বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিল পত্র

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : পঞ্চম খন্ড

মুজিবনগর : বেতার মাধ্যম

সম্পাদক : **হাসান হাফিজুর রহমান**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ পঞ্চম খন্ড

প্রকাশক	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণায়ল-এর পক্ষে- গোলাম মোস্তফা হাক্কানী পাবলিশার্স বাড়ি # ৭, রোড # ৪ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন : ৯৬৬১১৪১, ৯৬৬২২৮২ ফ্রাক্স : (৮৮০২)৯৬৬২৮৪৪ E-mail : info@paramabd.com
কপিরাইট	:	তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রথম প্রকাশ	:	নভেম্বর, ১৯৮২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯
পুনর্মুদ্রণ	:	ডিসেম্বর, ২০০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪১০
পুনর্মুদ্রণ	:	জুন, ২০০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬
প্রচ্ছদ	:	বকুল হায়দার
মুদ্রাকর	:	মোঃ আবুল হাসান হাক্কানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সড়ক # ৯, লেইন # ২, বাড়ি # ১ ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

HISTORY OF BANGLADESH WAR OF INDEPENDENCE
DOCUMENTS, VOL-5

Published by: Golam Mustafa
Hakkani Publishers
House # 7, Raod # 4, Dhanmondi, Dhaka-1205
Tel: 9661141, 9662282, Fax : (8802) 9662844
E-mail : info@paramabd.com

On behalf of Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Copyright: Ministry of Information
Government of the People's Republic of Bangladesh

Printed by: Md. Abul Hasan
Hakkani Printing & Packaging
Road # 9, Lane # 2, House # 1
Block # A, Sec # 11, Mirpur, Dhaka-1216

First Published: November, 1982
Reprint: December 2003
Reprint: June 2009

ISBN: 984-433-091-2 (set)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

দলিলপত্র : পঞ্চম খন্ড

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা, বাংলাদেশ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা ও বিকৃতির আশংকা এড়িয়ে যাবার জন্যই ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। আর সে প্রকল্পের ফসলই ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’। প্রায় ১৫,০০০ পৃষ্ঠায় ১৫ খন্ডে এসব দলিলপত্র প্রণয়ন করে ১৯৮২ সালে তা প্রকাশ করা হয়। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত গবেষক ও সম্পাদকবৃন্দের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই দলিলপত্র গ্রন্থমালা।

প্রথম প্রকাশের পরপরই বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতায় ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যেই এর সমুদয় কপি বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল গবেষণায় এই গ্রন্থমালা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য মন্ত্রণালযে গ্রন্থমালার চাহিদাপত্র আসতে থাকায় মন্ত্রণালয় ’’বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালা সীমিত সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘হাক্কানী পাবলিশার্স’কে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে তথ্যের কোন ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম যাতে না হয়, সে ব্যাপারে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রকাশনা প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব আরও সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র’’ গ্রন্থমালার সংস্করণটি বরাবরের মতই পাঠক ও গবেষকদের কাছে আদৃত হবে।

ঢাকা
ডিসেম্বর ২০০৩

(নাজমুল আলম সিদ্দিকী)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-তম/প্রেস-১/২এফ-২/৯৭/বিবিধ-১/৯৬৯ তারিখঃ ৩০ অক্টোবর ২০০৩

প্রেরক : অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রাপক : জনাব গোলাম মোস্তফা
স্বত্বাধিকারী
মেসার্স হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা।

বিষয় : "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৫ খন্ড)" পুনর্মুদ্রণের নিমিত্তে প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার নমুনা অনুমোদন।

সূত্র : তাঁর ০৮ অক্টোবর ২০০৩ তারিখের আবেদন।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের সাথে প্রাপ্ত নমুনা অনুযায়ী প্রচ্ছদ, প্রিন্টার্স লাইন ও অঙ্গসজ্জা মোতাবেক বিষয়োক্ত গ্রন্থাবলী চূড়ান্ত মুদ্রণের অনুমোদন প্রদান করা হলো। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত/অনুমোদিত প্রচ্ছদ নির্দেশক্রমে এতদ্ সাথ ফেরত প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মতোবেক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(অঞ্জলী রানী চক্রবর্তী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রেস-১)

প্রকাশকের কথা

প্রতিটি দেশ বা জাতির জন্য তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তৎপূর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের কাছে এক গৌরবময় সম্পদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য ১৯৭৭ সনে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে। নিরপেক্ষতা ও যথার্থতা বজায় রাখার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলাদি সংগ্রহ ও যাচাইপূর্বক তা সংকলন করা হয়। তারই ফলশ্রুতি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' গ্রন্থাবলী। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ১৯৮২ সনে ১৫ খন্ডে এই প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তার পুরো স্টক ফুরিয়ে যায়। এই গ্রন্থাবলী স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ক সকল গবেষণা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু স্টক না থাকায় বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত রয়েছে এবং এর দুষ্প্রাপ্যতা অনেক গবেষণা কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র** গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ রকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডের দায়িত্ব আমাদেরকে অর্পণ করায় আমরা গৌরবান্বিত। এরই ভিত্তিতে গ্রন্থাবলীর বিষয়সূচি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে নতুন আঙ্গিকে নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করি, পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলী পাঠক-গবেষকদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

বিশাল এই কর্মকান্ডে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৭ ডিসেম্বর ২০০৩

(গোলাম মোস্তফা)
স্বত্বাধিকারী
হাক্কানী পাবলিশার্স

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রামাণ্যকরণ কমিটির তরফ থেকে এই দলিল সংগ্রহের প্রকাশনা সম্পর্কে দুটি কথা নিবেদন করছি। এ প্রকল্পের উৎপত্তি ও গঠন, এর মূল উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হাসান হাফিজুল রহমান বিস্তারিত বলবেন।

বিপুলায়তন ও সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রকাশিতব্য দলিলসমূহ নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দলিলাদির পান্ডুলিপি ধৈর্য ধরে পরীক্ষা করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে সংযোজন ও সংশোধনের জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন। আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই দলিলগুলো সরাসরি পাঠক ও গবেষকদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দলিলপত্র যথাসম্ভব মূলসূত্র থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকাশিত দলিলগুলো প্রামাণ্যকরণ কমিটি অনুমোদন করে দিয়েছেন।

প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠাব্যাপী দলিল থেকে প্রাথমিক নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ। তাঁরা জনাব হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ দায়িত্ব যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে পালন করছেন।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সকল সদস্যকে এবং প্রকল্পের গবেষকবৃন্ধকে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে নিরলস ও অকাতর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত ও সবিবেচনার সাথে নির্বাচিত দলিলগুলো থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি সার্বিক, প্রামাণ্য ও নিরপেক্ষ চিত্র বেরিয়ে আসবে, আমরা এ আশা পোষণ করছি। সংগৃহীত সমূদয় দলিল একটি স্থায়ী আর্কাইভস্ গঠনে সহায়তা করবে। অনুদঘাটিত ও অনাবিস্কৃত দলিলগুলো ভবিষ্যতে সংগৃহীত হলে পরিশিষ্টের মাধ্যমে সেগুলো মূল দলিলের সংগে সংযোজিত হতে পারে।

প্রকাশিত দলিলগুলো পাঠক সমাজ ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৪ সেপ্টেম্বর,
১৯৮২।

মফিজুলস্নাহ কবীর
চেয়ারম্যান,
প্রামাণ্যকরণ কমিটি,
বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে সম্পর্কিত সারা বিশ্বে যা কিছু ঘটেছে তার তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সেসবের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পে ওপর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এই প্রকল্প স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল ও তথ্যসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর কারণ, সমকালীন কোন ঘটনার বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো একটি যুগান্তকারী ঘটনার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং বিকৃতির সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া বস্তুত অত্যন্ত দুরূহ। এ জন্যই আমরা ইতিহাস রচনার পরিবর্তে দলিল ও তথ্য প্রকাশকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। এর ফলে দলিল ও তথ্যাদিই কথা বলবে, ঘটনার বিকাশ ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, ঘটনা পরম্পরার সংগতি রক্ষা করবে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই কয়েকটি খন্ডে সংগৃহীত দলিলসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামনে একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় দেখা দেয় এই যে, দলিলপত্র সংগ্রহের সময়সীমা স্বাধীনতা যুদ্ধকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পশ্চাতে বিরাট পটভূমি রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধকে এই পটভূমি থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা যায় না। এই পটভূমির ঘটনাবলী- যাকে মুক্তিসংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায়- তার অনিবার্য পরিণতিই স্বাধীনতা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাই মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ জানা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধকে তুলে ধরা সম্ভবই নয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল প্রকাশের সংগে এর পটভূমি সংক্রান্ত দু'খন্ড দলিলসংগ্রহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এর ফলে প্রকল্পের দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা নিম্নরূপে দাঁড়ায় :

প্রথাম খন্ড	ঃ	পটভূমি (১০৫-১৯৫৮)
দ্বিতীয় খন্ড	ঃ	পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১)
তৃতীয় খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রশাসন
চতুর্থ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা
পঞ্চম খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : বেতারমাধ্যম
ষষ্ঠ খন্ড	ঃ	মুজিবনগর : গণমাধ্যম
সপ্তম খন্ড	ঃ	পাকিস্তানী দলিলপত্র : সরকারী ও বেসরকারী
অষ্টম খন্ড	ঃ	গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসংগিক ঘটনা
নবম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (১)
দশম খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (২)
একাদশ খন্ড	ঃ	সশস্ত্র সংগ্রাম (৩)
দ্বাদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া : ভারত
ত্রয়োদশ খন্ড	ঃ	বিদেশী প্রতিক্রিয়া " জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র
চর্তুদশ খন্ড	ঃ	বিশ্বজনমত
পঞ্চদশ খন্ড	ঃ	সাক্ষাৎকার
ষোড়শ খন্ড	ঃ	কালপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘন্ট

চার

মূল পরিকল্পনায় ৭২০০ পৃষ্ঠা মুদ্রণের পরিকল্পনা থাকলেও সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল হয়ে যাওয়ায় আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি খণ্ড প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠা, সর্বমোট ১৫০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহগুলির মুদ্রণ সম্পন্ন করার বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই ভিত্তিতে আমাদের কাজ এগিয়ে যায়।

দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে নীতিমালা আমরা ব্যাপক ও খোলামেলা রেখেছি। তবে পটভূমি সম্বন্ধে দলিল ও তথ্যাদি গ্রহণে কিছুটা সংযত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করি। আমরা শুধু সেইসব তথ্য ও দলিলই পটভূমি খণ্ডে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত নিই, যা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য ও এখানে বসবাসকারী জনগণের আশা আকাঙ্খার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ যেসব ঘটনা, আন্দোলন ও কার্যকারণ, এই ভূখণ্ডের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামের দিকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছে, প্রধানত সেসব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যই এই খণ্ডে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলাদেশের অতীত ঘাঁটতে বহু দূর-অতীতে প্রত্যাবর্তন করিনি। ১৯০৫ সালের বংগভংগ থেকেই পটভূমি সংক্রান্ত দলিল-তথ্যাদি সন্নিবেশন শুরু করি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ব্যাখ্যায় এই শুরুর সীমাটি বাহুল্যবর্জিত, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৯০৫-এর বংগভংগ এবং তা রদ-এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ দীর্ঘ সময়ের আর কোন দলিল এ খণ্ডে সন্নিবেশ করা হয়নি। কারণ ১৯১১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সর্বভারতীয় বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে বাংলার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। আর তা উত্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশেরই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা এ, কে, ফজলুল হক। ১৯৪৬ সালে নিতান্ত অবৈধভাবে দিল্লী কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের যে সংশোধনী করা হয়, তাতে বাংলার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয়রূপের প্রশ্নকে পরিহার করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের সম্মুখে স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে মূর্ত করে তুলেছে এমন সমস্ত দলিলই এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পটভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি শেষ হয়েছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের সময়সীমায়। এখানে কাল বিভাজন করা হয়েছে একান্তই খণ্ড পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসংখ্যার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে- কোন বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

পটভূমির বেলায় যে ধরনের দলিল ও তথ্যাদি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলো গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী, কোর্টের মামলা সম্পর্কিত রিপোর্ট ও রায়, কমিশন রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও প্রস্তাব, জনসভার প্রস্তাব, আন্দোলনের রিপোর্ট, ছাত্রদলের প্রস্তাব ও আন্দোলন, গণপ্রতিক্রিয়া, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রামাণ্য সমীক্ষা ও প্রবন্ধ, রাজনৈতিক পত্র, সরকারী নির্দেশ ও পদক্ষেপ ইত্যাদি। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদির বেলায় সংগ্রহের ধরন বিস্তৃততর হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ এই যুদ্ধের সংগে সারা বিশ্ব জড়িত হয়ে পড়েছিল। ফলে কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের বিষয়াদি জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় এবং প্রকল্প সেভাবেই অগ্রসর হয়। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ডায়েরী, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা, সরকারী নথিপত্র, রণকৌশল ও যুদ্ধসংক্রান্ত লিপিবদ্ধ তথ্যাদি, মুক্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতা, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, কমিটি গঠন, বিবৃতি, বিশ্বজনমত, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী প্রভৃতি নানা ধরনের তথ্য ও দলিল এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে সর্বসাধারণের মনোভাব প্রতিফলনে কোন ফাঁক না থাকে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে গণসহযোগিতার প্রতিস্তরের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে যতদূর সম্ভব মূল দলিল সন্নিবেশিত করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তবে যেসব দলিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং যেগুলি বাদ দিলে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না সেগুলি আমরা প্রকাশিত সূত্র থেকে গ্রহণ করেছি।

এ কাজে একটিই আমাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল, সঠিক ঘটনার সঠিক দলিল যেন সঠিক পরিমাণে বিন্যস্ত হয়। আমাদের কোন মন্তব্য নেই, অঙ্গুলি সংকেত নেই, নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নেই। আমরা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মনোভাব আগাগোড়া বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই দলিল-তথ্যাদি বাছাই, সম্পাদনা এবং বিন্যাস করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু সতর্কতা অটুট রেখেছি যাতে কারো প্রতিনিধিত্ব ক্ষুণ্ণ না হয়। দলিলের যথার্থতাই যার যা ভূমিকা ও গুরুত্ব তা যথাযথভাবে তুলে ধরবে। বস্তুত জনসাধারণই এ ধরনের ঘটনার প্রকৃত মহানায়ক। জনসাধারণের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছা যখন পরিণত ও অপ্রতিরোধ হয়ে ওঠে, কেবল তখনই জনগনের মধ্য থেকে যোগ্যতম নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশের বেলাতেও তাই ঘটেছে। আর তাই এমন সব দল বা সংগঠনের দলিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে দল বা সংগঠন আমাদের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো মুখ্য ভূমিকা বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেনি। তবু একাত্তরের অনেক আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চিন্তা একটা দেশের একটা জাতির নিদিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী অন্তঃস্রোতকেই সামনে তুলে ধরে। আসলে মহীরুহের চারপাশে জেগে ওঠা অজস্র গাছপালা নিয়েই বনের গঠন-কাঠামো। বনকে জানতে হলে এর সবটাই জানা দরকার।

তবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সবটুকু হয়তো প্রতিফলিত নাও হয়ে থাকতে পারে। এর দুটো কারণ, প্রথমত গ্রন্থের সীমিত পরিসরে স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্ন, দ্বিতীয়ত অনেক তথ্য ও দলিল হাতে না আসা যা বহুক্ষেত্রে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি, কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটেনি। সবাইকে আমরা জায়গা দিতে চেয়েছি এবং ভূমিকা অনুযায়ী গুরুত্ব বিধানের দিকেও লক্ষ্য রেখেছি- এইটেই মূল কথা। এই নীতি পটভূমি ও অন্যান্য খণ্ডেএকইভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার মতো দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহসংখ্যার দিক থেকে বিপুল বলতে হবে। তবু আমাদের ধারণা এই যে, বহু দলিল ও তথ্য এখনো সংগ্রহের বাইরে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি লোকই কোন না কোন ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগে জড়িত ছিলেন। গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বহু ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, বহু বীরত্বগাথা, বহু ত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনী স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে। এর পরিমাণ অনুধাবন করা কঠিন। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়েও ছিল এ সম্পর্কে সমর্থন ও প্রতিক্রিয়া এবং প্রবাসী বাঙালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তাই সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না। দেশ ও বিদেশের তথ্য সংগ্রহের কাজ তাই কেবল বাড়তে পারে, শেষ সীমায় পৌঁছানোর ঘোষণা দেয়া এখনই সম্ভব নয়। এর জন্য দীর্ঘ পরিক্রমা ও সক্রিয়তার প্রয়োজন।

সীমিত সময়ের জন্য আমাদের প্রকল্পের আয়ু; তদুপরি আমাদের লোকবলও মাত্র চারজন। এই অবস্থায় এই বিশাল কাজের কতখানি বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাববার বিষয়। তবু আমরা অসাধ্য সাধনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং যতদূর সফল হয়েছি তাতে স্বাধীনতা যুদ্ধসংক্রান্ত তথ্য ও দলিলের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায়। এখন এর বিকাশ ও উন্নয়নের অপেক্ষা রাখে মাত্র। তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এ কথা বলা যায়।

দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক এবং খোলামেলা। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পত্রপত্রিকার দপ্তর, গ্রন্থাগার এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছে প্রেরণ করেছি কয়েক হাজার প্রশ্নমালা কিন্তু দুঃখজনকভাবে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। প্রতিটি রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছে- কিন্তু দলগতভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ দিয়ে গেছেন নিজস্ব সংগ্রহের দলিলপত্র। আবেদনের জবাবে আশানুরূপ সাড়া না পাবার কারণ হিসেবে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করেছি : প্রথমত, ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা, যার ফলে খুব কমসংখ্যক মানুষই দলিলপত্র সংগ্রহ বা সংরক্ষণ করে থাকেন এবং দ্বিতীয়ত, ভিত্তিহীন সংশয়- বিশেষ করে কারো কারো প্রতিক্রিয়ার আমাদের মনে হয়েছে যে, ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টাটি সরকারী হওয়ায় এর সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁরা

ছয়

যথেষ্ট সন্দিহান এবং ফলে দলিলপত্র প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে অপূর্ণাংগতার সম্ভাবনাকেই যেন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এই সমস্যা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। সরকারী উদ্যোগের কারণে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে আশাঙ্কা, তা আমাদের দলিল খণ্ডগুলি নিরসন করবে বলে আমরা মনে করি।

এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, এমন অনেকের কাছেই দলিল ও তথ্যাদি রয়েছে যা তাঁরা হাতছাড়া করতে রাজী নন। অনেকেই কিছু ছেড়েছেন, কিছু হাতে রেখে দিয়েছেন। আবার কারো কারো প্রত্যাশা, দলিলাদি পুরানো হলে সেগুলি অনেক বেশী লাভের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমরা মূল দলিলের ফটোকপি রেখে অনেককেই তাঁর মূল কপি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রেও অনেকেই ফটোকপি রাখারও সুযোগ দিতে রাজী হননি- অর্থাৎ তাঁর হাতের দলিলটি তিনি বেরই করেননি ভবিষ্যতের আশায়। সরকার দলিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোন অর্ডিন্যান্স পাস করেননি। ফলে দলিল পাওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত অনুরোধ ও প্রয়াস চালাতে পারি, আইনগত চাপ সৃষ্টি করতে পারি না। অথচ এ কথাও সত্যি যে, স্বাধীনতাসংক্রান্ত দলিল মাত্রই জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠানগতভাবে কুক্ষিগত করে রাখা উচিত নয়।

এই সংগে আমরা দুঃখের সংগে উল্লেখ করি যে, এই প্রকল্প শুরু হবার আগেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট নেতাদের অনেককে আমরা হারিয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্র পাওয়ার কিংবা তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

এইসব বাধাবিঘ্নের মধ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে আমাদের এতদসংক্রান্ত যে বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে তা অতীতের ত্রুটি সংশোধনে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে সহায়ক হতে পারে। যে তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে তা পূরণ হওয়া দরকার। সম্ভব হলে অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে কিংবা ভবিষ্যতে আরো দলিলপত্র সংগৃহীত হলে তা থেকে নির্বাচন করে অতিরিক্ত খণ্ড প্রকাশ করে এই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করা যাবে। দেশে-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত জরুরী বলেই আমরা মনে করি। এ ধারা ক্ষুণ্ণ হলে এ কাজ দুরূহতর হবে, এমনকি এটা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পার। এ ব্যাপারে স্থায়ী কর্মসূচী সুফলদায়ক হবে সন্দেহ নেই।

দলিল এবং তথ্য প্রামাণ্যকরণের জন্য সরকার নয়-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর এই প্রামাণ্যকরণ কমিটির চেয়ারম্যান।

কমিটির সদস্যরা হলেন :
ডঃ সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ সফর আলী আকন্দ, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী।
ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর।
ডঃ কে, এম, করিম, পরিচালক, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার।
ডঃ কে, এম, মহসীন, সহযোগী প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডঃ শামসুল হুদা হারুন, সহযোগী প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনাব হাসান হাফিজুল রহমান, সদস্য-সচিব।

প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ নির্দিষ্ট গ্রন্থের জন্য দলিলাদি বাছাই করে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সামনে পেশ করেন। প্রামাণ্যকরণ কমিটি সেগুলি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য কি না তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করেন। কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল দলিল ও তথ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেগুলিই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থের জন্য পেশকৃত দলিলাদির কিছু কিছু কমিটি নাকচ করেন; কিছু নতুন দলিল ও তথ্য যা গ্রন্থের উৎকর্ষের জন্য নেহাৎ জরুরী তা সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে তাঁদের এই নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করা

হয়েছে। তবে এ-ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকল্পকে বেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। একেই লোকবল নগণ্য, তার ওপর স্বাভাবিক কাজ সেরে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য দলিলের সন্ধানে প্রকল্পের কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। তবুও কর্মীরা লেগে থেকেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলও হয়েছেন। তবে সংগ্রহ যথাসময়ে হয়তো হয়নি, অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। ফলে খণ্ডবিশেষে সংযোজন অধ্যায় যোগ করতে হয়েছে। বিশেষভাবে পটভূমি খণ্ড সংকলনে এই পরিস্থিতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯০৫ সালের মূল গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাচ্ছিল না। পটভূমি খণ্ডের জন্য আমরা প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত করি। কিন্তু প্রামাণ্যকরণ কমিটি যতদূর সম্ভব মূল দলিল সংকলনের পক্ষপাতী। তাই মূল দলিল সংগ্রহের চেষ্টা নতুনভাবে নেয়া হয়। ঢাকা গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়নি। কোলকাতা গেজেটেও নয়। ইতিমধ্যে পটভূমি খণ্ডটি প্রেসে চলে যায়। এই গেজেটের ফাইল লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, হঠাৎ অন্য কাগজের স্তূপের ভেতর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিন খানের রীট আবেদনের মূল দলিল খুঁজতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রমের পরও তা পাওয়া যায়নি। এর মূল কপি সিন্ধু হাইকোর্টে রয়েছে। আনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তা উদ্ধৃতির আকারেই গিয়েছে। এ থেকে প্রামাণ্যকরণ কমিটির সংকলনের কাজ নিখুঁত ও সুষ্ঠু করার জন্য অটল আগ্রহ ও আন্তরিকতাই ব্যক্ত হয়। প্রকল্পের কর্মীরাও তাঁদের এই অনুভূতির যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন; তাঁদের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে কসুর করেননি, প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। পটভূমি খণ্ডে দলিলসমূহ কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের দলিলের বেলাতেও কমবেশী এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডেই নির্ঘন্ট ও কালপঞ্জী দেয়া হয়েছে। শেষ খণ্ডে গ্রথিত হচ্ছে সকল খণ্ডের নির্ঘন্ট এবং কালপঞ্জী; ফলে পাঠকদের পক্ষে কোন খণ্ডে কী আছে তা একনজরে জানা সম্ভব হবে।

প্রামাণ্যকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল দলিলসমূহ মূল যে ভাষায় আছে তাতেই ছাপা হবে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এতে বিশেষ অসুবিধে দেখা দেয়। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় মূল দলিলগুলি আমরা সংকলনে স্থান দিয়েছি। তাছাড়া উর্দু, হিন্দী, আরবী ও রুশ ভাষার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল অনুবাদসহ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্কান্দেনেভীয়, ফরাসী, জার্মান, জাপানী ও ইন্দোনেশীয় প্রভৃতি ভাষায় বেশ কিছু দলিল ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও তার অনুবাদ করা এবং গ্রন্থে সেসবের স্থান দেয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি। এগুলি ভবিষ্যতের জন্যে জমা রইল। প্রাসঙ্গিকতা ও পরিসরের কথা বিবেচনা করে কোন কোন দলিল সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তবে সে ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি যাতে মূলের বিকৃতি না ঘটে।

বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্যাদি জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে। এছাড়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আরও দলিলপত্র সংগৃহীত হবে। এগুলির গুরুত্বও কম নয়। অর্থাৎ এগুলির ওপর গবেষণা করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রকল্প-প্রকাশিত খণ্ডগুলির বাইরেও নতুন তথ্য সংবলিত মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা অবারিত থেকে যাবে। এ সুযোগ সম্প্রসারিত করা দেশ ও জাতির স্বার্থেই একান্ত অপরিহার্য। কারণ এ সম্পর্কে যত বেশী বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি জাতি জানতে পারবে আমাদের অগ্রযাত্রা তত বেশী নির্ভুল ও সচ্ছল হবে। তাছাড়া এ আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস; তাই এ সম্পর্কিত প্রতিটি ছত্র পরম যত্ন, দায়িত্ব ও আগ্রহে সংরক্ষিত করা দেশ ও সরকারের নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত প্রায় প্রতিটি আত্মসচেতন দেশই তাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য স্থায়ী আর্কাইভস প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এবং এ সংগ্রহের কাজ ও এর ওপর গবেষণার কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে এ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি সমানভাবে দরকার- বিশেষভাবে এ কারণে যে, এ সংগ্রামে এ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যত দিন যাবে তাদের সংগে যোগাযোগ তত বৃদ্ধি পাবে, নতুন নতুন তথ্য আর্কাইভস-এর সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করতে থাকবে। এ সুযোগ বিনষ্ট করা দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।

প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পর্যায়ে কিছু প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তি ও কর্মীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা যাদুঘর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ অবজারভার লাইব্রেরী, দৈনিক বাংলা লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং

জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যাদুঘর এবং দিনাজপুর কালেকটরেট হতেও আমরা কিছু দলিল ও তথ্যাদি পেয়েছি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার এবং সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর (ডি, এম, আই)-এর সৌজন্যে বহুসংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকে দলিলপত্র দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম এখানে উল্লেখ করা খুবই সংগত মনে করছি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিছুসংখ্যক মূল্যবান দলিল প্রকল্পকে দিয়েছেন। বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মার্কিন কংগ্রেসের বহুসংখ্যক দলিল এ, এম, এ, মুহিতের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। প্রবাসে বাংলাদেশ আন্দোলনের সংগে জড়িত অনেকে তাঁদের দলিলপত্র প্রকল্পকে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুমা রাশীদা রউফ, আজিজুল হক ভূইয়া, ডঃ এনামুল হক, আমীর আলী, সাখাওয়াত হোসেন ও জহির উদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশ হতে কিছু মূল্যবান দলিল পাঠিয়েছেন মাহমুদুল হক এবং খোন্দকার ইব্রাহিম মোহাম্মদ। মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের দলিলপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে যাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা আমরা বিস্মৃত হব না তাঁরা হলেন হাসান তৌফিক ইমাম, মওদুদ আহমদ, মাঈদুল হাসান, আবদুস সামাদ, দেবব্রত দত্তগুপ্ত, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আলমগীর কবীর। পটভূমি পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল দিয়ে সাহায্য করেছেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী জাফর আহমদ, অজয় রায়, ইসমাইল মোহাম্মদ, যতীন সরকার, শেখ আবদুল জলিল, ডঃ সাঈদ-উর-রহমান এবং আমিনুল হক। ইসমত কাদির গামা, শামসুজ্জামান মিলন, উৎপল কান্তি ধর, স্বপন চৌধুরী ও রেজা মোস্তাক স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ও তথ্যাদি দিয়েছেন। উল্লিখিত সকলকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের বিপুল সংগ্রহের বিরাট কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত রয়েছেন আরও অনেকে। এই স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্কাইভস-এর দলিল সংরক্ষণ খাতায় তাঁদের সকলের নাম দলিলাদির উৎস হিসেবে লিখিত রয়েছে। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

দলিল ও তথ্যাদি সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রামাণ্যকরণ কমিটির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। কমিটির সদস্যগণ পরম ধৈর্য, যত্ন ও আগ্রহ সহকারে দলিলাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য বিচার করেছেন। তাঁরা শুধু দলিলাদির সত্যতা যাচাই করেননি, প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিশেষ করে খণ্ডসমূহের তথ্যসমৃদ্ধি ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীরের কথা আন্তরিকতার সংগে স্মরণ করছি।

দলিল সংগ্রহ খণ্ডগুলির প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংগে বাংলাদেশ সরকারের মুদ্রণ বিভাগ এবং দি প্রিন্টার্স-এর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সবশেষে আরও কয়েকজনের কথা বলতে হয়- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলসংগ্রহ খণ্ডগুলির পেছনে রয়েছে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম ও নিরলস সাধনা, তাঁরা এই প্রকল্পের চারজন গবেষক- সৈয়দ আল ঈমামুর রশীদ, আফসান চৌধুরী, শাহ আহমদ রেজা এবং ওয়াহিদুল হক। শুধুমাত্র চাকরির দায়িত্বে নয়- গবেষণার স্পৃহা ও প্রকল্পের কাজের সংগে একাত্মতায় তাঁরা দলিল ও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ হতে শুরু করে দলিলসমূহের সংগ্রহ, বাছাই, সম্পাদনায় সহায়তা, প্রেসকপি তৈরীকরণ, মুদ্রণ তত্ত্বাবধান-সর্ববিধ কাজ সীমিত ও সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন। এছাড়া সুকুমার বিশ্বাস ও রতনলাল চক্রবর্তীর শ্রম ও নিষ্ঠার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আবদুল হামিদের গভীর দায়িত্ববোধ এবং নিরলস তৎপরতা প্রকল্পের স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, যাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন, যাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশে যাঁরা দেশপ্রেমের দীপশিখা অমলিন রেখেছেন, যাঁরা আমাদের কর্মের পথে প্রতি মুহূর্তের প্রেরণাস্বরূপ তাঁদের সকলের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের এই সংগ্রহ আমরা দেশের মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছি।

হাসান হাফিজুর রহমান

সম্পাদক

দলিল প্রসঙ্গঃ মুজিবনগর - বেতার মাধ্যম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ৫ম খন্ডের দলিলপত্রের অধিকাংশই প্রাথমিক সূত্র থেকে আহৃত। প্রাথমিক সূত্র থেকে পাওয়া য়ায়নি এমন কিছু কিছু দলিল শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত শব্দসৈনিক এবং রেডিও বাংলাদেশের পাক্ষিক মুখপত্র 'বেতার বাংলা' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সন্নিবেশিত গানসমূহের কয়েকটি উৎস শামসুল হুদা চৌধুরী সম্পাদিত অনেক রক্ত :একটি জাতি নামক সাময়িকী এবং তার রচিত একাত্তরের রণাঙ্গন। সন্নিবেশিত দলিলসমূহের সূত্রোল্লেখ থেকেই এটা জানা যাবে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের সূচনা চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবনে ২৬-৩০ মার্চ ১৯৭১- সমাপ্তি মুজিব নগরে জানুয়ারী ২, ১৯৭২ তারিখে। ৩০ মার্চ ১৯৭১ তারিখে কালুরঘাট ট্রান্সমিশন ভবন হানাদার বাহিনীর বিমান হামলায় বিধ্বস্ত হওয়ার পর ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছিল, সেগুলির কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ পর্যায়ে প্রচারিত মাত্র একটি বিষয় (পৃঃ ১৩) সন্নিবেশ করা হয়েছে। সূচনা পর্বের ২৬ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত প্রচারিত বিষয় সমূহও বেশি পাওয়া যায়নি, শুধু একখানি বাণীবদ্ধ টেপ (পৃঃ ১-১০), ' শব্দসৈনিক '- এ প্রকাশিত একটি কথিকা (পৃঃ ১২) ও বেতার বাংলায় প্রকাশিত এ সময়ের প্রচারিত অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ (পৃঃ ১১) ছাড়া। এগুলি গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনরে প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকার তত্ত্বাবধানে সংগঠিতভাবে ২৫ মে ১৯৭১- এ স্বাধীন বাংলা বেতার সম্প্রচার নিয়মিতভাবে শুরু হয়। সেই তারিখ থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার দলিলপত্র যতোদূর সংগৃহীত হয়েছে তা আংশিকভাবে সন্নিবেশ কারা হয়েছে (পৃঃ ৪০-৫১১)।

তার আগে বেতারের অধিবেশন সমূহের পরিচয় দেবার প্রয়াস রয়েছে গ্রহন্থের ৩ নং শিরোনামভূক্ত অনুষ্ঠান পত্রগুচ্ছে (পৃঃ ১৫)। শেষে রয়েছে সংগীত সূচী (পৃঃ ৫১২-৫১৬)। স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত কর্মী, সংগঠক ও পরিচালবৃন্দের নামের কোন তালিকা এ খন্ডে দেওয়া হয়নি, কারণ, অনুরুপ একটি তালিকা এই দলিলপত্রের ৩য় খন্ডে আগেই মুদ্রিত হয়েছে।

বিভিন্ন শিরোনামে প্রচারিত বাংলা ধারাবাহিক স্বাতন্ত্র কথিকামালাকে সূত্রানুযায়ী বিভাজন করা হয়েঠেছ (পৃঃ ৫৪-৫২৬)।বাংলা অনুষ্ঠানের বিষয়াদি ছাড়াও উর্দু এবং ইংরেজী অনুষ্ঠানের প্রচারিত বিষয় সমূহের পরিচয় মিলবে যথাক্রমে ২৭৯-২৮০ ও ৪২২-৫০২ পৃষ্ঠাগুলিতে। বিষয় বস্তু অনুসারে আলাদা শিরোনামে চিহ্নিত করেও বাংলা অনুষ্ঠানের কিছু কথিকা সন্নিবেশিত হয়েছে-যেমন রণাঙ্গন সম্পর্কিত কয়েকটি কথিকা (পৃঃ ৫২৭-২৭৮), ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক কথিকা (পৃঃ ২৮১-২৮৭) ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অনুষ্ঠন (পৃঃ ২৮৮-২৯৫) ইত্যাদি। প্রচারিত বিভিন্ন নিয়মিত অনুষ্ঠান যেমন রক্ত স্বাক্ষর সাহিত্যানুষ্ঠান (পৃঃ ২৯৬-৩০৯), মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অগ্নিশিখা অনুষ্ঠান (পৃঃ ৩৪০) গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠান (পৃঃ ২৯৬-৩০৯), প্রবৃতির অন্তর্গত কিছু কিছু বিষয় সংকলন করা হয়েছে। এ ছাড়া কবিতা(পৃঃ ৩১০-৩৩৯), রুপকানুষ্ঠান (পৃঃ ২৪৮-৩৭০),জীবন্তীকা (পৃঃ ৩৭১-৩৮২), গান(পৃঃ ৪০২-৪২১) ইত্যাদিও রয়েছে। সংযোজনীতে স্থান পেয়েছে মার্চ ও এপ্রিল ১৯৭২-এর বেতার বাংলা থেকে সংকলিত আরও কয়েকটি বাংলা কাথিকা (পৃঃ ৫০৩-৫১১)।

পরিশিষ্ঠে (পৃঃ ৫১৭-৫২৭) আছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন জনের লেখা কয়েকটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ। সবশেষে এসেছে বেতার অনুষ্ঠন প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার সরকারী দরিল (পৃঃ ৫২৮)। এ দলিলপত্রের পঞ্চদশ খন্ডে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার নেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে এ সম্পর্কিত তথ্য সংক্ষেপ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিয়মিত অনুষ্ঠানমালার বাইরে বিভিন্ন সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, সরকার প্রধান, সেনাবাহিনী প্রধান ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের যেসব ভাষণ এবং সরকারের যেসব নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হয়েছে সেগুলি বাংলাদেশের স্বধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র -এর অন্যান্য প্রাসঙ্গীক খণ্ড, যেমন- ৩য়, ৪র্থ ও ১১শ খন্ডসমুহে সংযোজিত হওয়ায় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বিষয়সমূহের রচয়িতার নাম প্রায় ক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে কেবল দু'একটি ক্ষেত্রে যেমন-'বিশ্বজনমত শীর্ষক ধারাবাহিক বাংলা কথিকাগুলির (পৃঃ ৫৪-৮৬) লেখকের নাম দলিল সন্নিবেশকালে জানা যায়নি বলে অনুল্লিখিত থেকে গেছে। এ পর্যায়ের ৩০ মে, ১০ জুন, ২৯ জুলাই, ১ আগষ্ট ১৯৭১- এর কথিকাগুলি বাদে বাকী সবগুলি সাদেকীন-এর রচনা বলে পরে চিহ্নিত করা গেছে। ১ আগষ্ট-এর কথিকাটি লিখেছেন আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটির লেখকের নাম জানা যায়নি। অনুরূপভাবে, ইংরেজী অনুষ্ঠানের 'ওয়ার্ল্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রতিবেদনগুলিরও লেখকের নাম জানা যায়নি। তবে এগুলি একাধিক জনের রচনা এবং আলমগীর কবীর, আলী জাকের ও মওদুদ আহমেদ সাধারণত এগুলি লিখতেন।

পরিশিষ্ট

[এক]

The Bangladesh Gazette, Part II September 1, 1971, Page 503

Ministry of Information & Broadcasting

***　　　　***　　　　***

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৩শে আগস্ট ১৯৭৭

নং-তথ্য/৪ই-২৫/৭৭/৪১৪৮১- স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে দৈনিক বাংলার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব হাসান হাফিজুর রহমানকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে ১৯৭৭ সনের ১লা জুলাই হইতে জনস্বার্থে এক বৎসরের জন্য চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল।

২। চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি তাঁহার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে-

আবদুস সোবহান

উপ-সচিব

পরিশিষ্ট

[দুই]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DACCA

No. 51/2/78-Dev/231 Dated 18-7-1978

RESOLUTION

In connection with the Writing and Printing of the History of Bangladesh War of Liberation the Government have been pleased to constitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh War of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir	Pro-Vice Chancellor, Dacca University
2.	Professor Salahuddin Ahmed	Chairman, Department of History, Jahangirnagar University
3.	Dr. Safar Ali Akanda	Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.
4.	Dr. Enamul Huq	Director, Dacca Museum.
5.	Dr. K. M. Mohsin	Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University
6.	Dr. Shamsul Huda Harun	Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University
7.	Dr. Ahmed Sharif	Professor and Chairman, Deptt. of Bengali, Dacca University
8.	Dr. Anisuzzaman	Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman	O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project

The following shall be the terms of reference of the Committee:

(a) To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

(b) To determine validity and price of document are required for the purpose.

Syed Asgar Ali
Section Officer

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DACCA

No. 51/2/78-Dev/10493/(25) Dated : 13-2-1979

RESOLUTION

In partial modification of Resolution issued under No. 51/2/78-Dev/231, dated 18.7.78 Govt. have been pleased to reconstitute and Authentication Committee for the Project "Writing and Printing of a History of Bangladesh war of Liberation" with the following members:

1.	Dr. Mafizullah Kabir Pro-Vice Chancellor, Dacca University	Chairman
2.	Professor Salahuddin Ahmed Chairman, Department of History, Jahangirnagar University	Member
3	Dr. Anisuzzaman Professor, Deptt. of Bengali, Chittagong University	Member
4.	Dr. Safar Ali Akanda Director, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi.	Member
5.	Dr. Enamul Huq Director, Dacca Museum.	Member
6.	Dr. K. M. Mohsin Associate Professor, Deptt. of History, Dacca University	Member
7.	Dr. Shamsul Huda Harun Associate Professor, Deptt. of Political Science, Dacca University	Member
8.	Dr. K. M. Karim Director, National Library and Archives, Dacca	Member
9.	Mr. Hasan Hafizur Rahman O.S.D., History of Bangladesh War of Liberation Project	Member-Secretary

2. The following shall be the terms of reference of the Committee:

To verify, endorse and authenticate the collected data and documents to be included in the History of Bangladesh War of Liberation.

To determine validity and price of document are required for the committee.

M.A. Salam Khan
Section Officer

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্র প্রচারিত অনুষ্ঠান (অংশ)	১
২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান	
	-২৬ শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে	১১
	-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কথিকা	১২
	-সাম্প্রদায়িতকাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ	১৩
৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর অনুষ্ঠান গুচ্ছপত্র (অংশ)	১৫
৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজী সংবাদঃ	
	-বাংলা সংবাদ	৪০
	-ইংরেজী সংবাদ	৪২
৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত নিয়মিত বাংলা কথিকামালাঃ	
	-বিশ্ব জনমত	৫৪
	-দৃষ্টিপাত	৮৬
	-সংবাদ পর্যালোচনা	১০৪
	-মানুষের মুখ	১২৩
	-প্রতিনিধির কন্ঠ	১৩০
	-অভিজ্ঞতার আলোকে	১৩৯
	-শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন	১৪৩
	-পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে	১৪৬
	-দর্পণ	১৫০
	-কাঠগড়ার আসামী	১৫৩
	-জনতার সংগ্রাম	১৫৪
	-পুতুল নাচের খেল	১৫৫
	-বিশ্ব বিবেক ও বাংলাদেশ	১৫৮
	-পিন্ডির প্রলাপ	১৬১
	-রক্তের অক্ষরে লিখি	১৬৬
	-দৃষ্টিকোণ	১৭২
	-রাজনৈতিক মঞ্চ	১৭৫
৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও কয়েকটি নিয়মিত কথিকাঃ	
	-দর্পণ	১৭৮
	-রাজনৈতিক মঞ্চ	১৮১
	-জনতার সংগ্রাম	১৮৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-অভিযোগ	১৮৫
	-চরমপত্র	১৮৭
৭।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা কথিকামালাঃ	
	-সাময়িকী	১৯০
	-বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত	১৯২
	-মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা	১৯৩
	-রণ দামামা	১৯৬
	-কথিকা	১৯৭
	-বাংলাদেশ গেরিলা	১৯৮
	-আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা	১৯৯
	-দেশবাসী সমীপে নিবেদন	২০০
	-যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী	২০৩
	-সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাঙলাদেশ	২০৪
	-আমরা তাদের ভাতে মারাবো	২০৬
	-যুদ্ধই একমাত্র পথ	২০৮
	-কয়েকটি ছবি- একটি ইতিহাস	২১০
	-মুক্তি সংগ্রামে মায়ের প্রেরণা	২১২
	-মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গ বীরাঙ্গণা	২১৪
	-বাংলার মুখ	২১৬
	-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন	২১৯
	-বাংলাদেশে কাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়	২২১
	-আগ্রগামী মুক্তিবাহিনী	২২৩
	-এখন অনেক কাজ	২২৪
৮।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও বাংলা কথিকা	
	-রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে	২২৭
	-প্রতিধ্বনি	২২৯
	-অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর	২৩০
	-ইয়াহিয়া জবাব দাও	২৩২
	-ঝিলামের চার ভাই	২৩৩
	-রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম	২৩৫
	-রেনেসার সূচনাঃ বাংলাদেশ	২৩৭
	-রণাঙ্গনে বাঙলার নারী	২৩৯
	-দেয়ালের লিখন	২৪০
	-বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু	২৪২

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-দেশে গঠনে নারীর ভূমিকা	২৪৪
	-স্বদেশ স্বকাল	২৪৬
	-বাংলার সংগ্রামী জনাতা প্রস্তুত	২৪৮
	-বাংলাদেশের পুর্নগঠন-৩	২৪৯
	-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ	২৫১
৯।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত রণাঙ্গন সম্পর্কিত কংয়েকটি কথিকাঃ	
	-দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম	২৫৭
	-মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে	২৬৪
	-মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে	২৬৬
	-দুর্জয় বাংলা	২৬৮
	-মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম	২৭০
	-ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল	২৭২
	-রণাঙ্গণ ঘুরে এলাম	২৭৩
	-মুক্তাঞ্চলে	২৭৬
১০।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান থেকেঃ	
	-একটি উর্দু কথিকা	২৭৯
১১।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের কয়েকটি কথিকাঃ	
	-ইসলামের দৃষ্টিতে	২৮১
	-ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ	২৮২
	-বাইবেল পাঠ ও আলোচনা	২৮৫
১২।	ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানঃ	
	-রমজানের ওই রোজার শেষে	২৮৮
	-রকেথ রাঙ্গ ঈদ	২৯১
	-রক্তে রাঙা ঈদুল ফিতর	২৯৪
১৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠন থেকেঃ	
	-বিপন্ন যখন	২৯৭
	-আজকের বাংলায়	৩০০
	-সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে	৩০৩
	-রণ শিবিরের একটি প্রতক্ষ্য চিত্র	৩০৫
	-স্বীকারোক্তি	৩০৭
১৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত কয়েকটি কবিতাঃ	৩১০
১৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান অগ্নিশিখা থেকেঃ	৩৪০
	’-এহিয়া বধ কাব্য’	
১৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত একটি রুপক অনুষ্ঠানঃ	
	-জল্লাদের দরবার (অংশ)	৩৪৮

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত জীবন্তিকা অনুষ্ঠানঃ	
	-মীর জাফরের রোজনামচা	৩৭১
	-এ সত্য রুধিবে কে?	৩৭৪
	-কে আমাদের রুখবে?	৩৭৯
১৮।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানঃ	
	-সোনার বাংলা	৩৮৩
	-জনতার আদালত	৩৮৯
	-গ্রাম বাংলা	৩৯২
১৯।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান	৪০২
২০।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ	
	-নিউজি কমেন্টারী	৪২২
২১।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ	
	-ওয়ার্ল্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ	৪৩৪
২২।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী প্রতিবেদনমালা:	
	-Shocking Western Apathy : Bangladesh No Biafra or	৪৫০
	Indonesia	৪৫১
	-UN Proved Impotent	৪৫২
	-British Parliament Debates Bangladesh	
	-More US Arms for Killing Bengalees:	৪৫৪
	AAPO Fails to Understand Bangladesh	৪৫৫
	-Emergence of Secularism	৪৫৭
	-British Delegation States Yahya, Tikka	৪৫৮
	-Awami League Opts for Military Solution	
	-Not Separatism : A War of Liberation	৪৬০
	-Causes of Arab Apathy Toward Bangladesh	৪৬২
	-Nixon Goes to Peking as Bangladesh Bleeds	৪৬৪
	-Yahya Prepares to Murder Sheikh	৪৬৫
	-Indian Moslems Misled	৪৬৭
	-A multi-pronged Attack on Bangladesh	৪৬৯
	-UN to Pakistan's Rescue	৪৭১
	-Famine as a Weapon Relief Food for Soldiers!	
	Bangla is NO Biafra	৪৭২
	-World Press Worried about Sheikh: Honor for Tikka!	৪৭৪
	-Yahya Finds His Quisling	৪৭৬
	-'Amnesty' Fail to deceive : BBC Thaws:	
	Mercenary Malik	
	-An Historic Five-Party Agreement : Proof. Galbraith	৪৭৭
	Mistakes Bengali Spirit	৪৭৯
	-US Senators Vote Stop[page of Aid: Paks on the Run	৪৮১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	-Collusion with Iran	৪৮৩
	-India-USSR Treaty	৪৮৪
	-British Labor Party Wakes up: UN Intervention Not Welcome Now	৪৮৬
	-Yahya and His Bay Elections	৪৮৯
	-Monem Eliminated: Other Collaborators Shaking in	৪৯০
	Pants	৪৯১
	-Yahya'a Approaching Doom	৪৯৩
	-US People Force Nixon Stop Arms Flow	৪৯৫
	-Pakistan in Tight Corner: D-Day Nearing Warning for	৪৯৬
	UN	৪৯৮
	-Bangladesh Get Ready!	৫০০
	-Final Battle Begins: Mukti Bahini Riding High	৫০১
	-The Decisive Stage	
	-Niazi'a Pitiful Boasts	
	সংযোজন	
২৩।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানমালার আরও কয়েকটি কথিকাঃ	
	-তথাকথিত পাকিস্তান বেতার ঢাকা	৫০৩
	-মৃত্যুহীন প্রাণ	৫০৬
	-ইবলিশের মুখোশ	৫০৭
	-রণাঙ্গনের চিঠি	৫০৯
	-বিচার চাই	৫১০
২৪।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত সূচী (অংশ)	৫১২
	পরিশিষ্ট-১	
২৫।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন (অংশ)	৫১৭
	পরিশিষ্ট-১	
২৬।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সভার কার্যবিবরণী	৫২৮
২৭।	নির্ঘণ্ট	৫৩১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত অনুষ্ঠান (অংশ)	টেপ থেকে উদ্ধৃত	২৬-৩০ মার্চ, ১৯৭১

"এবার তোমাদের বিদায় নিতে হবে, তবে অক্ষত অবস্থায় নয়। যে রক্ত এতদিন তোমরা নিয়েছো, সে রক্ত এবার আমরাও নেব।" বলেছেন বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

"বাঙালী রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ বাহিনী, মুক্তিসেনা- এগিয়ে যাও। তোমাদের সাথে রয়েছে বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা। এরা সবাই রক্ত দিতে প্রস্তুত, আজ এরা রক্ত দেবেই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে পাকিস্তানী হানাদারদের ওপর এরা আক্রমণ চালাবে।" বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

"পাক সৈন্যদের খতম করুন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। যে পতাকা একবার বাংলাদেশের মানুষ উড়িয়েছে,শেষ রক্তবিন্দু থাকতেও সেই পতাকা কোনোদিন তারা ভুলে যাবে না।" বলেছেন স্বাধীন বাংলার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চারজন নেতা।

মনে রাখবেন, শত্রুসৈন্য ধ্বংস হওয়া না পর্যন্ত এই যুদ্ধাবস্থা চলবেই। তাই আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে, রাতের ঘুম হারাম করে আপনারা আপনাদের বিজয়ের পথে এগিয়ে যান।

পশ্চিমা হানাদারেরা এখনো চিনতে পারেনি বাঙালী রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ বাহিনী আর মুক্তিসেনা কি জিনিস! তারা ভুলে গেছে, এই বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে যে শৌর্য ও বীর্য দেখিয়েছে তা তারা এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, যে সমস্ত হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য এখনো রয়েছে তাদের বাঙালীরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। জয় বাংলা।

সংগীতঃ জয়, জয়, বাংলার জয়... ...।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরণপণ সংগ্রাম চলেছে। বাংলার বীর সৈনিক, ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী এবং এদেশের প্রতিটি ছাত্র, কৃষক, জনতা, হানাদার পশ্চিমা গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ সাফল্যের সাথে প্রতিহত করে চলেছে। এবং বাংলার বীর সৈনিকদের আক্রমণে দিশেহারা পশ্চিমা বাহিনী পিছু হটে চলেছে এবং মর্টার, কামান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা করে চলেছে। পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন প্রতিটি আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে গতকাল রাত্রে হাসপাতালে পর্যন্ত বোমাবর্ষণ করেছে- বাংলার সাত কোটি মুক্তিপাগল মানুষের উপর যেভাবে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে চলেছে, তার প্রতিরোধে বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তাই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন বাংলার মুক্তিপাগল জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। আপনাদের অবগতির জন্য আমরা আরও জানাচ্ছি যে, পশ্চিমা হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল টিক্কা খান- যাকে বাংলার বীর জনতা গর্ভনর হিসাবে মেনে নিতে .... (অস্পষ্ট) অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সেই কুখ্যাত টিক্কা খানকে বাংলার বীর

স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম সম্প্রচার কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচারের পর হানাদার বাহিনীর বিমান আক্রমণে কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় এবং চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চল থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার শুরু হয়। পরবর্তীতে ২৫ মে থেকে মুজিব নগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বেতার সম্প্রচার পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়।

* বন্ধনীযুক্ত অংশের টেপ অস্পষ্ট ও বাংলা ভাষণের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সৈনিকেরা হত্যা করেছে। বাংলার বীর জনতা প্রতিটি অলিতে-গলিতে অস্ত্র হাতে শত্রুদের মোকাবিলা করে চলেছে। বিশ্ববাসী, আপনারা আসুন, বাংলার মানুষকে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আমরা জানি, ইনশাল্লাহ্ জয় আমাদেরই হবেই। জয় বাংলা।

আপনারা বাংলার প্রতিটি জনসাধারণকে জানিয়ে দিন যেন শত্রুর মোকাবিলায় তারা সর্বাত্মক সাহায্য করেন। বাংলার বীর সৈনিকেরা যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে চলেছে, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনারা কেউ শহর থেকে যাবেন না। যে যেরূপ ভাবেই পারেন বাংলার মুক্তিপাগল মানুষকে সাহায্য করুন। ...... আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে খাদ্য ও যেসব সামগ্রী সংগ্রহ করা আছে, আপনারা যদি পারেন, সেখানে খাদ্য ও সামগ্রী জমা দিন।

সঙ্গীতঃ ... ...

ঘুম পাড়ানো তোতা পাখী লও বিদায়, লও বিদায়।

... ...

I Major Zia of Bengal Liberation Army. This is Major Zia, the Leader of Bengal Liberation Army, speaking on the support of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’s liberation movement.

The Pakistan Army consisting mainly of Punjabi are killing the Bengalee civilians of all ages, and they acted in most ruthless manner. They have not spared the unarmed Bengalees - those are chiefly unarmed Bengalee officers and men of the army, navy and air force, some of whose families have not been killed]* the massacre started on the night of last Thursday when they attacked and started killing the unarmed soldiers, navy, airmen and civilian population all over Swadhin Bangladesh. they have been using American Russia and Chinese armaments including artillery gun and tank including Russian tank which is presented, which was so generously given by the Indonesian during the last 1965 war, All these acts uncivilized and cruel, They had a very well conceived plan of killing the senior political, civil, military leaders of Bengal. The need of the hour is that the important personalities of Bangladesh should go underground and work from there. Voice of America has announced that Beluchistan and Pakhtunistan with North-West Frontier Province has seceded from Pakistan to support the cause of Swadhin Bangladesh. At this moment, we have to fight united. By the grace of God, we will capture all Punjabi traitors in a matter of one or two days and free Bangladesh of these menaces. Joi Bangla.

This is- you are listening the taped broadcast by Major Zia of Bengal-Bengal Liberation Army leader. The broadcast coming to you from Free Radio Bengal.

আপনারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। এবার আপনাদের মুক্তি-বাঙালী মুক্তিসেনা বাহিনীর নায়ক মেজর জিয়া আপনাদেরকে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন।

আমি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত স্বাধীন বাংলা প্রসংগে বলছি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানত ....* পাঞ্জাবী সৈন্যরা বাংলার বেসামরিক মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তারা অফিসার এবং নিরস্ত্র সৈন্যদের হত্যা করেছে। এমন কি তাদের পরিবারদেরকেও রেহাই দেয়নি। তাদের এরকম হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার থেকে। সেদিন থেকে তারা বাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে এবং সমস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের উপর জুলুম চালাতে থাকে। তারা আর্টিলারী কামান, আমেরিকান, রাশিয়ান ও চীনা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এছাড়াও তাদের জুলুমের ভয়াবহ সামগ্রীগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক, যেটি তাদেরকে গত উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের তথাকথিত যুদ্ধে মহান দেশ ইন্দোনেশিয়া আমাদেরকে দিয়েছিলো। দুশমনদের এ সমস্ত কাজ যেমন বর্বরোচিত তেমনি জঘন্য। এই সমস্ত বর্বর হানাদারদের এখন সুপরিকল্পিত মতলব হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান রাজনীতিক নেতাদের, বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনাদের হত্যা করা। এই চরম মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদিগকে আণ্ডারগ্রাউন্ড বা গোপন কাজে চলে যেতে হবে এবং সেখান থেকে দুর্বার আক্রমণ গড়ে তুলতে হবে। কিছুক্ষণ আগে ভয়েস অব আমেরিকা বেতারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ন্যায় আন্দোলনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করে বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনিস্তান তথাকথিত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই সময় আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে মহান সংগ্রাম গড়ে তোলা। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করবো। এই পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের বিধবস্ত করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র একদিন কিংবা দুইদিন। এবং এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে আমরা শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবো। জয় বাংলা।

This is.... This is Lt. Shamsher of Bengal Liberation Army- I hereby pass a message from Major Ziaur Rahman of the Bengal Liberation Army. He says it is reported that more Pakistani Punjabi Force and armament have been brought to Chittagong and Dacca by the sea and by air- I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace-loving country of the world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh...Under the circumstances I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidance of Sheikh Mujib. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement with increased vigor and intent devotion. By the grace of God the victory is ours- Joi Bangla.

Here is an announcement: All civilians of Chittagong are requested to collect at Laldighi Maidan with whatever weapons they have and report to Captain Bhuiya and Captain Naser of the Bengal Liberation Army.

চট্টগ্রামে অবস্থানরত সমস্ত নাগরিকদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে যে, তারা দুপুর বারোটার মধ্যে লালদিঘীর ময়দানে তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাপটেন ভূইয়া এবং ক্যাপটেন নাসের .... (অস্পষ্ট) হাজির হন। তিনারা দুপুর বারোটা পর্যন্ত আপনাদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করবেন। দুপুর বারোটার মধ্যে আপনারা সবাই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদিঘীর ময়দানে হাজির হয়ে যান। সেখানে ক্যাপটেন ভূইয়া ও ক্যাপটেন নাসের আপনাদেরকে আদেশ ও নির্দেশ দেবেন। অস্ত্রশস্ত্র পারতপক্ষে লুকিয়ে আনবেন-সাধারণ নাগরিক যাতে তা না দেখেন। আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে আনবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া লালদিঘীর ময়দানে যাবেন না। যাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে শুধু তারাই লালদিঘীর ময়দানে যেয়ে হাজির হবেন। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া কেউ ওখানে যাবেন না।

---

*এই অংশে টেপ অস্পষ্ট

আর একটি বিশেষ ঘোষণাঃ কুমিরায় অবস্থানরত স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর সংগে ক্যাপটেন ভূইয়া-ক্যাপটেন ভূইয়া দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর সংগে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের তিনশত সিপাই নিহত হয়েছে। তারা এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। কোন বেসামরিক নাগরিক তাদেরকে সাহায্য করবে না। পাঞ্জাবী কোন সৈনিককে বেসামরিক নাগরিক সাহায্য করবেন না। এখানেও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর জয় হয়েছে। জয় বাংলা।

.....স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলার বাসিন্দাদের উদ্দেশে আমাদের আবেদন, আপনারা কোন অবস্থাতেই বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাদের উৎসাহ ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখুন। শান্তি ও শৃংখলার সাথে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের নাগরিক বাংলার মুক্তিবাহিনীর কাজে সহায়তা করুন। আমাদের মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতায় সমগ্র এলাকা মুখর। আমাদের ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানপাট চালু করেছেন যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সুলভে পাওয়া যায়। ঔষধপত্রের দোকানগুলো খোলা হচ্ছে। আপনারা যদি পরাজিত শত্রুবাহিনীর কোন বর্বর সৈন্যকে বিক্ষিপ্তভাবে কোন স্থানে যেকোন বেশে চলাচল করতে দেখেন তাকে উচিত সাজা দিন। তাদের সাথে কথা বলে তাদের ভাষা পরীক্ষা করবেন। তারা আমাদের বাঙালী সামরিক বিভাগের জোয়ানদের ওপর জুলুম করেছে। তাদের ক্ষমা নেই। ক্ষমা নেই। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! নেবো! নেবো! আমাদের মুক্তিবাহিনী, কুমিরায় তিনশত বেঈমান পাঞ্জাবী জোয়ান যখন পালাচ্ছিল, ক্যাপটেন ভূইয়ার নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। জয় বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা।

দুশমনরা আমাদের মুক্তিবাহিনীর পোশাক পরে চোরের মত স্বাধীন বাংলাদেশ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বাংলাদেশের নাগরিকরা সজাগ দৃষ্টি রাখুন এই হানাদারদের ওপর। এদের যেখানেই পান, সাথে সাথে এদের ধরে উপযুক্ত শাস্তি দিন। এদের চেনার প্রথম উপায় হচ্ছে- যেখানে দেখেন বেশ দূরত্বে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এদের সাথে কথা বলবেন, সামনে যাবেন না প্রথমে। সন্দেহজনক লোক দেখলে বেশ দূরত্ব থেকে কথা বলে এদের পরিচয় জেনে তারপরে যদি সন্তুষ্ট হন, ছেড়ে দেবেন। নয়তো হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করুন।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত খবর শুনুন

স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, স্বাধীন বাংলার গ্রাম ও শহরের কোন ব্যক্তি যেন কোন প্রকার গুজবে কান না দেন বা কোন গুজবে বিভ্রান্ত না হন। কেননা, শত্রুসৈন্যরা ছদ্মবেশে শহরে ছড়িয়ে পড়ে এসব গুজব ছড়াতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থা স্বাধীন বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর হানাদার পাঞ্জাবীদের অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন। গত পাঁচদিন ধরে শত্রুসৈন্যরা পানি, খাদ্য, বিদ্যুৎবঞ্চিত হয়ে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তাদেরকে ভাতে পানিতে মারাই হচ্ছে উপযুক্ত প্রতিশোধ। এই উচিত সাজাই হবে তাদের প্রাপ্য। আসাম বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত এহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর প্রচারের বহু পরে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেছে। আমি আবার বলছি, আসাম বেতার কেন্দ্রের খবরে প্রকাশ, কুখ্যাত এহিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর প্রচারের বহু পরে বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ শোনা গেছে। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বিপ্লবী পরিকল্পনা কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। মুক্তিবাহিনী প্রধান

নির্দেশ দিয়েছেন- বেসামরিক লোক, যাঁরা অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানেন না, তাঁদের হাতে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আছে, তা প্রত্যেক জেলার ই-পি-আর বাহিনীর হাতে অবিলম্বে জমা দিতে হবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাখতুনিস্তানে অবস্থানকারী সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক বাঙালী লোকজন সম্প্রতি আশংকার কোন কারণ নেই বলে আসাম বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

মুক্তিবাহিনী প্রধানের খবরে প্রকাশ,নিহত টিক্কা খানের চারজন সহকারীও নিহত হয়েছে। এ খবর আপনারা শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার শরন সিং পূর্ববাংলার উপর পশ্চিমাদের সামরিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে কোন আবেগ প্রকাশ না করার অর্থ এই নয় যে, ভারতবাসীদের মনে বাঙালীদের প্রতি সহানুভূতি ও আবেগের অভাব রয়েছে এবং এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার অর্থই হচ্ছে তারা আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল। মিসেস গান্ধী স্বাধী বাংলার মুক্তিকামী জনতার ওপর পাঞ্জাবী দস্যুদের ট্যাঙ্ক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভয়েস অব আমেরিকার খবরে প্রকাশ, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশের সমস্ত সরকারী-বেসরকারী অফিস, আদালত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এই সম্পর্কিত তথাকথিত পাকিস্তান রেডিওর খবর সর্বৈর মিথ্যা।

খবর শুনলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের পরবর্তী ঘোষণার জন্য একটু অপেক্ষা করুন।

বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোন প্রাইভেট গাড়ীর জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন।

আমি আবার বলছি, বাংলাদেশের সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি এক নির্দেশে স্বাধীন বাংলার মুক্তিবাহিনী প্রধান ঘোষণা করেছেন, সামরিক বাহিনীর অনুমোদিত পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ যেন কোন প্রাইভেট গাড়ীর জন্য পেট্রোল বিক্রি না করেন। এই সংগে অন্যান্য নির্দেশ হচ্ছে, রাত্রে কেউ বাতি জ্বালাবেন না। কোন ঘরের আলো যেন আকাশ থেকে দেখা না যায়। সারা বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রদীপ থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রত্যেকটি গাড়ী চেক করবেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিমানবন্দরের রানওয়ে যে-কোন ত্যাগের বিনিময়ে বিমান নামার পক্ষে অনুপযোগী করে তুলুন। রাত্রে কোন বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক কোন গোলাগুলির আওয়াজ করবেন না। কোন অবস্থাতেই কোন সক্ষম ব্যক্তি শহর ছেড়ে গ্রামে যাবেন না। ঘোষণাটি আবার পড়ছি … …

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ ঘোষণা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রর অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘোষণাঃ

এখন থেকে আমরা প্রতিদিন নিয়মিত তিনটি অধিবেশন আমাদের সংগ্রামী জনতার উদ্দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি অধিবেশন আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। প্রতিদিন সকাল ন'টায় আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করা হবে, বেলা একটায় দ্বিতীয় অধিবেশন ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু করা হবে। আবার বলছি … … …

প্রত্যেক অধিবেশনে আপনারা খবর, দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া, সংগীত ইত্যাদি শুনতে পাবেন। মাঝে মাঝে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর মেজর জিয়ার নির্দেশ শুনতে পাবেন। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ান এবং বেসামরিক ব্যক্তিবিশেষের সংগে সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিশেষ ঘোষণা ও খবর প্রচার শেষ হলো। জয় বাংলা।

Bangladesh Liberation Army- I will now read out an appeal made by Major Ziaur Rahman of the Bangladesh Liberation Army. It says- it is reported that more Pakistani Punjabi troops and armaments have been brought to Chittagong and Dacca by Sea route and by air- I therefore on behalf of the people of Bangladesh request all the peace-loving countries of world to give immediate recognition to Swadhin Bangladesh and extend physical assistance of all types to liberate the democratic minded people of Bangladesh. Under circumstances however I hereby declare myself as a Provisional Head of the Swadhin Bangla Liberation Government under guidance of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I urge upon the people of Bangladesh to continue this freedom movement. I will repeat.......

সমস্ত পেট্রোল পাম্পের মালিকদের প্রতি-যারা গাড়ী চালানো জানেন, তারা অবিলম্বে রেস্ট হাউজে আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হোন।

.... (নারীকণ্ঠ)- বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলার সব পুরুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এদের সাহস ও উৎসাহ যোগাতে হবে আমাদের। নিজ নিজ ঘরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাড়িতে পুরুষদের উজ্জীবিত করে প্রমাণ করুন- এ সংগ্রাম শুধু বাংলার পুরুষদের নয়, মা-বোনেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনারা প্রমাণ করুন প্রতিটি বাঙালী ললনা বীর নওজোয়ানদের মা-বোন,বীরাঙ্গনা। আপনারা বর্গীর হাংগামার সময় যেভাবে হানাদার বর্গীদের বিরুদ্ধে তেজের সংগে রুখে দাঁড়িয়েছেন, রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন, তা এখন বৃথা যেতে দেবেন না। আপনারা সবক্ষেত্রে প্রাণপণ সাহায্য করুন। প্রতিটি ঘরে দুর্গ তৈরী হয়েছেন, আজ দেশদ্রোহী পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আপনাদের সন্তানদের প্রেরণা দিন, সাহস দিন, তাদেরকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়তে দিন। আপনাদের কোন ভয় নেই। আমাদের স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় সারা বাংলাদেশ এখন আমাদের হাতে আমাদেরই আছে, আমাদের কাছে। আপনারা এদেশ রক্ষা করুন, আপনারাও রক্ষার কাজে পার্টিসিপেট করুন, অংশগ্রহণ করুন- অংশ নিন। আপনারা মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের সব রকমের সহায়তা করুন। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। জয় ন্যায়ের ও বিনাশ অন্যায়ের হবেই হবে, এ আমাদের মনে রাখতেই হবে। জয় বাংলা। ... ...

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার এখনকার মত এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আমরা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবো সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন।

স্বাধীন বাংলার ভাই-বোনেরা, আসসালামু আলায়কুম-

মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সারা বাংলাদেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার জনসম্পদ লুণ্ঠন করার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে এখনও শোষণ অব্যাহত রাখতে চায় ওরা। তাই তার সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্যভাবে প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাসের আর দ্বিতীয় নজীর নেই। আজ সারাদেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বিপ্লবী জনসাধারণ*........ হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার তস্করের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় এ শত্রুবাহিনী তাদের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই-পি-আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলায় প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ মুক্তিপাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার নিকট আহ্বান জানাই-শত্রুসেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতয়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধা মত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছড়িয়ে দিন, হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যান্টনমেন্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন। বন্ধুগণ!..........

আজকে আমরা দেখতে পাই, নিরপরাধ নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর যেভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, দেখামাত্র গুলি করছে, হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে তার নজির এ বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাবো, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাবো, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ করে থাকবেন না। আসুন বিশ্ববাসী, সাড়ে সাত কোটি এই পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের বাঁচানোর জন্য আপনারা আমাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই- আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন। হে বিশ্বের অধিবাসী তোমরা দেখ, কিভাবে পশ্চিমা এই গণবিরোধী শক্তি,এই শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ পশ্চিম- এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালেরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে কিভাবে তাদের নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না, আসুন আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করুন। বন্ধুগণ, আমি সারা বাংলার স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান জানাবো, বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদেরকে শরিক করুন এবং হানাদার দুশমনদের খতম করুন। যেখানে যে যে অবস্থায় আছেন, যার হাতে যে অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্র তুলে নিন। মা-বোন বাপ-ভায়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বার হন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে শত্রুসেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন। আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে- এদিন আর সুদূরপরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাবো, এই দেশ এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হবে- অন্য কোন কারও নির্দেশ বাঙালীরা কোন দিন বরদাশত করবে না এবং কোন মার্শাল ল’ বাঙালীরা মানে না। আমি আহ্বান জানাবো- বাংলার প্রতিটি নরনারী সকলের কাছে-আপনারা মার্শাল ল’ মানবেন

টেপ অস্পষ্ট

না, মার্শাল ল'র আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক। স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলা-জয়।

....অনুষ্ঠান শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার তেকে। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলা খবর।

স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার থেকে খবর বলছি। আমাদের বিপ্লবী গণবাহিনী শত্রুর দুর্ধর্ষ আক্রমণকে প্রতিহত করে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সামরিক ঘাঁটিতে এখন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। সামরিক বিধি-বিধান, ভয়-ভীতি সবকিছুকে তুচ্ছ করে আমাদের বিপ্লবী বাঙালী সৈন্যবাহিনী শত্রুদের হটিয়ে চলছে। বাংলাদেশের মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে বাংলার মাটি আজ দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম এবং আরও কয়েকটি জেলায় সামরিক ঘাঁটি আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে এসে গেছে। দুনিয়ার সমস্ত মানবতার সহায়তা আমরা পাচ্ছি। খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে। আমাদের বীর সেনানীরা বিপুল বিক্রমে দুশমন সৈন্যকে প্রতিহত করে চলছে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মুক্তির আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি থানার পুলিশ বাহিনী আমাদের সাথে লড়ছেন। ই-পি-আর বাহিনী, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাংলার বীর স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী, বাংলার মা-বোনেরা, বাংলার যুবক সম্প্রদায় প্রত্যেকে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে আছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আজকের মত খবর এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের মত এখানেই শেষ হলো। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।

শত্রুবাহিনী উপায়ন্তর না দেখে ট্যাঙ্ক ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে, আঘাত হানার চেষ্টা করছে। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বাঙালীদের আয়ত্তে। (একজনের হাততালি ও বাহবা) কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামে পৌঁছে গেছে। এদেশের অন্যান্য সকল স্থান বাঙালীদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে এসে গেছে। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। এখন খবর পড়ছি-

বাংলাদেশের পথে পথে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ জনতার সাহায্য নিয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ করে চলেছে। ঢাকার সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান হানাদার সেনাবাহিনীর কর্মাধ্যক্ষ টিক্কা খান দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে হানাদার সৈন্যদের মুখপত্র পানিস্তান রেডিও থেকে যে খবর পৌঁছেছে যে শেখ মুজিব ধৃত হয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। টিক্কা খান তার দলবলসহ নিহত হয়েছেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বাঙালীদের আয়ত্তাধীন। কুমিল্লা থেকে একদল সৈন্য চট্টগ্রামের পথে পালাবার সময় বাংলার বিপ্লবী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনী তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে ও তারা এখন তাদের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে বিভিন্ন অবস্থায় পালিয়ে রয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু এক নির্দেশ জারি করেছেন যে পলায়িত সৈন্যরা যাতে কোনক্রমেই রেহাই না পেতে পারে। চট্টগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বাঙালী সৈন্যদের আয়ত্তাধীন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য বিভিন্ন অবস্থানে লুকিয়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের বীর জনতা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ তাদের ধ্বংস করে দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। গতকাল চট্টগ্রামের বিভিন্ন অবস্থান থেকে হানাদার বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় এবং এতে করে

হানাদার বাহিনীর বেশ কয়েকটা ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যশোর, রংপুর সিলেট এসব শহরেও এখন পর্যন্ত প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে এবং হানাদার সৈন্যদের এখন মূল লক্ষ্যস্থল হলো বেতার কেন্দ্রগুলো। তারা বেতার কেন্দ্রগুলো দখল করে সেখান থেকে ভুয়া প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে। কিন্তু বাংলার বীর জনতা তাতে মোটেই বিভ্রান্ত না হয়ে তাদের যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছেন। ঢাকার পথে পথে এখন মুক্তিসেনা এবং বেংগল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর ও পুলিশদের সাথে হানাদার সৈন্যদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, টিক্কা খান তার দলবল সহ নিহত হয়েছেন। সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যের নির্দেশ অমান্য করে জনসাধারণ স্বাধীন বাংলার পাহারাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশক্রমে চলছেন এবং তারা বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত প্রত্যেকটি নির্দেশকে হুবহু মেনে চলছেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘের কাছে এক আহবানে বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে তাই জাতিসংঘের এখন উচিত বিদেশী সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে হটানোর ব্যাপারে বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে সহযোগিতা করা। আপনারা এ খবর শুনছেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে।

টিক্কা খান সদলবলে নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তার নির্দেশ জারি করে চলেছেন। তার সর্বশেষ নির্দেশ হলো যে, আপনারা জনসাধারণ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই পশ্চিমা সেনাবাহিনীর অবস্থান নির্দেশ করুন। এবং পশ্চিমা সেনাবাহিনী কোথায় আছে সেটা জেনে তাদের ধ্বংসকাজে লিপ্ত থাকুন। ই-পি-আর, বেংগল রেজিমেন্ট ও পুলিশ বাহিনীকে খাদ্য-পানীয় দিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন। যার ঘরে যা আছে, বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার, প্রয়োজনবোধে সেটা ই-পি-আর অথবা বেংগল রেজিমেন্টের হাতে তুলে দিন আর আপনারা যারা চালানো জানেন তারাও তৈরী হয়ে থাকুন এবং যেখানে পশ্চিমা সেনাবাহিনী দেখবেন তাদের উপর আক্রমণ করুন। তবে একটি জিনিস মনে রাখবেন যে, কোথাও বাংগালী বা অন্য কেথাও কোন সৈন্য দেখা গেলে তার প্রতি গুলি করবেন না এবং এসব করার আগে ই-পি-আর, বেংগল রেজিমেন্ট অথবা পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করুন। গত রাত্রেও সারা বাংলাদেশের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলেছে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী বীর জনতা পশ্চিমা হানাদার সৈন্যদের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিদেশের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশ আক্রমণ করে এটাকে দখল করে নিতে চাইছে। তাই প্রত্যেকটি দেশের উচিত এ অবস্থায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা ও সাহায্য করা এবং পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে করে তারা অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর এক নির্দেশে এ কথাও জানিয়েছেন যে .... পাকিস্তানী সৈন্য যারা যেখানে আছেন তারা যদি আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে। অন্যথায় বাংলার মাটি থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এবং যাতে করে তারা বাংলাদেশ থেকে পালাতে না পারে তারও সম্পূর্ণ নির্দেশ তিনি জারি করেছেন। জয় বাংলা। বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে খবর প্রচার আপাতত এখানে শেষ হলো।

Here is an announcement from Radio Free Bangladesh. Our leader Sheikh Mujibur Rahman had declared the independence of Bangladesh. Now Bangladesh is an independent and sovereign state. After the declaration of independence, the Pakistani anti people forces have become mad like dog and are out to massacre our people, thus creating a reign of terror in Bangladesh. But the gallant forces of Bangladesh under the guidance of Sheikh Mujibur Rahman are fighting them out of the homeland of ours. East Bengal Regiment, East Pakistan Rifles and Police forces with all the efforts and help of the people of Bangladesh, are restricting them, sticking hard on them throughout the whole Bangladesh. Chittagong is completely under the control of Bangla Regiment as well as other sectors such as Comilla, Rajshahi, Sylhet, Jessore, Rangpur. In Dacca, heavy fighting is going on and our gallant forces are marching towards victory. We appeal to

the people residing in towns and cities not to leave their places and to prepare themselves with whatever they have and create barricades at every road-corner by which enemy may travel. Do not allow them to move an inch forward without resistance. All the people in the villages those who have fire arms of any kind are requested to proceed to the town and cities. People of all walks of life are specially requested to extend their help specially by giving food to our gallant fighting forces.

Now, this is an appeal on behalf of Free Bangladesh to the people of peace-loving countries throughout the world specially our neighboring countries to help with whatever they can so that we can become masters of our own destiny. We also appeal to the big powers to intervene and see that seventy five million people of Bangladesh can become free from injustice, hardship, deprivation from legal right and oppression and torture by forces of Pakistani aggression. We also appeal to the United Nations to immediately.....(Noise)........

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও অনুষ্ঠান	১। 'বেতার বাংলা' ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ ২ ও ৩। 'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	২৬ ও ২৮ মার্চ এবং ২১ এপ্রিল, ১৯৭১

১.

২৬ শে মার্চের অনুষ্ঠান থেকে
আবদুস সালাম

"নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লীআলা রাসুলিহীল কারিম"

আসসালামু আলায়কুম,

প্রিয় বাংলার বীর জননীর বিপ্লবী সন্তানেরা। স্বাধীনতাহীন জীবনকে ইসলাম ধিক্কার দিয়েছে। আমরা আজ শোষক প্রভুত্বলোভীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। এ গৌরবোজ্জ্বল স্বাধিকার আদায়ের যুদ্ধে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির মুক্তিযুদ্ধে মরণকে বরণ করে যে জানমাল কোরবানী দিচ্ছি, কোরআনে করিমের ঘোষণা-তারা মৃত নহে, অমর।

দেশবাসী ভাইবোনেরা, আজ আমরা বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি।

আল্লার ফজল করমে বাংলার আপামর নরনারী আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন। আর সবখানে আমাদের কর্তৃত্ব চলছে। আমরা যারা সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি- তাঁদের আপনারা সকল প্রকার সহযোগিতা দিন। এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সহাযতা দিন। স্মরণ রাখবেন দুশমনরা মরণকামড় দিয়েছে। তাদের এ সোনার বাংলাকে সহজে তাদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে না। কোন অবাঙালী সৈনিকের কাজেই সাহায্য করবেন না।

মরণ তো মানুষের একবার। বীর বাংলার বীর সন্তানেরা শৃগাল-কুকুরের মতো মরতে জানে না। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী।

কোন গুজবে কান দেবেন না। খালি হাতে কয়েকজন মিলে কোন পশ্চিমা মিলিটারীর মোকাবেলা করবেন না। ওরা আমাদের দেশে এসে আমাদের খেয়েই শক্তি যুগিয়ে আমাদের নির্বিচারে হত্যা করবে- তা হতে পারে না। দশজনে হলেও একজনকে খতম করুন। সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল, বাজি প্রস্তুতকারীরা মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানায়ে ওদের প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলী বাতির বাল্বে এসিড ভরে তাও নিক্ষেপ করুন। একেবারে খালি হাতে থাকবেন না। মরবেন তো মেরেই ইতিহাস সৃষ্টি করুন।

"নাছরুম মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব" । আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী।।

২.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম কথিকা

বেলাল মোহাম্মদ

কবির ভাষায়ঃ

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃংখল বলো কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।’

দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী। স্বাধীনতাবঞ্চিত জীবন থেকে তারা স্বাধীন জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার পথ দুর্গম, দুর্বার। এই যাত্রাপথে কোনো শাসক-শোষকের দমননীতি, কোনো অশুভ শক্তির বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জীবনজয়ের অভিযাত্রীদের কে বাধা দেবে? কে এই অভিযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে? সেই সাধ্য কারুর নেই, সেই দুঃসাহস দেখাবার সকল ‘পশ্চিম পাকিস্তানী দাপট’ আজ ছিন্ন-ভিন্ন, পর্যুদস্ত।

ভাবতে অবাক লাগে, তেইশ-তেইশটি বছর কিভাবে সেই তথাকথিত পাকিস্তান সরকার বাংলার মা-বোন, বাংলার শিশুবৃদ্ধ, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতী কামার-কুমার-মেহনতি মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছে। আমার সন্তানের দুধ ওরা কেড়ে খেয়েছে, আমাদের ক্ষেতের ফসল ওরা লুটে নিয়েছে, ওরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তথাকথিত সংহতির ধুয়া তুলে ওরা আমাদের নিরীহ জনপদের ওপর শাসনের নামে চালিয়ে গেছে শোষণ।

বাংলার মানুষকে ওরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অবহেলা দিয়ে দিয়ে নিজেদের জাতিগত দুশ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছে।

আজকের স্বাধীন বাংলার পথে-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় বীর জনতার গড়া স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানী গুপ্তচর, বর্বর সৈন্যদের প্রত্যেক প্রবেশপথ আজ রুদ্ধ। ওদেরকে যেখানেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠছে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে বুলেট- আজ ধরাশায়ী হচ্ছে এক-একটি হানাদার দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই- ক্ষমা নেই।

স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের মা-বোনেরাও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। দুশমনকে উচিত সাজা দেবার জন্যে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই সদা প্রস্তুত।

বাঙালী আজ জেগেছে। দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তারা-

‘এবার বন্দী বুঝেছে,
মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে
উঠিতেছে এক তান;

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান।'
জয় স্বাধীন বাংলা।

প্রচারঃ ২৮-৩-৭১

৩.

সাম্প্রদায়িকতাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গ *

মোস্তফা আনোয়ার

সামন্তবাদ সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়। বাংলাদেশেও একদিন ছিলো সামন্ততন্ত্র। ছিলো জমিদারের শাসন ও শোষণ। এই জমিদারদের ছিল দুর্দান্ত প্রতাপ। পরগাছার মত এই জমিদার-শ্রেণী বেঁচে ছিল লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই জমিদাররা নিজেরাই এক জাতি-নিজেরাই একটা শ্রেণী। এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এরা রক্তপায়ী এক জীব। এরা দরিদ্র মুসলমান কৃষককে শোষণ করেছে-নিরন্ন হিন্দু কৃষককেও ক্ষমা করেনি। এদের রক্তলোলুপ থাবা থেকে কেউ-ই রেহাই পায়নি। সম্পর্কটি ছিলো জমিদার ও কৃষকের মধ্যে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক- হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নয়। হিন্দু জমিদারের মধ্যে যেটা কাজ করেছে সেটা শ্রেণীস্বার্থ-জমিদাররূপে অত্যাচারিত কৃষকের রক্ত-পানের উদগ্র নেশা।

হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের অত্যাচারের এটাই বাস্তব চিত্র। শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের এটাই আসল চেহারা। রাশিয়ায় বা আমেরিকায় এই সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের কাহিনী রক্তলেখায় লেখা আছে ইতহাসে ও সাহিত্যে।

(বিশ্বের প্রতিটি দেশে সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে এই জমিদার শোষকগোষ্ঠী দ্বারা। কিন্তু এই অমানিশারও শেষ আছে। মানুষের মুক্তির সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারিত মানুষ জেগেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে দৈত্যপুরীর রাজকন্যার। অবশেষে কবর রচিত হয়েছে সামন্ততন্ত্রের। অত্যাচার আর নিপীড়নের হয়েছে অবসান। শোষণহীণ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করেছে সংগ্রামী মানুষ।)

আমরা আগেই বলেছি, সামন্তবাদ বা জমিদারতন্ত্র সভ্যতার ইতিহাসে একটি মৃত অধ্যায়-যাদুঘরের সামগ্রী। যে জমিদার অত্যাচার করেছিলো, সে জমিদার শেষ হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই রক্তাপায়ী জোঁক শ্রেণী। ব্যাপারটি হচ্ছে শ্রেণী-সংঘর্ষের- হিন্দ-মুসলমানের নয়। বরং সর্বহারা কৃষকের জয় ঘোষিত হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকের দুঃখের অবসান হয়েছিল। বাংলার কৃষকের চোখে নেমেছিলো নতুন ফসলের আশা। বাংলার কৃষক দুর্ভিক্ষ দেখেছে। দেখেছে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ তাণ্ডবলীলা, দেখেছে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণির বিধ্বংসকে। তবু সে বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছে প্রতিবার। পদ্মাপারের মানুষ ধ্বংসকে ভয় করে না, তার হাতে আছে দুর্জয় সৃষ্টির মন্ত্র।

কিন্তু এতবড় দুর্যোগ কি কেউ কোনোদিনও দেখেছে? নিজের দেশে, নিজের ঘামঝরানো পয়সায় কেনা গুলি এসে বিঁধে নিজেরই বুকে। কারা চালালো গুলি? হিন্দু জমিদার-নাকি সেই দস্যু বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার?

* চট্টগ্রাম সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থাপিত বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

কারা পুড়িয়ে দিলো কৃষকের সাজানো সবুজ ক্ষেতকে- কারা কামান ও গোলায় গুঁড়িয়ে দিলো কৃষকের কুটির- কারা কেড়ে নিলো নবান্নের উৎসব- কারা, কারা, তারা কারা?

ইতিহাসের কবর থেকে উঠিয়ে আনা হচ্ছে জমিদারকে। জমিদার তো অত্যাচার করেই ছিল আর তার শাস্তিও পেয়েছে গণ-মানুষের হাতে। কিন্তু তোমাদের শাস্তির দিনও যে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে- তা কি জানো?

তোমরা কি ভেবেছ জমিদার ও কৃষকের শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাসটি মুছে দিয়ে আজকের জাগ্রত শ্রেণী-সচেতন মানুষকে সাম্প্রদায়িতার ভাঁওতায় ভোলাতে পারবে? ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করে দাঙ্গাবাজ রাজনীতি এদেশের মাটিতে আজ অচল।

আজ প্রতিটি বাঙালী জানে, এ যুদ্ধ তার বাঁচার জন্য। এ যুদ্ধ তার চিরদাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধকে তাই ইতিহাসের কবরে পচে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষে ঘুলিয়ে দেওয়া যাবে না।

তথাকথিত পাকিস্তান আর নেই। পাকিস্তানের নিশান আমরা পুড়িয়ে ভস্মীভূত করেছি। আমরা উড়িয়েছি আমাদের বুকের রক্তে রাঙানো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। রক্তে আমাদের স্বাধীনতার আগুন গদগদ করছে। চোখে আমাদের প্রতিশোধের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুখে আমাদের স্বাধীনতার বাণী চৌচির করে ফেটে পড়েছে শত-কোটি কণ্ঠে।

এই মহান বিপ্লবকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা তাই উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওদের রসদ কই? হ্যাঁ, আছে বস্তাপচা রাজনীতি- হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-বাধানোর অপচেষ্টা। বুকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতিটাকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন-ষড়যন্ত্রে মেতে, অখণ্ডতার প্রলেপ মাখানো আর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ভূত দেখানোতে।

এক কথায়, দাঙ্গাবাজি, লুটতরাজ, নারী-হরণ প্রভৃতি অসামাজিক পৈশাচিক নারকীয় পশুত্বের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় ওরা লক্ষ শহীদের রক্তভেজা বাংলার মাটিতে। যে জাতি সূর্যতেজে জেগে উঠেছে সে কি অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে দাসত্বের জন্য হার মানে? অদ্ভুত ওদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। অদ্ভুত ওদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। অদ্ভুত ওদের বেপরোয়া গণ-হত্যার নজির।

দাঙ্গাবাজি কলা-কৌশল আর চলচে না। লাঞ্ছিত নিপীড়িত দরিদ্র বাঙালী গণ-মানুষ ওদের কলঙ্কিত রাজনীতির মুখোশ উন্মোচিত করেছে। ওদের নগ্ন আসল রূপটি অতি দুর্ভাগ্যের রাত্রে আমরা দেখে ফেলেছি। পশুও বুঝি এত নগ্ন নয়- এত বিশ্রী, এত কুৎসিৎ, এত বীভৎস নয়।

ওরা মানুষ হত্যা করেছে- আসুন আমরা পশু হত্যা করি।

জয় বাংলা।

প্রচারঃ ২১-৪-৭১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (মুজিব নগর) এর অনুষ্ঠানপত্র গুচ্ছ (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	২৫ মে-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আজ মঙ্গলবার, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮
২৫ মে ১৯৭১ সাল

(Signature Tune)

7-00A.M আসসালামো আলায়কুম।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।
বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি।
অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ….
মিটারে…. কিঃ সাঃ এ।

7-10 ’’ অধিবেশনের প্রথমে শুনুন তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি ঘোষণা। আজ থেকে সকাল ৭টা ও সন্ধ্যে ৭টায় দুটি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠানঃ
* বাঙলা খবর প্রচারিত হবে সকাল সোয়া সাতটায়।
* ইংরেজী খবর শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে।
* ‘চরমপত্র’ শুনতে পাবেন সকাল ৭টা বেজে ……মিনিটে।
* বঙ্গবন্ধুর বাণী থেকে পাঠ শুনতে পাবেন সকাল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে।
* জাগরণীঃ দেশাত্মবোধক গান শুনবেন সকাল পৌনে আটটায়।

আজকের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান সূচী শুনলেন।
আপনারা এ অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছেন স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র থেকে … মিটারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর শুনতে পাবেন-প্রথমে বাংলা পরে ইংরেজীতে।

7-15A.M (News in Bengali)

7-25 ’’ (News in English)

7-30 ’’ সকাল সাড়ে সাতটা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আজ এগারই জ্যৈষ্ঠ। বিদ্রোহী কবি নিপীড়িত জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এ উপলক্ষে এখন কবি রচিত কবিতা থেকে আবৃত্তি ও গান শুনুন অগ্নিশিখা অনুষ্ঠানে।

7-40 ’’ Slogans & Sayings of SK. Mujib.

SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA
(Cue Sheet)

Trans-I

Date : 26-5-71

6-57 P.M. Signature Tune

6-59 ’’ Opening of the station & Programme Summary.

7-00 ’’ AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.
(a)Message from

	(b) ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু''- Nazrul Islam's Song.
	(c) Agiye Chalo : Talk on inspiration.
	(d) Special News Bulletin.
	(e) Patriotic Song.
7-20 P.M	CHARAMPATRA :
7-30 ''	Counter Programme
7-40 ''	News in Bengali
7-45 ''	News in English
	AGNIBINA : A special programme on observance
8-15 ''	of the birth anniversary of poet Nazrul Islam.
8-20 ''	Slogans & Sayings of
8-55 Ó	National Leaders.
8-30 ''	.......Alor Diganta : A talk
২৭ শে মে, ১৯৭১	in Bengali.
6-59 P.M.	Flashes & music.
	Close down.
7-00 ''	
	Signature Tune & Opening of the station & Programme Summary.
	AGNISHIKHA : A Composite Programme for the freedom fighters.
	(a) Darpan : A talk in Bengali.
	(b) Oikatan : Patriotic Song.
	(c) Kabikantha : Self-composed poems.
	(d) Ranaveri : News of the Sectors.
7-20 ''	(e) partiotic Song.
7-30 ''	Talk in Bengali
7-40 ''	News in Bengali
7-45 ''	News in English
	RAKTASWAKKHAR :
	Self-composed poems & patriotic Song.

7-50 P.M	CHARAMPATRA :
	Couter Progamme.
7-55 ''	BIHWA JANAMAT :
8-00 ''	Bengali talk.
	Close down.
৩০ মে, ১৯৭১	
6-58 P.M	Signature Tune.
6-59 ''	Opening of the Station.
7-00 ''	AGNISHIKHA : A composite Progamme for the freedom fighters.
	(a) Darpan : Talk in Bengali
	(b) Oikatan : patrioic Song.
	(c) Recitation :
	(d) Ranaveri : Reports from Sectors.
7-20 ''	(e) patriotic Song.
7-30 ''	News in English.
	''স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা :
	Talk in Bengali :
7-40 ''	Mr. A. Mannan, MNA.
	RAKTASWAKKHAR :
	Self- composed poems,
	(a) Belal Mohammed.
7-45 ''	(b) S.I. Noor.
7-55 ''	News in Bengali
	Samayeeki : News
8-00 ''	Commentary in Bengali.
8-05 ''	Falk Song : Shah Ali Sirker.
8-15 ''	বাঙালী জবাব দাও : Talk in
8-20 ''	Bengali
8-25 ''	patriotic Song.
	Biswa Janamat.
8-35 ''	CHARAMPATRA :
8-40 ''	Counter progamme.
	Slogans & patriotic Song.
	Close down.

৩১ মে, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশন :

৬-৫৯ মিঃ	সূচকধ্বনি ও উদ্বোধনী ঘোষাণা
৭-০০ ”	অগ্নিশিখাঃ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান (ক) দর্পণঃ বাংলা কথিকা (খ)জাগৃতিঃদেশাত্মবোধক গান (গ) আবৃত্তি (ঘ) রণভেরীঃ যুদ্ধের খবর (ঙ)বজ্রকণ্ঠঃ শেখ মুজিবেরবাণী (চ) দেশাত্মাবোধক গান
৭-২০ ”	ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ”	বিশ্বজনমত
৭-৩৫ ”	পল্লীগীতিঃ শাহ্ আলী সরকার
৭-৪০ ”	রক্তস্বাক্ষরঃস্বরচিত কবিতা পাঠ (ক) বেলাল মুহম্মদ (খ) শিকদার ইবনে নূর
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৭-৫৫ ”	দেশাত্মবোধক গান ও বিশেষ ঘোষণা
৮-০৫ ”	যন্ত্রসঙ্গীত
৮-১৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও দেশাত্মবোধক গান
৮-২০ ”	চরমপত্র
৮-৩০ ”	সমাপ্তি।

৭ জুন, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

৬-৫৯ মিঃ	পরিচিতি সুর
৭-০০ ”	উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৫ ”	অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-১০ ”	অগ্নিশিখা। (ক) দর্পণঃ বাদশা (খ) সংগীত (গ) আবৃত্তিঃ নূরে আলম (ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ কামাল লোহানী (ঙ) নির্দেশাবলী (চ) সঙ্গীত
৭-৩০ মিঃ	বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ ”	সাময়িকী/কথিকা
৭-৫০ ”	ইংরেজী খবর
৭-৫৭ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ ”	সঙ্গীত
৮-১৫ ”	... ...
৮-৩০ ”	জাগ্রত বাংলা
৮-৪০ ”	চরমপত্র
৮-৪৭ ”	বিশ্বজনমত
৮-৫১ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ ৭ই জুন (ক) কথিকা-শহিদুল ইসলাম (খ) কবিতা
৮-৫৫ ”	সমাপ্তি

১৯ জুন, ১৯৭১

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণঃ ইসলাম ও পকিস্তানের রাজনীতিঃ কথিকা -কামাল মাহবুব (খ) সঙ্গীত (গ) সংবাদ (ঘ) আবৃত্তি (ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ
৭-২৫ ”	বিশ্বজনমত
৭-৩১ ”	সঙ্গীত
৭-৪০ ”	দৃষ্টিপাতঃ কথিকা-ডঃ মজহারুল ইসলাম
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ পড়বেন কামাল লোহানী।
৭-৫৫ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান।
৮-২৫ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত

৮-৩০ মিঃ	চরমপত্র	৭-৪০ মিঃ	ত্রিপিটক/কথিকা অথবা আবৃত্তি
৮-৪০ ”	সঙ্গীত	৭-৪৫ ”	বিশ্বজনমত
৮-৪৫	রক্তস্বাক্ষর	৭-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
	(ক) শহীদ মিনারঃ	৭-৫৩ ”	চরমপত্র
	আলেখ্য-মোস্তফা আনোয়ার	৮-০০ ”	জয় বাংলা।
৯-০০	জয় বাংলা।		
২৭ জুন, ১৯৭১			
সন্ধ্যাঃ		সন্ধ্যাঃ	
৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি	৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচিতি।
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ	৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ
	(ক) দর্পণ		(ক) দর্পণ
	(খ) সঙ্গীত		(খ) সঙ্গীত
	(গ) আবৃত্তি		(গ) আবৃত্তি
	(ঘ) রণভেরীঃ সংবাদ বুলেটিন		(ঘ) রণভেরীঃ সংবাদ বুলেটিন
	(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের		(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের
	নির্দেশ		নির্দেশাবলী
৭-২৫ ”	বিশ্বজনমতঃ পর্যালোচনা	**৭-২৫ ”**	বিশ্ব জনমতঃ পর্যালোচনা-
৭-৩০ ”	সঙ্গীত		আমিনুল হক বাদশা
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ	৭-৩০ ”	সঙ্গীত
	অধ্যাপক আবদুল হাফিজ	৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ কথিকা-
৭-৪০ ”	সঙ্গীত		অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ, সঙ্গীত ও	৭-৪০ ”	সঙ্গীত
	স্লোগান	৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান	৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান	৮-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৩০ ”	চরমপত্র	৮-৩০ ”	চরমপত্র
৮-৪০ ”	ইসলামের দৃষ্টিতেঃ	৮-৩৫ ”	সঙ্গীত
	সৈয়দ আলী আহসান।	৮-৪০ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ ষড়যন্ত্রের অন্তরালেঃ
৯-০০ ”	জয় বাংলা		পাকিস্তানের কবর রচনার জন্য
৩০ জুন, ১৯৭১			দায়ী কে?- অধ্যাপক অসিত রায়
সকালঃ			চৌধুরী।
৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী	৮-৪০ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
	(খ) কোরান তেলাওয়াত	৯-০০ ”	জয় বাংলা।
৭-১০ ”	(ক) অনুষ্ঠান সূচী		
	(খ) বাংলা সংবাদ	**৫ জুলাই,১৯৭১**	
	(গ) ইংরেজী সংবাদ	সকালঃ	
৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান	৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী
		”	(খ) কোরান তেলাওয়াত

৭-১০ মিঃ (ক) অনুষ্ঠান সূচী
(খ) বাংলা সংবাদ
(গ) ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ " জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪০ " আবৃত্তি
৭-৪৫ " বিশ্বজনমত
৭-৫০ " বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৭-৫৩ " চরমপত্র
৮-০০ " জয় বাংলা।

সন্ধ্যাঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ " অগ্নিশিখাঃ
(ক) দর্পণঃ আজকের মুক্তিযুদ্ধঃ সূর্যসেনের স্মৃতি-কথিকাঃ রণেশ দাশগুপ্ত
(খ) সঙ্গীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিন
(ঙ) বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী
৭-২৫ " বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ " সঙ্গীত
৭-৩৫ " দৃষ্টিপাতঃ কথিকা- অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ " সঙ্গীত
৭-৪৫ " বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ " ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর
(ক) ......
(খ) বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতিঃ আলী জাকের
(গ) গান
ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ " বজ্রকণ্ঠ

৮-৩০ মিঃ চরমপত্রঃ কথিকা-এম, আর, আখতার।
৮-৩৫ " সঙ্গীত
৮-৪০ " রক্তস্বাক্ষরঃ......
৮-৪৫ " সঙ্গীত
৮-৫০ " ইসলামের দৃষ্টিতেঃ সৈয়দ আলী আহসান
৮-৫৫ " স্লোগান ও দেশাত্মবোধক গান
৯-০০ " জয় বাংলা।

১০জুলাই, ১৯৭১

সকালঃ
৭-০০ মিঃ (ক) উদ্বোধনী
(খ) কোরান তেলাওয়াত
৭-১০ " (ক) অনুষ্ঠান পরিচিতি
(খ) বাংলা সংবাদঃ আলী রেজা চৌধুরী
(গ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৭-৩০ " জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪৫ " বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৫০ " বজ্রকণ্ঠ
৭-৫৩ " চরমপত্রঃ এম আর আখতার (পুনঃপ্রচার)
৮-০ " জয় বাংলা।

সন্ধ্যাঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ " অগ্নিশিখা
(ক) দর্পণ
(খ) সঙ্গীত
(গ) আবৃত্তি
(ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ মনজুর কাদের
৭-২৫ " বিশ্ব জনমতঃ আমিনুল হক বাদশা
৭-৩০ " সঙ্গীত

৭-৩৫ মিঃ	দৃষ্টিপাতঃ জামিল শারাফী
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি (খ) পর্যালোচনা (গ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন (ঘ) সঙ্গীত
৮-২৫ ”	সাম্প্রদায়িকতার উপর উর্দু কথিকা-শহীদুর রহমান
৮-৩০ ”	দেশবাসীর উদ্দেশে অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলীর ভাষণ
৮-৪০ ”	দেশাত্মবোধক গান
৮-৪৫ ”	চরমপত্রঃ এম আর আখতার
৮-৫০ ”	বজ্রকণ্ঠ
৮-৫২ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৩ জুলাই, ১৯১৭

সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণ (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিন শহীদুল ইসলাম
৭-২০ মিঃ	সংবাদ পর্যালোচনাঃ আমীর হোসেন
৭-২৫ ”	আলাপনঃ শ্রোতাদের চিঠির জবাব
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ মিঃ	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য (খ) পর্যালোচনা (গ) সঙ্গীত (ঘ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ ”	উর্দু সংবাদঃ শহীদুল হক
৮-৩০ ”	চরমপত্রঃ এম আর, আখতার
৮-৩৫ ”	সঙ্গীত
৮-৪০ ”	মানবতার নামেঃ কথিকাঃ আবু মাসুদ
৮-৪৫ ”	বজ্রকণ্ঠ, স্লোগান ও সঙ্গীত
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৭ জুলাই, ১৯১৭

সকালঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখাঃ (ক) দর্পণ (খ) সঙ্গীত (গ) আবৃত্তি (ঘ) সংবাদ বুলেটিনঃ শহীদুল ইসলাম
৭-২০ ”	(ক) আমাদের সংগ্রামঃ আবু শহিদ (খ) স্লোগান ও সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	দৃষ্টিপাতঃ অধ্যাপক আবদুল হাফিজ
৭-৪০ ”	সঙ্গীত
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদঃ সালেহ আহমদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ পরিচালনা-আলমগীর কবীর (ক) বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্য

	(খ) পর্যালোচনা
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) ইংরেজী সংবাদঃ পারভীন হোসেন
৮-২৫ ”	উর্দু সংবাদঃ শহীদুল হক
৮-৩০ ”	স্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৩৫ ”	শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনঃ আহমদ রফিক
৮-৪৪ ”	বজ্রকণ্ঠ, স্লোগান ও সঙ্গীত
৮-৫৩ ”	চরমপত্র : এম, আর, আখতার
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

১৮ আগস্ট, ১৯৭১
সন্ধ্যাঃ

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
	অগ্নিশিখাঃ
৭-০৫ ”	(ক) দর্পণঃ আশরাফুল আলম ও মোস্তফা আনোয়ার
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) আবৃত্তি
	(ঘ) সংবাদ বুলেটিন
	সংবাদ পর্যালোচনাঃ
৭-২৫ ”	আমির হোসেন
৭-৩০ ”	সঙ্গীত
৭-৩৫ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতেঃ কামাল লোহানী
৭-৪৫ ”	বাংলা সংবাদ
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান পরিচালনা-আলমগীর কবীর
	(ক) বিদেশী সংবাদপত্রের পর্যালোচনা
	(খ) সঙ্গীতঃ
৮-২৫ ”	(গ) ইংরেজী সংবাদ
৮-৩০ ”	উর্দু সংবাদ
৮-৩৫ ”	সঙ্গীতঃ শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গেঃ লিখিত-সলিমুল্লা, পড়বেন- মোস্তফা আনোয়ার
৮-৪৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৮-৪৭ ”	জল্লাদের দরবার
৯-০০ ”	জয় বাংলা।

২৮আগস্ট, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী
	(খ) বাংলা খবর
	(গ) ইংরেজী খবর
১-১৫ ”	সঙ্গীতানুষ্ঠান/পল্লীঃ ১। শেখ মুজিব সত্যযুগের.... ২। মুজিব বাইয়া .... ৩। ওরা কোথায় ....
১-৩০ ”	বিশ্ব জনমত
১-৩৫ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীতঃ
১-৪৫ ”	রক্তস্বাক্ষরঃ আশরাফুল আলম।
১-৫০ ”	পুঁথিপাঠঃ মোহাম্মদ শাহ বাঙালী
২-০০ ”	জয় বাংলা।

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	
৭-০০ ”	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী
	অগ্নিশিখাঃ পরিচালকঃ আশরাফুল আলম
	(ক) সংবাদ বুলেটিনঃ মনজুর কাদের
	(খ) সঙ্গীতঃ বীর বাঙালী অস্ত্র ধর
	(গ) দর্পণঃ আশরাফুল আলম
	(ঘ) আবৃত্তিঃ কামাল লোহানী
	(ঙ) পুঁথিপাঠঃ মোহাম্মদ শাহ বাঙালী
	(চ) মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকেঃ মোস্তফা আনোয়ার
	(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ মিঃ	বাংলা খবরঃ আলী রেজা চৌধুরী	৮-৩০ ”	উর্দু কথিকা
		৮-৩৫ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনাঃ শহীদুল ইসলাম	৮-৪০ ”	সোনার বাংলা/পল্লীগীতি
		৯-০০ ”	আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলাঃ মেহের খোন্দকার
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান		
	(ক) পর্যালোচনা	৯-০৭ ”	সঙ্গীত
	(খ) উদ্ধৃতি	৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
	(গ) সঙ্গীতঃ ‘দুর্জয় বাংলা’	৯-২০ ”	চরমপত্র
	(ঘ) খবর	৯-৩০ ”	সমাপ্তি।
৮-২৫ ”	উর্দু খবর	**২০সেপ্টেম্বর,১৯৭১**	
৮-৩০ ”	‘সোনার বাংলা’: গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্যে অনুষ্ঠান	প্রথম অধিবেশনঃ	
৮-৪৫ ”	পর্যাবেক্ষকের দৃষ্টিতে	৭-০০ মিঃ	(ক) উদ্বোধনী ঘোষণা
৮-৫২ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান		(খ) তেলাওয়াত
৮-৫৫ ”	চরম পত্র		(গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি
৯-০০ ”	জয় বাংলা।	৭-১০ ”	(ক) খবরঃ বাংলা
			(খ) খবরঃ ইংরেজী
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১		৭-৩০ ”	জাগরণীঃ সঙ্গীতানুষ্ঠান
তৃতীয় অধিবেশনঃ সন্ধ্যা		৭-৪৫ ”	‘রুস্তমের মা আমার মা’: কথিকাঃ কামাল লোহানী (পুনঃপ্রচার)
৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি	৭-৫৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
		৮-০০ ”	সমাপ্তি।
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা		
	(ক) সংবাদ বুলেটিন		
	(খ) সঙ্গীত		
	(গ) দর্পণঃ রণজিৎ	**তৃতীয় অধিবেশনঃ**	
	(ঘ) আবৃত্তি	সন্ধ্যাঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
	(ঙ) সঙ্গীত		
	(চ)মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকেঃ	৭-০০ মিঃ	অগ্নিশিখা
			(ক) সংবাদ বুলেটিনঃ
	মোস্তফা আনোয়ার	৭-০৫ ”	(খ) সঙ্গীত
	(ছ) আমার সোনার বাংলা		(গ) দর্পণঃ মোস্তফা আনোয়ার
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা		(ঘ) সঙ্গীত
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা		(ঙ) বাংলার মুখঃ জীবন্তিকা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান		(চ) আমার সোনার বাংলা
	সঙ্গীতঃ … …	৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
	খবরঃ ইংরেজী		
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু		

৭-৫৫ মিঃ	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) ডাইরি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা
৯-০০ ”	কথিকা
৯-০৭ ”	সঙ্গীত
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ ”	চরম পত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

২১ সেপ্টেম্বর,১৯১৭
তৃতীয় অধিবেশনঃ
সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা
	(ক) সংবাদ বুলেটিন
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) দর্পণ
	(ঘ) আবৃত্তি
	(ঙ) সঙ্গীত (২টি)
	(চ) আমরা গেরিলা (২)
	(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) উদ্ধৃতি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর

৮-২৫ মিঃ	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	(ক) আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলাঃ বেগম উম্মে কুলসুম
	(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-৫০ ”	সোনার বাংলা
	(ক) কথোপকথন
	(খ) পল্লীগীতি
৯-০০ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ ”	সঙ্গীত
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ ”	চরমপত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

২৪সেপ্টেম্বর,১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা
	(ক) সংবাদ বুলেটিন
	(খ) সঙ্গীত
	(গ) দর্পণ
	(ঘ) আবৃত্তি
	(ঙ) সঙ্গীত (২টি)
	(চ) আমরা গেরিলা (৩)
	(ছ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
	(ক) পর্যালোচনা
	(খ) উদ্ধৃতি
	(গ) সঙ্গীত
	(ঘ) খবর
৮-২৫ ’’’	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	(ক) ইয়াহিয়া জবাব দাও (১): শওকত ওসমান
	(খ) সঙ্গীত

৮-৪০ মিঃ সোনার বাংলা
(ক) কথোপকথন
(খ) পল্লীগীতি
৯-০০ " পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-০৭ " সঙ্গীত
৯-১৫ " বজ্রগকণ্ঠ ও স্লোগান
৯-২০ " সমাপ্তি

আজ ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আজ ছ'মাস পূর্ণ হলো

ছ'মাস আগে ২৫ শে মার্চের কাল রাতে জঙ্গী ইয়াহিয়া তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ আর শিশু হত্যার এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে জঙ্গীশাহী সমগ্র বিশ্ববাসীকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু বর্বর বাহিনীর নৃশংসতার জবাব দিতে বাংলার ছাত্র, যুবক, ই পি আর, আসনার আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর জোয়ানরা গড়ে তোলেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তিবাহিনী। প্রতি রণাঙ্গণে তারা প্রচণ্ড আঘাত হেনে চলেছেন শত্রু বাহিনীর উপর। চূড়ান্ত বিজয় এখন সন্নিকটে।

সোনার বাংলার সোনালী আকাশ, রূপালী নদী আর শ্যামল প্রান্তরে তাজা রক্তের অর্ঘ দিয়ে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা শত্রু হননের দৃঢ়প্রত্যয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের দুর্বার শপথে যাঁরা অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমদের আজকের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করছি।

বাংলাদেশের মাটি থেকে হানাদারদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এ মরণজয়ী সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন এবং যারা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন তাদেরকে সংগ্রামী সালাম জানিয়ে আজকের অগ্নিশিখা অনুষ্ঠান শুরু করছি। ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাঙালী জাতির উপর সেদিন নেমে এসেছিল শতাব্দীর ভয়াবহতম বিভীষিকা। হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী পশুশক্তি বনমানুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর। কিন্তু সংগ্রামী বাঙালী জাতি সে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে। সংগ্রাম চলেছে অবিরাম-১ দিন- ২দিন- ১ মাস- ২ মাস। আজ ২৫ শে সেপ্টেম্বর। মুক্তিসংগ্রাম আজ সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করলো দীর্ঘ ৬টি মাস। সংগ্রাম চলছে, চলবে- যতদিন না দেশ থেকে শেষ শত্রুসৈন্যটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই গৌরবমণ্ডিত দিনে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখন পরিবেশিত হচ্ছে নাট্যানুষ্ঠান 'রক্তশপথ'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে শহীদানের প্রতিটি রক্তবিন্দু আজ উদ্দীপ্ত করেছে স্বাধীনতার সূর্যকে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ মুক্তিসেনা আর কোটি কোটি বীর বাঙালীকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের আজকের এ অধিবেশন এখানে শেষ করছি।

আবার আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো আজ বেলা ১টায়। জয় বাংলা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘোষণাঃ

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়টি এখন হারিকেনের আকার ধারণ করেছে এবং তা আজ সন্ধ্যায় সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

- চালনার সমুদ্র-বন্দর থেকে ৮ নম্বর মহাবিপদ থেকে দেখাতে হবে।
- চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সমুদ্র-বন্দরগুলো থেকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সঙ্কেত দেখাতে হবে।
- খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহ থেকে ৪ নম্বর নৌ-মহাবিপদ সঙ্কেত দেখাতে হবে।
- চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া রাজশাহী জেলার নদী-

বন্দরগুলো থেকে ২ নম্বর নৌ সর্তক-সঙ্কেত দেখাতে হবে। খুলনা জেলার সমুদ্রবর্তী এলাকায় যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করছি।

সমুদ্রে অবস্থানরত জেলে-নৌকা ও ট্রলারসমূহের আরোহীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন নৌযানগুলোকে বন্দরে নিরাপদ আশ্রয়ে ভিড়িয়ে রাখেন।

ঘোষণাটি শেষ হলো।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

সকাল

৭-০০ মিঃ (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা
(খ) তেলওয়াত
(গ) অনুষ্ঠান পরিচিতি

৭-১০ ” (ক) খবরঃ বাংলা
(খ) খবরঃ ইংরেজী

৭-৩০ ” মুক্তিযুদ্ধের সফল অর্ধবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত রাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে যে বেতার ভাষণ দেন, তার ইংরেজী অনুবাদ।

৮-১৫ ” বজ্রকণ্ঠ ও স্লোগান

৮-২০ ” সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

বেলা

১-০০ মিঃ (ক) উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
(খ) খবরঃ বাংলা
(গ) খবরঃ ইংরেজী

১-১৫ ” (ক) ঐকতানঃ কোরাস

১-৩০ ” (ক) ‘এবার মায়ের পুজোয় আমরা’: বিশেষ কথিকা- রণজিৎ পাল চৌধুরী।
(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত

১-৪৫ ” রক্তস্বাক্ষরঃ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি-শামীম চৌধুরী

১-৫০ ” পুঁথিপাঠ

২-০০ ” সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি

৭-০৫ ” অগ্নিশিখা
(ক) সংবাদ বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণঃ মাহমুদ ফারুক
(ঘ) আবৃত্তি
(ঙ) সঙ্গীত
(চ) স্বাধীন বাংলা বেতার পরিক্রমা
(ছ) আমার সোনার বাংলা

৭-৪৫ ” খবরঃ বাংলা

৭-৫৫ ” প্রতিধ্বনিঃ শহীদুল ইসলাম

৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
(ক) পর্যালোচনা
(খ) উদ্ধৃতি
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) খবর

৮-২৫ ” খবরঃ উর্দু

৮-৩০ ” কথিকাঃ উর্দু

৮-৪০ ” সোনার বাংলা

৯-০০ ” পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

৯-০৭ ” সঙ্গীত

৯-১৫ ” জল্লাদের দরবার

৯-৩০ ” সমাপ্তি

১ অক্টোবর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠানসূচী

৭-০৫ ” অগ্নিশিখা

(ক) বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) আবৃত্তি
৭-৩৫ ” পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৭-৪৫ ” বাংলা খবর
৭-৫৫ ” সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ” উর্দু সংবাদ
৮-৩০ ” কথিকাঃ এ,বি,এম, শাহাবুদ্দিন
৮-৪০ ” সোনার বাংলা
৯-০০ ” জয় বাংলা
৯-৩০ ” সমাপ্তি।

২ অক্টোবর ১৯৭১
প্রথম অধিবেশনঃ
সকাল
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ঘোষণা
৭-০৩ ” তেলাওয়াতে কালামে পাক ও তার বাংলা তরজমা
৭-০৮ ” অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ” বাংলা সংবাদ
৭-২০ ” ইংরেজী সংবাদ
৭-৩০ ” জাগরণী
৭-৪৫ ” কথিকা (পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে)
৭-৫৫ ” বজ্রকণ্ঠ, সঙ্গীত
৮-০০ ” সমাপ্তি

আজ শনিবার, ১৬ই আশ্বিন ১৩৭৮ সন, ২রা অক্টোবর, ১৯৭১ সাল। অধিবেশনের শুরুতে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন মোঃ মুজিবুর রহমান জেহাদী ও তার বাংলা তরজমা পড়ছেন মোঃ খায়রুল ইসলাম যশোরী।

তৃতীয় অধিবেশনঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা (মুক্তিবাহিনীর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
(ক) বুলেটিন
(খ) সঙ্গীত (দুর্জয় বাংলা)
(গ) দর্পণ
(ঘ) সঙ্গীত
(ঙ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানঃ মেজর মঈনের সাথে
(চ) সোনার বাংলা (গান)
৭-৪৫ ” খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ” সংবাদ পর্যালোচনা আমির হোসেন
৮-০০ ” ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ” উর্দু সংবাদ
৮-৩০ ” সঙ্গীত
৮-৪০ ” সোনার বাংলা (পল্লীর শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান)
৯-০০ ” সঙ্গীত
৯-০৫ ” কথিকাঃ আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী
৯-১৩ ” বজ্রকণ্ঠ
৯-১৫ ” চরমপত্র
৯-২৫ ” জয় বাংলা
৯-৩০ ” সমাপ্তি

৩ অক্টোবর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
৭-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠানসূচী
৭-০৫ ” অগ্নিশিখা
(ক) বুলেটিন
(খ) দর্পণ
(গ) সঙ্গীত
(ঘ) সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান
(ঙ) সোনার বাংলা (গান)

৭-৪৫ মিঃ	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	প্রতিধ্বনি
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	উর্দু কথিকা
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা
৯-০০ ”	সঙ্গীত
৯-০৫ ”	পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে
৯-১৩ ”	সঙ্গীত
৮-১৮ ”	দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলামঃ কথিকা
৯-৩০ ”	
৯-২৫ ”	বজ্রকণ্ঠ ও সঙ্গীত
৯-৩০ ”	জল্লাদের দরবার
৯-৫০ ”	জয় বাংলা
৯-৫৫ ”	সমাপ্তি।

৪ অক্টোবর, ১৯১৭

প্রথম অধিবেশনঃ

৭-০০ ”	উদ্বোধনী
৭-০৫ ”	কোরান তেলাওয়াত ও তরজমা
৭-১০ ”	অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১১ ”	খবরঃ (ক) বাংলা (খ) ইংরেজী
৭-৩০ ”	জাগরণী
৭-৪০ ”	নিমজ্জমান ব্যক্তিদের তৃণ অঁকড়ে বাঁচার চেষ্টাঃ কথিকা (পুনঃপ্রচার)
৭-৪৯ ”	বজ্রকণ্ঠ
৭-৫০ ”	নজরুলগীতি
৭-৫৫ ”	জয় বাংলা
৮-০০ ”	সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি

১-০০ মিঃ	খবরঃ (ক) বাংলা (খ)
১-০৫ ”	ইংরেজী
১-১৫ মিঃ	ঐকতান
১-৩০ ”	কথিকাঃ ইলিয়াস আহমেদ
১-৩৮ ”	রবীন্দ্র সঙ্গীত
১-৪৫ ”	সাহিত্যানুষ্ঠানঃ রক্তস্বাক্ষর-শামিম চৌধুরী
১-৪৮ ”	পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি
১-৫৫ ”	জয় বাংলা
২-০০ ”	সমাপ্তি।

তৃতীয় অধিবেশনঃ

সন্ধ্যা

৭-০০ মিঃ	উদ্বোধনী ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-০৫ ”	অগ্নিশিখা (ক) সংবাদ বুলেটিন (খ) সঙ্গীত (গ) দর্পণ (ঘ) আবৃত্তি (ঙ) আমরা গেরিলা (৪) (চ) আমার সোনার বাংলা
৭-৪৫ ”	খবরঃ বাংলা
৭-৫৫ ”	সংবাদ পর্যালোচনা
৮-০০ ”	ইংরেজী অনুষ্ঠান (ক) পর্যালোচনা (খ) উদ্ধৃতি (গ) সঙ্গীত (ঘ) খবর
৮-২৫ ”	খবরঃ উর্দু
৮-৩০ ”	সঙ্গীত
৮-৪০ ”	সোনার বাংলা
৯-০০ ”	কথিকা
৯-০৭ ”	সঙ্গীতঃ পল্লী
৯-১৭ ”	বজ্রকণ্ঠ
৯-২০ ”	চরমপত্র
৯-৩০ ”	সমাপ্তি।

৮ অক্টোবর, ১৯৭১
দ্বিতীয় অধিবেশনঃ
১-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
১-০৫ " খবরঃ (ক) বাংলা
(খ) ইংরেজী
১-১৫ " ঐকতান
১-৩০ " ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ ও ইয়াহিয়া (২য় পর্ব): আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রহমান
১-৩৬ " নজরুল গীতি
১-৪৫ " পুঁথিপাঠ/পল্লীগীতি
১-৫৫ " জয় বাংলা
২-০০ " সমাপ্তি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

একটি বিশেষ ঘোষণা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত শনিবার মুক্তাঞ্চলে অনুষ্ঠিত মুক্তিবাহিনীর অফিসার ক্যাডেটদের প্রথম শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত অফিসার ক্যাডেটদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এর উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে আমাদের আজকের রাতের অধিবেশনে।

ঘোষণাটি এখানেই শেষ হল।

১৬ অক্টোবর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশনঃ
7-00 P.M Udbodhani Ghoshana-O-Anushthan parichiti
7-05 " Agnishikha : Mukti Bahinir janya
a) Sangbad Bulletin
b) Sangeet
c) Darpan
d) Kabita Abriti
e) Sangeet
f) Kothika/Sakhyatkar
g) Amar Sonar Bangla
7-45 P.M Khabar : Bangla
7-55 " Sangbad Parjalochana/Pratiddhani
8-00 " English Programme
a) Commentary
b) World Press Review
c) Music
d) News
8-25 " Khabar : Urdu
8-30 " a) Kathika
8-40 " b) Sangeet
Sonar Bangla
(a)Kathopakathan
(b) Palligeeti
9-00 " Kothika/Pindir Prolap
9-07 " Palligeeti/Puthi/Jari
9-12 " Bajrakantha-O-Slogan
9-15 " Drama/Jallader Darbar
9-20 " Charampatra
9-30 " Samapti.

১ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশনঃ
7-00 A.M. a) Udbodhani
b) Quran Tillawat-O-Anubad :
c)Anushthan Parichiti
7-10 " Khabar : Bangla
7-20 " Khabar : English
7-30 " Sangeet
7-35 " Kothika : Ranangane Banglar Nari- Begum Umme Kulsum.
7-42 " Rabindra Sangeet
7-47 " Kothika : Mustafizur Rahman
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতেঃ শত্রুর রক্তে অবগাহন করতে দাও (পুনঃপ্রচার)
7-50 " Bajrakantha-O-Slogan
8-00 " Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন :

1-00 P.M.	Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
1-05 ”	a) Khabar : Bangla
	b) Khabar : English
1-15 ”	Sangeet
1-23 ”	Biswa Janamat : Script written by Sadekin
1-30 ”	Palligeeti/Puthi/Jari
1-40 ”	কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা : এ সপ্তাহের জয়বাংলা পত্রিকা থেকে
1-47 ”	Sangeet.
1-50 ”	Punaprachar : Jallader
2-00 ”	Darbar
	Samapti

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M	Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ”	Agnishikha :
	a) Sangbad Bulletin
	b) Sangeet
	c) Darpan : Ashraful Alam
	d) Sangeet-O-Slogan
	e) Abriti : Mustafa Anwar
	f) Banglar Mukh : Jibantika: Script by Kallyan Mitra, Participated by Purnendu Saha & Bulbul Mahalnabish.
	g) Amar Sonar Bangla
7-45 ”	
7-55 ”	Khabar : Bangla
	Sangbad Parjalachana : Lekha : Amir Hussain
8-00 ”	Paath : Ashfaque Rahman
8-05 ”	Sangeet
	Jibantika : Mirjafarer Rojnamcha : Script by Kallyan Mitra
8-15 ”	
8-20 ”	Nazrul Sangeet :
	Kothika : Biswa Bibek-O-Bangladesh by Mohadeb Saha
8-27 ”	
8-30 ”	Bajrakantha-O-Slogan
	English Programme:
	Conducted by Alamgir Kabir
	(a) Commentaries by Ahmad Chowdhury
	(b) Patriotic Song
	(c) Extracts from World press/Talk
	(d) News
8-55 ”	Khabar : Urdu
	Zahed Siddiqui
9-00 ”	Kothika : Urdu/Partiotic Song
9-15 ”	Slogan & Orchestra
9-20 ”	Charampatra : M.R. Akhtar
9-30 ”	Samapti.

২নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন:

7-00 A.M	(a) Udbodhani
	(b) Quran Tillawat-O-Anubad : Moulana M.R. Zehadi
	(c) Anusthan Parichiti
7-10 ”	Khaba : Bangla
7-20 ”	Khabar : English
7-30 ”	Sangeet
7-35 ”	Kothika/Biswa-Bibek-O-Bangladesh : by Mohadeb Saha
7-42 ”	
7-47 ”	Nazrul Geeti
7-50 ”	Bajrakantha-O-Slogan
8-00 ”	Kothiha
	Samapti.

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P.M	
	Udbodhani-O-Anushthan
7-05 ”	Parichiti
	Agnishikha :
	(a) Sangbad Bulletin kamal Lohani
	(b) Sangeet
	(c) Kothika by Mustafa Anwar
	(d) Sangeet-O-Slogan
	(e) Abriti : B. Hasan
	(f) Amar Sonar Bangla
7-45 ”	
	Khabar : Bangla
7-55 ”	-Babul Akhtar
	Sangbad Parjalochana

	Lekha : Amir Hussain
	Paath: Ashfaque Rahman
8-00 P.M	Sangeet
8-05 ”	Kothika/Sangram Ghare Ghare (সংগ্রাম ঘরে ঘরে) by Mustafizur Rahman (Recorded)
8-15 ”	Nazrul Sangeet
8-20 ”	Kothipka : Parjabekkhaker Drishtite
	Lekha- Fayaz Ahmed
	Paath – Kamal Lohani
8-27 ”	Bajrakantha-O-Slogan
8-30 ”	English Programme :
	Conducted by : Alamgir Kabir
	(a) Commentaries by : Ahmed Chowdhury
	(b) Patriotic Song
	(c) Extracts from World Press/
	Talk : Ali Zaker
	(d) News : Parveen Hossain
8-55 ”	Khabar : Urdu by Zahed Siddiqui
9-00 ”	Kothika : Urdu by Zahed
9-15 ”	Siddiqui/Patriotic Song
9-20 ”	Slogan & Orchestra
9-30 ”	Charanpatra: M. R. Akhtar
	Samapti.

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন:

7-00 A.M	
	(a) Udbodhani
	(b) Quran Tillawat: Moulana M. R Zahedi
	Anubad : A. A. Faruqui
7-10 ”	
7-20 ”	a) Khabar : Bangla
7-30 ”	b) Khabar : English
7-35 ”	Sangeet
	Kothika/Kathgarar Ashami:
7-42 ”	by Mr. Rahman.
7-47 ”	Rabindra Sangeet
7-50 ”	Bajrakantha-O-Slogan
	Kothika : Pondir Prolap or
8-00 ”	Charampatra
	Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

1-0 P.M	Udbodhani-O-Anushthan
2-0	Parichiti
1-05 ”	a) Khabar : Bangla
	b) Khabar : English
1-15 ”	Sangeet
1-23 ”	Biswa Janamat :
	Lekha : Sadein
	Path : Shahjahan Faruq
1-30 ”	Palligeeti
1-40 ”	Shahitya Anusthan :
	Rakta Swakkhar/Swarachira kabita by Nirmaleendu Gun
1-47 ”	Sangeet
1-50 ”	Kothika : (punaprachar:)
	Parjabekkhoker Drishtite
2-00 ”	Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন:

7-00 A.M	
	Udbodhani-O-Anushthan
7-05 ”	Parichiti
	Agnishikha :
	Parichalana-A. Alam
	(a) Sangbad Bulletin : Babul Akhtar
	(b) Sangeet : ১। আমি অস্ত সাগর..
	(c) Darpan : A. Alam
	(d) Sangeet-O-Slogan :) মোরা ঝঞ্চার মত উদ্দাম
	(e) Abritti : A. Rahman
	(f) Kothika : Mustafa Anwar
7-45 ”	(g) Amar Sonar Bangla
	Khabar : Bangla
7-55 ”	-Abdullah-al-Ialam
	Sangbad Parjalochana:
	Lekha- Amir Hassain
8-00 ”	Paath- Ashfaqur Rahman\
	Sangeet ১। আঁধারে বাঁধ ভেঙ্গে
8-05 ”	২। মরবো তাতে নেই ক্ষতি
	Kothika/Jibantika: Drishtipat by
8-15 ”	Zafar Sadeque
	Egiye Chalo : A Prog. of patriotic song with Slogans
	১। আয়রে চাষী
	২) এবার উঠেছে মহা আলোড়ন

8-27 P.M Bajrakantha-O-Slogan
8-30 „ English Programme:
Conducted By : Alamgir Kabir
(a) Commentaries by :
Ahmed Chowdhury, A. Kabir
(b) Patriotic song : ব্যারিকেড বেয়নেট
(c) Extracts from World Press/ Talk
(d) News : Zareed Ahmed
8-55 „ Khabar : Urdu-Zahed Siddiqui
9-00 „ Kothika : Urdo & Sangeet
9-15 „ Jallader darber : Script by Kallyan Mitra
Participants : Raju ahmed, ...Bose, Babul Chowdhury Narayan Ghose
9-20 „ Charampatra
9-30 „ Samapti.

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M.(a) Udbodhani
(b) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti :
7-10 „ Khabar : Bangla-Abdullah-alIslam
7-20 „ Khabar : English : Parveen Hossain
7-30 „ Sangeet : জন্ম আমার ধন্য হল....
7-35 „ Kothika
7-42 „ Nazrul Sangeet : ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
7-47 „ Bajrakantha-O-Slogan
7-50 „ Kathika : Pindir Prolap by Abu Toab Khan
8-00 „ Samapti.

২য় অধিবেশন :

1-00 P.M. Udbodhani-O Anushthan Parichiti
1-05 „ (a) Khabar : Bangla : Ali Reza Choudhury
(b) Khabar : English : Parveen Hossain
1-15 P.M Sangeet
(a) রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন
(b) দূর্গম দূর পথ বন্ধুর
1-23 „ Biswa Janamat :
1-30 „ Palligeeti : Indramohan Raj Bongshi
1-40 „ Shahitya : Anusthan
1-47 „ Rakta Swakkhar/Salf composed poems by Mohd. Rafique
Sangeet : Rabinrda Geeti- wbwkw`b fimv ivwLm
1-50 „ Jibantika : Punaprachar– Mirjafarer Rojnamcha
2-00 „ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 „ Agnishikha:Parichalana Ashraful Alam
(a) Sangbad Bulletin : Babul Akhthar
(b) Sangeet:
(c) Kothika:
Amra Gurilla:
Belal Mohammad
(d) Sangeet-O-Slogan
(e) Abritti : Mustafa Anwar
(f) Durjoy Bangla : Talk by Badrul Hasan
7-45 „ Khabar : Bangla-Kamal Lohani
7-55 „ Sangbad Parjalochana:
Lekha– Amir Hassain
Paath– A. Rahman
8-00 „ Sangeet
8-05 „ Kothika : Talk by Nurul Huq M.N.A
8-15 „ Nazrul Sangeet
8-20 „ Kothika : Putulnacher Khel-Talk by Abdul Gaffar Chowdhury
8-27 „ Bajrakantha-O-Slogan

8-30 P.M English Programme :
(a) Commentaries
(b) Patriotic Song
(c) Extracts from World Press / Talk
(d) News : Parvccn Hossain
8-55 ” Khabar : Urdu
9-00 ” Kothika:
9-15 ” Urdu Kothika & Sangeet: Zahcd Siddique
9-20 ” Parjabekkhaker Drishtite Lekha - Fayez Ahmed Paath - Kamal Lohani
9-30 ” Samapti.

১০ নভেম্বর, ১৯৭১
তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ” Agnishikha :
(a) Sangbad Bulletin :
(b) Sangeet
(c) Kothika : Janatar Sangram : by Badrul Hasan
(d) Sangeet-O-Slogan
(e) Abrittt: Mustafa Anwar
(f) Sakkhatkar: Ranangane: Documentary
(g) Amar Sonar Bangla
7-45 ” Khabar : Bangla
7-55 ” Sangbad Parjalochana: Lekha : AmirHassain Paath : A. Rahman
8-00 ” Sangeet
8-08 ” Drishtipat : Zafar Sadeq
8-12 ” Sangeet (Folk Song)
8-17 ” Bajrakantha-O-Slogan
8-30 ” English Programme ; Conducted by Aiy Zaker
(a) Commentaries : by Ay Zaker
(b) Patriotic Song
(c) Extracts from World Press / Talk : Jamil Akhtar
(d) News
8-55 P.M. Khabar : Urdu
9-00 ” Kothika : Ramjaner Adarsha by Syed All Ahsan
9-10 ” Orchestra & Slogan
9-25 ” Jallader Darbar : Script by Kalyan Mitra
9-30 ” Samapti.

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশন :

7-00 P.M. (a) Udbodhani
(b) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ” Khabar : Bangla
7-20 ” Khabar : English
7-30 ” Sangeet
7-35 ” Kothika / Putul Nacher Khel: Punaprocher
7-42 ” Rabindra Sangeet
7-50 ” Kothika : অভিযোগ
8-00 ” Gana Sangeet-O-Slogan
8-15 ” Bajrakantha-O-Slogan
8-20 ” Kothika : PindirProlap : A. Toab Khan
8-30 ” Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

1-00 P. M. Udbodhani-O-Anushtha Parichiti
1-05 ” (a) Khabar : Bangla
(b) Khabar : English
1-15 ” Sangeet
1-23 ” Religious Prog. /Is tamer Drishtitie (!5iCut)-Punaprachar
1-30 ” Puthi-Mohammad Shah Bangali
1-40 ” Shahitya Anusthan : Chotagalpa-Musa Sadek
1-47 ” Jantrasangeet
1-50 ” Kothika : Punaprachar-BcimanerDalilBy Shawkat Osman
2-00 ” Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ” Khabar: Bangla
7-15 ” Ganasangeet -O- Slogan
7-30 ” Agnishikha : Parichalana - Ashfaqur Rahman
(a) Bajrakantha
(b) BiswaBibek-O-Bangladesh : Mohadev Shaha
c) Sangeet
d) Abritti
e) IbliserMukhosh : Mesbah Ahmed
f) Sangeet
g) PindirProlap : Punaprochar
h) Juddher Khabar
8-25 ” Amar Sonar Bangla
5-30 ” English Programme
8-50 ” Khabar : English
9-00 ” Puthi Path
9-10 ” Kothika : Parjabekkhaker Drishtite
9-20 ” Urdu Anushthan :
a\ Kothika
b) Khabar
9-35 ” Sanghad Parjalochana
9-40 ” Sangeet
9-45 ” Kothika: Islamer Drishtite by Syed Ali Ahsan
9-55 ” Sangeet
10-00 ” Charampatra : M. R. Akhtar
10-10 ” Gram Bangla : Jeebantika "
10-25 ” Khabar Shironam
10-30 ” Samapti.

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশন :

7-00 P. M. Udbodhani-O-Mnushthan Parichiti
7-05 ” Khabar: Bangla
7-15 ” Ganasangeet - O- Slogan
7-30 ” Agnishikha :
(a) Bajrakantha
(b) Sangeet
c) PratindidhirKantha: Abdul Malek Ukil MNA
d).....
e) Kothika:
Kathgarar Asami: Mustafizur Rahman
0 Slogan & Sangeet
g) Janatar Sangram : Badrul Hasan
h) Juddher Khabar
8-25 ” Amar Sonar Bangla
8-30 ” English Programme : Conducted by Aiamgir Kabir
8-50 ” Khabar : English
9-00 ” Palligeeti/ Puthipaath
8-10 ” Kothika : Abdur Razzak Chowdhury
9-20 ” Urdu Anushthan :
a) Kothika : Zahed Siddiqi
b) Khabar
9-35 ” Sanghad Parjalochana : Script by Amir Hossain Readout by Ashfaqur Rahman
9-40 ” Sangeet
9-45 ” Kothika : Islamer Drishtitie Shabe Kadar: Syed Ali Ahsan
9-55 ” Sangeet
10-00 ” Kothika : Drishtipat Dr. Mazharul Islam
10-10 ” Jeebantika: Zaiiader Darbar
10-15 ” Kothika
10-25 ” Khabar Shironam
10-30 ” Samapti.

২০ নভেম্বর, ১৯৭১- ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a) Udbodhani
(h) Quran Tillawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ” Khabar : Bangla
7-20 ” Khabar : English :

7-30 ’’ Musical Sketch: Specially composed for Idd-day-Scripl by ShahiduL Islam &Ajit Roy.
7-45 ’’ Ramzaner-Oi-RojarShcshe: Script written by AbdulGaftar
8-15 ’’ Chowdhury.
8-20 ’’ Sangcet Bajrakantha-O-Slogan
8-25 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন:

1-00 P.M M. Udbodhani-0 Anushthan Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar: Bangla
(b) Khabar : English :
1-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Rakta Ranga Idd: Jibantika in Banglai - Written by Badrul Has an
1-30 ’’ Puthi on Idd: Md. Shah Bangali,
1-40 ’’ Shahitya : Anusthan : Chhotagalpa-
Bulban Osman
1-47 ’’ Janlrasangeet & Slogan
1-50 ’’ Kothika : Idul Fittr :
2-00 ’’ TalkbySyedAli Ashan.
2-05 ’’ Sangeet
Ramjanner-Oi-Rojar Sheshe (Re-broadcast): Script by Abdul Gaffar Chowdhury
2-30 ’’ Close Down.

তৃতীয় অধিবেশন

7-00 P.M Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar : Bangla
7-15 ’’ Musical Sketches Specially Composed on Idd: Script Written by Mustafizur Rahman Produced by Ashraful Alam
7-30 ’’ Agnishikha : Ashfaqur Rahman
(a) Bajrakantha
(b) Sangeet : Idul 1'ittr Ei Dincy: Talk in Bengali by Hafez Ali, Readout by Md. Faruq.
c) Abriui:KrishakcrIdd by Poet Nazrul Islam :To be recited by MustafaAnwar
d) Kothika :BiswaBibek-0-Bangladesh
e) Sangeet:
f) Pindir Prolap: Abu Toab Khan
g) Juddher Khabar
8-25 ’’ Amar Sonar Bangla
8-30 ’’ English Programme : Conducted by Alamgir Kabir
8-50 ’’ Khabar: English
9-00 ’’ Palli Geeti
9-10 ’’ SurjyaShapalh:TalkbyAbdur Razzak Chowdhury.
9-20 ’’ Urdu Anushthan :
a) Kothika :
b) Khabar
9-35 ’’ SanghadParjalochana: Script by Amir Hossain
9-40 ’’ Sangeet
9-45 ’’ Kothika-.PatraPatrikar Mantabya-Script by Sadekm
9-55 ’’ Chandar Talwar: Script by MamunoorRashid, Produced by Hasan Imam
10-25 ’’ khabar Shironam
10-30 ’’ Samapti.

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 AM (a) Udbodhani
(b) Quran THawat-OAnubad
(C) Anusthan Parichtti
7-10 ’’ Khabar :Bangla
7-20 ’’ Khabar : English :
7-30 ’’ Sangeet
7-35 ’’ Kothika : Muktisangrame Mayer Prerona
7-42 ’’ Rabindra Sangect/ Nazrul Geeti

7-50 ’’ Kothika : Drishtipath Script by
8-00 ’’ Dr. M. Islam
8-15 ’’ Gana Sangeet with mirations
8-20 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
Kothika : Pindir Prolap-Script and Read out by Abu Toab Khan
8-30 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন :

1-00 P. M.Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar : Bangla
(b) Khabar : English
1-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Religious Prog. / Geeta Paath
1-30 ’’ Palligeeti/Puthi/Jari
1-40 ’’ Shahitya Anusthan :
Rakler Akhore Likhi by Jafar Sadek, Read out by Ashraful Alarn
1-47 ’’ Jantrasangect
1-50 ’’ Kothika : A suitable talk from "Agnishikha to be re-b'cast
Kathgorar Asami: M. Rahman
2-00 ’’ Samapti

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :

7-00 AM (a) Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla-Read out by Babul Akthar
7-20 ’’ Khabar : English Read out by
7-30 ’’ Parveen Hossain
7-35 ’’ Sangeet
Kothika : Parjabekkhaker Drishtite : Script by Faiz Ahmed
7-42 ’’ Rabindra Sangeet / Nazrul Geeti
7-50 ’’ Kothika জনতার সংগ্রাম- গাজীউল হক

8-00 ’’ Ganasangcet with Narrations
8-15 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-20 ’’ Kothika : Pindir Prolap : By Abu Toab Khan
8-30 ’’ Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন

1-00 P. M.Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ (a) Khabar : Bangla-Rcad out by Kamal Lohani
(b) Khabar : English-Read out by Parveen Hossain
1.-15 ’’ Sangeet
1-23 ’’ Jibantika : Janatar Adalat
1-30 ’’ Pally Gccti/Puthi/Jari
1-40 ’’ Shahitya Anusthan :
Rakta Shakkhar : Chhotogalpa
1-47 ’’ Jantrasangeet
1-50 ’’ Kothika : A talk from Agnishikha to be re-b cast
2-00 ’’ Samapti

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a) Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anuslhan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangeet-O-Slogan
7-40 ’’ Kothika : Muku' Sangram-O-BanglarNari:
Subhra Chowdhury
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika : Swikritir Khabar Peye (স্বীকৃতির খবর পেয়ে)
Shawkat Osman
7-58 ’’ Khabar Shironarn
8-00 ’’ Kothika / Pindir Prolap : Abu Toab Khan
8-10 ’’ Sangeet

8-15 ” Kothika : Bangladesh-O-Buddhijeebi Samprodai : Dr. Ajoy Roy
8-22 ” Nazrul Geeti
8-28 ” Khabar Shironam Palligecti
8-30 ”
8-42 ” Bajrakanlha-O-Slogan
8-42 ” JanIra Sangeet-O-Slogan
8-45 ” Khabar: Urdu
8-50 ” Khabar : Bangla
9-00 ” Samapti.

দ্বিতীয় অধিবেশন

1.00 P.M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ” Khabar : Bangla
1-15 ” Khabar : English
1-25 ” Saneet
1-30 ” সংগ্রামী বাংলা
1-37 ” Jantra Sangeet-O-Slogan
1-40 ” Sahitya Anushtahn : Rakta Swakkhar / Self Composed Poems by Asit Roy Chowdhury & Sabuj Chakravarty
1-50 ” Sangeet
1-58 ” Khabar Shironam
2-00 ” Kothika :
2-07 ” Jantra Sangeet-O-Slpgan
2-10 ” Kothika : Ekti Samikkha : Script-Fafez Ali
2-20 ” Sangeet
2-28 ” Khabar Shironam
2-30 ” Puthipath : Muhammad Shah Bangali
2-40 ” Kothika : Drishtipat : Dr. Mazharul Islam
2-50 ” Khabar Bangla
3-00 ” Samapti.

তৃতীয় অধিবেশন

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ” Khabar : Bangla
7-15 ” Khabar : English
7-25 ” Sangeet
7-30 ” Agnishikha :
(a) Bajrakantha-O- Slogan
(b) Sangeet :
(c) Pratinidhir Kantha : Zillur Rahman. M. N. A
d) Abritti : Blank Verse : Ashfaqur Rahman & Umme Kulsum
e) Jantra Sangect-OSlugan
f) Kothika : Janatar Sangram : Gaziul Huq
g) Sangeet
h) Kothika / Ranangan Ghure
Elam : Musa Sadek
j) Juddher Khabar
8-10 ” AMAR SONAR BANGLA
8-15 ” Urdu Anusthan :
(a) Kothika
(b) Khabar
8-28 ” Khabar Shironam
8-30 ” English Programme
8-50 ” Parjabekkhaker Drishtite : Scripte-Faiz Ahmed Read out by Kamal Eohani
8-58 ” Khabar Shironam
9-00 ” Kothika : জঙ্গীশাহীর পদলেহীদের উদ্দেশ্যে
9-10 ” Jeebantika : Gram Bangla
9-28 ” Khabar Shironam
9-30 ” Sanghad Parjalochana : Script by-Amir Hossain
9-40 ” Sangect-O-Slogan
9-50 ” Khabar : Bangla
10-00 ” Samapti.

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a)Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O-Anubad
(c) Anusthan Parichiti
7-10 ” Khabar: Bangla
7-20 ” Khabar : English
7-30 ” Sangeet-O-Slogan

7-40 ’’ Kothika : একটি আলেখ্য-জলি জাহানুর
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ : সাধন কুমার ধর
7-58 ’’ Khabar Shironam
8-00 ’’ Kothika
8-10 ’’ Sangeet
8-15 ’’ Kothika : বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ : মহাদেব সাহা, পাঠক : শহীদুল ইসলাম
8-22 ’’ Nazrul Geeti Khabar
8-28 ’’ Khabar Shironam
8-30 ’’ দৃষ্টিপাত : ডা. মজহারুল ইসলাম
8-40 ’’ Bajrakantha-O-Slogan
8-42 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
8-45 ’’ Khabar : Urdu
8-50 ’’ Khabar : Bangla
9-00 ’’ Samapti.

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১
দ্বিতীয় অধিবেশন

1.00 P.M. Udbodhani-O- Anushthan Parichiti
1-05 ’’ Khabar: Bangla
1-05 ’’ Khabar: English
1-25 ’’ Sangeet
1-30 ’’ Biswa Janamat: Script - Sadekin
1-37 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
1-40 ’’ Sahitya Anushtahn : Rakta Swakkhar/Swarochita Kabita Nirmalendu Gun
1-50 ’’ Sangeet
1-58 ’’ Khabar Shironam
2-00 ’’ Kothika :
2-07 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
2-10 ’’ Kothika : Parjabekkhaker Drishtite (পুনঃপ্রচার)
2-20 ’’ Sangeet
2-28 ’’ Khabar Shironam
2-30 ’’ Pallygeeti Puthipath : Muhammad Shah Bangali

(a) Bajrakantha-O- Slogan
(b) Kothika : ঢাকায় স্বাধীনতার সূর্য- দীপ্তি লোহানী
c) Sangeet

2-40 ’’ Kothika : Ranangan Ghure Elam : Musa Sadek
2-50 ’’ Khabar Bangla
3-00 ’’ Samapti.

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঈদের দিন

প্রথম অধিবেশন :

7-00 A.M. (a)Udbodhani
(b) Quran Tilawat-O- Anubad
(c) Anuslhan Parichiti
7-10 ’’ Khabar : Bangla
7-20 ’’ Khabar : English
7-30 ’’ Sangcct-O-Slogan
7-40 ’’ Kothika : Desh Gathane Narir
Bhumika : Parveen Akhtar
7-47 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
7-50 ’’ Kothika : Moder Garab Moder Asha : Asad Chowdhury
7-58 ’’ Khabar Shironam
8-00 ’’ Kothika : Drishtikon : Abu Toab Khan
8-10 ’’ Sangeet
8-15 ’’ Kothika : Satyer Jhankar : Pranab Chowdhury
8-22 ” Nazrul Geeti
8-28 ” Khabar Shironam
8-30 ” Kothika : Surja Shapath : Rezwanul Huq Chowdhury
8-35 ” Jantra Sangeet-O-Abritti from Shamsur Rahman or Sukanta by Mustafa Anwar
8-40 ’’ Bajrakantha -O- Slogan
8-42 ’’ Jantra Sangeet-O-Slogan
8-45 ’’ Khabar : Urdu
8-50 ’’ Khabar : Bangla
9-00 ’’ Samapti.

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P. M. Udbodhani-O-Anushthan Parichiti
7-05 ’’ Khabar: Bangla
7-15 ’’ Khabar: English
7-25 ’’ Sangeet
7-30 ’’ Agnishikha :
৭-৩০ ’’ তোরা সব জয়ধ্বনি করঃ বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
৭-৪২ ’’ এই ঢাকা এই রাজধানীঃ বিশেষ জীবন্তিকা

d) Abritti : Shahidul Mam
e) Jaritra Sangeet-O-Slogan f) Kothika : বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য : Shamim Chowdhury
g) তোরা সব জয়ধ্বনি করঃ কোরাস গান
h) Juddher Khahar

8-10 ” Orchestra
8-15 ” Urdu Anusthan : Conducted by Zaheed Siddique
a) Kothika by Shahidur Rah man
b) Khabar
8-28 ” Khabar Shironam
8-30 ” English Programme
8-50 ” Parjabekkhukcr Drishtitc : Faiz Ahrned
8-58 ” Khabar Shironam
9-00 ” Kothika : Charampatra : M. R. Akhtar
9-10 ” Jeebantika : Written by Kalyan Mitra
9-28 ” Khabar Shironam
9-30 ” Sanghad Parjalochana : Amir Hossain
9-40 ” Sangeet-O-Slogan
9-50 ” Khabar : Bangla
10-00 ” Samapti.

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশন :
সকালঃ

৭-০০মিঃ ক. উদ্বোধনী
খ. কোরান তেলাওয়াত ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১০ ” খবর : বাংলা
৭-২০ ” খবর : ইংরেজী
রচনা : টি,এইচ সিকদার।
৭-৫২ ” (ক) অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
(খ) বিজয় নিশান উড়ছে ওইঃ বিশেষ সঙ্গীত।
৮-০০ ” শ্লোগান ও গান (স্বাধীন স্বাধীন......)
৮-০৫ ” প্রধানমন্ত্রীর সাথে ‘দি পিপল’ পত্রিকার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার
৮-১০ ” বাংলার মাটি বাংলার জল : রবীন্দ্র সঙ্গীত
৮-১৫ ” চরমপত্র : এম,আর, আখতার
৮-২৫ ” দেশাত্মবোধক গান
৮-৩০ ” যন্ত্রসঙ্গীত ও শ্লোগান
৮-৩৫ ” বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নিয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণা।
৮-৪০ ” দেশাত্মবোধক গান
৮-৪৫ ” খবর : উর্দু
৮-৫০ ” খবর : বাংলা
৯-০০ ” সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১-০০ মিঃ উদ্বোধনী ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
১-০৫ ” খবর বাংলা
১-১৫ ” খবর ইংরেজী
১-২৫ ” সঙ্গীত
১-৩০ ” বাংলার মুখ : কথিকা-সাদেকীন
১-৩৭ ” বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে প্রশাসনিক পুলিশ অফিসার নিয়োগ সম্পর্কিত ঘোষণা।
১-৪২ ” সাহিত্যনুষ্ঠান : স্বরচিত কবিতা আবৃতিঃ মোহাম্মদ রফিক ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপ

১-৫০ ” সঙ্গীত
১-৫৮ ” খবর শিরোনাম
২-০০ ” ....
২-০৭ ” যন্ত্রসঙ্গীত ও স্লোগান
কথিকাঃ বদরুল হাসান
c) Sangeet: ও আমার দেশের মাটি
d) Abritti
c) Jantra Sangeet-O-Slogan

২-১০ ” বহু ইতিহাসের নগরী ঢাকাঃ কথিকা-
জয় বাংলা পত্রিকার কাটিং.........
২-২০ ” সঙ্গীত
২-২৮ ” খবর শিরোনাম
২-৩০ ” পল্লীগীতি/পুঁথিপাঠ
২-৪৫ ” বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক
পুলিশ অফিসার নিয়োগ সম্পর্কিত
ঘোষণা
২-৪৬ ” সঙ্গীত
২-৫৩ ” খবরঃ বাংলা
৩-০০ ” সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশনঃ

7-00 P.M. Udbodhani-O-Anushthan
Parichiti
7-05 ” Khabar: Bangla
7-15 ” Khabar: English
7-25 ” Sangeet
7-30 ” Agnishikha : Condt. by
Ashraful Alam
(a) Bajrakamha-O- Slogan
(b) দর্পন : আশরাফুল আলম
Kothika : Mohadeb Sana
g) Kothika
h) Sangeet
i) Juddher Khabar
8-10 ” Orchestra
8-15 ” Urdu Anusthan :
a) Kothika / Jibantika
b) Khabar
8-28 ” Khabar Shironam
8-30 ” English Programme
8-50 ” Parjabekkhaker Drishtite:
Script by Faiz Ahmed, Read
out by Kamal Lohani
8-58 ” Khabar Shironam
9-00 ” Kothika / Drishtikon : by Abu
Toab Khan
9-10 ” Patriotic Song
9-28 ” Khabar Shironam
9-30 ” Sanghad Parjalochana:
Mustafizur Rahman
9-40 ” Sangeet-O-Slogan
9-50 ” Khabar: Bangla
10-00 ” Samapti.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	২৬ মে-৫ জুন, ১৯৭১

বাংলা সংবাদ

২৬-৫-৭১

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন,স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি।

(২) ওয়ার অন ওয়ান্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বৃটিশ এম-পি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন।

(৩) বুদাপেস্টের শান্তি সম্মেলন বাংলাদেশে পাকিস্তানী হামলার নিন্দা করেছে।

(৪) মুক্তিফৌজ গানবোট দখল করেছে, কালভার্ট উড়িয়ে দিয়েছে, পাক ফাঁড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।

(৫) আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে।

(৬) বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন।

(৭) পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রধান উ থান্টের কাছে বাংলাদেশের বৌদ্ধহত্যার কাহিনী জানিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করে নেওয়ায় মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসার নিশ্চয়তা। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে পাক সৈন্য সরিয়ে নিতে পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের জনৈক বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহায্য দানের জন্য বিশ্ব সরকারসমূহের প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল যে আবেদন জানিয়েছেন সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বিরাট সংখ্যক নির্যাতিত ও নিগৃহীত মানুষ যে পাক-দস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়েছে উ থান্টের আবেদনে তার স্বীকৃতি রয়েছে। সেক্রেটারী জেনারেলের বিবৃতি থেকে এও প্রতীয়মান হয়, কি নিদারুন পরিস্থিতিতে মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আশা প্রকাশ করে বলেন যে উ থান্ট বাংলাদেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নেবেন যে পরিবেশে দেশত্যাগী শরণার্থীরা পূর্ণ মর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আবার দেশে ফিরে আসতে পারবেন। উক্ত সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার এ বক্তব্যের দ্বারা আমি এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে জাতিসংঘ পাকিস্তান সরকারের উপর এমন একটা চাপ সৃষ্টি করবে যে চাপের মুখে বাংলাদেশ থেকে

পাক হানাদার বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা

ফিরে আসার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সে অবস্থাতেই দেশত্যাগী লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু স্বদেশে ফিরে আসতে পারবে।

বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী ৫৫টি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করেছেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের এবং গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ রয়েছেন।

আবেদনে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যদানের জন্য এবং তারা যাতে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেন সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সরকারসমূহের ও জনগণের প্রতি অনুরোধ জানান হয়েছে। তারা বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সামরিক শাসক-চক্রের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তারা পাক সামরিক শাসকচক্রের প্রতি আহ্বান জানান। তারা সিয়াটো-সেন্টো জোটের মার্কিন এবং অন্যান্য সদস্যরা যাতে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করেন তার জন্যও দাবী জানিয়েছেন। বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম. এ. সামাদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বর্তমানে লণ্ডনের পথে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিলেতের War on Want প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মিঃ ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ এবং শ্রমিক দলের পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ মাইকেল বার্নস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠক প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে বৃটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান বলতে বৃটিশ পার্লামেন্ট কি বোঝাতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ এম, পি-র কাছ থেকে বিশদ ব্যাখ্য দাবী করে বলে জানা গেছে। বৃটিশ নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়নকেই তাঁরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান বলে মনে করেন। বাংলাদেশ থেকে বাঙালীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটা শাসন চাপিয়ে দেওয়ার নাম রাজনৈতিক সমাধান নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তিবাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় সদর দফতর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, মুক্তিফৌজ এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর পাকিস্তানী সেনাদের একখানা গানবোট দখল করে নিয়েছে। গানবোটযোগে খানসেনারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। গানবোটের আরোহী সব ক'জন খানসেনাই পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুক্তিবাহিনী জোয়ানেরা বরিশালে একটি থানা আক্রমণ করেন এবং বাঙ্গালীর দুশমন খানসেনাদের কয়েকজন স্থানীয় দোসরকেও হত্যা করেন।

রংপুর সেক্টরে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি দল ধরলা অতিক্রমের চেষ্টা করলে মুক্তিফৌজ তাদেরকে বাধা দেয়। সংঘর্ষকালে বেশ কয়েকজন খানসেনা নদীতে ডুবে মারা যায়।

রাজশাহীর কাছে একটি কালভার্টে মুক্তিফৌজের স্থাপিত মাইন বিস্ফোরিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি জীপ ধ্বংস হয়েছে। জীপের আরোহীরা গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিলেট সেক্টরে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের একটি কনভয়ের উপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালায়। এতে শত্রুপক্ষের ৭ খানা যানবাহন ধ্বংস হয়। বিয়ানীবাজার এবং বরলেখায় মুক্তিফৌজ খানসেনাদের ১৭ জন স্থানীয় দালালকে হত্যা করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি কুমিল্লার কসবা অঞ্চলে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ একটি পাক-হানাদার বাহিনীর উপর হামলা চালায় এবং তাদের হটিয়ে দেয়।

এই অঞ্চলে মোন্দেভাগ নামক এক জায়গায় পাক-হানাদারদের একটি ট্রলি বোঝাই অস্ত্র আর খাদ্যদ্রব্য যাচ্ছিল। মুক্তিফৌজ সেটি আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছেন। বল্লবপুরে পাক-ঘাঁটির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে মুক্তিফৌজ দু'জন প্রহরীকে হত্যা করেছেন। কাঁঠালবাড়িয়াতে মুক্তিফৌজের হামলায় পাক-বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন পাক-হানাদার খতম হয়েছে। ময়মনসিংহ এলাকার শ্রীবর্দীতে মুক্তিফৌজ একটি পাকা সেতু উড়িয়ে দিয়েছেন।

সিলেট সেক্টরে দু'টি পাক-ঘাঁটি মুক্তিফৌজ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই ঘাঁটি দুটির নাম জামকান্দি ও লালাপুঞ্জি। কুমিল্লায় বিবিরবাজারে মুক্তিফৌজ মাইন ফেলে পাক-হানাদারদের একটি ট্রাক বিধ্বস্ত করেন। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। হিলি আর পাচবিবির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের মুক্তিফৌজ বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন।

চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর এলাকায় যুক্তিসংগ্রামরত বাঙালী ছাত্ররা পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়েছে। পোস্টারের ভাষা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার সেনাদের খতম কর- ওদের খতম কর- খতম কর। অবিলম্বে বাংলাদেশ ছেড়ে না গেলে হানাদার সৈনিকদের সবাইকে খতম করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭২তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে আলোচনা সভা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আজকের সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নজরুলের উপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মিঃ জ্যোতিপাল মহাথেরো জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে বাংলাদেশে পাক সৈন্য কর্তৃক বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের সংবাদ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে পাক সৈন্যরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। এই হত্যাকাণ্ড থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বাদ যাচ্ছে না। মহাথেরো জানিয়েছেন, বৌদ্ধদের গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। মহাথেরো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের রক্ষা করার জন্য উ থান্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ইংরেজী সংবাদ

26-5-71

1. Syed Nazrul Islam, the acting President of people's Republic of Bangladesh, said: In the recognition of the freedom and sovereignty of Bangladesh, lies the key to the restoration of normalcy this part of the world.

2. The Chairman of the war on want organization and a Labor M.P. had called on the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed.

3. The Budapest Peace Conference condemned the Pakistani atrocities in Bangladesh.

4. The 72nd birthday of Poet Nazrul Islam is being celebrated throughout Bangladesh today.

5. The Liberation Forces captured a gunboat, shattered a culvert and burnt Pakistani check posts.

6. The Chief of the Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha has cabled U Thant about the plight of the Buddhists in Bangladesh.

7. Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a Bangladesh special envoy to the U. N. O. has proceeded to New York.

8. Terrors talks every corner of East Bengal today, says the London Times.

9. The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday.

The acting President of the People's Republic of Bangladesh, Syed Nazrul Islam has said that in the recognition of the independence and sovereignty of Bangladesh lies the key to the restoration of normalcy in that part of the world. He has expressed his hope that the United Nations will not fail to bring in pressure on the Pakistani Government to pull Pakistani forces out of Bangladesh.

The acting President of Bangladesh was talking lo a special correspondent of United Press International.

While commenting on the Secretary General U Thant's appeal seeking relief for the Bengalee evacuees in India, Syed Nazrul Islam said that the appeal of U That is an admission' that a large number of Bengalees had to leave their hearth and home under a terrible situation perpetrated by the military junta of Pakistan. The unbearable circumstances that warrants the people to leave their homeland is also evident in the Secretary General's appeal itself.

Syed Nazrul Islam told the U. P. I. correspondent that he hoped the Secretary General of the U. N. O. will take up the responsibility of creating such conditions inside Bangladesh to enable the evacuees to return home. By this he meant that the U. N. O. should bring pressure upon the Pakistani Government so that the Pakistani Occupation Army is withdrawn from Bangladesh and the freedom and sovereignty of Bangladesh is recognized. Only in that condition can normalcy be restored in Bangladesh.

The Chairman of the War on Want organization of England, Mr. Donald Chessworth and a Labor Party M. P., Mr. Michael Burns called on the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Tajuddin Ahmed yesterday. The British leaders spent at least three hours with our Prime Minister and discussed points of mutual interest. The Question of recognition of Bangladesh by the British Government is believed to have

figured prominently in the discussions. Our Prime Minister Mr. Tajuddin Ahmed wanted to know from the British leaders what they understood by a political settlement of Bangladesh issue. The British leaders told the Prime Minister that fulfillment of the hopes and aspirations of the majority of people in Bangladesh is considered to be the political settlement of the Bangladesh issue. They said that by driving a considerable number of Bengalees out of their own country, a political solution cannot be imposed on them in any case.

125 representatives of 55 participating countries in the World Peace Conference in Budapest have jointly issued an appeal to the world governments to extend relief and succour to the Bengalee evacuees in India. The conference also invoked the good offices of the world governments to create a situation congenial for the evacuees to return home. The signatories of the appeal consists of Ministers, Members of Parliament, lawyers, doctors and leaders of Afro-Asian freedom fighters and neutral powers. They held the Government of Pakistan responsible for the unprecedented carnage and genocide in Bangladesh and condemned the action with all the emphasis at their command. They have called upon the Pakistan military junta to be respectful to the democratic hopes and aspirations of the people of Bangladesh. They have also called upon the United States sponsored SEATO and CENTO Organizations to stop helping Pakistan's ruling military Junta. Mr. M. A. Samad. M. N. A, has represented Bangladesh in this peace conference in Budapest. He is now supposed to be on his way to England.

An Awami League Working Committee Member, Mr. Molla Jalaluddin. M. N. A, is presently touring Patna. He held talks with State Government leaders and will continue to do so during his stay there.

The news is coming to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

Reports reaching here from the Southern sectors of the Liberation Army, suggests that after a tense fighting the Liberation Army has captured an enemy gunboat which was patrolling the coastal areas of Barisal. AM the Pakistani troops in the gunboats were drowned in the water. The jawans of the Liberation Army made a severe attack on a Police Station in the District of Barisal, captured it and vanquished the local quislings.

In the Rangpur sector. Pakistani Force were taken to task when they were trying to cross the River Dharla. Near Rajshahi a culvert has been blown away due to a mine operation and an'enemy jeep was destroyed. In the Sylhet sector the Liberation Army conducted a guerilla attack on an enemy convoy. Seven enemy trucks were destroyed in the operation.

In the Kasba sector, the Mukti Fouj, attacked an enemy lorry full of ammunition and food and set fire to it. The Ballabpur Pakistan outpost was suddenly attacked by Mukti Fouj and two of its guards were killed. At Kathalbaria, a Pakistan army Captain and a few of his followers were killed. At Sreebardi. the Mukti Fouj has successfully blown a concrete bridge. In Jamkandi and Lalapunji, two Pakistani outposts were burned by the Mukti Fouj. At Bibirbazar of Comilia sector, an enemy lorry was destroyed by mine operation.

The President of Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha and Pakistan Region Centre for the World Fellowship of Buddhists, Mr. Jyotipal Mohalhero, sent a cable to Thant the Secretary General of the U. N. O. describing the plight of the Buddhists Bangladesh. He invited protection for the Buddhists of Bangladesh immediately from the world organization. The cable said : "Many Buddhists including Bhikkus of East Bengal brutally killed by Pakistani troops : Temples demolished. Buddhist villages burnt to ashes. Property looted by miscreants actively aided by Pakistani troops. Please arrange for their protection."

Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, a special envoy of the People's Republic c Bangladesh to the U. N. O. has gone to New York from London to take up his assignment. He will present the case of Bangladesh to the Council of Nations. Mr. Justice Choudhury will also present a pen-picture of the planned genocide and preconceive) extermination of the youth and intellectuals in Bangladesh by the belligerent Pakistani Army, to the press and people of the U. S. A.

All over Bangladesh the 72nd birthday of the Rebel Poet, Nazrul Islam is being celebrated today. The cultural and social organizations of Bangladesh have drawn up various programmes like seminars, cultural functions etc. in the occasion. The Swadhin Bangla Betar Kendra will broadcast a special programme on Nazrul Jayanti in its evening transmission today.

The Times of London has carried an exhaustive on the grim social conditions prevalent in Bangladesh today. Times correspondent Peter Hazelhurst writes : Terror stalks every corner of East Bengal today. Millions of people have been left homeless, famine is around the corner and there are not enough doctors left to combat an expected epidemic.

The Soviet President Mr. Podgorny arrived in Cairo yesterday on a two day visit for talks with President Anwar Sadat on the latest Middle East crisis.

More than £1 million donated by the British public for the victims of a cyclone disaster in Bangladesh last November is still lying in Banks in London even after six months after the catastrophe. Oxfam, one of the largest British relief agencies, says that the money is lying idle because the Pakistan Government has refused to allow relief workers into the area,

---

27-5-71

* * * *

The Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh has said : We wanted to establish democratic rights of the people in Pakistan and to that end we tried our best.

When all our peaceful attempts were tailed and on the night of" the 25th of March Yahya's army most shamelessly cracked down on the unarmed people of Bangladesh, we had no alternative hut to proclaim independence of Bangladesh to safeguard the very entity of 15 million democratic Bengalees of Bangladesh.

Our Prime Minister was talking to a correspondent of the Times of London. He said What I cannot understand is how the democratic govt. of the world could afford to continue supporting a dictatorial regime of a military junta in preference to a nation involved to the last in a democratic struggle for survival with democratic values of life and hopes of a statehood.

West Pakistan will be bankrupt by the end of the Summer and will be unable to sustain its struggle against Bangladesh according to leading economist of Pakistan. Dr. Robert Dorfman, the Harvard economist, said yesterday that West Pakistan cannot continue without some kind of aid from outside which can be diverted towards military efforts in Bangladesh. He said : It appeared that West Pakistan was desperately seeking a moratorium on its dept installment which fall due this month. Therefore the continued flow of American grants and loans is the most immediate objective in West Pakistan strategy, more important by far than any military operations. He said that the U. S. A should therefore refuse to finance any military operations.

The Pakistani arrogance has at last been swallowed by them when they agreed to accommodate representative of Secretary General U Thant, to coordinate relief work in Bangladesh. This was made clear in a letter from the Pakistani representative in the U. N. O. Mr. Agha Shahi. The letter was published in the U. N. O headquarters yesterday. Previously no less a person than the President of the now defunct Pakistan, himself declined to accommodate such representatives of the U. N. O.

The Soviet Communist Party Paper, Pravda, today highlighted the firing by the Pakistani army into Assam on Monday, thus reflecting Soviet concern over growing tension in that region. The report depicted the incident as an act of provocation on the part of the Pakistani Army in occupation of East Bengal.

The U. N. O. Secretary General U Thant has expressed his final decision not to contest for the office for another term.

The Indian Prime Minister. Mrs. Indira Gandhi, appealed to the world community to intercede for restoration of peace and democracy in Bangladesh. She was replying to a 8 hr. long debate in the Indian Lok Sobha yesterday. She emphasized that the refugee influx and other developments caused by Pakistan's calculated genocide in Bangladesh threatens the peace and security of India and indeed of South-East Asia.

The Soviet President Podgorny accompanied by his military, economic, and political aids has started discussion with his Egyptian counterpart President An war Sadat. Podgorny reached Cairo on Monday last and met the Egyptian President in the night. The meeting continued yesterday.

Yahya's occupation government could not clear the salaries of the government officials for the month of May even today. Some lump sum were doled out to officials in certain areas the dole did not reach.

The Awami League quarters has ruled out the possibility of any negotiated settlement of the Bangladesh issue and said whoever tries to that end will be totally rejected by the people of Bangladesh. The attention of this quarter was drawn to a U. S. State Department spokesman claiming recently that an emissary of Yahya Khan had suggested formula for a compromise solution. The Awami League circle emphatically told. Bangladesh is a free and sovereign country today and there is no fresh scope for talks.

The Bangladesh Government sources said that the chief of the Bangladesh mission in Calcutta, Mr. Hossain Ali called on Poet Nazrul Islam yesterday to pay respect on behalf of the 75 million people of Bangladesh on the occasion of his 72nd birthday. Mr. Hossain All accompanied by his wife, went to visit the poet yesterday morning and garlanded the poet on behalf of the people of Bangladesh.

In a brief statement in the poet's house, Mr. Hossain AM said : "A terrible carnage is on in the beloved land of Poet Nazrul Islam today. The people of Bangladesh have waged a war of independence against an occupation Army. Insha Allah we shall be victorious."

2-6-71

This is Swadhin Bangla Betar Kendra.

Here is the news read by Parveen Hossain.

1. The foreign banks in Pakistan have declined to underwrite letters of credits from Pakistan.

2. The 3-member Bangladesh Parliamentary delegation has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi.

3. Khan Abdul Ghaffar Khan has blamed the power hungry rich classes of West Pakistan for the crisis in Bangladesh.

4. Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Jhikargacha on Monday last.

5. Moulana Bhashani said : Freedom is the only goal of the people of Bangladesh.

The foreign monetary institutions have raised an alarm with regard to Pakistan's credibility abroad and have declined to underwrite letters of credit from Pakistan.

The foreign banks have also demanded 100% deposits for such purposes.

The Pakistani businessmen have told by the bank officials that they have taken this step due to the grave economic crisis of Pakistan.

A leading export-import businessman told Pakistani newsmen yesterday that an American bank had first demanded 100% deposit as a condition for opening letters of credits for imports from the U. S. A.

The Swiss and Japanese banks have also refused to issue letters of credit to Pakistani businessmen.

Another businessman is reported to have complained that the Japanese banks have gone to the extent of demanding a guarantee by banking establishments in England because the Ministry of Trade in Japan has stopped exporting insurance orders for Pakistan.

The refusal of foreign banks to issue letter of credit has created a scare among the West Pakistani business community.

The three-member Bangladesh Parliamentary delegation, headed by Mr. Phani Majumder has met the Indian President and the Prime Minister in New Delhi. The legislators from Bangladesh, including Mrs. Noorjahan Morshed and Shah Moazzem Hossain, also addressed the members of the Indian Parliament yesterday at the Parliament House. A spokesman of the Foreign Office of the Government of Bangladesh, told us: In the course of their 45 minutes talk with Mrs. Indira Gandhi, the Indian Prime Minister, the members of the Bangladesh delegation discussed the problems relating to the refugee problem created in India by the West Pakistani atrocities in Bangladesh.

They also discussed the question of recognition of the Bangladesh Government.

The Indian President, Mr. V. V. Giri, gave them a hearing for about 20 minutes and discussed various matters relating to Bangladesh.

The three legislators from Bangladesh, while addressing the Indian Parliament, made an impassioned appeal for the recognition of Bangladesh by the Government of India. They put before the Indian Parliamentarians the background of the Bangladesh issue, its exploitation by the West Pakistani rulers, the discrimination meted out to the majority people and finally the reign of terror let loose by the West Pakistani army on the innocent people of Bangladesh,

Addressing the Indian M.P.s Mr. Phani Majumdar said: Bangladesh stands for democracy, secularism and socialism. He called upon the Indian Government, to recognize the Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Majumdar also urged the Indian M. P. s to take up the question of the release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at every national and international forum.

Mrs. Noorjahan Morshed, while referring to the talk of political settlement, said': If, is to be a political settlement, it will have to be on our terms. And that is complete; withdrawal of the West Pakistani Army and the Liberation of Bangladesh.

Mr. Shah Moazzem Hossain, in his speech before the Indain M, P.s described the discrimination the people of Bangladesh, who constituted the majority, had suffered since the creation of Pakistan. He said: It is the rulers of Pakistan who have disintegrated Pakistan. They have killed Pakistan; we are only burying it. Mr. Moazzem Hossain said: Pakistan, with its two wings separated, and having nothing in common between the people of the two wings except religion, could not sustain without the will of the people. Such a will could develop only when all were treated an equals and not as slaves.

Mr. Moazzem Hossain gave a description of the killing unleashed by Yahya Khan's Army. He said : about five lakhs of people have been killed in Bangladesh. In his speech, Mr. Moazzem Hossain also appealed to the Indian Government to offer diplomatic recognition to the Government of Bangladesh.

This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news,

The Pakhtoon leader. Khan Abdul Ghaffar Khan, has blamed the aggressive, power-hungry, rich class of West Pakistan for the present crisis in Bangladesh.

Reporting this, the Kabul daily 'Caravan' says : The Frontier Gandhi Khan Abdul Gaffar Khan, is prepared to leave for Bangladesh to mediate between the Awami League and the West Pakistani leaders.

The Pakhtoon leader has also said : He has been asked by the Pakistan Council in Jalalabad to visit Pakistan and have meeting with President Yahya Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan is reported to have rejected this Pakistani offer and has declined to meet a military dictator of Pakistan.

Mr. M. Mansoor Ali, Minister for Finance. Govt. of the People's Republic of Bangladesh, has today proceeded for a trip to the eastern part of Bangladesh. During his stay there, he is expected to meet the Awami League M.P.A.s and M, N.A.s, leaders and workers.

The freedom fighters of Bangladesh are reported to have intensified guerilla activities m Rangpur, Comilla and Dacca sectors. A number of bridges on the railway line between Lalmanirhat and Keknia, have been blown up, dislocating railway communications for the Pakistani troops. In the Lalmonirhat-Kurigram area, freedom fighters have continued to harass the Pakistani troops by frequent commando raids. It is reported, in a recent encounter, the Liberation Forces killed 6 Pakistani soldiers and destroyed an enemy jeep at Lalmonirhat.

In the Dacca sector, the freedom fighters are reported to have exchanged fire recently with a Pakistani Army patrol, northeast of Mymemsingh. The Liberation Forces have

also successfully prevented (he Pakistani troops, from crossing the River Dharla. The enemy troops retaliated by burning down villages and attacking the civilian population.

In the Comilla sector, the Liberation Forces damaged two Railway bridges near Akhaura to disrupt the movement of the Pakistani Army. In Comilla the Pakistani troops are reported to have molested and abducted women after killing a number of people. The Pakistani soldiers also shot dead about 300 people, south of Chandpur. In Jessore, the local population killed two Pakistani soldiers recently.

Road and rail communication between Dacca and Chittagong have not yet been restored. Our Mymensingh correspondent reports: The freedom fighters have dislodged Pakistani troops from Mymensingh's Tawakucha border outpost.

Four young freedom fighters killed three Pakistani agents at Ganganandapur in Jhikargacha Thana on Monday last. These agents included the local President of the Anjuman-e-Muhajarian, A. Samad and two sub-inspectors of Jhikargacha Police Station. It is reported these Pakistani agents, with the help of the local goondas, were loading a jeep with articles looted from the civilians, when the four freedom fighters launched a surprise attack and killed three of them. The freedom fighters seized a few rifles and a light machine gun. The enemy jeep was captured and the dead body of a killed agent was also brought by the freedom fighters.

This news broadcast comes to you from Swadhin Bangla Betar Kendra.

The National Awami Party leader, Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, has ruled out the possibility of coming to a political settlement of the Bangladesh issue. In clear cut terms the Moulana declared: Our fight against Pakistan will continue to the last. Either we win or we die.

He said: Even if attempts are made for a political settlement either by someone in Bangladesh or abroad, the 75 million people of Bangladesh will reject it outright. The reason is that the people have lost their faith in the Pakistani Government, more so after its recent atrocities perpetrated on the people of Bangladesh, which is something unheard of in human history.

The Moulana said : He would not mind a referendum being held under the U.N. auspices to ascertain the wishes of the people of Bangladesh. He said : He is sure that not even 1% of the people will vote against independence,

The Moulana has also called upon such countries like the U.S.A., U.S.S.R., Britain and China, which are friendly to Pakistan, to send out their journalists to make an independent study of the Pakistan Army's atrocities in Bangladesh. Declaring his support to the Awami League leadership, Moulana Bhashani said : Nothing should be done to provide an opportunity to the Pakistan Government to divide and rule the people of Bangladesh.

(This is Swadhin Bangla Betar Kendra giving you the news.)

The Bangladesh emissary, Mr. Abdus Samad, now on a visit to Moscow, has said that Yahya's appeal to the evacuees to return to Bangladesh from India has been made only to mislead the people of the world. He said : While the West Pakistani troops continue genocide and barbaric atrocities in Bangladesh, this appeal from Yahya Khan is nothing but a cruel gesture.

Mr. Samad has been touring different countries of Europe for the last three weeks to give a clear picture of the Bangladesh situation to European leaders.

And that is the end of the news.

5-6-71

This is Swadhin Bangla Betar Kendra.

The news read by Parveen Hossain.

1. Widespread condemnation of Pakistani Army's inhuman atrocities upon the innocent people of Bangladesh, has been reported from different corners of the world.

2. The Pakistani Government has at long last accepted the humiliating position of standing defaulter to its creditor countries as a sequel of its war of Bangladesh.

3. The correspondent of the Dally Telegraph reports that the Pakistani army fears a Vietnam type guerilla warfare in Bangladesh.

4. The Freedom Fighters of Bangladesh continue launching massive attacks upon the Pakistani aggressors in all sectors.

5. Radio Australia reports : A Roman Catholic Archbishop of Calcutta, has confirmed that at least three priests have been killed by the Pakistani Army in Bangladesh in the past two months.

Widespread condemnation of the Pakistan Army's inhuman atrocities upon the innocent people of Bangladesh has been reported from different corners of the world. More and more people of the world are expressing their sympathy and support for the people of Bangladesh.

The World Federation of the United Nations Associations has expressed grave concern over the genocide committed in Bangladesh by the West Pakistani mercenaries. The 23rd Plenary Assembly of the Federation held in Luxemburg, has adopted a resolution condemning Pakistan for the massacre in Bangladesh. The Pakistani Ambassador to Belgium, was also not permitted to attend the Assembly session. The

Assembly of the World Federation of the U.N. Associations was attended by delegates from 52 countries of the world including U.S.A. U.S.S.R. Britain, Poland, Italy, Yugoslavia, Australia and Ghana. A spokesman of the Federation has said : It is significant that all delegates were very much vocal in condemning the unfortunate killing f hundreds of thousands of people of Bangladesh.

The Venezuelan Chamber of Deputies have called upon the U.N.O. and other international organizations in demanding that the military Government of Pakistan aspect the human rights of the people of Bangladesh. They have also urged the world bodies to put pressure upon Pakistan to facilitate the return of the Bengalee evacuees who, as to flee from Bangladesh following the bloody repression by the Pakistani Army. In a resolution unanimously passed by the 214 members of the Venezuelan Chamber of Deputies have deplored such acts of violence as have occurred in Bangladesh, and particularly acts of genocide against the Bengalee population.

Thailand has suspended the supply of aviation fuel to Pakistan as a mark of protest against the mass killing in Bangladesh by the West Pakistani soldiers. The Thai Foreign Ministry has announced his Government's inability to supply aviation spirits to Pakistan "or military operation against the 75 million innocent people of Bangladesh. The Thai leaders are also reported to be keeping themselves informed about the situation in Bangladesh.

The Vatican daily, 'Observatory Romano' has expressed the view that the war thrust upon Bangladesh by the army junta of Pakistan could have repercussions of incalculable proportions. In a front page comment the paper said: In order to solve the crisis, Pakistan should immediately stop the war and accept the right of freedom and self-determination of the people of Bangladesh. Otherwise East Bengal will be torn by guerilla war which will have economic repercussions on West Pakistan.

The Pakistan Government has at long last accepted the humiliating position of standing defaulter to its creditor countries as a sequel of its war on Bangladesh. Shamelessly the military rulers of Pakistan, have asked its representatives in the countries concerned to beg debt relief. Reliable sources tell us that Pakistan is currently incurring a loss of Rs. 120 to Rs. 150 million per month, due to what Pakistan calls 'temporary interruptions of export earnings in East Bengal'. Most of the Pakistani missions have been instructed to approach the Governments of their accreditation for the grant of debt relief.

The correspondent of the Daily Telegraph reported on May 20th that Pakistan Army in Bangladesh which claimed a month ago that it had the situation under control. But now they have expressed fear that a Vietnam type guerilla warfare was developing in Bangladesh. Every night, the correspondent says, the freedom fighters carry out about 30 acts of demolitions to disrupt enemy movement and inflict heavy casualties on them. Pakistani senior officers predicted that more intensive guerilla warfare are likely in Bangladesh during the coming Monsoons, the correspondent added.

The freedom fighters of Bangladesh continue launching massive attacks upon the West Pakistani aggressors in all sectors. In a determined bid to crush the enemy, the Liberation Forces have been putting up stiff resistance on all fronts. The freedom fighters are also harassing the Pakistani soldiers by cutting off strategic rail and road points. In all the sectors the Pakistani troops have been confronted with the problem of moving their men.

The liberation forces have blown up a bridge connecting Birol and Kanchan Railway Stations in order to block the movement of Pakistani troops.

Our Rangpur correspondent reported that the freedom fighters launched a surprise attack upon the Pakistani soldiers patrolling a place between Lalmonirhat and Barbari. This operation took a toll of 16 enemy soldiers.

The freedom fighters have blown up the Swarmati Railway Bridge. It is reported that the Liberation Forces also attacked a train carrying Pakistani soldiers and killed ten of them.

The freedom fighters have destroyed two ferry boats on the Bhotmari Ghat of Tista. These boats were being used by the Pakistani Army to move its troops. Due to the disruption of rail and road communications throughout the northern pans of Bangladesh, the Pakistani troops have been faced with a very difficult situation regarding their movement.

Fierce fighting between the freedom fighters and the West Pakistani mercenaries is reported from Amarkhana in the northern sector.

The Liberation Forces also exchanged heavy fire with the Pakistani troops last Friday at Bhurungamari and inflicted casualties upon the enemy. A large number of Pakistani soldiers are reported to have been killed in this engagement. At Dinajpur the freedom fighters launched massive attacks upon Pakistan Army position in several places.

Radio Australia reports: A Roman Catholic Archbishop of Calcutta has confirmed that at least three priests have been killed by the Pakistan Army in Bangladesh in the past two months. The Archbishop is reported to have said that the latest death he has confirmed occurred on May 8 when the Pakistani troops passing in a truck fired on a priest at a church close to the Pakistani border.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ-এর নিয়মিত কথিকামালা (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দালিলপত্র	৩০মে-২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

বিশ্ব জনমত

৩০ মে, ১৯৭১

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকার ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র জনতার উপর যে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে- ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আর সে রতের পর থেকেই শুরু হয়েছে বিশ শতকের ইয়াজিদ ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার যে চক্রান্ত সাবেক পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়েছিলো একাত্তরের মার্চ মাসে ঘটলো তারই নগ্ন প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা তাই আর কোনকিছু রেখেঢেকে রাখতে চায় না। এজন্য তারা কামান-বন্দুক-মেশিনগান-বোমারু বিমান মায় যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বাংগালীদের সামনে একটি মাত্র পথ-সে পথ স্বাধীনতা রক্ষার সশস্ত্র লড়াই। বাংলার বীর জনতা সে দায়িত্ব পালন করেছে। আজ তাই স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। এ সত্য বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার প্রাণের মন্ত্র- বাংলাদেশের বাঁচার শপথ।

বিগত ২৪ বছর বাংলাদেশ শোষিত হয়েছে ধর্ম আর সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠী লুণ্ঠন করেছে বাংলার সম্পদ-ধ্বংস করেছে বাংলাদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড। পাট প্রধান অর্থকরী ফসল। আর এ পাট রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা। কিন্তু পাটচাষীরা তাতে কোনো উপকৃত হয়নি। বাংলার গরীব চাষী-শ্রমিকেরা আরো গরীব হয়েছে- তাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতনের চরম দণ্ড।

বাংলাদেশ এবং বাংলার জনগণকে বাঁচাবার জন্যই আজ তাই শুরু হয়েছে মরণপথ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শরীক বাংলার বুদ্ধিজীবি, বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা সবাই।

বাঙালীরা এ সংগ্রামকে আজ নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষের বিবেক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অধিকাংশ সদস্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বাংলার জনগণের প্রতি তাঁদের সমর্থন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর ফুলব্রাইট এবং আরো কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন- পাকিস্তানের জংগী সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তাকে সমর্থন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সিনেটের বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত কমিটি পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। ইসলামাবাদের খুনী সরকারের বিশেষ দূত এম, এম, আহমদ হয়েছেন প্রত্যাখ্যাত। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর সাথে দেখা করার সকল আবেদন-নিবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ত্বরান্বিত করেছে। যুদ্ধের খরচ দৈনিক দেড় কোটি টাকা। অতএব-চাই-চাই-সাহায্য চাই। সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দেশ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ইয়াহিয়ার দোসর এম,এম, আহমদ কিন্তু সবখানেই ব্যর্থ হয়েছেন- তিনি শূন্য হাতেই ফিরেছেন।

অন্যদিকে যতই দিন যাচ্ছে বাংলা মুক্তিবাহিনীর আঘাত দুর্বার হয়ে উঠেছে। হানাদার শত্রুরা গেরিলা আক্রমণে হয়ে উঠেছে দিশাহারা। সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এগিয়ে আসছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাহায্যে। কয়েকদিন আগে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন। পৃথিবীর বহু দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছেন- বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সর্বাত্মক সাহায্য করবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে।

সুইডেনের সকল রাজনৈতিক দল যুক্তভাবে ঘোষণা করেছেন- বাংলাদেশে ইসলামাবাদের লেলিয়ে দেয়া জল্লাদদের নির্বিচার হত্যালীলা বন্ধ করতেই হবে বাংলার নির্যাতিত জনগণকে। তাদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাঁরা জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। সুইডেনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দল-মত নির্বিশেষে সবাই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের শুভ বিবেকের এই কণ্ঠস্বরকে জানাচ্ছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে- স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের লড়াই আজ তাই সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পীকার মিঃ জাইচেক বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে বাংলাদেশের সপক্ষে আবেদন জানিয়েছেন। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার হানাদার সেনারা বর্বরতা ও নৃশংসতার যে বীভৎস ইতিহাস রচনা করছে- তার তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর উপর অকারণে ইয়াহিয়ার সেনারা যে নির্যাতন চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে আওয়াজ তোলার জন্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। তিনি বলেছেন, বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে- শাসকগোষ্ঠীর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সমর্থন কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষই করতে পারে না।

দেশে দেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হচ্ছে। বিবেকের কণ্ঠস্বর আজ বহু দেশে উচ্চকিত। বৃটেনের শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য মাইকেল বার্ণসও বিশ্ববিবেকের সাথে ঘোষণা করেছেন একাত্মতা। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের নিরস্ত্র অসহায় জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে যে কোন রকম সাহায্য দান বন্ধ রাখুন।'

বাংলাদেশের যে সমস্ত লোক পশ্চিম পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি স্বচক্ষে তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। মিঃ মাইকেল বার্নস বলেছেন, বৃটেনের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

---

১০ জুন, ১৯৭১

হংকং-এর ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

দৈনিক ডন এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমসসহ পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা স্বীকার করেছিলেন যে প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান ও মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আলোচনা চলাকালে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষ একথা প্রচারও করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী

লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি যুক্তিসঙ্গত দাবী মেনে নিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই চারটি দাবী হলোঃ

এক - সামরিক শাসন তুলে নেয়া

দুই - সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

তিন - নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেয়া

চার - সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র জনসাধারণ হত্যার তদন্ত করা।

এই দাবীগুলো মেনে নেয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিতান্ত গোপনে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বিমানযোগে করাচী ফিরে গেলেন। এবং আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করে ও পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এর কোনো যুক্তসঙ্গত ব্যাখ্যাও প্রেসিডেন্ট দিতে পারলেন না। এতে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, আলোচনার নামে সময় নিয়ে ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলায় সৈন্য আমদানী করলেন- যাতে বাংলাদেশের অধিকার-সচেতন মানুষ ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এ সকল কারণে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর প্রতি সকলে সন্দেহ পোষণ করলো।

কানাডার দৈনিক মনট্রিল স্ট্রিট পত্রিকায় বলা হয়েছেঃ

ঢাকার ব্যাপক গণহত্যা পরিকল্পনায় স্বয়ং ইয়াহিয়া খানসহ পাক-সেনাবাহিনীর সব জেনারেল জড়িত ছিলো। মূলত গৃহযুদ্ধ দমনের পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় এই জেনারেলরা পুরোপুরি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই হত্যাযজ্ঞ কেবলমাত্র টিক্কা খানের নিজস্ব ও একক উদ্যোগ নয়- এটা আসলে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে সংঘটিত একটি মিলিটারী অভিযান। বাঙালী হত্যার সামরিক আদেশ সেনাবাহিনীর সকল ইউনিট কমাণ্ডারের কাছে যাতে প্রত্যক্ষভাবে এবং লিখিতভাবে পৌঁছে সেজন্য প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ বিকেল দুটো পর্যন্ত নিজেই খোঁজখবর নিয়েছেন। সন্ধ্যে সাতটায় প্রেসিডেন্ট বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বাসভবন ত্যাগ করেন। রাত ১১টায় ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার গানসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শুরু হয়।

জাপানের ডেলী জাপান টাইমস এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেনঃ পূর্ববাংলায় পাক-সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণেই এই রক্তক্ষয়ী অভিযান চলছে। জাপানের আসাহি শিমবুন পত্রিকা বলেছেন, বাংলাদেশে নিহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও সেখানে যে নির্বিচারে গণহত্যা চলছে, তা নজীরবিহীন।

নেপালের দি নিউ হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্র পূর্ববাংলায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে এবং গণজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে তাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের প্রতি বিশ্ববাসী সহানুভূতি দেখিয়েছেন। মুক্তিকামী জনতাকে এভাবে হত্যার ফলে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক চিরতরে তিক্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর কাণ্ডকারখানার দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, পূর্ববাংলার মানুষ স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এবং তারা প্রাণ দিচ্ছেও।

তুরস্কের ডি ডেলী জুনাইদিন পত্রিকা মন্তব্য করেছেন যে, একদিকে প্রায় এক লক্ষ সুসংগঠিত, সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য, অপরদিকে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সকল বাঙ্গালীকে কখনো কতল করতে পারবে না। বাঙালীর মুক্তি অবধারিত।

১৭ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা ও ব্যাপক গণহত্যা অপরাধকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র এক ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছে। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের গণহত্যার ঘৃণ্য অপরাধ ঢাকা দিতে তারা ‘‘ইসলাম বিপন্ন, ইসলামী দেশ বিপন্ন’’ বলে ধুয়ো তুলেছে। এই ধুয়ো তুলে তারা মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশসমূহের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে। ‘‘ইসলাম বিপন্ন, ইসলামী দেশ বিপন্ন’’ বলে তারা ওইসব দেশের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তানের কবরে শোয়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে। কিন্তু সবরকমের সাবধানতা সত্ত্বেও ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের এই হীন দুরভিসন্ধি ঢাকা পড়েনি। বাংলাদেশে গণহত্যার রক্তাক্ত হাত তারা লুকোতে পারেনি। গোপন করতে পারেনি তাদের জঘন্যতম অপরাধ।

বিভিন্ন আরব দেশের পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা এক যুক্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে যে ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আরব জনগণকে প্রতারিত করার যে চেষ্টা করেছিলো তা ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যার প্রতিবাদে আরব দুনিয়া থেকে এটাই হলো সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি ও প্রতিবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো আবার।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তথা বাঙালীদের বিপুল বিজয়ের বর্ণনা করে বিবৃত্তিতে বলা হয়েছে যে, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবার এবং জনগণের রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইয়াহিয়া বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করেছে। বাংলাদেশের জনগণের উপর গণহত্যা ও পাকবাহিনীর বর্বরতা ঐক্যের ওপর প্রচণ্ডতম আঘাত হেনেছে।

আরব দুনিয়ার এই পাঁচটি প্রভাবশালী যুব সংস্থা বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। বাঙালী মুক্তিসেনাদের বীরোচিত লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করেছে। বাঙালী মুক্তিসেনাদের বীরোচিত লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও সাহায্যদানের জন্যে সংহতিমূলক প্রচার সংগঠিত করার এবং ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনীর গণহত্যার মুখোশ খুলে ধরার জন্য আরব জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরব যুব সংস্থাগুলি দাবী করেছেন যে, বাংলাদেশে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গীচক্রকে বাধ্য করে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

বিবৃতিতে সিরিয়ার ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব ইউথ, ইরাকের ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন, ইয়েমেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আসসালাফি যুব আন্দোলন, সুদানের ইউথ ইউনিয়ন,ও লেবানন ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন ও লেবানন ডেমোক্রেটিক ইউথ ইউনিয়নে নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেছেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের ১২০ জনের বেশী সদস্য বাংলাদেশে গণহত্যার জন্যে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে এককভাবে দায়ী করে এক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন।

বৃটেনের ক্যাবিনেট মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ এই প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর বাংলাদেশে আক্রমণের ফলে উদ্ভূত পরিস্তিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তির পথে মারাত্মক হুমকি ও জেনেভা কনভেনশনের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান

জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকেই প্রকৃত সরকার বলে মর্যাদা দিতে হবে।

মার্কিন প্রতিনিধি সভার এশিয়া বিষয়ক সাবকমিটির চেয়ারম্যান মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাঘার পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে গতকাল একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। মার্কিন সিনেটের এ ধরনের একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এদিকে ইউরোপের বহু দেশ সুস্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে এক তরফা সামাধান চাপিয়ে দিতে পারে না।

সুইডেন, হল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী সমেত ইউরোপীয় দেশগুলি এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপর একতরফাভাবে কোন সমাধান চাপিয়া দিতে পারে না। ইউরোপের এইসব দেশগুলি তাদের মিত্রদেশসমূহের সঙ্গে একত্রে মিলে ইয়াহিয়া সরকারকে তাদের এই মনোভাব জানিয়ে দেবে।

১৯ জুন, ১৯৭১

.... বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ এক মাস ধরে সফরের পর মাত্র কয়েক দিন আগে বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে ফিরে এসেছেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ গিয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ ও সরকারের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারদের ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতার করুণ চিত্রটি তুলে ধরতে এবং দেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের উৎখাতের জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ যে মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে তার প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করতে।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বুদাপেস্ট অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে এই সম্মেলন সার্থক হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য সমর্থনে এই সম্মেলনে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পরিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আইনসঙ্গত ও ন্যায্য সংগ্রাম ও তাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে 'ল্যামব্রাকীস' পদক উপহার দেয়া হয়েছে।

জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বিশ্ব এটাও বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির সমাধান না হলে সমগ্র বিশ্বে এর বিস্ফোরণ ছড়িয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়াশাহীর অবসান ঘটবে। বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা নির্মূল হবে এবং তাদের ধবংসস্তুপের ওপর একটি নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটবে- এই মূল সত্যটি বিশ্ববাসী আজ উপলব্ধি করেছেন।

২০ জুন, ১৯১৭

...পাক সেনারা বাংলাদেশে যে অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠতরাজ ও নারী নির্যাতন চালিয়েছে তাকে 'কতিপয় দুষ্কৃতকারীরা কার্যকলাপ' বলে বিভ্রান্তকর খবর রটিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বের মানুষ তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত

হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত সাংবাদিক, কূটনীতিক, শান্তি ও সমাজসেবী সংস্থাসমূহ এবং পর্যটক প্রকৃত ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা দেখেছেন বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর লোমহর্ষক নৃশংসতার চিহ্ন। ভারতের সীমান্তে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ইয়াহিয়া সরকার ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী বলে বর্ণনা করেছিলো তারা সকলেই যে প্রকৃতই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত এবং ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর অত্যাচারেই যে তারা বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছে এটা তারা প্রত্যক্ষ করেছে। পৃথিবীর সকল দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে এর প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের কোন মানুষই ইয়াহিয়া সরকারের জঘন্য প্রচারে ভ্রান্ত হয়নি।

জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বললেন, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা মানব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়- মানব ইতিহাসের এই কলঙ্ক মুছে দেয়া সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের এই মন্তব্যের কয়েক দিন পরেই জাতিসংঘ ত্রাণ ও সাহায্য দফতরের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খাঁ ভারত সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর শিবিরগুলি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন।

ভারত সীমান্তে শরণার্থী শিবির সফর করার পর সদরুদ্দীন আগা খাঁ নিজেই বললেনঃ বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা নিজেদের জীবন সম্পর্ক কোনোরকম নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত স্বদেশে ফিরতে পারে না। বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এই স্মারকলিপিটিতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা বলেছেন যে, যতদিন পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের মাটিতে থাকবে ততদিন স্বদেশে ফেরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেন, পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আজও সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে, আজও তারা সেখানকার সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘর সহায়-সম্পদ ধ্বংস করছে- নারীর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারদের এই বর্বরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা ও এর অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হবার জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সন ও মার্কিন পরারাষ্ট্র সচিব মিঃ রজার্সের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সিনেটর কেনেডী বলেন, বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের সৃষ্ট এই ভয়াবহ পস্থিতিতে মার্কিন সরকারের নীরবতা মানব ইতিহাসের এক করুন ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিনি বলেন, আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে ইয়াহিয়া সরকার তা সবই বাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

সিনেটর কেনেডী বলেন, আর কালবিলম্ব না করে ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সক্রিয় হতে হবে। বর্তমান জরুরী অবস্থাই ইয়াহিয়া সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রকৃত সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২১ জুন, ১৯৭১

... সম্প্রতি হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী সামরিক তৎপরতার জন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে পাক

হানাদার বাহিনীর হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন বন্ধ করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতি বৈঠকে আহ্বান জানান হয়। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এই মর্মে দাবী জানান যে তারা যেন পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেন।

বাংলাদেশের শরণার্থী প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে এক আবেদনে বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বলেন, যারা মানবিকতার নীতিকে অস্বীকার করে, যারা মানবতাকে হত্যা করে- বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্র, সভ্যতা ও মানবতাকে একসঙ্গে খুন করেছে তাদের ক্ষমা নেই।

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘শান্তি ও মানবতার প্রতি আজও যারা শ্রদ্ধাশীল তাদের প্রক্যেকেরই উচিত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে এমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির দাবী করা, যাতে বাংলাদেশের শরণার্থীরা তাদের স্বদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতিসহ ফিরে যেতে পারেন।’

বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলী পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেছেন। বিশ্বশান্তি সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বাংলাদেশের সংগ্রামকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে বিশ্বের সকল শান্তি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু মানবদরদী ও শান্তি সংস্থা সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন। এইসব তারবার্তায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী যেহেতু ‘মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়’ সেই কারণেই বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অথচ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ইয়াহিয়া সরকার তার বেতার, টেলিভিশন ও কূটনৈতিক মিশনসমূহের মাধ্যমে এই ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রচার করছিলো। বাংলাদেশে তাদের সেনাবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যাতে তারা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর মধ্যে সংঘর্ষ ও কমিপয় দুষ্কৃকারীর কার্যকলাপ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের সে অপকীর্তি বিশ্ববিবেকের চোখে এখন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। জানি না ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার এই কেলেঙ্কারির পর আবার কোন ছেঁদো কাহিনীর আশ্রয় নেবেন- তবে সত্য ঢাকতে গিয়ে, অপরাধ গোপণ করতে গিয়ে তারা যে কৌশলই অবলম্বন করুন না কেন পরিণতি তাদের একই হবে। কারণ, খোঁড়ার পা গর্তেই পড়ে।

২৭ জুন, ১৯৭১

সম্প্রতি বার্লিন থেকে প্রকাশিত জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকারের এক ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যাপক গণহত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতনের ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী আর যাতে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য না হয় এবং ইতিমধ্যেই যে ৬০ লক্ষ বাঙালী দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে তারা যাতে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে এবং বাংলাদেশে যাতে তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হয় তার জন্য কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যাতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইসব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই বাস্তবসম্মত, উপযুক্ত এবং স্থায়ী সমাধানের পথ নিহিত আছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা এবং সেখানকার গণনির্বাচিত নেতৃবর্গের পরামর্শ ও পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক সঠিক ও সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের এই ইশতেহারকে বিশ্বের সকল দেশের রাজনৈতিক মহল দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাঁরা বলেন, এই ইশতেহারে বাংলাদেশ থেকে যেসব শরণার্থী ভারতে চলে গেছে তাদের সমস্যাকে শুধু যে কেবল আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়। এই ইশতেহারে দাবী করা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমানসহ সব রাজনৈতিক নেতার মুক্তি, আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রভৃতি।

ইউরোপ ও আমেরিকার পত্রপত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনসমূহের প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্যে বলা হয়ঃ গত ২৫ শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে বর্বরতা চালিয়েছে তাতে বাংলাদেশ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশছাড়া হতে বাধ্য হবে।

গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিলো তাতে অনুমানিক ১৮ থেকে ২০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং এই ব্যাপক প্রাণহানির মূল্যেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রচ্ছন্ন কারসাজি ছিলো। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যুর হাত থেকে শতকরা ৯৫ জন অব্যাহতি পেতে পারতো, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তথা ইয়াহিয়া সরকার ইচ্ছা করেই সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমন কি ব্যাপক প্রাণহানির খবরটুকু পর্যন্ত চেপে গেছে। বাইরের জগত যেটুকু জেনেছে তা বাংলাদেশের বেসরকারী কতগুলো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের খবর থেকে। গত ২৫শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে যে গণহত্যা চাললো, এর খবরও তারা চেপে গেছে। ইয়াহিয়ার জঙ্গী বাহিনী ১০ লাখ নরনারীকে গুলি করে ও আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা থেকে এই তথ্য উদ্ধৃত করা হয়। অনেকগুলো পত্র-পত্রিকায় একরম মন্তব্য করা হয়েছে যে, পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত মুসার (আঃ) যুগে মিশরের উপর পর পর যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় এসেছিলো তাতেও এত প্রাণহানি ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ পর্যন্ত যত বাঙালী খুন করেছে তার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নেই। এত নরহত্যা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত কখনও ঘটেনি।

২৮ জুন, ১৯৭১

বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে আর কোন আর্থিক সাহায্য দেবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মার্কিন প্রভাবশালী দৈনিক 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ প্রকাশিত এক খবরে উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি প্যারিস পাকিস্তানকে সাহায্য দানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত ১১টি দেশের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ স্থির করেছেন যে, বাংলাদেশে সবদিক থেকে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে নতুন করে কোন রকম আর্থিক সাহায্যদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং পাকিস্তান এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ঋণ নিয়েছে সেগুলোই সুদে-আসলে আদায় করা হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে যে, আর্থিক সাহায্য লাভের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে পাকিস্তান যত কান্নাকাটিই করুক না কেন, এ ব্যাপারে কনসর্টিয়ামের আর কোন বৈঠক বসবে না।

‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর প্যারিসস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে উক্ত বৈঠকে বেলজিয়াম, কানাডা ও বৃটেন একথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানীরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাদের জনমত প্রবল আকার ধারণ করেছে এবং পাকিস্তানকে কোন রকম সাহায্য দানের তারা ঘোরবিরোধী। অতএব নিজেদের দেশের জনমতকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক বর্বরতা চালানোর সহযোগিতা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। -অর্থাৎ পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের অভিমত হলোঃ ইয়াহিয়া ও তার জঙ্গী সরকার যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণহত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন বন্ধ না করবে, বাংলাদেশ থেকে যতদিন পর্যন্ত তাদের রক্তভেজা লোমশ হাতগুলো গুটিয়ে না ফেলবে এবং যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন আমরা কেউই পাকিস্তানকে একটি কানাকড়ি পর্যন্ত দিচ্ছি না।

হল্যাণ্ড সরকারও এই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। হল্যাণ্ডের উন্নয়ন সাহায্য সংক্রান্ত মন্ত্রী মিঃ জে, বি, উডনিক হেগস্থ পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতকে তাঁর সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু পাকিস্তানের সরকার তার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিহত করেছেন, যেহেতু পাক সরকার তার নিজের দেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ও শহর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশছাড়া করেছে এবং যেহেতু পাক সরকার নিজেই নিজের দেশের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদটিকেই বুলেট-বেয়োনেটের আঘাতে শেষ করে দিয়েছে, সেই কারণেই পাকিস্তানকে নতুন কোন সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করা যায় না।

মিঃ উডনিক বলেন, পাকিস্তানকে সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়ামভুক্ত দেশসমূহের সিদ্ধান্তের সাথে অমত হয়েই তার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, যেসব সাহায্য দেওয়ার কথা ইতিপূর্বেই হয়েছিলো তা এখন পুনর্বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।...

৪ জুলাই, ১৯৭১

... ভাটিকানের মহামান্য পোপ পল থেকে শুরু করে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলে উথাণ্ট এবং পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ধিক্কার আর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার একদিকে যেমন বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা ও অবর্ণনীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে অন্যদিকে তারা বাংলাদেশ থেকে বাইরে সংবাদ যাওয়ার সকল পথ রুদ্ধ করে চরম অপপ্রচার ও ভুয়ো কল্পকাহিনী ছড়িয়েছে। এইসব পরস্পরবিরোধী চিত্র ও প্রচারণার জন্যেই সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধিদল পাক-অধিকৃত এলাকাসমূহ এবং বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফরের এসেছিলেন। এই বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলের সদস্যই ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন দলের প্রভাবশালী সদস্য মিঃ আর্থার বটমলি।

মিঃ আর্থার বটমলি ছিলেন বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব। এখন তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের একজন প্রভাবশালী সদস্য।

বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে মিঃ বটমলি সাংবাদিকদের বলেছেনঃ ইয়াহিয়া তার সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন তা স্রেফ ধাপ্পা মাত্র। ইয়াহিয়ার ওই বেতার বক্তৃতায় রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তা ছুড়ে ফেলে দেবেন। ও ধরনের প্রস্তাব বাংলাদেশে মানুষ গ্রহণ করতে পারেন না।

মিঃ বটমলি বলেনঃ আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের অন্যতম সদস্য মিঃ টোবি জেসেল ও বিশিষ্ট সদস্য মিঃ আর্নেস্ট প্রিন্টিসও এ ব্যাপারে মিঃ বটমলির সঙ্গে একমত।

মিঃ টোবি জেসেল বলেনঃ রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা বিপজ্জনক। অবিলম্বে এ সমস্যার সমাধান যদি না করা হয়, তাহলে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ হতে বাধ্য। তিনি বলেন, পাকিস্তান এখন এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসের পিছনে ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা রয়েছে বলে পাকিস্তান যে ডাহা মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছিল বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যগণ সকলেই তার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে ধ্বংসের যে বীভৎস চিত্র আমরা দেখে এসেছি তা কোনক্রমেই ভারতীয়দের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়।...

বৃটিশ পার্লামেন্টারী দলের অপর সদস্য প্রাক্তন বৃটিশ সমর সচিব মিঃ জেমস র‍্যামসডেন বলেনঃ বাংলাদেশে পাক সামরিক বাহিনী যা করছে তা বীভৎস। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভবনা নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এতই বিপজ্জনক ও দুর্বিষহ যে সেখান থেকে আরও অধিক সংখ্যায় শরণার্থী ভারতে বা প্রতিবেশী দেশে চলে যেতে পারে। এর ফলে শরণার্থী সমস্যা আরও গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে। আর তা দেখা দিলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পাকিস্তানের পক্ষে আসবে এক দারুণ মরণ আঘাত। সে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই।

বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যই বলেনঃ পাকিস্তানের আজ এটা উপলব্ধি করা উচিত যে পাকিস্তান বর্তমানে এ শতাব্দীর সবচে বড়ো দুর্যোগের মাঝ দিয়ে চলেছে। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশের ওপর জঙ্গী শাসন চাপিয়ে রেখে এর সুরাহা হবে না, হতে পারে না। মিঃ আর্থার বটমলি বলেনঃ পাক বাহিনী কেন, পৃথিবীর কোন শক্তির পক্ষেই সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-সচেতন মানুষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ...

৯ জুলাই, ১৯৭১

গতকাল বিশ্বজনমত অনুষ্ঠানে মার্কিন সাময়িকী 'নিউজউইক'-এ প্রকাশিত বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কিত একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টের অংশবিশেষ আমরা উল্লেখ করেছিলাম। 'দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান'' বা ''টিক্কা খানের বীভৎস রক্তস্নান'' শিরোনামের এই রিপোর্টে 'নিউজউইক' সংবাদদাতা টনি ক্লিফটন বাংলাদেশে পাক বর্বরতার একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরেছেন। রিপোর্টে তিনি বাংলাদেশে যে মর্মান্তিক ঘটনাবলীর কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য না করে আমরা শুধু তার বাকী অংশটুকু তুলে ধরছি।

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে লিখেছেনঃ পাক বর্বরতার যেসব বীভৎস স্বাক্ষর আমি প্রত্যক্ষ করেছি ও পাক-হানাদারদের পৈশাচিকতার যেসব লোমহর্ষক কাহিনী আমি শুনেছি তাতে আমার শুধু একথাই মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে কয়েক হাজার মাইলাই ও কয়েক হাজার লিডিসেস সংঘটিত হয়ে গেছে। আমার আজ আর কোন সন্দেহ নেই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এ পর্যন্ত এমন বর্বরতা কখনও সংঘটিত হয়নি। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং এমন কি গত দুটো বিশ্বযুদ্ধেও একখানি বিপর্যয় কখনও ঘটেনি। আমার মনে হয়, পাক বর্বর বাহিনী বাংলাদেশে যে হাজার হাজার মাইলাই আর লিডিসেস করেছে তার শেষ এখানে নয়- বাংলাদেশে আরও অনেক মাইলাই, আরও অনেক লিডিসেস অচিরেই সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

টনি ক্লিফটন বলেনঃ এইসব দেখে-শুনে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো- আমি হতবাক, স্তব্ধ হয়ে গেছি। আমি যা দেখেছি যা শুনেছি তাতে ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে

যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি হতবাক হয়ে গেছি- বার বার বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি- এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড আর এই প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায় একজন মানুষের কোন চেতনা থাকা কি সম্ভব?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক-হানাদারদের হত্যা, নির্যাতন ও ব্যাভিচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের একটি সর্বহারা বালিকার এক মর্মান্তিক কাহিনী তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেনঃ লালফুল ও সবুজ লতাপাতা আঁকা গোলাপী রঙের একটা ছেঁড়া ফ্রকের আট-ন'বছরের বালিকা ইসমত আরার মুখে আমি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছি। আমি তাকে দেখলাম শরণার্থী শিবিরের অনতিদূরে একটি হাসপাতালে। শত শত আহতদের ভিড়ের একপ্রান্তে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। দিশেহারা দুটি ভিরু চোখ দিয়ে চারিদিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। সে যে আহত আমি তা দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম। মনে হলো শীর্ণ আলোর একটি রেখার মতো এই মেয়েটি তো কারও বিপদের কারণ হতে পারে না? এই ছোট্ট মেয়েটি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর কাছে কি এমন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যার জন্য তারা এভাবে আঘাত করেছে? একজন পাকিস্তানী সৈন্য বেয়োনেট দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করেছে। তার শ্বাসনালি কেটে দিয়েছে। সে তার গলার ব্যাণ্ডেজের ওপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি বললোঃ আমার নাম ইসমত আরা আমার বাবার নাম মরহুম ইশাক আলী। কুষ্টিয়ায় আমার বাবার দোকান ছিলো। দু'মাস আগে বাবা কুষ্টিয়ায় রওয়ানা হয়েছিলেন সেই রাতে আমি ঘুমোবার আগে বাইরে কোলাহল আর ভারী ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে যাওয়ার আগেই দেখতে পেলাম অনেকগুলো পাক সৈন্য আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা আমাদের ঘরে ঢুকেই আমার দাদাকে গুলি করে। আমার দাদা বি-এসসি পাস করেছিলো। তারপর তারা আমার মা ও বোনদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং তাদের শেষ পর্যন্ত বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে। একজন সৈন্য লাফ দিয়ে এসে আমাকে আঘাত করে। তারা বেয়োনেট দিয়ে আমার গলায় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে আমি পড়ে যাই এবং মৃতের ভান করি। তারপর সৈন্যরা চলে গেলে পরের দিন একজন লোক দিয়ে আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে। এই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কেমন হয়ে পড়েছিলো। সেই বীভৎস দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো। সে তা সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। আর তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার ওয়ার্ডের ডাক্তারের সংগে আলাপ করলাম। ডাক্তার আমায় জানালেন, একদিন আকে ভদ্রলোক তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে নিয়ে আসে। এরপর হাসপাতালে আহত শরণার্থীদের ভিড় ঠেলে আমি যখন বাইরে বের হচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় ইসমত আরা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার দুচোখের কোণায় জল টলমল করছিলো। কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে সে আমায় জিজ্ঞেস করলোঃ বলুন না এখন আমি কি করবো? জানেন আমরা পাঁচ বোন ছিলাম, আমার ভাই ছিলো, মা-বাবা ছিলো। কতো সুন্দর আমাদের ঘরবাড়ি ছিলো। আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আজ আমি এতিম। বলুন না, আমি কোথায় যাবো? আমার কি হবে? আমি তাকে বললাম, আর তো কোন ভয় নেই। তুমি এখানে চলে এসেছ, এখন তোমার ভয়ের কিছু নেই। কপট এক নির্বোধের মতো আমি তাকে সান্ত্বনার কথাগুলো বললাম- কিন্তু ইসমত আরার কি হবে? কি হবে আরও হাজার হাজার ইসমত আরার?

টনি ক্লিফটন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকার নিউজার্সির কংগ্রেস সদস্য মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাঘার আমায় বলেছেন যে, পাক বাহিনীর বর্বরতার খবর অতিরিক্ত বলে আমি প্রথমে মনে করেছিলাম এবং প্রকৃত সত্য যাচাইয়ের জন্যেই আমি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। মিঃ গ্যালাঘার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর একজন বিখ্যাত সামরিক অফিসার ছিলেন। তিনি বলেছেনঃ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের সময় ফ্রান্সের বিধ্বস্ত এলাকাগুলো আমি দেখিছি- মর্মান্তিক বধ্যভূমিগুলোও আমি দেখেছি, কিন্তু আমি এমনটি কখনও দেখিনি। এ বীভৎসতা, এ বর্বরতার কোন তুলনা হয় না।

টনি ক্লিফটন বলেন, গত তিন মাসে পশ্চিম হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তাতে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র দেশ হয়ে যাচ্ছে। সেটা ঠিক কবে হচ্ছে সেটাই শুধু প্রশ্ন, হচ্ছে কিনা সেটা আজ আর কোন প্রশ্ন নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা।

১০ জুলাই, ১৯৭১

বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র কয়েক দিন আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- ‘‘বাংলাদেশের লাখো শহীদের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে।’’ প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের এই উক্তির ক’দিন পরেই লণ্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক ডেলী মিরর-এ প্রকাশিত A DEATH OF A NATION শিরোনামের একটি মর্মস্পর্শী রিপোর্টে বাংলাদেশে পাক বর্বরতার লোমহর্ষক বিবরণ দিয়ে এই একই মন্তব্য করা হয়। এর আগে লেবানিজ দৈনিক ‘আল সাব’ পত্রিকায় প্রকাশিত ARTIFICIALLLY CREATED PAKISTAN IS UNFIT TO CONTINUE শিরোনামের রিপোর্টেও এই একই মন্তব্য করা হয়। তারপর গত সপ্তায় প্রকাশিত প্রভাবশালী মার্কিন সাময়িকী NEWSWEEK- এ প্রকাশিত THE TERRIBLE BLOOD BATH OF TIKKA KHAN শিরোনামের রিপোর্টে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বীভৎস হত্যাযজ্ঞ, ব্যাভিচার, নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর হয়ে গেছে। পাকিস্তান ভেঙে দু টুকরো হয়ে যাচ্ছে। এ ভাঙ্গন জোড়া দেয়ার নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব ঘটনা। চলতি সপ্তাহে নিউজউইক লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সৈন্য পাঠিয়েছে সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি কানাডীয় পার্লামেন্টের তিনজন প্রভাবশালী সদস্য বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া সর্বহারা শরণার্থীদের অবস্থা এবং বাংলাদেশে পাক বর্বরতার নমুনা দেখার জন্যে শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা বলেছেনঃ ‘পূর্ব পাকিস্তান’- এই নামে কোন রাষ্ট্র-রাষ্ট্রাংশের অস্তিত্ব আর নেই। বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব সত্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এ কথা জোর দিয়ে বলেন, আমরা একটি গণতান্তিক দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি। নির্বাচন ও গণতন্ত্রের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আর এই আস্থা বলেই আমরা মনে করি বাংলাদেশের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। কানাডীয় পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের নেতা, কানাডার ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মিঃ জর্জের লাচাঁস সাংবাদিকদের বলেনঃ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে অন্যায় কিছু করেননি। তিনি বলেন, কানাডার অনেক পরিষদ সদস্যই তো কুইবেক-এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী তুলেছেন। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অতএব এই গণতান্ত্রিক অধিকার তোলার জন্যে কাউকে অপরাধী বলে গণ্য করা উচিত নয়।

শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পর কানাডীয় প্রতিনিধিগণ বলেনঃ এটা এখন পরিষ্কার যে পাকিস্তাতনের সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে চয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, এটা এই শতাব্দীর সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়। শুধু কানাডার জনসাধারণের নয়, বিশ্ববাসী বিশেষ করে কমনওয়েলথ দেশসমূহের মানুষের যা কিছু করণীয় আছে আমরা তা অবশ্যই তুলে ধরবো।

তাঁরা বলেন, পাকিস্তান, ভারত ও কানাডা সকলেই কমনওয়েলথের সদস্য। কমনওয়েলথের একটি সদস্যরাষ্ট্রের সমরনায়করা বাংলাদেশকে ও বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে তা কোনমতেই সহ্য করা যায় না।

কানাডীয় পরিষদের এই তিনজন সদস্য হলেন ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টির মিঃ জর্জেস লাচাঁস, মিঃ এ বিউইন ও মিঃ হিথ নেলসন।

সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার কারাকাস থেকে প্রকাশিত খৃষ্টীয় বিশ্বের প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য রিলিজিয়ন' পত্রিকায় বলা হয়ঃ পাকিস্তানী হানাদাররা বাংলাদেশে যে নারকীয় বর্বরতায় লিপ্ত হয়েছে তা দেখলে যীশুখৃষ্ট নিজেও ভয়ে শিউরে উঠতেন।

পাক হানাদারদের এই পৈশাচিকতার কঠোর সমালোচনা করে 'দ্য রিলিজিয়ন' পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়ঃ পাক সামরিক সরকার বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে ঘরোয়া ব্যাপার বলে চালাতে চেষ্টা করে বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদেরই চূড়ান্ত অপমান করেছে। বস্তুতঃ এই সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং মানববিবেকের প্রতি এটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৪ জুলাই, ১৯৭১

... গত ১২ই জুলাইয়ে প্রকাশিত মার্কিন সাময়িকী নিউজইউক-এ বলা হয়ঃ পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে সৈন্য পাঠায় সেই দিনই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে।

নিউজউইক' পত্রিকায় বলা হয়ঃ ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযান চালানোর জন্যে বাংলাদেশে যখন সৈন্য ও সমরসম্ভার পাঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো ঠিক সেই সময় পাকিস্তানের ঘরে-বাইরে সবদিক থেকেই রাজনৈতিক সমাধানের দাবী উঠছিলো। ইয়াহিয়ার সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছিলো। দাবী উঠছিলো- পাকিস্তানের যে সঙ্কট তার সমাধান সমরসজ্জা বা সামরিক অভিযানে সম্ভব নয়। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। কোন রকম শর্ত আরোপ না করে গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যেই সমাধান নিহিত রয়েছে। বুলেট-বেয়োনেটে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র ঘরে-বাইরের এই দাবী উপেক্ষা করে পাকিস্তানের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত বৈঠক বাতিল করে বাংলাদেশের ওপর সামরিক অভিযান চালালো।.....

নিউজউইক উল্লেখ করেঃ গত সপ্তাহে ঢাকায় কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক মন্তব্য করেছেন, আপোষ আলোচনার আর কোন পথই খোলা রইলো না। ইয়াহিয়ার গোঁয়ার্তুমির জন্যে আলোচনার সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। আলোচনা এখন আর সম্ভব নয়। পাকিস্তান মরে গেছে এবং ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্রই পাকিস্তানকে ধ্বংস করেছে।

১৫ জুলাই, ১৯৭১

... পাকিস্তানকে উন্নয়ন সাহায্য দেয়ার মতো আদৌ কোন অবস্তা রয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফলকরে ফিরে গিয়ে তাঁরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে এসে বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদল তাঁদের রিপোর্টে এই একমাত্র সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া বন্ধ করা

হোক। কারণ, এখন পাকিস্তানে যে কোন আন্তর্জাতিক সাহায্যই দেয়া হোক না কেন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

রিপোর্টে তারা বলেছেনঃ বর্তমানে পাকিস্তানকে কোন রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যাবে না। এমন কি পাকবাহিনী বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্যে যদি কোন আন্তর্জাতিক সাহায্য পাঠানো হয় তাহলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার সেই সাহায্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোন সাহায্যই গিয়ে পৌঁছুবে না। বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে কোন রকমের আন্তর্জাতিক সাহায্য দিলে ইয়াহিয়া সরকার তা পশ্চিম পাকিস্তানেই পাচার করবে। অতএব পাকিস্তানকে কোন রকম আন্তর্জাতিক সাহায্য দেয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফরকারী বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদলের নেতা Mr. I. P. M. CARGILL এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। Mr. I. P. M. CARGILL বিশ্ব ব্যাঙ্কের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগের ডিরেক্টর।

Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের ব্যাপকতা এত বেশি হয়েছে যে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক জীবনধারা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এখন এক ভয়াবহ আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে লিখেছেনঃ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষের বিরুদ্ধে যে এখনও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে, সেখানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাঁরা যে এখনও চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, হত্যা, লুণ্ঠন ও ব্যাভিচারে তারা যে এখনও সমান তৎপর রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই হোক অথবা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই হোক, সামরিক গভীর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। মুক্তিসেনাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পাক সেনারা, আর তারই প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করছে সাধারণ মানুষের ওপর।

সংক্ষেপে, বাংলাদেশের প্ররিস্থিতি এখন দারুণ উদ্বেগজনক। স্বাভাবিকতার নাম-গন্ধ নেই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে পাকিস্তানী সামরিক সরকার যে দাবী করছে Mr. CARGILL তাঁর রিপোর্টে তার কঠোর সমালোচনা করে বলেনঃ সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা, সৈন্য প্রত্যাহার করা ও বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে পারে না।

১৮ জুলাই, ১৯৭১

কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত আজ এক নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি স্বার্থান্বেষী মহল ও ইয়াহিয়া চক্র সর্বাত্মক মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে যে বিভ্রান্তির কালো ধোঁয়া ছড়িয়েছিলো বিশ্বমানবতা ও বিশ্ববিবেকের নবতর অভ্যুদয়ের আলোকচ্ছটায় তা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে আজ ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও অমানুষিক নির্যাতনের খবর পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার পেছনে কোন দুরভিসন্ধি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে বিশ্বের মানুষের কাছে তা আজ অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকৃত ঘটনাবলী যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বিশ্বের মানুষ ততই আমাদের পক্ষে মত প্রকাশ করছে, আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশ আজ আমাদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন জানাচ্ছে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ এবং আরও কয়েকটি দেশ বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নটি জাতিসংঘে তোলার জন্যে

উদ্যোগী হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রশ্নটি জাতিসংঘে উত্থাপনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার অপরাধ সম্পর্কে পাকিস্তানের কোন বক্তব্য যে থাকতে পারে না তা ধরে নেয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, সমাজসেবী, কূটনীতিক, পর্যটক ও বিশ্বসংস্থাসমূহের যেসব প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তাদের রিপোর্ট ও প্রামাণ্য তথ্যাদি থেকে এটা আজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পাক বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা ও বর্বরতার অপরাধে অপরাধী। জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠলে পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী হানাদার বলে চিহ্নিত হবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশও বিশ্ব সংস্থার সমর্থন এবং স্বীকৃতি লাভ করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে কোন অবস্থাতেই তারা পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে সহযোগিতা করবে না। অর্থাৎ, ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ইয়াহিয়া সরকারকে আর কোন সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে না।.....বিশ্ব ব্যাঙ্কের যে প্রতিনিধিদলটি গত ৩রা জুন থেকে ২১ শে জুন পর্যন্ত উনিশ দিন ধরে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন তারা বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন পরিস্থিতি আদৌ স্বাভাবিক নয়। সেখানে সর্বত্রই ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, পাক হানাদার সৈন্যরা এখনও বাংলাদেশের ওপর হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ছাড়া এইড কনসর্টিয়ামভুক্ত সব দেশই পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতনিধিদলের নেতা তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে একথা তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে, পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া অর্থহীন হবে এবং পাকিস্তানকে এখন যে কোন সাহায্যই দেয়া হোক, ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার তা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে, ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে সমর সম্ভার ও অর্থ সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করলেও আমেরিকান জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশ ও বহু জননায়ক বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলী প্রকাশ করে বাংলার জনগণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ খোলাখুলিভাবেই বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ইভিনিং স্টার' প্রভৃতি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকাগুলিতে মার্কিন সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ঋণদানকারী রাষ্ট্রগুলির উচিত পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত Mr. Chester Bowles পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য প্রেরণের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, মার্কিন সরকারের এ ভুলের কোন তুলনা হয় না। মার্কিন সরকারের এটা শুধু ভুল নয়, এটা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ- ইতিহাস এ অপরাধ কোন দিনই ক্ষমা করবে না।

২০ জুলাই, ১৯৭১

... ডাবলিন থেকে প্রকাশিত 'আইরিশ টাইমস' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ ইয়াহিয়া তার বেতার ভাষণে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বা যে রাজনৈতিক রদবদলের প্রস্তাব করেছে তা জঘন্য। ইয়াহিয়া তার বেয়োনেট-উদ্যত সেনাবাহিনী দিয়ে আটক দেশবাসীর উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেছে তাতে তার দেশ গোল্লায় যাবে। বাংলাদেশ থেকে যে সকল নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সেনাবাহিনীর অত্যাচারে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা কেউই এ প্রস্তাবে দেশে ফিরে আসতে পারে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পদ্ধতির কথা ইয়াহিয়া ঘোষণা করেছে তা দুরভিসন্ধিমূলক। দশ লক্ষ বাঙালীকে নির্বিচারে হত্যা করে গোটা বাংলাদেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়ে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের কিছু অংশের ওপর তথাকথিত দখল রেখেছে সত্যি, কিন্তু এই দখল

রাখতে গিয়ে তাদের যে কী পরিমাণ দিতে হচ্ছে তা একমাত্র তারাই জানে। কারণ, বাংলাদেশের মানুষ ইতিমধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং বাংলাদেশে সরকারের অধীনে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে উঠছে। আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যেসব বাঙালী সৈনিক ছিলেন তারাই আজ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে ইয়াহিয়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। বাংলাদেশের সর্বত্রই এখন গেরিলা যুদ্ধ চলছে- শুধুমাত্র তাই নয়, ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীতেও গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

'আইরিশ টাইমস' পত্রিকায় আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে। বর্তমানের এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী ও সরকার যেখানে আজও হত্যা, লুন্ঠন ও নির্যাতন সমানে চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। ভারতে এভাবে লাখ লাখ শরণার্থী ঠেলে দিয়ে ইয়াহিয়া সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করতে চাইছে। পত্রিকায় বলা হয়ঃ বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকেই যাবে এবং তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

স্টকহোম থেকে প্রকাশিত সুইডিশ দৈনিক, DOGENS NYHETER-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানকে বাংলাদেশে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে বাংলাদেশের জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হয়।

'ডগেনস নিহিতের' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটিতে ইয়াহিয়ার সামরিক অভিযানের কঠোর সমালোচনা করে বলা হয়ঃ বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা বর্তমানে চরমে পৌঁছেছে। এখনও বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ শরণার্থী সৈন্যদের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

পত্রিকায় বলা হয়ঃ বাংলাদেশে সামকি বর্বরতা সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে গিয়ে কিছু সময় দাঁড়ালেই ইয়াহিয়ার স্বাভাবিক পরিস্থিতির দাবীর অসারতা সহজেই ধরা পড়ে- বোঝা যায় ইয়াহিয়া সরকারের মিথ্যা প্রচারণার বহর।

২৩ জুলাই, ১৯৭১

... সিয়েরা লিওনের ফ্রিটাউন থেকে প্রকাশিত 'মেইল' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে এক দীর্ঘ রিপোর্ট বেরিয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ফ্রিটাউন দৈনিকের সংবদদাতা Mr. SOM SHORT প্রশ্ন করেছেনঃ বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার চেয়ে বেশি কিছু কি ঘটতে পারতো?

তিনি লিখেছেনঃ বাংলাদেশে যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, তা বোঝার জন্যে বা তা বিশ্বাস করার জন্য এর চেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলাদেশের ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখে ফ্রিটাউন দৈনিক মেইল-এর সংবাদদাতা Mr. SOM SHORT বলেন, পাকিস্তান সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের পশ্চাতে যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র বা ভয়াবহ একটা কিছু আছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি লিখেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্বরতা ক্রমে বেড়েই চলেছে, যুদ্ধ যতো দীর্ঘস্থায়ী হবে বাংলাদেশে ধ্বংস ও মৃত্যু ততো বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই তো এখন এখানকার ঘটনাবলীর অল্পবিস্তর জানতে পেরেছে কিন্তু তবু আমরা আমাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য করতে পারছি না কেন?- এই রক্তস্নানের কি কোন শেষ নেই?

২৯ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার যতো অপচেষ্টাই পাকিস্তানী সামরিক চক্র করুক, কিন্তু যা সত্য তাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতই বাংলাদেশের ঘটনাবলীর খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে।

আমেরিকান বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' ও লণ্ডনের প্রভাবশালী দৈনিক 'দি টাইমস'-এ বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের মোকাবিলায় মুক্তি বাহিনীর সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনার খবর প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তথাকথিত দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মুল করা হয়েছে বলে যে দাবী করেছেন, সে প্রসঙ্গে 'The Bengalis Strike Back' শীর্ষক একটি নিবন্ধে 'নিউজউইক' পত্রিকা বলেঃ 'ইয়াহিয়ার জন্যে দুঃখ হয়, কেননা তিনি যা দাবী করেছেন প্রকৃত ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।' পত্রিকায় বলা হয় যে, সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধ অভিযান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এ অভিযান গোড়া থেকেই পরিচালিত হচ্ছে এবং উন্নত সমরসজ্জায় সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনী চরমভাবে ঘায়েল হচ্ছে।

'নিউজউইক' বলেঃ বাংলাদেশের বহু কলকারখানা ধ্বংস করা হয়েছে, ডিনামাইট দিয়ে প্রধান প্রধান ব্রীজসমূহ উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, মাইন বসিয়ে বহু রেল সড়কের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

পত্রিকায় বলা হয়, সামরিক বাহিনী অধিকৃত ঢাকা শহরেও নিয়মিত গোলাগুলি চলছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত মুক্তি সংগ্রামীদের অভিযান বাংলাদেশের সর্বত্রই অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল সফরকারী নিউজউইকের সংবাদদাতা মিঃ লোরেন জেনকিনস এখানে মুক্তিবাহিনীর হাতে খুলনার দু'জন দালালের 'লালরঙা চিঠি' প্রাপ্তি এবং কড়া সামরিক পাহারাধীন থেকেও শোচনীয় মৃত্যুর খবর জানান।

লণ্ডন টাইমসের রিপোর্টার মাইকেল হর্নসবী জানান যে, বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অহরহ মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা রাস্তা, রেলওয়ে ব্রীজ, রেললাইন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে পাকিস্তানী সামরিক প্রশাসনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশের সকল শহর বিশেষ করে ঢাকা শহরে গেরিলাদের পাক বাহিনীর ওপর বোমা নিক্ষেপ করছে।

হর্নসবী জানান যে, গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক বাহিনী আশপাশের এলাকার বেসামরিক বাসিন্দাদের ওপর উৎপীড়ন করে থাকে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের পাক বাহিনী অধিকৃত এলাকায় এমনি প্রশাসনিক অচলাবস্থাই বিরাজ করছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আক্রমণে পাক সেনারা এখানে-ওখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দিন দিনই হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে।

এই বাস্তব সত্যকে গোপন করার মতো অপচেষ্টাই পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার করুক, বিশ্বের চোখে ধরা পড়বেই। আর এভাবে বাংলার সার্বিক মুক্তিকামী মানুষের সপক্ষে গড়ে উঠবে বিশ্বজনমত।

১ আগস্ট, ১৯৭১

... বর্তমানে ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত ইয়াহিয়ার সৈন্যদের অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার ও দাপট যতই বাড়ছে এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা যতই জোরদার হচ্ছে ততই বিশ্ববাসী আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের সপক্ষে ততই গড়ে উঠছে বিশ্বজনমত।

ইতিমধ্যে জঙ্গীশাহীর অনেক বাধাবিপত্তি সত্বেও বহু বিদেশী সাংবাদিক, সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ও রাজনীতিবিদ যুদ্ধক্ষত বাংলাদেশ সফর করেছেন।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধি কর্নেল অ্যার্লা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে তাঁর সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেছেন, বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন বায়াফ্রার মর্মান্তিক ঘটনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্যরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার কোন নজির নেই। নরওয়ে রেডক্রসের একজন প্রতিনিধি ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে বলেছেন, বর্তমান শরণার্থী সমস্যার সাথে বিশ্ব ইতিহাসের অন্য কোন ঘটনার তুলনা করা যায় না।

একটি স্বাধীন দেশে দখলদার সৈন্যরা কতো বেশি নির্যাতন চালিয়ে গেলে ৮০ লাখ মানুষকে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি ফেলে দেশত্যাগ করতে হয় তা সকলেই বোধগম্য।

এহেন অবস্থায় বাংলাদেশে যখন মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই- মানবতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা যখন বিপর্যস্ত, সে ক্ষেত্রে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুটি বৃহৎ শক্তি একনাগাড়ে পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করে গণহত্যার উস্কানি দিচ্ছে।

মার্কিন জনগণ ও সেখানকার পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন জঙ্গীশাহীকে অস্ত্র সাহায্যের নীতিতে অবিচল রয়েছেন। মার্কিন সিনেটের বহু প্রভাবশালী সদস্য পরিষ্কার ভাষায় নিক্সনের এই অনমনীয় নীতির সমালোচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেয়ার মানেই হচ্ছে গণহত্যায় অংশ গ্রহণ করা। তা ছাড়া যুদ্ধের ফলে যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিন কোটিরও বেশি মানুষ চরম খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়েছে সেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া সরকারকে খাদ্য ও অস্ত্র সাহায্য দেয়া রীতিমত যুদ্ধাপরাধ।

এদিকে ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী জন আরউইন সিনেটের এক সাব-কমিটির বৈঠকে বলেছেন যে, বাংলাদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষের খবর তাঁরা পেয়েছেন। অথচ পাকিস্তানের দখলদার সমরকর্তারা দুর্ভিক্ষ রোধের কোনো চেষ্টা চালাচ্ছে না। এতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দেশ থেকে ৮০ লাখ মানুষকে তাড়িয়ে এবং ১০-১২ লাখ মানুষকে হত্যা করেও এদের কসাই বনোবৃত্তির এখনো খায়েশ মেটেনি।

এমনি মর্মান্তিক অবস্থায় জাতিসংঘ আবার বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পাঁয়তারা করছে। অথচ গত চারমাস যাবৎ জাতিসংঘ বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারও বাংলাদেশ-সমস্যাটিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ হিসাবে দেখাবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে প্রদত্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ জঙ্গীশাহীর এ ধরনের নির্লজ্জ অপকৌশলকে পাকিস্তানের 'ভ্রান্ত পদক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলে সহানুভূতিশীল বিশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চরম মার খেয়ে পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী জঙ্গী কর্মকর্তারা আজকাল জাতিসংঘের ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশে তাদের কৃতকর্মের কালিমা মোচনের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কাজেই বাংলাদেশ সমস্যাটি হচ্ছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বিরোধ। এ বিরোধ যত শ্রীঘ্র মিটমাট হবে ততই সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণ ত্বরান্বিত হবে- বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের মনে ফিরে আসবে শান্তি ও আস্থার মনোভাব।

বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশন সংস্থাও সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবনের নিরাপত্তার জন্যে বাংলাদেশ সমস্যার আশু সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বাংলাদেশের প্রকৃত গণপ্রতিনিধিরাই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং লাখ লাখ শরণার্থীকে নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারবে।

১৫ আগষ্ট, ১৯৭১

... গত ২৫শে মার্চ থেকে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্র বাংলাদেশে যা করেছে সমস্ত বিশ্ব তাতেই হতবাক হয়েছে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বর্ণিত মানব ইতিহাসের সেই সর্বাধিক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনার পর এবং মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বর্ণিত মানব ইতিহাসের বৃহত্তম বিপর্যয় সৃষ্টির পর ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী বর্তমান বাঙলার নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে সামরিক আদালতে বিচার প্রহসন শুরু করেছে। এই বিচার প্রহসনের পিছনে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক চক্রের যে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি রয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলাদেশে পাক সামরিক চক্রের বর্বরতা ও বীভৎসতার দৃষ্টান্তে এটাই মনে হয় যে, ইয়াহিয়া ও তার নয়া নাৎসী বাহিনী করতে পারে না এহেন কিছু নেই।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ট্রুডো পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক তারবার্তায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনেও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারে দারুণ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

লণ্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, যেভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে পাক সামরিক চক্রের ওপর আদৌ ভরসা করা যায় না। লণ্ডনের 'টাইমস' 'ইয়র্কশায়ার পোস্ট' ও অন্যান্য সংবাদপত্রে এই তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। বৃটেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীগণ এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইনজীবী সংস্থাও শেখ মুজিবুরের বিচার প্রহসনের জন্যে ইয়াহিয়ার বর্বর সামরিক চক্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

'টাইমস' পত্রিকায় প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ ডব্লু টি, উইলিয়ামের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে মিঃ উইলিয়াম বলেছেনঃ যেভাবে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রহসন শুরু হয়েছে তাতে তিনি ও বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, যেভাবে এই তথাকথিত বিচার চলছে তাতে কোনক্রমেই শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় বিচার আশা করা যেতে পারে না। তিনি বলেন, একমাত্র প্রাণের ঝুঁকি ও বহু ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়া কোন বাঙালী কৌশুলিই শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থনে যাবেন না। মিঃ উইলিয়াম বলেন, আইয়ুবের আমলে সুপ্রিম কোর্টের রায় লজ্ঘন করে সামরিক সরকার শেখ মুজিবুর

রহমানের বিচার শুরু করেছিলো। ভয়ঙ্কর ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র সেই একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিচারে প্রহসন শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাক সামরিক চক্র মূঢ়তার বশে মিথ্যা অভিযোগ শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি কোনরকম দণ্ড দেয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ মিথ্যা অভিযোগ তুলে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা এক মারাত্মক ভুল করেছে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যদি এই তথাকথিত বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে সেটাই হবে সবচে মারাত্মক ভুল আর সেই ভুলের কোন সংশোধনের পথ থাকবে না।

১৬ আগস্ট, ১৯৭১

... পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষ দেশবরেণ্য জননেতা, বুদ্ধিজীবী সমাজ, বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র পাকিস্তানী নরঘাতী তস্করদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।....

জাতিসংঘের জনৈক মুখপাত্র গত শুক্রবারে বলেছেন যে, পাকিস্তানী সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসনের ব্যাপারে সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি আলোচনা চালাচ্ছেন ।

গত শুক্রবারে 'ওয়াশিংটন স্টার' পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন শুরু করে পাকিস্তানের মূঢ় সামরিক চক্র এক প্রচণ্ড ভুল করে বসেছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের একথা বোঝা উচিত যে নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদা প্রশ্নাতীত।

'ক্রীশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা। আজও তিনি বাংলার নয়নমণি। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর হৃদয়ে আজও তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম। পাকিস্তানের জঙ্গী সামরিক চক্র বিচার প্রহসনের দ্বারা যদি তার কিছু করে, তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যে চিরতরে বিদায় হবে তা নয় বরং মূল পাকিস্তানটাই চূর্ণ হয়ে যাবে।

যুগোশ্লাভ দৈনিক "বলগ্রেড বোরবা" পত্রিকার সম্পদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন করতে গিয়ে ইয়াহিয়া তার নিজের সমস্যার সমাধানের সকল পথই রুদ্ধ করেছে। এখন অন্ধকারে মাথা কুটে মরা ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

জেনেভার 'ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস'-এর সদর দফতর থেকে ইসলামাবাদে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়েছে। এই তারবার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

'জাকার্তা টাইমস'-এ বলা হয়ঃ শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নেতা। তার বিচার প্রহসন চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সর্বস্ব খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়েছে। ইয়াহিয়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছে।

১৮ আগস্ট, ১৯৭১

বিশ্ব জোড়া প্রতিবাদ, ঘৃণা ও কোটি ধিক্কার উপেক্ষা করে পাক সামরিক চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে।....

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঝানু আণ্ডার সেক্রেটারী ও প্রাক্তন রাষ্টদূত মিঃ চেস্টার বোলস শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেনঃ পাকিস্তানী সামরিক জান্তা সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের যে গোপন বিচার চালাচ্ছে তা আগাগোড়া একটি প্রহসন মাত্র। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এটা একটা চরম ধৃষ্টতা। এ বিচার সকল রীতিনীতি ও আইন-কানুনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মিঃ চেস্টার বোলস পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বর্তমান নীতির কঠোরতম সমালোচনা করেন। মার্কিন সরকার পাকিস্তান সরকারকে যে সামরিক সাহায্য অব্যাহতভাবে দিয়ে চলেছে, মিঃ চেস্টার বোলস তাকে "চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও নীতিবিগর্হিত" বলে বর্ণনা করেছেন।

সম্প্রতি 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে মিঃ চেস্টার বোলস বলেনঃ পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী সরকারকে সাহায্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক চরম ভুল করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অতীতের সব ভুলত্রুটি সংশোধন করে পাকিস্তানের কাছে সামরিক অস্ত্র ও সমরসম্ভার বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা এবং পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য দান একেবারে বন্ধ করে দেবার আহ্বান জানান।

পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর সহোদর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী সৃষ্ট 'মানব ইতিহাসের চরম বিপর্যয় ও মানব ইতিহাসের সবচে কলঙ্কজনক অধ্যায়' নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে বাংলাদেশের শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে গেছেন। তিনি পাক অধিকৃত বাংলাদেশেও যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাক বাহিনীর বর্বরতা পাছে পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায় সেজন্যে পাকিস্তানী সামরিক সরকার তাঁকে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশে যাবার অনুমতি দেয়নি। শুধুমাত্র সীমান্তে দাঁড়িয়ে ও শরণার্থীদের শিবিরগুলো পরিদর্শন করে তিনি যা দেখেছেন এবং যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকেই তিনি বলেছেনঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মার্কিন সিনেটের উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিটির সভাপতি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেনঃ পাকিস্তানী সামরিক জান্তার কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র অপরাধ হলো তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। তাঁর বিচার আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে বিচারের ব্যাভিচার এবং ন্যায়বিচারের প্রহসন মাত্র।

আদ্দিস আবাবা বেতার থেকে প্রচারিত এক খবরে বলা হয়ঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্যে সারাবিশ্বে এক প্রচার অভিযান শুরু করবে।

বিশ্ব জোড়া এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তানী সামরিক জান্তা শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রহসন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এই প্রহসন মেনে নেয়নি। আজ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই চলছে পাক হানাদার নিধনের দুর্বার অভিযান। মুক্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা বাংলাদেশের পুণ্যভূমি থেকে হানাদারদের সমানে উৎখাত করে চলেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ হানাদার উৎখাতে বদ্ধপরিকর।

১৯ আগস্ট, ১৯৭১

...পাকিস্তানের সাবেক এয়ার মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের তীব্র নিন্দে করেছেন। এই বিচার প্রহসনের কঠোর সমালোচনা করে তিনি পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে, পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশে যা করছে এবং বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে মেতে যা করতে যাচ্ছে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর ফলে পাকিস্তানটাই তাসের ঘরের মতো এক মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

এয়ার মার্শাল আসগর খান এ নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তাকে পরপর দুবার হুঁশিয়ার করে দিলেন। এয়ার মার্শাল আসগর খানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের আরও কয়েকজন নেতার চৈতন্যোদয় ঘটেছে। সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সর্বনাশা তৎপরতার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর খোদ মুখপত্র 'পাকিস্তান টাইমস'-এও শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের সমালোচনা করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি শান্তিকামী মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে সমরাস্ত্র, সমরসম্ভার ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে এলেও মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহল, রাজনীতিক ও শান্তিকামী মার্কিন জনগণ পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদমুখর। গত সপ্তাহে পাকিস্তানী জাহাজ আল-আহমদী মার্কিন সমরাস্ত্র বহনের জন্যে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার চেষ্টা করছিলো কিন্তু সেখানে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং বিক্ষোভকারীরা ছোট ছোট নৌযান দিয়ে পাকিস্তানী জাহাজের সম্মুখে অবরোধ সৃষ্টি করে। ফলে পাকিস্তানী জাহাজটিকে ফিলাডেলফিয়া বন্দরে ভেড়ার সংকল্প পরিত্যাগ করে বাল্টিমোরের দিকে এগুতে হয়।

শুধু ফিলাডেলফিয়া বন্দর নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই পাকিস্তানী সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কার উঠেছে। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী সর্বত্র লাঞ্ছিত। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মদদ পেয়ে পাকিস্তানের গোঁয়ার সামরিক চক্র এখনও আস্ফালন করছে সত্যি কিন্তু এর শোচনীয় পরিসমাপ্তি অত্যাসন্ন।

২০ আগষ্ট, ১৯৭১

... পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এসে তাঁর বাবা খান আবদুল গফফার খানের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কাবুলে পৌঁছে তিনি সেখানকার একটি ইংরেজী পত্রিকা 'নিউ ওয়েভ'-এর সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেনঃ পাকিস্তানের রাজনীতি এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়- পাকিস্তান ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবেই। পাকিস্তানের রাজনীতি এখন যেভাবে চলছে তাতে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই।

তিনি বলেনঃ বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করছে তা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতাকেও হার মানায়। তবে পাকিস্তানী সৈন্যদের পক্ষে বাংলাদেশকে দখলে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যদি মনে করে থাকে যে, চরম অত্যাচার চালিয়ে, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের বীর জনগণকে দাবিয়ে রাখতে পারবে তাহলে তারা চরম ভুল করবে। খান আবদুল ওয়ালী খান বলেনঃ আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশও যখন ভিয়েতনামের বীর জনগণকে বশে আনতে পারেনি তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুঁচকে পাকিস্তানের পক্ষে বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশকে কব্জায় রাখা কি করে সম্ভব? পাকিস্তানের আর্থিক ও সামরিক বাজেট এখনও যেখানে বাংলাদেশের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, সেখানে জয়লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না।

পশ্চিম পাকিস্তানী ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান বলেনঃ ধর্ম যে ভিন্ন সংস্কৃতির দুটি জাতির রাষ্ট্রীয় বন্ধন হতে পারে না, তা চিরকালের মত প্রমাণিত হয়ে গেল। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় বন্ধন বলে যারা ভাবতো এবার তাদের মোহমুক্তি চিরদিনের মতো ঘটে গেল। তিনি বলেনঃ আমার কাছে বাঙালীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের গুরুত্ব এখানেই।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া আর তার বর্বর সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হবার দুদিন আগে পর্যন্ত খান আবদুল ওয়ালী খান ঢাকায় ছিলেন। তিনি বলেন, নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং পাকিস্তানের নতুন সরকার গঠনের একমাত্র অধিকারী তিনিই ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ও তার সামরিক চক্র তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটিকে টিকিয়ে রাখার যে ক্ষীণতম সম্ভবনা ছিলো, পাকিস্তানী সামরিক চক্র তাকেও বেয়োনেট বিদ্ধ করেছে। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হবেই- তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। অথচ এমনটি হয়তো এতো তাড়াতাড়ি ঘটতো না। পাকিস্তানী সামরিক চক্রের মাথায় গোবর বোঝাই না হলে খুব সহজে এমনটি ঘটতো না। তারা যদি জনগণের রায়কে মনে নিত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী বলে স্বীকার করে নেয়া হতো তাহলে পাকিস্তানকে আরও কয়েকটা দিন টিকিয়ে রাখা যেতো। কিন্তু তা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। গত ২৫শে মার্চের রাতেই ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী সেই সম্ভাবনাকে খুন করেছে।

পিণ্ডির বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করতে গিয়ে খান আবদুল ওয়ালী খান একটি উপমা দিয়ে বলেনঃ ‘দুধের কলসী ভেঙ্গে গেছে। দুধ চারদিকে গড়িয়ে পড়ছে। আর তার চারপাশে বসে তারা কাঁদছে।’’

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ যে কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন তা নয়, বিপজ্জনক।

২১ আগস্ট, ১৯৭১

... বাংলাদেশের শহরে নগরে বাজারে বন্দরে প্রতিটি পল্লীতে আজ শত্রুহননের দুর্বার লড়াই চলছে। আর এই লড়াইয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সামরিক চক্র নতুন এক ফন্দি আঁটলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তারা ভারত-পাকিস্তান সমস্যা বলে চিহ্নিত করে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো আমাদের দেশের এই মুক্তিযুদ্ধকে তারা যদি ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আজ যে বিশ্ব জনমত গঠিত হয়েছে তাকে বিভ্রান্ত এবং বাংলাদেশে আজ যে দুর্বার লড়াই চলছে, তাকে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে। পাকিস্তানী সামরিক চক্র এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার সীমান্তে এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা শুরু করলো। কিন্তু বিশ্বের সচতেন মানুষ পাকিস্তানী সামরিক চক্রের এই দুরভিসন্ধিটা বুঝে নিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এমন কি প্রয়োজন হলে সংঘর্ষ একটা বাধিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার যে দুরভিসন্ধি তারা করেছিলো তা ভন্ডুল হয়ে গেছে।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সী কোসিগিন পাকিস্তানী ফ্যাসীবাদী সামরিক চক্রের এই ঘৃণ্য দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী নির্যাতনের নায়ক পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেনঃ সাবধান! ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানো পাকিস্তানের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে।

গত ১৭ই আগস্ট ইসলামাবাদস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ এ, এ, রদিনভ জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিনের একটি চিঠি পৌঁছে দেন। ওই চিঠিতেই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানী সামরিক চক্রের গোপন দুরভিসন্ধি ঔদ্ধত্যের বিষয়ে জেনারেল ইয়াহিয়াকে হুঁশিয়ারী প্রধান করেন। চিঠিতে তিনি ইয়াহিয়া ও তার বর্বর সামরিক চক্রকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে, তারা যেন গোঁয়ারের মতো ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আস্ফালন বা দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি না করে। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিন ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সামরিক চক্রকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও উৎপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনে আর একপা অগ্রসর না হওয়ার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন।

২৭ আগস্ট, ১৯৭১

... সম্প্রতি বৃটেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের পনেরোজন লোকমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণরক্ষার জন্য অবিলম্বে সক্রিয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশ্বের সকল সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বের সকল সরকারের কাছে পাঠানো এক বার্তায় তাঁরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেনঃ বাংলাদেশে আজ যা ঘটেছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে, তাকে বিশ্বশান্তি আজ দারুণ এক হুমকির সম্মুখীন। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীকে কোনরকম সামরিক অথবা অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্যেও তাঁরা বিশ্বের সরকারবর্গের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

হংকং-এর একটি প্রভাবশালী দৈনিক 'হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড-এ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনের জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়ঃ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের নামে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যা করতে যাচ্ছে তা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিচার প্রহসনের পেছনে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার যে গোপন দুরভিসন্ধি রয়েছে তা বীভৎস। পত্রিকায় বলা হয়ঃ সম্প্রতি পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী ঘোষণা করেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে একজন কৌঁসুলি নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে কো কৌঁসুলি থাক আর না-ই থাক এটা স্রেফ একটা ধাপ্পা ও প্রসহন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইয়াহিয়া আর জঙ্গী সরকার ইতিপূর্বেই শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাকতার অভিযোগ এনেছে। তারা যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগেভাবেই দোষী বলে ঘোষণা করছে সেখানে এই বিচার স্রেফ একটি প্রহসন ছাড়া আর কি হতে পারে?

আইরিশ আইনজীবী সমিতির অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য ও রাজনৈতিক বন্দী মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়াম্যান মিঃ সিয়ান ম্যাকব্রাইড জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে লেখা এক চিঠিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার অসামরিক আদালতে করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে আইনগত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করার জন্যে গত মাসে মিঃ ম্যাকব্রাইড পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে তখন কিছুই করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার গোপনে সামরিক আদালতে না করে প্রকাশ্যে বেসামরিক আদালতে করার দাবী জানিয়ে মিঃ ম্যাকব্রাইড বলেনঃ কোন বিদেশী আইনজীবীকে পাকিস্তানের আদালতে শেখের পক্ষ সমর্থনের অনুমতি যদি না দেয়া হয় তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান যাতে তাঁর ইচ্ছেমতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন তার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

মিঃ ম্যাকব্রাইড গত মাসে তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উল্লেখ করে বলেনঃ শেখ মুজিবুর রহমানের লণ্ডন সলিসিটরদের অনুরোধে তিনি বাংলাদেশের নেতার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্য নিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার আইন উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করে শেখের বিচার যেভাবে চলছে সে সম্পর্কে দারুণ উদ্বেগ ও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেনঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মার্জনা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে তিনি বিচারের কতগুলো উদ্বেগপূর্ণ দিক সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন।

তিনি অভিযোগ করেনঃ সামরিক আদালতে গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার চলছে তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি। এর মধ্যে শুধু একটাই বলা হয়েছে যে, অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তিনি বলেন, বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি তার ইচ্ছামতো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে সে বিচার বলে গণ্য হতে পারে না।

২১ আগস্ট, ১৯৭১

... আজ বাংলাদেশ সমস্যা একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানী শাসক চক্র শত প্রচেষ্টাতেও বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে মৃত পাকিস্তানের পচা গলিত লাশের তলায় ঢাকা দিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্বের সকল চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছেও এই তথ্যটি আজ অজানা নয়। আর ঠিক এই কারণেই মার্কিন সিনেটের আরও একজন প্রভাবশালী সদস্য রিপাবলিকান দলের মিঃ চার্লস পার্সি মন্তব্য করলেনঃ পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। আর কোন অবস্থাতেই দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানে জোড়া লাগানো সম্ভব নয়।

রিপাবলিকান সিনেটর পার্সি সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখে গেছেন। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোর তিনি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের হোমড়া-চোমড়াদের সঙ্গেও কথা বলে দেখেছেন এবং দেখেশুনেই তিনি বলেছেনঃ এখন আর যাই হোক, একথা কল্পনাও করা যায় না যে পাকিস্তান আবার বেঁচে উঠবে। আগের অবস্থা ফিরে আসবে এ কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বাঙালীর মনোভাব একই রকম। বাঙালীদের কাছে পাকিস্তানীরা বিদেশী হানাদার ছাড়া আর কিছুই নয়।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেনঃ বাঙালী জাতি আজ যে ইস্পাতকঠিন সংকল্প নিয়ে লড়াই করবে তা একটি বিরাট ও মহৎ সংকল্প। আমি আশা করি পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নায়করা এটা উপলব্ধি করবে এবং ই উপলব্ধির উপরেই তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

সিনেটর চার্লস পার্সি বলেনঃ আমি পাকিস্তানী সামরিক সরকারের নেতাদের এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনে তারা যদি আর এক পা অগ্রসর হয় তাহলে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা যদি তথাকথিত বিচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ড দেয় তাহলে পৃথিবীর কেউ-ই তাদের ক্ষমা করবে না।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

... বাংলাদেশ পরিস্থিতির এই ক্রমাবনতিতে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দারুণ উদ্বিগ্ন। বিশ্বজনতার এই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বরে এক বিবৃতিতে তিনি বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের প্রতি এক দারুণ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ বাংলাদেশের ঘটনাবলী বর্তমানে যেভাবে জটিল হয়ে পড়ছে সেখানকার পরিস্থিতি বর্তমানে যেভাবে দ্রুত অবনতির দিকে গড়িয়ে চলেছে এবং এর ফলে প্রতিনিয়ত যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর সমস্যাদির উদ্ভব ঘটছে তাতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে দারুণ উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে।...

তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতি এখন এত দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এ ব্যাপারে বিলম্ব হলে যে কোন রকমের মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেবে এবং তা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সীমার মধ্যে সীমিত থাকবে না। তিনি বলেনঃ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর পক্ষে এটা দারুণ এক উদ্বেগের ব্যাপার। বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধান আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে অবিলম্বে এগিয়ে আসবে হবে।

সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বলেনঃ গত ১৯৭০ সালের নভেম্বরের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছে। তারপর সেখানে শুরু হয়েছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান এবং তাতেও লক্ষ

লক্ষ মানুষের জীবনহানি ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। তিনি বলেন, আজও বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশের তাঁবেদার সরকার খাড়া করেছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে- কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে না, বরং প্রতিদিনই জঙ্গী সরকার যতই গলাবাজী করুক না কেন তারা সেখানে তাদের গণবিরোধী নীতি এখনও সামনে চালিয়ে যাচ্ছে।

সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট বলেনঃ বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের ফলেই এই দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকসমূহের মানুষ আজ দারুণ এক শোচনীয় অবস্থার মুখে পড়েছে। অবিলম্বে সেখানে বড় রকমের ত্রাণ ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গত ২৮শে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদাররা যা করেছে যা করেছে এবং আজও যা করে চলেছে তার এক মর্মান্তিক বিবরণ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর কঠোর সমালোচনা করেন।

অধিবেশনের শুরুতে সোভিয়েট উইনিয়ন, সুইডেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ কঠোরতম ভাষায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের সমালোচনা করে বলেনঃ পাকিস্তানী হানাদাররা বাংলাদেশে যা করছে এবং আজও যা করে চলেছে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁরা দাবী করেন, অবিলম্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতার অবসান ঘটাতে হবে। তাঁরা বলেছেনঃ বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে পাকিস্তানী সরকারী প্রচারযন্ত্র যতই বিভ্রান্তির জাল বুনুক সেখানকার প্রকৃত ঘটনাবলী আজ আর কারও অজানা নয়। পাকিস্তানী সামরিক সরকার বা সেখানকার জান্তা যা-ই বলুক না কেন সেখানে যা ঘটেছিলো তা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বিশেষ কোনো দাবীভিত্তিক আন্দোলন নয়। তা ছিলো বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবন-মরণের আন্দোলন। আর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী নিও-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনই শুরু করেছিলো। গত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেছিলো পাকিস্তানী হানাদাররা তা মেনে নিতে পারেনি। তাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের একমাত্র অপরাধ হলো নির্বাচনে তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যেই তারা বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সুইডেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ গভীর আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, অবিলম্বে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান না করা হলে তা এক মহাপ্লাবী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে এবং তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ক্রিসটার ভিকম্যান বলেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী যা চালাচ্ছে তা কোনোমতেই সমর্থন করা যায় না। দেশমাতৃকার বুক থেকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে হটিয়ে দেবার জন্যে বাংলাদেশের মানুষ আজ পাল্টা আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশের পাক অধিকৃত এলাকার সর্বত্রই দুর্বার লড়াই চলছে এবং এ লড়াইয়ের পরিণতি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে দারুণ বিপজ্জনক। মিঃ ক্রিসটার ভিকম্যান এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে মান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এবং বাংলাদশের মানুষের পূর্ব নিরাপত্তার ব্যাপারে অবিলম্বে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট না হলে এ সংকট বহু দূর গড়াবে।

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস স্যুম্যান বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশ সংকটের সমাধান করতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশের সংকট আরও বিস্তার লাভ করবে।

২ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশে সাধারন মানুষের উপর পাকিস্তানী হানাদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ঢাকায় বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মিঃ টাইগারম্যান পদত্যাগ করেছেন।

মিঃ টাইগারম্যান গত ছ'বছর ধরে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাঙ্কের একজন বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তিনি গত ডিসেম্বর মাসে শিকাগো গিয়েছিলেন। মিঃ টাইগারম্যান একজন মার্কিন নাগরিক। তিনি শিকাগো থেকে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন।

মিঃ টাইগারম্যান বলেনঃ বাংলাদেশ অত্যন্ত পরিচিত দেশ। এদেশে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পর এখানকার প্রতিটি জিলা প্রতিটি শহর-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে আমি ঘুরেছি। ঘুরেছি একবার নয়, বার বার। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় তিনি এ পর্যন্ত ঘুরেছেন ১৮ বার।

গত ৮ই সেপ্টেম্বরে আবার তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বলেনঃ বিমান থেকে নেমেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই পরিচিত ঢাকা বিমানবন্দর এ যেন নয়। এ যেন বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোন বিমান ঘাঁটি। বিমান বন্দরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলোকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে দেখলাম। দেখলাম বিমানবন্দরের চারিদিকে অসংখ্য বিমানবিধ্বংসী কামান। টার্মিনাল ভবনের ছাদে, জানালায় আর চিলতে ছাদ বা বারান্দাগুলোয় দেখলাম বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার করা হয়েছে এবং সেখানে সশস্ত্র পাকিস্তানী সৈন্যরা বিমানবিধ্বংসী কামান, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তাক করে আছে যেন এখুনি কিছু ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে। আগে যেখানে বিমানবন্দরের পূর্বপাশে রাস্তায় প্রাচীরের ধারে এবং ডমেস্টিক ও ইন্টারন্যাশনাল উইংসের টার্মিনাল ভবনে হাজার হাজার দর্শনার্থীকে দেখতাম লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে এখন সেক্ষেত্রে একজন অসামরিক ব্যক্তিকেও দেখলাম না। আগে বিমানবন্দরে যেসব অসামরিক কাস্টম ও ইমিগ্রেশন বিভাগের কর্মচারীদের দেখতাম, তাদের কাউকেই দেখলাম না। হয় তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হয়েছে, অথবা তারা প্রাণভয়ে এ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরাই সবকিছু করছে। বিমানবন্দরে যেসব বিদেশী নাগরিক যাওয়া-আসা করছে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের নানাভাবে নাজেহাল করছে। পিআইএ বা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের যে বিমানগুলো আগে অসামরিক যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যেতো সেগুলোকে আজকাল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম, গোলাবারুদ ও সৈন্যদের পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মিঃ টাইগারম্যান বলেন, ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে একজন বাঙালীকেও আমি খুঁজে পেলাম না। অথচ দেশটা একান্তভাবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর দেশ।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মিঃ টাইগারম্যান বলেনঃ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আমি দেখলাম এয়ারপোর্ট রোডের দু'পাশে বহু ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে এবং রাস্তার দুধারের বাড়িগুলি জনশূন্য। আর এইসব জনশূন্য বাড়িগুলির ছাদে, বারান্দায় ও জানালায় বালির বস্তা দিয়ে বাঙ্কার বানানো হয়েছে। রাস্তায় দু'হাত ছাড়া চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। এইসব চেকপোস্টে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে কথিত যে দু-একটা অসামরিক গাড়ী চলাচল করছে স্যৈন্যরা সেগুলো তন্নতন্ন করে তল্লাশী করছে। পথচারীদেরও তল্লাশী করা হচ্ছে। পথচারীদের বেশভূষা ও চেহারায় বাঙালীত্বের স্পষ্ট ছাপ পাওয়া গেলে সৈন্যরা তাদের ধরে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টর দিকে যাচ্ছে। বাঙালী বুদ্ধিজীবী তরুণ হলে তো আর কথাই নেই। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোয় যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সারি সারি বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে সশস্ত্র পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার দুপাশে দেয়াল তুলে দিয়ে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। শহরের প্রধান প্রধান সরকারী ভবনগুলোর চারপাশে ১৫

থেকে ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল তোলা হয়েছে। ঢাকা রেডিওকে বর্তমানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর ঢাকার রাস্তায় কেউ হাঁটে না। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শহরের রাস্তায় কেবল পাকিস্তানী সৈন্য, পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ও কুকুর ছাড়া আর কেউ চলাচল করে না। মানুষ সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচার এতই ভীবসন্ত্রস্ত যে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে তারা ভীষণ ভয় পায়। কারণ আজও প্রতিদিন শহরে ধরপাকড় চলছে। কখন কোন মুহূর্তে সেখানে কার জীবনে মৃত্যু নেমে আসবে না কেউ জানে না। প্রায় প্রতিরাতেই বোমা বিস্ফোরণ ও খণ্ড লড়াইয়ের শব্দ শোনা যায়। গোটা শহরটা এখন বদ্ধভূমিতে পরিণত।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বলেনঃ এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সেখানে থেকে কাজ করা আমার পক্ষে যুক্তিগতভাবে, নীতিগতভাবে কিংবা নৈতিকতার দিক থেকে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন , পাকিস্তানে আমি আর কোনদিন ফিরে যাবো না। বাংলাদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হলে আমি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে যাবো। আমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কাজ করবো। দীর্ঘ ছ'বছর থাকার পর আমি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবেসেছি। তাদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের বন্ধন অনেক গভীর।

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

...বৃটিশ কমন্সসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেছেনঃ বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। জাতিগতভাবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভাষা ও সামাজিকতার দিক থেকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র- সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বাঁচার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই বাঙালীরা আজ হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তারা আজ যে লড়াই করছে তা হলো এ দেশকে মুক্ত করার লড়াই- শত্রুমুক্তির লড়াই। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যে যুদ্ধ করছে তা তাদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। আর এই অধিকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্মগত অধিকার।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী-নির্যাতনের ফলে যে দুই লক্ষাধিক শরণার্থী সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে এবং কি নারকীয় নির্যাতনের ফলে তারা তাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে উদ্বাস্তু শিবিরে দিন কাটাচ্ছে তা জানার জন্যে বৃটিশ কমন্সসভার বিশিষ্ট সদস্য মিঃ ফ্রেড ইভান্স লণ্ডন থেকে পশ্চিম বাংলায় গিয়েছিলেন। একাধিক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্য করেন। বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের অসহনীয় নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেরই এগিয়ে আসা উচিত।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতায় বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেনঃ অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলে এশিয়ার এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে। অবিলম্বে এর সমাধান করতেই হবে।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেনঃ বাংলাদেশের মূল সমস্যা মানবিক চেতনা ও মানবাধিকারের সমস্যা। তিনি বলেনঃ একজন গণতন্ত্রী হিসাবে বুলেটের বদলে ব্যালটের মাধ্যমেই যে কোন সমস্যার সমাধানে আমি পক্ষপাতী। বাংলাদেশ সঙ্কটের শুরুতে বিশ্বের গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মতো আমিও এটাই আশা করেছিলাম কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক শক্তি সে সম্ভাবনাকে গোঁয়ারের মতো গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

মিঃ ফ্রেড ইভান্স বলেনঃ আমরা বৃটেনবাসী ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নেমেছিলাম, প্রয়োজন নয়া ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত।...

২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

...গত বাইশে অক্টোবর থেকে পঁচিশে অক্টোবরে মধ্যে নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা হয় তাতে এই উপমহাদেশের পরিস্থিতি এবং পাকিস্তান ভারতের সীমান্তে যে গুণ্ডামি ও তস্করবৃত্তির মহড়া দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে উভয়পক্ষে আরও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে চারদিনব্যাপী আলোচনার পর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়ঃ পাকিস্তান ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে এই উপমহাদেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তাতে এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবার দারুণ আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ভারত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ভারত আক্রমণ করে বাংলাদেশ প্রশ্নকে ভারত-পাকিস্তান প্রশ্নে রূপান্তরিত করার সপক্ষে এবং পরে জাতিসংঘের সাহায্য নিয়ে ত্রাণ পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছে তাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ ভারত আক্রমণের অর্থ হবে পাকিস্তানের আত্মহত্যা, ভারত আক্রমণ করতে গেলে গোটা পাকিস্তানটাই কবর হয়ে যাবে।

গত ছাব্বিশে অক্টোবর মস্কো ও অটোয়ায় যুগপৎভাবে প্রকাশিত সোভিয়েট-কানাডা যুক্ত ইশতাহারে বাংলাদেশ সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কানাডার এই যুক্ত ইশতাহারে বলা হয়ঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতির এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান আনতে হবে যাতে বাংলাদেশের জনগণের আইনসম্মত অধিকার ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষিত এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা পূর্ণ আস্থায় ও মর্যাদায় দেশে ফিরে আসতে পারবেন। কানাডায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলেক্সী কোসিগিনের আটদিনব্যাপী সরকারী সফরশেষে এই ইশতাহার প্রচারিত হয়।

১ নভেম্বর ১৯৭১

... যুগোশ্লাভিয়া সর্বতোভাবেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ একটি শান্তিমকামী দেশ বলে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীবাদী উভয় ব্লকেই এই সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছেই জোটনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়া সমানভাবে সমাদৃত।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটোও আজ বাংলাদেশের পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট টিটো বলেছেনঃ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করেছে এবং আজও তারা সেখানে যা করে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সেখানকার নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও বর্বরতা চালিয়েছে তার ফলেই বাংলাদেশ থেকে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের ঘরবাড়ি সহায়-সম্বল ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াসহ গোটা সরকারী প্রচারযন্ত্র এতদিন প্রচার করে এসেছিলেন যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী মুষ্টিমেয় অবাঙালীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলো, আর তাকেই থামাতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করে জনগণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে বাংলাদেশের মানুষ আজ দেশ থেকে হানাদার নিশ্চিহ্ন করার যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছে তাকে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় অনুচরদের কার্যকলাপ বলে ইয়াহিয়া সরকার কতদিন যাবৎ প্রচার করে এসেছে।

পাকিস্তানের মাথামোটা গোঁয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আর তার জঙ্গী সরকারের অপপ্রচামুখর মুখে বিরাট একটা চপেটাঘাত মারার মতো জওয়াব শোনা গেল গোষ্ঠীনিরপেক্ষ যুগোশ্লাভীয় প্রেসিডেন্টের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে। তিনি বলেনঃ বাংলাদেশ প্রশ্নটি ভারত-পাকিস্তান প্রশ্ন নয়। এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কোন বিষয় নয়। তিনি বলেনঃ এটি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারও নয়।

সপ্তাহব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আগে গত সপ্তাহে মার্কিন টেলিভিশন সংস্থা সি, বি, এস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট টিটো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বাবাসীকে এই সত্যটি জানিয়ে দিয়েছেন।...

৬ নভেম্বর, ১৯৭১

সম্প্রতি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি তথা বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে পাক হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা নগরীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার ঢাকা থেকে পাঠানো এর রিপোর্টে বলেছেনঃ বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক অভিযান শুরুর পর সাত মাস কেটে গেছে কিন্তু এখনও কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। বাংলাদেশের প্রত্যেক শহর-বন্দরের জনসংখ্যা বিগত ২৫ শে মার্চের আগে যা ছিলো এখন তার শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। এই ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষের কিছু অংশ সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে, কিছু লোক নিখোঁজ হয়েছে এবং বাকী সকলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টে বলা হয়ঃ পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তি বাহিনীকে খতম করবে বলে যে দুরাশা পোষণ করেছিলো তা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বরং ফল উল্টো ফলতে শুরু করেছে- বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর হাতে দারুণ মার খাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। লড়াইয়ে তারা তারা কোনোক্রমেই সুবিধে করে উঠতে পারছে না। জলে-স্থলে সর্বত্রই তারা মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের এখন একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো কয়েকটি ক্যান্টমেন্ট।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্টার লিখেছেনঃ বাংলাদশের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর অধিকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওই রিপোর্টার লিখেছেনঃ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাগুলোয় ব্যাপক হত্যা, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসের দ্বারা পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বিভীষিকা ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো তা এখন হ্রাস পেয়েছে। মুক্তিসেনারা এখন দেশের শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বাঙালীদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর ঘৃণা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সামরিক অভিযানের পর প্রথমদিকেও এতখানি ঘৃণা ছিল না। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অসামরিক প্রশাসনে নিযুক্ত বাঙালী এবং সাধারণ বাঙালীদের ওপর এখনও চরম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। একজন বাঙালী একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছিলো-শুধু এই অপরাধেই পাকিস্তানী সৈন্যরা ওই বাঙালী ভদ্রলোকের পরিবারের সকলকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। কিন্তু এত করেও তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠছে না।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা লিখেছেনঃ মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ প্রশ্নটিকে অন্যদিকে ঘোরানোর উদ্দেশ্যে ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ভারতীয়

বাহিনীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষের মাধ্যমে তারা বিষয়টিকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চালাবার চেষ্টায় আছে। এই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করেছে। ফলে বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা, সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্য কমে গেছে।...

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

... সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিঃ ভি, কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন-বাংলাদেশে আজ যে লড়াই চলেছে তা খাঁটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার তথা বর্বর সমর নায়করা বাংলাদেশে গণহত্যা, ধ্বংস আর চরমসন্ত্রাসের নীতির দ্বারা বাঙালীদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছে। তিনি বলেনঃ আমি আশা করি এই বাস্তব ঘটনা যত তিক্ত ও যতো কঠোরই হোক না কেন পাকিস্তান এটা উপলব্ধি করে সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে। সম্প্রতি সোভিয়েট পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ভারত সফরে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ কুদরিয়াভেৎসেভ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন।

বিশিষ্ট সোভিয়েট নেতার এই উক্তিরই আরও স্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠেছে ফরাসী দেশে। ফ্রান্সের লোকবরেণ্য নেতৃবর্গ আজ মনে করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আজ এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাবার কোনো পথ নেই, পন্থাও নেই। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পঁপিদু নিজেই বলেছেনঃ বাংলাদেশ সংকটের মূল হচ্ছে রাজনৈতিক, অতএব বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এ সঙ্কটের সমাধান করতে হবে। তা না হলে সমগ্র উপমহাদেশে বিপর্যয়ের ঝড় নেমে আসবে এবং যার পরিণতি ভাবা দারুণ কঠিন ব্যাপার। বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ ও পৈশাচিকতার ফলেই বাংলাদেশ থেকে ৯৬ লক্ষ অসহায় নরনারী-শিশু বৃদ্ধ তাদের বাড়িঘর-সহায় সম্পদ হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশকে একটি বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিলো। বাংলাদেশে এই ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টির জন্যে পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী তথা জঙ্গী সমরনায়করাই দায়ী। আর ঠিক এই কারণেই সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'য় পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার ও সামরিকজান্তাকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশের যে নব্বই লক্ষাধিক শরণার্থী তাদের সহায়-সম্পদ ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তারা যাতে পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তার উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে তারা যাতে স্বদেশে ফিরে আসতে পারে তেমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। 'প্রাভদা'য় বলা হয়, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীই শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এ সমস্যা আজ এক জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিনত হয়েছে। পাকিস্তানের মাথাগরম জঙ্গীচক্র যুক্তিতর্ক বিসর্জন দিয়ে তাদেরই সৃষ্ট সমস্যার জন্যে গোঁয়ারের মতো ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে।

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

... গত রাতে বিবিস'র এক বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের পাঠানো রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ঃ মুক্তি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গত ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তান তার দশটি সামরিক ঘাঁটি হারিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা পশ্চিম খণ্ডে মোট বাইশটি সীমান্ত চৌকির মধ্যে একুশটি দখল করেছে।

গত রাতে ঢাকা থেকে বিবিসি'র বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ রোনাল্ড রোবসন জানাচ্ছেনঃ মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা এখন যশোরের চৌগাছা থেকে যশোর বিমান বন্দরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর

আক্রমণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অধিকৃত যশোর বিমানবন্দরে রানওয়ে ও কন্ট্রোল টাওয়ারটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে করতে পাকিস্তানী বাহিনী এখন দ্রুত পিছু হটে যেতে শুরু করেছে।

বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অস্ট্রেলীয় বেতার থেকে প্রচারিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়ঃ বাংলাদেশের সর্বত্রই বীর মুক্তিসেনারা সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে শত্রুসেনাদের একের পর এক ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানী হানাদারদের শিবিরে শিবিরে এখন ত্রাহি ত্রাহি হাঁক উঠেছে।

ঢাকা থেকে AFP সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাচ্ছেনঃ শত্রুবাহিনী অধিকৃত ঢাকার সঙ্গে গত সোমবার থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঢাকা-যশোর, ঢাকা-ইশ্বরদী, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-কুমিল্লা এক কথায় বাংলাদেশের সকল আভ্যন্তরীণ রুটে পি-আই এ'র সকল সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। গত মার্চের পর ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার একমাত্র যোগাযোগ ছিলো পাকিস্তানী বাহিনী নিয়ন্ত্রিত পি-আই-এ সার্ভিস। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে তাও বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিসেনারা বর্তমানে চারদিক থেকে শত্রুবাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার শত্রুবাহিনীকে সমূলে নিধন করে চলেছে। সর্বত্রই চলেছে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রা। ঢাকার মাত্র আঠারো মাইল দূরে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা মুন্সীগঞ্জ শহর আক্রমণ করে। মুন্সীগঞ্জ থানার পুলিশের ওপর আক্রমণ করলে থানার একজন পুলিশ অফিসার ও বহু পুলিশ নিহত হয়। মুক্তিসেনারা বিজয় দর্পে সারা শহরে কুচকাওয়াজ করেন। মুক্তিসেনারা মুন্সিগঞ্জ মহকুমার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী থানা দুটিও পুড়িয়ে দিয়ে ঢাকার এক বিশাল এলাকাকে শত্রুমুক্ত করে।

এদিকে মুক্তিসেনারা বর্তমানে উত্তরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সিলেট শহরের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বলে বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ ডোনাল্ড রোবসন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সিলেটের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা হটে যাচ্ছে। তিনি তার বার্তায় জানিয়েছেন মুক্তিসেনারা কুমিল্লার ওপরেও এক ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে।

গত রাতে অস্ট্রেলীয় বেতারের এক সংবাদদাতা বুলেটিনে বলা হয়ঃ বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার আক্রমণ চালিয়েছে তার সঙ্গে একমাত্র বাংলাদেশের গত ঘূর্ণিঝড়েরই তুলনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করবোঃ গত সপ্তাহে NEWSWEEK-এর সিনিয়র এডিটর মিঃ বোচগ্রেভ তাঁর An unwinnable Guerilla war শীর্ষক রিপোর্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এখন এমন এক দুর্জয় গেরিলা যুদ্ধের ফাঁদে পড়েছে যেখান থেকে তাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই।

২৬ নভেম্বর, ১৯৭১

... গত ২২ শে নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর করাচীস্থ সংবাদদাতা গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে God is not with the big battalions শিরোনামের এক দীর্ঘ রিপোর্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেনঃ গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কিত মাও সেতুঙ এর একটি বিখ্যাত উক্তি ভিয়েৎনাম তথা সমগ্র ইন্দোচীন, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিসেনাদের দারুণ প্রেরণা দিয়ে চলেছে। উক্তিটি হলোঃ মাছ

যেমন করে সমুদ্রের অগাধ জলের মধ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, মুক্তিসেনাকেও সেভাবে জনসমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে হবে।

Mr. Malcom Browne তাঁর এই রিপোর্টে বলেনঃ বাংলাদেশের বীর মুক্তিসেনারাও আজ বাংলাদেশের বিশাল জনসমুদ্রে মাছের মতোই সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে।

নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা বলেনঃ গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অধিকৃত বিভিন্ন এলাকা এবং মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বিশাল এলাকা সফল করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি কোনদিন তা কল্পনাও করিনি। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশের সমগ্র জনগণ মুক্তিসেনানী হয়ে উঠবে একথা ভাবাও যায় না। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা নয় বাংলাদেশে গিয়ে আমাকে তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আজ বাংলাদেশের যে কোন পর্যটক যেকোন সাংবাদিক যান না কেন তিনিও আমার মতোই বিস্ময়ে মুগ্ধ হবেন।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশের সর্বত্র শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে আমার শুধু বার বার একটা কথাই মনে হয়েছে যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থেকে এইসব হতভাগ্য পাকিস্তানী সৈন্য ও সমর নায়করা কিছুই শেখেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকায় আমি যেসব পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করেছি তাদের সবাইকেও মনে হয়েছে এক একটি আস্তো উজবুক।

পাকিস্তানের মাথামোটা সমরনায়করা বাংলাদেশে বড়ো বড়ো রেজিমেন্ট ও ব্যাটেলিয়ন নিযুক্ত করেছে বাঙালীদের মুক্তি সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু God is not with the big battalions -অর্থাৎ আল্লাহ তাদের সহায় নন। বাংলাদেশের গণগেরিলাদের হাতে তারা চূড়ান্তভাবে মার খাচ্ছে। পাকিস্তানের ব্যাটেলিয়নগুলো এখন কেবল প্রাণরক্ষার জন্যেই লড়াই করছে। বাংলাদেশের নদী-মাঠ-প্রান্তরে আর জলাভূমিগুলোয় পাকিস্তানী যুদ্ধজয়ের স্বপ্নের কবর দিয়েছে বাঙালী গেরিলারা। যে কোন বিদেশীর পক্ষে বাংলাদেশের এই বাস্তব পরিস্থিতিটুকু উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ শুধু গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে নয়- বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহের প্রতিটি শহর-বন্দরের সর্বত্রই মুক্তিবাহিনীর দেখা পাওয়া আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, দোকান, বিদেশী ফার্ম, কনসুলেট অফিস থেকে শুরু করে সরকারী অফিস আদালতের প্রত্যেকটি দফতরে তারা সক্রিয়। বাংলাদেশের আমি যেখানে গেছি, যার সঙ্গে কথা বলেছি সবখানে সবার মুখে একই কথা শুনেছি পাকিস্তানী হানাদারগুলোকে আমরা নিশ্চিহ্ন করবোই। আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদারমুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চলবেই।

পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এখন এমন অবিশ্বাস্যরূপে কমতে শুরু করেছে যা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে আজ এটাই কঠোর বাস্তব।

দৃষ্টিপাত

১৪ জুন, ১৯৭১

আমাদের চোখের সামনেই যেন একটি মর্মান্তিক ইতিহাস তার পৃষ্ঠাগুলো দিনের পর দিন উন্মোচন করে দিল। আর আমরা সবাই হয়ে থাকলাম ইতিহাসের এক-একজন উজ্জ্বল সাক্ষী। সর্বযুগের, সর্বকালের এবং সর্বদেশের একটি নিষ্ঠুরতম ঘটনা, একটি অমানুষিক পৈশাচিকতা, একটি হৃদয়বিদারক, বিশ্বাসঘাতকতা

আমাদের চোখের সামনেই ঘটে গেল। আমরা চোখ দিয়ে দেখলাম, আমাদের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে অনুভব করলাম এবং আমরা সবাই বহু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করে আবার নতুন সূর্যের অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। নতুন দিনের আশায় আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ উজ্জীবিত নতুন সংগ্রামে আমরা সমগ্র বাঙালী আজ শপথ গ্রহণ করেছি। এ সংগ্রাম আমাদের সুনিশ্চিত মুক্তি নিয়ে আসবে, এ সংগ্রাম আমাদের বিজয়ের তোরণদ্বারে উপস্থাপন করবেই।...

বন্ধু, আমরা তো কোন অন্যায় করি নাই। বৃটিশ বেনিয়াদের উৎখাত করে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করতে সারা ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালীর অবদান সবচেয়ে বেশি। মহামতি গোখলে তাই একদিন বাঙালীকে লক্ষ্য করে এ যুগের একটি পরম সত্যবানী উচ্চারণ করেছিলেন What Bengal thinks today, Indian thinks tomorrow -অর্থাৎ বাঙালী আজ যা ভাবে, সারা ভারত তা চিন্তা করে আগামীকাল। রামমোহন, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নেতাজী সুভাষ বসু, নজরুল ইসলাম এবং এই জাতীয় আরো বহু নাম উচ্চারণ করা যায় যাঁরা সারা ভারতীয় উপমহাদেশকে মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিও ছিল বাংলাদেশ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকায়। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব যিনি সারা বিশ্বের কাছে পেশ করেছিলেন তিনিও ছিলেন একজন বাঙালী-বাংলার নয়নমণি, বাংলার বাঘ ফজলুল হক। পাকিস্তান অর্জনের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুতে মুসলিম লীগের বিরোধী মন্ত্রিসভা ছিল-সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান চায় কিনা তা নির্ধারণ করতে হয় গণভোট নিয়ে। সারা পাকিস্তানে একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ সরকার কায়েম ছিল। সুতরাং পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি বহুলাংশে নিস্পৃহ ছিল-এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ এবং অগ্রণী নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। বাঙালীর আন্দোলনেই পাকিস্তান এসেছে পাঞ্জাবীম সিন্ধী, বেলুচি বা পাঠানদের আন্দোলনে নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই মাতব্বর হয়ে এলো পাঞ্জাবী, কি চাই? না লুটের মাল চাই-এলো সিন্ধী, এলো পাঠান। কোথায় লুট করা যায়। আর কোথায়! সোনার বাংলায় সোনা ফলে। সুতারাং সবাই মিলে লুটের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু লুট করতে গিয়ে দেখা গেল বাঙালীর সাধনা, বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর সংস্কৃতি সব কিছু অত্যন্ত প্রদীপ্ত। সুতরাং শুরু হলো ষড়যন্ত্র। ধ্বংস, করতে হবে বাঙালীর আসল চেহারাকে। ইসলামকে সামনে রেখে পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে সামনে রেখে তাদের এই লুণ্ঠনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর দিনের পর দিন ষড়যন্ত্রেও জাল বিস্তারিত হতে থাকলো। প্রথম আঘাত এলো ভাষার ওপর তারপর অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শুরু হলো শোষণের এক সুপরিকল্পিত আয়োজন, আরম্ভ হোল শাসনের এক নিদারুণ প্রয়াস। আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছিলাম এবং প্রত্যেকটি বাঙালী পাকিস্তানের নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের আদর্শকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে একান্ত সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের দেউলিয়া অর্থনীতিতে পুষ্ট মানুষ নিজেদের স্বার্থপরতাকে ভিত্তি করে বাঙালীর সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে বড় হবার জন্য মেতে উঠেছিল, আর তাই তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিরে পরিণত করলো। কথায় কথায় আমরা যে পাকিস্তানের সত্যিকার নাগরিক সে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলো-আমাদের আন্তরিকতা, আমাদের বিশ্বস্ত চেতনা সবকিছু পদদলিত করে আমাদের সবাইকে পর্দার সামনে থেকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে যাবার সুপরিকল্পিত কাজ শুরু হোল। আর এই হোল পাকিস্তানের বিগত তেইশ বছরের ইতিহাস। বর্তমান শতাব্দীর নিমর্ম একটি ইতিকথা।

(‘চেনাকণ্ঠ’ ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

১৬ জুন ১৯৭১

বাংলার প্রাণের নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হককে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদীচক্রের মুখপাত্ররা একদিন বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিয়েছিল। বলেছিল Mr. Fazlul Hoq is self-confessed traitor ১৯৫৪ সালের

নির্বাচনে কুচক্রী মুসলিম সরকারের অনুসারীগণ বাংলার মাটিতে সাংঘাতিক পরাজয়বরণ করে আবার পর্দার অন্তরালে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার সপক্ষে সমগ্র বাঙালী অকুণ্ঠ রায় দিয়েছিলেন। বাঙালীর এই একতা ও নবজাগ্রত চেতনা পশ্চিমাদের ভয়ের ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাকে যেমন নির্বিচারে শোষণ করা চলছিল এবার সে পথে এক বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই জাগ্রত জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যখন শেরে বাংলা ফজলুল হক ব্রজকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকেন যে বাংলাকে আর শোষণ করতে দেয়া হবে না তখন পশ্চিমা আমলাগণ এবং স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদরা বিপদ গুনতে শুরু করে। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হতে থাকে-আর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ফজলুল হককে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক। এই ষড়যন্ত্রের নেতা সেদিন ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ প্রমুখ। এদের সাথে হাত মিলিয়েছিল চুয়ান্নোর নির্বাচনে পরাজিত মুসলিম লীগের কতিপয় বাঙালী মীরজাফর। ১৯৫৫ সালের ২৯ শে মে বাংলার দরদী নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক যখন করাচী থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে ফিরে এলেন তখন বিপুল জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস-নিজের দেশে ফিরে এসে, যে বাংলার মাটিকে ফজলুল হক প্রাণের মত ভালবাসতেন সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলবার অধিকার তাঁর রইল না। সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় তাঁকে বিমানবন্দর থেকে গৃহে নিয়ে যাওয়া হোল এবং নিজের ঘরে তাঁকে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হোল। ছয় মাস তাঁকে বাইরের কোন লোকের সাথে মিশতে দেয়া হোত না। এমনকি পবিত্র ঈদের দিনে মুসলিম জামাতের সাথে একত্রে বসে নামাজ পড়তে পর্যন্ত তাঁকে দেয়া হোত না। বাংলাকে ভালবাসার এই হোল শাস্তি-বাংলার দুঃস্থ, নিঃস্ব, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের জন্য কথা বলার এই হোল সত্যিকার পুরস্কার। ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করে একদিন যে ফজলুল হক বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষা করতেন, বাংলার গ্রামে, বন্দরে, শহরে অসংখ্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার পথ যিনি সুগম করেন এবং সর্বোপরি লাহোর বৈঠকে যিনি সারা বিশ্বের সামনে পাকিস্তান প্রস্তাব তুলে ধরেন সেই ফজলুল হক, সেই শেরে বাংলা ফজলুল হক সেদিন প্রবীণ ও বৃদ্ধ বয়সে নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন। যেদিন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস ও আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফজলুল হক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন কোথায় ছিল ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মোহাম্মদ? বৃটিশের তাঁবেদার ও গোলাম সেজে তারা তখন চাকরি করতো ও নিজেদের সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাঁচিয়ে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করতো এই দুই পরাশ্রিত বশংবদ জানোয়ার। আর পাকিস্তান প্রস্তাবের যিনি উদ্যোক্তা, যাঁরা হাতে পাকিস্তান প্রস্তাবের জন্য, সেই মনীষী ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক বলতে এদের এতটুকু বাধলো না।....

উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনের পর এসেছে অভিশপ্ত একাত্তর সাল। এবারেও সেই একই খেলার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। চুয়ান্নোর নির্বাচনের পর শিকার ছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক, প্রবীণ গণনেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও অসংখ্য দেশপ্রেমিক। শিকার ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আজকের নির্বাচনের পর শিকার হয়েছেন বাংলার অবিসংবাদিত প্রাণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। যে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং এম, এম, আহমেদ একদিন ছিল বৃটিশের পদলেহী চাকর, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল এক-একটি অখ্যাত-কুখ্যাত সাধারণ গোলাম, আজ তারাই হয়েছে দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতা। আর ফজুলল হকের ভাগ্যে যেমন জুটেছিল বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি, তেমনি বাংলার প্রাণের নেতার সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একমাত্র গণনেতা আজ হলেন দেশদ্রোহী। ভাগ্যের এ এক নির্মম পরিহাস বটে-রবীন্দ্রনাথের উপেনের ভাষায় "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আর আমি চোর বটে।"

কিন্তু দিন আর বেশী দূরে নয় যখন এই ষড়যন্ত্রের জাল আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবোই এবং বাংলাদেশকে এই দানবদের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবোই। আসুন আপনি কৃষক-মজুর, আসুন আপনি চাকরিজীবী-বুদ্ধিজীবী, সবার ওপর এসো তোমরা ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-তরুণের দল এবার আমরা দানব হত্যায় ও দানব বিতাড়নের

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। জয় বাংলা। ('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

২৩ জুলাই, ১৯৭১

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকবর্গ তাদের বেতার ও অন্যান্য প্রচারকেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের নিকট দিন-রাত প্রচার করে চলেছে যে তাদের দখলীকৃত বাংলাদেশের অঞ্চলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। বিগত তিন মাসে জঙ্গী শাসকদের অমানুষিক কার্যকলাপ এবং সমগ্র প্রচারণা যে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে আমরা তা জানি এবং বিশ্বের নিকটও তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের চীৎকার এবং ক্রন্দন এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রচারণাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মাসক্যারেনহাস্ নামক 'সানডে টাইমস'-এর একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এই মাসের ১৩ তারিখে করাচী থেকে সপরিবারে লণ্ডনে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবার সুপরিকল্পিত কার্যকলাপের একটি লোমহর্ষক এবং প্রামাণ্য বর্ণনা দিয়েছেন। সানডে টাইমস-এর জেনোসাইড বা একটি জাতিকে নির্মূল করা সম্পর্কে এই প্রামাণ্য তথ্য আজ ইউরোপ, আমেরিকা এবং প্রাচ্যজগতে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কিভাবে শক্তসমর্থ যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে শরীর থেকে রক্ত নিয়ে মৃতদেহগুলোকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, তিনি দেখেছেন সৈন্যরা কিভাবে যাকে খুশী তাকে ধরছে এবং খেয়ালখুশিমত গুলি করে মারছে। তিনি দেখেছেন এই বর্বর পশুগুলো কিভাবে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করছে। এবং এই জাতীয় আরো বহু চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। আর এই ঘটনাগুলো সবই বেশী দিন আগের নয়। মে মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ঘটেছে। সুতরাং একদিকে মৃত্যুর নিষ্ঠুর লীলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের বর্বর হানাদার সেনাবাহিনী, অন্যদিকে জঙ্গী সরকার প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পি-টি-আই পরিবেশিত আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ করবো। কোন একটি শহরে শতাধিক নিরীহ লোককে বলা হয় যে, রেশনের দোকানে এলে তাদেরকে সাপ্তাহিক রেশন দেয়া হবে। লোকজন সরল বিশ্বাসে রেশনের দোকানে উপস্থিত হয়। তখন সেনাবাহিনী রেশনের দোকান খুলে দিয়ে সেই শতাধিক লোককে দ্রব্য নিয়ে দোকান থেকে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল তখন সৈন্যরা পেছন থেকে গুলি করে এবং শতাধিক লোককে সেখানেই হত্যা করে।

এগুলো সবই বর্বরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার এক-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই দৃষ্টান্তগুলো এখন সবই ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য বিদেশী পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে মিথ্যা প্রচারণার তো অন্ত নেই। দেশবাসী সবাই জানেন যে এখনো ট্রেন পুরো চালু করা সম্ভব হয়নি- যে সব জায়গায় দিনে একটি কি দুটো মাত্র ট্রেন চালু হয়েছে সেখানেও বাঙালীদের উঠবার বিশেষ সুযোগ নেই। সড়কপথেও অনুরূপ অবস্থা। মফস্বল শহরগুলোতে লোকজন ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছে না, কেননা বহু ঘটনায় দেখা গেছে যে লোকজন ফিরে এলেই তাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং সড়কপথে গাড়ি দু'এক স্থানে চালু হলেও লোকজন নেই। জলপথের অবস্থাও একই রকম। স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছে কিন্তু দু'একজন শিক্ষক কাজে যোগ দিলেও ছাত্র নেই- এবং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হানাদার সৈন্যদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত কোন ছাত্র পড়াশুনা করতে যাবে না।

অফিস-আদালতের অবস্থাও অন্যরূপ নয়। ঢাকার বেশকিছু পরিমাণ অফিস খোলা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার অফিসগুলো মফস্বল শহরগুলোর অফিসের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু মফস্বল শহরে শতকরা আট-দশটির বেশী

অফিস চালু হয়নি, সেহেতু ঢাকায় লোকজন অফিসে গিয়ে বসে বসে সময় কাটানো ছাড়া করবার কিছু পাচ্ছেন না।

সুতরাং পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক চীৎকার করে যতই বলুক যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে কিন্তু আসলে যে তা সত্য নয় একথা আমরা সবাই জানি। আর আমরা বাঙালী একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশকে যতদিন পর্যন্ত না হানাদার পশ্চিম পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে, ততদিন দেশে স্বাভাবিক অভস্থা ফিরে আসতে পারে না। সত্যিকারভাবে বাংলায় বিগত তিনমাসে যা ঘটেছে তারপর আর কোন অবস্থায়ই এই হানাদার পশুশক্তির সাথে সহযোগিতা করতে একটি বাঙালীও অগ্রসর হতে পারেন না। জোর করে কিছুসংখ্যক লোককে অফিসে, আদালতে, ট্রেনে, বাসে বা শহরে-নগরে নিয়ে এলেও বাংলার মানুষের মন জয় করবার সাধ্য এই পশুশক্তি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। আর তাদের বর্বরতা, তাদের ইতিহাসে নজীরবিহীন হত্যালীলা, পাশবিকতা ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক দেশটি মৃত্যুবরণ করেছে-আর সেখানে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় জন্মভূতি বাংলাদেশ। জয় বাংলা।

('চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

২৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশ! ও নাম কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। এ নামের লাবণী অবনি বহিয়া যায়। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। শেখ মুজিবের বড় প্রিয় গান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর প্রাণের গান। এ গানে বাংলাদেশের মর্মকথাটি আছে। আমার কাছে এ গানের কিন্তু একটা ভিন্ন অর্থ আছে। মনে পড়ছে গাঁ থেকে ফিরছি। অদূরে রাজশাহী শহর দেখতে পাচ্ছি। তেসরা এপ্রিল। সকাল দশটা। মাথার ওপরে উড়ে এলো ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বিমান স্যাবর জেট। তারপর শুরু হলো নির্মম বোমা বর্ষণ। আমি তাড়াতাড়ি একটা খালে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু খালটার দশহাত দূরেই একটি ছেলে হাল চাষ করছে। তাকেও শুয়ে পড়তে দেখলাম। কিন্তু সে নির্বিকার হাল চাষ করতে লাগলো। কোন কিছুই হয়নি। বিমানগুলি চলে গেলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঝাড়তে লাগলাম। কিন্তু ছেলেটি তখন গাইছে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। আমাকে দেখে ও বলদ দুটি থামালো-বললো, আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছিলেন? তার কথায় একটু বিদ্রূপের সুরও ছিল। বললাম, হ্যাঁ ভয় একটু পেয়েছিলাম বৈকি। বললাম, তোমার বুঝি ভয় করেনি। বললো, না। বললো, মরতে তো হবেই স্যার। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার নামটি কি ভাই? উত্তর এলো, অমল। ঘটনাটা ছোট্ট কিন্তু অসামান্য। অমল, বিমল, রহিম, করিম হাল-চাষ করছে আর গান গাইছে, আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি। আম বাগানের নীচে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বীর সেনানী ভাইরা বন্দুক নিয়ে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। রাজশাহী শহরের চারদিকে অতন্দ্র প্রহরী এই ই-পি-আর বাহিনীর জোয়ানেরা। ওদের কাছে বসলাম। পাশেই বাজছে রেডিও। আবার গানঃ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। ই-পি-আর এর কয়েকজন জোয়ান গানের সঙ্গে পায়ের তাল ঠুকছে। ওরই মধ্যে একজন, নাম রশিদ। ঢাকায় বাড়ি, বললো, কি জানেন সাহেব, এ গানটা শুনলেই পরানটা এক্কেবারে ফাইট্যা যাবার চায়। বললো ঐ যে ছেলেটাকে দেখছেন, ঐ যে হাল চাষ করছে। ওর নাম অমল। কাল সারা রাত ট্রেঞ্চ কেটেছে আমাদের জন্য। আর এই যে দেখছেন বুড়ো মিয়াকে, ইনি মসজিদের ইমাম। সারাদিন আমাদের জন্য খাবার দিয়ে যাচ্ছে। পানি আনছেন। বিড়ি-সিগারেট জোগাড় করছেন। বুকটা আমার গর্বে ফুলে উঠলো। বাংলাদেশের মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এমন প্রমাণ আর কখনও দেখিনি।...

(অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ রচিত)

২৭ জুন, ১৯৭১

২৭ জুন, ১৯৭১

একজন মায়ের কথা বলছি। হ্যাঁ, একজন বাঙালী মায়ের কথাই বলতে চাইছি। মার্চ মাসে ইয়াহিয়ার সরকার বন্দুক-রাইফেল জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ জমাও দিয়েছিল। কিন্তু যে মায়ের কথা বলছি তিনি রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর ছেলেদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন-খবরদার, বন্দুক জমা দিবি না। জল্লাদের হাতে বন্দুক দেয়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করবি না তোরা? বললেন তিনি। আমার মনে আছে, তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই বললেন, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করো। হয় ইয়াহিয়ার সেনাদেরকে খতম করবে আর না হয় মরবে। ছেলেরা কথা রেখেছে। তাঁর এক ছেলে শহীদ হয়েছে। আর বাকী দুজন এখনও লড়ছে। গেরিলা আক্রমণে তারা দুজনেই সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছে। এই কিছুদিন আগে এদের দু'ভাইয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। বললাম- তোমার মায়ের কথা বলো। বললে মা আছেন গাঁয়ে। তিনি তাঁর কাজ করছেন। সবাইকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন, প্রেরণা যোগাচ্ছেন। বললে- মা কি বলেন জানেন আপনি? বলেন, মাকে আর দেশকে এক করে দেখবি। তোমরা আমার ছেলে নও, তোমরা বাংলাদেশের সন্তান- এই কথাটা মনে রেখো, ইয়াহিয়ার রক্তপিপাসু সেনারা আমার মতো বহু রত্নপ্রসবিনী মাতাকে হত্যা করেছে। আর এখন রত্নগর্ভা বাংলাদেশকে হত্যা করছে। কিন্তু ওরা জানে না, একজন মাকে হত্যা করা যায় কিন্তু দেশকে হত্যা করা যায় না। বাংলাদেশকে হত্যা করা যায় না। যাবেও না। মাতা আর পুত্রের রক্ত থেকে জন্ম নেবে রক্তবীজের ঝাড়।

এমনি মা আমরা পেয়েছি লক্ষ লক্ষ, আর এমনি পুত্রও পেয়েছি লক্ষ লক্ষ। শেখ মুজিবের বাংলাদেশ আজ মরণ-পণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। সমস্ত শোষিত নিপীড়িত জনগণ আজ জেগে উঠেছে, হাতে তুলে নিয়েছে তারা তরবারি-আজ ভয় নেই। মুক্তিফৌজের বীর ভাইয়েরা প্রতিনিয়ত কঠিন আঘাত হানছে ইয়াহিয়ার সেনাদলের ওপর। আর ভয় নেই। মুক্তিফৌজির সামনে তিনটি প্রধান কর্তব্যঃ

(এক) শত্রুকে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে হবে

(দুই) শত্রুর দালালদের খতম করতে হবে

(তিন) কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনতে হবে।

... আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করছি, আমরা জানি, পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। কারণগুলো কি? প্রথম কারণঃ পৃথিবীর কোনও মুক্তিযুদ্ধ এমন অভূতপূর্ব গণঐক্য দেখে নি। দ্বিতীয় কারণঃ পৃথিবীর কোনও মুক্তিযুদ্ধই যুদ্ধের শুরুতেই সশস্ত্র বাহিনীর এমন সমর্থন লাভ করেনি। স্মরণ করুন কিভাবে আমরা ই-পি-আর, ই-বি-আর পুলিশ, আনসার এবং মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং এ মুহূর্তেও তারা কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। এমন কি ভিয়েতনামের যুদ্ধেও প্রথম দিকে এ ধরনের সশস্ত্র সমর্থন পাওয়া যায়নি, কাজেই সবদিক থেকে বিচার বিবেচনা করে বলা যায় আমরা সবাই একটি গৌরবময় মহান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছি। মনে রাখতে হবে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কারণসমূহ যথার্থ। আমরা লড়াই করছি ন্যায়ের জন্য এবং আমাদের লড়াইও যথার্থ পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই বিশ্বের সকল দেশ থেকে আমরা সমর্থন, সাহায্য ও সহানুভূতি পাবোই এবং পাচ্ছিও....

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

৯ জুলাই, ১৯৭১

মাঠে মারা গিয়েছে ইয়াহিয়া খানের লম্বা-চওড়া রেডিও গলাবাজি। শাহী কায়দায় ফরমান জারির ভঙ্গিতে কাকাতুয়া ইংরেজীতে আওড়ানো প্রায় একঘন্টার নরম গরম চরম বিলাপ আর প্রলাপ কি করে দাগ রাখবে

দুনিয়ার মানুষের মনে? তবু, যাদের মাথায় দুর্বুদ্ধি ভর করেছে, যাদের মাধ্যমণি হিসেবে ইয়াহিয়া খান ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে, তারা এই রেডিও গলাবাজির আগে একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বাজনা তো কম বাজায়নি, কাঠখড় তো কম পোড়ায়নি, গৌরীসেনের টাকা তো কম খরচ করেনি, বেঈমানি ঢাকবার জন্যে দেশদেশান্তরে মিষ্টি কথা তো কম পরিবেশন করেনি। পাকিস্তানী শাসকচক্রের ঝানু ঝানু উপদেষ্টারা ইতিমধ্যে তদ্বির-তদারকের বাকি কিছু রাখেনি। কিন্তু কোন ফল হলো না। ইয়াহিয়া খানের ২৮ শে জুনের রেডিও ভাষণ একটা জঘন্য অপভাষণ হিসেবেই বরং চিহ্নিত হয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে গেলে রাওয়ালপিণ্ডি সামরিকচক্রের সেই মুনাফালোভী দুর্বুদ্ধিতা, যা এই চক্রকে বাংলাদেশ দমনে প্রবৃত্ত করেছে। ইয়াহিয়া খান তার প্রলাপে বলেছে যে, রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক চক্র নিজেরাই শাসনতন্ত্র রচনা করবে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও শাসনতন্ত্র রচনার এখতিয়ার নাকচ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকে তো তারা ধ্বংস করতেই চেয়েছে। এটা ইয়াহিয়ার কারণে দুনিয়ার কাছে জাহির হয়ে গিয়েছে।

২৮শে জুনের আগে দুনিয়ার যেসব রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চিন্তা করছিলেন যে, দাবনীয় অপকর্ম করে ফেলে হাতেনাতে ধরা পরে ইয়াহিয়া খানেরা হয়তো তওবা করে পশ্চিম পাকিস্তানে বহাল থাকার জন্যেও দুনিয়ার কাছে একটা সম্মানজনক মীমাংসাসূত্র রাখতে পারবে, তারাও খুঁজে পেতে কিছু পায়নি ইয়াহিয়া খানের বাচনে।

বস্তুতপক্ষে ২৮শে জুনের পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বলেছেন, তাদের প্রত্যেকটি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায় যে, এইসব মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানের বাচনকে আমলেই আনেননি। নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক মীমাংসাসূত্রের জন্যেই তাগিদ দিয়েছেন। এটা ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা কূটনৈতিক সূত্রে ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক সমাধান সূত্রগুলিকে প্রত্যাখান করেছেন।

কানাডা আর আয়ারল্যান্ডের আইন পরিষদের যেসব সদস্য বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন, তাদেরও একই কথা। তাঁরা স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের রাওয়ালপিণ্ডি চক্রের জল্লাদেরা একটা গোটা জাতিকে সাড়ে সাত কোটি নরনারী শিশুকে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ধরনের হত্যাকাণ্ড করেছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের যে তাগিদ তাঁরা দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারা যায়, ইয়াহিয়ার বাচনকে তাঁরা ঝাড়া অগ্রাহ্য করেছে। গোটা বাঙালী জাতিকে নিধন করার জন্য পাকিস্তানী শাসকচক্র যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে এতদিন, ইয়াহিয়ার বক্তব্য তারই একটা বেতালা পদক্ষেপের মহড়া ছাড়া যে আর কিছু নয় সে কথা আজ বিশ্বের মানুষ বুঝে নিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে আসছে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা গেল, চেকোশ্লোভাকিয়ার কর্মকর্তারা সরকারীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা বাংলাদেশের ব্যাপারে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। এর সোজা অর্থ এই যে, ইয়াহিয়া খানের রেডিও বাচনকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব, এটাই বর্তমান, এটাই ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ নিজের শাসনতন্ত্র নিজেরাই তৈরী করবে। দুনিয়ার দেশ-দেশান্তরের কাছে এই ঘটনা অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ঘটনা হিসেবে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ইয়াহিয়া খানেরা মিথ্যা। স্বাধীন বাংলাদেশ সত্য। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নরনারী-শিশু বুকের রক্ত ঢেলে এই সত্যের ভিত্তিতেই বাংলাদেশের মুক্তির দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

('জামিল শারাফি' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

১০ জুলাই, ১৯৭১

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে দুটো পত্র পৌঁছেছে লণ্ডনে। সরকারীভাবে সরকারী চিঠি। এগুলো নাকি প্রতিবাদলিপি। কিন্তু কিসের প্রতিবাদ? দুনিয়া তাজ্জব হয়ে গিয়েছে খবরটা শুনে। পাকিস্তানী জল্লাদ সরকার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখে জানিয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে বৃটেনের সংবাদপত্রে পাকিস্তানবিরোধী প্রচার চলছে- এ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থা হোক।

বিশ্ববাসীর মনে স্বভাবতই দুটো প্রশ্ন জেগেছে। বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার পরেও যে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসকচক্র অতীতের রেশ ধরে বাংলাদেশের ঘটনাকে এখনও আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বোঝাতে চেষ্টা করছে। আর শুধুমাত্র অস্ত্রপাতির জোরে বলে বেড়াচ্ছে যে বাংলাদেশ তাদের দখলে রয়েছে- তারা বৃটেনের খবরের কাগজগুলি কি লিখছে না লিখছে তার ওপর খবরদারি করতে চাইছে কোন লজ্জায়? এটা হতে পারে প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা ভিন্ন ব্যাপার থেকে এসেছে। পাকিস্তানী জল্লাদেরা নিজেদের হাতে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করা ঢাকা কিংবা চট্টগ্রাম নগরীতে রাজমিস্ত্রী দিয়ে দুটো-চারটে দালানকোঠা মেরামত করিয়ে আর রং ফিরিয়ে, নিজেদের হাতে খুন করা হাজার হাজার নরনারী-শিশুর গলিত লাশ গুম করে সাফাই-সাক্ষীর মারফত প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিল যে, পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা বেকসুর, মাসুম; তারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে জান কোরবান করে দিয়েছে আর ফৌজী কর্তাব্যক্তিরা করুণার বড় বড় থলে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বসে আছে জনসংযোগ দফতর হাট করে খুলে। ফল এতে উল্টোই হয়েছে। সাংবাদিকরা অবরুদ্ধ নগরীগুলিতে ঢুকবার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন এবং ফাঁস করে দিয়েছেন পাকিস্তানী জল্লাদদের সমস্ত গোমর। শেষ রক্ষা করার জন্যে, সত্যের বিশ্বপরিব্যাপ্ত অগ্নিশিখাগুলিকে ঢাকা দেবার জন্যে পাকিস্তানী জল্লাদেরা এখন চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেশের সরকারকে দিয়ে কিছু একটা করাতে। কিন্তু এদের মাথায় কি এ কথাটা ঢুকছে না যে, যে হাত দিয়ে এরা সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র লিখছে, তা বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ নরনারী-শিশুর রক্তে রঞ্জিত সে রক্তের দাগ লেগে যাচ্ছে এদের চিঠিপত্রেও? তবে দুনিয়ার সামনে উপরোক্ত দুটো প্রশ্নের একটাই জবাব রয়েছে। দু'কান কাটা রাস্তার মাঝ দিয়েই চলে। আসামীর কাঠগড়ায় উঠে আবোল-তাবোল বকে পাগলের ভান করে। সত্যকে চাপা দেবার জন্যে পাকিস্তানী জল্লাদেরা কম চেষ্টা করেনি এরা ২৫শে মার্চে নৈশ হামলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা নগরীতে সমাগত সমস্ত বিদিশী সাংবাদিকদের হোটেলের কামরায় আটকে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও সেই অবরোধ ভেদ করে সাংবাদিকরা পাকিস্তানী জল্লাদদের নারকীয় কাণ্ডের যে তথ্য আর ছবি নিয়েছিল, সেই সব তথ্য আর ছবি কেড়ে নেয়া হয়েছিল করাচী বিমানবন্দরে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে এরা ঢুকতে দেয়নি, পাছে পাপ প্রকাশ পেয়ে যায় এই চিন্তায়। এরা বাংলাদেশের যেসব খবরের কাগজের অফিসকে দালান সমেত পুড়িয়ে ছাই করেনি, তাদের ওপর জঙ্গী আইনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কোন ফাঁকে যাতে বাংলাদেশ থেকে খবর বাইরে না যেতে পারে সে জন্যে এরা বিদেশীদের জন্যে নির্ধারিত কূটনৈতিক শিষ্টাচারকে বুটের তলায় মাড়াতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু সত্যকে চাপা দেওয়া যায়নি। পাকিস্তানী জল্লাদেরা ভেবেছিল, দিন চলে যাবে একরকম করে এবং দুনিয়ার মানুষ আস্তে আস্তে ভুলে যাবে।

('জামিল শারাফী' ছদ্মনামে রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

১৬ জুলাই, ১৯৭১

বাংলাদেশের মত এমন শান্তির দেশ, এমন সুখের দেশ আর কোথায় আছে। এমন জন্মভূমি ক'জনে ভাগ্যে পায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননী। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল ঘরকুনো। বুঝিবা একটু আড্ডাবাজ। কিন্তু বাংলার ছেলেমেয়েরা কোনোদিন গোলমালে নিজেদেরকে জড়াতে চায়নি। মায়ের স্নেহ, দাদা-

দাদী আর নানা-নানীর আদর কেড়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। অথচ আজ! ভাবলে অবাক লাগে। এই তো সেদিন! ঘুরছি আর ঘুরছি। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম মুক্তিবাহিনীর শিবিরে। শান্ত নিরীহ বাঙালীর ছেলেরা দীপ্ত অগ্নিশিখার মত জ্বলছে। এক একটি ছেলে যেন জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে নিয়েছে। মায়ের আঁচল ছেড়ে, ঘরের নিশ্চিন্ত কোণ ছেড়ে, সামান্য সুখ আর আনন্দের পথ ত্যাগ করে বাংলাদেশের ছেলেরা এই প্রথম অস্ত্রের ভাষায় কথা বলছে। পার্থক্যটা অনুভব না করে উপায় নেই। আমিও না করে পারিনি। বাংলাদেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ নেই মুক্তিবাহিনীর স্কুল-কলেজ। তা সব সময়ই খোলা।

এমনি একটি মুক্তিবাহিনীর শিবিরে গেলাম সেদিন। সোনার টুকরো হীরের টুকরো সব ছেলেরা লড়াইয়ে যাবে তাই তৈরী হচ্ছে। বললাম, কেমন আছো ভাইরা আমার? কেমন আছো? সবাই বললে ভালো আছি। বললেঃ আমাদের বিপ্লবী সেলাম নিন। ওদের সঙ্গে কথা বললাম। পেয়ালা পেয়ালা চা খেলাম। একজন বললেঃ আমরা এখন লড়াই করতে যাচ্ছি। বললাম- সে কি? এক্ষুনি? হ্যাঁ এক্ষুনি। প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম। অস্ত্রে ওরা দীক্ষিত হচ্ছে- অস্ত্রে ওরা শাণ দিচ্ছে। ওদের সমস্ত মাংসপেশীগুলো ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, ওরা পায়ের তালে তালে মার্চ করছে- ওরা তৈরি হচ্ছে, লড়াই করতে যাচ্ছে। বাংলার সন্তান মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে, শত্রু নিকেশ করছে। পার্থক্যটা সত্যিই ভুলবার মত নয়। মায়ের আদূরে খোকা নয় আর। ঘাড়ে বন্দুক, বুকে অসীম সাহস, চোখে-মুখে উজ্জল বিশ্বাস, পায়ে পায়ে বলীয়ান অশ্বের বেগ। ওদের একজন বললে-দেখবেন লড়াইটা। বলার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল মুক্তিবাহিনী আর একদল পাক-সেনা। শুরু হল লড়াই। ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী হেরে গেল। আমি হাততালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানালাম। এরপর ওরা গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল দেখালো। আর একবার হাততালি দিয়ে ওদেরকে অভিনন্দন জানালাম। ওদের অবসর ওরা এমনি করে কাটায়। আনন্দের মধ্যে শিক্ষা আর শিক্ষার মধ্যে আনন্দ। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এভাবে তৈরী হচ্ছে। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনীর কবর রচিত হবে অচিরে।

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

১৯ জুলাই, ১৯৭১

কবি শহীদ সাবের আজ আর নেই- কিন্তু তার কবিতা আছে। সেই কবিতাটিই পড়ছিলাম। গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনী যেভাবে গেরিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল- সেসব কথা মনে পড়েছিলো শহীদ সাবেরের। সাবেরের মনে তৈরি হচ্ছিল বিদ্যুতের-জন্ম হচ্ছিল একটি কবিতার- আর সে কবিতা মুহূর্তে মনকে আক্রান্ত করে।

কবিতাটি পড়ছিলাম। শহীদ সাবের আজ আর নেই। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনাবাহিনী হত্যা করেছে শহীদ সাবেরকে। হত্যা বলবো, না অন্য কিছু? শহীদ থাকতেন ঢাকার দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ'-এর কার্যালয়ে আগুনে-বোমা ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হল সংবাদ কার্যালয়। তাঁরই সঙ্গে পুড়ে গেলেন শহীদ সাবের- যে শহীদ সাবের ছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী, যে শহীদ ছিলেন মুক্ত মানবতার প্রতীক। ইয়াহিয়ার খুনী সেনাবাহিনী শুধু অধ্যাপক হত্যাই করেনি। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী কেউ বাদ যায়নি।

শহীদ সাবের নেই- কিন্তু আছে তাঁর কবিতা। কবিতাটির একটি ভূমিকা লিখেছিলেন সরদার ফজলুল করিম। লিখেছিলেনঃ

'কিশোর শহীদ সাবের আমারই ন্যায় জেল থেকে জেলান্তরিত হতে হতে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এসে আমার সঙ্গে দৈবক্রমে মিলিত হয়েছিলেন। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব-বাংলার

আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল। আর সে আন্দোলনের সঙ্গে ইলা মিত্রের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।''... সরদার ফজলুল করিম আরও লিখেছেনঃ ''ইলা মিত্রের গ্রেফতার এবং তার উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন তখনকার সংগ্রামের উপকথায় পরিণত হয়েছিল। সে কাহিনীর ভিত্তিতে শহীদ সাবের তাঁর 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন।'' সংক্ষেপে এই হল শহীদ সাবেরের সেই বিখ্যাত কবিতার পটভূমি। তাঁর মনে পড়েছিল হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অত্যাচারের কথা। কিন্তু যে কারণে আমি বিস্ময় বোধকরি, তা হল শহীদ সাবেরের সেই কবিতায় ইয়াহিয়ার খুনী জল্লাদ সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন ধর্ষণ, অপহরণ, খুন সবই প্রতিফলিত হয়েছে বিস্ময়কর ভাষায়। কবিরা নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। দেখতে পেয়েছিলেন শহীদ সাবেরও। সবচাইতে বড় কথা সেই ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের শিকার হলেন কবি নিজেই। এমন করে নিজের ভবিষ্যৎ আর কোনও কবি দেখেছেন কি? আছে কি বিশ্বে কোনও উদাহরণ? না নেই- শুধু আছে এই বাংলাদেশে। শহীদের সেই কবিতার ভাষা তাই কান্নায় সিক্ত, ঘৃণায় ঘৃণায় উচ্চকিত, ছন্দে ছন্দে উচ্ছ্বসিত, পাশব শক্তির ঘৃণ্যতম অত্যাচারের কথা এমন কোরে কেউ কখনও প্রকাশ করেনি।...

কবিতাটির প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে একজন জার্মান ফ্যাসিস্ট ক্যাপ্টেন ভের্নের গর্ভবতী একজন রুশ মহিলাকে উলঙ্গ করছে। কারণ, সেই রুশ মা ছিলেন গেরিলা দলের সদস্যা। তাই এই নির্মম অত্যাচার। শহীদ সাবের লিখছেনঃ

মাগো, মা আমার কাঁদছো তুমি?
আমাকে একবার দেখো,
দেখো, আমি স্থির, অটল, চোখের পাতাটি নড়ছে না।
চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই,
কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, লুকিয়ে আনা বইটি।
এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে
সেতো তোমারি ছবি মাগো।

কি সেই ছবি? ছবিটা দেখুন।

চারদিকে রক্ত-জমানো হিমেল মৃত্যু
আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমাণ্ডারের সামনে
মাগো ক্যাপ্টেন ভের্নের কি বুঝবে বলো?
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে?
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে
পররাষ্ট্র লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা।

না, শুধু হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী নয়। বোঝেনি ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্ট জল্লাদ সেনারাও। শহীদ সাবের তারপর লিখেছেন দ্বিতীয় দৃশ্য। ফ্যাসিস্টরা ধরে নিয়ে গেছে গর্ভবতী মাতাকে। পথেই তার সন্তান হল। মায়ের কোল থেকে দস্যুরা কেড়ে নিলে নবজাতককে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার
সেই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে, সেই দুঃসহ শীতে
তুমি উলঙ্গ, মাগো তুমি উলঙ্গ

সেই বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তুমি
হেঁটে চলেছ মাগো, পেছনে বেয়োনেটের ডগা
ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার,
দস্যুরা হাসছে মাগো, মাতৃমূর্তির নগ্নতায়,
তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মাগো
খোঁচায় খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত তোমার শরীর

*　　*　　*　　*

তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারণ যন্ত্রণা বলোঃ
একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ডঃ আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে।
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে

*　　*　　*　　*

শয়তান তোমার ছেলের জান কবজের দিক হুমকি
মাগো, তুমি, মা- তোমার একটি কথার পরে
করছে নির্ভর অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী, বলবে না একটি কথাও।

না জননী একটি কথাও বলেননি। তাঁর চোখের সামনে তার সাদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করা হলো। পরে তিনি নিজেও প্রাণ দিলেন। বাংলাদেশের মা-বোনদের ওপরে এমনি নির্যাতন চালিয়েছে ইয়াহিয়ার বর্বর সেনারা।...

শহীদ সাবের লিখেছিলেনঃ
আর দেখ আমি কারাগারে
মাগো তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
আমার জন্যে কেঁদো না, দেখ দেখ
আমি স্থির, অটল...

না, শহীদ সাবেরের জন্য আমরা কাঁদবো না। বাংলাদেশের তিনিই প্রথম কবি যিনি ইয়াহিয়ার বর্বর ফ্যাসিস্ট সেনাদের হাতে প্রাণ দিলেন।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

২০ জুলাই, ১৯৭১

...পাকিস্তান সরকার শিক্ষিত সেনাবাহিনীর নিয়মিত মৃত্যু রোধ করতে আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে? যেমন- রাজাকার বাহিনী তৈরী করেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। আকাশ থেকে নিক্ষেপ করেছে রাশি রাশি প্রচারপত্র। তাতে বলা হয়েছেঃ হে দেশপ্রেমিক জনগণ দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা বড্ড খারাপ কাজ করছে। আপনারা তাদেরকে ধরিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁ সাহেবদের জন্য এখনও দেশপ্রেমিক আছে, এ কথা ভাবলে হাসি পায়। তবে একটা কথা বলতেই হয়, বাংলাদেশের মানুষ দেশপ্রেমের বাস্তব পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছেন হাতে হাতে।

একজন কৃষক ভাইয়ের সাথে আলাপ করছি। তিনি জমিতে রোয়া লাগাচ্ছিলেন। বললাম- কেমন আছেন? বললে-ভাল আছি, খুব ভাল আছি। বলেই মাথার টোপরের ভেতর থেকে একখানা কাগজ বের করে দিলে। বললে, এই এক্ষুণি ফেলেছে বিমান থেকে। ওখানেই বসে বসে পড়লাম। সেই প্রচারপত্র যাতে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে। কৃষক ভাইটি জানালেন, মুক্তিবাহিনীকে বলবেন- তাদের জন্য আমরা ধান-চাল আটা-গম সব মজুদ করে রেখেছি। এমন জায়গায় রেখেছি, খান সেনাদের চৌদ্দপুরুষও খুঁজে পাবে না।

অবাক লাগলো। একজন সাধারণ চাষী মুক্তিবাহিনীর জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী যা করছে, তা সমস্ত অত্যাচারের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রতিদিন অনুভব করছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদী ধনিকদের দালাল পাকিস্তানী হানাদার সেনার হাত থেকে মুক্ত করতেই হবে স্বদেশকে তাই দেশের সমস্ত অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছেন। দেশের সাধারণ মানুষ। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতাই মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের কারণ। রাজাকার বাহিনী কিংবা শান্তি কমিটি করেও কূল পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণের ব্যাপক অংশে বিরাজ করছে অসন্তোষের তীব্র দাবদাহ।...

আজ 'পাকিস্তান' বলতে যা বোঝায়- তা হল পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনো অভিযোগ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ আমাদের মতই শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকচক্র পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে মিথ্যে ভাঁওতায় ভুলিয়ে, কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাঙালীকে হত্যা করবার কাজে লাগাতে চেয়েছে। সিন্ধু থেকে কৌশলে এভাবে স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক আনা হয়েছে সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্যে মুক্তিবাহিনীর হাতে এরাও প্রচণ্ড মার খাচ্ছে।

গোড়াতে সেই যে চাষী ভাইয়ের কথা বলেছিলাম। তিনিই বলছিলেন- একটা মজার ব্যাপার দেখেছেন? মজার ব্যাপার? আমি অবাক হলাম- চারিদিকে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ এবং অত্যাচারের মধ্যে মজার ব্যাপারটা কি? তিনি বলছিলেন, সিন্ধু থেকে আনা একদল সেনা রাস্তার ধারে বসে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করছে। তারা এ হত্যাকাণ্ডে নিজেদের হাত রক্তাক্ত করতে চায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশে ফিরে যেতে চায়। আর কেউ বা বসে বসে কাঁদে। এরা যুদ্ধ করতে চায় না, মরতে চায় না। পাকিস্তানী শাসকচক্র সিন্ধুর শোষিত জনগণকে লেলিয়ে দিয়েছে শোষিত বাঙালীদের বিরুদ্ধে। মানুষ যুদ্ধ নয়- মানুষ ভাবে, মানুষ চিন্তা করে, মানুষেরই শুধু বিবেক রয়েছে। তাই সিন্ধী, বেলুচী এবং সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা লড়তে চায় না। একজন কম্যাণ্ডিং অফিসার তার অধীনস্থ সেনাদেরকে বাঙালীদের বাড়ি ঘর লুট করতে বললে তারা রাজী হয়নি। উল্টো তারা কম্যাণ্ডিং অফিসারকেই হত্যা করে।...

(অধ্যাপক আবদুল হাফিজ রচিত)

২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা আজ শত্রুমুক্ত। এইসব জায়গায় মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় গ্রামবাসী প্রতিটি গ্রমকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে গড়ে তুলেছে। যে হাত কেবল লাঙল ধরতো, কিংবা কলম ধরতো, কিংবা যে হাতে একতারা শোভা পেতো-সেই হাত, সেই একই হাত আজ তুলে নিয়েছে রাইফেল।

এই সব এলাকা কয়েকদিন আগে ঘোরার সময় খান সেনাদের অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি, শুনেছি তাদের বর্বরতার কথা, জেনেছি মুক্তিবাহিনী ও গ্রামবাসীর সম্মিলিত ক্রমাগত যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা। তরুণ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করেছি এবং বার বার অনুভব করেছি কি গভীর আমাদের দেশের মানুষের দেশপ্রেম; কি প্রচণ্ড সংগ্রামের, যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের। এবং কি কঠিন পণ নিয়েছে তারা সবকিছু উৎসর্গ করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার।

এসব জায়গায় যে কদিন খান সেনারা ছিল, সে কদিন তারা গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। বহু মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়েছে, ফসলের ক্ষতি করেছে, বাজার-দোকানপাট জ্বালিয়েছে, লুট করেছে, অনেকের পাকা বাড়ি ভেঙ্গে ইট নিয়ে বাঙ্কার বানিয়েছে। খেয়াল-খুশিমতো হত্যা করেছে মানুষকে, অত্যাচার করেছে মেয়েদের উপর।

এইসব অন্যায়-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ-পদদলিত, শোষিত মানুষ জেগে উঠেছে। তাদের চোখে এখন শত্রুহননের আকাঙ্খা। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ এখন যুদ্ধ করে যেতে চায়। একজন গ্রামবাসী আমায় বললেনঃ যুদ্ধ তো সবে শুরু, এখনই কি জয়ের কথা বলেন। খান সেনাদের বিষদাঁত ভেঙে না দেয়া পর্যন্ত জয় কিসের। আমাদের হাতে অস্ত্র ছিলো না তাই খান সেনারা ফাঁকা মাঠে কারদানি দেখিয়েছে, এখন তো আমরা সবে অস্ত্র ধরেছি, তারা শোধ তুলবো না?

গ্রামের একজন যুবক বললেন, 'অস্ত্র যখন ধরেছি তখন বেঁচে থাকতে খান সেনারা এই গ্রামে আর ঢুকতে পারবে না। চেষ্টাও তারা কম করেনি, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন মজাটা টের পেয়েছে তারা। এখন তারা মাইল সাতেক দূরে থানা গেড়েছে।'

সবখানেই এক মানসিকতা। খরচাপাতি কমিয়ে দিয়েছে সবাই। খাদ্যসামগ্রী জমিয়ে রাখছে ভবিষ্যতের জন্য। গ্রামের এখানে-ওখানে জঙ্গল হয়ে গেছে- আমাদের যোদ্ধাদের জন্য খুবই অনুকূল। গ্রামবাংলা যুদ্ধ ও জীবন সব এখন একাকার হয়ে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধারা এমন চতুরতার সঙ্গে খানসেনাদের ঘায়েল করে চলেছে যে আমাদের কোন প্রাণহানি হয় না বল্লেই চলে। তার কারণ নিজেদের পরিচিত দেশে যুদ্ধ করে চলেছে মুক্তিসেনারা। সহজে তারা দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। মানুষের শত্রুখান সেনারা তা পারে না। কাউকেই তারা বিশ্বাস করতে পারে না, দেশের মাটি ও পরিবেশ তাদের অনুকূল নয়। কারণ এদেশ তাদের নয়, এদেশকে তারা জানে না, এ দেশের মানুষকে চেনে না, জানে না। তারা কেউ এদেশের নয়। তারা যে জোর করে এদেশে থাকতে চাইছে সেটি নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার তাই তারা এদেশে থাকতে পারবে না, এদেশ থেকে তাদের চলে যেতে হবে, এদেশের মানুষই তাদের তাড়িয়ে দেবে। মাটির সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে যারা শত্রুতার করে তাদের এরকমই পরিণত হয়ে থাকে।

যুদ্ধ কিভাবে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা দু-পাঁচজন মুক্তিসেনার সঙ্গে আলাপ করলেই জানা যায়। যারা আহত হয় তাদের কারুর হাতে বা পায়ে, কিংবা কাঁদে বা শরীরের অন্য কোথাও হয়তো গুলি লাগে। এগুলো যেন কাউকে বলার মতো কোন ব্যাপার নয়। নিতান্ত জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়ঃ গুলি তা লেগেছিল

গোটা দুই-হাত কিংবা পায়ে বা অন্য কোথাও। বেশ কিছু ছেলে বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছে তা বিশেষ কোন ব্যাপার নয়, জীবনে আর পাঁচটা ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটে, ঘটেছে; এও তেমনি। সে জন্যে এসব ব্যাপারে কোন মুক্তিসেনার ভ্রূক্ষেপও নেই। তাদের সবার সামনে একটি মাত্র লক্ষ্য-শত্রু ধ্বংস করা।

দুটি তরুণের কথা শুনলাম। কয়েকবার যুদ্ধ করেছে এমন একটি ছেলের নাম খোকন। স্কুলের ছাত্র। হালকা গড়ন। লাজুক লাজুক ভাব। সবার সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতো। যুদ্ধ করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কোন সুযোগ এলেই সে লাফিয়ে উঠতো। তার সঙ্গে শেষবারের মতো যখন আমার দেখা হয় তখন সে বারবার আমাকে বলেছিল, 'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শুত্রু খতম করে এদেশের শোষিত মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দেয়া। কেউ যেন আর কোন দিন আমাদের বঞ্চিত পদদলিত করতে না পারে সে জন্যই আমরা জীবন দিচ্ছি। পাক-সেনাদের দ্বিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল খোকন। একটি সজিনা গাছের আড়ালে লুকিয়ে গুলি চালাচ্ছিল সে। তার শেষ চেষ্টা ছিল সঙ্গীদের বাঁচানো। কয়েকজন খানসেনাকে খতম করার পর একটি গুলি সজিনা গাছ ভেদে করে তার শরীর বিদ্ধ করে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তার উত্তর ছিল একজন খান সেনার উদ্দেশে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে দেয়া। তাতেই খানরা তাদের বহু সঙ্গীকে হারিয়ে পালিয়ে যায়।

কাছাকাছি এক শিবিরে দেখা হয় হাবলুর সঙ্গে। তার বুকে পাশ থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে। বাঁ হাতেও লাগে কয়েকটি গুলি, বাঁ পা-ও রেহাই পায়নি। ডান হাত ছাড়া হাবলুর কোন অঙ্গই আর চালু ছিল না। বুক পেটের সামনের মাংস সমেত উড়ে চলে যায়, হাত-পা অচল তবু হাবলু যুদ্ধ চালিয়ে গেছে এক হাতে, ছুড়েছে গ্রেনেড। যে খানসেনাটি তাকে গুলি করেছিল তাকে হাবলু শেষ করেছে এক গ্রেনেডেই। সামনে যে কয়টি পড়েছিল তাদের কাউকেই ছাড়েনি সে। তারপর বুকে হেঁটে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে নিরাপদ জায়গায় চলে। হাবলুর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো অচল হয়ে গেছে।

হাবলু বললো, 'আমরা এখন খানদের একেবারে কাছে না পেলে আর গুলি ছুড়ি না। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে, আমরা হিসেব করে গুলি খরচ করি। ওরা বেহিসাবীর মতো মরে, মরে অন্যায়ের ধ্বজাধারী হয়ে। আমরা মরি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, প্রতিটি প্রাণ আমাদের অমূল্য, একটি একটি মৃত্যু একটি অবদান।'

এরকম বহু খোকন ও হাবলুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা সবাই প্রাণ দিচ্ছে, দেবে। তারা বারবার বলেছে, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা শোষণের শেষ ঘাঁটিটি পর্যন্ত ধ্বংস করতে চাই। কড়াই থেকে আগুনে পড়তে চাই না আমরা। দশ লক্ষ নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। মরছে প্রতিদিন হাজার হাজার। রক্ত দিচ্ছে মুক্তিসেনারা, দেশ সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর বিরাম নেই। কিন্তু তার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ যেন মুছে যায়, শোষক যেন ধ্বংস হয়। শোষক যেন না গজায়, গরম কড়াই থেকে আমরা যেন আগুনে না পড়ি। তাহলেই, কেবল তাহলেই আমাদের জীবন বিসর্জন, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের যুদ্ধ, আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সার্থক হবে।

('জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' প্রবাদটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য পিণ্ডি অধিকর্তাদের বেলায়। কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করে, ৯০ লক্ষ লোককে দেশত্যাগী, আরো অসংখ্য গৃহ ভস্মীভূত এবং লুণ্ঠন করে হঠাৎ টনক নড়েছে। আজ ইয়াহিয়ার বাদশাহী সিংহাসন টলোমলো, জল্লাদবাহিনীর আর্তনাদে মুখর সমস্ত পাকিস্তানের আকাশ বাতাস। যারা এসেছিল এদেশকে পদানত করতে, শৃংখল পরাতে, ধনসম্পদ লুট করতে আজ মুক্তি বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে হত্যাকারী হয়ে উঠেছে হতোদম, গতপ্রাণ। জল্লাদ বাহিনীর মনেও আজ ভয়, সন্ত্রাস দানা বেঁদে উঠেছে। মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে তিনবার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে।

এখন উপায়? উপায় খুঁজে বের করেছে বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণিত নায়ক, বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সেনাপতি ইয়াহিয়া খান। খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো বিবৃতি, সর্ব অসত্যের ভাণ্ডার রেডিও পাকিস্তান থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচারিত হলো সেইসব মানুষের উদ্দেশ্যে আবেদন, যারা ঘর ছেড়েছে অত্যাচারের জ্বালায় র্জজরিত হয়ে, গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য, একটু আশ্রয়, একটু নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে। দরদবিগলিত কণ্ঠে পরম বন্ধুর মতো আহ্বান এলো- 'আয়, ওরে আয় ঘর ছেড়ে যারা গেছিস তারা আয়। তোদের সব আছে, তোদের সব দেবো। কিন্তু বাংলার মানুষ দুর্জনের আশ্বাসে ভুলল না। কেননা তারা জানে, 'খলের ছলের অভাব হয় না। একবার তারা আঘাত পেয়েছে, বহু কষ্টে বুকের পাথর চাপা দিয়ে ভুলে আছে মা বোন ভাই আত্মীয়স্বজনের হত্যার কাহিনী। তারা চায় নায় আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

ইয়াহিয়ার তাঁবেদাররা বলল, 'সংবর্ধনা শিবিরগুলি ফেরত-উদ্বাস্তদের দ্বারা ভেঙ্গে গেছে।' সংগে সংগে ইংল্যাণ্ডের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, 'সংবর্ধনা সভায় একটি লোকও দেখলাম না। দুর্জনদের মিথ্যা উক্তির প্রমাণটি লক্ষ্য করুন।

যারা মানুষকে ঘরছাড়া করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, বাঙালীকে হত্যা করে সংখ্যাসমতা আনতে চাইছে- তাদের কোন আশ্বাস কি সংগ্রামী মানুষ সুস্থ মানুষের উক্তি বলে গ্রহণ করতে পারে?...

শুধু এই নয়, আরো আছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের দিন ও তারিখ ঘোষণা করেছে। ভাবখানা এই, 'নিজের মুরগী যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে কাটব'। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার, ভাগ্য, ধ্যান-ধারণা তো সস্তা বা মূল্যহীন নয়। ইয়াহিয়া খান অনুভব করেছে এতদিনে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, জনপ্রিয় অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগের সদস্যদের দেশদ্রোহী বলে ফরমান জারি করা হলো। আবার সেই ব্যক্তি যে দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো, সে দলেরই নির্বাচিত কতিপয় সদস্যদের আবার বৈধ বলে মেনে নিলো। প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনার পথ বেছে নিলো। বাতিলকৃত সদস্যপদ আবার নির্বাচন হবে। এ যেন ছেলের হাতের মোয়া। সামরিক শক্তির বলে গণমানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা যেন ছেলেখেলা ব্যাপার।

শুধু তাই না, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিনিধি নির্বাচিতও হয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, আওয়ামী লীগের সংগে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তাদেরই অনেকে আজ নির্বাচিত হলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, খেলা আর বলে কাকে? মনগড়া হিসেবে বিশ্বকে ভাঁওতা দেয়ার যে পথ বেছে নিয়েছিল ইয়াহিয়া খান, আজ তা নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বাংলার মানুষ আজ তার জবাব দিচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বারবার।....

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

৭ নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ বাহিনীর মৃত অফিসারদের জন্য কাটের বাক্স তৈরী করা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে ব্যাপকহারে। বেচারা কাঠমিস্ত্রীর শান্তি বা স্বস্তি নেই। দিন-রাত তার কাজ-বাক্স বানাও। মরা লাশগুলোকে জলদি পাঠাও নিজের দেশের মাটিতে। কারণ? কারণ অনেকগুলো। প্রথমত, বাংলার মানুষ যেন বুঝতে না পারে যে বর্বরবাহিনীর অফিসাগুলোর একে একে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়, বাংলার মাটিতে ওদের ঠাঁই নাই। কেননা ওরা বাংলার নয়। বাংলার মাটির এতোটুকু দরদ নেই ওদের জন্য। বাংলা শুধু বাংলাদেশের জনগনের। এখানের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য কৃষ্টি সব এদেশেরই। এসবই বেড়ে উঠেছে সবুজ কোমল লতার মতো বাংলার মাটি থেকে। তাই এ মাটিতে কি ঠাঁই পেতে পারে যারা বাঙালী বিদ্বেষী, যারা বাংলার পয়লা নম্বরের দুশমন? কখনোই না।

হিংস্র পশুদের খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বাংলার শ্যামল প্রান্তর আর জনপদে। লোভী, বিবেকহীন পশুর দল দিকদিশাহীনভাবে চালিয়েছে অত্যাচার, হনন আর সন্ত্রাসের রাজত্ব।

কিন্তু তারপর? কূল আর রক্ষা হয় না। চারিদিক থেকে আঘাত হানছে বাংলার মানুষ। পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, শহরে-বন্দরে, জলে-স্থলে, যেখানেই সুযোগ পাচ্ছে, অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের খতম করছে। এখন শয়তানদের পথ চলতে ভয়, ঘরের মধ্যেও নেই স্বস্তির আশ্রয়।

এজন্যেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রাইফেল দেখিয়ে টেনে নিয়ে আসছে খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষকে। তাদের আড়ালে এগিয়ে আসছে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখে। কিন্তু এতেও কূল রক্ষা হচ্ছে না। তীক্ষ্ণধী, সদজাগ্রত বাংলার প্রহরী মুক্তিবাহিনী তাদের কৌশল ধরে ফেলেছে। পাল্টা এমন আঘাত হানছে যে দস্যুর দল 'পরি কি মরি' করে পালাতে দিশা পাচ্ছে না।

ভীতসন্ত্রস্ত জল্লাদবাহিনী শহরের চারপাশে নদীর ধারে গড়েছে বাঙ্কার, বসিয়েছে মেশিনগান। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গা মিশিয়ে এসে মুক্তিবাহিনী আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর, তাই কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। নদী দিয়ে পানা ভেসে যাবে ওদের সামনে দিয়ে? যাদি মুক্তিবাহিনী হয়? মেশিনগানের গুলি চলে পানার ওপর।

রাতের অন্ধকারে শিয়াল-কুকুরেরও ওদের সীমানা দিয়ে যাওয়ার উপায় নাই। হত্যাকারীদের ধারণা, মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা যেকোন রূপ ধারণ করতে পারে-অতএব দৃশ্যগোচর কোন কিছুকেই ক্ষমা নেই।

রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর গুলির শব্দ পেলে সে পথে তারা হাঁটে না। প্রথমে তাদের পরম ভৃত্য রাজাকারদের পাঠিয়ে খোঁজখবর নেয়, পরে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলে সেখানে যায়।

একবার রাতের বেলায় গেরিলারা একজন পাক দালালের বাড়ি ঘেরাও করে তাকে হত্যা করে। দালালের এক শুভানুধ্যায়ী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় পার্শ্ববর্তী জল্লাদবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে। খবর দেয়, 'হুজুর, অমুককে মুক্তিবাহিনী এসে মেরে ফেলল। এখনো ওরা আছে, রাজাকারদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাপুরুষ পশুপ্রবর, খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'হাম কিয়া করেগা। মুক্তিফৌজ আয়া হ্যায়, তুম লোগ যা কর হঠা দো। আভি হাম নেহি যায়েগা, সুবাহ মে যায়েগা।' নিরাশ হয়ে ফিরে এলো দালালের সাগরেদ।

এখন ফল হয়েছে অন্যরকম। এখন বরং পশুগুলো এলে এইসব ঘা খাওয়া মানুষগুলোই এসে খবর দেয়, 'ওরা এসেছে। তাদের সংখ্যা এবং শক্তি সমস্তই পুংখানুপুংখরূপে জানিয়ে দেয় মুক্তিবাহিনীকে।

যারা নেহাৎই প্রাণের দায়ে শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছিল বা রাজাকারে নাম লিখিয়েছিল, আজ তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড মারের সামনে টিকতে না পেরে দলে দলে রাজাকার আত্মসমর্পণ করছে। জংগীশাহীর জঘন্যতার রূপটাও ফাঁস করে দিচ্ছে।

আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে ভাড়াটে সৈন্যের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৈনিক। আমাদের গেরিলারা আজ তাই হয়ে উঠেছে অজেয়, দুর্বার।

আর পক্ষান্তরে এবং মুক্তিবাহিনীর সাম্রাজ্য বাসনা ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দুঃসাহসী গেরিলাদের এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে খতমকৃত জালেম বাহিনীর অফিসারের জন্য আর কতো কতো কাটের বাক্স লাগবে, তার খতিয়ান কি করছে ইয়াহিয়া খান?

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

যাদের চক্ষু আছে এবং চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন, আজ তাঁদেরকে একবার বাংলাদেশের রণাঙ্গনে দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করবো। একবার চোখ খুলে দেখুন আমাদের সংগ্রামী বীর যোদ্ধা বাঙালী যুবকগণ কিভাবে পশ্চিম পাকের হানাদার পশুদের খতম করে ক্রমাগত জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছেন। বাংলাদেশের চূড়ান্ত দুর্দিনে পশু পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য মুক্তিবাহিনীর বীর সৈনিকগণ আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বিক্রম, ধৈর্য এবং দেশপ্রেমিকতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নিদর্শন একান্ত বিরল। একবার চেয়ে দেখুন যশোর রণাঙ্গনের দিকে-আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আঘাত সামালাতে অপারগ হয়ে কিভাবে খানসেনারা পশ্চাদপসারণ করছে। খুলনায় একটি জাহাজ ডুবিয়ে আমাদের সেনারা জাহাজ চলাচলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সিলেট, চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া সর্বত্রই আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতি এবং পাকসেনাদের পরাজয় অব্যাহত রয়েছে। ঢাকায় বেসামাল হয়ে সামরিকচক্র বারবার সান্ধ্য আইন জারি করে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করছে। কিন্তু তাই বলে বাঙালীর মনোবল হ্রাস পায়নি। আমাদের বীর সেনাদের অগ্রগতির দেখুন এবং জেনে রাখুন, ইনশাল্লাহ সময় আর খুব দূরে নাই যখন ঢাকায় স্বাধীন বাংলার পতাকা গৌরবের সঙ্গেই উত্তোলিত হবে।

সে কারণেই বলছিলাম যাঁদের চক্ষু থেকেও যাঁরা অন্ধ নন আজ তাঁরা চোখ খুলে একবার দেখুন- শ্রবণশক্তি যদি বধির না হয়ে থাকে তবে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের এই বিজয় বার্তাগুলো শুনুন। কথাগুলো এইজন্য বলছি যে বাংলাদেশ এখনো কিছুসংখ্যক বাঙালী আছেন যারা চোখ থেকেও অন্ধ এবং শ্রবণশক্তি থেকেও বধির। ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে এই জাতীয় কিছু অন্ধও বধির বাঙালী এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য দেদার চীৎকার করে যাচ্ছেন। এইসব বাতুলদের তখনই জ্ঞানোদয় হবে যখান মুক্তিবাহিনীর সঙ্গীন তাদের গর্দানকে স্পর্শ করবে। যে প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য এখনো কিছুসংখ্যক জন্মদালাল বাঙালী গলদঘর্ম হচ্ছেন তাদের বোঝা উচিত যে আজ ঐসব প্রভুদের কি অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। বেলুচিস্তানে বেলুচরা এবং সীমান্ত প্রদেশে পাঠানরা এবার অস্ত্রধারণ করেছে। এমান কী রাজনীতির ক্ষেত্রে বালকোচিতে চাপল্যই যাঁর বৈশিষ্ট্য সেই জুলফিকার আলী ভূট্টোর খোদ জন্মভূমি সিন্ধু ও আজ বিক্ষুদ্ধ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া চক্রের পালাবার স্থানটি পর্যন্ত থাকবে না। এই দুই জানোয়ারের শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথাই আমরা এখন ভাবছি।

জানি, বহু দুঃখ এবং বেদনা, এবং নিপীড়ন বহু রক্তক্ষয় এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের দিন কেটেছে এবং এখনো অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। জানি, আমরা যারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে দুদিন পর বিজয়ীর বেশে নতুন করে যাত্রা শুরু করবো, তাদের অনেকেই প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনাকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। যে জীবন আমরা হারিয়েছি, যে সম্মান এবং ইজ্জত আমরা পশুদের হাতে বিসর্জন দিয়েছি, যে সম্পদ আমাদের লুন্ঠিত হয়েছে, জানি, সেসব আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবক্ষয়, এই অপরিসীম ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা একটি জাতিকে, একটি দেশকে বিশ্বের ইতিহাসে নবজন্ম দান করতে চলেছি- এই মহান গৌরব একান্তভাবেই আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান বংশধরদের। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই গৌরব অর্জনের সৌভাগ্য হয়নি। সেদিকে থেকে আমরা অনেক ভাগ্যবান। দুঃখ আমাদের অনেক হয়েছে, রক্ত এবং জীবন আমাদের প্রচুর দিতে হয়েছে সত্য কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এই মৃত্যু এই রক্তদান, এই আত্মত্যাগ সবকিছুর মধ্যেই একটি বিরাট মাহাত্ম্য আছে। সেই মাহাত্ম্যই আমাদের মহীয়ান করে তুলেছে। তার জোরেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে বলতে পারবে যে আমরা আজ দেশের কারণে মরতে শিখেছিলাম বলেই তারা মানুষের মত বাঁচতে পারবে। আমদের

আত্মত্যাগ ও মৃত্যুর মাধ্যমে ভবিষ্যত বংশধরদের সত্যিকার মানুষের মত বাঁচবার একটি স্থান, একটি পথ আমরা আজ তৈরি করে যাচ্ছি। যে মহৎ কারণের জন্য জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে, অনেক অভাব ও দীনতাকে হাসিমুখে বরণ করে এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের সকল ছোবলকে দু'পায়ে দলিত মথিত করে আজ বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তার মূল্য মানুষের ভাষায় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই মহান কারণ ও সংগ্রামের উজ্জ্বলতম আদর্শ শুধু বাংলাদেশের নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্বের সমাজ গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। বাঙালী জাতি হিসাবে আমরা যে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এই একট অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়েছি, তা কম গৌরবের কথা নয়।..

এটা অত্যন্ত আশার কথা যে বিশ্ববিবেকের ক্ষেত্রে আজ আশানুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বের বিবেকসম্পন্ন সকল মানুষ আজ উপলব্ধি করেছেন যে, আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে। অবশ্য বাংলাদেশের মানবতার যে অপমান সংঘটিত হয়েছে, মানবতার ইতিহাসে তুলনা হয় না। আর এই লাঞ্ছিত মানবতাকে রক্ষার জন্য সভ্যতাগর্বী উন্নত দেশগুলো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন, আমরা গোড়া থেকেই এমন আশা করেছিলাম। সে আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে একথা আমরা বলতে পারবো না। গণতন্ত্রের আদর্শকে সমগ্র বিশ্বে যাঁরা সমুন্নত রেখেছেন বলে গর্ব করেন, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভূমিকা আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে।

বিশ্বের জনগণ আমদের সাথে আছেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও আমদের সংগ্রামকে সমর্থন করেন। এ ছাড়া বিশ্বের সর্বত্রই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম মোটামুটি একটি সহানূভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে। আমরা আশা করবো, আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বিশ্ববিবেক আমাদের সপক্ষে আরো জাগ্রত হবে। আমরা একথা জানি,স্বাধীনতা কোনদিন শুধুমাত্র অপরের সাহায্যে আসে না- সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হবে। আম তাই আজ দিকে দিকে সংগ্রামের এমন দুষ্কর যাত্রাপথকে বেছে নিয়েছি। আর এই সংগ্রামই আমাদেরকে বিজয়ের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর জয়পতাকার ছায়া আজ বাংলা সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চলে সবুজ ঘাসের ওপর বিপুল এক শুভাবহ মায়ার প্রলেপের মত বিস্তারিত হচ্ছে। সেদিন আর অধিক দূরে নয় যখন এই বিজয়-কেতনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা জাগ্রত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী কবি নজরুলের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে গভীর প্রত্যয় জননী জন্মভূমি বাংলাদেশকেও প্রণতি জানাবোঃ

নমঃ ননঃ বাংলাদেশ মম
চির মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর।

(ডঃ মযহারুল ইসলাম রচিত)

সংবাদ পর্যালোচনা*

২১ জুলাই, ১৯৭১

একটি ছোট্ট খবর। পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী শীগগীরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করবে। কখন, কোথায়, বিভাবে এ বিচার প্রহসন জমে উঠবে, খবরে তার বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশিত খবরে এটুকু স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকার স্বাধীন বাংলার জনক শেখ মুজিবের বিচারের আয়োজন করছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

ভ্রান্তি বিলাসের কি বিচিত্র পুনরাবৃত্তি! সত্যকে, ন্যায়কে, বিবেককে, টুঁটি টিপে হত্যা করে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকবার কি দুঃসাহসিক প্রয়াস! কি সীমাহীন স্পর্ধা! এ তো নতুন কিছু নয়। বিচার নামে প্রহসনের জালিয়াতি মঞ্চ সাজিয়ে শেখ মুজিবের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার এমনি এক স্পর্ধিত অপচেষ্টা ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। উনিষ শ’ ছিষট্টি সালে বীরপ্রসবিনী বাংলার অগ্নিসন্তান শেখ মুজিব যেদিন ছয়দফা দাবী পেশ করেন, সেদিনই ত্রাসে আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো পশ্চিমা শাসককুলের তখতে তাউস। আর তাই সেদিনের গণবিরোধী শাসক সামরিক জান্তার মুখপাত্র প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি। উদ্ধত রাজরোষ জেল-জুলুম আর বক্ষভেদী বুলেট হয়ে নেমে এসেছিল আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের উপর-স্বাধীনচেতা বাঙালী জাতির উপর। কিন্তু তাতেও যখন ফল হয়নি, যখন বাংলার গণশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে আয়ুবের রণহুঙ্কার বিধবার অসহায় আর্তনাদের মত বাতাসে মিলিয়ে গেছে, আইয়ুবশাহী শেষরক্ষার জন্য সাজিয়েছিল মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা। উদ্দেশ্য ছিল, ভাড়াটিয়া জজ, উকিল আর সাক্ষীসাবুদের সযত্নসৃষ্ট ষড়যন্ত্রের জালে বেঁধে শেখ মুজিবকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া। কুর্মিটোলা সেনানিবাস দিনের পর দিন সেই সাজানো-গুছানো মামলার বিচার প্রহসন চলেছে। ভাড়াটিয়া সাক্ষীদের মিথ্যা জবানীর রেকর্ডপত্র স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে-গোটা সরকার তার সর্বশক্তি দিয়ে শেখ সাহেবকে আটকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সকলি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। বাংলার মানুষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে মনে করেছে তাদের নিজেদেরেই বিরুদ্ধে, সমগ্র বাংলার বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। আর তাই সর্বশক্তি নিয়ে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আইয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। শেখ মুজিবের পিছনে কাতারবন্দী বাংলার মানুষের সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের স্রোতের মুখে খুলে গেছে জেলের তালা, খড়কূটোর মত ভেসে গেছে ক্ষমতাদর্পী শাসকের মসনদ আর আইয়ুব-মোনেম নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। বাঙালীর আশা-আকাঙ্খার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি, বঞ্চিত বাংলার বিবেকের কণ্ঠস্বর শেখ মুজিবর রহমান জেল-জুলুম আর ত্যাগ-তিতিক্ষার দুঃসহ আগুনে পুড়ে হয়েছেন আরও খাঁটি সোনা। হয়েছেন বঙ্গবন্ধু-বাংলার মুকুটহীন সম্রাট। বিগত সাধারণ নির্বাচনে নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবে বাংলার মানুষ সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে-শেখ মুজিব বাংলার, বাংলা শেখ মুজিবের। তারা আরও দেখিয়ে দিয়েছে-শেখ মুজিব শুধু বাংলার নন, সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু দলের নেতা। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ বিশ্ববাসীকে বিস্মিত হতবাক করে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে এক নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সবচাইতে বড় কথা, শেখ মুজিবেরই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তারই নির্দেশে বাংলার মানুষ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ইয়াহিয়ার জল্লাদ বহিনী গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। এই নরপশুর দল ছারখার করে দিয়েছে অগণিত সোনার সংসার-চিরতরে নিভিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ ঘরের প্রদীপ। কিন্তু বুলেট শুধু রক্তই ঝরাতে পারে-মানুষের হৃদয়ের অমোঘ বাণীকে, তার আত্মার আন্তরিক আকাংক্ষাকে পিষে মারতে পারে না। ওরাও পারেনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে যে অনিবার্য প্রদীপশেখা শেখ মুজিব জ্বেলেছেন সাড়ে সাত কোটি

---

* সংবাদ পর্যালোচনা’ শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি আমির হোসেন রচিত।

বাঙালীর অন্তরে, হানাদার সেনা-দস্যুদের হিংস্র থাবা তা নিবিয়ে দিতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তা আজ বাংলার দশদিগন্তে চলেছে শত্রুহননের মহোৎসব। দিন যায়, রাত যায়, আর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে জল্লাদবাহিনীর মৃত্যুঘণ্টার শব্দ। ওরা দেখতে পাচ্ছে ওদের পরাজয় আসন্ন। ওরা বুঝতে পারছে সোনার বাংলার বুকটিকে চিরে চিরে খাবার দিন শেষ-এবার বিদায়ের পালা। তাই মুমূর্ষু শয়তানের মরণার্তির মতই ইয়াহিয়ার মুখে অশ্রাব্য প্রলাপধ্বনি। তাই আইয়ুবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শোচনীয় পরিণতির স্মৃতি মিলিয়ে যাবার আগেই তার জারজ সন্তান আজ ব্যতিব্যস্ত শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নতুন মামলা সাজাবার আয়োজনে।

কিন্তু কিসের মামলা? কিসের বিচার? কে করবে কার বিচার? নরঘাতক ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু ক্ষমতাদর্পী সেই উন্মাদ জেনারেল রঙীন পানীয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আজ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে যে, শেখ মুজিব আজ আর ইয়াহিয়ার শক্তির উৎস বন্দুকের নল। আর সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের শক্তির উৎস তার দেশবাসীর শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সংগ্রামী চেতনা….

২৮ জুলাই, ১৯৭১

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় অফিস-আদালতে ও দোকান-পাটের নামফলক বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী ও উর্দুতে লেখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নামের সংগে অমুসলিম গন্ধ রয়েছে সেগুলো পাল্টিয়ে নয়া নামকরণের অভিযান শুরু হয়েছে।

খবরটিতে নতুনত্ব না থাকলেও কৌতুকের খোরাক আছে। কারণ, ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটা পেছনদিকে ঘোরে না জেনেও কসাই ইয়াহিয়া ইতিহাসের চাকা আর ঘড়ির কাঁটাকে পশ্চাদমুখী করার হাস্যকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলার পরিবর্তে উর্দু এবং ইংরেজীতে নামফলক লেখা আর বিশেষ বিশেষ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠানের নয়া মুসলমানী নামকরণের নির্দেশে ওদের দুরভিসন্ধিটাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আমরা এতে বিস্মিত হইনি। বিক্ষুব্ধ হলেও আমরা এতে মোটেই বিচলিত হইনি। করণ, ওদের এই অপচেষ্টা নতুন কিছু নয়। চব্বিশ বছর আগে যেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশ ছেড়ে যায় সেদিনই পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীচক্র মেতে ওঠে বাংলার বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রে। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিল বাঙালী জাতিকে চিরদিন পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখা। আর এই ঔপনিবেশিক লক্ষ্য হাছিলের স্বার্থে পশ্চিমা শাসককুল বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক হিস্যা, তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি আর স্বকীয় সত্তার ওপর হামলা করেছে বার বার। বাঙ্গালীদের নিজস্ব পরিচয়, তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে চিরতরে মুছে ফেলবার জন্য চক্রান্ত চলেছে সুপরিকল্পিতভাবে। চেষ্টা চলেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক দিক দিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখবার…

বাংলার মানুষের সাহিত্য সংস্কৃতিকে পঙ্গু করার যে নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলে এসেছে চব্বিশ বছর ধরে, পরাধীন বাংলার শেষ সুবেদার মোনেম খানের আমলের একটি ঘটনায় তার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। দুরন্ত প্রতাপশালী গভর্নর মোনেম খান একদিন লাটভবনের দরবার কক্ষে ডেকে পাঠালেন ঢাকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের। এ এত্তেলা পেয়ে হাজির হলেন সকলে। তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল হাশিম, কবি জসীমুদ্দীন এবং অন্যান্য। হুকুম করলেন গভর্নরঃ কি লেখাপড়া করেছেন আপনারা? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?' জবাব দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। বললেনঃ 'না, পারি না। আমরা কি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত

লিখবো? আমরা লিখলে তো তা হবে হাই সঙ্গীত, জসীম সঙ্গীত...। লজ্জায় অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন গভর্নর। জারি করলেন দ্বিতীয় নির্দেশ- বাংলা ভাষাকে ইসলামী রূপ দিতে হবে। এবার জবাব দিলেন অবিভক্ত বাংলার খ্যাতনামা রাজনীতিক- মুখের উপর চীৎকার করে বলেছিলো বাংলার ছাত্র-তরুণের দল- 'না। তোমার কথা মানি না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' বিদ্রোহী বাঙালীর সেই কণ্ঠস্বর নূরুল আমিনের বুলেটও স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের দল বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করে এনেছেন। রক্তের অক্ষরে লিখিত হয়েছে বাংলাভাষা আর বাঙালীর বিজয়গাথা।

কিন্তু পশ্চিমা শাসকের দল কোনদিন এই সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পারেনি। বাংলা আর বাঙালী কথা দুটি ওদের অনুভূতিতে প্রতিনিয়ত ছড়িয়েছে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। তাই অবিরাম হামলা পলেছে বাঙালী জাতির উপর-বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালী, সংস্কৃতির ওপর। ওরা আরবী হরফে বাংলা ভাষা লিখতে চেয়েছে, হাওয়াই হামলা করেছে, ভাষাটাকে মুসলমানী চেহারা দেবার জন্য তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিয়েছে। 'কৃষ্টি-সংস্কৃতি'কে করা হয়েছে 'তাহজিব-তমদ্দুন'। নজরুলের কবিতায় 'শ্মশান' কেটে করা হয়েছে 'গোরস্থান'। কায়কোবাদের লেখা 'মহাশ্মশান' বইখানির নাম পাল্টিয়ে রাখা হয়েছে 'মহা-গোরস্থান'।

কিন্তু কি লাভ? মিঃ জিন্নাহ থেকে মোনেম খাঁ যা পারেনি-ইয়াহিয়া-টিক্কাও তা পারবে না। ইতিহাসের গতি পশ্চাদমুখী নয়, ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘোরে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখের ভাষা আর তাদের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়বাদী চেতনাকেও কেউ জোর করে হত্যা করতে পারবে না।

৩০ জুলাই, ১৯৭১

একটি বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে জানা যায় যে, এবারে পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। অপরাধ? সেখানকার মানুষ শত্রুকবলিত ঢাকা বেতারের কোন অনুষ্ঠান শোনে না-তারা শোনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী ও ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান।

খবরটি ছোট্ট হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, অধিকৃত এলাকার জনগণকে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বিশ্বজনমত সর্ম্পকে অন্ধকাকে রাখবার জন্যই জঙ্গীশাহী রেডিও বাজেয়াফত করতে শুরু করেছে। আর এই প্রচেষ্টা থেকে বাংলাদেশে হানাদারদের নাজেহাল অবস্থারই স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

যুদ্ধের সবচাইতে বড় বলি হচ্ছে সত্য। মারণাস্ত্র মানুষের জানমালের মত সত্যকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জঙ্গীশাহীও তাই করেছে। প্রকৃত ঘটনা যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছে। অধিকৃত এলাকায় বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাতে প্রকৃত ঘটনার কোন বিবরণ থাকে না, নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ সেখানে নেই। প্রতিটি শব্দ ছাপা হবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে। সব কাগজে একই খবর ও মন্তব্যের কার্বন কপি ছাপা হয়। ফলে সংবাদপত্র নামে যে কাগজগুলি অধিকৃত এলাকায় প্রকাশিত হয়, তা বস্তুত সংবাদপত্র নয়- জঙ্গীশাহীর প্রচার বুলেটিন মাত্র। তাই সেগুলো কেউ কেনে না, পড়ে না। জালেমশাহীর প্রচার দফতর ওগুলো বিনামূল্যে বিলি করে।

এইতো গেল সংবাদপত্রের কথা। এরপর থাকে রেডিও। এবং সেটাই আজকের দিনের সবচাইতে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। ঢাকা বেতারকেন্দ্র এখন শত্রুবাহিনীর দখলে। শত্রুকবলিত এই বেতারযন্ত্রটি থেকে যা প্রচারিত হয়, তা জঘন্য জালিয়াতি আর মিথ্যার বেসাতি ছাড়া কিছুই নয়। জল্লাদ বাহিনীর বর্বর অত্যাচারের রক্তের গঙ্গা

বয়ে চলেছে বাংলার দিকে দিকে। ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসস্তূপ সাক্ষী হয়ে আছে ওদের পাশবিক নির্যাতনের। হানাদার দস্যুরা নারীর কেড়ে নিচ্ছে, দুধের শিশুকে খুন করেছে, দলে দলে মানুষকে করছে ঘরছাড়া, দেশছাড়া। অধিকৃত এলাকার মানুষ নিজের চোখে দেখেছে, দেখছে এ দৃশ্য। কিন্তু ঢাকা বেতারে শুনছে ঠিক এর উল্টো কথা। ঢাকা বেতার সুকৌশলে প্রচারণার মারপ্যাচে সত্যটাকে হত্যা করে মিথ্যার পুতুল সাজিয়ে খাড়া করছে মানুষের কাছে। তাই তারা আস্থা হারিয়েছে- বীতশ্রদ্ধ, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঢাকা বেতারের উপর। আর সেই কারণেই কেউ আজ ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছে না। তারা সত্যি খবরের জন্য, নির্ভূল তথ্যের জন্য, বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমতের ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য শুনছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকার অনুষ্ঠান। জঙ্গীশাহী এ খবর জানে। তারা জানে যে, এসব বেতার কেন্দ্রের মারফত জনগণ হানাদারদের নির্যাতন-নিপীড়ন-গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী জেনে নিচ্ছে। জেনে নিচ্ছে বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় সাফল্য এবং হানাদারদের ক্রমাগত বিপর্যয়ের বৃত্তান্ত। ফলে ওদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ে যাচ্ছে ওদের মিথ্যাবাজি আর জালিয়াতির বেসাতি। তাই শংকিত, বিব্রত হয়ে উঠেছে জঙ্গীশাহী। ওরা জানে, লোকের হাতে যদি রেডিও থাকে, ঢাকা বেতারের জাল-জুয়াচুরি অনুষ্ঠান তারা শুনবে না- শুনবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও বিদেশী বেতারের অনুষ্ঠান। তাই আক্রোশের ক্রোধে দিশেহারা হয়ে জল্লাদেরা এখন কেড়ে নিতে শুরু করেছে সকল রেডিও উদ্দেশ্য-মিথ্যে যদি না শুনতে চাও, সত্য কথাও শুনতে দেবো না...।

১আগষ্ট, ১৯৭১

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় উৎপাদিত ফসলের তিন-চতুর্থাংশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দোবর জন্য চাষীদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে যে, ফসলের এক-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে জরিমানা হিসাবে এবং বাকী দুই-চতুর্থাংশ নেওয়া হবে ট্যাক্স ও খাজনা বাবদ।

বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় চাষীদের শায়েস্তা করা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য আছে এই নির্দেশে জারি করেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ পশ্চিমা শাসকদের রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছে। আর সেই শূন্য রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া করেছে এই তোগলকি নির্দেশ।

একথা আজ সকলেরই জানা যে, বাংলাদেশে যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভারের চাপে পাকিস্তানী অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে পাট, চা, চামড়া সহ সমস্ত রকম রফতানী বাণিজ্য বন্ধ। কলকারখানায় উৎপাদন নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে থাকার দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে নেমে এসেছে চূড়ান্ত অচলাবস্থা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংরক্ষিত বাজারে পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বিক্রয়ের নামে হরিলুটের বাতাসের মত দুহাতে অর্থ লুটে নেবার দিন শেষ। রাজত্ব আদায় বন্ধ-বাংলার মানুষ খাজনা দিচ্ছে না, ট্যাক্স দিচ্ছে না। আয়ের কোটা শূন্য কিন্তু খরচ বেড়েছে বহুগুণ। প্রশাসনিক ব্যয় ছাড়াও জঙ্গীশাহী বাংলাদেশে গণহত্যা খাতে প্রতিদিন খরচ করছে দেড় কোটি টাকা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? বৈদিশক সাহায্য বন্ধ। পৃথিবীর দেশে দেশে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরেছে ইয়াহিয়ার অনুচরেরা, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। তাই রাজকোষ শূন্য-নিদারুণ অর্থসংকট, পরের ধনে পোদ্দারিতে ঘটেছে মারাত্মক বিঘ্ন। বেসামরিক কর্মচারীদের তো বেতন দেয়ার প্রশ্নই নেই, কসাই বাহিনীর জোয়ানদেরও বেতন বাকী পড়েছে দীর্ঘদিনের। ফলে দিকে দিকে উঠেছে অসন্তোষের ঝড়। বেগার খাটতে রাজী নয় তারা-কাজ করাছি, পয়সা চাই। বেতন বাকী রেখে যুদ্ধ করা যায় না। আর এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যই টাকা চাই-প্রচুর টাকার দরকার ইয়াহিয়া খানের। টাকার দরকার বাঙালী হত্যার হাতিয়ার কিনতে, জল্লাদ ভাড়া করতে। আর সে টাকা ওরা আদায় করতে চায় বাংলাদেশেরই চাষীদের কাছ থেকে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্যই জারি হয়েছে নরঘাতক ইয়াহিয়ার নয়া নির্দেশ।...

১৭ আগষ্ট,১৯৭১

তিনটি খবর। তিনটি খাবরের উৎসস্থল দূর-দূরান্তরে তিনটি জায়গা-করাচী, নয়াদিল্লী, ওয়াশিংটন। অথচ খবর তিনটি একই সূত্রে গাঁথা-একই লোককে কেন্দ্র করে। আর তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

করাচী থেকে ফরাসী বার্তা প্রতিষ্ঠান এ-এফ-পি জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করায় পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আদালতে তার বিচার স্থগিত হয়ে গেছে। লায়ালপুরের কাছে শেখ সাহেবের বিচার প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন, আমি কোন অপরাধই করিনি। তাই বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না।

নয়াদিল্লীতে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের মুক্তিদানের শর্তে বাংলাদেশের সমস্যার একটি রজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী। বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের তীব্র নিন্দা করে সিনেটর কেনেডী বলেন, শেখ মুজিব যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি একটি নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। যেভাবে গোপনে তা বিচার হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে জাতিসংঘে জঙ্গীশাহীর রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে যে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দেয়া হবে না।

আগা হিলালী আরও বলেছে যে, বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী মিলিটারী কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে না। রায়ের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাস করতে পারবে।

খবরগুলো পাশাপাশি রেখে এগুলোর তাৎপর্য লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শেখ মুজিবকে জল্লাদ বাহিনী এখনও হত্যা করেনি- করতে পারবেও না। কারণ সে শক্তি ওদের নেই। তাই বঙ্গবন্ধুর বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভীতসন্ত্রস্ত করে নরঘাতক ইয়াহিয়া চেষ্টা করছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে। বঙ্গবন্ধুর অমূল্য জীবনকে বাজি রেখে সে নেমেছে বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধ বানচালের জুয়াখেলায়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আবার ভুল করেছে- আবার ভ্রান্তির বালুচরে পা আটকে গেছে তার। ইয়াহিয়া স্বীকার না করলেও বিশ্ববাসী জানেন, প্রায় সাড়ে চারমাস ধরে ভয়ভীতি-প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা চলেছে শেখ মুজবকে বশে আনার। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর মাথা সে কিনতে পারেনি। আর পারেনি বলেই শেষ অস্ত্র নিক্ষেপের মত হুঙ্কার ছেড়েছে-আমি শেখ মুজিবের বিচার করবো, তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। এর পিছনে এক সুচতুর লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া খাঁর। সে ভেবেছিল, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিয়ে তাকে বশে আনা যাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যাবে, আর যাবে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হয়েছে জল্লাদী প্রচেষ্টা। ভয় পাবার পরিবর্তে আরও বলিষ্ঠকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছেন: আমি কোন অপরাধ করিনি। সুতরাং বিচার বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাই বাধ্য হয়ে তাকে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন মুলতবি রাখতে হয়েছে। এই বিচার আর হত্যার হুমকি মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল এতটুকু দমাতে পারেনি। বরং শেখ মুজিবের নির্দেশিত পথে দ্বিগুণতর শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুশমনের ওপর-আরও ত্রিশঙ্কু অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে হানাদার বাহিনী। আর বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে ইয়াহিয়া খানের। এইতো গতকাল সিনেটর কেনেডী বলেছেন শেখ মুজিবের একটিমাত্র অপরাধ যে তিনি নির্বচনে জয়লাভ করেছেন। তার গোপন বিচার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতির চূড়ান্ত বরখেলাপ মাত্র। বস্তুতঃ এ কথা কেনেডীর একার কথা নয়। কেনেডীর কণ্ঠে বিশ্ববিবেকের দ্ব্যর্থহীন রায়ই ধ্বনিত হয়েছে। আর সে ক্ষমাহীন নিয়তির মত জানিয়ে দিয়েছে যে, অপরাধী শেখ মুজিব নয়- ইয়াহিয়া

খান। যুদ্ধ শেখ মুজিব শুরু করেননি-ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা অভিযানের জবাবেই সৃষ্টি হয়েছে রক্তাক্ত সংঘর্ষের। আর তাই সমস্যার সমাধানের শর্ত হচ্ছে শেখ মুজিবের মুক্তি। কেনেডীর এই বক্তব্যের আরেকটি তাৎপর্য আছে। কেনেডীদের বলা হয়ে থাকে মার্কিন বিবেকের কণ্ঠস্বর। আর সে কারণেই বলা যায়, কেনেডীর বক্তব্য পৃথিবীর আর দশটি দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী মানুষেরই বক্তব্য। সুতরাং দেখা যায়, যে দেশের অস্ত্র দিয়ে ইয়াহিয়া বাঙালীদের হত্যা করেছে, শেখ মুজিবকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সেই আমেরিকার জনগণের দৃষ্টিতেও ইয়াহিয়া দোষী, শেখ মুজিব নির্দোষ। জল্লাদ ইয়াহিয়ার রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেছে, বিচারের রায় যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হবে না। তার দণ্ডাদেশ বাতিল বা হ্রাসের ক্ষমতা থাকবে ইয়াহিয়ার। চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু এর গোপন তাৎপর্যটুকু বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইয়াহিয়া চেয়েছিল ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ধামাচাপা দিতে। কিন্তু ভারত-রাশিয়া শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি জল্লাদের সে খায়েশ চিরতরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন একটিমাত্র তুরুপের তাস আছে ইয়াহিয়ার হাতে। আর সে হচ্ছে শেখ মুজিবের জীবন। তাই সে চাইছে বিচার প্রহসনে বঙ্গবন্ধুর চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করে তার জীবনরক্ষার ক্ষমতাটুকু নিজের হাতে নিয়ে তাই দিয়ে রাজনীতি করতে। আর ইয়াহিয়ার এই গোপন উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিন লিখেছে : "এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শেখ মুজিবকে দণ্ড দেওয়া হবে। তবু মনে হয় ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে না। কারণ, সে জানে বাংলাদেশের যুদ্ধে এক পাকিস্তানের আসা চিরতরে সমাধিস্থ হয়েছে। শেখ মুজিবকে বাচিঁয়ে রাখলে অন্তত একটা শেষ সুযোগ পাওয়া যাবে। সে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধের বদলে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগাভাগিটা সম্পন্ন করা।" অতঃপর মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।

২২ শে আগষ্ট, ১৯৭১

লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পন্থা স্থির করার উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ ও তেহরানে গোপনে গোপনে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চলেছে। এই তৎপরতার নায়ক ইরান। আর এই পেছনে নাকি সমর্থন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার। খবরটিতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারী ইতিমধ্যেই তেহরান পৌঁছেছেন। সেখানে ইরানের উদ্যোগে তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের গোপন সাক্ষাৎকারের আয়োজন হবে।

সুদূর ইরানে বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে পর্দার অন্তরালে কি ঘটেছে স্পষ্ট জানবার উপায় নেই। আর সে নেপথ্য নাটকে তেহরান-চন-রাশিয়ার ভূমিকাটাও সহজবোধ্য নয়। ডেলী টেলিগ্রাফের এই খবরটি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোন সূত্র থেকে কোন তথ্যও আমাদের হাতে আসেনি। তাই এক কথায় খবরটি উড়েয়ে দেয়া বা একে সত্য বলে মেনে নেয়া কোনটাই সহজ নয়। তবু কথা আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচ-আক্রমণের মুখে জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া বাহিনী আজ দিশেহারা। প্রতিদিন ওরা মরছে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে মাত্র কদিন আগে নতুন করে এক ডিভিশন সৈন্য আমদানী করা হয়েছে বাংলাদেশে। আমেরিকা থেকে প্রচুর অস্ত্র আসছে, চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম আসছে, মার্কিন বিশেষজ্ঞ এসেছে। এমনকি জর্দান থেকে লোক ভাড়া করে আনা হয়েছে বাংলাদেশের বীর যোদ্ধাদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু তবু অবস্থার উন্নতি হয়নি-পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে ইয়াহিয়ার। প্রতিদিন নয়া নয়া এলাকা মুক্ত হচ্ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাতে। ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি তার দুরভিসন্ধি সে বানচাল করে দিয়েছে-ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের খায়েস মিটে গেছে ইয়াহিয়ার। ক্ষমতার মদমত্ত সেই নরঘাতক চেষ্টা করেছে জাতিসংঘকে টেনে এনে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকে বাংলাদেশ প্রশ্নকে পাক-ভারত বিরোধ বলে চিহ্নিত করতে। কিন্তু সে চেষ্টাও তার নিদারুন ব্যর্থতা বরণ করেছে। আরেকটা চাল খেলেছে খুনী ইয়াহিয়া। সে

ভেবেছিল বিচারের নামে প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে মিলিটারী জজ-ব্যারিস্টারের পুতুল নৃত্যের ব্যবসা করে শেখ মুজিবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে-আর তার ফলে মনোবল ভেঙ্গে যাবে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের। তার ভাড়াটিয়া ডালকুত্তা বাহিনীর দুরু দুরু বক্ষে আসবে নতুন শক্তি-দাবিয়ে দেওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ। কিন্তু এখানেও হতাশ হয়েছে জোনারেল ইয়াহিয়া। এ খবরে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী-তীব্রতর হয়েছে তাদের আক্রমণধারা। তারই পাশাপাশি বিশ্বজনমতের প্রচণ্ড চাপে শাণিত ছুরিকা খসে পড়েছে জল্লাদের হতে থেকে। তার প্রমাণ- বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবকে গুলি করা হবে না বলে জাতিসংঘে পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর ঘোষণা। ইয়াহিয়ার সামনে এখন পাকিস্তান নামক মৃত ঘোড়াটিকে জীবিত করে তোলার আর কোন পথই খোলা নেই। তবু শেষ চেষ্টা করছে সে। শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে দিয়ে হলেও যদি বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাখা যায়, সেটাই তার শেষ চেষ্টা। হতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই চলেছে তেহরানের গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা । আবার এমনও হতে পারে যে, এই তৎপরতা নতুন কোন জালিয়াতি, কোন দুরভিসন্ধি হাসিলের জঘন্য ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।...

২৬ আগস্ট, ১৯৭১

একটা খবরের মত খবর! করাচী থেকে এ-এফ-পি জানিয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রতি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। যেসব সদস্য জল্লাদশাহীর দৃষ্টিতে নিরপরাধ সুবোধ বালক, তাদের প্রতিই এই আবেদন জানানো হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের মারফত সরকারী মহল গণপ্রতিনিধিদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

খবর শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাই না। মনে হয়, পৃথিবীর সবকিছুই সীমা আছে- সীমা নাই শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নির্লজ্জ বেহায়াপনা, নিষ্ঠুরতা, ন্যাকামি আর ধোঁকাবাজির। আর সীমা নাই বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ওদের নির্মম পেশাদারী রসিকতার। সম্ভবতঃ সে কারণেই, এতদিন পরে জঙ্গীশাহী গণপ্রতিনিধিদের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব পালনের আবেদন জানাতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। কে না জানে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যই তারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এজন্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার মানুষ নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের শিরদেশে পরিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসের নজিরবিহীন নির্বাচনী বিজয়ের গৌরবময় শিরোপা। বাংলার মানুষ বিগত নির্বাচনে শেখ মুজিব এবং তার অনুসারীদের শুধু ভোট দেয় নাই- দিয়েছল হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবিচল বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আস্থা। এ বিশ্বাস ও আস্থার যাতে এতটুকু অমর্যাদা না হয়, স্বীয় দায়িত্ব পালনে যাতে বিন্দুমাত্র অবহেলা না হয়, সেই সচেতন সতর্কতাই গণপ্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে। দিনটা ছিল ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ সাল। বাংলার উদার আকাশের নীচে শীতার্ত দিনের শেষ প্রহরে স্নিগ্ধ সূর্যালোক-স্নাত সুবিশাল রেসকোর্সের জনারণ্য আর উপরে জাগ্রত বিধতাকে সাক্ষী রেখে সেদিন বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিরা শপথ নিয়েছিলেন। এক হাত বুকের উপর রেখে আরেক হাত ঊর্ধ্বে তুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গণপ্রতিনিধিরা বিবেকের নামেই ওয়াদা করেছিলেন : 'জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব।' এই শপথ যে ধোঁকাবাজির ভড়ং ছিল না, ছিল তাদের ঈমানেরই অঙ্গ-সেই সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণেও তার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। শেখ মুজিব সেদিন বাংলার মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ভায়ায় নির্দেষ দিয়েছিলেন : যদি কেউ এই শপথ ভঙ্গ করে, যদি কোন গণপ্রতিনিধি তোমাদের বিশ্বাস ও আস্থার অমর্যাদা করে, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয-তাকে জ্যান্ত কবর দিও। এমনকি এই যদি আমি করি-আমাকেও তোমার রেহাই দিও না।

গণপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের এমন দুর্বার আগ্রহ ছিল বলেই নির্বাচনী-বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার জাতীয় অধিবেশন আহ্বানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহবার জানিয়েছেন। এজন্য তিনি ১৫ই ফেব্রয়ারী তারিখটিও নিদির্ষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়াই টালাবহনা করেছে। শেষ পর্যন্ত তারই খুশিমত ১লা মার্চ হয়েছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ। কিন্তু সেদিনও পরিষদের অধিবেশন বসতে দেয়নি ইয়াহিয়া খানই-গণপ্রতিনিধিরা নয়। আর এভাবেই শাসনতন্ত্র রচনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পথ গণপ্রতিনিধিদের সামনে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে- অথচ আজ হঠাৎ করে সেই জঙ্গীশাহীর মুখেই শোনা যাচ্ছে গণপ্রতিনিধিদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন। শুনে চমকে উঠতে হয় ভূতের মুখে রাম নাম শোনার মত।

কিন্তু আর যাই হোক হঠাৎ করে জঙ্গীশাহীর এই সুমতির পেছনে যে কোন সাধু উদ্দেশ্য নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিন ও আজকের অবস্থাটার দিকে তাকালেই জল্লাদী আবেদনের গোমরাটা ফাঁস হয়ে যাবে।

৩১০ সদস্যের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ১৬৭। ৩০০ সদস্যের বাংলাদেশ পরিষদেও আওয়ামী লীগারের সংখ্যা ২৮৮। যদি মার্চের এক তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারতো, ক্ষমতাসীন হতে পারতো। ফলে সমাধি রচিত হতো জঙ্গীশাহীর। কিন্তু তা হতে দিতে চায়নি জল্লাদ ইয়াহিয়া। আর চায়নি বলেই ষড়যন্ত্র আর শঠতার আশ্রয় নিয়ে সে বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষের ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে, অসংখ্য ঘর-বড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশান্তরী করেও ইয়াহিয়া বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের বিবেককে কিনে নিতে পারেনি। তাই সেই বিবেকহীন জল্লাদ কলমের এক খোঁচায় জবাই করেছে আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ এবং ১৯০ জন প্রাদেশীক পরিষদ সদস্যকে। ইয়াহিয়ার দৃষ্টিতে তার পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পরিষদে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা এখন সংখ্যলঘু। শেখ মুজিব কারাগারে। পাকিস্তানের সাবেক জঙ্গীশাসক আইয়ুবের জারজ সন্তান এবং বর্তমান শাসক ইয়াহিয়া লেজুড় ভূট্টোর দল জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু। সুতরাং আর ভয় নেই। তাইতো আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া মেহেরবানি করে পরিষদ সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। এ আবেদনের আজ শুধু মানুষের মনে বিদ্রূপ, ঘৃণা আর ধিক্কার সৃষ্টি করবে।...

২৭ শে আগষ্ট, ১৯৭১

বিদেশী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার তথাকথিত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত গণপ্রতিনিধিদের শূন্য আসনগুলির উপনির্বাচন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখতে চায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যে ৭৯ জন অনুসারীকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের সদস্যপদ খারিজ করা হয়েছে, তাদের জায়গায় আগামী নভেম্বর মাসে উপনির্বাচন হবে বলে ইয়াহিয়া খানই ঘোষণা প্রচার করেছিল। লণ্ডনের ‘ডেলী টেলিগ্রাফ’ পত্রিকা জানিয়েছে যে, নির্বাচনে দাঁড়াবার মত দালাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ইয়াহিয়া খান উপনির্বাচন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে গেরিলাদের অপ্রহিত তৎপরতা। তারা যে কোনভাবে হোক উপনির্বাচনের প্রহসন ঠেকিয়ে রাখবে। ডেলী টেলিগ্রাফ বলেছে, ইয়াহিয়া খান খুব শিগগিরই উপনির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। বলা নিস্প্রয়োজন, যা ঘটতে যাচ্ছে তা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক কিছু নয়।

গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তেইশ বছরের প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিয়েছে শোষক-ষড়যন্ত্রী শাসকের কজা থেকে নিজেদের ভাগ্য ছিনিয়ে আনার দূর্বার আকাঙ্ক্ষায়। বিজয়ী করেছে তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে। দেশ ও

দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালোবাসা এবং তার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আস্থাই নেতা ও জনতাকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে এনেছে। এই নৈকট্যবোধ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই প্রতিফলিত হয়েছে নির্বাচনী রায়ে। এই নির্বাচনের লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু এই নির্বাচনের রায় যখন শেখ মুজিবের পক্ষে গেল, যখন শোষক-ষড়যন্ত্রকারী গণদুশমন শাসকরা বুঝতে পারলো যে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মানে হলো নিজেদের কবরের উপর জনতার বিজয়-কেতন উড্ডীন করা, ওরা প্রমাদ গণলো। লিপ্ত হলো নির্বাচনী রায় বানচালের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। ন্যায়নীতি-বিবেকের মাথা খেয়ে জঙ্গীশাহী জনতা, গণ-প্রতিনিধিবর্গ আর তাদের নেতা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে শুরু করলো নতুন চক্রান্ত। উদ্দেশ্য-যে কোনভাবে হউক পরিষদের অধিবেশন বাতিল এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখতেই হবে। আর এই দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য কি না করেছে জঙ্গীশাহী। রক্তগঙ্গা সৃষ্টি করেছে ওরা বাংলাদেশে-খুন, জখম, লুট, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা ওরা করেনি। এমনকি শেখ মুজিবকে বন্দী করে, বিচারের প্রহসন মঞ্চ সাজিয়ে তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করতেও ওরা পিছপা হয়নি। তাতেও যখন কাজ হয়নি-মাথা নত করেনি বাংলার নেতা ও জনতা-জল্লাদ ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় খারিজ করেছে পৌনে তিনশত গণপ্রতিনিধির সদস্যপদ। কারণ, ইয়াহিয়া ভেবেছিল আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের এসব শূন্যপদে উপনির্বাচন করে দালালদের পার করিয়ে নেওয়া যাবে, গঠন করা যাবে একটি পুতুল সরকার-যে সরকারের একমাত্র দায়িত্ব হবে জল্লাদের পা চাটা।

কিন্তু বিধি বাম, বাংলার মাইর দুনিয়ার বাইর। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আর বীর জনতার মিলিত প্রতিরোধের সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ইয়াহিয়ার তোগলকি খোয়াব।...

....সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

রয়টার পরিবেশিত এক খবরে জানা যায়, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর নায়ক ইয়াহিয়া খান গত মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরান গিয়ে পৌঁছেছে। ওয়াকেবহাল মহল জানিয়েছেন, ইয়াহিয়া খান ইরানের শাহের সঙ্গে পাক-ভারত সর্ম্পকে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সে সর্ম্পকে আলাপ-আলোচনা করবে।

তেহরানের ইংরেজী দৈনিক 'তেহরান জার্নাল'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান ও ভারতের বর্তমান সংঘাত ইরানের মধ্যস্থতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে ইরানের বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক বিরাজমান থাকায় ইরান দুই দেশের সর্ম্পকোন্নয়নের ব্যাপারে তৃতীয় যে কোন দেশের চাইতে অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পত্রিকাটিতে এমনও বলা হয়েছে, অক্টোবরে পারস্য সাম্রাজ্যের আড়াই হাজারতম বার্ষিকী অনুষ্ঠান ইয়াহিয়া খান ও ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের একটা চমৎকার সুযোগ করে দেয়।

ঠিকই দিল ঢাকা থেকে এক বেতার ভাষণে বাংলদেশের অধিকৃত এলাকার লাটবাহাদুর গাদ্দায় মালিক বলেছে যে, সে ভারতীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

দুটি খবরের উৎসস্থল তেহরান ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব অনেক-হাজার হাজার মাইল। কিন্তু আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে খবর দুইটির সারসংক্ষেপে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে অনেকের কাছেই। তবু একথা সত্য যে, সমস্যার কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া ধর্না দিয়েছে ইরানের দরবারে, উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের বৈঠকের। আর এদিকে ইয়াহিয়ার ভাড়াটিয়া গর্ভনর মালিক বাস্তুচ্যুত বাঙ্গালী শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য আলোচনা করতে চাইছে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে।

কিন্তু কেন? পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর এই আচরণের, ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এত খায়েশ কেন?

বিশ্ববাসী জানেন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ কোন বিরোধ নেই। আসলে সংঘাত চলেছে, যুদ্ধ চলেছে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশ এবং উপনিবেশবাদী পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর মধ্যে। রক্তপাত, বর্বরতা, লুটতরাজ, নির্যাতন চলছে বাংলার মাটিতে-এসব করেছে ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া ডালকুত্তার দল। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে অমিতবিক্রমে লড়ে চলেছে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের বিরুদ্ধে। হানাদার বাহিনী নাপাম বোমা ফেলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে বাংলাদেশের জনপদ। স্বাধীন বাংলার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে জল্লাদ ইয়াহিয়া খান। লিপ্ত হয়েছে তার বিচার প্রহসনে। তাই সমগ্র বিরোধটা, মূল সংঘর্ষটা চলেছে বাংলাদেশের জনগণ আর পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এর মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? ভারতের কথা আসে কিসে?

কিন্তু তবু গোড়া থেকেই জঙ্গীশাহী চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি বেমালুম চাপা দিয়ে বিশ্ববাসীকে এই মর্মে বিভ্রান্ত করতে যে সংঘর্ষটা আসলে পাকিস্তন ও ভারতের মধ্যে। এর উদ্দেশ্যেও পরিষ্কার। জঙ্গীশাহী চাইছে পাক-ভারত সংঘর্ষের ডামাডোলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ইয়াহিয়া চাইছে বাংলাদেশ ইস্যু থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কল্পিত পাক-ভারত বিরোধের দিকে সরিয়ে নিতে। আর সে কারণেই তেহরানের দুয়ারে ধর্না।

২২শে 'সেপ্টেম্বর', ১৯৭১

খবরের পর খবর। নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ সর্ম্পকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারী ২৫টি দেশ একবাক্যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করেছে। গত সোমবার সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে স্বাধীন বাংলাদেশেকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দানের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ভারতের সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করা এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত সমুদয় সাহায্য সামগ্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করারও দাবী জানানো হয়।

এদিকে কুয়ালালামপুর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সংসদীয় সম্মেলনে বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানানো হয়েছে। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে বলা হয়েছে, তার মত কালজয়ী নেতাকে আটক রাখা গর্হিত অন্যায়। আফগানের বাদশাহ জহির শাহের মস্কো সফরশেষে প্রকাশিত সোভিয়েত-আফগান যুক্ত ইশতেহারেও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি, বাংলাদেশে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদস্যুদের বর্বর গণহত্যাযজ্ঞের নীরব দর্শক জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট শেষ পর্যন্ত বিবেকের তাড়নায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদাপূর্ন স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের মূল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। তিনি একথাও বলেছেন যে, বাঙালী জাতিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা বিশ্ববাসীকে নৈতিক দায়িত্ব।

এদিকে, ফ্রান্সের বিশিষ্ট লেখক, রাজনীতিক ও প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী মঁসিয়ে আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে দেশ-

বিদেশের বহু তরুণ তার কাছে চিঠি লিখেছে। এই খবর পরিবেশনাকারী একটি পত্রিকার ভায়ায় "আজ বাংলার মুক্তিসংগ্রামের কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি" পড়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, উল্লেখিত সবক'টি খবরই বাঙালী জাতির জন্য শুভ সংবাদ। কারণ, এতে একদিকে যেমন বাঙালী জাতির মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে দুনিয়ার মানুষ জল্লাদ ইয়াহিয়ার কথা বিশ্বাস করেনি। বরং পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে অন্ত হীন ঘৃণা আর ধিক্কার ছাড়া তার আশা করবার আর কিছুই নেই।...

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

একটি বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, লণ্ডনে এই মর্মে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি আসন্ন। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে, বাংলাদেশ সর্ম্পকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার আগেই শেখ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। লণ্ডনে পাকিস্তানী অনুচররা এই মর্মে প্রচরণা চালিয়ে যাচ্ছে যে, শেখ মুজিবের কোন দোষ নেই। শুধুমাত্র চরমপন্থীরা দেশদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য দায়ী। আর একই দরুন ২৫শে মার্চ পাক ফৌজকে অস্ত্র হাতে রাস্তায় নামতে হয়েছিল।

এদিকে করাচী থেকে ফরাসী বার্তা সংস্থা এ-এফ-পি জানিয়েছে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেগম মুজিবকে লয়ালপুরের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারে। রাওয়ালপিণ্ডির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় চিকিৎসাধীন তার বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে পারে। বলা হয়েছে যে, গত সপ্তাহে বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গর্ভনর ডাঃ মালিকের সঙ্গে দেখা করে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধু যাতে তার অসুস্থ পিতা-মাতাকে দেখতে পারেন সে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। পিণ্ডির পত্র-পত্রিকার খবরে আরও বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবের বিচারের রায় আগামী সপ্তাহেই দেওয়া হবে বলে মনে হয়।

জল্লাদ ইয়াহিয়া খেলাটা ভালো জমিয়ে তুলেছে। উপরের খবরগুলো একটু তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কারভাগে বুঝতে পারা যায় যে এর পেছনে রয়েছে ইয়াহিয়ার এক সুচতুর চাল। এই ক'দিন আগেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান 'লা ফিগারো' পত্রিকায় প্রতিনিধির কাছে সদম্ভে বলেছে যে, শেখ মুজিব কোথায় আছে তা তার জানা নেই। কারণ, কারারুদ্ধ ক্রিমিনালদের' কে কোথায় আছে তা-একটা দেশের প্রেসিডেন্টের জানা থাকবার কথা নয়। আজ সেই ইয়াহিয়া খানের সরকারই দয়ায় বিগলিত শেখ মুজিবের পত্নীকে তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবে, বঙ্গবন্ধুকে তার রোগশয্যাশায়ী মাতাপিতাকে দেখতে ঢাকায় নিয়ে আসবে, এমনকি জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্নে বির্তক শুরু হবার আগেই বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবে-এতসব খবরে এখন বাজার মাত। শুধু কি তাই, একদিকে ইয়াহিয়া খান নিজেই বলেছে শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিমিনাল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়ে তার হচ্ছে বিচারের নাম প্রহসন- আবার অপরদিকে জেনারেল ইয়াহিয়াই বঙ্গবন্ধুর জাতীয় পরিষদ সদস্যপদটি খরিজ করে। তার অনুচরেরা সার্টিফিকেট দিচ্ছে 'শেখ মুজিব আসলে ভালো মানুষ। তার কোন দোষ নেই। ইয়াহিয়া খান 'লা-ফিগারো'কে বলেছে, 'শেখ মুজিবকে দিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবী করিয়েছে। ইয়াহিয়ার অনুচরেরা বলছে, 'চরমপন্থীরাই 'দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডের গুরুঠাকুর।'

কিন্তু ঘটনাটা কি? আমরা বরাবরই বলেছি, শেখ মুজিবের জীবন এবং তার নিরাপত্তাকে ইয়াহিয়া খান ব্যবহার করতে চাইছে শেষ রক্ষার তুরুপের তাস হিসাবে। তাই সে এদিকে শেখ মুজিবের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে, অপরদিকে গোপনে দূত পাঠিয়ে তারই কাছে দিচ্ছে আপসের ধর্না। ... তারই অনুসারীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে জঙ্গীশাহী আর তার চেলা-চামুণ্ডারা জনমনে বিভ্রান্তি এবং বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। ইয়াহিয়া

খান জানে যে, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের নির্দেশিত থেরেই অভিযাত্রিক মাত্র। তবু এই বিভেদ-প্রচার নীতি অনুসরণ করছে তারা নিজেদের দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্যই। …

১লা অক্টোবর, ১৯৭১

জাতিসংঘ সদর দফতর প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবার জন্য পাকিস্তান জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ উথান্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়, জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানী প্রতিনিধি আগা শাহী উথান্টের কাছে লেখা এক চিঠিতে এ আবেদন জানিয়েছে। চিঠিতে অভিযোগ করা হয় যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে গুরুতর 'ক্রিমিনাল' অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে জনাব সিদ্দিকী এবং প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের নিউইয়র্কে প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও আবেদন করা হয়েছে।

ব্যাপারটাকে কি বলা যায়! পাকিস্তান যে ফরিয়াদ জানিয়েছে তাকে মামা বাড়ির আবদার বললেও খাটো করে বলা হয়। একটি। স্বাধীন দেশের জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের বিশ্বসংস্থায় মাতৃভূমির বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টিকল্পে উপনিবেশবাদী জঙ্গীশাহীর এই নির্লজ্জ অপচেষ্টাকে কলঙ্কজনক তস্করবৃত্তি আখ্যা দিলেও যথেষ্ট বলা হয় না, কিন্তু তবু ঘটনা সত্য যে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহী জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পেশে বাধা সৃষ্টির ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। এমনকি জাতিসংঘ লবিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা যাতে স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে না পারেন, সেজন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ভিসা মঞ্জুর বন্ধ করার চেষ্টাও পাকিস্তান করেছে। পাকিস্তানের এই অপচেষ্টার দরুনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা লাভে বিলম্ব হয়েছে এবং তার ফলে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিউইয়র্ক পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছে পুরো চারটি দিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জঙ্গীশাহীর প্রথম অপচেষ্টাটি ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেছে।

সকলেই জানেন, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং লণ্ডনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল নিউইর্য়ক গিয়েছেন বিশ্ব সংস্থার সদস্যদের কাছে জননী বাংলার বুকে জল্লাদ ইয়াহিয় ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও নজিরবিহীন গণহত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনী বর্ণনা করতে। তাঁরা গিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিদান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্ব রাষ্ট্রবর্গকে অগ্রণী করতে। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যারা জাতিসংঘে গিয়েছেন তারা জনগনের আস্থভাজন-সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী এবং কূটনীতিক। সততা ও দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাঁটি সোনা তারা। তাদের কণ্ঠস্বর বাঙালী জাতির কণ্ঠস্বর বলেই বিবেচিত হবে। তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন হানাদার বর্বর উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত একটি দুর্বিনীত জাগ্রত জাতির।

অপরদিকে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলটি গঠিত হয়েছে গণধিকৃত রাজনৈতিক মৃত সৈনিকদের নিয়ে। সকলের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। শুধুমাত্র দুই নেতা-বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী এবং পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা পেশাদার দালাল মাহমুদ আলির দিকে তাকালেই দুটি প্রতিনিধিদলের মধ্যকার পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বিশ্বাবাসী জানেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের হয়ে কথা বলার অধিকার রয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের-পাঞ্জাবী কুচক্রের জারজ সন্তান মাহমুদ আলিদের নয়। তাই একথাও পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বক্তব্যকেই বিশ্ববাসী চূড়ান্ত

বলে মেনে নেবে। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার জল্লাদী খায়েশ নির্ঘাত মাঠে মারা যাবে। আর সেই ভয়েই জঙ্গীশাহী প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিশ্বসংস্থার আঙ্গিনায় ঢুকতে না পারেন-তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে না পারেন।...

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় জঙ্গীশাহীর উপনির্বাচনের প্রহসন সর্ম্পকে আরও জবর খবর এসেছে। শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার মারফত জানা গেছে যে, অধিকৃত এলাকার যে ৭৮টি জাতীয় পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের খারিজ করে উপনির্বাচন হচ্ছে তার ৫৫টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাকিস্তান দরদী ইসলামী-দরদীরা নির্বাচিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৩টি আসনের ৮৫টিতে জনাবরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে-ভোটাভুটির দরকার হয়নি। এদিকে রেডিও পকিস্তান জানিয়েছে লাহোরে ইয়াহিয়া খাঁ'র সঙ্গে তার বৃদ্ধ ঘেটু নূরুল আমিন সুদীর্ঘ আলোচনা-বৈঠক চালিয়েছে। বিদেশী বার্তা প্রতিষ্ঠা জানিয়েছে, ইয়াহিয়া খান নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের পরিকল্পনা করেছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় নিয়েই নাকি জল্লাদ আর দালালের সলাপরামর্শ চলেছে।

অপরদিকে ভুট্টোর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী-গিরির চাকরিটা পাকা হবার সম্ভাবনাই বেশী বলে মনে করা হচ্ছে তার চীন সফরের দরুন। কিছুদিন আগেও ভুট্টো ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম কথা বলেছে। আর শেষ পর্যন্ত সেই ইয়াহিয়ারই ট্যাণ্ডেল হিসাবে সে পিকিং সফর করছে সমরাস্ত্রের ভিক্ষাপাত্র হাতে। বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে ক্ষমতার কাঁচকলার গন্ধ পেয়েই ভুট্টো এতটা তকলিফ স্বীকার এবং নীচে নামতে রাজী হয়েছে।...

এবার আসা যাক উপনির্বাচনের তেলেসমাতি খেলার কথায়। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলি ,'৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাই বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি। তাদেরই নিয়ে গঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। তাই বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় পর্যন্ত এই তথাকথিত জল্লাদী উপনির্বাচন শুধু অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপই নয়-ইয়াহিয়ার এক হাস্যকর পাগলামিও বটে। আর এই উপনির্বাচন সম্পর্কে ইয়াহিয়ার খাস তালুক পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকার মতামতই কি তার প্রতি খুব অনুকূল? মোটেই নয়। সেকথাই এখন বলছি।

করাচীর 'ডন' পত্রিকা বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার উপনির্বাচনে ভুট্টোর পিপলস পার্টির ৬ জন সদস্যের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়াকে 'রহস্যজনক' বলে মন্তব্য করেছে। পত্রিকা বলেছে, এটা সত্যিই রহস্যাবৃত-কেন এই ৬টি আসনের সবক'টিতে পিপলস পার্টির বিরোধী নূরুল আমিন নেতৃত্বাধীন ৬ দলের ঐক্যজোটের সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আর কেন নিয়েছে, তার জবাব নূরুল আমিনও দিতে পারেনি-সে জানে না। লাহোরের উর্দু দৈনিক 'কোহিস্তান' জানিয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ৬টি আসন দখল করার জন্য পিপলস পার্টি বিরোধী প্রার্থীদের ২২ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছে। আরেকটি লাহোরী উর্দু দৈনিক 'আজাদ' এ ব্যাপারে তদন্ত দাবী করেছে। পত্রিকাটির এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে। এই উপনির্বাচনের ফলাফল জনগণকে এবং বিশ্ববাসীকে নির্বাচনের বৈধতা, নিরপেক্ষতা ও সত্যতা সম্পর্কে সংশোধন করতে পারবে না। পত্রিকাটি বলেছে, 'এই ৫৫টি আসনে তারাই নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়েছে, ডিসেম্বরই নির্বাচনে যাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' তারপর আমাদের আর কি বলার আছে?

১৬ই নভেম্বর, ১৯৭১

... নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর আর্নড বোর্চগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক তারবার্তায় অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছেন : ইস্টার্ন সেক্টরের কমাণ্ডার নিয়াজীকে মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে বললো, 'বিদ্রোহীরা কোন সমস্যা নয়। তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমাদের রাজাকাররাই যথেষ্ট।' অথচ বোর্চগ্রেভের মতে রাজাকাররাই সামরিক জান্তার উপকারের তুলনায় ক্ষতিই করেছে বেশী। যেহেতু তাদের হাতে বন্দুক আছে, তাই তারা মনে করে তাদের এক-একজন বিধাতাপুরুষ। খাদ্য বা মেয়েমানুষ সরবরাহে অস্বীকৃতি জানালে এই রাজাকাররা যে কোন লোকের জীবর বিপন্ন করে তুলতে পারে।

বোর্চগ্রেভ আরও লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কঠিন সত্যটিকে সযত্নে ডাঃ মালিক থেকে শুরু করে জেনারেল ইয়াহিয়া পর্যন্ত সবার কাছে থেকে গোপন রাখা হচ্ছে। তাদের ধারণা, সেনাবাহিনী সঠিকভাবেই মুক্তিবাহিনীর মোকাবেলা করছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে এখনও কত ভয়াবহ হিংস্র বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তারই দুটি নজির পাওয়া গেছে সম্প্রতি। নিউজউইকের প্রতিনিধি বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের পশ্চাদ্ধাবনের নামে কয়েকদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ডেমরা গ্রামে ঢুকে পড়ে। হানাদার নরপশুরা সেখানে ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের বেশী বয়স্ক সকল পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরই দু-একদিন পরে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা চালনার কাছে নদীতে দ্রুত গানবোট চালিয়ে ঢেউ তুলে কতকগুলি জেলে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। জেলেরা সাঁতরে তীরে উঠবার চেষ্টা করলে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়।

আমাদের কথা নয়-বিদেশী সাংবাদিক আর্নড বোর্চগ্রেভের এই বিবরণীই নিরপেক্ষ নিয়তির কঠিন রায়ের মত বিশ্ববাসীকে আরেকবার জানিয়ে দিল বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী জঙ্গীচক্র মার্চ মাসে যে নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ, যে হিংস্র বর্বরতা শুরু করেছিল আজো তা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন এই বর্বরতা? কেন এই নৃশংসতা? কোন মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন এই পাশবিক গণহত্যযজ্ঞ? কি অপরাধ করেছিল বাংলার মানুষ?...

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন উপনিবেশবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে-আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া ভোট দিয়ে বাঙালী জাতি শেখ মুজিবকে প্রদান করেছে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্বভার। আর বিধাতার ছায়া সন্দর্শনে ভীতসন্ত্রস্ত শয়ানের মতই থর থর করে কেঁপে উঠেছে গণবিরোধী শাসন-শোষককুলের অন্তরাত্মা। কারণ, তারা জানতো, শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থই হবে দুঃখী জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-আর চক্রান্তকারী শাসক-শোষক ও জঙ্গীবাজদের চূড়ান্ত সর্বনাশ। এ তাই তাদের স্বার্থের জিম্মাদার, ভাড়াটিয়া এজেন্ট ইয়াহিয়াকে তারা প্ররোচিত করেছে হিংস্র বর্বর পন্থায় বাঙালী জাতিকে নির্মূল করে দেবার অভিযান চালাতে।...

২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি ম্যাককম ডব্লু ব্রাউন বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফরশেষে ঢাকা থেকে প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেছেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বাংলাদেশের মানুষ পূর্ন স্বাধীনতা চায়। ইয়াহিয়া খান শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাদের এ ইচ্ছাকে দাবিয়ে দিতে পারবে না। অর্থাৎ তার বর্বরতা এবং শক্তি প্রয়োগের মাত্রা যত, বাড়বে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ততই ত্বরান্বিত হবে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের এই রিপোর্টে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিদ্রোহী তার সব রকমের মাধ্যমের সাহায্যে যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, নিউইয়র্ক টাইমসসহ

বিভিন্ন নিরপেক্ষ বিদেশী সংবাদপত্রের রিপোর্টে এবং মন্তব্যই বিশ্ববাসীর সামনে তার অসারতাকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছে। সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টি আজ বাংলাদেশের দিকে। তাই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ যাতে ঠিক তথ্য জানতে না পারে জল্লাদ ইয়াহিয়ার প্রচারবিশারদরা সেজন্য চেষ্টার এতটুকু কসুর করেনি।

পশ্চিম পাঞ্জাবী শিল্পপতি, কায়েমী স্বার্থবাদী এবং শোষককুল পৃষ্ঠপোষিত উপনিবেশবাদী জঙ্গী শাসককুলের গণবিরোধী শাসন ও শোষণের চাকা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকায় তাদেরই ভাড়াটিয়া গোলাম জল্লাদ ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। ইতিহাসে নজিরবিহীন গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, হিংস্র বর্বরতার সঙ্গে নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের আশ্রয় নিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা দেশান্তরী করে ইয়াহিয়া খান চেয়েছিল পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তাদের স্বাধীনতার দাবীকে নির্মূল করে দিতে। আর এ বর্বরতার লোমহর্ষক কাহিনী চাপা দিয়ে রাখবার জন্য কুচক্রী ইয়াহিয়া বাংলাদেশ থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছিল বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ শুরুর প্রথম মুহূর্তেই। কিন্তু তার অসদুদ্দেশ্য সফল হয়নি। ইয়াহিয়া একদিকে যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করতে পারেনি, তেমনি পারেনি বাংলাদেশে তার ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর পৈশাচিকতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রাখতে।

বহুদিন কড়া সেন্সরশীপ আরোপ রেখে, কিছু অসৎ সাংবাদিক ভাড়া করে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে জল্লাদশাহী নিজেদের পাপকীর্তি চাপা রাখার, বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমগ্র দুনিয়াব্যাপী সংবাদপত্র জগৎ এর জনমতের প্রচণ্ড চপে বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান বিদেশী সাংবাদিকদের বাংলাদেশে ঢুকতে দিয়েছে। প্রথম সুযোগেই দুনিয়ার দশদিগন্ত থেকে খ্যাতনামা পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানরা ছুটে এসেছেন যুদ্ধবিক্ষত বাংলাদেশে। তারা দেখেশুনে বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছেন। ভিয়েৎনাম, আলজেরিয়া, কিউবার বিপ্লব আর জনযুদ্ধসারা পৃথিবীর মানুষের সপ্রশংসা দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশও মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আট মাস সময়ও অতিক্রান্ত হয়নি কিন্তু এরি মধ্যে বীর প্রসবিনী বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা যে অভূতপূর্ব বীরত্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে তার আর কোন নজির নেই। ইয়াহিয়া খান ৭২ ঘণ্টার 'ক্রাশ বেঙ্গলী' পোগ্রামের হিংস্র নখরাঘাতে শুরুতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দাবিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের তীব্রতায় জল্লাদী খোয়াব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আজ জল্লাদী সাম্রজ্যের মোহই চূড়ান্তভাবে ক্রাশ হবার দ্বারপ্রান্তে। বিদেশী সাংবাদিকরাই নিজের চোখে দেখছেন প্রতিদিন প্রতিটি রণাঙ্গনে হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটছে। প্রতিদিন মুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা-নতুন নতুন অঞ্চলে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। আর তাই হানাদার জঙ্গীবাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়ে বিদেশী সাংবাদিকেরা সত্যভাষণের স্বার্থেই বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীন হবেই-কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৭১

জল্লাদ ইয়াহিয়া খান গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতি ভারত ও পাকিস্তানের সম্পদ এমন একটি এক জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে যেখান থেকে আর ফিরবার উপায় নেই। রেডিও পাকিস্তানের কাজ অনুসারে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছে, পাকিস্তানের সম্মান ও অখণ্ডতাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবে। ইয়াহিয়া খান আবার অভিযোগ করেছে যে, ভারত বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ পরিচালনার ফলেই উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে।

একই দিনের আরেকটি খবরে জানা যায়, যে সমস্ত বৃটিশ, মার্কিন ও জার্মান নাগরিক বাংলাদেশে আছেন অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা এই মুহূর্তেই স্বদেশে ফিরতে পারছেন না তাদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। গতকালের খবরে বলা হয়েছে, মুক্তিবাহিনী ঝিকরগাছা থেকে হানাদার বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে যশোর সেক্টরে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলেছে। সাতক্ষীরা মহকুমাও গতকাল শত্রুমুক্ত হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর একটি দল খুলনা শহর অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর যশোর ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে আকাশবাণীর খবরে জানা যায়, পকিস্তানী সৈন্যরা বুধবার মধ্যরাত্রি থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাটের ওপর একটানা ১২ ঘণ্টা ধরে গোলাবর্ষণ করায় ১২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আগরতলা সীমান্তেও পাকিস্তানী বাহিনীর অশুভ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সমগ্র পাকিস্তানে ইতিপূর্বেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে আশংকা করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, পাকিস্তানী কাণ্ডজ্ঞানহীন জঙ্গীচক্রের ভারত আক্রমণের সম্ভবত বেশী দেরী নেই। ভারতও প্রস্তুত হয়ে আছে হামলার পাল্টা জবাব দেবার জন্য। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রমের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে একথা নিশ্চিত যে, পাকিস্তান যদি আক্রমণ চালায় ভারত তার দাঁতভাঙ্গা জবাবই দেবে। আর সে জবাব যে পাকিস্তানী জঙ্গীচক্রের জন্য কত ভয়াবহ হবে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হচ্ছে সম্প্রতি ভারতের আকাশসীমা লংঘনকারী ৪টি পাকিস্তানী বিমানের তিনখানির ভূ-পতন।

কিন্তু, কেন এই রণপাঁয়তারা? কেন এই যুদ্ধের আগুন? ভারত যুদ্ধ চায় নাই। ভারত চেয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীন জাতি হিসাবে বাঁচুক, সেখান থেকে জঙ্গী বর্বরতার অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণভয়ে যারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, তারা সসম্মানে দেশে ফিরে যাক। তবু, শুধুমাত্র এই মৌলিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দায়েই পাকিস্তান ভারতের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছে। আগাগোড়াই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ভারতের কারসাজি বলে চালিয়ে দিয়ে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করতে। আজ যখন ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেয়া ভাড়াটিয়া বাহিনী শেখ মুজিবের বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে চারদিকে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তখনও ইয়াহিয়া খান সেই পুরাতন সুরেই কথা বলছে। মুক্তিবাহিনীর হাতে নিজের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের পরাজয়ের কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হওয়াতেই হয়তো সে বলে চলছে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেছে। আর এই কল্পিত অভিযোগে তুলেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণের পাঁয়তারা করছে।..

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য পাকিস্তানী জঙ্গীশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইয়াহিয়া খানের শুভেচ্ছা বাণীর জবাবে শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের মাধ্যমে তার এই আহ্বান জানিয়ে দেন।

ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, ইয়াহিয়া খান শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার প্রস্তাব দিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ কোন আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারবে না। শ্রীমতী গান্ধীর মতে, তিনি বাংলাদেশের জনগণকে কোন সমাধান মেনে নিতে বলতে পারেন না। কারণ সে অধিকার তার নেই।

এই উপমহাদেশের বর্তমানে উত্তেজনাকর পরিবেশের পটভূমিতে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদান এবং বাংলাদেশ ইস্যুর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর এই আহ্বানের তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মধ্যে একটা ভয়াল রক্তক্ষয়ী এ্যাডভেঞ্চার পরিহার করে বাস্তবতার আলোকে বিরাজমান গুরুতর সমস্যা থেকে শান্তিপূর্ণ পরিত্রানের এটাই সম্ভবত বিশেষ মানবিক আহ্বান। ইয়াহিয়া খান যদি শ্রীমতী গান্ধীর এই ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়, অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, এই উপমহাদেশে উত্তেজনার বারুদস্তূপে জল্লাদী হামলার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগে, সর্বাত্মক যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। আর তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ইয়াহিয়া খান শুধু মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদই-নয় কূটচক্রান্তের এক ঘৃণিত নায়ক। যে পশ্চিম পাঞ্জাবী শোষক-পুঁজিপতি-উপনিবেশবাদী চক্রের সে ভাড়াটিয়া গোলাম, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইয়াহিয়া না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। বাঙালীদের বুকের ওপর দিয়ে ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের রথচক্র চালিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখার জন্যই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের বর্বর গণহত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ আর নারী-ধর্ষণের পাশবিক উন্মত্ততায় লিপ্ত হয়েছে। এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই সে দশ লক্ষ বাঙালীর নরকঙ্কালের ওপর বিচার প্রহসনের মঞ্চ সাজিয়ে মেতে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলায়। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই ইয়াহিয়া খান চেষ্টা করে এসেছে বাংলাদেশ ইস্যুকে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের চেহারা প্রস্তাব দিতে। এই উদ্দেশ্যেই সে বারবার ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রত্যাখাত হয়েও আবার প্রস্তাব দিয়েছে। এই একই উদ্দেশ্যেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং সর্বশেষ সুইজারল্যাণ্ডের কাছে তথাকথিত ভারত-পাকিস্তানে বিরোধ মীমাংসার মধ্যস্থতা করার জন্য ধর্না দিয়েছে। ঈদবাণীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার জল্লাদী খায়েশেরও আসল উদ্দেশ্য ভারত-পাকিস্তান বিরোধের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা দিয়ে জননী বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন আর সংগ্রামকে পিষে মারা। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তারও পিছনে সক্রিয় এই একই দুরাভিসন্ধি।..

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ইয়াহিয়ার অপকর্মের দোসর স্বঘোষিত ডেনমার্কের যুবরাজ জুলফিকার আলী ভুট্টো ৮-সদস্যের এক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে জাতিসংঘে গিয়েছে। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর চাকরি পাওয়ার পরপরই ইয়াহিয়া তাকে জাতিসংঘে পাঠিয়েছে তার পক্ষ হয়ে বক্তব্য পেশের জন্য।

ভুট্টো ভাগ্যবান লোক। ইয়াহিয়া জল্লাদ হলেও বেঈমান নয়। সম্বত সেকারণেই অনেক ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মান-অভিমানের পর আবার জল্লাদে-যুবরাজে মিলন ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হয়নি ভুট্টো। দীর্ঘদিন পরে ক্ষমতার কাঁচকলাটার টুকরা একটা অংশ হলেও ইয়াহিয়া ভুট্টোর হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে পাঠিয়েছে জাতিসংঘে।...

বিগত সাড়ে আট মাসে জল্লাদ ইয়াহিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বানচাল করার জন্য যে হিংস্র বর্বরতা, যে পাশবিক গণহত্যা, শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আর ছন-চাতুরির তস্করসুলভ অভিযান চালিয়েছে, মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। কিন্তু তবু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। দশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, এক কোটিকে দেশান্তরী করে, অগণিত জনপদ নিশ্চিহ্ন করে, কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার হুমকি দিয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করতে ইয়াহিয়া খান। বরং যতই দিন গেছে, ততই তীব্রতর দুর্জয় দুর্বার হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ বাঙালী জাতির আক্রমণধারা। মিত্রবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত করতে চলেছেন। দুশমন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তারা দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছেন শত্রুকবলিত ঢাকার দিকে। বাঙালী জাতি আজ শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হচ্ছে ইয়াহিয়া খানের। তাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছে শেষরক্ষার জন্য -ধর্না দিয়েছে আমেরিকার দুয়ারে। আমেরিকা এগিয়ে এসেছে খুনী নিক্সনের দোসর জল্লাদ ইয়াহিয়ার পরিত্রাণে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা চালিয়ে আমেরিকা চাইছে ইয়াহিয়াকে সর্বনাশের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা করতে। ইয়াহিয়ার সরকার মানবেতিহাসের ঘৃণ্যতম নরমেধযজ্ঞের নায়ক-এক কলঙ্কিত সরকার। এই সরকারের চেহারাটা বিশ্ববাসীর কাছে এত বেশী ঘৃণাদায়ক যে খোলস বদল ছাড়া ওকালতির ও সাহস পাচ্ছে না নিক্সন। সম্ভবত সে কারণে -ওয়াশিংটনের অদৃশ্য সুতার টানে ইয়াহিয়া নূরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী আর ভূট্টোকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছে। উদ্দেশ্য : বাঙালী নূরুল আমিন আর সিন্ধী ভূট্টোকে মঞ্চে খাড়া করে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেয়া যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। জনগণ পাকিস্তানই চায়-ভারতই পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য পূর্ব বাংলা দখল করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে ভূট্টোকে অস্ত্র ভিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল চীনে। এবার তাকেই মৃত পাকিস্তানের সঞ্জীবনী সঙ্গীত গাইবার জন্য পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘে। ইয়াহিয়ার বড় আশা, ভূট্টো ব্যারিস্টার, তুখোড় বক্তা-নিশ্চয় সে সবকিছু গুছিয়ে বলে সারা দুনিয়ার মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে।

হায়রে দুরাশা! ইয়াহিয়া হয়তো জানেই না যে, কথার মারপ্যাচে ধোঁকাবাজির দিন বাসি হয়ে গেছে। আসল সত্য, উপমহাদেশের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর অজানা নয়। তার প্রমাণ বিদেশী পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে ও নিবন্ধ।

লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখেছে, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রেত হোক আর না হোক, ধ্বংস আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। যদি এরপর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অতি নাটকীয় কিছু ঘটে তবু বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। গার্ডিয়ান আরও বলেছে, ইয়াহিয়া যদি এখন আলোচনায় বসতে চায়, সে আলোচনার মূল বিষয় হবে কি উপায়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ফিরিয়ে নেয়া যায়। আমেরিকার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অনেক দেরীতে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গতিরোধের সময় পার হয়ে গেছে। 'নিউজউইক' লিখেছে, পাকিস্তানের মৃত্যুচিৎকারের মধ্যেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে নবজাত বাংলাদেশের প্রথম জন্মধ্বনি। আমাদের আর কিছু বলবার দরকার আছে কি?

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনিবার্য পতনের মুখে জঙ্গীশাহীর সাম্রাজ্য। বড্ডো প্রাণ লাগছে, সাধের উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে্ গালে চড় খেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। বীরবর জওয়ানরা লড়াই করা তো দূরের কথা, প্রাণের ভয়ে আত্মসমর্পণ করছে মিত্রবাহিনীর কাছে। তবু অবশ্য আশানুরূপ সাড়া এখনো মেলেনি। আজ পর্যন্ত অফিসার এবং জওয়ান মিলিয়ে ৮ হাজার অস্ত্র ফেলে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করার স্বপ্ন যারা দেখেছিল, বাংলাদেশে জুলুমের এবং ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যারা বাংলাকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, তারা প্রত্যক্ষভাবে কেউই বাংলার অকুতোভয় মুক্তিবাহিনীর শক্তির সম্যক উপলব্ধি করতে পারেনি, অথবা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও মনকে চোখ ঠেরে সবকিছু ধামচাপা দিতে চাইছিল। পিণ্ডির সদর দফতরে যুদ্ধের ঢেউয়ের আঘাত লেগেছে কিন্তু বাংলার মাটিতে মৃত্যভয়ে ভীতি খানসেনাদের আর্তহাহাকারের কোন শব্দ হয়তো পৌঁছায়নি।

কিন্তু সত্যকে গোপন করে বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। সেটা বোধগম্য হয়েছে জল্লাদশাহীর অনেক দেরীতে। যুদ্ধরত সৈনিকের আকুল আবেদন পৌঁছেছে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে, কিন্তু সে আবেদনের সাড়া দেবার এখতিয়ার নেই রাষ্ট্রসংঘের। বাংলাদেশে জল্লাদবাহিনীর প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ নাকচ

* সংবাদ পর্যালোচনা'র এই কথিকাটি মুস্তাফিজুর রহমান রচিত।

করে মৃত্যুর দিনটিগোনার জন্য তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন। মেজর জেঃ রাও ফরমান আলীর সব আবেদন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ' বারবার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসংবরণ করে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আর তা না হলে চরম বিপর্যয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেনে। ঢাকা নগরীর ওপর গত রাত থেকে চরম আঘাত হানা শুরু হয়েছে।

জেনারেল নিয়াজী সত্যকে গোপন করার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ বা উদ্ধারের পক্ষে সমর্থন জানায়নি। কারণ, উদ্ধারপ্রাপ্ত জীবিত এই সেনাবাহিনী দেশের মাটিতে অর্থাৎ পাকস্তানে ফিরে গেলে সেটা হবে জঙ্গীশাহীর পক্ষে আত্মহত্যার শ্যামিল। বাংলাদেশের সংগ্রামের সামগ্রিক রূপটি উদঘাটিত হয়ে যাবে। আপামর জনসাধারণের কাছে এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে যে, তাদেরই বাপ-ভাই-ছেলে বাংলদেশে জঙ্গীশাহীর পরিচালিত অন্যায় যুদ্ধের জন্যই মারা গেছে। তাদের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে গ্লানিকর মৃত্যু। তার ফলে হবে মারাত্মক। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাকিস্তানে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ, আকাশবাণী এবং বি-বি-সি শোনা নিষিদ্ধ।

আর এদিকে যাদের ভরসা দিয়ে শক্তির অহমিকা দেখিয়ে একটি অবাস্তব পুতুল সরকার গড়ে তুলল, তাদেরও স্বস্তি নেই। চিরকালের মিথ্যাবাদী, উগ্রমস্তিষ্ক ভুট্টোকে তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে পাঠানো হলো জাতিসংঘে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! সেই উগ্রমস্তিষ্কের মাথা এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিথ্যাবাদীর মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এতদিনে ভূট্টো স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছে এবং ভুট্টোর স্বভাবসিদ্ধ নীতিমাফিক সামরিক জান্তাকে দোষরোপ শুরু করেছে-অন্যায়ের সমস্ত ঝক্কি এখন ঠেলে দিচ্ছে সামরিক জান্তার উপর।

পুতুল সরকারের লোভী, ক্ষমতালিপ্সু পালের গোদটির যখন এই অবস্থা তখন বাংলাদেশের অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে অনেক। জঙ্গীশাহীর ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করে একটি বালির প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল চিরদিনের বাংলার জাতশত্রু; পাক দালাল ডাঃ মালিক। পাকিস্তানী সুবেদারের দায়িত্বভাবে গ্রহণ করে তাঁতের মাকুর মত নিয়াজী এবং ফরমান আলী যাতয়াত করেছিলেন, ঠিক কখনই কলজের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী। চৈত্যন্যোদয় হলো বাংলার কলংক, জঙ্গীশাহীর পদলেহী তথাকথিত পাকিস্তানী সুবেদার ডাঃ মালিকের। চোখ থেকে এতদিনে গ্যালন গ্যালন জল ঝরতে শুরু করেছে।

ঢাকার গভর্নর হাউসের উপর বোমা এবং কামানোর গোলা নিক্ষেপের সংগে সংগে সন্দেহাতীভাবে পাক প্রতিরোধের পতন অনুধাবন করেছেন ডাঃ মালিক।

আন্তর্জাতিক রেডচক্র সোসাইটির একটি খবরে প্রকাশ, ডাঃ মালিক কাঁপা কাঁপা হাতে তাঁর এবং মন্ত্রী পরিষদের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে ডাঃ মালিক নিডের জীবনের চুলচেরা হিসেব করে দেখছেন।

গভর্নর হাউসের বাংকারও আজ নিরাপদ নয়। তাই অতি মূল্যবান নিজের প্রাণটি বাঁচানোর জন্য স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে ঢাকা নগরীর নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। গতকাল অর্ধমৃত অবস্থায় পুলিশের প্রধান এম, এম, চৌধুরী উচ্চপদস্থ আরো ১৬ জন সরকারী কর্মচারীকে নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ডাঃ মালিক সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছেন অবশ্য। আসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত।

ঢাকা নগরী মিত্রবাহিনীর এবং মুক্তিবাহিনীর পদানত না হওয়া পর্যন্ত ডাঃ মালিক সপরিষদ আইউব খানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কাজের পর্যালোচনার করুন, হিসেবের খতিয়ান কষে দেখুন।

পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বশেষ এবং সুদৃঢ় প্রতিরোধ যে বিপর্যস্ত এবং পতনের মুখে, এটা আজ দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট।

এখন পাকিস্তানী বাহিনীর সম্মুখে দুটি পথ-একটি জেনারেল মানেকশ'র আহ্বান আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করা, আর তা না হলে মৃত্যুকে শ্রেয় জেনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা।

মানুষের মুখ *

১৬ জুন, ১৯৭১

এক টুকরো রুটি

সময় : উনিশ শ' একাত্তের সনের ২৭শে মার্চ। স্থানঃ চট্টগ্রামের কোন উপকণ্ঠ। পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গড়ে উঠেছে শহরে, বন্দরে, গ্রামে। 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হয়েছে ঘরে ঘরে' আমাদের মুক্তিবাহিনী। সীমান্তে থেকে ছুটে এসেছে ই-পি -আর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ানরা। দলে দলে ওরা এসেছে রামগড়া রাঙামাটি আসলং কিংবা হরিণা থেকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত অথচ উদ্দীপ্ত ঐ জওয়ানদের অন্তত একরাত্রির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাল ভোর থেকে ওরা 'অবরোধ শুরু করবে ক্যান্টনমেন্টে। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ দেড়শ জওয়ানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

না, অসুবিধা মোটেই হল না। থাকার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালা খুলে দেয়া হল। খাবারের কথা গ্রামে পৌঁছতেই বাড়ি বাড়ি থেকে গরম ভাত-তরকারি চলে এল। মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই নবাগত মেহমানদের জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত খাবার এল অঢেল পরিমাণে।

যুদ্ধের সময়ে খাদ্য সরবরাহ একটি গুরতৃপূর্ণ ব্যাপার। স্থানীয় যুবকবৃন্দ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একটি কমিটি করে ফেললেন। খবর এল, রাতেই আরও নতুন জওয়ান পৌঁছে যাবে ওখানে। মোট আড়াই শ' লোকের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা থাকলেও নিয়মিত কার্যসূচী চালিয়ে যাওয়া নিতান্ত সাধারণ কথা নয়।

ভোর বেলাতেই বস্তা বস্তা চাল এসে পৌঁছলো মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় দফতরে। গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক দু'টো দশাসই ছাগল নিয়ে এলেন। ওগুলো যুদ্ধকর্মীর হাতে তুলে দিতে বললেন, আগমী ঈদে কোরবানী দেব ভেবেছিলাম। সে সুযোগ আর জীবনে আসবে কিনা জানি না। ছাগল দুটো দিয়েই খালাস পেলাম ভাববেন না। প্রয়োজন হলে নিজেকেও কোরবানী দিতে কসুর করব না।

শুধু চাল আর ছাগল নয়। আরও এল তরিতরকারি, লাউ-কুমড়ো, গুঁড়ো মশলা ইত্যাদি। অনেকে পাক করে আনলেন ভাজা কিংবা সেদ্ধ ডিম। সেসব যথাযথভাবে রাখতে হিমশিম খেয়ে উঠলেন তিরিশজন কর্মী।

---

* মানুষের মুখ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'কামাল মাহবুব' ছদ্মনামে মাহবুব তালুকদার রচিত।

একাশি বছরের বৃদ্ধ সাদেক আলী লাঠীতে ভর দিয়ে যখন এসে পৌঁছালেন তখন সকাল আটটা। গভীর মমত্ববোধে তাকিয়ে রইলেন জওয়ানদের মুখের দিকে। শীর্ণ হাতে ধরে থাকা একটা কলাপতার ঠোঙা। ওটার মোড়ক খুলে বেরুল এক টুকরো রুটি।

বৃদ্ধ একজন জওয়ানের দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন ঠোঙাটি। দেখতে পেয়ে জনৈক কর্মী ছুটে এলেন। বললেন কিছু দিতে হলে আমাকে দিন। ভদ্রলোকে রুটি টুকরোটি এগিয়ে দিলেন কর্মীটির দিকে। বললেন, আমি গরীব মানুষ। এক টুকরো রুটি দেয়া ছাড়া আমার আর সাধ্য নেই বাবা। বয়স কম হলে যুদ্ধে যেতাম। কিন্তু আল্লাহ সে সৌভাগ্যও কপালে রাখেননি।

আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কর্মীটি সহনুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। গ্রামের নাম বললেন বৃদ্ধ। আত্মপরিচয়ও দিলেন, 'আমি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতাও করেছি। এখন আর কিছু করে খাবার সাধ্য আমার নেই।' 'কিন্তু আপনি দেড় মাইল পথ হেঁটে রুটি বয়ে আনলেন, কষ্ট তো আর'- বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আমার এতগুলো ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দেবে, আর আমার হবে কষ্ট?' একটু যেন উষ্ণতা তাঁর কণ্ঠে। ভদ্রলোক বিশেষ অপেক্ষা না করে চলে গেলেন।

এক টুকরো রুটি নিয়ে যুদ্ধকর্মীটিকে যথেষ্ট অসুবিধেয় পড়তে হল। সকালের টিফিন-সবারই খাওয়া হয়ে গেছে। রুটিটা তাহলে কি করা যায়? এমনিতর রুটি তখন পর্যন্ত আর আসেনি, সুতরাং ওটাকে আলাদা রাখতে হবে এবং এক টুকরো রুটির জন্যে আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন। কর্মীটি মনে মনে বিড়ম্বনা বোধ করলেন।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক সুবেদার সাহেবে তাঁর প্লাটুন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অপারেশনের জন্যে। কর্মীটি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, এটা খেয়ে নিন তো?

আমার নাস্তা সারা হয়েছে। সুবেদার বললেন, এখন এটা দিয়ে কি করব?

কর্মীটি ম্লান মুখে বললেন, আমার রাখার অসুবিধা হচ্ছে। একজন অনেক কষ্ট করে রুটিটা নিয়ে এসেছেন। সুতরাং কোনদিকে ফেলে রাখতেও মন চাইছে না।

দিন তাহলে আমেকে, সুবেদার সাহেব হাত বাড়িয়ে রুটির টুকরোটি নিলেন। তারপর ওটা কাগজে মুড়িয়ে প্যান্টের পেছন-পকেটে ভরে রেখে দিলেন।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হল না। দুদিন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া গেল না সুবেদার সাহেবের। শোনা গেল, যুদ্ধ করতে করতে সুবেদার সাহেব ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি চলে গিয়েছেন, বিস্তর পাক সৈন্যকে খতম করেছে ওঁদের দলটি। গড়পড়তায় এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনজন পাকিস্তানীর প্রাণ নিয়েছে। কিন্তু সুবেদার সাহেব বেঁচে আছেন কিনা কে জানে!

হ্যাঁ, বেঁচেছিলেন সুবেদার সাহেব। তিনদিন পরে যখন ফিরলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল, কয়লার খনি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন যেন, দুচোখ ভরে কালি পড়েছে। শ্রন্তি আর ক্লান্তির প্রলেপ পড়েছে মুখে।

কিন্তু সুবেদার সাহেব কাকে যেন খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন এক সময়। সেই যুদ্ধকর্মীটিকে সামনে দেখে হাত চেপে ধরলেন তার। বললেন, আপনি আমার খুব উপকার করেছেন।

আঁ-আমি! অপ্রস্তুত হলেন কর্মীটি।

আপনি সেদিন রুটিখানা না দিলে কি যে হত? উপোস করার অভ্যেস অবশ্য আছে। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যে তাকদ দরকার ঐ রুটিখানাই তা আমাকে দিয়েছিল। আপনি ওটা না দিলে-

কর্মীটি বাধা দিয়ে বললেন-সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে স্মরণ করুন ঐ এক টুকরো রুটি যে সময় বিশেষে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাতো আমি জানতাম না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকে বোধকরি জানতেন।

দুজনেই মাটির দিকে তাকালেন। দুজনের অভিভূত মনে একজন বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। একজনের মনে বাস্তব, আর একজনা তাঁকে দেখেননি বলে ছবিটি কাল্পনিক।

কিন্তু আর একটা ছবি ওদের সামনে স্পষ্ট। দুজনের চোখের সামনেই অতি সাধারণ এক টুকরো রুটি।

২৭ জুন, ১৯৭১

স্বাতীর যুদ্ধ

স্বাতী। বয়েস সাড়ে পাঁচ। পেশা-ঘরকান্নার কাজে মাকে টুকিটাকি সাহায্য করা, আব্বু বাড়ী ফিরলে দরজা খুলে দেয়া, ছোট বোনটিকে যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে উপদেশ দান। ইস্কুলের পড়াশুনা এখনও ওর শুরু হয়নি, বাসায় প্রথম পাঠের অনেক দূর এগিয়ে গ্যাছে। বাংলাদেশের হাজার মেয়ের মত সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট্ট স্বাতী এখন যুদ্ধ করছে।

ওর বাবা ছিলেন অধ্যাপক। আর অধ্যাপক মানেই জল্লাদ ইয়াহিয়া বাহিনীর পয়লা নম্বরের শত্রু। ওদের চোখে শিক্ষা ও শিক্ষকতা মারাত্মক অপরাধ। মনুষের বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতি আণবিক বিস্ফোরকের চাইতেও মারাত্মক; ফলে কুচক্রী পাশব শক্তির ষড়যন্ত্রে ওদের ছোট্ট সংসারেও নাড়া পড়ল। সংসারের সাজানো বাগান পেছনে ফেলে ওদের এগিয়ে যেতে হলো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

প্রথম বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল একটি স্কুলের ছাত্রাবাসে। দিন দশেকের মধ্যে ওখন থেকে সরে যেতে হলো গ্রামের আরো অভ্যন্তরে, তারপর আরও ভেতরে যেখানে আদি অকৃত্রিম পা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর কোন যানবাহন চলে না। চিরকালের পরিবেশ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন করে নতুন এক পরিবেশে এসে দাঁড়াল ক্ষুদে পরিবারটি। হাতের সম্বল বলতে সামান্য কিছু টাকা-স্বাভাবিক অবস্থায় যাতে পনেরো থেকে বিশ দিন অব্দি চলে। এখন ঐ টাকায় অনির্দিষ্টকালে চালাতে হবে। প্রথম দিকে আলুভর্তা, ডাল আর দুবেলা ভাত বরাদ্দ রইল, কিন্তু ওতে মুখ ঘুরিয়ে রইল স্বাতী। বল্লো, আমি নাশতা খাবো। আমার বড়ো খিদে লাগে।

ওর মা এসে মাথায় বুলালেন, নাশতা এখন কোথায় পাব মামণি? এখন তো যুদ্ধ চলছে। সাবইকে তাই কষ্ট করতে হচ্ছে। আমরা যুদ্ধ করেছি? স্বাতীর মুখের রেখা পালটে গ্যালো সহসা। ওর চোখে-মুখে ঔজ্জ্বলতার ছোঁয়া লাগল। কণ্ঠ নামিয়ে বল্লো, ভূট্টো খুব পাঁজী, খুব শয়তান। আর শেখ মুজিব কতো ভাল, না আম্মু?

আম্মু মাথা নাড়লেন।

এরপর স্বাতীই সংসারের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলল। ওর আব্বুর পরনের একমাত্র লুঙ্গিটা ছিঁড়ে এসেছিল কিন্তু কেনা হচ্ছিল না। স্বাতীর মাও কবার বলেছেন আর একটা কিনে ফেলতে। কিন্তু পয়সার অভাব তখনকার জন্যে নিদারুণ সত্য। স্বাতী বল্লো, যুদ্ধ থামলে তোমাকে একটা ভালো লুঙ্গি কিনে দেব আব্বু।

এ কথার পর যথাশীঘ্র লুঙ্গি কেনার ব্যাপারে ওর মায়ের চাপ কার্যকরী হলো না। ওর বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্বাতীর ছোট বোনটির অনেকগুলো হবি। তার মধ্যে অন্যতম কান্না। কিছু একটা হাতের মুঠোয় পায়নি বলে হঠাৎ সেদিন কান্নায় প্লাবন বইয়ে দিল। বোনের রকম-সকম দেখে স্বাতী ভারি খাপ্পা। বোনকে রীতিমতো শাসাল সে, কতবার বলছি এখন যুদ্ধ হচ্ছে! খবরদার তুমি কান্নাকাটি করবে না। কাঁদলে মিলিটারি বুঝে ফেলবে আমরা এখানে আছি। আব্বুকে তখন ধরে নিয়ে যাবে।

তারপর আব্বুর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বল্লো! আব্বু! তুমি যে প্রফেসর তা কিন্তু কাউকে বলো না। তুমি যদি কিছু না বল, তাহলে তোমাকে কেউ চিনতেই পারবে না, আবার যুদ্ধ করে আমাদের জয় হলে তখন তুমি প্রফেসর বলবে।

ওদের বাসস্থানের তিন-চার মাইলের মধ্যেই গোলাগুলির শব্দ শোনা যেত। ততদিনে স্বাতী চিনে ফেলেছে কোনটি মেশিনগানের শব্দ আর কোনটা শেল। বেশী আর অনেকক্ষণ ধরে শব্দ হলে বুঝত পাকিস্তানীদের আওয়াজ, অন্যদিকে পাশাপাশি কম শব্দ হলেই বুঝতে পারতো বাঙালীদের গোলাগুলির শব্দ। সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী যুদ্ধের অনেক কথাই শিখে ফেলেছিল।

এইটা মেশিনগানের শব্দ, না আব্বু? দূরের শব্দ শুনে স্বাতী বলতো। কখনো ছোট বোনকে ধমকে দিয়ে বলতো, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। খালি বিস্কুট খেতে চাও। যুদ্ধের সময় কি বিস্কুট পাওয়া যায়।

কান্নাকাটি থামিয়ে ছোট বোনটি তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকাত ওর দিকে। আম্মু ও আব্বু দুজনেই তাকাতেন। তখন ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনার মুখর হতো স্বাতী ; আমাকে আর ছোট বোনকে দুটো শাড়ি কিনে দিয়ো যুদ্ধ থামলে। আমরা না একদিন পোলাও খাব তখন! তখন তো তুমি আবার মাইনে পাবে। আমাদের সাইকেলে চড়ে আবার বিকেলে বেড়াতে যাব। আচ্ছা আব্বু আমাদের অতসুন্দর বাড়িটা মিলিটারিরা নিয়ে গ্যাছে? তোমার বইগুলো ওরা নষ্ট করেছে? এসব কথা শুনে ওর আব্বুকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হতো, ছল ছল করতো ওর মায়ের চোখ। আশ্চর্য, এসব মোটেই বিষাদ-বেদনা জড়াতো না ওর কণ্ঠে। স্বাভাবিক সহজভাবে বলতো সব কথা। যুদ্ধক্ষেত্রের একজন সৈনিক যেমন জীবনের সকল অস্বাভাবিকতা দূর করে পৃথিবীর নির্মমতম সত্যটিকে হাতের মুঠোয় রাইফেল তুলে দাঁড়ায়, তেমনি ওদের ছোট্ট সংসারে বাস্তবের কঠিন সত্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য প্রেরণা যোগাত সে।

একদিন বিকেলে দিঘীর পাড়ে আব্বুর সাথে বসে ছিল স্বাতী। চুপচাপ বসে মেশিনগানের শব্দ শুনছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে , আব্বু! যুদ্ধ কেন হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর ওর আব্বুর অজানা-কি উত্তর হতে পারে এই অবোধ সরল শিশুর ক্ষুদ্র প্রশ্নটির? মানুষ মারার কারিগর ইয়াখান! আপনি কি পারবেন এ প্রশ্নের জবাব দিতে? বাংলাদেশের মানুষের উপর কেন যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন আপনি? কি স্বার্থ রক্ষা করলেন নিরীহ লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নির্বিচারে হত্যা করে? আপনি তো পাকিস্তানের অখণ্ডতা চেয়েছিলেন; সেনাবাহিনীর পশুত্ব লেলিয়ে রাষ্ট্রীয় সংহতিকে নিহত করল কে? ইতিহাসের পাতায় একদিন পাকিস্তানের প্রথম শত্রু ইয়াহিয়ার কলঙ্কিত নামে সিন্ধু-বেলুচিস্তানের মানুষও থুতু ছিটাবে। আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রবাদে রূপ লাভ করবে এই কথাটির : বিশ্বাসঘাতকতার অন্য নাম ইয়াহিয়া খান।

কিন্তু স্বাতীর কথায় আসি। দিঘীর কালো জলের দর্পণে মুখ রেখে স্বাতী বলেছিল : আমাদের পেলেন থাকলে বেশ হতো।

পেলেন দিয়ে কি হবে? অন্যমনস্ক আব্বু প্রশ্ন করেছিলেন।

শান্ত ধীর কণ্ঠে স্বাতী বলেছিল, তাহলে পেলেন বসে আমরা মেশিনগান দিয়ে ওদের মারতাম। আমাদের অনেক বন্দুক থাকলে মিলিটারীরা আমাদের সাথে পারত না।

হ্যাঁ মা-ওর আব্বু বলেছিলেন, আমদের হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলী হয়ে গ্যালো। অস্ত্র হাতে থাকলে তা হতো না।

স্বাতী কি বুঝেছিলে কে জানে! আব্বুর হাত ধরে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিল, ওরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারবে না।

ওর আব্বুকে উত্তর দিতে হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে এর উত্তর লিখেছে রাঙ্গামাটির প্রান্তরে। সত্যি, ওরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবে না। জল্লাদ বাহিনীর কয়েক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য ছাড়া আর কি আছে? হৃদয়হীন পাশব শক্তির উল্লাস ছাড়া ওদের অস্ত্রের আর কোন ভাষা নেই।

আর বাংলার মাটির দুর্বার ঘাঁটিতে 'প্রত্যেকে সৈনিক আজ, প্রত্যেকে সৈনিক'। ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে? আমাদের মুক্তিফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাড়ে পাঁচ বছরের স্বাতী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে। ওরা কি করে এ যুদ্ধে জিতবে?

স্বাতী কেবল একটি মেয়ের নাম নয়, এদেশের অগণিত শিশু মেয়েদের নাম- সে স্বাতী জাতির অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারার মতো সংগ্রামী জনতাকে পথ দেখায়, যে স্বাতী রাতের অন্তিমে আসন্ন সূর্যোদয়ের আহ্বান জানাতে ঘন অন্ধকারেও প্রাণের আলো জ্বেলে রাখে।

"কলিজার রক্তে ভেজা মুহূর্তেই সে মুক্তি মহিমা
আকাশ, তোমারে ভাঙ্গে সীমা!"

৩ জুলাই, ১৯৭১

দেশের শত্রু

ছেলেটির বয়স ষোল কিংবা সতেরো। মুখের আদলটি কিন্তু আরও কচি। দেখতে চৌকস। এস-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তীণ হয়েছিল দুটো লেটার নিয়ে। কলেজের ছাত্র ছিল ঢাকায়। মুক্তিফৌজের দফতরে এসে বলল, আমি গেরিলা যুদ্ধে নাম লেখাব।

তুমি এত দেরী করে এলে কেন? প্রাথমিক তদন্তকারী অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

কি করব? আব্বা দিচ্ছিলেন-না কিছুটা উষ্মা ও ক্ষোভ ছেলেটির কণ্ঠে।

তোমার বয়সী ছেলেরা অনেকেই বাবার মতামতের অপেক্ষা করেনি। তদন্তকারী অফিসার বল্লেন।

জানি, একটু বিরক্তির স্বর ছেলেটির কণ্ঠে। বলল, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রাখলে আপনি কি করবেন?

তাহলে কি করে এলে? এবারে কৌতুহলের স্বরে অফিসারের কণ্ঠে।

অনশন করে। তিনদিন যখন না খেয়ে রইলাম, তখন মা-কে দরজার তালা খুলে দিতে হলো। মা অবিশ্যি আব্বার ভয়ে কিছু বলতে পারেন নি, নইলে আটকে রাখার মতো মহিলা নন।

তোমার বাবাই বা আটকালেন কেন?

বাবার কথা বলবেন না, সে পরে বলব, আমি আবার একটু ভদ্র ছেলে ছিলাম কিনা, মুক্তিফৌজ যোগদান করব ভেবে বিদায় চাইতে গিয়েছিলাম।

অফিসার ভদ্রলোক অন্য প্রসঙ্গ তুল্লেন, বল্লেন-ঢাকার কি খবর বলো।

সবাই স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছে, ঐ যে ‘‘পরমপত্র’’ বলে অনুষ্ঠানটা-দারুণ পপুলার। আচ্ছা বলুন না ভদ্রলোক কি এই ক্যাম্পে থাকনে? আমি দেখব।

পাকিস্তানী বেতার লোকে শোনে না তাহলে?

শোনে মাঝে-মধ্যে, তবে স্বাধীন বাংলা না থাকলে ভারতীয় বেতারই শোনে বেশী। বিশেষ করে রাত সাড়ে দশটার সংবাদ পরিক্রমা।

ব্যাস! এবার বলো ঢাকার মুক্তিসেনার গেরিলারা কেমন কাজ করছে?

করছে বেশ ভাল, কয়েকটি তো ঘুঘু লোককে সাবাড় করে দিয়েছে। তবে টপ লীগার ফিগারগুলোর মাথায় মিলিটারী ছাতা ধরা কিনা, ঝড়-বৃষ্টি এখনও এদের গায়ে লাগেনি, দু’চারটে বাজ ফেলতে পারলে কাজ হবে।

এরপর ছেলেটাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করা হলো। ওর নাম মোরশেদ। ঢাকার এক অভিজাত এলাকায় ওদের বাড়ি। ওদের এলকায় একটি লিস্ট তৈরি করে মিলিটারিরা লোকজন ধরছে। বিশেষ করে কম বয়সী ছেলেদের । ওর জন্য অবশ্য বিশেষ ভয় ছিল না। ও বরাবরই একজন গুড বয়। বাংলাদেশের আন্দোলন সম্পর্কে ওর সচেতনতা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ২৫শে মার্চের পরের ঘটনা ওকে দারুণভাবে প্রভাবন্বিত করে। তারপরই মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাবে বলে ঠিক করেছে।

তদন্ত ও অন্যান্য কাজ শেষ হলে মোরশেদকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করে ট্রেনিং সেণ্টারে পাঠান হল। এতদিনে ওর সকল স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছে। সেই সফলতার ছাপ লাগল ওর চোখে -মুখে।

ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পের এক অফিসারের উপর ভার পড়েছিল একটি লিস্ট তৈরি করবার, তাতে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর সাহায্যকারী দালালদের নাম সংকলিত করে ওদের খতম করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দান ছিল অফিসারটির কাজ। দুজন বন্ধুকে নিয়ে মোরশেদ ঢাকা থেকে নবাগত বলে উনি ওর সাথে আলাপ করছিলেন।

আপনি কি শত্রুদের লিস্ট করেন? মোরশেদ এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করল।

কেন? অফিসারটি এহেন প্রশ্নের জন্য বোধ করি প্রস্তুত ছিলেন না।

আমি আপনাকে একটা নাম দেব। মোরশেদ বলল।

সবার কাছে সব সময়ে অবশ্য নাম নেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি শত্রুতার উপযুক্ত প্রমাণাদি পাওয়া যায়, তবেই তার নাম তালিকায় রাখা হয়।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যি একজন শত্রুর নাম আপনাকে বলতে পারি, মোরশেদ জানালো।

কিন্তু, সে তো সত্যিকার শত্রু না-ও হতে পারে। আসলে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি না বল্লে ঠিক বোঝা যায় না কে কোন ধরনের শত্রু। অনেকে ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্যও আমাদের কাছে একজনের নাম দিয়ে বসতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয়।

ব্যক্তিগত শত্রুহলেই দেশের শত্রুহবে এমন কি কথা আছে? দেশের শত্রুমানে দেশের শত্রুই।

কিন্তু সেটা তুমি কিভাবে বিচার করবে। এমন তো হতে পারে যে, তুমি যাকে শত্রুভাবছ, চরম মূল্য দেবার মতো শত্রুসে নয়।

আমি তাকে ভাল করেই চিনি। তিনি যে দেশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করেছেন, সে সম্পর্কেও কোনরকম সন্দেহ নেই। মোরশেদ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লো কথাগুলো। সব অভিযোগ খুলে বল্লো।

কি নাম তার বলো। অফিসারটি কাগজ-কলম নিলেন। বল্লেন, যাচাই করে অভিযোগ যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিতে হবে।

এবারে অকস্মাৎ ম্লান হয়ে উঠল মোরশেদের মুখ। চেখের সমস্ত উজ্জ্বল্য যেন নিভে গেলো, শীতল কণ্ঠস্বরে বল্লো-আমি একটা কথা বলতে চাই এ সম্পর্কে।

কি কথা?

ধরুন তাকে না মেরে বন্দী করে নিয়ে আসা যায় না?

সেসব আমরা দেখব। তোমার ভাবনায় কারণ নেই, তাকে যদি বন্দী করে রাখা যায় তো সবচেয়ে ভাল। বল্লাম তো! সে আমরা দেখব, অফিসারটি ওর চোখ-মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেই হঠাৎ ধমকে গেলেন, বল্লেন, লোকটির প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে মনে হয়; কিন্তু ওর কাজের বর্ণনা শুনে কিন্তু তার প্রতি কোন দুর্বলতা থাকার কথা নয়।

মোরশেদ চুপ করে রইল, কিছু বল্লো না।

কথা বলছো না কেন? অফিসার ভদ্রলোক সহানুভূতির সাথে জিজ্ঞেস করলেন।

উনি আমার আববা, মোরশেদ বল্লো। ওর দুচোখের পাতা ভিজে উঠছে।

না। মোরশেদের আববার নামটি শেষ পর্যন্ত শত্রুর তালিকায় উঠাতে পারেন নি অফিসার। ঐ তালিকায় নাম থাকার একটিমাত্র অর্থ, তা হচ্ছে মৃত্যু।

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে মোরশেদ এখন দিগ্বিজয়ের মতো একটির পর একটি দেশের শত্রুকে খতম করছে। ওর মতো একটি ছেলের শুধুমাত্র জনক হয়ে মোরশেদের বাবা তা জীবনের মূল্য পরিশোধ করেছেন। জনাব আফতাব আলী সাহব-ঐ হীরের টুকরো সন্তানের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করে নিজেকে আপনি সংশোধন করবেন না কি?

প্রতিনিধি কণ্ঠ*

১৯শে জুলাই, ১৯৭১

... টিক্কা-হামিদ, ভূট্টো-মওদুদী চক্র পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাপতি ইয়াহিয়াকে বলিলেন, ‘‘আলোচনার প্রয়োজন নাই, আলোচনা দ্বারা বাঙালীকে ঠাণ্ডা করা যাইবে না। সেনাবাহিনী প্রস্তুত, হুকুম পাইলেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাঙালী জাতিটাকে চিরদিনের জন্য হুকুমের গোলাম বানাইয়া দিতে পারি।’’ হুকুম মিলিয়া গেল। রাতের অন্ধকারে পরিকল্পনা মোতাবেক আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী নারী শিশু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ১০ লক্ষ বাঙালীকে খুন করিল। নগর, বন্দর, গ্রাম, জনপদ, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, কারখানা, পত্রিকা অফিস সবই এই কসাইরা অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধ্বংস করিতে লাগিল। ইহারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করিল। বাঙালী জাতি এই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জল্লাদদের হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া রুখিয়া দাড়াঁইল। বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কসাইদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কারণে ৬০ লক্ষ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইয়াহিয়ার নিয়মিত জল্লাদ বাহিনীতে যখন টান পড়িল, তখন পশ্চিম পাকিস্তান হইতে অনিয়মিত বাহিনী আমদানী করা হইল। বঙ্গশার্দুলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যদি বলা হয় ইয়াহিয়া-টিক্কার হানাদার বাহিনী খতম হইয়াছে, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা যাহারা অসীম সাহসী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছি তাহারা দেখিয়াছি বাংলার সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে কিভাবে এই হানাদার বাহিনী প্রাণ লইয়া দৌড়ায়। মার খাইতে খাইতে ইহারা এখন মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে আসিতে নারাজ। অপরপক্ষে এই পশুবাহিনী নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার চালাইয়া প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছে। এই প্রসঙ্গে দুই-একটি জেলার যুদ্ধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে চাই। তাহা হইতে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবেন প্রকৃত অবস্থা কি। একমাত্র নোয়াখালী জেলার শুভপুর, ছাগলনাইয়া, বান্ধুয়া, মুন্সিরহাট, পরশুরাম, রথি ইত্যাদি স্থানের সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর তিন হাজারের উপর সৈন্য নিহত হইয়াছে। গেরিলাদের আক্রমণে এই জিলার পেনাঘাটা, চন্দ্রগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মাদাসব্রীজের নিকট, বগাদিয়া , আলোরপাড়া, কাঠালিয়া, পারপাড়া, পাঠাননগড় ইত্যাদি স্থানে কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন, জে-সি-ও ইত্যাদি অফিসার সহ এক হাজারের উপর হানাদার বাহিনী নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যা নিহতের সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে। পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জিলার শত্রুর অবস্থা আরও শোচনীয়। কুমিল্লা হইতে ফেনী পর্যন্ত হাইওয়ে রাস্তার দুই পার্শ্বে মিয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথ দিঘী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শালদা নদী, কসবা, আখাউড়া, গঙ্গাসাগর ইত্যাদি রণাঙ্গন হানাদার বাহিনীর গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। মুক্তিবাহিনীর সাথে গ্রমবাসী একত্র হইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করিয়া দিয়াছে। গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নোয়াখালীর এক গ্রামবাসীর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করিতে চাই। তাহারা পিতা-পুত্র দুইজনে শত্রু যাতায়াতের রাস্তার পার্শ্বের জমিতে ইরি ধান কাটিতেছিল। এমন সময় মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়া শত্রুর সৈন্যসহ দুইখানা ট্রাক ধ্বংস হইয়া যায়। পরের দিন গ্রামবাসীরা তাদের নিকট ঘটনার বিষয় জানিতে জড়ো হয়। তখন বৃদ্ধ বলিতে থাকনে, ‘‘যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি, এইবার আল্লাহ তাহা দেখাইয়াছে। কামান-বন্দুকের কথা শুনিয়াছি কিন্তু গতকল্য যাহা দেখিয়াছি তাহা আল্লার গজব ছাড়া আর কিছু নহে। এই পাঞ্জাবী পশুরা নিরীহ গ্রামবাসী মা-বোনের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, শরিয়তবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। তাই আল্লাহতায়ালা এই গজবিয়াগো উরফে এক্কারে নারাজ অই গ্যাছে। নইলে কওচেন, হিগুন যাওন লাগছিল রাস্তার হরদি গাড়ী চালাইয়া, আচমবিৎ মাটির তলেত্তুন আওয়াজ করে কি একটা বারঅই হিগুনরে কিল্লাই ধ্বংস কল্লো! ইয়াত্তুন আঁর মনে অইচে ইগুনের উরফে আল্লার গজব নাজিল অইচে। আল্লা মজিবের উরফে রাজী অই গ্যাছে। মজিব এই যুদ্ধে জিতবো। নইলে আল্লার কিতাব মিইছা।’’......

(নূরুল হক, এম-এন-এ)

* জাতীয় সংসদ সদস্যদের বক্তৃতামালা থেকে সংকলিত।

৫ আগস্ট, ১৯৭১

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধ বর্তমানে পঞ্চম মাসে পদার্পণ করল। প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম এবং প্রতিকূলতার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ২২ বৎসর যাবৎ টিকে আছে। যুদ্ধ আমরা চাইনি, যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ চাইনি বলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পশ্চিম পাক সামরিক জান্ত ভেবেছিল আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে কিন্তু অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সামগ্রিক সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ওরা ভেবেছিল বাংলদেশের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল আছে তাদের কিছু কিছু বাঘা বাঘা নেতা নির্বাচনে জয়লাভ করবেই এবং সেই সমস্ত 'কুইস্লিং'দেরকে নিয়ে যে পরিষদ গঠিত হবে তাতে আওয়ামী লীগ খুব জোর হলে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে পরিষদে আসন গ্রহণ করবেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিগত নির্বাচনে সাড়া বাংলার সংগ্রামী মানুষ যেন এক হয়ে গেল এবং শতকরা ৯৮$\frac{১}{২}$ টি আসনে জয়লাভ করে অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। তার পরেই শুরু হলো নতুন খেল। সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ করে ফেরার পথে মন্তব্য করল যে "আমি পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে এসেছি।" এদিকে পূর্বেই আয়োজিত লারকানায় শিকারের বাহানায় ভুট্টোর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া ভুট্টোকে বলল যে, চিরাচরিত প্রথায় অর্থাৎ মন্ত্রিত্বের টোপ আমি দিয়ে এসেছি। ভুট্টো তুমি শক্ত হয়ে যাও। ভুট্টো তার চিরাচরিত প্রথায় আবোল-তাবোল বকা আরম্ভ করে দিল এবং তার ঔদ্ধত্য এতখানি বেড়ে গেলে যে, সে বলল- "পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।" অথচ সবাই জানেন যে, সিন্ধু প্রদেশ '৪৭ সালের পরে কোন সময়ই শাসনযন্ত্রের চাবিকাঠি হাতে পায় নি। পশ্চিম পাঞ্জাবের সামন্তপ্রভু এবং আমলাতন্ত্রের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে সিন্ধু প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার যোগান দিত। আমাদের তরফ থেকে আমরা জবাব দিলাম যে, স্মরণকালে ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের পূর্বে পশ্চিম পাঞ্জাব কোন সময়ই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ছিল না, বরং বৈদেশিক আক্রমণে বিদেশীদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালের কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, আলেকজাণ্ডার হতে আরম্ভ করে যত বিদেশী আক্রমণকারী ভরতবর্ষে স্বল্পকাল অবস্থান করেছেন তাদের অনেকেই নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আসেননি।

যাই হোক ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধুর যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি জনগণের কাছে আমার দলের ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচী দিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি। এ থেকে একচুল নড়া আমার পক্ষ সম্ভব নয়। ভুট্টো বলেছিল সে তার দলের নেতাদের সঙ্গে আলেচনা করে পরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুট্টোর ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আপনাদের সকলেই জানা আছে। যাই হোক সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেনাপতি ইয়াহিয়াকে তারযোগে জানিয়ে দিলেন যে, যদি ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হয় তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তহার পরে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে। এদিকে ভুট্টোর একগুঁয়েমির কারণে পহেলা মার্চ বেআইনী এবং অগণতান্ত্রিকভাবে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই মুলতবি ঘোষণা করে দিল। সারা বাংলাদেশ আন্দোলনে ফেটে পড়লো। শত শত ছাত্র-জনতা ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হলেন। সংগ্রামী ছাত্রলীগ ২রা মার্চ প্রদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করল এবং আওয়ামী লীগ

৫ই মার্চ প্রতবাদ দিবস ঘোষণা কর। বঙ্গবন্দু ৭ই মার্চ রমনার ঘোড়দৌড় মায়দানে আয়োজিত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসকি সমাবেশে ঘোষণা করলেন, ‘‘শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাজপথ দিযে আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।’’ তিনি ঘোষণা করলেন যে, অবিলম্বে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সৈন্যদেরকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ২রা মার্চ হতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে তাদের হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে- অন্যথায় আওয়ামী লীগ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে পারে না।

পরবর্তীকালে ১৫ই মার্চ থেকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ তার উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সকল শর্ত মেনে নিল এবং ২৪ কি ২৫শে মার্চের মধ্যে উহা ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু আসলে এই দীর্ঘসূত্রতা অতি সংগোপনে সামরিক প্রস্তুতির বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিওর ঘোষণা দূরে থাকুক আসলে ২৫ই মার্চ রাতে ট্যাঙ্ক, কামান, মেশিনগান নিয়ে হানাদার বাহিনী বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা এবং বিভিন্ন রেজিমেন্টে যে সমস্ত বাঙালী অফিসার ও নিয়মিত বাঙালী আছে তাদেরকে নিরস্ত্র করে হত্যা করা এবং ই-পি-আর ও পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দো। তাই তারা যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে নিয়মিত বাহিনীর বাঙালীদেরকে হত্যা করেছে এবং ই-পি-আর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের ই-পি-আর পুলিশ বাহিনীর উপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আমাদের বাঙালী ছেলেরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরেছে এবং দেশমাতৃকাকে হানাদারের কবলমুক্ত করার অগ্নিশপথে সারা বাংলার ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-জনতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। আজকে বাংলার প্রতিটি ঘর এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য মরিয়া হয়ে হানাদার বাহিনী নারী ও শিশু সমেত হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করে চলেছে। ইয়াহিয়া বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে যাঁরা আত্মাহূতি দিয়েছেন তাঁদের জন্য আমাদের মন ও প্রাণ শোকাপ্লুত এবং অভিভূত।...

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আজকে আপনারা সকলেই বিক্ষুব্ধ। বাংলার ঘরে এমন কোন পরিবার নেই যাদের কেউ না কেউ কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বঙ্গবন্ধুর নামে আজকে আপনাদেরকে ডাক দিযে যাই-বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার আপনার সকলের। মুক্তি বাহিনী আজ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং দিন দিন এর শক্তি বেড়েই যাবে, কমবে না। আপনারা ধৈর্য করুন। বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে আমরা উদ্বুদ্ধ। একটি বাঙালী বেঁচে থাকা পর্যন্ত হানাদারদের রেহাই নাই। বাঙলা মায়ের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব কায়েম আমরা করবোই। বাঙালী হিসাবে জন্মেছি, বাঙালী হিসাবে বাঁচবো, বাঙালী হিসাবে আমাদের জীবনতরী বেয়ে যাবো আর বাঙালী হিসাবেই মরবো- এই মন্ত্রই হোক আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

পরিশেষে আমি বলতে চাই-

‘‘আমাদের যাত্রা হলো শুরু
এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এবার বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক
ফিরবো নাকো আর
ওগো কর্ণধার।’’

আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। জয় বাংলা।

(মিজানুর রহমান, এম-এন-এ)

২১ আগস্ট, ১৯৭১

শেখ মুজিব আজ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়- শেখ মুজিব আজ বাংলার ইতিহাস। বাংলার ২৩ বছরের রাজনীতি তথা সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে তিনি এক হয়ে মিশে গিয়েছেন। শোষণ ও পীড়নের রাজনীতিতে শেখ মুজিব এক আশ্চর্য প্রতিবাদ। প্রতিবাদ তিনি করেছেন সমস্ত জীবন ধরে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। তিনি তাঁর পর্বতপ্রমাণ অটল সাহস ও মনোবল নিয়ে সবকিছু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এককভাবে বাংলার ইতিহাসে প্রতিবাদের মুর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আজ সেই শেখ মুজিব, যাঁকে বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাঙালী বঙ্গবন্ধু নামে আখ্যায়িত করেছিল এবং যিনি শুধু মুজিব ভাই বলে সবারই কাছে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিযে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং বিচারের নামে প্রহসন চলছে।

শেখ মুজবুর রহমান বাংলার সন্তান। বাংলাদেশে জন্মেছেন, বাংলাদেশে লালিত-পালিত, বাংলাদেশকে ভালবেসেছেন এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন। শুধু তাই নয় বাঙালীর স্বার্থে বাঙালীর মুক্তি কামনায় নিজের জীবনের সুখ-শান্তি চিরদিনের মত বিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই শেখ মুজিবকে বাংলাদেশে না রেখে সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোষক গোষ্ঠী সমস্ত রকমের আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়েও নিরীহ বাঙালীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে ১২০০ মাইল দূরে বন্দী করে রেখেছে। শুধু তাতেই তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করেনি। বাঙালীর কণ্ঠকে ও দাবীকে চিরকালের জন্য স্তব্ধ করার জন্য তাঁকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।...

এবারের এই বন্দীদশা তিনি অনায়াসে এড়াতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে, বিশ্বাস করতেন অহিংস আন্দোলনে। তিনি কোনদিন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি যে, বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস। তিনি কোনদিন চাননি নিরস্ত্র, নীরহ জনসাধারণের রক্তে বাংলাদেশ রাঙা হোক। আগরতলা কেস থেকে মুক্তি পেয়েই রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ‘‘আমি জনগণের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করব না, দেশের স্বাধীনতার জন্য দরকার হলে সবার আগে আমি রক্ত দেব’’। তিনি নিজের ঘোষণার সম্মান দিয়েছেন। আজ তিনি ধৃত। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে তিনি সবার আগে তাদের হাতে ধরা পড়েছেন।

আর আজ জল্লাদ ইয়াহিয়া বিচারের আসনে বসেছেন। কিন্তু কার বিচার কে করে? তাঁকে বিচারের অধিকার খুনী ইয়াহিয়ার নাই। শেখ মুজিব সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আশা-ভরসার স্থল, তাদের একচ্ছত্র নেতা। স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া তাঁকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিনন্দিত করতেও কসুর করেনি। আজ শেখ মুজবুর রহমান যদি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে ইয়াহিয়াকে তাঁরই হুকুমের তাঁবেদার হতে হতো। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শেখ মুজিবের বিচার তিনি করতে বসেছেন। যদি বিচার করতেই হয় তাহলে এত গোপনীয়তা কেন? কেন আজ স্থানের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে? কেন বিচারকদের নাম জনগণকে জানান হচ্ছে না? কেন বাইরের কৌঁসুলী আসবার অনুমতি দেয়া হয়নি? শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী বা দেশের শত্রু হন তাহলে সাধারণ কোর্টে এবং সবার সামনে বিচার করার মত সৎসাহস থাকা উচিত ছিল।...

আজ পৃথিবীর শান্তিকামী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের দাবী ও আবেদন তাঁর যেন শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ করতে জল্লাদ ইয়াহিয়াকে বাধ্য করেন। শেখ মুজিবুর রহমান কোন একটি বিশেষ দেশের মানুষ নন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতীক, তিনি নিপীড়ত জনগণের ত্রাণের প্রতীক। তাঁর জীবন রক্ষা

করার দাযিত্ব শুধু বাংলাদেশের লোকের নয়, তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের। শেখ মুজিবকে হত্যা মানেই গণতন্ত্রকে হত্যা করা- সত্য ও ন্যায়কে আবর্জনার আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়া।

বাংলাদেমর মা-বোনের তরফ থেকে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তাঁর মত মহান নেতার কোন ক্ষতি আমরা সহ্য করবো না। এবং তাদের এই বলেই সাবধান করে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানের কোন লোককেই ক্ষমা করবে না।...

(বদরুন্নেসা আহমেদ, এম-এন-এ কর্তৃক

'শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে' শিরোনামে লিখিত ভাষণ)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষের উপর যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন বাংলার শ্যমল প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে চললো, যখন বাংলার আকাশ নির্যাতিত মানুষ ও ধর্ষিতা মা-বোনদের আর্তণাদে বেদনাকরুণ, তখন পৃথিবীর মানুষের চোখে এক নিদারুণ বিস্ময় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিলো। পরম বিস্ময়ে মানুষ দেখেছিলো বিশ্ববিবেক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সরকার, যারা গণতন্ত্র এবং মানবতার নামে চীৎকারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ, তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের এই রক্তপ্লাবী ঘটনাকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে একটা ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টারও অন্ত ছিল না। এদের মনোভাব দেখে এই সময়ে মনে হয়েছিলো ব্যবসার মুনাফার বেদীমূলে তারা মানবতাকেও বলি দিতে কুণ্ঠিত নন। বাংলাদেশের ঘটনা যে পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয় নেই সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো "লাখো লাখো আদম সন্তানের লাশের তলায় পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। পাকিস্তান আজ মৃত। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে একটা নতুন জাতির জন্ম হয়েছে।" কিন্তু তার এই পরিষ্কার ঘোষণাটিও যেন তখন পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু দেখা গেল মানবতাকে রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মুক্ত মানুষের মন সোচ্চার হয়ে উঠলো বাংলার মানুষের সপক্ষে। ধিক্কার দিল তারা ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসক ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক চক্রকে। ব্যবসার মুনাফার গোলকধাঁধায় বাধা সরকার ছাড়া প্রতিটি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ইংল্যাণ্ডের লিবারেল দলের M.P মিঃ রাসেল জনস্টোন ৩১ মার্চে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বল্লেনঃ

"আমি বিশ্বাস করি না ইহাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া বৃটেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে। আমাদের চোখের সম্মুখে যে ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা চূড়ান্ত বর্বরতার নামান্তর মাত্র। শান্তি ফিরাইয়া আনা এবং মীমাংসার জন্য কমনওয়েলথের প্রধান সদস্য হিসাবে বৃটেনকে তাহার সমস্ত কিছুই করিতে হইবে।"

"Conflict in East Pakistan : Background & Prospect" শিরোনামে হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক- মি: এডওয়ার্ড মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান এবং স্টীফেন এ, মার্গলিন ১লা এপ্রিল তারিখে লিখলেনঃ

"স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম, বাংলাদেশ হবে একটি সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু প্রশ্ন হল এই স্বাধীনতার জন্য তাকে কত রক্ত ঢালতে হবে।"

History of Economics & Political Domination of East Pakistan পত্রিকায় Herbert বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপন সোসাইটি লিখলেন, "বাংগালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ লড়ছে।

এই যুদ্ধে তাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের কত প্রাণ দিতে হবে এবং তাদের কত সম্পদ ধ্বংস হবে।''

৯ই এপ্রিল নেপালের 'অর্পন' পত্রিকা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলো,"ইহা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় আজ শুধুমাত্র কল্পনা নয়, একটি বাস্তব সত্য।"

১৩ই এপ্রিল তুরস্কের পত্রিকা 'আকসাস' লিখলো, ''পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ছে।''

ইন্দোনেশিয়ার 'জাকার্তা' পত্রিকা ১৫ই এপ্রিল লিখলো, "পূর্ব পাকিস্তানীরা আর পাকিস্তানী নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছুক নয়। তারা বাঙালী- এই পরিচয়ই গ্রহণ করেছে। কারণ আজ 'পাকিস্তানী' শব্দ দ্বারা তারা মনে করে একদল সৈন্য, যারা তাদের লোকজনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।"

৩০শে মার্চ চিকাগো ট্রিবিউন লিখলো, "পৃথিবীর যে অংশটি একদিন ভিয়েতনামের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখর ছিল, সেই অংশে আজ শত-সহস্র লোককে মেশিনগানের গুলিতে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ভিয়েতনামে গত ৪ বছরে যত লোককে হত্যা করা হয়নি তার চেয়েও অধিক লোককে মাত্র ৪ দিনে হত্যা করা হয়েছে।''

৭ই এপ্রিল 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা লিখলো, ''পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা করছে, চাক্ষুষ দর্শীর এই বিবরণ সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং নিরবতা মানুষের কাছে নিশ্চয় পীড়াদায়ক। বাংলাদশের এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধ প্রতিবাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয় একটি মানবিক দায়িত্ব রয়েছে।

শুধুমাত্র এই কয়েকটি পত্রপত্রিকাই নয়, লণ্ডনের ডেইলি মেইল, ডেইলি টেলিগ্রাফ, New Statesman. Sunday Times. London- এর Time পত্রিকা, গার্ডিয়ান, Sunday Telegraph. Newsweek. Christian Monitor. Washington Post. Ockland Tribune. Bultimore Sun. Otowa Citizen. চিলির আলমারকিউরিও, ব্রসেলসের লা লিব্রা, জাপানের Time পত্রিকা, আরব রাষ্ট্র কুয়েতের আকবর-আল-কুয়েত, সিরিয়ার আল-তাউরা, রামিয়ার প্রাভদা, ইত্যাদি সমস্ত পত্রিকায় পৃথিবীর মানবতাকামী মানুষ ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেন, স্বাধীনতাকামী বাংলার মানুষকে জানালেন আন্তরিক সমর্থন।

হিমালয়ের ঘুম ভাঙলো। পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেবার বিরুদ্ধে আমেরিকার সিনেটে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন সিনেটর কেনিডি। শ্রমিকরা পাকিস্তানী জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করতে অস্বীকার করলেন। আমেরিকার বৈদেশিক সাহায্য কমিটি পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন।

বৃটেন, ফ্রান্স, পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য প্রদান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলো। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন গণহত্যার নিন্দা করে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য দাবী জানালেন।

এবার বাংলাদেশর সপক্ষে এগিয়ে এলো উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েতনাম। সংগ্রামী উত্তর ভিয়েতনাম ঘোষণা করলোঃ ''বাংলাদেশের যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ।'' বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে তারা পূর্ণ সমর্থন জানালেন- কিন্তু বিশ্বের দৃষ্টি নিবন্ধ রইল চীনের প্রতি। ইয়াহিয়া বারবার হ্রেষা ধ্বনি করছিলো, "চীন আমাদের সাথে"। চীনের কণ্ঠ নীরব। অবশেষে চীন মুখ খুললো ভুট্টোর চীন গমন উপলক্ষ ভোজসভায়। বিভ্রান্ত ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত হিসাবে মানবতার ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য অপরাধী ভুট্টো গিয়েছিলো চীনের সমর্থন আদায়ের জন্য।

ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো চক্র মনে করেছিলো চীন তাদের কুকর্মকে সমর্থন জানাবে, কিন্তু চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন প্রকৃতপক্ষ ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মুখে চপেটাঘাত করলেন। ভোজসভায় চীনের অস্থায়ী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোকে পরামর্শ দিলেন পূর্ব বাংলা সম্বন্ধে একটি যুক্তিসম্পন্ন মীমাংসা করতে। শুধু তাই নয়, চীন ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের সমস্ত প্রচারণার মুখে পদাঘাত করলেন।

১১ই নভেম্বর B.B.C.-র খবরে প্রকাশ, চীন পাকিস্তানকে সংযত হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। চীন বলেছে, "কোন অবস্থাতেই ভারত আক্রমণ করা পাকিস্তানের উচিত হবে না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার আকারে নিরাপত্তা পরিষদে তোলার আবেদন জানিয়েছিলো। চীন তার সেই আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছে।

চীনের এই কথার অর্থ এই দাঁড়ায়, চীন পাকিস্তান সরকারের কার্যাবলী সমর্থন করতে প্রস্তুত নয় এবং ইয়াহিয়ার রণহুঙ্কারকেও চীন অসার ও অযৌক্তিক মনে করে। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যাকে চীন পাক-ভারত সমস্যা হিসাবে দেখতে রাজী নয়।

এইদিকে মার্কিন সরকারও পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। এর ফলে আজ ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার সারা বিশ্ব অসহায় এতিমের পর্যায়ে নেমে এসেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলার মানুষের সপক্ষে। বাংলার দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছেন। তাদের ক্ষীপ্রতায় এবং প্রচণ্ডতায় হানাদার বর্বর পাক বাহিনী দিশেহারা।

সেদিনের স্বল্প অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিবাহিনী আজ বিশ্বের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং দুর্ধর্ষ অজেয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তারা প্রস্তুত হচ্ছে চরম আঘাত হানার জন্য, বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটিকেও নিশ্চিহ্ন করার জন্য। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।

(জিল্লুর রহমান, এম-এন-এ)

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিগত প্রায় আট মাসাধিককাল যাবৎ আমরা সবাই মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত আছি। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মুক্তিসংগ্রামে শরীক হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোরবানী দিয়েছে কোন না কোন ভাবে। মুক্তিযুদ্ধ ও সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধের পার্থক্য এই যে, সাম্রাজ্যবাদী বা সম্প্রসারণবাদী যুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে জোর করে যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়; বেতনভোগী (Mercenary) সৈন্যরা দায়ে পড়ে অথবা পদের লোভে বা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়- সুশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুসেনাকে খতম করার জন্য মাতৃভূমিকে শত্রুকবল হতে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে। আমাদের বাংলাদেশের বাহাদুর বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার ও মোজাহেদ বাহিনী, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার সংগ্রাম পরিষদের বাহাদুরেরা প্রথমে এরূপ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমরনায়ক ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের হানাদার দস্যুবাহিনীর বর্বর আক্রমণ রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের সর্বস্তরের নরনারী, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মজদুর তথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে পরবর্তীকালে এই চরম সংগ্রামে শরীক হয়েছে- কে সক্রিয়ভাবে, কেহ পরোক্ষভাবে, সক্ষম যুবকেরা অস্ত্রের মাধ্যমে এবং শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও কূটনীতিবিদ সাধ্যমত তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার মাধ্যমে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মুক্তিযুদ্ধ কারও একার কর্তব্য। অবশ্য যুগে যুগে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বেঈমান, সুবিধাবাদী, বা 'কুইসলিং' 'মীরজাফরদের' যেমন ভূমিকা ছিল, আমাদের এই সংগ্রামেও

মীরজাফরেরা তেমন নিষ্ক্রিয় নয়। দেশবন্ধু তাই একসময়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘‘পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় বেশী।’’ সোনার বাংলার লক্ষ লক্ষ নীরিহ ‘মাসুম’ নরনারী, শিশু, যুবক-যুবতীকে নির্বিচারে হত্যার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ নারীর শ্লীলতাহানি ও সতীত্ব নষ্ট করার অপরাধে, বাংলার কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা, লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির অপরাধে, প্রায় ৯৫ লক্ষ নরনারী-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার অপরাধে এবং অপর প্রায় ২ কোটি লোককে গৃহহারা-বাস্তুহারা এবং ছিন্নমূল করার অপরাধে, লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম ব্যক্তিকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা তথা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করার অপরাধে ইয়াহিয়া-টিক্কা-ভুট্টো-হামিদ যেমন অপরাধী- তেমনি এই জলল্লাদচক্রের ক্রীড়নক সহযোগী মাহমুদ আলী, ডাঃ মালিক, নূরুল আমীন গং এবং তাদের প্রত্যেকটি সক্রিয় সমর্থক ও তাঁবেদারগণও সমভাবে অপরাধী এবং সমভাবে শাস্তির যোগ্য। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধানানুসারে হত্যাকরী এবং তার সহযোগীকে একই আইনে ফাঁসি দেয়ার বিধান চালু আছে। সহযোগী বা নরহত্যাকারীর সহকারী সম্পর্কে আইনে বলা আছে, As if he himself Committed murder- অর্থাৎ, সহযোগী যেন নিজেই খুন করেছে। কাজেই ইয়াহিয়া চক্রের দালালদের সম্পর্কে এই চালু ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বন্ধুগণ, "Truth shall prevail" -এটা universal truth বা সার্বজনীন সত্য- অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই, আমাদের পবিত্র কোরানেও আছে-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًاه

অথাৎ ‘‘সত্য সমাগত- মিথ্যা অপসৃয়মাণ, এবং মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।’’

আমাদের এই আজাদীর সংগ্রাম মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম, জালেমের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বঞ্চিত মজলুমের সংগ্রাম। আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষা- ‘‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’’ এই যুদ্ধে ইনশাল্লাহ আমরা কামিয়াব হবই। আমাদের মনজিলে মকসুদে আমরা পৌঁছবই।

দুনিয়ার সমস্ত আজাদীর ইতিহাসে দেখা যায় স্বাধীনতা ‘‘অর্জন করা হয়েছে’’। স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক কোরবান হয়েছে, নানাভাবে আজাদী পাগল মানুষ নির্যাতন ভোগ করেছে- কিন্তু শির দিয়েছে তবু আমামা দেয়নি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে ফাঁসির রজ্জু বরমাল্যের মত কণ্ঠে বরণ করে আজাদীর জয়গান গেয়েছে, তবুও জাতির স্বাধীন সত্তাকে বিলিয়ে দেয়নি- স্বাধীন পতাকাকে অপমানিত হতে দেয়নি। ইতহাসে মহাচীন, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে স্বীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কেহই স্বাধীনতা দান হিসাবে বিনা রক্তপাতে পায়নি। অবশ্য ওদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা পেয়েছে সভ্য জাতির নিকট হতে, সক্রিয় বা পরোক্ষ সমর্থন পেয়েছে। আমরাও আশা রাখি, দুনিয়ার সমস্ত সভ্য দেশ হতে সাহায্য সমর্থন পাবো। পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে অনেকের হয়ত ভ্রান্ত ধারণা যে, মেহেরবানী করে বৃটিশ সরকার আমাদিগকে স্বাধীনতা দান করে গিয়েছেন। বাস্তবপক্ষে কি তাই? ১৮৫৭ ইং সনের সিপাহী বিদ্রোহ, ক্ষুদিরাম, ভগৎসিং এবং হাজার হাজার সিপাহীর ফাঁসির কি কোন দাম নেই? তোজী সুভাষ বসুর পরিচালনায় বার্লিন, সিঙ্গাপুর, মালয়, বর্মা ও বিভিন্ন স্থানে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করা হয়েছিল, তা কি কম চাঞ্চল্যকর? মনিপুর ও ইম্পল অপরেশনে যে প্রায় ছয় হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ (INDIAN NATIONAL ARMY) অনাহারে-অর্ধাহারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষ তথা ব্রিটিশ আর্মির হাতে যে বিভিন্নভাবে প্রায় ২০ হাজার আজাদ হিন্দু ফৌজ বন্দী হয়েছিল, নির্যাতন ভোগ করেছিল বা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তা কি এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি? বর্মা, রেঙ্গুন, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, জাপান ও অন্যান্য স্থানের লক্ষ লক্ষ ভারতীয় (তদানীন্তন) নাগরিকগণ কেহ কেহ তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও কোটি কোটি টাকা এবং কেহ কেহ

মোট সম্পদের একটা অংশ INA ফৌজকে দান করেছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির Kin's Commission, প্রাপ্ত Major G.S. Dillon, শাহনাওয়াজের মত শত শত কমিশণ্ড অফিসার এবং হাজার হাজার জোয়ান ব্রিটিশ সরকারের চাকরি ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্রোতে নিজদেরকে নিক্ষেপ করে আজাদ হিন্দু ফৌজে যোগ দিয়েছিল। ICS পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেও নেতাজী সুভাষ বসু যে চাকরি ত্যাগ করেছিলেন, তা কি বৃথা গিয়েছে? বস্তুতঃ এই সব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ উপমহাদেশের আজাদী লাভকে ত্বরান্বিত করেছিল।

আমার প্রিয় ধর্মভীরু দেশবাসীকে বলা প্রয়োজন যে, মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। এবং এটাকে অপমৃত্যু বলা চলেনা। অবশ্য পাকিস্তানের জন্মটাকে কিছুটা অস্বাভাবিক বলা চলে। কাজেই এর প্রতি আর কারও কোন মোহ থাকা উচিত নহে? পাকিস্তানরূপী যে শিশুকে তিওয়ানা-নসরুলা কোম্পানীর আকবার-আহরার পার্টি তথা পশ্চিম সামন্তবাদ চক্র জন্ম দিতেই চায়নি, তারাই পরবর্তীকালে স্বীয় বুর্জোয়া স্বার্থে সে শিশুর দাবীদার সেজে প্রকৃত জন্মদাতা তথ্য নিরীহ ধর্মভীরু বাঙালীকে বিগত ২৪ বৎসর ধরে নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন করেছে। ইসলাম, সংহতি ও মুসলমানের নামে বহু অনৈসলামিক কারবার বেঈমানী ও ধোঁকাবাজি করেছে। ব্যবসায়ী স্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা ভাই বলে মুখে প্রচার করেছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষকে কোনদিন তারা হৃদয়ে স্থান দেয়নি। লক্ষ লক্ষ বাঙালী বন্যায়-জলোচ্ছ্বাসে-ঘূর্ণিঝড়ে শিয়াল-কুকুরের মত প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা শোষকচক্র, কখনও শোষণের যাঁতাকল বন্ধ করেনি। ১৯৬৪ সনে যখন পূর্ববাংলার এক মহকুমায়ই ১৮ হাজার লোক একরাত্রে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারিয়েছিল তখন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সফর করতে পূর্ববঙ্গে না এসে লণ্ডনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। লণ্ডনের পত্রপত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিলঃ 18 thousand people died, who cares? অর্থাৎ বিগত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালীতেই যখন প্রায় ১০ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারা নরবারীর অগণিত মৃতদেহ পদ্মা-মেঘনা-যমুনাতে এমনকি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে পর্যন্ত ভেসে ভেসে যাচ্ছিল- তখন আমাদের গরীবের ট্যাক্সের টাকায় কেনা Gunboat, Helicopter কোথায় ছিল? তদানীন্তন গভর্নর এডমিরাল আহসান বলেছিলেন, “আমি Islamabad-এর কাছে Helicopter চেয়েছিলাম- কিন্তু পাইনি।” সেই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগ। লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। ভারতসহ দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্র হতে সাহায্য-সম্ভার এসেছিল, হেলিকপ্টার এসেছিল। তখনও পিণ্ডি-ইসলামাবাদশাহীর হৃদয় বিগলিত হয়নি। শত শত নর-নারীকে, স্ত্রী ও পুরষকে একসাথে কবরস্থ করা হয়েছিল। এমনকি হিন্দু-মুসলমানকে একসাথে এক গোরে দাফন করা হয়েছিল-কারণ দাফনের কাপড়েরও অনটন হয়েছিল। Gunboat ছিল না, অর্থ ছিল না। এক ফোঁটা পানি, এক মুঠো অন্ন ও লজ্জা নিবারণে এক টুকরো কাপড়ের জন্য লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের করুণ আর্তনাদে সারা দুনিয়া বিগলিত হয়েছিল, সাহায্য-সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছিল কিন্তু বিগলিত হয়নি আদমজী, ভালিকা, আমীর আলী, ফেন্সী, দাউদ ও গান্ধারা গোষ্ঠীর তথা পশ্চিমা ২২-পরিবারের হৃদয়। এর পরও আপনারা এদের ইসলামী দরদের ধোঁকামিতে বিশ্বাস করেন? এদের ইসলাম শোষণের যন্ত্রবিশেষ। আসলে এরা ইসলাম মানে না। ১৪ শত বৎসর পর্যন্ত প্রতি জুম্মাতে, ঈদে আপনারা খোতবায় শোনেন-

إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسَانِ

-আল্লাহ ‘আদাল’ ও এহছানের কথা তথ্য ন্যায়বিচার ও ইনছাফের কথা, মঙ্গলের কথা বলেছেন; আর এই লুটেরা দস্যুদের পাক কোরানের এই নির্দেশ অমান্য করে যুগ যুগ ধরে বেইনসাফ ও বেঈমানী করেছে। ভাইসব, দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রই শুধু ধর্মীয় বন্ধনের নামে বা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জোর করে অবাস্তব ও অসম্ভবকে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। তাই বহুদিন জোড়াতালি দেওয়ার পর নকল পাকিস্তানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আর যদি কেহ মনে করেন পাকিস্তানের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তজ্জন্যও বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ বা পূর্ববঙ্গবাসী দায়ী নহে।

বঙ্গবন্ধু শেখ পর্যন্ত Artificial Heart Transplantation করে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে পকিস্তানের জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ২৫শে মার্চের গভীর রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া-টিক্কাখান-ভুট্টো চক্র বেয়নেটের খোঁচায় পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। এর জন্য এককভাবে তারাই দায়ী। তারপর ১০ লক্ষাধিক বাঙালী নরনারী-শিশু-যুবক-যুবতীর-মা-ভাই-ভগ্নির তাজা রক্তস্রোতের অতল তলে পাকিস্তান নিমজ্জিত হয়েছে-ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর প্রাণরক্ষা আর সম্ভব নহে। ইসলাম Universal -আল্লাহ সবার। আমরা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'- অর্থাৎ 'সব প্রশংসা তাহার জন্য যিনি বিশ্বব্রক্ষাণ্ড সৃষ্টি করেছেন'....

মোট কথা, ইসলাম Co-existence, Co-havitation ও Compromise-এর ধর্ম। এক কথায় ইসলামের মর্মকথা Secularism-এর মর্মকথা। কাজেই আমরা স্বাধীন বাংলদেশ গড়ে তুলবো এমন এক সমাজব্যবস্থা যা হবে সার্বজনীন- Universal and Secular-যাতে থাকবে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার। থাকবে না মানুষে মানুষে কোন বিবাদ-বিচ্ছেদ, কোন ভেদাভেদ। আর আমাদের এই মহান মূলমন্ত্রের হোতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী তথা দুনিয়ার সমস্ত মজলুম বঞ্চিত মানবতার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাগ্যের পরিহাস, তিনি আজ জোনরেল ইয়াহিয়ার কারাগারে আটক, আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী সাবধান করে দিতে চাই- বঙ্গবন্ধুর কোন ক্ষতি সাধিত হলে সমগ্র বিশ্ব দাবানলের অগ্নির মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এখনও সময় আছে জেনারেল ইয়াহিয়া, তাকে এখনও মুক্তি দাও-নচেৎ শুধু তোমার পাকিস্তান নয় অচিরেই তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে। জয় বাংলা।

(আবদুল মালেক উকিল,এম-এন-এ)

অভিজ্ঞতার আলোকে

২৪ জুলাই, ১৯৭১

বাংলার মুক্তি আন্দোলনের যারা রক্ত দিয়েছেন, যারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রায়কে উপেক্ষা করে, গণতন্ত্রের সমস্ত নীতি পদদলিত করে এবং মানবতার সমস্ত শিক্ষাকে মথিত স্বৈরাচারী বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরপরাধ নিরস্ত্র বাঙালী জনতার উপর ২৫শে মার্চের রাতে। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রবেশ করার পূর্বেই প্রচারিত হয়ে গেল এ খবর, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপের ঘটনা। কিন্তু বাংলার মানুষ এবার মরণজয়ী। সামনিক বাহিনীর কামান, ট্যাংক, মর্টার, বিমান ও আরও হাজার ধরনের উন্নত মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল তারা। বিপুল বিক্রমে বিশ্বাসঘাতক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল EPR, পুলিশ বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর। এ খবরও প্রচারিত হল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিশাবসানের পূর্বেই। সচেতন জনতা বুঝতে পারলো মুক্তি তাদের সোজা পথে আসবে না। স্বাধীনতা তো ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা আদায় করে নিতে হয়। এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় রক্তের। জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো বঙ্গবন্ধুর বাণী ''রক্ত যখন দিতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'' বাংলার বীর জনগণ রুদ্ররোষে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কৃষক, মজুর, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী ও জনতা অস্ত্র হাতে তুলে নিল। কোটি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল রক্তের বিনিময়ে বাংলার মুক্তি আদায় করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা, পরাধীনতার গ্লানির অবসান করার দীপ্ত প্রতিজ্ঞা।

এ ধ্বনি আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে আঘাত করলো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর সে ঢেউ এসে সাড়া জাগালো হজরত শাহ মখদুম শাহদ্দৌলার পদস্পর্শে পবিত্র শাহজাদপুরসহ পাবনা জেলার বেড়া, সাঁথিয়া, উল্লাপাড়া, ফরিদপুরসহ আরও অসংখ্য গ্রামে। প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলো সবাই। মুক্তিবাহিনী গঠিত হল মহল্লায় মহল্লায়। মা-বোনেরা এবং অশীতিপর বৃদ্ধও এসে দাঁড়ালো মুক্তিবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সবার মুখেই একই মন্ত্র ‘‘জয় স্বাধীন বাংলা’’। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলে শত্রু বাহিনীর আগমনের- মোকাবেলা করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে। কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে দা এবং কারও হাতে মজবুত লাঠি। বাইরে থেকেও মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা এলো। বিভিন্ন জায়াগয় ছাউনি ফেলা হল। শেরপুর থেকে নগরবাড়িঘাট পর্যন্ত ঐ রকম ছাউনি পড়লো পাঁচ-ছয়টা। এ পর্যন্ত ছাউনিতে বাংলার মুক্তিসেনাদের হাতে সাধারণত বন্দুক, রাইফেল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানী বাহিনীর কাছ থেকে নেওয়া কিছু উন্নত ধরনের অস্ত্র থাকতো। সোনার বাংলার সোনা মুক্তিযোদ্ধাদের জনতা আপন করে নিল। নিষ্পেষিত, অধিকারবঞ্চিত জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখতে পেল স্বাধীন বাংলার প্রতিচ্ছবি। একটি ঘটনা বলি। একদিন দুপুরের দিকে খেয়া নৌকায় পার হচ্ছি। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন যুবক। নৌকারোহীরা মুক্তিসংগ্রামে মোমেনের ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ উঠে এলেন আমাদের কাছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার মাথায় হাত রেখে বললেন, ‘‘তোমরাই তো বাবা অবহেলিত, লাঞ্ছিত বাংলার চোখের মণি। তোমাদের রক্তের বিনিময়ে আমার মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হবে। আমি মুক্ত বাংলায় মরতে পারবো। আমাদের পরবর্তী পুরুষকে আর পরাধীনতার গ্রানি সহ্য করতে হবে না। কি গৌরব এ ত্যাগের! জয় তোমদের হবেই বাবা, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের হবেই। এ যুদ্ধ তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। দুর্ভাগ্য, অনেক বয়েস হয়েছে আমার। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা এখন আর নেই। কিন্তু তবুও যদি আমাদের মত নিরস্ত্র হয়ে সামনে আসতো শত্রু; তবে এ বয়সেও একবার দেখিয়ে দিতাম বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি।” ভাবছিলাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এই আর্শীবাদের উপর শ্রদ্ধা রেখে, মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো অসংখ্য রণাঙ্গনে বাংলার রত্নরা সদাসচেতন প্রহরী হয়ে রয়েছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য। চিন্তা করার আর সময় হয়নি। বৃদ্ধকে মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনও করা হয়নি। হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলাম মারণাস্ত্রের বিকট আওয়াজ। খুব কাছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে খেয়াল হল অদূরে পাইকারহাটির ডাববাগানে মুক্তিবাহিনীর ছাউনির কথা-আমাদের বাহিনীর ৬০ জন মুক্তিসেনার কথা। তখন বেলা প্রায় দুটো।। পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যরা ১৪ খানা ট্রাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে কাশিনাথপুর থেকে আসছিল বাঘাবাড়িঘাট অভিমুখে। মাঝপথে ডাববাগানে। ট্রীগারে হাত রেখে মুক্তি বাহিনীর জোয়নরা প্রস্তুত। শত্রুসেনাদের ট্রাকগুলো ওদের আওতায় এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো মুক্তিসেনাদের রাইফেল আর ব্রেনগানগুলি। শত্রুবাহিনীর পাঁচখানা সৈন্যবাহী ট্রাক অকেজো হয়ে গেল গুলির আঘাতে। প্রাণ দিল ৫০/৬০ জন পাকিস্তানী সৈন্য। এ যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর একজন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল- EPR- এর লোক। অদ্ভূত শরীর। তার গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল ৫/৬টা বুলেট। অচেতন অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হল ফ্রন্ট থেকে। ডাক্তারগণ তাকে ঔষধ দিচ্ছেন- অপারেশন করে তার শরীর থেকে শত্রুবাহিনীর বুলেট বের করছেনর। বাঁচার আশা খুবই কম। আমরা সেবা করছি কায়মনোবাক্যে। ও চোখ মেলে চাইলো। জিজ্ঞেস করলেও মুক্তিসেনাদের কুশল, অগ্রগামী অবস্থানের পরিস্থিতি। মুমূর্ষ অবস্থায়ও ওর চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। করুণাময় আল্লাহতায়ালার অসীম কৃপায় ও বেঁচে আছে। মনে হয় বাংলার কোন প্রান্তে আবার সে অস্ত্র তুলে নিয়েছে শত্রুসেনাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে। খোদার অসীম রহমত আছে ওর উপর, কারণ ও তো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। পরে পাকিস্তানী বাহিনীর কামান আর মর্টারের আঘাতে ডাববাগান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ধ্বংস হয়েছিল পাশ্ববর্তী গ্রামগুলো। মুক্তিযোদ্ধারা তবুও নির্ভয়। তারা আবার ঘাঁটি গড়ালো ঘ্যাটনা ব্রীজের তলায়। পণ করলো, পাকস্তানী বাহিনীকে কিছুতেই সিরাজগঞ্জের দিকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না কয়েকদিন পর শত্রুসেনারা ট্রেনে সৈন্য বোঝাই করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে সিরাজগঞ্জের দিকে। কিন্তু মুক্তিসেনারা ঘ্যাটনা ব্রীজের কাছে রেলের ফিস-প্লেট তুলে রেখেছে। ট্রেন থেমে গিয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্রেন

থেকে নেমেছে মেরামত করার জন্য। এ সময়ের জন্যই ওৎ পেতে বসে ছিল মুক্তিসেনারা-সংখ্যায় মাত্র ১০ জন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো তাদের রাইফেল। ভূলুণ্ঠিত হল আক্রমণকারী পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর ১৫/১৬ জন সৈন্য। শত্রুসেনারা মেশিনগান, মর্টার আর রকেট ব্যবহার করেও মাত্র ১০ জন মুক্তিকামী বাঙালীর সামনে দিয়ে সেদিন ঘ্যাটনা ব্রীজ অতিক্রম করতে পারেনি। নরপিশাচ পাকিস্তানী সৈন্যরা তখন ফিরে উল্লাপাড়া গ্রামে চলে যায়। নিরপরাধ জনগণের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়, হত্যা করে নিরস্ত্র লোকজনকে। আশ্চর্য পৌরুষ পাকিস্তানী সৈন্যদের। মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে নিরস্ত্র মানুষ মারার অদ্ভুত মনোবল! আরও আশ্চর্য ইসলামপ্রীতি এহিয়া খানের! ইসলাম কি কোথায়ও নিরস্ত্র, নিরপরাধ লোককে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে? অনুমতি দিয়েছে কি অসংখ্য নিরপরাধ লোকের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার, খাদ্যশস্য নষ্ট করার? মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার?

জানি, এহিয়া খান এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে-পারবে না। কিন্তু যত অত্যাচারই করুক না কেন বাংলার জনগণ এবার এদের উৎখাত করবেই। একজন বাঙালী জীবিত থাকলেও সে পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। বাংলাকে মুক্ত করবে। আমরা পশুর-মত বাঁচতে পারি না। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদের আমরা ক্ষমা করতে পারি না। তাইতো সেদিন বাংলার সোনা ফলানো মাঠের মধ্য দিয়ে আসবার সময় কয়েকজন কৃষক আমার কাছে এসেছিল। ওরা বলছিলো, ''তিন গাঁয়ের লোক সভা করে ঠিক করেছে-যদি গায়ে মিলিটারী আসে তবে লাঠি, দা আর বর্শা নিয়েই তাদের খতম করব। গায়ের একটা পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে একটা মিলিটারী ঢুকতে পারবে না। পুরুষ লোক বেঁচে থাকতে গায়ের মেয়েদের উপর মিলিটারী এত অত্যাচার করবে তা হতে দেওয়া হবে না।'' ওরা জানে ওদের লাঠি আর বর্শা মিলিটারীর মারণাস্ত্রের তুলনায় কত নগণ্য। কিন্তু কি অদ্ভুত প্রত্যয়! এহিয়া খান, তুমি এদের পরাভূত করতে পারবে কি?

(এই কথিকাটির লেখকের নাম জানা যায়নি)

২৭ জুলাই, ১৯৭১

অসম সাহসীর অধিকারী মুক্তিবাহিনীর হাতে নরপশুরা মার খেয়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, আর অনেকে হাসপাতালে পা-হাত হারিয়ে কাতরাচ্ছে। তাদের বন্ধুরা সেসব দেখেশুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে যেসব বংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় 'ছেড়ে দে মা পালিয়ে বাঁচি' এই পুরাতন কথাটি ওরা জেনে ফেলেছে। কারণ, পশ্চিম পাঞ্জাবী কুকুরদের সঙ্গে বালুচ ও পাঠান সৈন্যদের তীব্র মতদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পশ্চিম পাঞ্জাবী অধিনায়ক অনেক জায়গায় বালুচ ও পাঠান সৈন্যাদের নিরীহ নিষ্পাপ গ্রামবাসীদের উপর গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিলে এই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে সৈন্যদের মধ্য হতে একটা বিরাটসংখ্যক অংশ বাঙালীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী নয়, এ দৃষ্টান্ত কয়েকটা ঘটনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিছুসংখ্যক পাঠান সৈন্য মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিফৌজে যোগদানেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অনেকে নিজের পায়ে নিজেরা গুলি করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তারা জানে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে

লড়াই করে এ পৃথিবী হতে চিরবিদায় না নিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে থাকা অনেক ভাল। তবুও আশা থাকবে ভাল হয়ে মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র পরিজনের সঙ্গে দেখা করার।

স্পষ্টতই পাক বাহিনী ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এমনকি সেদিন পাক পশুদের একটা চলন্ত গাড়ির সামনে একটি বোমা ফুটলে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার সমেত অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে সকলেই নেমে পালাতে আরম্ভ করে। তখনই মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন ও জনগণ গিয়ে গুলি না করে ছুরি দিয়ে পাক পশুদের কতল করে ফেলে। এই চার মাসের যুদ্ধে পাক পশুরা সেখানে যেভাবে নতুন নতুন কলাকৌশল করে প্রস্তুত নিয়েছে, পরক্ষণেই মুক্তিবাহিনী চারদিকে থেকে আক্রমণ করলে আস্তানাতেই চিরতরে মৃত্যুর কালো অন্ধকারে লুটিয়ে পড়েছে। এসব দেখেশুনে পাক পশুরা বাঙালীদের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে রাজী নয়। তাছাড়া বেশ কিছুদিন হতে পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত লোক বাংলাদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও এক নম্বর লাইসেন্স নিয়ে কণ্ট্রাকটরি করত এবং বড় বড় চাকরিজীবী হয়ে বাংলার মাটিতে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরি করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করত, তাদের অনেকেই এদেশ থেকে চলে গেছে। খুলনা পোর্ট হতে জাহাজ ভর্তি হয়েছে তাদের মালপত্র-জীপ, ট্যাক্সি, খাট, আলমিরা, আসবাবপত্র ও এমন কি যাত্রীবাহী বড় বড় বাস পর্যন্ত। এইসব মালপত্র নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। বাংলাদেশে কার্যরত সব লোকই খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে এদেশে তাদের থাকা চলবে না। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। বেশ কিছুদিন আগে পশ্চিম পাকিস্তানী পশুদের মেজর খান আলতাফ হোসেনের ভাই, যিনি একজন সি এ্যাণ্ড বি'র প্রথম শ্রেণীর কণ্ট্রাকটর, তিনি বক্তব্যগুলি তার আর এক বাঙালী প্রথম শ্রেণীর কণ্ট্রাকটর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে পেশ করে বলেন, ''রহমান সাহেব, এদেশে আমরা থাকতে পারব না। ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু শুনলাম। যে কটা টাকা-পয়সা আছে তা নিয়ে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। আর আমার যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে, তা আপনাকে দিয়ে চলে যাব। আপনাদের দেশ মুক্ত হবার পর বেঁচে থাকলে পরে দেখা হবে।'' এমন কি খুব গোপনভাবে তিনি বলে গেলেন, 'তার ভাই যশোর ক্যান্টনমেন্টে রয়েছেন কিন্তু খুলনায় থাকা বেশী নিরাপদ নয় মনে করে চলে আসতে চান- কখন কোন সময় কি হয় তার ভয়ে।' এখন বুঝতেই পারা যাচ্ছে তাদের মনোবলের মিটার কত নীচুতে নেমে গেছে। অথচ টিক্কা এত ধাক্কা খাওয়ার পরও চিন্তা করতে পারে না কি গতি হবে তার। আর জঙ্গী এহিয়া ইসলাবাদের স্বপ্নপুরীতে থেকে মুক্তিবাহিনীর মার কি রকম কি করে বুঝিতে পারবে? যে স্বপ্নপুরী একদিন ওর বাপ বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্ত চুষে অর্থ নিয়ে গড়ে তুলেছিল, সেখানে শুধু লালপানির শ্রাদ্ধ করা হয়। আর এদিকে তার দালাল ভাইস অ্যাডমিরাল মোজাফফর হাসান ঐ বর্বর কুকুরদের আস্তানায় আস্তনায় সাহস যোগাতে বেরিয়ে পড়েছে। হলে কিজ হবে, ফলে যে হচ্ছে তার উল্টো। মুক্তিবাহিনীর হাতে ওরা দিনের পর দিন মার খেয়ে হয়েছে দিশেহারা।

ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে একটা কথা বলতে; মুক্তিবাহিনীর হাতে এত মার খাওয়ার পরেও ইয়াহিয়া আজও ভারতকে দোষারোপ করছে। লজ্জাহীনকে শিক্ষা দিতে হলে কিছুটা নির্লজ্জ না হয়ে পারা যায় না। এখন পর্যন্ত তো বাংলার মুক্তিবাহিনীকে স্বীকার করা হল না, অথচ মুক্তিবাহিনী বাংলার মাটিতে থেকে আজ হতে প্রায় চার মাস ধরে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে, তবুও তারা ভারতের দুষ্কৃতকারী। যদি তাই-ই হয় তাহলে ইয়াহিয়ার প্রিয় দালাল ও পাক সেনাদের জিজ্ঞাসা করলেই তো সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে। কারা তারা, যাদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে? দালালেরা কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ পাবার আশায় তো রাজাকার বাহিনী করেছে। আর এই রাজকার বাহিনীতে যতসব চোর, বাটপার, বদমাইশ ও ডাকাতদের নেয়া হয়েছে- যারা সমাজের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং যাদের সমাজে কোন ঠাঁই নেই। এদে রমধ্যে অবশ্য অনেকে জেল-হাজতে ছিল। এই সমস্ত লোকেরাই পাক পশুদের লুটতরাজ ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তাদের নাম ইতিমধ্যে মুক্তিবাহিনীর কাছে ধরা পড়েছে। আসলে মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে জীবন রক্ষার্থে রাজকারের খাতায় নাম লিখেছে। অথচ দেখা গেছে, পাক বাহিনী এদেরকে ভালোভাবে বিশ্বাসও করে না। ঐ রাজাকারেরা

এখন শুধুমাত্র মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামের কতগুলি দালালের দেহরক্ষী হিসাবে রাইফেল ঘাড়ে করে চলে, কোন সময় মুক্তিবাহিনীর সম্মুখীন হলেই অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে আবার ইয়াহিয়া ডিফেন্স সার্টিফিকেট, সেভিংস সার্টিফিকেট ও প্রাইজবণ্ড কেনার কতই না আহ্বান জানাচ্ছে: কিন্তু বিশ্বসঘাতক এহিয়া জানো যে অন্ধ তার লাঠি একবারই হারায়। যে ভুল বাঙালী একবার করেছে, তার পুনরাবৃত্তি আর করতে পায় না। কারণ তারা জানে এসব টাকা-পয়সা কোন দিনই আর ফিরে পাওয়া যাবে না । বাঙালীদের জানতে বাকি নাই যে, এগুলোর হেড অফিস ঐ দালালদের দেশে। সে জন্যই ব্যাঙ্ক-বীমার টাকা জমা দেয়া ও প্রিমিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ার দিতে গেল কোন দিনও আর সে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। অবশ্য বাংলদেশ মুক্ত হবার পর বাংলাদেশ সরকার এর একটা ব্যবস্থা করবে। আমরা পশ্চিম পকিস্তানী দালালদের কোন মালপত্র খরিদ করবো না। কোন কাপড়-চোপড় আমরা না কিনলে ওদের গুদামে সব জমা হয়ে হয়ে পচবে। এ জন্যই ওদের কল-কারখানা বন্ধ হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে অনেক মিল ও কারখানা হতে শ্রমিক ছাঁটাই আরম্ভ হয়েছে। আমরা ওদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিরতরে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবো। বাংলার মানুষকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করবার দিন ঐ ২৫শে মার্চের রাত ১০টায় ফুরিয়ে গেছে। যারা আজ পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য দেখেশুনে খরিদ করছে, তারা নরঘাতক এহিয়ার হাতকে শক্তিশালী করতে সহায়তা ছাড়াও বাংলার সম্পদ ভোগ করে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়ে, বাংলার সম্পদ ভোগ করে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যে কত বড় অপরাধ তার কৈফিয়ৎ ওদের দিতে হবে জীবন দিয়ে। বাঙালীরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করবেই করবে- যার জন্য দিনের পর দিন গ্রাম বাংলার প্রতিটি ছাত্র, শ্রমিক ও যুবকেরা এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করছে। এরা সকলেই স্বাধীনতা রক্ষার বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে ঐ কুকুরদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যেই বেরিয়ে পড়েছে। তারা জানে, অমবস্যার কালো অন্ধকারে ভেদ করে অচিরেই লাল সূর্য আলোয় ভরা আভা নিয়ে পূর্বদিগন্তে উদিত হবে।

(অধ্যাপক এম, এ, সুফিয়ান রচিত)

শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন

২৭শে জুলাই, ১৯৭১

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বাংলদেশ রত্নাগর্ভা। বাংলাদেশে শুধু সম্পদ নয়, আছে মানুষের মত মানুষ। বাংলাদেশের জননেতারা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর নিজ দেশের জনগণকে ভালোবেসে যে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তার তুলনা সমকালীন ইতিহাসে নেই। বঙ্গজননী তার কোলে শুধু তীতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, বাঘা যতীনদের মত বিপ্লবীদের ধারণা করেনি, করেছে চিত্তরঞ্জন, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত বিখ্যাত নিয়মতান্ত্রিক নেতাদেরও। নিয়মতান্ত্রিক নেতা হয়েও এরা দেশের জন্য কম নির্যাতন ভোগ করেননি। শেরে বাংলা ফজলুল হককে পাকিস্তানের তৃতীয় বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে নজরবন্দী করেছিলেন। এই বৃদ্ধ সর্বজনমান্য নেতাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শয়তান শাসকচক্র ঈদের নামাজের জামাতেও যোগ দিতে দেয়নি। এর চাইতেও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। হৃদরোগে আক্রান্ত এই নেতাকে বৃদ্ধ বয়সে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের' কাল্পনিক অভিযোগে দীর্ঘ ছয় মাস

জেলে আটকে রাখা হয়েছে। জেলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। মুক্তিলাভের পর দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে প্রিয় পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বহুদূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশের আরেক জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনের পর গিয়েছিলেন লণ্ডনে। তিনি দেশে ফেরার আগেই হয়ে গেল সব ওলট-পালট। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করে দিলেন বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ। ফজলুল হক হলেন নজরবন্দি। গোলাম মোহাম্মদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসকান্দার মীর্জা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'মওলানা ভাসানী যদি দেশে ফেরেন, তাকে আমি গুলি করার নির্দেশ দেব।'

বিবরণ দিতে গেলে এক মস্তবড় পুঁথি তৈরি করা যায়। বাংলাদেশের এমন একজন নেতা, এমন একজন রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী নেই যাকে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শাসকচক্র হয়রানি করেনি, নির্যাতন করেনি, অমর্যাদা করেনি। তাই এবারেও বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের কাছে পাকিস্তানের বর্তমান ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের নাক ইয়হিয়া খাঁ যখন বলেন 'শেখ মুজিব একজন ক্রিমিনাল, তখন আমরা বিস্মিত হই না। ইয়াহিয়ার মত একজন অর্ধশিক্ষিত বর্বরের কাছ থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা সম্পর্কে এর চাইতে শোভন ও ভদ্র ভাষা আমরা আশা করি না। যে ব্যক্তি নিজে ক্রিমিনাল,যার হাতে এখনো নিরীহ-নিরপরাধ বাঙালীর বুকের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে, ইতিহাসের সেই জঘন্যতম খুনী দস্যু বাংলার ইতিহাস সৃষ্টিকারী এক মহান জননায়ক সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে কথা বলবেন, এটা কেমন করে সম্ভব হয়?

আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশে অনেক মহান নেতা জন্মেছেন। দেশের জন্য তারা যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধেয়। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, নির্যাতন বরণ ও নেতৃত্বাদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুগ সৃষ্টিকারী নেতা। তার ত্যাগ, সাহস ও ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তিনি এখন শুধু বাঙালীর নয়নমণি নন, কিংবদন্তীর রাজা। জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রায় বারটি বছর তিনি কাটিয়েছেন জেলে। ইয়াহিয়ার আগে আইয়ুব একবার তার গলায় ফাসিঁর রজ্জু পরাতে চেয়েছিলো। পারেনি। এখন আবার সেই ফাঁসির রজ্জু হাতে নিয়ে খুনী ইয়াহিয়া নতুন খুনের নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবের অপরাধ তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের মানুষ তাকে ভালোবাসে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের ইতিহাসে যে অধ্যায় যোজনা করেছেন, তার কোন দ্বিতীয় নজির নেই। একটি নিয়মতান্ত্রিক গণআন্দোলনকে রজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের প্রভাবে তিনি রূপান্তরিত করেছেন বিপ্লবে। বিপ্লবকে রূপান্তরিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড রুখে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সুদক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে বলতে গিয়ে প্রায় খালি হাতে লড়ছে। এ কি ইতিহাসের কম বড় বিস্ময়? এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র মানুষের সবল ও প্রেরণাদানকারী নেতৃত্বের জন্য। একটি নামই আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে সৃষ্টি করেছে। আর বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করেছেন বাংলাদেশের নতুন সংগ্রামী ইাতহাস। তাই বাংলাদেশের ঘৃণ্য শত্রু ইয়াহিয়া, হামিদ ও টিক্কা খাঁর দল এই ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের নায়ক শেখ মুজিবকে ধ্বংস করার জন্য পাগলা কুকুরের মত হয়ে উঠেছে। শেখ মুজিবকে জেলে বন্দী রেখে কাপুরুষ ইয়াহিয়া সাহস ও স্বস্তি পাচ্ছে না। সুতরাং বিচারের নামে তাকে হত্যা করার এই শয়তানি চক্রান্ত।...

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

২০শে আগস্ট, ১৯৭১

(এই পর্যায়ের শেষ আলোচনা)

সত্তরের নির্বাজচনবিজয়ী বাংলাদেশের একচ্ছত্র জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত চলছে পকিস্তানী নাৎসীদের জেলে। এটা যেবিচার নয়, বিচার প্রহসন এবং হত্যা করার নারকীয় চক্রান্ত,

সে সম্পর্কে বিশ্বের কোন দেশের কোন মানুষের মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন সম্পর্কে ইউরোপের প্রভাবশালী দৈনিক 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা গত ১২ই আগস্ট তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেনঃ ''এই বিচারে বিদেশী সাংবাদিকদের পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে দেয়া হচ্ছে না। বিদেশের সংবদাপত্রগুলোর প্রতি ইসলাবাদের এই অবিশ্বাস, পাকিস্তানের কল্যাণ সাধন করবে না।''

'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা ঠিকই বলেছেন। তবে তিনি বলছেন বিদেশী সাংবাদিকদের প্রতি ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রের অবিশ্বাস, আসলে সেটা ভয়। ইয়াহিয়া জানে, গত ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় বিদেশী সাংবাদিকেরা ছিলেন বলেই, তার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে। আজো শেখ মুজিবের তথাকথিত প্রহসন যদি বিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকেন, তাহলে আসল কথা ফাঁস হয়ে যাবে। ধরা পড়বে আসল অপরাধী ইয়াহিয়া এবং তার বেঈমান খুনী চক্র। তাই বিচারের নামে খুনী ইয়াহিয়ার এই কঠোর গোপনীয়তা। প্রতি যুগে বিচারের নামে ইয়াহিয়ার মত খুনীচক্রের যে হত্যালীলা, তারই প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন-

> 'আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
>
> বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার খুনীচক্রের ষড়যন্ত্রে আজ এই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। তবে কবিগুরু, তোমোকে আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালী দৃঢ় আস্থার সঙ্গে এই আশ্বাস দিতে পারে, বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। শয়তান ইয়াহিয়া চক্র আজ বাংলাদেশে প্রতিকারহীন শক্তি নয়। এই জানোয়ারদের, এই বর্বর পশুশক্তির পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য বাংলাদেশের তরুণরা আজ অস্ত্রধারণ করেছে। বাঙালী মুক্তিবাহিনী আজ অজেয়, অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এই অপরাজেয় মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কাপুরুষ ইয়াহিয়া ঢাকা আগমনের সাহস পাচ্ছে না। টিক্কা এবং সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছে ছাউনিতে।

এখন প্রশ্ন, এত শীঘ্র শেখ মুজিবকে বিচারের নামে হত্যা করার জন্য পাগলা কুকুরের মত কেন হন্যে হয়ে উঠেছে ইয়াহিয়া? এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সোজা। মূর্খ ইয়াহিয়া ভেবেছে- এক. শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর উৎসাহ নষ্ট হবে এবং মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হবে; দুই. বাংলাদেশ নেতাহীন হবে এবং তার প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস হবে; তিন. শেখ মুজিব বেঁচে না থাকলে বাংলাদেশের সারা এলকা স্বাধীন হলেও তাকে সংগঠিত ও স্থিতিশীল করার মত কোন নেতা ও সংগঠন থাকবে না।

আগেই বলেছি, অতীতের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি এই মূর্খ ইয়াহিয়া। নইলে সে জানতো, আইয়ুবের আমলে এই পরীক্ষা একবার নয়, বহুবার হয়ে গেছে। ১৯৬৬ সালে যখন বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দফার আন্দোলন শুরু করেন, তখন আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে দীর্ঘকালের জন্য কারাগারে রেখে ভেবেছিল আন্দোলন ব্যর্থ হবে। শেখ মুজিবকে ছাড়া তার হাতে গড়া আওয়ামী লীগ এই আন্দোলনকে টিকিয়ে রখতে পারবে না। আইয়ুবের এই দুরাশা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৭ সালে কুচক্রী নওয়াবজাদা নসুরল্লাকে হাত করে পশ্চিম পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহম্মদ আলী চক্র ভেবেছিল, শেখ মুজিব জেলে রয়েছেন এই সুযোগে আওয়ামী লীগকে ভেঙে তাদের পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে। কিছু লোককে হাত করে এজন্য তারা চেষ্টাও চালিয়েছিলেন, কিন্তু নসরুল্লার এই চক্রান্তও সফল হয়নি। ১৯৬৮ সালে যখন তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করা হয়, তখনও আইয়ুব চক্র ভেবেছিল শেখ মুজিবকে জেলে রেখে এই মামলার বিচার চালানো হলে দেশে নেতৃত্বের অভাবে কোন আন্দোলন হবে না। আইয়ুবকে এই ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে অত্যন্ত কঠোরভাবে। ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে যে গণবিপ্লব হয়, তখনো শেখ

মুজিব কারাগারে। তার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নবীন অথচ সংগ্রামী নেতারা এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রনেতারা এই বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নির্ভূলভাবে পরিচালনার করেন।

ইয়াহিয়া বাংলাদেশের এই বিপ্লবী ইতিহাস জানে না তা নয়। কিন্তু মানবতাবোধ ও ইতিহাসজ্ঞান বর্জিত এক মূর্খ সেনাপতির কাজ থেকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আশা করা বাতুলতা। ইয়াহিয়া এবং তার চারপাশে জমায়েত জঙ্গী নায়কেরা জানে না, একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা যায়; কিন্তু একটি আইডিয়া বা আদর্শকে হত্যা করা যায় না। শেখ মুজিব আজ শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি সংগ্রামী আইডিয়া বা আদর্শ। বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামী জাতীয়তা এবং তার সংগ্রামী সংগঠন আওয়মী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি শেখ মুজিবরূপী এই আদর্শ। এই আদর্শেই আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা আজ বলীয়ান। শেখ মুজিব যদি সশরীরে এই আদর্শ রূপায়ণে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে পারেন, তাহলে সারা বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির পরম গৌরব। আর তিনি যদি কোন চক্রান্তের শিকার হয়ে নাও থাকেন, তাহলেও তার প্রদর্শিত পথেই আওয়ামী লীগ ও বাঙালী জাতির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিব আজ দেশের বাইরে বহুদূরে কারান্তরালে রয়েছেন; তবু তার প্রদর্শিত পথে অবিচল থেকে আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি সুসংগঠিত সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান। স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারে শক্তি ও স্থিতিশীলতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দিন দিন সংগঠিত ও শক্তিশালী হচ্ছেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঙালী জাতির এই নবঅভ্যুত্থান ব্যর্থ করার আশা মূর্খ ইয়াহিয়ার দূরাশা মাত্র।

তবে বাঙালীর নয়নমণি, জাতির প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে ইয়াহিয়া চক্র নিস্তার পাবে তারা এমন আশা যেন স্বপ্নেও না করে। এই কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার সময় এসেছে। বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নাজরুল ইসলাম বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র পরিণতি হবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। আমরা বলি, একজন বাঙালীর দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে এই পৈশাচিক হত্যার পরিশোধ না নিয়ে তারা ছাড়বে না। ইয়াহিয়া চক্র পালিয়েও প্রাণে বাঁচবে না। তোজো ও হিটলারের পরিণতি বরণই তাদের ভাগ্যে অবধারিত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি, কোটি কোটি বিশ্ববাসী এবং সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার জোরে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সমস্ত শয়তানি চক্র ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবেন এবং তার প্রিয় জনগণের মধ্যে ফিরে আসবেন। আজ এই সংকট সন্ধিক্ষণে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা দিন গুনছি।

শেখ মুজিব দীর্ঘজীবী হোন।। জয় বাংলা।। ..

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

২৫শে আগস্ট, ১৯৭১

রোগাগ্রস্ত ভদ্রলোকের অপচেষ্টা

বিদ্রোহের অগ্নিতে ভস্মীভূত ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে বিশ্বের বৃহত্তম উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে পৃথিবীতে এতো ব্যাপক উপ-নির্বাচন বোধ হয় আর কোন দেশে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের দখলীকৃত

এলাকায় মূক ও শঙ্কিত নাগরিকদের অস্ত্রের হুঙ্কারে একটি তথাকথিত সাধারণ নির্বাচনের স্বাদ পেতে হয়তো চলছেন। বন্দী নাগরিকদের অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ইয়াহিয়া যে উপ-নির্বাচনের ফাঁদ পেতেছেন, গণহত্যার মতোই সেটা হবে তার আর একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক রেকর্ড-প্রবঞ্চকের ডাইরীতে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন।

ভদ্রলোক রোগগ্রস্ত। মনস্তত্ত্ববিদগণ যেমন কোন কোন রোগীর মধ্যে বিশেষ জৈবিক প্রবণতা সন্ধান পান, মনোবিজ্ঞানের চেম্বারের উপস্থিত করলে ইয়াহিয়ার মধ্যেও রক্তপাতের প্রবল উন্মাদনা পরীক্ষাযন্ত্রে ধরা পড়বে।

জীবনে অন্ততঃ একটা বিজয় তার আছে- তা হচ্ছে অস্ত্রের ঝঙ্কারে বলপূর্বক পাকিস্তান দখল, রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত। অঙ্গুলি হেলনে তিনি নির্বাচন করেছেন, অঙ্গুলি আস্ফালনে তিনি গণহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবে সেনাদের লেলিয়ে দিয়েছেন। আবার খেয়াল-খুশী মতো নির্বচিত প্রতিনিধিদের আসনচ্যুত করার নির্দেশ দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। এই তোঘলকী হঠকারিতার উত্তরাধিকারী শৈলনিবাসী ভদ্রলোকে ইয়াহিয়া জানেন না যে, নির্বাচনে অনুষ্ঠানের নির্দেশ তিনি দিয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু প্রতিনিধিদের সদস্যপদ খারিজের অধিকার তার নেই। কারণ, পরিষদ সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের ভোটে, তার ভোটে নয়। এক্ষেত্রে ধনুক থেকে তীর তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। তার এই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রটি একটি মাত্র অভিপ্রায় বা মনোবাসনা দ্বারা পরিচালিত, তা হচ্ছে অস্ত্রবলে বেআইনীভাবে ক্ষমতার মসনদ আইনানুগ ও চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়। পাগলাগারদের চিকিৎসকগণ এ রোগের একটা নাম দিয়েছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে সুস্থ-সবল দেখতে, এমন কি মাত্রাধিক অমৃত রসধারা পান করেও লোকটি স্বাভাবিক মাতালের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ আকাঙ্খা চরিতার্থে করার উদ্দেশ্যে সে অকস্মাৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে- তখন যেকোন ব্যক্তিকে সে হত্যা করতে পারে। বিশষজ্ঞগণ এ রোগকে 'প্যারানাইয়া'' বলেন। উন্মাদদের শ্রেণীবিন্যাস।

নরহত্যার জেনারেল এই ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় আওয়ামী লীগের ৭৯ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের নির্বাচন বাতিল করেছেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৫ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের পদ খারিজ করে আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই আবার আওয়ামী লীগ প্রধানরূপে অবশিষ্ট পরিষদ সদস্যদের উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে স্বপ্নরাজের ভবিষ্যৎ পরিষদে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ 'প্যারানাইয়া' রোগে আক্রান্ত এই ভদ্রলোকের এক অস্বাভাবিক খেয়ালে দু'টি পরিষদে আওয়ামী লীগের মোট ৪৫৫ জন সদস্যপদ হারিয়েছেন এবং মোট যে ১৮১ জন সদস্যপদ হারাননি, তাদের ইয়াহিয়া খান নিজেই শেখ মুজিবের পক্ষে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেছেন! এ যেন টোগোল্যাণ্ডের কোন এক ক্লান অধিনায়ক কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার নির্দেশের মতো। ইয়াহিয়ার এই স্বেচ্ছাচারমূলক অধিকারটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে উন্মাদের কার্যকলাপ বলেই পরিগণিত হচ্ছে, একথা আজ সত্যের মতো উজ্জ্বল।

যে ২৭৪ জনকে অপরাধী বলে উল্লেখ করে সদস্যপদ খারিজ করেছেন, তাদেরই আবার বিচারের জন্যে কোর্টে উপস্থিত হতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি শাস্তি আগে দিয়েছেন, বিচার পরে হতে চলছে। শরীরের রক্তপ্রবাহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; কিন্তু মানুষ যদি রক্ত পান করে, তবে তার কার্যক্রমে অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ও অসঙ্গতি দেখা যায়- এ তারই দৃষ্টান্ত।

এতো সামঞ্জস্যহীন কার্যপদ্ধতির মধ্যেও ইয়াহিয়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করতে চাচ্ছেন- এক ঢিলে দুই পাখী। অন্ততঃ কাল্পনিক পরিষদে আওয়ামী লীগকে এভাবে সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে এবং গণহত্যার সহচরও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী চক্রান্তকারী ভূট্টোকে সংখ্যালঘু দলের নেতার নেতারূপে পঙ্গু করা সম্ভব হবে।

জাতীয় পরিষদে মাত্র ৮৮ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৯৩ জন আওয়ামী লীগ নেতার সদস্যপদ বাতিল হয়নি বলে পিণ্ডি সরকার ঘোষণা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশ নাগরিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, উক্ত মোট ১৮১ জন আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্য ইয়াহিয়া ও তার উন্মাদ জেনারেলদের পাশে রয়েছেন। এমন কি বাংলাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, ও নারী নির্যাতন তারা সমর্থন করেন। পরিষদ সদস্যদের একটা বিরাট অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাস করেন না। অপরদিকে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা দিতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, উক্ত ১৮১ জন সদস্য ইয়াহিয়ার কোটের পকেটে রয়েছেন। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি এই বিভ্রান্তিকর চিত্র সাময়িককালের জন্যে তুলে ধরেছেন। কারণ মিথ্যাশ্রয়ী এই জেনারেল জানেন যে, ১৮১ জন সদস্য তার মুঠোর মধ্যে নেই। এদের প্রায় সব ক'জনই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করতে যাননি। তিনি সদস্যপদ বাতিল না করে শুধুমাত্র প্রলোভন দেখিয়েছেন।

এতো ব্যাপকসংখ্যক আওয়ামী লীগ সদস্যকে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা বিশ্বাস করতে পারে না। অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিষদের মধ্যেও তারা বিদ্রোহীর ভূমিকা নিতে পারেন। যারা বিশ্বাসঘাতক, 'বিশ্বাস' শব্দটি তাদের অভিধানে থাকে না। চক্রান্তের প্রথম পর্বেই হচ্ছে সন্দেহ। রক্তপিপাসুদের হাতে নিহত হবার জন্যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন ছাড়া কেহই যখন ইয়াহিয়ার বন্দীশালায় পা বাড়াবেন না, তখন তিনি পর্যায়ক্রমে বাতিলকৃত সদস্যদের তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করবেন এবং সে সংখ্যা চার শতাধিক হয়ে দাঁড়ালে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। আর সে ক্ষেত্রে যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের নির্বাচনের রূপ নেবে ইয়াহিয়ার সর্বব্যাপী উপ-নির্বাচন।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে 'কমপিউটারকে' ও জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে হত্যাভিযানে যিনি প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার নিয়েছেন, সেই ইয়াহিয়া জানেন যে, যতো প্রলোভনই থাকুক না কেন লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের মৃতদেহ মাড়িয়ে ইতিপূর্বে নির্বাচিত কোন সদস্য পরিষদকক্ষে প্রবেশ করবেন না। তিনি জানেন যে, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে যারা হত্যা করেছে নির্বিচারে, তাদের সাথে সহযোগিতা করে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে কেউ এগিয়ে যাবেন না। তিনি জানেন যে, দেশপ্রেমিকদের রক্তে কলম চুবিয়ে কেউ ইয়াহিয়ার পরিষদের হাজিরা খাতায় দস্তখত করবেন না। সেই দানব শক্তিটি জানেন যে, দস্যু-হানাদারদের কবল থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে উদ্ধার করার জন্য এরা সবাই স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

এই রোগগ্রস্ত ভদ্রলোক এ-ও জানেন যে, বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার তার এই অপচেষ্টা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হবে।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়েছে

সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খানকে তাড়িয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তারই প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রে যখন পিণ্ডির সিংহাসনের বসলেন, সে সময় এই মিথ্যাশ্রয়ী জেনারেল বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যে সভ্য জগতের শাসকদের অনুকরণে কোমল ভাষায় দর্শনসম্মত বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন, জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত শাসনতন্ত্র ও ন্যায়নীতির শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তিনি অহরহ প্রচার করতেন। এমন কি, ''আমি জনগণের প্রতিনিধি নই- সৈনিক; জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবো এবং সামরিক সরকার হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন''- এ সমস্ত বক্তব্য ফলাও প্রচার করে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন।

দেশী-বিদেশী নেতৃবর্গ, অফিসার ও সাংবাদিকদের কাছে সবচাইতে প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল নির্বাচন ও শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ বন্দুকধারী মানুষটির মধ্যে গণতন্ত্রের এক সুকুমার মূর্তি বিরাজ করছে, এটাই ছিল সমগ্র কিছুর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক কথায় তিনি দানবের কাছ থেকে মানবীয় গুণাগুণ লাভের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশপের গল্পের সত্য তার মধ্য প্রকাশ পেতে থাকে। বিশেষ বিশেষ পশু বা পক্ষী ছদ্মবেশ ধারণ করে দীর্ঘ সময় যেমন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না, কণ্ঠস্বরই তার জন্যে অভিশাপ হয়ে ওঠে, তার পরিচয়কে ঘোষণা করে-ইয়াহিয়ার ব্যাপারেও তাই ঘটল। ক্রমবিকাশমান পাশবিক রূপটি সকলের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তবে তিনি সুচতুরের ন্যায় বাক্যব্যয়ে শিক্ষিত।

তখন পিণ্ডিতে ট্যাঙ্কগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গিয়েছিল, রাস্তার মোড়ের কামানগুলোর নল মাথা নত করে স্তব্ধ। অসামরিক ও সামরিক স্টারধারী আমলদের রাজনৈতিক শাসনগত কাঠামো তখন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় ইয়াহিয়া সিভিলিয়ান পোশাকে ঢাকা সফরে আসলেন। হাতের ব্যাটন আর মূখনিঃসৃত সৌরভ বাদ দিলে তাকে সেদিন অন্ততঃ একজন মোনাফেক রাজনীতিকের মতো মনে হয়েছিল। সাংবাদিকরা বিমানবন্দরে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে- দেশব্যাপী এক রেফারোণ্ডামে দ্য গল পরাজিত হয়ে সেদিনকার পত্রিকাতেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

প্রশ্ন ছিলঃ দ্য গলের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান হাতের ব্যাটন বাঁ হাতের তালুতে দু'বার ঠুকে বিজ্ঞের ন্যায় মন্তব্য করেনঃ যে কোন সম্মানীয় নেতার পক্ষে এটাই হচ্ছে গৌরবজনক পথ।

আবার প্রশ্নঃ পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও কি এ কথা প্রযোজ্য?

এ প্রশ্ন যে তির্যকভাবে তাকেই আঘাত করছে, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ক্রোধ সংবরণ করে প্রশ্নকারী রির্পোটারের কাঁধে হাত রেখে দ্রুত উত্তর দেন 'ইয়েস্'-মানে 'হ্যাঁ'।

এটা যে তার দিক থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে কথা এই সিপাহীর মস্তিষ্কে আসেনি। কিন্তু রিপোর্টারগণ বুঝতে পেরেছিলেন কোথায় তার আঘাত লাগে।

ক্রমান্বয়ে ক্ষণিকের এই ছদ্মবেশীর ময়ূরপুচ্ছ খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবঞ্চনাপূর্ণ বক্যসম্ভারের ছিদ্রপথে তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালানোর তথ্য প্রকাশ করতে থাকেন- রিপোর্টারের কাঁধে তিনি হাত রেখে "গৌরবজনক পথ অবলম্বনের" প্রতিশ্রুতি তখন থেকেই তার কানে ব্যঙ্গ'র মতো শোনাতে ।

পিণ্ডির এক সংবর্ধনা সভায় ঘনিষ্ঠ মহলের আলোচনায় ইয়াহিয়া অস্ত্রে শান দেওয়ার তথ্য সগৌরবে ফাঁস করেন। তিনি বাঁ হাতের অমৃত্যাধার উর্ধ্বে তুলে ডান হাতের অঙ্গুলি নির্দেশে বলেনঃ আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন মুষ্টিবদ্ধ হাতে- বিদায়ের সময় মুষ্টি খুলে তাকে চলে যেতে হয়েছে। আর আমি এসেছি মুষ্টি খুলে, কালক্রমে আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে। কথাটা শুনে জী-হুজুর পরিষদ নিষ্প্রয়োজনে হেসে উঠেছিলেন, সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতারা বিচলিত হয়ে পড়বেন- কিন্তু জনসাধারণ তার এই বক্তব্যে মোটেই বিস্মিত হননি। তারা জানতেন ডিক্টেটর সেনাপতি কোন পথ নেবেন, তার শাসনের পথ কোনটি, ক্ষমতার স্থির থাকার জন্যে তার হাতের অস্ত্রের নাম কি। আর এক দুস্য জেনারেলের "অস্ত্রের ভাষা" সম্পর্কে তারা সচেতন।

নির্বচনের আয়োজন ও বিলম্বিত ব্যবস্থার পরও জনগণ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ইয়াহিয়াকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তবুও সামরিক আইনের মধ্যেই জনগণ ইয়াহিয়ার স্বপ্নকে চুরমার করে এক ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠীর গুপ্ত বাহিনীর রির্পোট ছিল আওয়ামী লীগ

শতকরা ৬০ বা ৬৫টির অধিক আসন লাভ করতে পারবে না। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল শত্রুর শানিতে অস্ত্রের ন্যায় ইয়হিয়ারে বক্ষে প্রোথিত হল। এই পরিস্থিতিটা ছিল সামরিক শাসকদের বিদায়ের ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু সামরিক শাসক কোনদিন সম্মানের সাথে বিদায় নেন না- বিতাড়িত পশুদের ন্যায় পরাজয় হয়ে পলায়নই তার চরিত্র। ডিক্টেটরের চরিত্রের নির্দেশে ইয়াহিয়া চণ্ড রূপ নিয়ে হত্যার অভিযানে বের হলেন বাংলাদেশের নগরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে। বিদ্রোহের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখমণ্ডল। বিপ্লবী প্রত্যেকটি মানুষের লৌহ-পেশী বাহু দৃঢ়তার হয়ে উঠলো ঘৃণ্য আক্রমণকারী ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনীর ধ্বংসের তাড়নায়। এতো হত্যা, এতো ধ্বংস আর নির্যাতনের বিভীষিকার মধ্যে তারা আজ দৃঢ়তর ক্রন্দনরত নয়, নয় স্থবির। তারা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ, নবচেতনায় উদ্ভাসিত মুক্তির দিশারী।

তাই আজ পরিস্থিতিটা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে চলছে। বিশ্বের সচেতন রাষ্ট্র ও নাগরিকগণ সোচ্চার কণ্ঠে বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। কিন্তু এর পরও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া নানান অপকৌশল অবলম্বনে পথ বেছে নিয়েছেন। চক্ষু চিকিৎসককে করেছেন ক্রীড়নক গভর্নর, আর মন্ত্রী করেছেন দশজন ধিকৃত ও জনগণের আঘাত থেকে পলাতক পশুকে। তদুপরি নির্বচিত ১৮৪ জন সদস্যের পদ খারিজ করে উপ-নির্বাচনের নির্দেশে দিয়েছেন। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উপনির্বাচনে হবে। আর এরই মধ্যে তিনি সামরিক নির্দেশে রচিত শানতন্ত্রের খসড়া প্রকাশ করবেন। তার মতের বাইরে উক্ত খসড়ার কোন ধারাই প্রস্তাবিত তথাকথিত পার্লামেন্টে বাতিল সংশোধন কথার ক্ষমতা থাকবে না। সম্ভবত ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর পূর্বে তিনি পার্লমেন্টে আহ্বান করতে সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তার এই স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র রচনা ও অধিবেশন সবকিছুই একটা বিরাট ‘‘যদি’’র উপর ঝুলছে।

কার রাজত্ব তিনি শাসন-নির্যাতন-হত্যা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে এইসব বিভ্রান্তির আয়োজন করার ঘোষণা করছেন, সে কথা পিণ্ডির ‘‘ব্রাসহ্যাট’’ গোষ্ঠী হয়তো জানেন। কিন্তু তার চাইতে ও সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর চক্রান্তের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রয়েছন বাংলাদেশের সংগ্রামরত নাগরিকগণ। ইয়াহিয়ার প্রতিশ্রুতি আর দেশদ্রোহীদের সমাবেশ দ্বারা অস্ত্রধারী সংগ্রামীদের স্তব্ধ করা যাবে না-সমগ্র নব-চক্রান্ত আজ সূর্যের মতো প্রখর।

যার জীবনেতিহাস প্রবঞ্চনার বিষধারায় আচ্ছন্ন, মুক্তিকামী মানুষের ক্রুদ্ধ অস্ত্রের বর্ষণেই কেবল তার চক্রান্তের ফলপ্রসূ উত্তর।

(ফয়েজ আহমদ রচিত)

দর্পণ

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সম্প্রতি প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যক ও কূটনীতিকে মঁসিয়ে আঁদ্রে মালর বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সংগ্রামী ভিয়েৎনামী জনগণের মত জবাব দিতে বলেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তিনি আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আবেদন করেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করছেন না- তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন।

মঁসিয়ে মালর দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানী জঙ্গী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তাতে জয় তাদের অনিবার্য।

দ্য গল মন্ত্রীপরিষদের সংস্কৃতি দফতরের বিদগ্ধ মন্ত্রী এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী বর্বরতা নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি জানেন যুদ্ধ কি। তিনি জানেন, অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কিভাবে গড়ে ওঠে এবং তিনি জানেন মুক্তিযুদ্ধ কি। এই কূটনীতিক ও সংবেদনশীল মানুষটির অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ফ্রান্সকে নাৎসী জার্মানীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে একদিন জেনারেল দ্য গলকেও ইংলিশ চ্যনেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জেনারেল দ্য গল তখন মুক্তিযোদ্ধা-স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে তিনি সংগ্রাম করছেন।

আলজেরিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্যের জন্যে অনেক প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক কারাগার বরণ করেন। এ সম্পর্কে এ কালের বিবেকের অন্যতম মুখপাত্র জাঁ পল সাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সার্ত্র নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। শুধু সার্ত্র নন, ফরাসী দেশের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলবেয়র কামুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও বহু প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করেছেন কিংবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন Anglo-Spanish যুদ্ধে নিহত হন। স্পেনের কবি গার্সিয়া লোরকাও স্পেনের গৃহযুদ্ধ শহীদ হন। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপনাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধেরও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিক ছিলেন মহান সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ঋষি টলস্টয়।

এ যুগের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল তারকা গ্রীসের মিকিস থিওডোরাকিস। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লবী শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ মিকিস থিওডোরাকিস গ্রীক সামরিক জান্তার উৎপীড়নকে না মেনে নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। গ্রীক সামরিক জান্তা তাকে বন্ধ করে রেখেছে কারাগারে।...

মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকবলিত দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এক-একজন মুক্তিযোদ্ধা। সকলেই হয়তো রণাঙ্গনে শত্রুর সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবেলা করেন না- কিন্তু সকলেই যুদ্ধ করছেন। কেউ নিষ্ক্রিয় নয়, সকলেই সক্রিয়। চাষী, শ্রমিক, মজুর, চাকুরে, ব্যবসায়ী সকলেই যুদ্ধ করছেন।

এই মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, কবি, শিল্পীদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে- তারা সংগ্রামীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁদের গান, কবিতা ও রচনার মাধ্যমে।

রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করার দরকার নেই কবির। কবি তখন যুদ্ধক্লান্ত যোদ্ধাদের গেয়ে শোনেন দেশপ্রেমের উদাত্ত সঙ্গীত, বিজয়গাথা । রণক্লান্ত সৈন্যরা আবার নতুন বলে বলীয়ান হয়ে মাভৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যান। কবি তখন চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মসি ও অসির প্রাধান্য নিয়ে পুরোনো বিতর্ক সৃষ্টি করার সময় নয় এটা। মসি এখন ঝলসে উঠুক অসির মত প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতিতে।

বাংলাদেশের বেশীরভাগ কবি, সাহত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী আজ গৃহহারা। ঘাতক ইয়াহিয়া ২৫শে মার্চ রাতেই তাদেরকে খতম করতে চেয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতি বাংলদেশ থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নরপশু ইয়াহিয়ার জল্লাদবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের কোয়ার্টারগুলোতে আক্রমণ চালায়। বেশীরভাগই নিহত হয়েছেন। কেউ কেউ হয়তো পালিয়ে বেঁচেছেন।

কিন্তু এখনও যাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি কিংবা অসুবিধার জন্য যারা দেশের শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে রয়ে গেছেন, তারা কি করছেন- এটাই জানতে ইচ্ছে হয়। বলাবাহুল্য তারাও চুপ করে নেই। কি করে চুপ করে

থাকা যায়? চোখের সামনে মা, বোন, ভাই, বাপ, বন্ধুবান্ধব সকলকে ঘাতকেরা হত্যা করছে। এই জল্লাদদের অকথ্য অত্যাচারে সোনার বাংলা আজ শ্মশান।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্ধন হচ্ছে ভাষার বন্ধন। বাংলা-বাংলা ভাষাভাষীর দেশ। কি করে সহ্য করা যায় বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে হানাদারদের আনাগোনা? তবু সহ্য করতে হয়। সারাদিন রাত-কাটে এক ত্রাসের মধ্যে, এক দুঃস্বপ্নের জগতে। বেয়নেটের মুখে বিপন্ন অস্তিত্ব!

শামসুর রাহমান এখন পত্রিকা অফিসের তেতলায় বসে কবিতা লিখছেন কি? তাঁর বিষণ্ণ চোখ দুটোতে নিশ্চয় দশ লাখ মৃত মানুষের পুঞ্জীভূত নিষ্পলক দৃষ্টি লেগে রয়েছে। দুঃখ, মহা দুঃখ! আর এই দুঃখ অহরহই নাম লিখেছে- বাংলার প্রতিটি পর্ণ কুটিরে-ভাবনার আদিগন্ত জুড়ে।...

শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন নিশ্চয় বেয়নেটের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সৃষ্টির উন্মাদনায় একর পর এক এঁকে চলেছেন ধর্ষিতা বাংলার ছবি। আরব গেরিলা শিবিরে থাকাকালে তার তুলিতে জ্বলে উঠেছিল আগুন- আর সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল আরব মুক্তিযোদ্ধারা। আমরাও সে্ মন্দ্রে দীক্ষা নেবার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছি।

জিন্না এভেন্যুর রেস্তরাঁতে নববিবাহিত শহীদ কাদরী কি এখনও সন্ধ্যা কাটান? রক্ত, রক্ত চায়ের কাপে, ফ্রিজের জলে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে বৃষ্টির শব্দকেও কি তার দশ লাখ মানুষের আত্মার হাহাকার মনে হয়?...

আবুল হাসান কি এখনও হাসপাতালে পড়ে আছে? অসুখে নয়, জল্লাদের গুলীতে আহত হয়ে । নাকি সে পড়ে পড়ে ধুঁকছে কোন মেসের আলোহীন কক্ষে-আলোর প্রতীক্ষায়। ... সে কি এক মিলিয়ন শবের দুঃস্বপ্নে ঘুমের মধ্যে ঘেমে ওঠে?

রফিক আজাদের অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয়ই এখন বারুদের আগুন হয়ে শত্রুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে?

.... তোমাদের মৃত্যু নেই। তোমাদের স্থান সাড়ে সাত কোটি বাঙারীল মনের মণিকোঠায়।

বিশ্ববিবেক তোমাদের দিকে। তোমাদের ভয় কি?

জয় আমাদের হবেই। তোমাদের মসিকে করে তোল জিঘাংসু ধারালো হাতিয়ার। পড়ে পড়ে মার খাবার দিন চলে গেছে। তোমার প্রাণের ভাষা তোমার পবিত্র জন্মভূমি জননী বাংলাকে ওরা ধর্ষণ করছে। তোমরা দেখিয়ে দাও রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমরা তোমাদের পাশেই রয়েছি। পশ্চিম বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে চাই-

'মরো কিন্তু মেরে মরো এবং উদ্ধার করো ঘর-
নিশ্চিত রয়েছি পাশে আমি তোর জন্ম সহোদর।"...

(রণজিৎ পাল চৌধুরী রচিত)

কাঠগড়ার আসামী

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংস হত্যাকারীর তালিকায় সংযোজিত হয়েছে দুটি নাম। একটি ইয়াহিয়া খান, অপরটি টিক্কা খান। জঘন্য জালেম হিসেবে সারা বিশ্ব তাদের ধিক্কার দিচ্ছে। টিক্কা খান শুনেছ সেসব কথা? তোমার বক্তব্য আছে কিছু? বিচারের কাঠগড়ায় হলফ করে বলো, কেন এই গণহত্যা অনুষ্ঠিত করলে? বাংলার মাটি মানুষের রক্তে কেন লালে লাল হয়ে গেলো? এ গণহত্যার অন্যতম আসামী টিক্কা খান জবাব দাও।

অদ্ভুত এবং মস্তিষ্কবিকৃত নাদির শাহের যোগ্য প্রতিনিধি, হত্যার নেশায় ভুলে গেছিলে, মরিয়া মানুষের কি প্রচণ্ড শক্তি! বিশাল অতল সমুদ্রও সে শক্তির কাছে হার মানে। তুমি তো আজাজিলের পাণ্ডা, তুমি তো কোন ছার! ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লায় তথা সারা বাংলাদেশে তোমারই নির্দেশে নিতান্ত বর্বরের মতো গুলি করে মারা হয়েছে অগণিত মানুষ। বিভীষিকার রাজত্ব কয়েম করতে চেয়েছ সারা বাংলাদেশে। বলো কুখ্যাত গণহত্যাকারী-কি অধিকার তোমার ছিল এ গণহত্যায়?

জল্লাদ প্রভুর আর জনগণের দুশমন দালালদের মনোরঞ্জনের জন্য, অমিতশালী তুমি- ৭২ ঘণ্টায় স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিলে সারা বাংলার সংগ্রামের আগুন। কত শক্তি ধরে তোমার ওই শূকরছানার দল? সাম্রাজ্যবাদী, গণতন্ত্রের শত্রু; এ যুগের কলংক টিক্কা খান, তোমারই সেই বীর পুংগবের দল নেড়ীকুত্তার মত আজ লেজ গুটিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে গর্তে। দেখেছ? প্রত্যক্ষ করছে বাংলার মানুষের শক্তি? তোমার শক্তির দম্ভ এক নিমিষেই মাটির হাঁড়ির মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অবশ্যই এ কথা তোমার জানা। তবু, তবু হত্যাকারী, তোমার হত্যার নেশা মেটেনি। গ্রামে-জনপদে-শহরে-নগরে জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অত্যাচারের বান ডাকিয়েছ। বাংলার মাটি নিরীহ মানুষের রক্তে হয়ে গেছে লালে লাল। রক্তের সমুদ্রে আজ কার সর্বনাশ দেখছো শয়তান? তোমার? না তোমার মহাপ্রভুর? বলো কুৎসিৎ হত্যাকারী, এ বীভৎস হত্যার জবাব কি? জবাব দাও।

গ্রামে-গ্রামান্তরে-শহরে নগরে কুকুরের মতো লেলিয়ে দিয়েছ তোমার সেনাবাহিনী। ধর্ষণে, লুণ্ঠনে, হত্যায় তারা সারা বাংলাকে করে তুলেছিল মৃত্যুর পুরী! এ অত্যাচারে কতটুকু পেলে শয়তান? এক-একটি রক্তবিন্দুতে জন্ম নিয়েছে লাখো লাখো মুক্তিযোদ্ধা। তোমার সেই কুকুরের দল মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে দিকভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত। তবু আজো সাধ মেটেনি, হত্যার নেশায় এখনো খুঁজে ফিরছে অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষদের। কিন্তু তারই বদলে কুকুরগুলো নিঃশেষ হচ্ছে একের পর এক। বলো নরকের কীট, গ্রামবাংলাকে তুমি পুড়িয়েছ, লুট করেছ, শ্রীহীন করেছ কেন? জবাব দাও।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে পদলাভে উন্মুখ হয়েছিলে, যে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলে- চেয়ে দেখা আজ সেই সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মৃত মানুষের লাশের তলায় চাপা পড়ে গেছে তোমার সাধের পাকিস্তান। হাত-পা কামড়াচ্ছ কেন? সঙ্গীদের মতোই লাঙ্গুল দিয়ে গায়ের মাছি তাড়াও। বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিহিত আত্মাকে খুঁজে পাচ্ছে না? নির্লজ্জ বিবেকহীন, জবাব দাও, কোন বিষীষিকা তোমার চোখে ভাসছে?

কতো মজার শাসন ব্যবস্থা তোমার দেশের! বেহায়ার পৃষ্ঠপোষক বেহায়াই হয়। তার প্রমাণ তুমি আর তোমার বন্ধু-বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কিত নায়ক ইয়াহিয়া খান। এত অত্যাচার, এত লুণ্ঠন, এতো হত্যা করার পরেও তোমার পদোন্নতি হলো- পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে 'কোর-কমাণ্ডার'! কিন্তু অর্বাচীন টিক্কা খান, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছে তার জের চলছে, চলবে। বাংলাদেশের মানুষে কোনদিন তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমাদের

শয়তানের মতো কালো মুখে নিক্ষেপ করবে রাশি রাশি কলঙ্কের কালি। তুমে যেখানেই যাও, যতো পদোন্নতিই তোমার হোক না কেন, শান্তিহীন, স্বস্তিহীন হবে তোমার দিবারাত্রি। বলো হত্যাকারী শয়তান, তোমার জবাব কি?

কালো কলংকের বোঝা মাথায় দিয়ে, নৃশংস জালেম প্রস্তুত হও। বলো, তোমার জবাব কি? জবাব দাও শয়তান ইয়াহিয়ার চেলা টিক্কা খান।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

জনতার সংগ্রাম

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা রচনা করেছে নয়া ইতিহাস। হরতাল, মিছিল আর বিক্ষোভের স্তর পার হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে মুহূর্তে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, সে মুহূর্তে জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনাআপনি। ফুল ফুটলে যেমন সুগন্ধ বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে।

দুনিয়ার ইতিহাসে দেশের এমন ঘটনা অবশ্য ঘটেছে এর আগেও। ফ্রান্সে ঘটেছে ফরাসী বিপ্লবের সময়। রাশিয়াতে ঘটেছে সোভিয়েট বিপ্লবে। চীনে গণচীনের প্রতিষ্ঠায়। কিউবাতে ঘাটেছে চে গুয়েভারার গেরিলা সংগ্রামের ধারায়। আর ঘটেছে হো চি মিনের ভিয়েতনামে- সারা দুনিয়াকে আজও যা করছে বিস্মিত।

কিন্তু বাংলাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ আর মিছিলের স্তর পার হয়ে জনতার মুক্তিসংগ্রাম যত তাড়াতাড়ি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, এমনটি আর কোথাও হয়নি।

চলতি '৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে অহিংস গণঅসহযোগের কর্মসূচী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়, তা যে দেখতে দেখতে অস্ত্রধারণের কর্মসূচীতে পরিণত হবে, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল পাকিস্তানী হানাদার সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার দুর্দম অভিযানে পৌঁছতে পারবে, এ ধাণা হয়তো আগে করা যায়নি।

কিন্তু এ ঘটনাই ঘটিয়েছে আমাদের বাংলাদেশ- আমাদের বাংলাদেশের জনতা- বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দা। পাকিস্তানী শাসকচক্রের শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশের নিরন্ন বুভুক্ষু সর্বস্তরের মানুষ, নরনারী-শিশু অবতীর্ণ হয়েছে আপোষহীন মুক্তিযুদ্ধে। মাত্র সাত মাসের মধ্যে বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষ আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখেছে। পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের সমস্ত রকমের যোগাড়যন্ত্র করা আধুনিকতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত সাঁজোয়া বাহিনী 'ব্লিৎসক্রিগ' বা বজ্রগতির যুদ্ধপদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেনি। ফিউজ হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানী 'ব্লিৎসক্রিগ'। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের একটিমাত্র অংশের কাছে মামুলি ধরনের অস্ত্র ছিল ২৫শে মার্চ। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বাঙালী ইপিআর আর বাঙালী পুলিশ বাহিনী এবং আনসার বাহিনীকে সামনে নিয়ে ভবিষ্যতে আধুনিক অস্ত্র পাবার আশায় বাংলাদেশের জনতা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই হানাদার পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর সামরিক সময়সূচীকে পণ্ড করে দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে উদ্যোগ।

নরঘাতক ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, হামিদ খান, গং এর নির্দেশে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে ঠাণ্ডা করার মতলবে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড আর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে গত সাত মাস ধরে, পৃথিবীর তিহাসে তার নজীর নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এতে ঠাণ্ডা না হয়ে বরং আরও বেশি একরোখা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রায় দু'কোটি মানুষ উৎখাত হলেও দেখা যাচ্ছে জনতা শুধু সামলে নেয়নি নিজেদের, পাল্টা আঘাত শুরু করেছে হানাদার বাহিনীর ওপর- প্রথমত গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ পরিচালনা করে, দ্বিতীয়ত নিয়মিত সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্রে নিয়োজিত করে। সমূসূচীর দিক দিয়ে এইভাবে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার তুলনা নেই ইতিহাসে।

সে জন্যই আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা মুক্তিসংগ্রামের নতুন নজীর স্থাপন করলো।

তুলনা করার জন্যে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের আমলের ফরাসী জনতার। ফ্রান্সের জনগণ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকসমাজ আর শহরের মেহনতি মানুষ আর ব্যবসায়ীরা খাজনা-ট্যাক্সের কড়ি গুণতে গুণতে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন ফ্রান্সের শহর আর গ্রামাঞ্চলের কোটি জনতা তাই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতাকা নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ণ গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ফরাসী জাতির নবজীবন আর মুক্তি আর মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম চলে আসছিল বিভিন্নভাবে, তা-ই দানা বেঁধেছিল সশস্ত্র বিপ্লবে।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ প্যারিসের জনতা শুধুমাত্র সড়কি সম্বল করে দুর্ভেদ্য ব্যাস্টিল কারাগার ভেঙ্গে ফেলেছিল। মুক্ত করে এনেছিল রাজবন্দীদের। তার পরে বিপ্লবী ফরাসী গণসেনাবাহিনী গড়ে তুলতে তাদের চার বছর লেগেছিল। অথবা বলা যেতে পারে, ফরাসী জনতা চার বছর সময় পেয়েছিল গণসেনাবাহিনী গড়ে তোলার। পরে অবশ্য তৎকালীন ইউরোপের সমস্ত দেশের রাজতন্ত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল এই ফরাসী জনতার গণসেনাবাহিনী। রাজকীয় অস্ত্রভাণ্ডারগুলি দখল করে জনতার এই সেনাবাহিনী রাজতন্ত্রীদের সাঁজোয়া বাহিনী তুলোর মত উড়ে গিয়েছিল ফরাসী গণবাহিনীর ঝটিকা অভিযানে। এই গনসেনাবাহিনীর লোকদের নিয়মিত সামরিক পোশাক-আশাক ছিল নাব লে দের স্যানসবুলেট নাম হয়েছিল। জনতার মুক্তিসংগ্রাম জনতার মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হবার পরে জনতার সুখে-দুঃখে, ভাবনায়-চিন্তায় জড়িত যে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়, তার সফল সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে।

এদিক দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা আর মুক্তিবাহিনী ফরাসী বিপ্লবকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে বিপ্লবের নেতা ড্যান্টনের অগ্নিবাণী- আমাদের চাই সাহস, আরও সাহস এবং আরও সাহস।

শ্রদ্ধা জানাবে একথা মনে রেখেই যে, বাংলাদেশেও এমন লড়াই করছে, যা আজ এবং আগামী যুগে-যুগান্তরে মুক্তিপ্রেমিক দেশদেশান্তরের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।...

(রণেশ দাশগুপ্ত রচিত)

পুতুল নাচের খেল

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মানুষ দখলীকৃত ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনে না। গত পঁচিশে মার্চের পর থেকেই ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে তারা বর্জন করতে শুরু করে। এখন এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের নারী, পুরুষ, শিশু

কেউ শোনে না। কে শুনবে? যারা নিজেদের চোখে দেখেছে মেঘনা নদীকে কারবালার রক্তরাঙা ফোরাত নদী হয়ে যেতে, যাদের চোখের সামনে হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, তারা কি করে বিশ্বাস করবে দখলীকৃত ঢাকা বেতারের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার? গল্পের পাগলা মেহের আলীর মতো অবস্থা হয়েছে ঢাকা বেতারের। মেহের আলী থেকে থেকে কেবল বলতো, সব ঝুট হ্যায়- সব ঝুট। ঢাকা বেতারও সেই মার্চ মাসের সাতাশ তারিখ থেকে কেবল চেঁচাচ্ছে, সব নর্মাল হায়- সব নর্মাল।

এবার রমজান মাসের শুরুতে যশোরের এক মুক্তাঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেখি মাগরিবের নামাজ ও ইফতার সেরে গ্রামের মসজিদের এক ইমাম সাহেব তার ট্রানজিস্টর রেডিও নিয়ে বসেছেন। নিবিষ্ট মনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনছেন। পরিবেশটি বড় চমৎকার। আকাশে চাঁদ নেই। মিটি মিটি জ্বলছে তারার প্রদীপ। কার্তিকের হিমেল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। যে পুকুরের পাড়ে ইমাম সাহেব বসেছেন, তার পানিতে ঝিকিমিকি তারার প্রতিভাস। ক'দিন আগেই এই গ্রামটিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে- তার চিহ্ন এখন নেই। হানাদারের পালাবার সময় কোন কোন বড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ধানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতিতে গ্রামের মানুষ আবার নতুন উৎসাহে ঘর বাঁধার কাজে হাত দিয়েছে। তাদের কেউ হারিয়েছে তার প্রিয়তম ভাইকে। কেউ হয়েছে পিতৃহারা। কারো যুবতী বোন লাঞ্ছিত হয়েছে বর্বর হানাদার দস্যুদের হাতে। কিন্তু তাতে কারো চোখে অশ্রুকণা নেই। সব অশ্রুকণা পুড়ে যেন ক্রোধের বারুদ হয়ে গেছে। সকলের মুখে, সকলের বুকে এক প্রতিজ্ঞা- মরতে হয় আরো মরবো, তবু হানাদারদের দেশছাড়া করবো।

ইমাম সাহেবের পাশে বসে আমি দেখছিলাম সোনার বাংলার সংগ্রামী রূপ। এই তো কার্তিকের হিমে ভেজা বাংলার সবুজ ঘাস। মাথার উপরে সাদা মেঘের কারুকাজ করা নীল আকাশ। ইমাম সাহেব নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম। এই গ্রামে আপনি কি একাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনেন, না সবাই শোনেন? ইমাম সাহেব হেসে বললেন, কি যে বলেন, সবাই শোনে। এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য আমরা সারাদিন পাগল হয়ে থাকি।

প্রশ্ন করলাম, এই অনুষ্ঠান শুনে কি লাভ হয় আপনাদের?

ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের আশা বাড়ে, সাহস বাড়ে, বুকের হিম্মত বাড়ে।

এরপরই আমার কাছে সরে এসে বললেন, একটা সত্য ঘটনা বলি শুনুন। তখনো আমাদের এই গ্রাম মুক্ত এলাকা হয়নি। পাকিস্তানী সৈন্যরা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে, দিনে-দুপুরে লুটপাট চালাচ্ছে, ঘরের মেয়েকে বেআব্রু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বুড়ো মানুষেরা তখন কেবল চোখের পানিতে ভাসি, আল্লাহকে ডাকি আর ভাবি, মুক্তিবাহিনীর নওজোয়ানেরা কবে আমাদের গ্রামে আসবে? আমার ছোট নাতিটির বয়স বছর দশ। সে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। আমি তাকে একদিন সাবধান করে দিলাম, বললাম- নানু, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনিস না। মিলিটারিরা জানতে পারলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। নাতি বলল, কতজনকে মারবে! এই গ্রামের সকলেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনে। কেউ ঢাকা বেতারে হুক্কামে মারশাল ল'-র অনুষ্ঠান শোনে না।

এর পরই নাতি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো- আচ্ছা নানা, হুক্কামে মারশাল ল'র অর্থ কি?

নাতির প্রশ্ন শুনে এই বুড়ো বয়সেও ঠাট্টার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, নানু, হুক্কামে মারশাল ল'-র অর্থ- মার শালাদের। এই শালা কারা জানো? ওই বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা। বৃদ্ধ ইমাম আর নাতির গল্প শেষ করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম, আপনার নাতির কথা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আপনি এবং আপনার এই মসজিদের অন্যান্য মুসল্লিরাও কি ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনেন না?

ইমাম সাহেব বললেন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। মুসলমানদের কাছে তো কবিরা গুনা। এটা পবিত্র রমজান মাস বাবা। আমাদের কাছে বড়ই পবিত্র মাস। এই মাসে মিথ্যা কথা বলার মতো শোনাও মস্তবড় পাপ। ঢাকা বেতার থেকে এই রমজান মাসেও রাত দিন যে মিথ্যা বলা হয়, আল্লাহর বান্দা, নবীর উম্মত হয়ে তা কেমন করে বরদাস্ত করি বাবা?... তবু মনকে চোখ ঠেরে না হয় ঢাকা বেতারের প্রাচারই বিশ্বাস করলাম, কিন্তু এর পরই একদিন শুনলাম নতুন প্রচার। শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানের মিলিটারি সরকার বর্ডারে অভ্যর্থনা শিবির খুলেছেন। শুনে আমরা সবাই বেকুব! ঢাকা বেতারই এতদিন বলে এসছে, যারা দেশ ছেড়ে গেছে তারা দৃষ্কৃতকারী, তারা ভারতের চর। এখন সেই দৃষ্কৃতকারী ও ভারতের চরদেরই আবার ফিরিয়ে আনার জন্য অভ্যর্থনা শিবির খোলা কেন?

এটা গেল জুলাই মাস পর্যন্ত প্রচার। আগস্ট মাস ও সেপ্টেম্বর মাসে শোনা গেল নতুন কথা। দলে দলে শরণার্থী ভারত থেকে দখলীকৃত বাংলাদেশের ফিরে এসেছে। ঢাকা বেতর থেকে বলা হলো, রোজ হাজারে হাজারে মানুষ ফিরে আসছে। আগে যারা বলেছিলেন, মুষ্টিমেয় দৃষ্কৃতকারী দেশ ছেড়েছে- তারা পরে কি করে বললেন, হাজারে হাজারে দেশত্যাগী ফিরে আসছে? এটা যে বাবা আমাদের সেই পুঁথির বয়ানের মত-

লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতারে

শুমার করিয়া দেখি চল্লিশ হাজার।

মাঝখানে ঢাকা বেতারের মুরুব্বিরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের মিথ্যা প্রচার বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই ফাঁক বুঝে এক সময় বলা হলো, ভারতে কিছু শরণার্থী গেছে বটে, কিন্তু তাদের ভয় দেখিয়ে ও লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোন বাবা কথা। বিদেশের রেডিওতেও শুনেছি, বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে নব্বুই লাখ শরণার্থী গেছে। কেউ লোভ দেখিতে বা ভয় দেখিয়ে এতগুলো লোককে রাতারাতি দেশছাড়া করতে পারে? আর যদি তা পারাই যায়, তাহলে তোরা কেন বাপু ভারতের অন্তত এক হাজার লোককেও ভয় দেখিয়ে, কি লোভ দেখিয়ে তোদের দিকে নিয়ে আসতে পারিস না? দেখা না তোদের কথার সত্যতা!।

ইমাম সাহেব থামলেন, দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, কত আর বলবো বাবা, বললে কিসসা ফুরায় না। সারা আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে শুনেছি, ভারত থেকে হাজার হাজার শরণার্থী ইয়াহিয়া খানদের অভ্যর্থনা শিবিরে ফিরে যাচ্ছে। যে হারে হিসাব দেয়া হয়েছে, তাতে এতদিনে নব্বুই লাখ লোকেরই দেশে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন ওই ঢাকা বেতারেই তাঁবেদার গভর্নর মল্লিক মিয়ার একটা ভাষণ শুনলাম। মল্লিক মিয়া বলেছেন, ভারত রাজি হলে তারা বিমান পাঠিয়ে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবেন। শোন বাবা কথা! এতদিন তোরা বল্লি সব শরণার্থী ফিরে গেছে। তাহলে বিমানে কবে কাদের আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছিস? এ জন্যই কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তির কম। আগে জেনেশুনেও ওরা কত মিথ্যা বলতে পারে, তা যাচাই করার জন্য ঢাকা বেতর ধরতাম। এখন আর ধরি না। এই রমজান মাসে মিথ্যা শোনাও পাপ। বাবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এই কথাটা কেন তোমরা ঢাকা বেতারকে জিজ্ঞাসা কর না- প্রত্যেক দিন এত মিথ্যা কথা বলতে ওদের জিহবা আড়ষ্ট হয়ে যায় না? ঈমান কমজোর হয়ে যায় না? আমি বাবা এখন ঢাকা বেতার ধরি না। কেউ ধরে না। খামোখা কেন মিথ্যা কথা শুনে গুণাহ্গার হই বলো! তার উপর এখন তো আবার রমজান মাস।

ইমাম সাহেবকে বললাম, এ নিয়ে দুঃখ করবেন না। দখলীকৃত ঢাকা বেতারে এখন চলছে পুতুল নাচের খেল। পুতুলকে দিয়ে যা বলানো হচ্ছে, তাই তারা বলছে। যে খেল খেলানো হচ্ছ তা-ই তারা বলছে। মেফিস্টোফিলিস আর ফাউস্টের কাহিনী আপনি জানেন না- শয়তানের কাছে আত্মা বন্ধক রেখে এক সাধুর কি পরিণতি হয়েছিল। ঢাকা বেতারেরও এক শ্রেণীর ভাড়াটা বুদ্ধিজীবী তাদের আত্মা, বিবেক, সততা ও মনুষ্যত্ববোধ কয়েকটা টাকার বন্ধক রেখেছে খুনী দস্যু ইয়াহিয়া চক্রের কাছে।

ইমাম সাহেব কি বুঝলেন জানি না। দুঃখিত স্বরে বললেন, বাবা, এর কি কোন প্রতিকার নেই? তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আছে এবং সেই প্রতিকারের দিনও খুব দূরে নয়। শিগগিরই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ঢাকা বেতার কেন্দ্রসহ সারা দখলীকৃত এলাকা মুক্ত করবে। আবার ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আপনারা শুনতে পাবেন মুক্ত বাংলার মুক্ত কণ্ঠ, সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা।

ইমাম সাহেব ভাবাবেগে অশ্রুপূর্ণ চোখ মুছে বললেন, আমিন, আমিন। ইয়া আল্লা, রব্বুল আলামিন, বাংলাদেশের সেই সুদিন যেন দেখে যেতে পারি।

কার্তিকের সেই স্বপ্নসন্ধ্যায় ইমাম সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ

১১ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের মানুষের কাছে এখন সবচেয়ে আলোড়নকারী ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলের মানুষের চোখ বাংলাদেশের ওপর- সেখানে কি ঘটছে, কি চলছে সেখানে। কিন্তু জল্লাদ ইয়াহিয়ার মিথ্যা প্রচারণার কুয়াশা ভেদ করে বাংলাদেশের ঘটনাবালী সঠিক চিত্র কি সব সময় তাদের চোখে ধরা পড়ছে? তারা কি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের বর্তমান রূপ, তার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত চেহারা? বাংলাদেশ এখন আক্রান্ত। হানাদার বর্বর দস্যুরা তার বুকের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সেখানে সত্য নেই, ন্যায় নেই- মানুষের মুল্যবোধ মৃত, সেখানে এখন প্রচলিত মিথ্যা, উন্মাদ লালসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সেখানে কেবল-

জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া

নির্বিচারে নির্ববাদে সওয়া

শবের সংসর্গ আর শিবার সদভাব;

বর্তমান আক্রান্ত বাংলাদেশকে যদি আপনার জানতে চান, যদি তার পূর্ণাঙ্গ ছবি মানসচক্ষে অবলোকন করতে চান, তাহলে পিশাচের উপজীব্য জীবনকেই সেখানে খুঁজতে হবে। কারণ পাশবিকতাই এখন সেখানকার মৌলনীতি। কিন্তু এইসব নয়। এই রক্তাক্ত, নিপীড়িত বাংলাদেশের মাটি থেকেই লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের কংকাল থেকেই বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশের জাগ্রত তারুণ্য। তারা যুদ্ধ করছে মিথ্যার বিরুদ্ধে, পাশবিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ করছে- আর তার নামই বাংলাদেশ। তাই আমরা হতাশ হইনে, হতাশ হবো না।

বিশ্বের বিবেকমান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আছে আমাদের এই সংগ্রামে, অস্তিত্ব রক্ষার এই যুদ্ধে। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশের একটি মানব হৃদয়ও ব্যথিত হয়নি বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলীতে। সব অঞ্চলের সব দেশের বিবেকমান মানুষের মন এই ঘৃণ্য বর্বরতায় বিষায়িত হয়েছে, প্রতিবাদ করেছেন তারা। আর সেই হলো আমাদের পুরস্কার, আমাদের স্বীকৃতি। পশুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল মানুষের কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তারই অন্তর্ভুক্ত। ...

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চূড়ান্ত বিজয়ের পথে। যতই দিন যাচ্ছে, নৈতিকতাহীন, বর্বর হানাদার সেনাবাহিনীর মনোবল ও শক্তি ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিজয় ও সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন। বিশ্বের সব প্রভাবশালী পত্রপত্রিকা মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কথা স্বীকার করেছেন। 'নিউজউইক' ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি ও পাকিস্তানী হানাদার খান সেনাদের চরম নাজেহাল হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিক ও সংবাদ ভাষ্যকারদের মতে, হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আর দীর্ঘদিন এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশে তাদের প্রভূত্ব বজায় রাখতে পারবে না, তাদের মৃত্যু আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী।

এর পরেও মধ্যযুগীয় বর্বরতার নায়ক জল্লাদ ইয়াহিয়া তার মিথ্যা অপপ্রচারের দ্বারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কারণ তার খোয়াব ভাঙতে এখনো কিছু বিলম্ব। কিন্তু ইয়াহিয়া, তোমার খোয়াব যেদিন ভাঙবে, সেদিন দেখবে কি নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর বাস্তব তোমার সম্মুখে।

দস্যু ইয়াহিয়া বাংলাদেশে পুতুল সরকার খাড়া করে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। সম্প্রতি একজন বিদেশী সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে তার বাংলাদেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের পুতুল মন্ত্রিসভার যে ঠাঁট ইয়াহিয়া দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। মন্ত্রী সাহেবরা থাকেন মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে। হাজার চেষ্টা করেও তাদের সাক্ষাৎ মেলেনি। আর বাংলাদেশের মালেক মন্ত্রিসভার কোনো আছে অস্তিত্ব বলেও মনে হয় না। এইসব মন্ত্রীদের জনসাধারণ কেউ চেনে না। বরং সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। মৃত্যু, নির্যাতন সবকিছু উপেক্ষা করে ঢাকার অধিবাসীরা পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসছেন। ফলে হানাদার বাহিনীর দিশেহারা হওয়ার জোগাড়।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের প্রবল চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে সামরিক সাজসরঞ্জাম রপ্তানির লাইসেন্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঘোষণায় এই তথ্য জানা গেছে। এদিকে চীনে গিয়ে মি. ভুট্টো বড়ো বেশি কল্কে পাননি। বরং চীনা অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিং পেং ফেই বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তসঙ্গত সমাধানের প্রতিই পাকিস্তানকে সচেষ্ট হতে বলেছেন। ফরাসী সরকার বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন এবং এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক ফ্রান্স সফরকালে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে এই মতামত প্রকাশ করা হয়। পশ্চিম জার্মানীর চ্যালেন্সর উইলি ব্রান্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিম সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে পশ্চিম জার্মান সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

কিন্তু এখনো বাংলাদেশের মানুষ মরছে, গৃহ অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। এখনো দলে দলে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এখনো অন্ধকার রাত্রির শেষ হয়নি। তারা সকল চোখে অসহায় দুটি হাতে তুলে তাকিয়ে আছে সত্য ও ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড করে নেমে আসবে, কবে, কবে। কবে শেষ হবে এই কালরাত্রির কুটিল অন্ধকার? শেষ এর হবেই। এতো রক্ত, এতো মায়ের চোখের জল, বুকফাটা কান্না, সকরুণ প্রার্থনার বাণী ব্যর্থ হতে পারে না :

বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার ও অশ্রুধারা
এর যতো মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?

রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্নিল যাবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দেবে না দেখা
দেবতার অমর মহিমা?

(মহাদেব সাহা রচিত)

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এখন চরম বিজয়ের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে, অমিতবিক্রম মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশই তারা সংগঠিত হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছেন, দুর্বার দুর্জয় হচ্ছেন। আর অন্যদিকে সেই সঙ্গে যতই দিন যাচ্ছে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী ততই দুর্বল হচ্ছে, মনোবল ও নৈতিক সাহস হারাচ্ছে। এর কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তারুণ্য ও নৈতিক মনোবল হানাদার দস্যুদের নেই। তারা পাশবশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটি নবজাগ্রত জাতির স্বাধীনতার আকাংক্ষাকে পদদলিত করে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম রাখতে। আর সেই শাসন কায়েম রাখতে গিয়ে তারা নির্বিচারে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণের পাশবিকতার পথ অনুসরণ করেছে। নীতিবোধ, মনুষ্যত্ব, মানবিক ন্যায়বিচার সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে তারা দস্যু ও তস্করের নির্লজ্জ বর্বরতার ভূমিকায় নেমেছে- যেখানে তারা বন্যপশুর মতোই আদিম, হিংস্র ও নৃশংস। তাদের কাছের ন্যায়নীতি, সুবিচার, যুক্তি কিংবা মনুষ্যত্বের কোনো মূল্য নেই। নিষ্ঠুরতায় তারা বন্যজন্তুর মতোই অন্ধ, বর্বরতার তারা মধ্যযুগীয় হার্মাদ দস্যুদের মতোই হিংস্র ভয়ংকর।

বিপরীত দিকে বাংলাদেশের তরুণ যারা যুদ্ধ করছেন, তাদের সংগ্রাম নিজেদের মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম, মায়ের লজ্জা, বোনের অপমান, পিতার অমর্যাদার প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রাম। তাদের রক্তে মায়ের বোনের ভায়ের রক্তের প্রতিজ্ঞা জড়িত। তাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ঐ হানাদার বর্বর দস্যুরা বন্দী পশুর মতোই অসহায়, দুর্বল। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা। বাংলাদেশে উড়ছে স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা, সেই সঙ্গে বিশ্বমানবতার মনের ভূগোলে অর্জিত হচ্ছে তাদেও জন্যে সমর্থন ও শুভেচ্ছার রক্তকুসুম। পৃথিবীর দিকে দিকে উড়ছে তারই উজ্জ্বল মানবিক পতাকা। তাই ওদেও যেখানে শেষ; আমাদের সেখানে শুরু।

বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক 'নিউজউইক' লিখেছেন, সামরিক ও রাজাকার বাহিনীর ক্রমাগত অত্যাচার বাংলাদেশের মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারিনি। বরং অত্যাচার যতই বাড়ছে, বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার মনে প্রতিশোধের স্পৃহা ততই প্রবল হচ্ছে। ঐ সাপ্তাহিকের বিশেষ প্রতিনিধি সিনিয়র সম্পাদক আর নো দ্যা বোরচাগ্রাফ বলেছেন, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর এখন মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সারা বাংলাদেশের মানুষ আজ প্রতিশোধ চায়। 'শিকাগো নান টাইমসের' সহযোগী সম্পাদক মি. রবার্ট ই, কেনেডি বলেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতি তার কাছে হতবুদ্ধিকর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সমস্যাটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী নন বলেও তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মি. কেনেডি স্বীকার করেছেন যে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য আসন্ন এবং তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধেও বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয়। মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইমস এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের একটি দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- পাকিস্তান একটি ডুবন্ত কুকুর। তার মাথা জলের নিচে ঠেসে ধরার কোনো প্রয়োজন নেই ভারতের।

মস্কোর প্রভাবশালী রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস'-এ বিশিষ্ট সোভিয়েট লেখক মি. উলানুকী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, পাকিস্তানের নিষ্ঠুর নিস্পেষণই স্বাধীন বাংলাদেশের দাবীর জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে মি. উলানুকী বলেছেন, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতেই বাঙালীরা অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। বৃটেনের উদারনৈতিক দৈনিক 'গার্ডিয়ান' বলেছেন, পাকিস্তান এখন নিঃসঙ্গ ও বন্ধুবিহীন। যুদ্ধ বাধলে তাকে একাই তার ফল ভোগ করতে হবে। 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাও পাকিস্তানের এই নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছে, যতক্ষণ না ইয়াহিয়া বাংলাদেশ সমস্যার একটি যথার্থ রাজনৈতিক সমাধান না চাচ্ছেন, ততক্ষণ তার বন্ধুহীনতা কেবল বাড়তেই থাকবে।

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রী মিঃ রিচার্ড উড বাংলাদেশ সমস্যার যথার্থ রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার যুক্তগ্রাহ্য সমধান ছাড়া শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারে না। আর এই যুক্তগ্রাহ্য সমাধানের অর্থই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মার্কিন সিনেটর উইলিয়ম স্যাকসবি বলেছেন, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার কোন সমধান হতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেম সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে হলে প্রথমেই শেখ মুজিবের মুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাকে তিনি ইতিহাসের অন্যতম শোচনীয় ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে মার্কিন সরকারকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে- আর সেই সঙ্গে বিশ্বমানুষের সমর্থনপুষ্ট মানবতার পতাকাও উড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। কেননা ন্যায়, সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হয় না।

(মহাদেব সাহা রচিত)

পিণ্ডির প্রলাপ*

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খাঁ আর তার জল্লাদ বাহিনীর তোতাপাখীগুলা সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একই শেখানো বুলি আউড়ে চলেছে রেডিও গায়েবি আওয়াজে গ্রামোফোন কোম্পানীর কুকুরের ছবিওয়ালা সেই রেকর্ডের মতো। পিন দিয়ে চড়িয়ে দিলেই হোল কলেরগান বাজতে শুরু করবে। বাঁধা গতে গান হবে। সকাল-সন্ধ্যা-রাত-যখনই শুনুন না কেন, পড়ানো লবজই বেতারের একমাত্র পুঁজি। সকালবেলা উঠে শুনতে পাবেন, 'অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।' দুপুরে-'দেশপ্রেমিক জনসাধারণ দৃষ্কৃতকারীদের প্রশ্রয় তো দিচ্ছে-ই না বরং সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিচ্ছে।' এরপর রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে পিন পাল্টে দেয়া হবে। আর তোতার কণ্ঠে শোনা যাবে- 'একদল অনুপ্রবেশকারী আমাদের সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের সেনাবাহিনী শুরুতেই তাদের বাধা না দিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরে সময়মতো আক্রমণ চালায়। আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে অনুপ্রবেশকারীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়।' এর পরেই একটি অস্ত্রপাতির লম্বা ফর্দ পেশ

---

* 'পিণ্ডির প্রলাপ' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলো তোয়াব খান রচিত।

এবং হতহাতের সংখ্যা বহু বলে উল্লেখ করা হবে। সবশেষে বলা হবে, 'কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' দিনের পর দিন তোতার কণ্ঠে রেডিও গায়েবী আওয়াজের এই বাণীই শুনতে পাওয়া যাবে। অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাও আবার কয়েক হাজার, কিন্তু তোমার প্রভুর ক'জন বরকন্দাজ মারা গেল সে সম্পর্কে গায়েবী আওয়াজ একেবারেই চুপ।

সমরবিদ্যার সবচেয়ে খারাপ ছাত্রটিরও পেটের পিলে এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে ফেটে যেতে পারে হাসতে হাসতে। সীমান্তের কয়েকশ' গজ ভেতরে, হতাহতের সংখ্যা বহু, কয়েকজন গ্রেফতার'- অর্থাৎ সঠিক সুস্পষ্ট কোন তথ্য তোতার মুখে ভুল করেও শোনা যাবে না। যদি প্রশ্ন করা যায়- মাথা খারাপ হয়েছে, ও কথা মুখে আনবেন না। কোন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা সাফ মানা। তার উপর তোতা কি প্রশ্ন করতে পারে? কিন্তু মুশকিল হোয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানীর তোতা আর তার প্রভু ছাড়াও বাইরের যে জগতটি রয়েছে তাকে নিয়ে তারা তো তোতা নয়, তাই প্রশ্ন তারা তুলছে। বলছে, নাদীর শাহের বংশধর আর গোয়েবলসের মন্ত্রশিষ্যারা হাতে কোন সুস্পষ্ট তথ্য থাকলে ছাড়ুন। কয়েক হাজার অনুপ্রবেশকারী, কয়েকশ' গজ ভেতরে, কয়েকজন গ্রেফতার, হতাহত বহু- এসব কথা শুনলে তো পাগলেও হাসবে।

বাংলাদেশে কি ঘটেছে বা এখন কি ঘটছে, সে সম্পর্কে তোতার মুখের কাহিনীর ছাড়া অন্য কিছু যাতে দুনিয়ায় প্রচারিত না হয় তার জন্যই ইয়াহিয়া খাঁর আর সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমেই সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। পরে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদের মুখে নিজেদের ইচ্ছমত বাছাই করা সাংবাদিককে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। সেই সঙ্গে বলে দেয়া হলো- অমুক অমুক জায়গায় যেতে পারবেন না, তমুক তমুক কথা লিখতে পারবেন না। অমান্য করলে হয় ফাটক, না হয় লেখা গুম। এতসব বাধানিষেধ সত্ত্বেও বিদেশী খবরের কাগজগুলো যা লিখছে, তাতে জঙ্গীশাহীর বিচারের বেলুনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

'নিউজউইক' পত্রিকার কথাই ধরা যাক। এই মার্কিন সাপ্তাহিকীটির সাথে সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য বলেছিলেন। সেই কাগজই লিখেছে, ইয়াহিয়ার সরকার যাদেরকে অনুপ্রবেশকারী, ভারতীয় চর বলছে, তারা তো শুরু থেকেই লড়ছে সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে। এরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কিছুই নয়। পত্রিকাটিতে ভারতীয় গোলাবর্ষণের পাকিস্তানী অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, শেলগুলো পরীক্ষা করলেই যে কোন পর্যবেক্ষক বুঝতে পারবেন- এগুলো নিকটপাল্লার কামান বা দু'ইঞ্চি মর্টার থেকে বর্ষিত হয়েছে। দূরত্ব বিচার করে একথা অনায়াসে বলা বলে, ভারত থেকে বর্ষণ করলে শেলগুলো এত দূরে আসতে পারে না। বিলেতের কাগজগুলো বলছে, বিবিসি বলছে, ফ্রান্সের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র 'লামদ' বলছে একই কথা। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তোতার শেখানো লবজ তা পাল্টে যাবে না।

এরপর ধরুন না 'অবস্থা স্বাভাবিক, দেশপ্রেমিকেরা দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিচ্ছে' তোতার এ বাণীর কথা। দেশপ্রেমিক নাগরিকরা জঙ্গিশাহীর সাথে এমনই সহযোগিতা করছেন যে, এখন তাদের উপর পিটুনি ট্যাক্স ধার্য করতে হচ্ছে জঙ্গীশাহীকে। এতেও যদি নিজেদের দৈন্য প্রকাশ না পায়, তবে 'দৈন্য' শব্দের আধিধানিক অর্থই পাল্টে ফেলতে হবে। বিবিসির ভাষ্যকারের মতে, পিটুনি ট্যাক্স ধার্য থেকে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, জঙ্গীশাহীর এ দাবির অসারতা দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পেরেছে। শুধুই তাই নয়, মুক্তিবাহিনীর লোকজন বাংলার মানুষের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাচ্ছে, এ থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। গার্ডিয়ান, ডেলি টেলিগ্রাফ ও বিবিসির মতে, বাংলাদেশের মাইলে পর মাইল এলাকায় ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বা তার ক্রীড়নক সরকারের কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি ইয়াহিয়ার চামুর দল রাতের বেলা কোথাও বের হতে সাহস করে না।

মুক্তিবাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জঙ্গিশাহীর এই যখন হালহকিকত, সৈন্যদলের মোর‍্যাল ঠিক রাখার জন্য তখনই খাঁ সাহেবরা গোয়েবলসের প্রেতাত্মার ঘাড়ে ভর করেছেন, তাই প্রতিদিন কুৎসা আর মিথ্যার বোঝা তাদের বেড়েই চলেছে। কিন্তু এমন দিন আর দূরে নয়, যখন মিথ্যার বোঝা চাপা পড়ে জঙ্গীশাহীকে পুঁজিপাটাসমেত পৈত্রিক প্রাণটাও হারাতে হবে।

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

একেবারে গোমড় ফাঁক! ইয়াহিয়া খাঁর জবর বাক্যবাগীশ জেনারেল এ, এ, কে নিয়াজীকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে মার্কিন কাগজ 'নিউজউইক'। এত জাঁক করে তিনি বলেছিলেন, মার্চে যা করেছি, প্রয়োজনবোধে আবার তা করবো ঢাকার রাজপথে। আমাদের ট্যাঙ্কগুলো অপেক্ষা করছে। কিন্তু নিউজউইর্কের সিনিয়র এডিটর আরনড-দ্য-ব্রচগ্রেভ তো আর নিয়াঁজীর ক্যান্টনমেন্টের সিপাই নয়। সাফ বলে দিয়েছেন, জেনারেল তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছো। পায়ের তলায় মাটি যে কতটা সরে গেছে তার খবর রাখ না। বাংলাদেশের শতকরা ২৫ ভাগ থানার উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। মুক্তিবাহিনীর কর্তৃত্ব সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। খোদ ঢাকার উত্তরাংশ এখন মুক্ত।

বাংলাদেশের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান শেষ করার লম্বা-চওড়া আশ্বাসদানীকারী নরঘাতক জেনারেল টিক্কা খানের সর্ববৃহৎ বেলুনটি চুপসে যাওয়ার সাথে সাথেই এ, এ, কে নিয়াজীর আবির্ভাব। পাঞ্জাবের সাবেক সামরিক প্রশাসন এই জেনারেলের ভূমিকা সামরিক চক্রের জঘন্য ষড়যন্ত্রগুলিতে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। '৬৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-মার্চ যখন সারাদেশ গর্জে উঠেছিল আইয়ুবের স্বৈরাচারী কুশাসনের বিরুদ্ধে, হরতাল মিছিল আর ঘেরাওয়ে প্রকম্পিত হয়েছিল সামন্ত প্রভু একচেটিয়া পুঁজিপতি আর সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ, পশ্চিমী আমলারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছিল সামরিক অফিসারদের বাড়িতে বাড়িতে সেই সময়ে এই নিয়াজীকে দেখা যায় ঝিলামের একটি সামরিক ছাউনি এলাকায় অফিসারদের সাথে সলাপরামর্শ করতে-সংগঠিত করতে। '৬৯ সালের ২৫ মার্চের ইয়াহিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ বলেছিল, জেনারেল নিয়াজীর-যাকে সামরিক চক্র টাইগার নিয়াজী বলে অভিহত করে থাকে- নেতৃত্বে একদল অফিসার এই মর্মে আলটিমেটাম দিয়েছিল যে তারা বাংলাদেশের তথাকথিত অরাজকতা কোনমতেই বরদাস্ত করতে রাজি নয়। তাদের মতে, এই সময়ে যা চলেছে তাকে বাড়তে দিলে সব যাবে। শোনা যায়, ঝিলামের সেই কুখ্যাত বৈঠকেই ঠিক করা হয়েছিল, বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য যদি দরকার হয় তবে লক্ষ লক্ষ লোককে সাবাড় করে দেওয়া হবে। শহরে-নগরে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের উপর প্রয়োজনবোধে চালানো হবে ট্যাঙ্ক। তবে নিয়াজীর বড় আফসোস ছিল '৬৯ সালেই এগুলো ঘটেনি বলে। অতএব নিয়াজী এ্যান্ড কোম্পানীরা বাংলাদেশের গণহত্যার ব্লুপ্রিন্টটা দু'বছরের জন্যে কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিয়েছিলেন। তাই '৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশের মানুষের অসহযোগ আন্দোলনের আলোতেই এইসব জেনারেলরা তাদের বিপদের সংকেত দেখতে পেলো। কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন। তাই তারা চক্রান্তের জাল ফেলতে শুরু করলো একে একে। অবশেষে এলো ২৫শে মার্চের সেই কালোরাত। টিক্কা খাঁর সাথে সাথে জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশে এলেও প্রেক্ষাপটে তার আগমনবার্তা ঘোষিত হয়নি। কিছুটা নেপথ্যেই রয়ে গেলেন তিনি। দায়িত্ব দেওয়া হলো বাঙালী নিধনের অপারেশনের। তারপর একদিন রণাঙ্গণে তার আবির্ভাব সামরিক প্রশাসন ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমাণ্ডাররূপে।

কিন্তু এবারে জেনারেল সাহেবের এস্টার্ন কমান্ড একোবরেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে মুক্তিবাহিনীর গোলা আর বুলেটের আঘাতে আঘাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজাকার নামক একদল ক্ষুদে ডাকাত সৃষ্টি করা হলো, যাদেরকে 'নিউজউইক' পত্রিকা 'রাস্তার বখাটে তস্কর দল' বলে অভিহিত করেছে। পত্রিকাটির মতে, "হাতে অস্ত্র আছে বলে রাজাকারদের দল নিজেদের খোদা বলে মনে করে। যত্রতত্র নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণের কাছ থেকে

টাকা-পয়সা আদায় করছে। যারা তাদের আশ্রয় দিতে বা মেয়েলোক সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে হত্যা করছে গুলি করে। এরপর মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় অভিযানের সামনে সেনাবাহিনী প্রথমেই ঠেলে দিচ্ছে এইসব নির্বোধ রাজাকারের দলকে।”

এসব সত্ত্বেও জেনারেল নিয়াজীর লম্বা-চওড়া দাবি কেন? নিউজউইকের মতে, পরাজয়ের গ্লানি কিছুটা লাঘবের জন্য জেনারেলের জল্লাদ বাহিনী নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, ব্যাপকাকারে চালাচ্ছে লুটতরাজ। সংবাদদাতা ঢাকার ডেমরা এলাকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যদল এই গ্রামটি ঘেরাও করে ১২ থেকে ৩৫ বছরের প্রত্যেকটি মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং ১২ বছরের উপরের সকল পুরুষকে হত্যা করে। এই হত্যা, লুণ্ঠন ও পাশবিকতায়ও শেষরক্ষা যে অসম্ভব, বাংলার দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে একবার তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

মিথ্যোবাদী রাখালের কান্নায় ভিজে তার মহাপ্রভু শ্বেতপ্রাসাদ থেকে একেবারে দূরপাল্লার টেলিফোন করে বসেছেন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে। অভিপ্রায়- কিভাবে বাঁচানো যায় রাখালটিকে। স্বস্তি পরিষদের বৈঠক-টৈঠক কিছু করা যায় কিনা, তারই শলাপরামর্শ নাকি চলছে। হাজার হলেও এই রাখাল আর তার দেশ দীর্ঘদিন ধরে সাথে সাথে আছে সবকিছুতেই। সেই বাগদাদ চুক্তি, সিটো আর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি থেকে শুরু করে সব সময়ে দুর্দিনে-সুদিনে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে পিণ্ডির জঙ্গীচক্র। ’৫৮ সালের ইরাকী বিপ্লবের পর বাগদাদ জোট থেকে খোদ বাগদাদ খসে পড়ার পরও পিণ্ডির জঙ্গীচক্র উৎসাহী দোসর হিসাবে পাশ্চাত্যের সাথে থেকেছে সেন্টো চুক্তির বাঁধনে। আর এশিয়ার মাটিতে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও পিণ্ডির জল্লাদের দল কোন সময়েই সিটো জোট থেকে সরে দাঁড়ায়নি। অতএব এ ধরনের একটি বিশ্বস্ত দালালকে তো রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জাতিসংঘ নামক সংস্থাটির সনদ নিয়ে। এই সনদ অনুযায়ী একমাত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত অবস্থা দেখা দিলেই শুধু স্বস্তি পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পিণ্ডির জঙ্গীচক্র এখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি, যাকে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হওয়ার মত পরিস্থিতি বলে অভিহিত করা চলে। অন্যদিকে জঙ্গীচক্রের বরকন্দাজেরা একথা ক্রমান্বয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, বৈদেশিক হামলা-টামলা নয়, মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণেই এখন তারা চোখে সর্ষের ফুল দেখতে শুরু করেছে। বরকন্দাজ দলের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজী তো খোলাখুলিভাবে বলেই ফেলেছেন যে, একমাত্র ঢাকাতেই দু’হাজার গেরিলা সক্রিয় রয়েছে। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ বলছে, যশোরের চৌগাছার কাছে লড়াই চলছে। তবে কিনা মুক্তিবাহিনী এখনও সরাসরি যুদ্ধ করার পর্যায়ে যায়নি। আতএব জঙ্গীচক্র শীঘ্রই চৌগাছা আবার দখল করতে পারবে-এই তাদের আশা! বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রেডিও গায়েবী আওয়াজ এটা প্রচার করলেও একটি সত্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়- চৌগাছায় মুক্তিবাহিনীর সাথেই জল্লাদ দলের লড়াই চলছে। অতএব বৈদেশিক আক্রমণের জুজুটা যে একেবারেই নির্জলা মিথ্যা, এটা রেডিও গায়েবী আওয়াজও স্বীকার করে নিল। এ অবস্থায়, অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর সাথে জল্লাদ দলের লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে শ্বেতপ্রাসাদের মহাপ্রভূরো রাখার বালকের জন্য তাদের উদ্বেগকে নিয়ে স্বাস্তি পরিষদের কোথায় রাখবেন? আন্তর্জাতিক আইন-কানুনেই তা স্পষ্টই ধোপে টেকে কি করে? বাংলার মানুষের মুক্তিসংগ্রোমের আট মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ আট মাসের তীব্র ও তিক্ত সংগ্রামকালে যাদের মুখ থেকে এমনকি সমবেদনার একটি কথাও শোনা যায়নি। আজ তারা এতই উদ্বিগ্ন যে, স্বস্তি পরিষদে হাজির হওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবছেন। অবশ্য মিথ্যেবাদী রাখালটিকে নিয়ে শ্বেতপ্রসাদের মহাপ্রভুরা উদ্বেগে আজ সোচ্চার হলেও নতুন কিছু নয়।কিছুদিন আগে ছ’জন সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্তদল গঠনের কথা তারা ঘোষণা করেছিলেন। এটার মাধ্যমে তারা আসর জাঁকাতে চেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঐ রাখাল বালকটিকে কিছু কিছু সুপরামর্শও দেয়া হয়েছে। এবং সেই অনুযায়ী বাংলার গভর্নর পদে আবদুল মোতালিব

মালিক নামক জনৈক দালাল দন্তচিকিৎসককে বসানো হয়েছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনগণের কাছে পরিত্যাক্ত কতিপয় রাজনীতিককে নিয়ে একটি তথাকথিত বেসামরিক সরকারও খাড়া করা হয়েছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রহসনকে তথাকথিত 'সুবিচার' হিসেবে দেখানোর জন্য একজন অনুমোদিত কৌঁসুলি দেয়া হয়েছে। আরো শোনা যায়, মার্কিনী সুপারিশ অনুযায়ীই গঠন করা হয়েছে রাজাকার বাহিনী, দেখানো হয়েছে সাধারণ ক্ষমার প্রহসন।

বাংলাদেশের মানুষ, সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কেউই এই ধরনের কোন ফাঁদে পা দেননি। সকলের কাছেই এই ধরনের সুকৌশল-চাতুর্যের আসল মতলবটা সব সময়ই ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। এবার তাই মরণোন্মুখ রাখাল বালটিকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টা শুরু হয়েছে শ্বেতপ্রাসাদ আর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে। যে সংস্থা বাংলার লাখ লাখ মানুষ হত্যার, গণহত্যার অভিযোগ শুনতে চায়নি, জল্লাদ দলের অত্যাচারে পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বিদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি মানুষের আকুল আবেদন যাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, তাদের নতুন যেকোন চক্রান্ত বাংলার মানুষ বানচাল করে দেবে। হানাদার বাহিনীকে চিরতরে খতম করে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে অম্লান অক্ষয় রেখেই সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এই নতুন চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

স্বস্তি পরিষদ বা সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা মার্কিন চক্রান্ত একের পর এক চলতে থাকলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। এটা অস্বীকারের অর্থ সকালের নবীন সূর্যের আলোকরশ্মি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। নিরাপত্তা পরিষদে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে কতিপয় পেটুয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে এবং চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ তথা ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছে। আর তাদের সাথে এ ব্যাপারে ভিড়ে গেছে ইসলামের বেশধারী কতিপয় ইসলামপন্থী রাষ্ট্র। কিন্তু জাতিসংঘে যত তাড়াহুড়ো করেই তারা প্রস্তাব পাস করুক না কেন বাংলাদেশের পিণ্ডির জল্লাদ দলের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দুর্বার অভিযান তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। জাতিসংঘের ফরমান বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তানী হানাদারদের প্রতিরোধের সকল প্রাচীর ধসে পড়বে, এটা এখন প্রায় সুনিশ্চিত। সত্যি কথা বলতে কি, জাতিসংঘ নামক ঠুঁটো জগন্নাথকে রবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আর পাচ্ছে না বা এ সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না। বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার যে সূর্য আজ আপন মহিমায় বিকশিত হয়েছে তাতে কলঙ্কিত করার মওকা পাক-দোস্ত চীন বা পিণ্ডির মহাপ্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের রবার স্ট্যাম্প জাতিসংঘ পাবে না।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে সংগ্রাম শুরু করেছেন মহান গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতির পর তা আজ এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মুক্তাঞ্চলে নবজীবনের রূপায়নের মহান দায়িত্ব আজ মুক্তিসংগ্রামী সকলের উপর বর্তেছে। তারাই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সুখী শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নকিব। এজন্যই প্রথমে মনে রাখা দরকার, আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও মূলনীতির কথা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ তাদের সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীন বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মূলনীতি জানিয়ে দিয়েছেন। এই নীতির ভিত্তি হলো ধর্মনিরেপক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তারা বলেছেন, মানুষের উপর মানুষের শোষণের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক ব্যবধানের অবশ্যই বিলোপ সাধন করতে হবে। আজ তাই এমনভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ উপকৃত হয়। যাতে শ্রমিক-কৃষক পায় সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের জীবনযাত্রার পুনর্বাসনের জন্য।

বস্তুতঃপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোটি কি ধরনের দাঁড়াবে তার একটি মোটামুটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে। এতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা ভারী ও বৃহৎ শিল্পসহ পাট, তুলা, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি সমেত আমদানী-রফতানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্বকরণের কথা বলা হয়েছে। ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং কর কাঠামোর প্রগতিশীল রূপায়নের দিকও নির্দেশিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টেতে। যেহেতু বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান ও কৃষিনির্ভর দেশ সেহেতু গ্রামবাংলার উন্নয়ন তথা কৃষির পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। দারিদ্র্য তার সর্বগ্রাসী সংহার মূর্তি নিয়ে সর্বত্র সমান ছায়া ফেললেও পাকিস্তানী শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চেহারা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পাকিস্তানী শোষকরা দরিদ্র কৃষককুলের কল্যাণের জন্য কোন ব্যবস্থা তো গ্রহণ করেইনি বরং এমন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে ভূমিহীন কৃষকের হাতে এককাঠা জমি না যায়। এক সময়ে ভূমির সর্বোচ্চ সীমা পরিবারপ্রতি ৩৩ একর নির্ধারণ করে যে আইন পাশ করা হয়েছিল, জল্লাদ ইয়াহিয়ার গুরুদেব আইয়ুব খাঁ তা রদ করে ১২৪ একরে নির্ধারণ করে। যার ফলে উদ্ধৃত্ত ভূমি বাংলাদেশে বণ্টনের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই আজকে বাংলাদেশের মেহনতি কৃষকসমাজের ৭৬ শতাংশ হয় ভূমিহীন আর না হয় নিতান্তই গরীব। পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ভূস্বামী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সীমাহীন শোষণের ফলে বাংলাদেশের কৃষকের ঋণের পরিমাণ শুধু সরকারের কাছে দাঁড়ায় একশো কোটি টাকার উপরে। জোতদার ও মহাজনী ঋণের পরিমাণ তাতে ধরা হয়নি। আর কৃষকদের মধ্যে এই মহাজনী ঋণের পরিমাণ যে কত ব্যাপক তা সকলেরই জানা আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ আবাদী জমিও এদের কবজার মধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার বলে বিবেচিত জেলাগুলো- সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে মহাজনী ও জোতদারী শোষণের রূপটা সবচেয়ে প্রকট। এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার অবসানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টেতে। ভূমিব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে যাতে সত্যিকারের কৃষক উপকৃত হয়। বর্তমান ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ জমির জন্য বকেয়া কোন খাজনা দিতে হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত করে কৃষক-শ্রমিক মধ্যবিত্ত-ব্যবসায়ী তথা আপামর জনসাধারণের জন্য এক সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের দায়িত্ব আজ সকলের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজ হাতে নিয়েছেন। নয়া জামানার নতুন নকীবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আজ নবজীবনের শপথ, নতুন সমাজ গঠনের রণতূর্য।

রক্তের অক্ষরে লিখি*

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

শান্তির ললিতবাণী যাদের কাছে পরিহাসের সামগ্রী, সেই দানবের সঙ্গে সংগ্রামের তরে সংগ্রামীরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে- এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছিলেন বহু বছর আগে। আজ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা অনুভব করছি সংগ্রামীদের পদচারণা, বীরের মতো তারা যুদ্ধ করছে শত্রুর সঙ্গে, প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে প্রাণ দেয়া-নেয়ার এই উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের সোনার বাংলা ও তার শান্তিপ্রিয় মানুষকে সুখের মধ্যে

*'রক্তের অক্ষরে লিখি' শীর্ষক ধারাবাহিক কথিকাগুলি 'জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত।

প্রতিষ্ঠিত করার মহান সংকল্প নিয়েছে। জেগেছে মানুষ, জেগেছে প্রাণ, খুলেছে দুয়ার। কার সাধ্য বিজয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কার সাথ্য অন্ধকারে রাজত্ব কায়েম করে।

সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলাদেশ, রক্তাক্ত বাংলা, সংগ্রামী বাংলা। সাধ্য যে নেই তার প্রমাণ বাংলার মানুষ, প্রমাণ তাদের সংগ্রামী চেতনা। সেই চেতনার কথা বলছেন বাংলারই এক কবিঃ

আমার চেতনা ঘিরে বিচ্ছুরিত এক কণা
গড়ে তোলে আর এক রক্তিম চেতনা
পৃথিবীর সব কথা ম্লান ভেবে অনেক বিস্মৃতি
মুছে ফেলে আজ জেগে থাক রক্তাক্ত স্মৃতি।

এই রক্তাক্ত অনুভূতির কথা বাংলার হৃদয়কে উজ্জীবিত করেছে। বাংলার যে মানুষ চিরকাল শান্তি চেয়েছে, চেয়েছে সবাইতে ভালোবাসতে। চেয়েছে পরের তরে সব কিছু উৎসর্গ করতে, ভালোবেসেছে বন্দুকের বদলে কবিতা- তারা আজ তুলে নিয়েছে হাতিয়ার। নেমেছে মানুষের শত্রু, শান্তির শত্রু, সভ্যতার শত্রু র সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আজ শত্রু হননের পালা। জীবন আজ উৎসর্গিত হবে জীবন বাঁচাতে- জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে এমনভাবে যেন শত্রু আর শান্তির নীড়ে হানা দিতে না পারে। তাই আজ চারিদিকে লাল সূর্যের অভ্যুদয়।...

২১ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জোরদার করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে। আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'জয় বাংলা' সাপ্তাহিক বাদে বাংলার বাণী, নতুন বাংলা, বিপ্লবী বাংলা, স্বদেশ, দাবানল প্রভৃতি নানা নামের পত্রপত্রিকায় আমাদের বীর যোদ্ধাদের অগ্রগতির সংবাদ, অজেয় মনোবল ও অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনীসহ দেশী-বিদেশী সংবাদ সব সময় বেরুচ্ছে। দেশের জনসাধারণকে সব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল রাখতে এই পত্রপত্রিকাগুলো নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। হানাদারদের মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য দেশপ্রেমিক সাংবাদিকরা মন-প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ার যে প্রচণ্ড প্রচেষ্টা দেশের মানুষ সব সময় করে চলেছে, এটা তারও একটি অংশ। দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে সংবাদপত্র যে মহান ভূমিকা পালন করতে পারে সেই ভূমিকাই আন্তরিকভাবে এইসব পত্রিকাগুলো পালন করে চলেছে।

সংগ্রামীরা যুদ্ধের সংগে সংগে কলম ধরেছেন এবং দেশপ্রেম ও সংগ্রাম এক হয়ে যে আগুন ঝরাচ্ছে তা অনুভব করতে হলে এই পত্রিকাগুলো বার বার পড়া দরকার।

মুক্তিযোদ্ধারা ডায়েরীর আকারে তাদের অভিজ্ঞতার কথা সব সময় লিখছেন এখানে। 'দাবানল' পত্রিকায় 'গেরিলার ডায়েরী' লিখেছেন মুকুল নায়ক। ৩১শে অক্টোবর সংখ্যায় ইনি লিখেছেন :

"আমি একজন গেরিলা নায়ক। গত মাসে পাবনার বিভিন্ন মুক্ত এলাকা ঘুরেছি। গ্রামবাংলার মানুষ এত দুঃখ, কষ্ট ও নির্যাতনের মাঝেও সুকঠিন মনোবল নিয়ে থাকতে পারে এটা একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই নয়। তাদের বাড়ি-ঘর দস্যুসেনারা জ্বালিয়েছে, লুট করেছে মা-বোনের ইজ্জত, হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে, তবুও তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন মুক্তিবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায়।... তারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন।... তাদের সকলের কথা 'অস্ত্র চাই, মরতে হয় যুদ্ধ করে মরবো, দেশকে স্বাধীন করবোই।' কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে।

এরপর লেখক দালাল, দস্যু ও পাকসেনাদের খতম করার কাহিনী বলেছেন :

"রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে এলো আমাদের গেরিলা ইউনিটসমূহের দলপতিগণ।... গাজনার বিলে অপারেশন করে এগারোজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে ধরে এনে গণআদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বাকী দুষ্কৃতকারীগণ গ্রাম থেকে পালিয়েছে।... তৃতীয় দল নগরবাড়িগামী পাকসেনা বোঝাই ট্রাকের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২ জন পাকসেনাকে খতম করেছেন।

তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা শুনে সত্যি আনন্দ অনুভব করছিলাম।"

'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকার নিয়মিত 'মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী' প্রকাশিত হচ্ছে। বরিশাল থেকে মিজানুর রহমান লিখেছেন তার উপর পাকসেনাদের নির্যাতনের কথা, কিভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলেন তার কথা। তিনি লিখছেনঃ

"মৃত্যুর হাত থেকে আমি বেঁচে এসেছি। বাঁচিয়েছে মুক্তিসংগ্রামী আবদুল জলিলকে। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি শহীদুল হাসান, শাহজাহান ও আমির হোসেনকে। ওরা আজ মৃত্যুর দেশে বসে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে।"

এই স্মৃতিচারণের পর লেখক বর্ণনা করেছেন, কিভাবে তারা পাঁচ বন্ধু খান-সেনাদের হাতে বন্দী হলেন। এরপর তিনি লিখছেনঃ

"পাক হানাদাররা আমাদের পাঁচজনকে পাঞ্জাবী পুলিশের হেফাজতে রেখে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।... এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হোল থানায়। সেখানে পাঁচজনের উপর চলল নির্যাতন।... শরীর কেটে লবন পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। সমস্ত রাত ধরে চলল এমনি অত্যাচার, পর দিনও কাটল। আবার রাত হলো।...

দেখতে দেখতে এক সময় চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। ফায়ারের অর্ডার হলো। তিনজন পাঞ্জাবী পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠল, লুটিয়ে পড়ল শহীদুল হাসান, শাহাজান, আমির হোসেন। আবার ট্রিগার টানা হলো মুহূর্ত পরেই লুটিয়ে পড়ব আমরা বাকী দুজন, কিন্তু এমন মৃত্যুই কি চেয়েছিলাম?

না, না, প্রতিশোধ নিয়ে তবে মরতে হবে। পাশেই স্রোতস্বিনী নদী বয়ে চলেছে- বাঁচতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে। আবার ফায়ারের অর্ডার হলো। কিন্তু তার আগেই জলিলকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীর বুকে। হে দেশমাতা, তোমার বুকে ঝাঁপ দিয়েছি, তুমিই গ্রহণ করো।

রাতের আধাঁর বিদীর্ণ করে ঝাকেঁ ঝাকেঁ গুলি এসে পড়তে লাগল নদীর বুকে, জলিলকে ধরে ডুব দিতে দিতে ওদের নাগালের বাইরে চলে এলাম, এবার প্রতিশোধ।".....

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতা এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যদিয়ে এ বছরের ঈদ উদযাপন করলো। দেশের মাঝে পশুশক্তির প্রতীক ইয়াহিয়া চক্র নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, নিরস্ত্র বঙ্গবাসী প্রাণ রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত, আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনপণ করে লড়ছে শত্রুর সঙ্গে। বিভিন্ন সেক্টরে খান সেনারা আজ কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে, দিন গুণছে মৃত্যুর। এমনি পরিবেশের ঈদের চাঁদ উঠলো, ঈদও হয়ে গেল- কিন্তু বাঙালী আজ দরদভরা

কণ্ঠে, আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে শুনতে পেলো না নজরুলের সেই বিখ্যাত গানঃ ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ’।

এতে বাংলাদেশের মানুষ দুঃখিত নয়। কারণ তারা জানে যে, কোনো জাতির জীবনে কোন কোন সময়ে এক-একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসে যখন তাকে স্থায়ী একটি সিদ্ধান্ত দিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে ভাবতে হয়, জীবন বিসর্জন দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় শত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। শত আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে তাকে এ কথা নিশ্চিত প্রমাণ করে যেতে হয় যে, পরবর্তী বংশধররা আর অত্যাচারিত, শোষিত, নিষ্পেষিত হবে না। সেই ঐতিহাসিক ও চরম মুহূর্ত আজ এসে গেছে। আমরা সেই ইতিহাস পরিবর্তনকারী, ইতিহাস সৃষ্টিকারী গৌরবময় মুহূর্তের মধ্যে আছি যখন আমরা বুঝতে পারছি ‘ফুল খেলবার দিন আজ নয়’- আজকের দিন হচ্ছে চরম সংগ্রামের, চরম আত্মত্যাগের, আত্মোপলব্ধির।

বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব অবস্থা বিরাজ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার ঈদ সম্পর্কে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রপত্রিকায়।

সাপ্তাহিক ‘জয় বাংলা’ পত্রিকা ২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছেঃ এবার শারদোৎসবে বুড়ীগঙ্গার পারে যেমন বাজন বাজেনি, তেমনি এবার ঈদেও খুশীর চাঁদ বাঙালীর আকাশে ওঠেনি। খুশী হওয়ার উৎসব করার অবকাশ কই এখন বাঙালীর জীবনে? গোটা জাতি যখন তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত, নরপশু ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের বিরুদ্ধে জাতি যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন উৎসব করার, আনন্দ করার অবকাশ মানুষের জীবনে থাকতে পারে না।

গতবারও বাংলাদেশের মুসলমান রোজার ঈদে উৎসব করতে পারেনি। বারোই নভেম্বরের প্রলংকারী ঝড়ে সেবার বিশ লাখ বাঙালী মৃত্যুবরণ করেছে। দেড় হাজার মাইল দূরে তথাকথিত ইসলামাবাদের শাদ্দাদী বেহেশতে বসে ইয়াহিয়া-চক্র বিশ লাখ বাঙালীর মর্মন্তদ মৃত্যু দেখে উপেক্ষার শয়তানী হাসি হেসেছে এবং আরো দশ লাখ বাঙালীকে হত্যার জন্য ছুরি শাণিয়েছে। গতবার বাংলার মুসলমান বিশ লাখ মানুষের মৃত্যুর শোকে রোজার ঈদে শোকাশ্রু চোখে কাতারবন্দী হয়েছে নমাজের ময়দানে,- এবার আরো বিশ লাখ ভাইবোনের লাশের স্তুপের উপর বসে তারা আকাশে দেখছে বাঁকা খঞ্জরের মত ঈদের চাঁদ। এবারও তারা উৎসব পালন করতে পারে না।

আজ নয়, বাংলার আকাশে খুশীর ঈদের চাঁদ একদিন উদিত হবে এবং সেদিন সুদূর নয়- যেদিন ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হবে এবং স্বাধীন ও মুক্ত বাংলার নীলাকাশে শওয়ালের চাঁদ সব অশ্রুর কুয়াশামুক্ত হয়ে আবার খুশীর রোশনাই ছাড়বে।

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ১লা অগ্রহায়ণ সংখ্যায়ও ঈদ সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণেও বিধ্বস্ত একটি পাকা মসজিদের ছবিসহ এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

বাংলাদেশের দ্বারপ্রান্তে এসে ঈদ যেন এবার ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল। তার নামে যে কী একটা উৎকট দুর্গন্ধের দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ফেললো। কী এক বিকট হাহাকার ও আর্তনাদের ধ্বনি যেন তার কানে তালা লগিয়ে দিলো। চোখ তুলে এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে আঁৎকে উঠল সে?। ধ্যাননেত্রে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় কোথাকার কোন রক্তপিপাসু রক্তপায়ী দানবের দল কামড়ে আঁচড়ে লাখো লাখো বাঙালীর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্ত ঝরিয়ে চলেছে। ধর্ষিতা বাংলার মা হতচেতন অবস্থায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আর এখনো যারা বাংলাদেশে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে আছে তারা প্রায় সকলেই প্রিয়জনের

বিয়োগব্যথায় শোকাতুর, ব্যাথাতুর, ম্লানমুখ, জীবন্মৃত অবস্থায় ধুকছে। আমি কি করে এদের মুখে হাসি ফোটাব?...

মৃত্যুর সঙ্গে, শত্রুর সঙ্গে যে পাঞ্জার লড়াই চলছে- তার সংবাদ দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধামন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের উদ্দেশ করে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, আমরা শত্রুকে চারদিক থেকে আঘাত হেনে চলেছি, দেশবাসী যেন তৈরি থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথা বলেছিলেন, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে। শত্রুকে নির্মূল করে এমন এক সুখী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে একজন আর একজনকে শোষণ করতে পারবে না। সবাই সমান সুযোগ-সুবিধে পাবে।

এর পর পরই মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসেনার উপর আঘাত হেনেছে এবং খুলনা, যশোর, রংপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম খান সেনারা প্রচণ্ড মার খেয়ে ক্রমাগত পিছু হটে চলেছে। মুক্তিবাহিনী এখন বিজয়ের পথে। সে কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী গত ২৩শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক বেতার ভাষণে দেশের প্রতিটি মানুষকে শত্রুর ওপর চরম আঘাত হানার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, শত্রু দাঁতভাঙ্গা জবাব পাচ্ছে। সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। তার মনোবল ভেঙে গেছে। সে বুঝতে পারছে অন্যায় টিকতে পারে না। অহঙ্কারের পতন অবশ্যম্ভাবী, অত্যাচারীর ধ্বংস অনিবার্য, পশুশক্তি মানবতার কাছে কিছুই নয়। বাংলার মানুষ আজ ইতিহাসের শুভ্রতম পৃষ্ঠাগুলো অধিকার করেছে, আর ইয়াহিয়াচক্র ইতিহাসের কৃষ্ণতম পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ছে। এরই নাম ইতিহাস, এরই নাম মহাকাল। এরই নাম সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়।

২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

... ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তখনও আমরা জানতাম পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনধারন পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই আমাদের মিল নেই, তাদের সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় নেই, বহুদূরে অবস্থিত সেই দেশের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সব সময় পরিচায়েরও সুযোগ নেই। তবুও আমরা মিলেমিশে থাকতে চেয়েছিলাম। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতি নিয়েও একসঙ্গে বাস করা যায়। রাশিয়া, ভারত, চীন তার প্রমাণ। আমরা আশা করেছিলাম, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত যেমন আমরা অনুসরণ করছি তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও অনুসরণ করবেন। দেয়া-নেয়া, মিলনের মধ্যদিয়ে একটি বৃহৎ মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, সে জন্যই আমরা সব সময়ই স্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম, স্বার্থ ত্যাগ করেছিও। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদে সমান সমান প্রতিনিধিত্ব আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এ কথা আমরা বলিনি যে একমাত্র বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা আমরা চেয়েছিলাম, মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিদ্যা শিক্ষা আমরা চেয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা আমরা বলিনি যে, উর্দু সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে- যে উর্দুকে আমরা জানবো না, উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কোন উৎসাহ নেই। বরং উর্দু ছোটগল্প, কবিতা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ-ই ছিল। সমসাময়িক উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে ফয়েজ আহমদ ফয়েজসহ অনেকেই আমাদের পরিচিত ছিলেন। শুধু উর্দু কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সবকটি ভাষা সম্পর্কেই আমাদের গভীর আগ্রহ ছিল। পশতু বা সিন্ধী সাহিত্য জানবার চেষ্টা করেছি আমরা। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন পাকিস্তানী ভাষা ও সাহিত্য কেন পৃথিবীতে সমস্ত ভাষা ও সাহিত্য জানবার দরজা আমরা সব সময়ই খোলা রেখেছি। বাঙালী কি ইতোপূর্বে সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, উর্দু, ইংরেজি শেখেনি? সেইসব ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অধিকার অর্জন করেনি?

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনরকম বাধানিষেধ বা ঘৃণার জন্ম দিতে কখনও রাজি হয়নি। আমরা জানিয়ে দিয়েছি কোন কিছু জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলে আমরা মেনে নেবো না- যেমন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি; কিন্তু তখন একথা আমরা বলিনি, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা বিদ্বেষভাবাপন্ন। এমনকি বাংলাদেশে যে সমস্ত উর্দুভাষী বাস করছেন তাদেরকে উর্দু বাদ দিয়ে কেবল বাংলাই শিখতে হবে এমন কথাও আমরা বলিনি। আমরা সব সময়ই উদার নীতি গ্রহণ করেছি। আমরা স্মরণ করেছি যে, হিটলারের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলছে, তখনও জার্মান সাহিত্য গ্রন্থ বা সংগীত বন্ধ করে দেয়নি বৃটেন। এই দৃষ্টান্ত আমাদের লেখকরা বারবার কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন; বিশেষ করে ভারত থেকে বাংলা গ্রন্থাদি আমদানী করার সয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আমরা বলেছিলাম যে, যে জাতি জ্ঞানের দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হয় সে জাতির মৃত্যু অনিবার্য। কেবল গায়ের জোরে একটি জাতি টিকে থাকতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী....

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১

... আমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা, সবসময় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাস করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বলেই দীর্ঘকাল ধরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রচণ্ড স্বার্থ ত্যাগ করেছিলাম। বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে, আর বাংলাদেশে সামান্য কয়েক শ কোটি টাকার অভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচার জান্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। লক্ষ লক্ষ বাঙালী প্রাণ দিয়েছে। তবু পশ্চিমী কুচক্রীদের চৈতন্যেদয় হয়নি। শেষ পর্যন্ত বীর বাঙালী হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে ও করছে শত্রুর সঙ্গে । এখন চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণার সময়, এখন শত্রুর পরাভব শিকারের সময়, এখন শত্রুর অস্ত্র ত্যাগ করে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার সময়। এখন সত্যের জয়, আলোকের জয়, ন্যায়ের জয় ঘোষণার সময়। এখন নতুন সূর্য ওঠার সময়।...

বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি আজ সেই গৌরবের অধিকারী হতে চলেছে। তারা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। প্রাণ দেয়ার মহান কর্তব্যে বাংলাদেশের লক্ষ তরুণ আত্মনিয়োগ করেছে। তাদেরই একজন আমিন। সেই আমিনের আত্মত্যাগের কথা লিখেছেন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ‘বিপ্লবী বাংলাদেশ’। পত্রিকাটি লিখছেনঃ

‘‘তেতুলিয়া নদীর পাড়ে ছোট একটি গ্রাম, নাম তার সোনাহাটি। কবে অনাদি কালে কে এই মিষ্টিমধুর নামটি রেখেছিল জানি না, তবে সোনারহাট না হলেও ঘর আলো করা অফুরন্ত সুখ-সৌন্দর্য এই গ্রামটিকে ঘিরে ছিল-আজও কালের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার সবটুকু হরণ করে নিতে পারেনি। সোনাহাটির প্রতিটি গাছ, পাতা, লতা আর ধূলোমাটির সাথে তার অন্তরের একান্ত আত্মিক সম্পর্ক। সে বন্ধন কেউ কোনদিন ছিন্ন করতে পারে না- পাক হানাদার বাহিনী তো দূরের কথা মহাকালও সেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়।

এরপর হানাদার বাহিনীর সঙ্গে তেতুলিয়াতে যে যুদ্ধ হয় তার প্রসঙ্গে পত্রিকাটি লিখছেনঃ

‘‘তেতুলিয়ার বুকে আজ দস্যুদের গানবোট। গোলাগুলির বজ্রগম্ভীর শব্দের অকস্মাৎ সোনাহাটির আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। চোখের পলকে ছোট ছোট কুটিরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বিশ্বাঘাতক বেঈমানেরা হানাদারদের খবর দিয়েছে- খবর দিয়েছে আমিনের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা সুসংঘটিত হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করছে। আর যোগ্য সেনানীর ন্যায় পরিচালনা করছে ওর সহযোদ্ধাদের। এ যুদ্ধ হলো বিপ্লবী বাংলাদেশের বীর সন্তানদের মুক্তিযুদ্ধ, যে মুক্তিযুদ্ধ কোনদিন ব্যর্থ হয়নি, হতে পারে না। চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেল আর হাল্কা মেশিনগানের গুলি হানাদারদের আক্রমণের জবাব দিতে আরম্ভ করল। পাক পশুরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সারাদিন ধরে এইভাবে চললো গুলিবিনিময়। একশো’র উপর খান

সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে- পশুদের উষ্ণ তাজা রক্তে সেনাহাটির মাটি তর্পণ করছে। এক সময় পশ্চিম দিকের মুক্তিযোদ্ধাদের গুলি চালনা থেমে যায়। এই সুযোগে অবশিষ্ট হানাদারদের গানবেটে পালিয়ে গেলঃ পেছনে ফেলে গেল ১০-১২ খানা গানবেটি ও অসংখ্য আধুনিক মারণাস্ত্র।"

এই যুদ্ধে আমিন শহীদ হন। আমরা জানি ইতিমধ্যে শত্রুরা তেঁতুলিয়াসহ বহু জায়গায় পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। আমিনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে পত্রিকাটি মন্তব্য করেছেন।

"আমিন মরেনি, আমাদের মাঝে ও বেঁচে আছে-বেঁচে আছে বাংলার মাটির সাথে, মিশে আছে তেঁতুলিয়ার উদ্দাম তীরভাঙ্গা পাগলা ঢেউগুলোর সাথে, যা কোন দিনই বাংলা মায়ের কাছ ছাড়া হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশে আবার সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাবে-ফিরে যাবে সেই ছোট গ্রাম সোনাহাটিতে। সেই গ্রামে অজস্র ঝরা বকুল ফুল কবরটাকে ঢেকে রেখেছে। মিষ্টিমধুর গন্ধে মাতোয়ারা মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে গাছটাকে ঘিরে, লক্ষ আমিন জন্মেছে বাংলাদেশে। আমিনরা কোনদিন মরবে না, আমিনরা কোনদিন মরে না।

দৃষ্টিকোণ

১৫ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের হবু বেসামরিক সরকারের হবু উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্টমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর জাতিসংঘ প্রাসাদ চত্বরে পদার্পণের সাথে সাথেই হাজার মাইল দূরের ভিয়েৎনামের টনকিন উপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। গন্তব্যস্থল অনির্দিষ্টি বলে উল্লেখ করা হলেও আপাতত উদ্দেশ্য নাকি ঢাকার মার্কিন নাগরিকের উদ্ধার করা। ঢাকার মাত্র কয়েক শ' মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের জন্য সপ্তম নৌবহরের পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ ন্যায় রণপোতকে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই খোঁড়া অজুহাতটি দুগ্ধপোষ্য বালকেও বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া মার্কিন নাগরিকরা হয়তো ইতিমধ্যেই ঢাকা ছেড়ে গেছেন। তাই সপ্তম নৌবহরের এই আকস্মিক আনাগোনা বা শক্তি প্রদর্শনের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন অভিসন্ধি রয়েছে, এটা সকলেই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ করবেন। এদিকে দিয়ে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ন্যক্কারজনক কীর্তিকলাপের রেকর্ড কেউ বিস্তৃত হবেন না। মার্কিন সমর দফতর পেন্টাগনের গোপন দলিলপত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর দুনিয়ার মানুষ জেনেছেন কিভাবে বিনা প্ররোচনায় এই সপ্তম নৌবহর টনকিন উপসাগরে থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এখনও ভুলে যাওয়ার কথা নয়, ১৯৫৬ কোরিয়া যুদ্ধে মার্কিন হানাদার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআরথারের নৌবহর বলে পরিচিত এই সপ্তম নৌবহরকে কোরিয়ার হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ! লোক অপসারণের নামে এরা অবতরণ করেছিল ১৯৬২ সালে থাইল্যাণ্ডে। পর্যবেক্ষকরা তাই ১২৫টি জাহাজ, ৬৫০টি বিমান ও ৬৫ হাজার নৌসেনা গঠিত এই সপ্তম নৌ-বহরকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গানবেটের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব অবরুদ্ধ মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের অজুহাত যে একেবারেই বাজে একথা বলাই বাহুল্য মত্র। ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র ইতিমধ্যেই তাই বলেছেন" মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্যই মার্কিন সপ্তম নৌবহরের এই পদচারণা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসনের পিণ্ডি-প্রেম বর্তমানে প্রায় চরম পর্যায়ে উপনীত হলেও একেবারে নতুন কিছু নয়। দুনিয়ার সকল জাতির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় সবার আগে এগিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে পিণ্ডির জল্লাদ দলের গণহত্যা তথা এক কোটি বাঙালীর পৈত্রিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের ব্যাপারে

এই মার্কিন প্রশাসন তাই উচ্চবাচ্য করেনি। মার্কিন সংবাদপত্র এবং উদারপন্থী সিনেটেরদের প্রবল চাপের মুখে নিক্সন সরকার শরণার্থীদের জন্য কিঞ্চিৎ খয়রাতি বিতরণ করলেও পিণ্ডির জল্লাদচক্রকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সবকিছুর সাহায্যে মদদ দিয়েছে। যার পরিণতি ভারতের উপর পাকিস্তানী সামরিক চক্রের প্রকাশ্য নগ্ন হামলা। আজ নিজের চক্রান্ত জালে আটকে জবরদস্ত সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁর যখন নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে তখন পেয়ারের পিণ্ডিকে বাঁচানোর জন্য স্বস্তি পরিষদের দুয়ারে ছুটে গেছে নিক্সনের অগ্রদূত বুশ সাহেব। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ায় দিনের পর দিন নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে গ্রামের পর গ্রাম এমনকি বনাঞ্চল সাফ করে দিলেও আজ শ্যামচাচারা এই উপমহদেশের শান্তির জন্য একেবারে বেচায়েন হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণে যে মার্কিন প্রশাসন অস্বীকৃতি জায়য়েছে সেই একই প্রশাসন আজ বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবারের চক্রান্তে মার্কিনী ''কাগুজে বাঘ'' রা এক নয়। চীনের বিপ্লবী সাত্ত্বিক নায়করা এবার মার্কিন শ্যামচাচার সাথে ভিড়ে গেছেন। স্বস্তি পরিষদে প্রস্তাব পেশ ও ভোটদানের ব্যাপারে এ দুটো দেশ একই সাথে চলেছে হাতে হাত মিলিয়ে।

পিকিং ও ওয়াশিংটন একের পর এক প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদে উত্থাপন করেছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করার জন্য, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবীতে। কিন্তু মহান সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে তাদের সে চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে গেছে প্রতিবারেই। সোভিয়েট প্রতিনিধি জ্যাকব মালিক ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেনের বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, বাংলাদেশ সমস্যার মূল অনুসন্ধান না করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত ও আইনানুগ অধিকারের কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালে তাতে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তিনি স্বস্তি পরিষদের বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিকে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাতেও সমর্থন জানানোর প্রয়োজনবোধে করেনি।

জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদের ব্যর্থ হওয়ার পর পিণ্ডির মহাপ্রভু ওয়াশিংটন আর জানি-দোস্ত পিকিং একই সাথে জাতিসংঘের বাইরে দাবার ঘুঁটি চালাতে শুরু করেছে। নিক্সনের নির্দেশে সপ্তম নৌবহর সায়গন দরিয়ার পানি কেটে এগিয়ে চলেছে তথাকথিত মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের অজুহাতে। অন্যদিকে তিব্বত চীনা সৈন্য নাকি নড়াচড়া করতে আরম্ভ করেছে। মার্কিন বা চৈনিক কার্যক্রমের পেছনে যে গূঢ় অভিসন্ধিই থাকে না কেন, তাদের লেজের আগুনে আর একটি ভিয়েতনাম এই উপমহাদেশে কখনই করতে দেবে না বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি এবং ভারতের ৫৫ কোটি মানুষ। 'স্বাধীন দুনিয়ার' বড় মোড়ল গণতন্ত্রের মেকি ভজনাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু ঘৃণাভরে উপেক্ষা করবে এই দু' দেশের সাধারণ মানুষ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সককারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদও সাম্প্রতিক এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, এই উপমহাদেশ সম্পর্কে মনগড়া যে ধারণা নিয়ে কতিপয় বৃহৎ শক্তি থাকুন না কেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। নিক্সন প্রশাসনের চোখরাঙানি আরো একবার প্রমাণ করলো, গণতন্ত্রের জন্য যতই তারা চীৎকার করুক না কেন আসলে এরা দুনিয়ার সকল জঙ্গীচক্রের শয্যাসঙ্গিনী। ভিয়েতনামের থিউ, কম্বেডিয়ার লন নল, লাওসের ফুমি নোসাভান, থাইল্যাণ্ডের কিট্টিকাচরণ, কঙ্গোর মোবুতু আর পিণ্ডির ইয়াহিয়া সবাই শ্যামচাচার অবৈধ সন্তান।

নিক্সন প্রশাসনের বাসনা থাকলেও বাংলদেশকে আর একটি ভিয়েতনাম বানানোর পথে বড় বাধা হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাগ্রত জনমত। ভিয়েতনামের জঙ্গীচক্রের শাসন বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকার শত শত মা হারিয়েছেন তাঁদের সন্তান, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, পিতা হারিয়েছে পুত্রকে। তাই আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টির ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডী, সিনেটোর মাস্কি, সিনেটের ম্যাকগর্ভান এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সিনেটর মাইক ম্যান্সফিল্ড ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সর্ম্পকে নিক্সন প্রশাসনের ভ্রান্তনীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠছেন। এই সিনেটরদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হতে পারেন। আশা করা যায়, এই অবস্থায়

প্রেক্ষিতে নিক্সন সাহেব যত লম্ফঝম্ফই করুন না কেন আর একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টি করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজনৈতিক সমাধি রচনায় তিনি সাহসী হবেন না। সর্বোপরি, মার্কিন দুঃসাহসের পথে প্রচণ্ডতম অন্তরায় হয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পদগর্ণি ইতিমধ্যেই বৃহৎ শক্তিবর্গকে এই উপমহাদেশের সংকট থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে নাক গলানোর বিরুদ্ধে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত সত্য। জাতিসংঘ বা বিশ্বের অন্যান্য দেশ যত তাড়াতাড়ি এই সত্যকে স্বীকার করে নেবেন, এই উপমহাদেশে সংকট তত তাড়াতাড়িই নিষ্পত্তি হবে। এতে বিভ্রান্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঢাকার অধিকৃত এলাকা থেকে চমকপ্রদ খবর এসে পৌঁছেছে। দখলদার বাহিনীর তথাকথিত বেসামরিক প্রশাসনের শেষ কাঠামোটুকুও ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেছে। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর গভর্নর ডাঃ মালিক সদলবলে মন্ত্রিসভা সমেত ইস্তফা দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন রেডক্রসের নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। চীফ সেক্রেটারী ও পুলিশের আইজিসহ আমলাদের একটি দলও মহাজনী পন্থা অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ঢাকার লাখ লাখ বেসামরিক অধিবাসী এখন কি ভাবছেন, কি করছেন? বিগত নয় মাস ধরেই তারা বাস করছেন ইতিহাসের দীর্ঘতম অমাবস্যার রাত্রিতে। ২৫শে মার্চের কালরাতে অমবস্যার যে অন্ধকারে নেমে এসেছিল এখনও তার অবসানের প্রতিক্ষা। স্বজন হারিয়ে, সর্বস্ব খুইয়ে আজ যাঁরা বেঁচে আছেন, একটিমাত্র আশা তাঁদের- কবে আসবে মুক্তির সেই সোনালী দিন? আবার যখন বলতে পারবো ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি? সেই দিন যেদিন আসবে পাকিস্তানের রাহুগ্রাস থেকে সোনার বাংলার মুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তির দ্বারপ্রান্তে ঢাকায় এখন চলেছে চূড়ান্ত সংগ্রাম- পিণ্ডির জল্লাদ দলের শাসন-শোষণের অবসানের শেষ সংগ্রাম। মুক্তির এই উষালগ্নে জঙ্গীশাহী যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করুক না কেন ঢাকার মানুষ কি ধাতুকে গড়া তা তারা ভালভাবেই জানে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক হবেন যে ঢাকার মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ, একথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা চলে। গত এক দশকের ইতিহাসে যাঁরা জ্ঞাত আছেন, যাঁরা দেখেছেন কিভাবে ঢাকার মানুষ এই সময়ে জঙ্গী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য একের পর এক দুর্বার গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলেছে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। কামানের গোলা, মর্টারের শেল আর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে হাজারো হাজারে। কারফিউ আর ১৪৪ ধারা সেখানে নিত্যসহচর। সমুদ্র সেখানে শয্যা পাতা, জঙ্গীচক্রের আজকের শেষ চোখরাঙানিতে সেখানে ভয়ের কি আছে! ঢাকার সংগ্রামী নাগরিকরা পিণ্ডির জল্লাদ দলের সকল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে বার বার। ইয়াহিয়ার গুরুদের আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনের খবরদারীকে ছিন্নভিন্ন করে পথে নেমেছিলেন ঢাকবাসী গণতন্ত্রের দাবী কণ্ঠে নিয়ে ১৯৬২ সালে। মিছিলে মিছিলে রক্ত ঝরেছিল সেদিনে। আইয়ুবের ছবিগুলো হয়েছিল টুকরো টুকরো। আইয়ুবের দেওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠ সংগ্রামের আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল রমনার রাজপথে, পটুয়াটুলির অলিতে-গলিতে। আইয়ুবের মৌলিক ধরনের মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও ঢাকার মানুষ সুস্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। এলো ১৯৬৬ সাল ঐতিহাসিক ছ’দফা আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্ন। বাংলার স্বাধিকারের দাবীতে গর্জে উঠলো ঢাকা। ৭ই জুন স্তব্ধ হয়ে গেল নগরীর প্রতিটি ধমনী। মিছিলের ভৈরব গর্জনে প্রকম্পিত হোল একনায়কত্বের পাষাণ কারা। জনসন রোড, জিন্নাহ এভিন্যু, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শত শত শহীদদের রক্ত স্নান করেছিল কৃষ্ণচূড়ার লাল রং। এরপর থেকে ঢাকার মানুষের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে বারবার ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। ৬৮-৬৯ সালের আইয়ুব-বিরোধী গণূঅভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পিণ্ডির শাসকচক্রের সকল জঞ্জাল। ঢাকার মুক্তিপাগল মানুষ সেদিন অগ্নিমন্ত্রে

দীক্ষা নিয়ে শাসক। শ্রেণীর মিথ্যার বেসাতির কারখানাগুলোকে সাফ করে দিয়েছিল আগুনের লেলিহান শিখায়। বাংলার মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবীতে ঘেরাও করেছিল ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট। সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা নথিপত্র সমেত পুড়েছিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস. এ রহমানের বাসভবন। বাঙালী গৃহভৃত্যের মহানুভবতায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। ১৮ই ফেব্রুয়ারীর রাত। ঢাকার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে সে এক অনন্য রাত। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে মুখোমুখি মোকাবিলা করেছে নিরস্ত্র মানুষ সারা রাত। অবরোধ করে রেখেছে ঢাকা নগরীকে। কারফিউর বিধিনিষেধ দিয়েছে উড়িয়ে। মেশিনগানের গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছিল তারা। শ্লোগানে শ্লোগানে ঝংকৃত ঢাকা নগরীতে সে রাতে হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছিল আইয়ুবের বেতনভুক সেনাবাহিনীর। রক্তের বিনিময়ে মানুষ তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করে এনেছিল ঢাকা ক্যান্টনমেণ্টের লৌহকারা থেকে। ঢাকায় দুটি জাতীয় পরিষদের আসনে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গবন্ধুকে জয়যুক্ত করে ধন্য হয়েছিল তারা। তারপর মার্চের অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতেও ঢাকা আপন মহিমায় থেকেছে অম্লান। বস্তুতঃপক্ষে ইয়াহিয়া খাঁন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করলে ঢাকার মানুষই প্রথমে ছুটে গিয়েছিল তাঁদের নেতার কাছে নির্দেশের জন্য। ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে তখন বৈঠক চলছিল বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির। নির্দেশ এলো সর্বাত্মক গণঅসহযোগ আন্দোলনের। কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া উড়লো না। ট্রেনের চাকা গেল থেমে। লঞ্চ-স্টীমার স্তব্ধ। বাস-ট্যাক্সি-রিকশা চললো না। এমন যে সাধের পিআইএর বিমানগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো মাটিতে। মিছিলে পতাকায় ব্যানারে ফেস্টুনে শ্লোগানে সে আরেক ঢাকা। পিণ্ডির শাসক-চক্রের বাংলাদেশবিরোধী অনড় মনোভাবের মুখে ঢাকার মানুষই প্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন একটি নতুন জাতীয় পতাকার, নতুন জাতীয় সঙ্গীতের। মিছিলের বজ্রমুঠিতে সেদিন উচ্চকিত হয়েছিল একটি নতুন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম শপথ।

নিষেধাজ্ঞা-বিধিনিষেদের বেড়াজাল ফেললেই ঢাকার মানুষ প্রতিবাদে আলোড়িত হয়, ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারফিউ দিলে রাস্তায় নামে। কাউকে ডাক দিতে হয় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। আওয়াজ তোলে । গুলিতে বুক পেতে দেয়। আবার শ্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে আকাশ-বাতাস।

অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে এখনও সে মানুষ আছে। পিণ্ডির জল্লাদ দলের পাশবিক হামলাকে বিশেষ এক অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা মুখ বুঝে সহ্য করেছে। গত নয় মাস শুধু সেই বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণটি প্রতীক্ষায়, যখন তারা ফেটে পড়তে পাড়বে আগ্নেয়গিরির মত। নাদিরশাহের সুযোগ বংশধর জল্লাদ সরদার ইয়াহিয়া খাঁর পাইকবরন্দাজের দল মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যে বিভীষিকাই কায়েম করুক না কেন, ঢাকায় তাদের নিস্তার নেই।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

রাজনৈতিক মঞ্চ

৪ অক্টোবর, ১৯৭১

পূর্ব বাংলা-পূর্ব পাকস্তান- বাংলাদেশ। এ রূপান্তর ২৫শে মার্চের সেই কালো রাতে নিরীহ নিরস্ত্র গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর ইয়াহিয়ার ঘাতক দলের উন্মুক্ত আক্রমণের ফলে চূড়ান্ত রূপ নিলেও বিগত ২৫ বছরের অনেক বঞ্চনা আর রক্তঝরা ইতিহাস জমাট বেঁধে ছিল এর পিছনে। বাংলাদেশে গণপজাতন্ত্রী সরকার

প্রতিষ্ঠার সাথে ফলগুধারার সেই বাঁধটি খুলে গেছে, যা প্রতিনিয়ত পিষে মারছিলো বাঙালীর সঞ্জীবনী শক্তিকে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে রাখার জন্য, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার জন্য একের পর এক চক্রান্তের জালে বুনেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত সামরিক চক্র। বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আঘাত এসেছে একের পর এক। এসবের প্রতিবিধান দাবী করে বাঙালী পেয়েছে শুধু বুলেট।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্জাবী-বেলুচ, পাঠান-সিন্ধী সকলের অবস্থানের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বীকৃত পায়নি শুধু বাংলার মানুষ। ভাগ্যের এ এক নিদারুণ পরিহাস। দেশে জনসংখ্যার যারা শতকরা ৫৬ ভাগ, যাদের ভোটের জোরে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল ধ্যান ধারণা বিসর্জন দিয়ে অতীব কৃত্রিম একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তারাই হলো অবহেলিত। অবজ্ঞা আর বঞ্চনার হোল শুরু। সদ্য স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন উঠলো। সদর্পে ঘোষণা করা হলো- উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আর একথা বাঙলা মুলুকে সরবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্ণধাররা ড্যাকোটা বিমানে চেপে ঢাকা এলেন। প্রতিবাদ জানালো ঢাকার ছাত্রসমাজ। মুসলিম লীগের দোর্দণ্ড প্রতাপের সেই দিনগুলিতেও ছাত্ররা রেসকোর্স ময়দানে মুসলিম লীগের মহানায়কের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার তীব্র প্রতিবাদ জানালো। পুলিশ বাহিনী আর গুণ্ডাদলের সম্মিলিত হামলার মাধ্যমে এই প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা হলেও শাসকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে তখন প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিয়েছিল। এলো রক্তস্নাত ১৯৫২ সাল। শাসনতন্ত্রের মুসলিম লীগ সংক্রান্ত বিষয়ে আবার এলো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। গোলাম মোহাম্মদ-নাজিমুদ্দীন গোষ্ঠী আবার বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলো উর্দুর বোঝা। এবার ছাত্র-জনতা পথে নামলে ফেস্টুন-ব্যানার-প্লাকার্ড নিয়ে। রাজপথ হলো প্রকম্পিত। বিধিনিষিধের বেড়াজাল গেল উড়ে। খুনী নূরুল আমিনের পুলিশের গুলিতে বরকত-সালামসহ শাহাদাতবরণ করলেন বহু ছাত্র। জনতা গর্জে উঠলো "আমরা সালামের ভাই! আমরা বরকতের ভাই!!" সেই গর্জন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে, কলে-কারখানায়, হাটে-মাঠে। একের পর এক সর্বদলীয় সমাবেশ ঘটতে থাকলো কুখ্যাত মূলনীতি কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে। জনতার একবাক্যে রায়-মানি না।

এলো নির্বাচন। পূর্ব বাংলার মানুষ আইনসভায় নিজেদের বক্তব্য পেশের সুযোগ পেলেন। গঠিত হোলো যুক্তফ্রন্ট- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। শাসক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগসহ ছোটখাটো অনেকেই শরীক হলেন এ যুক্তফ্রন্টে। নির্বচনী রায়ে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সমাধি রচিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হক বাংলাদেশের স্বার্থে যখনই কিছু করতে ও বলতে শুরু করলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ষড়যন্ত্রের জাল বুনে তা নস্যাৎ করে দিল। ৯২ (ক) ধারাবলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হোল।

পরবর্তী বছরগুলিতে বুড়ীগঙ্গার অনেক পানি বয়ে গেছে। বাঙালীর রক্তে রমনার কৃষ্ণচূড়া গুচ্ছ আরো লাল হয়েছে। কিন্তু চক্রান্তের রাজনীতি শেষ হয়নি। মরহুম সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন এবং বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে চেষ্টা করছিলেন পশ্চিমী সামন্ত সামরিক গোষ্ঠীর একমাত্র উপজীব্য ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ রাজনীতিকে সার্বজনীন ভোটধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে খতম করার।

এবারে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সকল আশা-আকাঙ্খা নস্যাৎ করার জন্য সেনাবাহিনী সরাসরি এগিয়ে এলো। সামরিক শাসক আইয়ুব খাঁর অধিনায়কত্বে এবং তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো সারাদেশ দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ। আইয়ুবী আমলের এই কালো দশকে বাংলার মানুষের জাতীয় সত্তার প্রতিটি তন্তু ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার নিস্ফল চেষ্টা হয়েছে বারবার। শত শত ছাত্র যুবক-কৃষক-শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে গুলি করে। আটক করা হয়েছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক নাগরিককে। বাংলা ভাষা-

সাহিত্য ধ্বংস করার জন্য চালানো হয়েছিল বর্ণমালা-বানান সংস্কারের দানবীয় অভিযান। বেতার-টেলিভিশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিষিদ্ধ।

রাজনীতিতে এই যখন অবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র সে সময়ে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আইয়ুব খান দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবস্থাটা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। সেই কমিশনের একবাক্য রায় ছিলো- আয়ুবের তথাকথিত ‘‘উন্নয়ন দশকে ’’ বৈষম্যের পরিমাণ আরো ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলার জাতিসংঘ বিকাশের সুযোগ-সুবিধার দাবী কণ্ঠে নিয়ে গড়ে উঠলো ঐতিহাসিক ছ'দফায় আন্দোলন। আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো ‘‘জাগো জাগো, বাঙালী জাগো’’ আওয়াজে। হুঙ্কার ছাড়লেন ‘বন্ধু নয় প্রভু’র ফিল্ড মার্শাল- অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হবে। বাংলার মানুষ অবিলম্বেই বুঝতে পারলো এ কথার তাৎপর্য। সাজানো হলো কুখ্যাত আগরতলা মামলা’’। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান থেকে শুরু করে অনেককেই জড়ানো হলো এই সাজানো মামলার জালে। কিন্তু বাঙালী এটাকে মেনে নেয়নি। আর মেনে নেয়নি বলেই ১১ দফা আন্দোলনের সূচনা, ‘৬৯-এর আইয়ুব বিরোধী গণবিপ্লবের অভ্যুদয়। আইয়ুব খানের পতন ঘটলেও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন তাঁরই বরকন্দাজ পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত ধনকুবের সামরিক চক্রের আরেক প্রতিভূ আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রতি এবার তাদের নীতিতে কপটতার আশ্রয় নিল। দেশব্যাপী সাধরণ নির্বচনে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হলো। তারা মনে করেছিল জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করে তাদের শোষণের পাকাপোক্ত একটা রূপ দিতে পারবে। কিন্তু এবারেও বাংলার মানুষ এই চক্রান্ত প্রতিহত করলেন নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়যুক্ত করে। জাতীয় পরিষদে চক্রান্তের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই সামরিক শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষের উপর সরাসরি সামরিক হামলার পথ বেছে নিল।

পাকিস্তানের বিগত ২৩ বছরের ইতিহাসে এইভাবে বারবার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙালীর জাতিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের প্রচেষ্টাকে হিংস্র পন্থায় দমন করতে চাওয়া হয়েছে।’ ৪৮, ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০ সালগুলো বাংলার মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এক-একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পাল্টা হামলা চালিয়েছে নব নব কৌশলে। তাই’ ৭১-এর ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালীর জাতিসত্তা বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার শুরু হয়েছে স্বাধীন জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার পালা।

(আহমদ নাদিম রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও কয়েকটি নিয়মিত কথিকা।	'শব্দসৈনিক', ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।	আগস্ট-ডিসেম্বর,১৯৭১।

দর্পণ

২৬ আগস্ট, ১৯৭১

ক্যাম্পে বসে বসে সে তার পুরানো দিনগুলোর কথা ভাবছিল। সেই নদী, শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়, বন্দুকের শব্দ, পরান মাঝির চোখ-এক এক করে সব কথাই মনে পড়ছে। প্রথম যেদিন বন্দুক থেকে গুলি ছুড়েছিল সেদিনের কথাও।

সোনাগাছির চর পাখী শিকারের জন্য বিখ্যাত। শীতকালে নদী ক্রমশঃ শুকিয়ে এলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর পড়ে। এই চর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে তোরণের বাড়ি। বাড়ি বলতে অবশ্য ছোট দুটি কুড়েঘর, একট আমগাছ, গোটা কয়েক সুপারি গাছ। চালের উপর সারা বছর কুমড়ো গাছের লতা ছেয়ে থাকে। শীতের খুব ভোরে উঠে তোরণ সোজা চলে আসত নদীর পারে। বর্ষা পরিত্যক্ত নদীর পরিসর তখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। ঘাটে বাঁধা নৌকায় নদী পার হয়ে, চরের শিশির ভিজে ওঠা বালুর উপর দিয়ে আরও মাইল খানেক হাঁটার পর এলোমেলো চরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খালের পাড়ে এসে দাঁড়াত। খালের পাশেই বালুর উপর দুটো ছই পাতা। তার একটাতে খড়ের উপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ পরান মাঝি তখনও ঘুমাচ্ছে। তোরণ তাকে ডেকে তুলতো। খালে বেড় দিয়ে মাছ ধরার যন্ত্র সারারাত পেতে রাখা হত; তোরণ আর পরান দু'জনে মিলে গামছা পরে সব মাছ খাঁচিতে ঝেড়ে তুলতো। তারপর তোরণ নিজ হাতে ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে মালসা জ্বালিয়ে তাতে দুজনেই হাত-পা সেঁকে নিত। পরান নিজ হাত হুকো ধরিয়ে হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে আয়েশ করে খোঁচা খোঁচা মুখে ধোঁয়া ছাড়ত। এরপর একটা বাঁশের টুকরোর দু'পাশে দুটো খাঁচি বেঁধে নিয়ে নদীর ঘাট পার হয়ে কুয়াশা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেত গঞ্জের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে রাতের অন্ধকারে বসে থাকা তোরণের এক এক করে অনেক কথাই মনে পড়ল। তখন ওর বয়স প্রায় ২৩ বছর। বছর ন'য়েক পূর্বে ওর বাবা মারা গেছে। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধ মা ছাড়া আর কেউ নেই। পনের বছর বয়স থেকে সে পরান মাঝির সাথে কাজ করে। বৃদ্ধ পরান তাকে ছেলের চেয়েও বেশী স্নেহ করত।

সে শীতের সেই সকালগুলোর কথা ভাবছিল । পরান গঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলে, তোরণ মালসার পাশে বসে নতুন করে হুকো ধরিয়ে পরানের মত ভঙ্গিতে টানতো। ক্রমে ক্রমে কোন দিন কুয়াশা আরও পাতলা হয়ে আসত, কোন কোন দিন আরও ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চরের বালু পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিত। সূর্য উঠবে উঠবে ভোরবেলার ভাবটা যখন এইরকম ঠিক তেমনি সময় থেকে সোনাগাছির চরে অসংখ্য সৌখিন শিকারীর পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করত। এবং তাদের সবাইকে যেতে হ'ত পরান মাঝির মাছ ধরার জায়গার উপর দিয়ে। তারপরই বিস্তীণ চর-যেদিকে খুশী চলে যাওয়া যায়। এইসব শিকারীদের একজনের কাছ থেকে সে প্রথম বন্দুক চালান শেখে।

সেদিনও তোরণ যথারীতি বসে বসে হুঁকো টানছিল। বন্দুক হাতে জনাতিনেক লোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, চরের কোন অঞ্চলটায় ভাল পাখী পাওয়া যায় এবং এর জন্য তোরণকে তারা সঙ্গে নিতে চায়। উপযুক্ত পারিশ্রমিকেরও কথাও তারা উল্লেখ করল। তোরণ বন্দুক কোনদিন নিয়ে পর্যন্ত দেখেনি। চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, "যাবার পারুম এক শর্তোত, হামাক বন্দুক মারা শিখাবার নাগিবে।" যে ভদ্রলোক কালো একটা ওভারকোট গায়ে দিয়েছিলেন তিনি হেসে উঠলেন। মাছ মেরে শখ মেটে না, পাখী মারার ভীষণ শখ তাই না?

তোরণ কোন উত্তর দেয়নি, ভদ্রলোকরা রাজী হয়ে গেল। সেদিনই সে প্রথম বন্দুক ছুড়লো। লাল একটা কার্তুজ ভরে যখন তার হাতে বন্দুকটা দিল তখন সে নতুন একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের আনন্দে কেঁপে উঠেছিল, কিছুটা ভয়ও করেছিল। নির্দেশমত বাঁটটা বুকের কাছে শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে দিয়েছিল। এখনও সেই দিনের কথা ভাবলে তোরণের নাকে বারুদের গন্ধ এসে লাগে।

সেইদিনের থেকেই প্রায় প্রত্যেকদিন বন্দুক ছোড়ার শর্তে চরের যেসব অঞ্চলের প্রচুর পাখী সেইসব এলাকায় শিকারীদের নিয়ে যেত। তারপর দুপুরবেলা মাছ ধরার ডেরায় ফিরে আসত। ভোরে গঞ্জে যাওয়া বৃদ্ধ পরান দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরে আসত। আসার সময় বাড়ি থেকে খেয়ে আসত। পরান ফিরে এলেই তোরণ বাড়িতে ফিরে যেত। আবার সন্ধ্যেবেলায় দিকে কিছুক্ষণের জন্য আসত-তারপর আবার সেই ভোরের দিকে।

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের বাইরে বসে এক এক করে সব কথা মনে পড়ল। কবে তার বাবা মরে গিয়েছিল। কবে একবার নদীর পাঁকে পড়ে ডুবতে ডুবতে আশ্চর্যভাবে বেঁচে এসেছিল, একবার মাছের ডেরা ফেলে সারা রাত যাত্রা শোনার জন্য বুড়ো পরান মাঝি তাকে ভীষণ মেরেছিল । সব কথা এক এক করে মনে পড়ছে। কিন্তু একদিনের কথা তোরণ কিছুতেই ভুলতে পারে না। একদিন দেখল অসংখ্য নৌকায় চড়ে দলে দলে সব লোক যাচেছ! জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কুড়িগ্রামে নাকি বিরাট মিটিং-শেখ মুজিব বক্তৃতা করবেন। অতি পরিচিত নামটা শুনে তোরণ যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। বলে কয়ে কুড়িগ্রামমুখী একটা নৌকায় উঠে বসল।

এখনও মনে পড়ছে কি সে মিটিং। লক্ষ লক্ষ লোক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। অসংখ্য স্পীকার লাগান হয়েছে। ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। শেখ মুজিব বক্তৃতা দিলেন, বাংলার কথা বললেন, বাংলার মানুষের কথা বললেন। তোরণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে সমস্ত বক্তৃতা শুনলো।

মিটিং ভাঙ্গলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ফিরতি কোন এক নৌকায় ফিরে এসেছিল। ভোররাতের দিকে তাকে ঘাটে নামিয়ে দিল। তোরণ ভয়ে ভয়ে মছের ডেরায় ফিরে এসে দেখলো ছই-এর নীচে পরান চাচা নেই। সে অবাক হয়ে গেল। এরকম একটা ব্যতিক্রম পরান মাঝির জীবনে নেই বললে চলে। ভোরের দিকে মাঝি ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলো পরান মাঝিও মিটিং -এ গিয়েছিল। মাছের ডেরা ফেলে মিটিং-এ যাওয়া পরান মাঝির জীবনে এই প্রথম।

তোরণের জীবন থেকে একটা একটা দিন প্রতিদিনের মত খসে যেতে লাগল। এক সময় সারা দেশ জুড়ে ভোট হল, শেখ মুজিব নির্বাচিত হলেন । তারপর বাংলার বুকে খুব দ্রুত কতকগুলো দৃশ্যান্তর ঘটে গেল। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত ফাঁদলেন। আবার নতুন করে শুরু হল শ্লোগান, মিটিং, পোস্টার, ব্যানার। ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বৈঠক বসল।

গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লেকাজনের কাছ থেকে সব খবরই সে পেত। কিন্তু পরান মাঝি বিশ্বাস করত না। তোরণও বিশ্বাস করত না। 'ভোট দিনু যাক' ক্ষমতাও যাবার নয় এটা হবার পারে না।"

পরান মাঝি তখন নিশ্চিন্তে ডেরা নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন দেখল গঞ্জ থেকে ফিরে আসা লোকগুলো খুব উত্তেজিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে পত্রিকা। গ্রামের ছাত্ররা দল বেঁধে যেন দিন-রাত কিসব সলাপরামর্শ করে। থানায় পুলিশদের মধ্যেও এ কি উত্তেজনা।

তারপর একদিন ডুপুর গাড়িয়ে বিকেল হ'ল-বিকেল গড়িয়া সন্ধ্যা। ভোরে গঞ্জের দিকে বেরিয়ে যাওয়া পরান মাঝি ফিরে এলো না। অন্যান্য দিন গঞ্জ থেকে সারি সারি নৌকা ফিরতো। সেসবও দেখা গেল না। রাত্রিবেলার দিকে সে মাঝির বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। না, তখনও মাঝি ফেরেনি। তারপর রাত আরও বাড়লে গঞ্জ থেকে পালিয়ে আসা একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম বন্দরের উপর পশ্চিমা সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড গুলি চালিয়েছে। তোরণ মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়ল। কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে পরান মাঝি নিশ্চয়ই ফিরে আসত।

পরের দিন তোরণ গঞ্জের দিকে রওয়ানা দিল। স্কুলবাড়ির থেকে একটু ডুরে পাটের গুদামের পাশ দিয়ে গঞ্জের ভেতর ঢুকতে যাবে এমন সময় সমস্ত গা ছমছম করে উঠল। একটা লোকজন নেই। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেল বাজারে পোড়া ধ্বংসাবশেষ। তোরণের আর ভেতরে ঢোকার সাহস হয়নি। জোরে পা চালিয়ে বেরিয়ে সোজা গ্রামে চলে এসেছিল।

তোরণের এখন অন্য জীবন শুরু হয়েছে। বসে বসে পরান মাঝির চোখ ডুটোর কথা মনে করল। সেই চোখ ডুটো থেকে তোরণের জন্য সবসময় স্নেহ ঝরে পড়ত। না, পরান মাঝি আর গঞ্জ থেকে ফিরে আসেনি। সব বুঝতে পেরে তোরণ মাছের ডেরার পাশে গ্রামে চলে এসেছিল।

তারপর পশ্চিমা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন তোরণ মাছের ডেরায় কাজ করছিল, এমন সময় তাদের গ্রামের দিক থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল। তোরণের ছেঁড়া জাল মেরামত করা বন্ধ হয়ে গেল। সে খুব ভয় পেয়েছে। ঘণ্টা খানেক পর গুলির শব্দ থেমে গেল। বাড়িতে ফেরার সময় বার বার কেন যেন পরান চাচার কথা মনে পড়ল। গঞ্জে গুলি হয়েছিল। পরান চাচা আর ফিরে আসেনি। মা, পরান চাচার বউ এখনও কি বেঁচে আছে? ঘাটে নৌকো পেল না। পশ্চিমা দস্যুরা নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছে। সাঁতারে তোরণ নদী পার হ'ল।

তোরণ এখন মুক্তিযোদ্ধা। গতকাল একটা অপারেশনে গিয়েছিল। আবার আগামীকাল রাতের অন্ধাকারে পশ্চিমা দস্যুদের খোঁজে গ্রেনেড, এল-এম-জি নিয়ে কয়েকজন মিলে যেতে হবে। আজ রাতটা শুধু একটুখানি বিশ্রাম। ক্যাম্পের বাইরে একটা অন্ধকারে গাছের নীচে বসে বসে তোরণ এইসব ভাবছিল। সাঁতরে তোরণ নদী পার হয়ে কাছাকাছি আসতেই সে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। গ্রামের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঠিক শ্মশানের পরিত্যক্ত চিতার মত। গ্রামের ভেতর ঢুকে দেখতে পেল গুলি চালনার সময় যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা ফিরে এসে ছাইয়ের ভেতর থেকে তাদের আপনজনের মৃত লাশ খুঁজছে। তোরণ পাগলের মত দৌড়ে তার বাড়ির দিকে ছুটে গেল। ভিটের উপর তার মায়ের চিহ্ন খুঁজে পেল না। তারপর বাড়ির আশেপাশের ফিরে আসা ডু'চারজন লোককে জিজ্ঞেস করল। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। তোরণ পাগলের মত বাড়ির পেছনের বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে পড়ল। এমনও তো হতে পারে গুলি খেয়ে বাঁশঝাড়ে ঢুকে সেখানেই মারা গেছে। তন্নতন্ন করে সেখানে খুঁজতে লাগল । সেখানেও পেল না। তারপর বাড়ির থেকে আরও দূরে খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

ক্যাম্পের বাইরে বসে থাকা তোরণের চোখ দিয়ে ডু'ফোটা উত্তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে পড়ল। তাদের গ্রাম থেকে আধা মাইল খানেক দূরে একটা আমবাগানে আছে। তারি ভেতর তার মায়ের লাশের পাশে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিল তোরণ।

এখনও মায়ের কথা মনে পড়লে তার কণ্ঠেস্বর যেন কানে এসে বাজে। শীতের খুব ভোরে মাছ ধরার ডেরার দিকে যাবার সময় মা তাকে বলতো, "জার নাগিবে রে তোরণ, জার নাগিবে। মোর একখানা শাড়ি জড়ায়া নে ক্যানে?"

এই মা আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

তোরণ শুধু ভাবছে। সে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিল, তারি বন্ধু কাজল যে ইউনির্ভাসিটিতে পড়ত তার সথে একদিন দেখা হয়ে গেল। সে-ই তাকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

শেষবারের মত তার মায়ের কাঁচা কবরের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার পোড়া ভিটেটাকে পেছনে ফেলে রেখে কখনও নৌকায়, কখনও হেঁটে কাজলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে চল এসেছিল।

প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল। রাতের পর রাত জেগেছে। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু তোরণের মধ্যে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নামেনি। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দিনের পর দিন লড়াই করে চলেছে। সে জানে মাকে আর কোনদিন সে ফিরে পাবে না। পরান মাঝি আর কোনদিন ফিরে আসবে না। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে সে লড়ছে। তোরণ আবার সেই ফেলে আসা শীতের সকাল, গ্রামকে বিলুপ্ত করে দেয়া কুয়াশা, পানিতে ভেসে বেড়ান পানকৌড়ি, সোনাগাছির চরের উপর প্রসন্ন বুনো হাঁস এইসব হারিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো সুখ আবার আগের মত ফিরে পেতে চায়।

(আশরাফুল আলম রচিত)

রাজনৈতিক মঞ্চ

২ নভেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও গোপন দুরভিসন্ধি সে কি ছিলো গত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল রহস্যের উপসংহার ঘটালো গত ২৫ মার্চ থেকে জন্ম নিলো স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের লাখো মানুষের গলিত লাশের তলায় কবর হয়ে গেল পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কিছু অশের উপর আজও যেহেতু দখলদার হানাদার বাহিনী তাদের মরা পাকিস্তানের লাশকে জিন্দা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই কারণে বাংলাদেশ মৃত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্কে দু'চার কথা বলার অবকাশ আজও আছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, রাজনৈতিক কর্মী, যুদ্ধরত তরূণ এবং কৃষক-মজুর সকল শ্রেণীর মানুষকেই জানতে হবে পাকিস্তান নামক সেই মৃত রাষ্ট্রের প্রকৃত শ্রেণী-চরিত্র কি ছিলো, এবং কোন অনিবার্য কারণে তার মৃত্যু ঘটলো। এবং বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে আমরা শত্রুবাহিনী তথা শত্রুর নাম-নিশানা ও অস্তিত্বকে কেনই বা দ্রুত নিশ্চিহ্ন করতে চাইছি। এসব বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের ধারণা আজ স্পষ্ট হতে হবে।

একথা সবাই জানেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে যে মূল রাজনৈতিক শক্তি কাজ করেছিলো তার নাম হলো মুসলিম লিগ। এই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিলো দুটি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে। একটি হলো বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান জমিদার শ্রেণী এবং অপরটি হলো তদানীন্তন ভারতের গজিয়ে ওঠা

মুসলমান বণিক শ্রেণী, যারা সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য বণিক শ্রেণীর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলো। বাংলাদেশের মানুষকে বোঝানো হয়েছিলোঃ যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় মূলতঃ কৃষিজীবী, সেই কারণে তাদের মুক্তি নিহত আছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অমুসলমান জমিদার, জোতদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অমুসলমানদের উৎখাতের মধ্যে। মুসলিম লীগ বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক প্রচার জোরদার করে কাজ হাসিল করে নিল। আসল উদ্দেশ্য ছিলো দেশের অর্থাৎ গোটা পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের বাসস্থান বাংলাদেশকে বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উদ্বাস্তু বণিক শ্রেণীর একটি স্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরলপ্রাণ বাংলাদেশের মানুষ প্রথম দিকে তাদের এই গোপন দুরভিসন্ধি ধরতে পারেনি। তারা আশা করেছিলো দেশ ভাগ হলে সামন্ত ও আমলাদের হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে। সোনার বাংলা তার হৃত শ্রী আবার ফিরে পাবে। এই আশাতেই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগকে প্রথম দিকে সমর্থন করেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের অবাঙালী কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের আসল রুপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকাশ পেলেও শুরু থেকে বাংলাদেশের আপামর সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে তার প্রক্রিয়া হতে থাকে। বাংলাদেশের সচেতন ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের মধ্যেই তা সীমিত ছিলো। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনও ওই পর্যায়ের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিলো। পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা কিন্তু শুরুতেই আর একটা খেলা খেলেছিলো। সেটা হলো ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার। এবং আসল উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্যে এই সাম্প্রদায়িক প্রচারকে স্থায়ী করতে তারা ১৯৮৪ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করে। জন্মলগ্নে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের পক্ষে একটা সুবিধে হয়ে গেল। তারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের প্রথম এবং প্রধান জাতীয় সমস্যারূপে চিহ্নিত করলো। এবং কাশ্মীর সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেশের চিন্তা-ভাবনা, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই যাচাই করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতারা কাশ্মীরের দোহাই দিয়ে এগুতে লাগলো তাদের আসল উদ্দেশ্যের পথে। এর মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতার ভাগবোটোয়ারা নিয়ে আত্মকলহ যে বাধেনি তা নয় । বরং বলা যায় তাদের নিজেদের মধ্যকার কলহ-বিবাদ চরমে পৌঁছেছিলো, আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দেশে ঘটলো সামরিক অভ্যুত্থান। গজিয়ে ওঠা পুঁজিপতি ও আমলারাও তথাকথিত নেতাদের ঝগড়া-বিবাদ ও কামড়াকামড়িতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমারিক শাসনকে সমর্থন করে চললো। তারা সাপমরিক শাসনের সাহায্যে নিয়ে রাতারাতি ফুলে উঠতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশকে পশ্চিমক পাকিস্তানের একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করার সব রকম আয়োজন তারা গ্রহণ করলো। আইয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় অর্থাৎ আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় তাদের গতি হলো অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে এই দীর্ঘকালীন সামরিক শাসনে দেশের গণআন্দোলনের সর্বনাশ করা হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে যে গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিলো আইয়ুব তাকে গুঁড়ো করে দিলো।

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করা হয়। গোটা দেশের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সাম্প্রদায়িককতা ও ভারতবিদ্বেষের প্লাবন বইতে দিয়ে তারা এপথে এগিয়েছে। সচেতন বাঙালীরা যে এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি তা নয়, কিন্তু জানতে পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্লাবনের মুখে তাদের করার কিছু ছিলো না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিলো তার প্রথম একটা চিত্র পাওয়া গেল আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৩ সালে। এই সময় সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা ছিলো শতকরা ৫ ভাগ, বিমান বাহিনীতে ছিলো শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ এবং নৌবাহিনীতে ছিলো শতকরা ৩ ভাগ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে পুরোপুরি ফাঁকি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্বেও এর কৃষি উন্নয়নের জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা করা হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান-অনুর্বর অনাবাদী পশ্চিম পাকিস্তানকে কৃষি ও খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে

সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। এদিকে বাংলার যে সোনালী আঁশে পশ্চিম পাকিস্তানটা গড়ে উঠলো তাকেও শেষ করার চেষ্টা করা হয়। পাটচাষ ও পাটচাষীদের কৃত্রিম অসুবিধে সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৯ সালে টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসায় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পাটের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল এবং তাতে পাটচাষীরা ডুবে গেল।

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হলো। সুতীবস্ত্র, পশমীবস্ত্র, ইস্পাত, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী শিল্প-কারখানাগুলোর মধ্যে সবগুলোই করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববাংলায় বা বাংলাদেশে যা করা হলো তা অত্যন্ত নগণ্য, এবং তা করা হলো পশ্চিম পাকিস্তানী বণিক পুঁজিপতি তথা কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থেই। সরকারি খাতে বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায় রয়ে গেল। বেসরকারি বিনিয়োগ আরও শোচনীয়। সারা পশ্চিম পাকিস্তানকে সরকারি ও সরকরি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি শিল্প কারখানায় ভরে তোলা হলো। বাংলাদেশ হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপণ্যের বাজার। শুরু হলো বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ শোষণ। বাংলাদেশ পৃথিবীর বাজারে পাট বিক্রি করে ও চা বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা পেতো তার শতকরা আশি ভাগেরও বেশি খরচ করা হতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণের কাজে। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের স্বার্থে বিদেশ থেকে সাধারণের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানি বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা নিজেদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অত্যাধিক চড়া দরে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করলো তাদের দ্বিমুখী শোষণ। রফতানি ও বৈদেশিক সাহায্যের সবখানি ফল ভোগ করতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তান।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশকে বাদ দেয়া হয়েছে। তা যদি না দেয়া হতো তাহলে আর যাই হোক বাংলাদেশকেও ওদের কলোনীতে পরিণত করতে পারতো না। অবশ্য এ সবই হচ্ছে আজ গৌণ বিষয়। আজকের দিনের বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ পাকিস্তানীদের দীর্ঘদিনের শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে নিজেদের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে স্বাধীন সার্বভৌগ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেছে। দেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক দস্যুদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা দ্রুতগতিতে।

(সাদেকীন রচিত)

জনতার সংগ্রাম

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমি যতদিন শত্রু কবলিত থাকবে ততদিন আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। চূড়ান্ত জয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ আর থামবে না। এবং এই যুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই কথাগুলো আজ আর উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগে চালিত নয়, এই কথার সত্যতা আজ প্রতিটি বাঙালীর ধমনীতে প্রবাহিত। বিশ্ববাসীও বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে বাঙালীর এই অভূতপূর্ব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে।

নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিজের জমিতে চাষ করতে করতে কৃষক লাঙলের ফলা হাতে আজ শত্রুনিধনে তৎপর। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে পার্শ্ববর্তী চাষী ভাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলে ওঠে, পশ্চিম পাকিস্তানী শত্রুসৈন্যরা যতদিন আমাদের সবুজ মাটিতে আছে ততদিন আর শান্তি নেই। তার রক্ত জল করে উৎপাদিত

পাট-চা-ধান-ধানের মুনাফা লুটবে পশ্চিম পাকিস্তানী ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা আর কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। কারখানার শ্রমিক আজ বুঝতে পেরেছে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী মুনাফখোর শিল্পপতিদের শিকার মাত্র, কাজেই সর্বপ্রথমে তাদের সরাতে হবে এবং ঐ ধনিক গোষ্ঠীর অনুচর হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদল। ছাত্ররা আজ দিশেহারা, স্কুল-কলেজে আজ শিক্ষক নেই, ক্লাসগুলো বলতে গেলে প্রায় শূন্য, তারা আজ মিলিটারী জান্তার শিকার মাত্র। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সৈন্যরা বুঝতে পেরেছে তাদের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ। কেননা তাদের উপরে বসে আছে পাঞ্জাবী সামরিক অফিসাররা। দিনে দিনে সর্বস্তরে এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের প্রতিরোধ আকাংক্ষা। মার খেয়ে বাঙালী অস্ত্র তুলে নিয়েছে, তারা হাতিয়ার তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

তাই স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আজ সর্বস্তরের মানুষ সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে আজ কৃষক-মজুর-ছাত্র-পুলিশ-সৈন্য সকলেই যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। সামরিক অফিসার থেকে গ্রামের একেবারে সাধারণ একজন কৃষক যুবক প্রত্যেকেই মুক্তিবাহিনীর আজ সক্রিয় সদস্য, অর্থাৎ বীর যোদ্ধা। একজন কারখানার মজুরের পাশে বসে একজন ছাত্র বলছে সে কয়জন শত্রুকে নিহত করেছে। একজন শিক্ষক, যে কোনদিন রাইফেল ধারার কথা চিন্তাও করেনি সে আজ একজন পরিপূর্ণ যোদ্ধা। এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, এবং তারা যুদ্ধ করছে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়।

অনেক ত্যাগ এবং অনেক রক্ত দিয়ে বাঙালী আজ আরো রক্ত দিতে ও নিতে শিখেছে। এবার প্রতিটি রক্তবিন্দু ঝরবে শত্রুর রক্তের বদলা নিতে। অনেক রক্ত দেবার পর বাংলাদেশের সবুজ মাটি আজ নির্মম হয়ে উঠেছে। এই রক্তপাত ব্যর্থ হবার নয়। বীরের রক্ত কখনো ব্যর্থ হয় না এই সত্য মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা বুঝতে ফেলেছে।

আমাদের স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামে প্রথম দিকের অস্ত্রর সংগ্রহের অভিযান এখন শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে আমাদের ভয় ছিল আমরা অস্ত্র পাব কোথায়। এখন আমাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র এসেছে। আরো আসছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের মত ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র। এমনকি তাতে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। আমাদের টাকায় কেনা অস্ত্র আজ আমাদের হাতে এসেছে শত্রুর হাত হয়ে। বাঙালীদের টাকায় শত্রুরা যে অস্ত্র কিনেছিল দেশরক্ষা করতে, সেই অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের মারছে। আমরা রুখে দাঁড়িয়ে সেই অস্ত্র কেড়ে নিয়েছি এবং নিচ্ছি। প্রতিটি গেরিলা আক্রমণে আমাদের পীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে রাইফেল, মর্টার, মেশিনগান, কামান। সেই অস্ত্র বাঙালীদের ঘরে ঘরে উঠছে। মুক্ত এলাকায় আজ প্রত্যেকেই রাইফেল চালাতে জানে, অস্ত্র আজ তাদের খেলা। বাঙালী আজ বুঝতে শিখেছে যে এই অস্ত্র দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে, এই অস্ত্র আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এবং অস্ত্র দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে- নিয়মতান্ত্রিক পথে কিছু আদায় করা যাবে না, শত্রুর সঙ্গে কোন আপোস নেই। যুদ্ধ করেই মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কিউবার মুক্তিসংগ্রাম থেকে আমরা শিখেছি স্বাধীনতাস্পৃহাই হচ্ছে বড় কথা। এই স্বাধীনতার আকাংক্ষাই সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। বুকের মধ্যে একবার এই আগুন জ্বলে উঠলে তা আর কোনদিন নেভে না। আমাদের বুকের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন প্রতিনিয়ত খেলা করছে তাকে পৃথিবীর কোন শক্তি নির্বাপিত করতে পারে না, সেই আগুন দিনে দিনে শুধু বেড়েই থাকে। একবার সেই আগুন জ্বলে উঠলে কোনদিন আর নেভে না। বাংলার বুকে আজ সেই আগুনের অনির্বাণ শিখা। শত্রুকে চিরতরে শেষ করে তাতেই তার শান্তি। এমনকি স্বাধীনতার এই স্পৃহা বা আগুন থেকে কোন মানুষ নিজেকেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলেও এই আকাংক্ষা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। এমনকি এক সময় এই স্বাধীনতাস্পৃহা এমনভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে যে ভীতু এবং দুর্বল লোক পর্যন্ত সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়ে ওঠে । তখন সে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয় শত্রুর ওপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোন বাধা তখন তার কাছে আর বাধা থাকে না। আমাদের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসামানী বলেছেন, ‘‘আমাদিগকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে

রাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে হবে। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে হবে যাতে শত্রু এক মুহূর্তের জন্যেও অবকাশ না পায়।" তিনি আরো বলেছেন, "আপনাদিগকে দলমতনির্বিশেষে সকল পার্থক্য ভুলে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, পরিকল্পনা প্রস্তুতি নিতে হবে, শত্রুর উপর আঘাত হানতে হবে, এবং শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে। শেষ শত্রুটি ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না।" -এই যুদ্ধ তাই প্রত্যেক বাঙালীর যুদ্ধ, এই মুক্তিযুদ্ধে তাই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে সংগঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। তারা রাতদিন চেষ্টা করছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৃঢ় মনোবল আমাদের সহায়। আমাদের অস্ত্র যোগাবে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পাওয়া শত্রুর হাতের অস্ত্র। এবং মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়েই। এমনিভাবে মুক্তিবাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রগতি চলছে দুর্বার ও দুর্দম গতিতে; তারা আর থামবে না, কোনদিন থামবে না। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পূর্বে, চূড়ার বিজয়ের পূর্বে এই যুদ্ধ থামবে না। কারণ প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা জানেন-

আমি সেই দিন হত শান্ত-

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না;

অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

(বিপ্রদাস বড়ুয়া রচিত)

অভিযোগ*

.....১৯৭১

বাঙালীর মনোবল ভাঙতে ত্রাস সৃষ্টির জন্যে ধ্বংসযজ্ঞের প্রথম ক'দিন হাজার হাজার বাঙালীর লাশ ওরা পথে-ঘাটে ছড়িয়ে রাখলো। সংসার-নিস্পৃহ ডক্টর গোবিন্দ দেব, আমার বন্ধু অধ্যাপক জ্যোতির্ময়, ডক্টর মনিরুজ্জামান, সপ্ততিবর্ষী আইনজীবী ধীরেন্দ্র দত্ত, নব্বই বৎসরের ভিষগাচার্য যোগেশ ঘোষ, মিউনিসিপ্যালিটির মেথর, স্টেশনের কুলি, নৌকার মাঝি, ক্ষেতের চাষী, নদীর জেলে, গায়ের তাঁতী, ঘাটের ধোপা, পথের নাপিত, হাটের পশারী, গঞ্জের মহাজন, মসজিদের ইমাম, গীর্জার পাদ্রী, মন্দিরের পুরোহিত- সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল শ্রেণী-ধর্মের নিরীহ বাঙালীর শবদেহ অসনাক্তভাবে কুকুর-শকুনের ভক্ষ্য হল সকলের চোখের সমানে। মনুষত্বের এতবড় অবমাননা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও সম্ভব হতো বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর সেই জন্যেই বোধ করি এই অমানুষিক বর্বরতা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবু বলব, দুষ্কৃতি দমনের নামে যারা বাঙালীর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুট করল, জাহাজ ভর্তি নতুন নতুন গাড়ী, টেলিভিশন, রেডিও, রিফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার ব্যক্তিগত মালিকানায় পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করল, কোটি কোটি টাকার অর্থ, অলংকার প্রকাশ্য মানি অর্ডার, পার্সেল অথবা পি-আই-এ কার্গো মারফত নিজের নিজের এলাকায় পাঠিয়ে দিলো, হাজার হাজার অবাঙ্গালীর হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিয়ে বাঙালী নিধনে লেলিয়ে দিলো, হাট-বাজার, গ্রাম-জনগত পুড়িয়ে শ্মশান করে ফেললো, দশ লক্ষাধিক বাঙালীর মৃতদেহ খাইয়ে জলের হাঙ্গর-কুমীর ও ডাঙ্গার কুকুর-শেয়াল-শকুনের সখ্যতা অর্জন করলো, দীর্ঘদিন ধরে যারা সেই ঘাতক দস্যুদের এই সব ক্রিয়াকীর্তি সার্কাসের দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পরিমণ্ডল থেকে চিরনির্বাসনের সড়ক তাঁরা নিজেরাই প্রশস্ত করে নিলেন।

---

* কবি সিকান্দার আবু জাফর ১৯৭১ সালের ২৬ জুলাই একটি অভিযোগ-ইশতেহার প্রকাশ করেন। এটি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়। এখানে তার অংশবিশেষ সংকলিত।

পাকিস্তানী হানাদারদের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সংহতির পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা শহীদ মিনারগুলো ধ্বংস করে নিজেদের পদলেহী কিছুসংখ্যক গরুচোর দিয়ে সেখানে নামাজ পড়াচ্ছে। অর্থাৎ ওইসব জায়গার এক-একটা মসজিদের দাবী খাড়া করানো হচ্ছে। মজার ব্যাপার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটগাছটিকেও তারা নির্মূল করে উপড়ে ফেলেছে। যেন ওই বটগাছের ডালগুলোতেই বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা ট্রাপীজ খেলতো। বাংলাদেশে হিন্দুর অস্তিত্ব পাকিস্তানী সংহতির পরিপন্থী। কাজেই তাবৎ হিন্দুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা পালিয়ে বেঁচেছে তারা এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকছে কিন্তু একজনেরও সম্পত্তি নিজেদের দখলে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের পেশাদার বাঙালী গুণ্ডারা সেগুলো দখল করে বসে আছে। তাই যখন ইয়াহিয়া খান বাঙালী হিন্দুদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তথা অতি দুঃখেও হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, হিন্দুরা তো আসবে কিন্তু উঠবে কোথায়? নিজের নিজের বাড়ি বলতে যা বোঝাতো সে তো পুড়ে-জ্বলে খাক। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও কি আর খালি আছে?... হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মাটির বরাবর করা হচ্ছে তা-ও দেখছি চোখের সামনে। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন এলাকার লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমানদের সম্পত্তি এখন অবাঙালীদের দখলে। ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বাঙালী খেদানো এবং নির্বিচারে বাঙালী নিধন শুরু হয়েছে ২৩ শে মার্চ থেকে। ওই দুটি অঞ্চলের তাবৎ বাঙালীর সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং অবাঙালীদের অধিকৃত। ভারতে শরণার্থী বাঙালী মুসলমানেরা ফিরে এলে যথাসময়ে ওইসব অবাঙালীদের অস্ত্রের শিকার হবে। আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের হাজার হাজার বাঙালী ছাত্র যুবককে পাকিস্তানী ঘাতকরা ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলেছে। এখনও ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো মেরেও ফেলেছে। উদ্দেশ্য, সক্ষম বাঙালী যুবকদের খতম করে বাঙালীদের বাহুবল ভেঙ্গে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের দেয়া ভারতীয় সংহতির চোহারা- ''শক হুনদল পাঠান মোগল এবং দেহের হলো লীন''- আমরা দেখলাম, পাকিস্তানী সংহতি কসরতে হানাদার সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবী পাঠান বিহারী বালুচ অফিসার জওয়ান পাইকারী হারে অপহৃতা বাঙালী নারীদেহে লীন হচ্ছে। দূরপ্রসারী অভিসন্ধি হয়তো একটি মিশ্র জেনারেশন সৃষ্টি করা। সেটা রোধ করতে গেলে আমার আশঙ্কা, যে পরিমাণ গর্ভপাতের প্রয়োজ হবে তাতে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় মেটারনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে শত শত বিশেষজ্ঞ ধাত্রী আমদানি অপরিহার্য। আজ এদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ আমদানি হচ্ছে। বাঙালী অফিসার বাদ দিয়ে তাদের জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। বাঙালী অফিসারদের যারা অবাঞ্ছিত তাদের মেরে ফেলা এবং আধা-বাঞ্ছিতদের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্যে জেলে পোরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই একই ব্যবস্থা হবে শিক্ষক, সংস্কৃতিবিদ এবং সাহিত্যকদের ক্ষেত্রেও। ফলে গড়ে উঠছে অবাঙালী তাঁবেদার গোষ্ঠী এবং সুবিধাভোগী বাঙালী মীরজাফর শ্রেণী। বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং গুরুত্ব হ্রাস করা হচ্ছে শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁবেদার গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি বাড়িয়ে। এই সংহতি অভিযানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কোন ফললাভের সুযোগ আমাদের নেই। কারণ এসবই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত বাঙালী আজ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে মুক্তি সংগ্রামের দুর্জয় অঙ্গীকারে। বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক বাংলার বাছাই করা বীর সন্তানেরা। তাদের সঙ্গে নিজেদের বন্ধু-আত্মজনের রক্তস্নাত তৎখালীন ই-পি-আর, পুলিশ, আনসার বাহিনী আর মুক্তি- মাতাল বাঙালী তরুণ কিশোর ছাত্র এবং ছাত্রীরাও। রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেছিলেন "বাঙলার মাটি বাঙলার জল বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল পুণ্য হউক।''- আজ এতদিনে শ্রেণী বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে নিরীহ বাঙালী নরনারীর রক্তধৌত বাংলার মাটি মহাপুন্যাস্নাত হয়েছে। পাকিস্তানী হানাদার ঘাতকেরা ইতিহাসের একটি সহজ সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি যে, সার্বিক মৃত্যু ছিটিয়ে একটি জাতিকে আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত রাখা যায় না।

জাতীয়তাবাদ কোন একটা নির্ভরযোগ্য নীতি নয়। আমার মানসিক প্রস্তুতি আন্তর্জাতিকতাবাদ গ্রহণ করারই সপক্ষে। কিন্তু পাকিস্তানের কালে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন কবিতায় বাঙালী

জাতীয়তাবাদকেই আমি বলিষ্ঠ আকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। এর কারণ, প্রথম থেকেই বাঙালীর সমস্যা হয়েছে নবজাত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করার জন্যে, অস্থিমজ্জায় একান্ত আত্মীয়তার পরিচয়ে স্বাক্ষরিত, বাঙালী জাতীয়তাবাদ বর্জনের তাগিত। এই তাগিদ এসেছে প্রধানতঃ দ্বিজাতিতত্বের প্রবক্তা এবং তাদের অনুগামী গোষ্ঠীর কাছ থেকে, পাকিস্তান যাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে এক উজ্জ্বল সূর্য-সম্ভাবনায় পরিণত হয়েছে। এদের প্রায় অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পতি এবং পাকিস্তানী জঙ্গীযন্ত্রের পরিচালক। দেশ-বিভাগের প্রথম দিন থেকেই এরা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্তে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমূলে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং সেই একই দিন থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে বাঙালী যতই লুণ্ঠিত, নিগৃহীত এবং অপমানিত হয়েছে ততই হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতীয়তাবোধ তার কাছে উজ্বল হতে উজ্জ্বলতর দীপ্তিলাভ করেছে। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য-নরহত্যা, লুণ্ঠন এবং নারীধর্ষণের অভিজ্ঞতা আর স্বাধীনতা লাভের আগে দীর্ঘ দুই শতাব্দী শৃঙ্খলিত শিকারী কুকুরের মত ঔপনিবেশিক প্রভুর পদলেহনের কৃতিত্ব। বাঙালীর আত্মমর্যাদা এই চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে কোনদিনই তাকে আত্মহননের উদ্দীপ্ত করতে পারেনি। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতকেরা আজ বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার পরিকল্পনা সূচীত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটি থেকে।

আর সার্বিক অবলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালীর পক্ষে আত্মসংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। শিক্ষক হিসেবে যাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশ্নাতীত মর্যাদা, তারা আজ শুধুমাত্র পেশাদার চাকুরে। ডাক্তার কিম্বা ইঞ্জিনিয়ার, বিচারপতি কিম্বা আইনজ্ঞ হিসেবে নিজের নিজের কৃতিত্বে যারা গোটা দেশের জন্যে অপরিহার্য তারা আজ অনিশ্চয়তা এবং বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আত্মবিস্তৃত, চাষী-মজুর বাস্তহারা, দিশাহারা। সরকারী কর্মচারী আজ নিরক্ষর সিপাই প্রভুর ভ্রূকুটিলাঞ্ছিত মর্যাদাহীন হুকুমের নফর। ব্যবসায়ী-শিল্পপতি আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় নিষ্পিষ্ট নিরূপায় সরীসৃপ। ছাত্রছাত্রীরা আজ উদ্দেশ্যহীন আকাংক্ষাহীন। এমন সামগ্রিক মৃত্যুর আবর্তে কোন জাতি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। তাই বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন আজ অগণিত আত্মপরিজনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এক বেদনায় একাত্ম হয়েছে, এক প্রতিজ্ঞায় বাহুবদ্ধ হয়েছে- মৃত্যুর বিনিময়-মূল্যেই তারা মৃত্যুকে রোধ করবে। বাংলার মাটিরে পূণ্য-পীযুষধারায় সঞ্জীবিত প্রাণ একটি বাঙালী বেঁচে থাকতে বাংলাদেশের এই মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হবে না।

(সিকান্দার আবু জাফর রচিত)

চরমপত্র

....১৯৭১

মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরোমুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচকা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলো তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা- আ-আ-আ- দম ফেলাইতেছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরি হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ- ভৈরব থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মধ্যে তো দেখতাছি- লেখা রইচে ভৈরবে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস ব্যাস আর কইতে হইবো না- বুইজ্যা ফালাইছি। বাকীগুলোর বুঝি হেই কারবার হইয়া গেছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১ জন কীর লাইগা? তোমার কতজন আছিলা? খাড়াও খাড়াও- এই যে পাইছি কালিয়াকইর-১২৫ জন। তা হইলে ১১৪ জনের ইন্নালিল্লাহে ডট ডট ডট রাজেউন হইয়া গেছে। হউক, কোন ক্ষতি নেই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলর বাঙ্গালমুলুকে আনা হইছিলো। আরে এইগুলি কারা? যশুরা

কই মাছের মতো চোহারা হইছে কীর লাইগ্যা। ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট হওনের গতিকে এই রকম লেড়লেড়া হইয়া গেছো। অ্যাঁ: তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা? কী কইলা-তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল নাঃ- ও-অ-অ-অ বাকী হগগলগুলোরে বুঝি বিচ্চুরা মেরামত আছে? গাং- এর পারে পাইয়া আর মাসে পানির মাইদ্দে চুবানী মারছে। কেইসডা কী? আমাগো বকশীবাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস না। কইছিলাম না, 'বাঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইন্দে মছুয়াগো মউত তেরা পুকারতা হ্যা।' নাঃ তখনই কী চোট-পাট-হ্যান করে গা, ত্যান করেগা; আর তখন! অখন তো মওলবী সাবরা কপিকলে মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্চু, পিছনে বিচ্চু, ডাইনে বিচ্চু, বাঁয়ে বিচ্চু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে। 'ইডা হ্যামি কী করছুনুরে, হ্যামি ক্যা নানীর বাড়িতে আচ্ছিনুরে। হামি ইডা কী করণুরে।' আতকা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, 'ভাইসাব, আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতেছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা মাথাডা এ্যাঙ্গেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহী কী! শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার চাপ মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়ইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়ার বশীর তাগো জিগাইলো 'তুম লোগকো কাপড়া কেধায় গিয়া? জবাব আইলো 'যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আচিয় আণ্ডারউইয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি-হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া- হামলোগ তো আভি নাঙ্গা মছুয়া বন গিয়া?' আতকা ঠাস ঠাস কইরা আওয়াজ হইলো- ডরাইয়েন না ডরাইয়েন না। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাবড়াইতে শুরু করেছে- 'পদ্মা নদীর কূলে আমরা নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমরা নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার দাদা মরেছে, গাবুর বাড়ির চোটে আমরা কাম সেরেছে। ব্যাস মওলবী রাও ফরমান আলী, ঠেটা মালেক্যা ভাগোয়াট হওনের গতিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনরকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা হইলে তুরনদ আমাগো কইয়া দাও কীভাবে বিচ্চু আর হিন্দুস্থানী ফোর্সের পা ধরলে আমার লেড়লেড়া আর ধ্বজভংগ মার্কা বাকী সোলজারগো জানটা বাঁচানো সম্ভব হইব।' এই খবর না পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজী আর সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? ছদর ইয়াহিয়া লগে লগে উ থান্টের কাছে টেলিগ্রাম করলো, 'ভাই উ থান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এইরকম কারবার করছে। হের চিডিডারে চাপিশ কইরা ফালাও। এদিকে আমি আর শাহনেয়াজ ভূট্টোর ডাউটফুল পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতেছি। একটুক নজরে রাইকখো।' বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করণের খুবই খায়েশ রইছে। সাবে কইছে কীসের ভাই, আহলাদের আর সময় নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা। ব্রাকেট শেষ জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে টু-উ-উ মারত মানে কিনা লুকোচুরি খেলা খেলতাছিলো। তারপর জাতিসংঘে আতকা কান ধইর্যা উঠ বস উঠ বস কইরা ভুট্টো সাবে চিল্লাইতে শুরু করলো, আর লাইফে এইরকম কাম করুম না। বাঙ্গাল মুলুকে আমরা গেনজাম কইর্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি।- আমাগো এইবারের মতো ক্ষমা কইর্যা দেন। কিন্তু ভুট্টো সাহবে বহুত লেইট কইর্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ কথাবার্তায় আর কাম চলবো না। ঠাস ঠাস কী হইলো? কি হইলো? সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসংঘে ভেটো মাইরা হগগল মিচকী শয়তানরে চীৎ কইর্যা ফালাইছে। কইছে ফাইজলামীর আর জায়গা পাওনা? এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরান জানের জান চাচা নিক্সন কড়া কিসিমের টিরিক্স করনের লাইগ্যা সপ্তম নৌবহরের সিঙ্গাপুরে আনছে। লগে লগে সোভিয়েট রাশিয়া একটুক হিসাব কইর্যা কামকরণের লাইগ্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্দি ক্রেমলিন থাইক্যা কইছে পাক-ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলাইলেই ভালো হয়। ব্যাস, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিঙ্গাপুর আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো। এ্যাঃ এ্যাঃ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হারাধানের একটা ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ, হেইটা গেলো গাথার মাইন্দে

রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের মাইন্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে, আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কি হইবো? আমি পাইট করুম, পাইট করুম। আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া উঠলো এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজীর ফুলপ্যান্টোর দুই রকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং, কেইসডা কী? অনেক থিংক করলে বোঝন যায় এর মাজমাডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম...

(এম আর আখতার রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৭। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত বাংলা কথিতমালা।	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	মে-ডিসেম্বর, ১৯৭১

সাময়িকী

২৮ মে, ১৯৭১

স্বাধীন বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের নিধনযজ্ঞে নেমে পাকিস্তানের সামরিকশাহী অকল্পনীয় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। লণ্ডনের যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, দেড় হাজার মাইল দূর থেকে এসে বাংলাদেশে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর দৈনিক এককোটিরও বেশি টাকা খরচ হচ্ছে- এ হিসেবে যুদ্ধের প্রথম পঞ্চান্ন দিনে পাকিস্তানের আড়াইশ' কোটি টাকা খরচ ও ঘাটতি হয়েছে। মার্চ মাসের শুরু থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন মাল রপ্তানি না হওয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ নেমে কমেছে ১৫ কোটি ডলারে। বাণিজ্য খাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

ফ্রান্স-এর পত্রিকা 'লা ফিগারো'র মতে যুদ্ধের প্রথম মাসে অর্থাৎ প্রথম ত্রিশ দিনে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের পশ্চিম পাকিস্তান একশ' কোটি টাকা হারিয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা ছিল ১২৭ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৯০ কোটি টাকা। যুদ্ধের দরুন এপ্রিলের শেষে সেই অংক কমে ৮২ মিলিয়ন ডলারে, অর্থাৎ প্রায় ষাট কোটি টাকায়। এবং বর্তমানে সেটা এসে ঠেকেছে ২০ কোটি টাকার কাছে।

পাশ্চাত্যের অর্থ-বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন দেশের সংরক্ষিত তহবিলে বিশ কোটি ডলার অর্থাৎ এক শ' কোটি টাকা জমা থাকা উচিত। এর কম হলে সে দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়া দেশ বলা হয়। পাকিস্তানের সংরক্ষিত তহবিলে এখন জমা আছে মাত্র ২০ কোটি টাকা। এদিক থেকে পাকিস্তান এখন সত্যসত্যই দেউলিয়া দেশ।

ফলে পাকিস্তানী টাকার মূল্যমান কমানো অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান কমাতে সম্মতও হয়েছে। কারণ এখন আর উপায় নেই।

ফ্রান্সের 'লা ফিগারো' পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে যে, মার্কিন সরকার পাকিস্তানের সামরিকশাহীকে এ বছর ষাট কোটি টাকার সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা দেয়া হচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৫ শে মার্চ অর্থাৎ বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনানায়করা যুদ্ধ শুরু করার দিন থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া স্থগিত রেখেছে। বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুত সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকার সাহায্য বন্ধ রয়েছে।

এদিকে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট উপদেষ্টা মি.এম,এম আহমদকে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনো ঋণ দেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে।

জার্মান পত্রিকা 'আলগেমাইনে জাইটুং'-এ এই মর্মে সংবাদ ছাপা হয়েছে যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ চালাতে গিয়ে পাকিস্তানের রফতানী এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং যুদ্ধ খাতে প্রচুর ব্যয়ের জন্য পাকিস্তান এখন আর্থিক দেউলিয়া দেশে পরিণত হয়েছে।

ইয়াহিয়া খানের অর্থ-উপদেষ্টা মি. এম,এম আহমদ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বলেছেন, পাকিস্তানের মাত্র তিন-চার মাসের খাদ্যশস্য মজুদ আছে। সেখানে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করতে গিয়ে পাক-সেনারা বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ রেলপথ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বর্তমান শতকরা ৮০ ভাগ রেলপথই অকেজো। ফলে বাংলাদেশে সরবরাহ ব্যবস্থা বিলকুল বন্ধ- মানে প্রায় তিনমাস ধরে বন্ধ। তাছাড়া প্রায় তিনমাস ধরে চট্টগ্রাম ও চালন বন্দর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। বাংলাদেশের কল-কারখানা বন্ধ-ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নেমে এসেছে রীতিমতো আকাল।

অপরপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত কোনো জিনিসপত্র গত তিনমাস ধরে বাংলাদেশে আমদানী কলা সম্ভব হয়নি। অথচ এই বাংলাদেশেই গত ২৩ বৎসর ধরে পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের বাজার ছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অচলাবস্থার দরুন বাংলাদেশে থেকে যেমন চা, পাট, পান, সুপারি পশ্চিম পাকিস্তানের নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও কোন মালামাল এখান আমদানী করা সম্ভবপর হয়নি। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদনকারীরা অতুলনীয় ব্যবসায়ীক সংকটে পড়েছেন। এদিকে বাংলাদেশে পাক-সেনারা জানমালের যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং এখনো করছে তার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে বিরল।

এ অবস্থায় পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করেছেন। ১৪ বৎসর ধরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন কায়েম থাকায় এবং এবার জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বরং বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী-নির্যাতন ও লুটতরাজসহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মতো লাভজনক বাজার হারাতে বসায় পঃ পাকিস্তানের সর্বত্র খান-সরকারের অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে থেকে ইয়াহিয়াশাহী অবিলম্বে সেনাবাহিনী গুটিয়ে না নিলে আর্থিক ও জানমালের ক্ষতি যে কি পর্যায়ে পৌঁছে তা বলা দুষ্কর- তাই জঙ্গীশাহীর অর্থর-বিশেষজ্ঞরা আজ আতঙ্কিত হয়ে কি ভাবছেন না যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি?

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ রচিত)

বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় অভিমত

৬ জুন, ১৯৭১

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলিম দেশের পত্রপত্রিকা সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে এবারই প্রথমবারের মত সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্টের পত্রপত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি মুসলিম দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যান্ত আশা ও আনন্দের বিষয় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে আমরা বিশ্ববাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়ে আসছি।

* সিরিয়ার 'আল-তাউরা' পত্রিাকায় ২৭ শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পূর্ব বাংলায় সামরিক অভিযান শুরু হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে পাকিস্তানের মিলিটারী শাসকগোষ্ঠী দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা ফিরে আসুক, এটা চাননি। তারা এটাও চানটি যে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমে হোক।

* তুরস্কের দৈনিক 'জমহুরিয়াত'-এ ২৮ শে মার্চ তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পশ্চিম পাকিস্তান তাদের কামান-বন্দুক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে দমন করতে শুরু করেছে কিন্তু একটু আগে বা পরে পূর্ব বাংলা তার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

* মালয়েশিয়ার দৈনিক 'উতশান মালয়েশিয়া' পত্রিকার ৩০ শে মার্চ তারিখে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পাকিস্তানের মিলিটারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্বয়ং বুঝেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার জনগণের অবস্থা ও ভাগ্যের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা ও উদাসীন মনোভাব পোষণ করায় বাংলাদেশে গণ-অসন্তোষ বিরাজ করছে। বর্তমানে ইয়াহিয়া খান পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে, পূর্ব বাংলা কোন স্বাধীন দেশের অংশ নয়- বরং পূর্ব বাংলাকে বলা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনী।

* সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রোসে আল-ইউসুফ'-এর এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

অনেক পর্যবেক্ষক এই ভেবে অবাক হয়েছেন যে, পূর্ব বাংলা এতদিন পরে কেন স্বাধীনতা চাইল! পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে পূর্ব বাংলায়। অথচ পাকিস্তানের মোট সাধারণ বাজেটের ৪ ভাগের ১ ভাগের চাইতে কম অর্থ ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বাজেটের তিন ভাগের একভাগের চেয়েও কম টাকা ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়। আর বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানিজাত আয়ের মাত্র ৪ ভাগের ১ ভাগ পায় পূর্ব বাংলা। সরকারি চাকুরির মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং সামরিক বিভাগীয় চাকুরির শতকরা মাত্রা ১০ ভাগ পেয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষ। ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় দেখা গেছে যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিটি বেশী নজর দিয়েছে।

* সুদানের দৈনিক 'আল-সাহাফা' পত্রিকার ৫ই এপ্রিল তারিখের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র দ্বারা বঞ্চিত ও শোধিক হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করে আসছে। পূর্ব বাংলার এই অভিযোগের কারণ হলো এইঃ

১। পাকিস্তানী সামরিক অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের শতকরা ৯০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেয়া নেওয়া হয়েছে।

২। বেসামরিক সরকারী অফিসার পদে ৮০% পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। পাকিস্তানের বার্ষিক আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

৪। রপ্তানিজাত আয়ের ৮০% ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্রা ২০% ব্যয় হয় পূর্ব বাংলায়।

এ সকল কারণেই পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত মনে করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে পূর্ব বাংলার ১৭% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২%। পূর্ব বাংলার অধিকার সচেতন মানুষের কাছে এখন এ বিষয়টি একেবারে খোলাসা হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট, চা ও চাউল বিদেশে রপ্তানী করে যে আয় পাকিস্তানের হয়, তা পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্যই ব্যয় করা হয়। এ কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা পূর্ববাংলার মানুষের কাছে তাদের সম্পদের শোষক ও বঞ্চনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব বাংলার মানুষের টাকা দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে যে রাজধানী গড়া হলো হলো তাতেও খরচ করা হয়েছে ৫শ' কোটি টাকা।

এ সকল ন্যায্য কারণেই পূর্ববাংলা স্বায়ত্তশাসন চেয়েছে।

* আফগানিস্তানের দৈনিক 'আফগান মিল্লাত'-এর এক প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ

পশ্চিম পাকিস্তানী একচেটিয়া পুঁজিবাদী এবং ফৌজী নেতারা এ অবস্থা দেখতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না যে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা বাঙালীর হাতে যাক। এ কারণেই তারা জাতীয় পরিষদের বৈঠক বানচাল করতে সচেষ্ট ছিল। এবং পরিষদের অধিবেশন বসবার আগে একটা কিছু গোঁজামিল দিয়ে বাঙালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতা করতে ফন্দি এঁটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র ন্যাপপ্রধান ওয়ালী খানই এসব বেআইনী ও অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেছেন। তার দাবি ছিল, যেকোনো সমস্যার সমাধানের পন্থা পরিষদের বৈঠকে বসেই স্থির করতে হবে।

পশ্চিমা শাসকচক্র দেখলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পূর্ব বাংলাকে শোষণমুক্ত করতে চান না, একই সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত ও বঞ্চিত প্রদেশগুলোকেও পুঁজিপতি ও সামরিক জান্তার শোষণ থেকে মুক্ত করতে চান। কাজেই ক্ষমতা হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় ইয়াহিয়া খান, ভুটো পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি নস্যাৎ করার জন্য আঁটলেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্র-পূর্ব বাংলার এঁরা পাঠালেন সেনাবাহিনী।

* কুয়েতের দৈনিক 'আখবার আল-কুয়েত'-এর ৬ এপ্রিল তারিখের এক সম্পাকদীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছেঃ

শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, নির্বাচনের জয়লাভ করলে তার দল পূর্ব বাংলা জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করবেন। নির্বাচনের তার দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো। শেখ সাহেবের দাবি ছিল ন্যায্য, আইন-সঙ্গত এবং গঠনমূলক। তিনি চাইলেন গণতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং দেশের সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে

সশস্ত্র ধ্বংসাভিযান চালিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলেন। ভাইয়ে ভাইয়ে এই হত্যাকাণ্ড সৃষ্টির অপরাধে ইয়াহিয়া খানকে ভবিষ্যৎ বংশধররা কোনদিন ক্ষমা করবে না।

(আবুল কাসেম সন্দ্বীপ অনূদিত)

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা

১১ জুন, ১৯৭১

পঁচিশে মার্চের রাত্রির সুপ্তি থেকে সমগ্র বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। মধ্যরাতের দুঃস্বপ্নে অকস্মাৎ কেঁদে উঠেছিল ঢাকা নগরী। সে কান্না মায়ের জঠর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নবতর জন্মলাভের কান্না। বিশ্বাসঘাতকতার খোলস ছেড়ে নতুন সূর্যোদয়ের মতই স্বাধীন বাংলা পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। তার মুক্ত আলোকচ্ছটা সূর্যকরের মতই সত্য আর স্বচ্ছ।

সুজলা সুফলা বাংলা আজ বিশ্বের বিস্ময়ে পরিণত। কৃষাণের লাঙ্গল রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ারে, শ্রমিক তার হাতুড়ি ছুড়ে দিয়েছে গ্রেনেডের মত, দেশের অগণিত জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পোস্টার লিখছে। এ কোন বাংলাদেশ। এই অচিন্তনীয় বাংলার রূপ কি পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেছিল? হয়ত দেখেনি, কিন্তু বাংলার কবিতার চিরকালীন আবহমান বাংলাকে অনুভব করেছেন এই বিস্ময়ময় রূপের মধ্যে। তাই বাংলার রণক্ষেত্রে আজ তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং তাদের দেশের একান্ত প্রিয় কবিদের কাব্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একদিকে হিংস্র বন্য পশুদের নির্মম অত্যাচারের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর, অন্যদিকে স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগময় ভালবাসা। এই ভালাবাসার প্রতিভাস ফুটে উঠেছে এ দেশের কবির সৃষ্টিতে। মসি এখানে অসির সহযোগী। বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনগণ জীবনানন্দের অনুভবে একান্ত হয়ে উচ্চারণ করেনঃ "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"

ভাষাই সম্ভবত বাঙালীর চেতনার উৎসমুখ। নদীর স্রোতের মত অগণিত কাব্যের প্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে এদেশের মানুষ আত্মশুদ্ধ হন। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব ভাষা ও ভাবের আত্মীয়তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বের মুক্তি আবিষ্কার। এ জন্যেই একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষার আন্দোলন নয়; একুশে ফেব্রুয়ারি আজকের স্বাধীনতা-বাসনার প্রথম প্রজ্বলন।

দেশের প্রতি কবিদের আত্মনিবেদনে দেশের মানুষ সমান অংশীদার। তাই এদেশের মানুষের কাছে একজন সৈনিক এক একজন কবি পাশাপাশি পথ চলেন। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালেবাসি- এ কেবল জাতির সঙ্গীত নয়, জাতির হৃদয়-সঙ্গীত। অন্তরের প্রতি প্রান্তে স্বদেশের মাটির প্রতি কবির যে সংবেদন, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রতিটি বুলেটে সেই চিরন্তন সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আর তাই অকুতোভয় বাঙালী সৈনিকের কাছে মৃত্যুকেও মৃত মনে হয়, তুচ্ছ মনে হয়।

বাংলার জাতীয় জাগরণে জসীম উদ্দীন কেবল কবি নন, তিনি সংগ্রামের সৈনিক ও বটে। মানুষের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি তাকে নিয়ে এসেছে সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে তাই তিনি বলেনঃ

‘সেনাবাহিনীর অশ্বের চড়িয়া

দম্ভ-স্ফীত ত্রাস,

কামান গোলার বুলেটের জোরে

হানে বিষাক্তা শ্বাস।

তোমার হুকুকে তুচ্ছ করিয়া

শাসন ত্রাসন ভয়

আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে

চলেছি আনিতে জয়।’

আমাদের স্বাধীনতার মূল উদ্দীপনা আহৃত হয়েছে দেশের প্রতি উৎসারিত মমত্ববোধ থেকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রেও এই স্বদেশপ্রীতিই হচ্ছে আসল হাতিয়ার। দেশকে ভালোবাসার অপরিমেয় আগ্রহ এক নতুন রণশক্তির সৃষ্টি করেছে যে মানবিক মূল্যবোধহীন বর্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম। এখানেই বাংলাদেশের কবিরা হয়ে উঠেছে মুক্তিসেনার পরম সহায়ক। যুদ্ধ এক ধরনের হিংস্রতা সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন দেয়া-নেয়ার গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টিতে মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের মুখে যে নির্ভীক সাহাসিকতার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশমান তার প্রেরণা বাংলা মায়ের মুখ। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসই যেখানে অস্ত্র, সেখানে পশুশক্তির পরাজয় অনিবার্য। হাসান হাফিজুর রহমান এমনিতর অস্ত্রই আবিষ্কার করেছেন। যা জনগণের চোখের দৃষ্টি আর বুকের ভাষা থেকে উৎসারিত।

‘অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায়?
মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
দ্যাখো না লক্ষ্য কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাদের আকাশ বাতাস চেরে?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা’।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি আজ অতি স্পষ্ট। ইতিহাসের অনিবার্য গতিতেই আসন্ন হয়েছে এদেশের স্বাধীনতা। মানুষ মারার জন্যে বুলেটের সাথে অমানবিক জিঘাংসার প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু পশু হত্যার জন্যেই চাই মানবিক দৃঢ়বদ্ধ চেতনা। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি এখন রক্তক্ষয়ী আপোষহীন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার মাইল দূর থেকে নিয়ে আসা ভাড়াটে হানাদল বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে উঠেছে। কোন নৈতিক মনোবলশূন্য সামরিক শক্তি যত বিশালই হোক না কেন, আত্মিক বলে বলীয়ান নিরস্ত্র মানুষের শক্তিও তার চেয়ে কম নয়। এহেন মনোবলের বোধ পাকিস্তানের শূন্যগর্ভ বুলিতে কোনকালেই জাগ্রত করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে বাংলাদেশের কবিরা বাঙালীর আত্মিক প্রেরণার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছে। রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে যদিও বাংলাদেশ ধুয়ে যাচ্ছে, তবু মহান মুক্তিসেনারা আজ মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। তাদের মনের নির্ভীক প্রতিরূপটিকে ব্যক্ত করে এদেশের কবি বলেনঃ

‘মৃত্যুকেও মৃত মনে হয় আজকাল, কারণ মৃত্যুতে

মোমবাতির শিখাটি নড়ে না,

শোকধ্বনির মধ্যে গভীর আনন্দে খোল করতাল বাজে
অন্ধকারে আলো ওঠে জ্বলে
স্বপ্নের রং গুঁড়ো হলে কারা তবু আঁকতে চায় ছবি
বারুদের পোড়া গন্ধ শুঁকে
স্বদেশের ঘ্রাণ পায়, প্রাণে নেয় আশ্বাসের বায়ু
দুঃখ ক্লান্তি ভীতি নেই, যেহেতু তাদের
প্রত্যেক দুঃখের সঙ্গে আনন্দ ঘুমায় অবিরত,
যেহেতু এখন
মায়ের জঠরে কাঁদে বাংলাদেশ নবতর জন্মের পুলকে।'

ইতিহাসের অমোঘ ধারাকে লংঘন করার সাধ্য পাশব শক্তির প্রতিভূ ইয়াহিয়া খানের নেই। বাংলাদেশ এখন সেই মহাজাগতিক সত্যের ধারায় স্নাত হয়ে মুক্ত সত্তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। 'এ পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়'- জীবনানন্দের এই চিরন্তন বাণী মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে স্বাধীনতা পরম সত্যের মাঝখানে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই অলখ অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আমরা নিদ্রাহীন, ক্লান্তিহীন। জীবনকে ভালবাসি বলেই আমরা বরণ করি মৃত্যুকে।

('কামাল মাহবুব' ছন্দনামে মাহবুব তালুকদার রচিত)

রণ দামামা

৬ জুলাই, ১৯৭১

"এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তৃষ্ণাহারা তাপহারা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।"

গ্রীষ্মের খরদাহ তাপক্লিষ্ট রুদ্র রূপের পর বর্ষা তুমি এসেছো। তোমার রুমঝুমাঝুমু নৃত্য আমার হৃদয়ে ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তোলে না। রুদ্র দাহনের পর তোমার শ্যাম-সুন্দর সরল আগমন। আজ জনমত সঞ্জীবিত তোমার রসসিঞ্চনে। হারান সম্পদ বিয়োগব্যথার ত্রিধরা প্রকৃতি আজ শীতল হল।

'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গরজে গগনে গগনে'। সেই সাথে গরজে আমার উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মন। আজ হৃদয় দুর্জয়, অশান্ত, টালমাটাল। ঘন বর্ষার বাংলার ঘুমন্ত রানীল তন্দ্রালু স্বপ্নাচ্ছন্ন বেশ। ঝমঝম করে একটানা করছে। ঝরে পড়া জলের সমুদ্দুরে আরও নতুন ধারা পড়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠছে। আমার হৃদয় সমুদ্রেও তেমনি বিক্ষুব্ধ কল্লোলধারা অশান্ত ঊর্মিমালা উত্থিত-পতিত হচ্ছে ভীমবেগে। আজ 'জনতা সাগরে জেগেছে উর্মি টালমাটাল'। স্বাধীন বাংলায় বর্ষা এসেছে নতুন জাগরণের বাণী নিয়ে, উত্থানের মন্ত্র নিয়ে- ঘুমপাড়ানী গান যেন নয় শিকল-ছেঁড়া বাঁধনহারার গান গেয়ে। তরুণ অরুণের বহ্নিশিখার মতো প্রতিজ্ঞার ভাস্বরতা নিয়ে।

হৃদয়-বারিধি তীরে সে আহ্বানের অনুরণন। নতুন নতুন শপথের দীপ্ত প্রতিভাস, নবীন প্রত্যয়ের সুরে ঝংকৃত অসংখ্য প্রতিজ্ঞার মালা হৃদয়কে আরও কঠিন, আরও ভৈরব-রুদ্র করে তুলছে। বরষার মন্দ্রার মঞ্জরী উত্তরীয় আর হৃদয়পদ্মের কোমল পাপড়িকে আন্দোলিত করে না, বরং নব উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের ঘুমন্ত বিদ্রোহী সত্তাকে জাগিতে তোলে। আজ প্রাণের রুদ্রবীণায় একটি সুরের লয় মিলে-মুক্তির সুর, স্বাধীনতার সুর। রিমঝিম সুরের ঐকতান হৃদয়ের নিকুঞ্জবনকে স্বর্ণমদিরায় অসল-উতল ঘুম আর্দ্র করে তোলে না, বরং বিসুভিয়সের সুপ্ত লাল লাভা উদগীরণ করে। বর্ষার কলকল্লোল বারিধারা, ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর উদ্দম কলহাস্য, তাল-তমালের শিহরণ এখন আর হৃদয়ের পেলবতন্ত্রীতে সুন্দরে ঝঙ্কার তোলে না বরং দুরন্ত দুর্দম কালবোশেখীর প্রলয়বিষাণ বাজায় হৃদয়মধ্যে। কদম্ব-কেতকী-কামিনী আর কুমুদ-কহ্লার অনুপম অনাবিল সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি ভয়ঙ্কর সুন্দরের প্রতিভাস। স্ফীতকায়া নির্ঝরিণীর সলিল-উল্লম্ফনে রক্তের ফিনকি চমক দিয়ে যায়। বজ্রামানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়ের মালায় একটি রক্তকবরী গেঁথে দেই। যেন এক শপথের গুচ্ছ শহীদী রক্তের সিক্ত হয়ে নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। বিজলী চমকের ঝিলিকে সে প্রত্যয় আরও প্রোজ্জ্বল, আরও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘমল্লার রাগে নতুন করে বাজুক রণদামাম- 'জয় নিপীড়িত প্রাণ, জয় নব উত্থান'।

(দিলীপ কুমার ধর রচিত)

কথিকা

১৩ আগস্ট, ১৯৭১

২৪ বছর পরে আজ ১৪ই আগস্টে মনে পড়ছে আজ থেকে ২৪ বৎসর আগেকার দিনটি কথা। সেদিন কি উজ্জ্বল ছিল বাংলাদেশ, আর প্রাণদপ্ত ছিল বাংলার মানুষ। সারাদেশে কাগজের রঙিন পতাকা আর মালার ছড়াছড়ি। আলোয় আলোয় সারাদেশ ঝলমল। আমরা স্বাধীন হয়েছি, এবার আমাদের দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী শাসন, জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ আর সামাজিক অসাম্যের হাত থেকে রেহাই পাবে বাংলার মানুষ। সারাদেশের মানুষ অন্তরের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে বরণ করে নিল ১৪ই আগস্টের ভোরের লগ্নটি।

তারপর প্রতিবছর ১৪ ই আগস্ট ঘুরে ঘুরে এসেছে। বাংলার মানুষ তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশ্যা নিয়ে প্রতিবছর ১৪ই আগস্টের ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। ভেবেছে, যে দিনগুলো চলে গেলো সে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এবার নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত নতুন জীবনের বাণী বহন করে আসছে ১৪ই আগস্ট। কিন্তু প্রতিবারই ভুল ভেঙ্গে গেছে বাংলার মানুষের। তার অতি কাঙ্ক্ষেয় জীবনের প্রতিশ্রুতি বহন করেন এলো না কেন ১৪ই আগস্ট। বিদেশী শাসনের পরিবর্তে তার ঘাড়ে চেপে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন। ১৪ই আগস্ট বাঙালীর জন্যে মুক্তি নিয়ে এলো না কোনবার। শুধু তীব্রতর হলো শোষণ। জমিদারের অত্যাচার আর মহাজনের শোষণের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এবং পুঁজিপতিদের বর্বরতম অত্যাচার ও তীব্রতর শোষণে তারা জর্জরিত হয়ে উঠলো। সামাজিক অস্বীকৃতি আর অনাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ।

এই শৃঙ্খলিত শাসন আর সামাজিক অবিচারের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকবার প্রতিটি উপকরণের জন্যে তাদের লড়তে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র বাংলাদেশের প্রতিটি দাবিকে অস্বীকার করেছে, আর প্রতিটি দাবি আদায়ের জন্যে বাংলার মানুষকে লড়তে হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর বাংলাদেশের ইতিহাস পশ্চিম পাকিস্তানী

শোষকশ্রেণীর শোষকের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস।

১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে বাংলার বীর সন্তানেরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে তাজা তাজা প্রাণগুলো উৎসর্গ করেছে। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন কোটি বাঙালীর প্রাণের দাবি দফ-দফাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে ভাই মনু মিয়া এবং আরো অনেকে। ১৯৬৯ সালে বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দাবিতে, বাঙালীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে বুকের তাজা রক্তে বাংলার শ্যামল মাটি লালে লাল করে দিয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকশ্রেণী, আমলাতন্ত্র, সামরিকচক্র এই তিনশক্তির বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে বার বার হামলা করেছে। প্রতিবারই বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের সম্মুখে পিছু হটে গিয়েছে। এবং চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। তারপর তারা তাদের চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করলো ২৫ মার্চের গভীর রাত্রিতে। বুলেট, সঙ্গীন, মেশিনগান, মর্টার আর বোমার আঘাতে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো বাংলার মুক্তিকামী জনতার কণ্ঠকে। কিন্তু বাংলার মুক্তিকামী জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের সম্মুখে আবার পিছু হটে চলেছে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর শোষকশ্রেণী এবং তাদের স্বার্থবাহী সামরিক চক্র। তাদের এই অভিজ্ঞান হয়েছে যে, পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত-মৃত্যুর ঘণ্টা বেজেছে।

বাংলায় আজ রক্তের স্রোত বইছে। ঘরে-ঘরে, মাঠে মাঠে, রাজপথে জমাট-বাঁধা রক্ত। ধর্ষিতা মা-বোনদের মরণ আর্তনাদ অভিশপ্ত ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট আর তার নায়কদের প্রতিমুহূর্তে ঘৃণার সাথে ধিক্কারে ধিকৃত করছে। '৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বাংলার জন্য এনেছে প্রতিশ্রুতির আড়ালে বঞ্চনা, শোষণ আর রক্তস্নান; কান্না আর দীর্ঘশ্বাস।

তাই আজ ১৪ই আগস্টে স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকল-ছেঁড়া বাংলার মানুষ অতীতের অপমান আর গ্লানিভরা দিনগুলোকে স্মরণ করছে প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে। আর সেজন্যেই সেদিন ছোট ছেলেটি বললো- মা, কি পুণ্যই যে ছিল তোমার, যার জন্যে ১৯৪৭-এর আগস্টের কলঙ্কিত দিনটির মুখ দেখেতে পাইনি, আর তোমাদের মত আমার দুহাত দিয়ে এমন দিনটির জন্যে মালা গাঁথতে হয়নি।

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত)

বাংলাদেশ গেরিলা

২৯ আগস্ট, ১৯৭১

'গেরিলা' শব্দটি এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে উচ্চারিত। এ শব্দটা শুনলেই মানসপটে ভেসে উঠে একটা ছবি-'রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি চলেছে এক যুবক, কখন ঝড়ের রাতে তার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছে বাংলা মায়ের আনন্দাশ্রু বৃষ্টিধারায়, কখন স্রষ্টার বরাভয়ের মত ঝরে পড়ছে তালনবমীর আধো আধো জোছনা। পরনে কেন নির্দিষ্ট যুদ্ধসাজ নেই। কখন লুঙ্গী, কখন পাজামা, ঊর্ধ্বাংগে কখন শার্ট কখন ফতুয়া। সে চলেছে শত্রুপক্ষের

কোন গুপ্ত অবস্থানের খবর পেয়ে। অস্ত্র তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকানো কিছুক্ষণ পরেই গর্জন করে উঠবে প্রচণ্ডভাবে...।

এখন প্রশ্ন-গেরিলা কে? তাকে দেখতে কেমন? কী এমন তার মাঝে আছে যা তাকে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে?

প্রথম প্রশ্নের একমাত্র উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে 'গেরিলা' সবাই। 'গেরিলা' যে কেউ হতে পারে, সে ছাত্র হোক অথবা শিক্ষিত হোক। কৃষক শ্রমিক মজুর মালিক যে কেউই গেরিলা হতে পারে। জীবিকার জন্যে যে -যে পেশায় নিয়োজিত আছে- যেমন মুদি দোকানী, হোটেল বা রেস্টুরেন্টের মালিক, কর্মচারী, রিকশাঅলা, বুদ্ধিজীবী- সবাই গেরিলা। গেরিলা শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক হতে পারে। যেমন শত্রুনিধনে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদেরই শুধু নয়, বরঞ্চ যারা সক্রিয় গেরিলাদের প্রকারান্তরে সাহায্য করছে গেরিলা বলতে তাদেরকেও বোঝায়। বাংলাদেশের মা-বোনেরা যারা মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের খাবার দিয়ে বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করে অশীতিপর বৃদ্ধা, বেঁকে যাওয়া কোমড়ের ভাঁজে মুড়ির ধামা আর লোলচর্ম হাতে জলের বালতি নিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর জন্যে অক্লান্ত স্মিত মুখে। সেই অর্থে এমন বাংলাদেশের আবলবৃদ্ধবনিতা, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী সবাই 'গেরিলা'।

(শামীম চৌধুরী রচিত)

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহিলা

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২৩ বছর ধরে নিরপরাধ নিঃসহায় বাঙালীর উপর যে অত্যাচার অবিচার আর নির্যাতন চলে আসছিল সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বাঙালীর দানাবাঁধা ক্ষোভ এবার ফেটে পড়েছে '৭১-এর ২৫শে মার্চে স্বাধীনতা সংগ্রামের আকারে। বাঙালীদের বাঁচার দাবীকে দাবিয়ে রাখতে বছরের পর বছর জঙ্গীশাহীর নরঘাতকরা অসহায় বাঙালীর উপর অস্ত্র ব্যবহার করছে। রক্তপিপাসু নরপিশাচরা বার বার রক্ত পান করছে। কিন্তু এবার বাঙালীর সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী বাঙালী তার স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবার হাতে অস্ত্র নিতে শিখেছে- হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

আর তাই বাংলার তরুণ যুবকরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর তরুণ যোদ্ধারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাহস আর কৃতিত্বের সহিত প্রচুর শত্রুসেনা খতম করে অস্ত্রের ভাষায় অস্ত্রের জবাব দিচ্ছে।

আজকের আমাদের মুক্তিসংগ্রাম বাংলার সাড়ে সাত কোটি নরনারীর মুক্তিসংগ্রাম। বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের এ ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে অকাতরে এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। বাংলার সামগ্রিক জনতার অর্ধাংশ যে নারী তারাও আজ পিছিয়ে নেই। তারও স্বাধীনতা-চেতনার পরিস্ফুটন আজ আমরা আমাদের মুক্তসংগ্রামে দেখতে পাই। তাই দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায় বীরাঙ্গনা খাওলা, চাঁদ সুলতানা থেকে শুরু করে জামিলা বোখারীদ, প্রীতিলতা

ওয়াদ্দেদার আর লায়লা খালেদের পাশে বাংলার বীরঙ্গনা রওশনারা নিজের নাম যোজনা করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে কবির সেই বৈপ্লবিক চেতনার কথা স্মরণ করতে হয়। কবির ভাষায়-

এ বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

কিংবা-

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান

মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।

আজকের আমাদের এ সংগ্রামও বাংলার মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আজকে দেখি বঙ্গমাতার হীরের টুকরো ছেলে যখন অশ্বধামের বলির মত বর্বর পশুর হাতে স্বাধীনতা শিকারে পরিণত হয়েছে তখনও শোকাকিনী মাতা সগর্বে আর এক সন্তানকে তার প্রতিশোধ নিতে মুক্তিসংগ্রামে পাঠাচ্ছে। আজকে বাংলার ভগ্নীকুল তার নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও ভাইকে দেশের স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। আজকে বাংলার কুলবধূ স্বামী হারিয়েও রণাঙ্গনের পাশে পাশে বীর সৈন্যদের সেবশুশ্রূা করছে।

নরপিশচরা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে হত্যা করে, পাইকারী হারে লুটতরাজ করে, মহিলাদের ইজ্জত নষ্ট করে-কামান, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক চালিয়ে, নাপাম বোমা ব্যবহার করেও আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে পারে নাই। কেননা আমাদের ভাইরা যখন রণাঙ্গনে থেকে শত্রু খতম করছে, বিভিন্ন জায়গায় রাস্ত, সড়ক, সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে তখন বাংলার মহিলারা তাদের অনুপ্রেরণায় শরীরে ডিনামাইট বেঁধে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করছে।

তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা তাদের স্বেচ্ছাসেবিকা কেন্দ্রে স্থাপন করে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং গ্রহণ করছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে মহিল সমাবেশ সৈন্যদের খাবার ও পোশাক তৈয়ার করা হচ্ছে। সর্বোপরি মহিল চিকিৎসকরা সূর্য-সৈনিকদের সাথে সাথে যুদ্ধাঙ্গনে রয়েছে। আহত সৈন্যদের পাশে চিকিৎসালয়ে মায়েরা বোনেরা নার্স হিসাবে তৎপর রয়েছে।

‘কোনকালে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।’

তাই বাংলার বিজয়লক্ষ্মী নারীরও আজ বঙ্গবন্ধুর ‘রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব’ মন্ত্রে আজ দীক্ষা নিয়েছে। জয় বাংলা।

(মেহের খন্দকার রচিত)

দেশবাসী সমীপে নিবেদন

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

বালাদেশবাসী ভাই-বোনেরা,

কী বুকফাটা আহাজারী আর কান্নায় দরিয়া সাঁতরে সাঁতরে আমাদের দিন কাটছে, তা ইসলামাবাদের দুর্বৃত্তেরা না জানলেও, পৃথিবীর মানুষ জানে। অনেকেই আজ একে অপরের কাছ থেকে ছিটকে পড়েছে। লক্ষ মানুষ ছিটকে পড়েছে দিগ্বিদিক-স্বদেশহারা, গৃহহীন, আত্মীয়স্বজনহারা। একদিন যারাঁ কাছে ছিল, আজ নেই।

শুধু মানুষ নয়, আমাদের অতি মেহনতে-গড়া শহর- সবুজের ভাঁড়ার ঘর আমাদের গ্রাম-যেখানে ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে হাসিকান্নায় দিন কাটত- পরম শান্তির নিবাস আমাদের বহু গ্রামও ধ্বংস হয়ে গেছে। আগুনে বোমা, কামানের গোলা পুড়িয়ে দিয়েছে বসুজের ভাণ্ডার। ঝোপঝাড়ে যেখানে পাখি ডাকত সেখানে একমাত্র আওয়াজ মানুষের গোঙানি- রমণীর আর্তনাদ। বেঁচে যাওয়াটা এদেশে দৈবী ব্যাপার। ছোট ছেলেমেয়ে, এমন দৈবীভাবেই যারা বেঁচে গেছে, আজ তাদের মুখে স্বাভাবিক হাসি নেই। কান্না ভুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু ফ্যালফ্যাল চেয়ে আছে সেই রাস্তার দিকে যে-পথে ঘরবাড়ি তছনছ করার পর বুটপরা খাকী লেবাস জানোয়ারেরা কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। এরা কেউ বাংলার বাসিন্দা নয়। বাংলাদেশের দুঃখ-আনন্দের শরীক তারা কী করে হবে? লুটতরাজের মালে পকেট বোঝাই এইসব জানোয়ারদের কাছে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

কিসের পরীক্ষা? তা আপনাদের জানা। অনেককে ব্যক্তিগতভাবে এই মসিবৎ পার হতে হয়েছে। পরীক্ষা- আমরা বাঙালীরা মুসলমান কি না। তাই চার-কলেমা পড়তে হয়েছে উদ্যত সঙ্গীন বা রাইফেলের মুখে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! যে বাঙালীর তাগদ ও তাগিদের জোরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে বাঙালী নিজ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের প্রতি প্রীতি-পরবশ পাকিস্তান চেয়েছিল, যে বাঙালী শাসনতন্ত্র পরিষদে লিয়াকত আলি প্রমুখ অবাঙালীদের বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, নেহায়েৎ বাঙালীসুলভ উদারতায় এবং নিজে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা মাইনরিটি হয়েছিল শাসনতন্ত্র পরিষদে- সেই বাঙালীকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ও হচ্ছেঃ সে মুসলমান কি না। অদৃষ্টের পরিহাস বটে!

পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বা হয়েছে কার কাছে? যে পাঞ্জাবী সৈন্য লুটতরাজ করে, নিরীহ নিরস্ত্রকে হত্যা-খুন করে, জুলুমের চাকা নির্দয় চালিয়ে যায়, বোনকে ভাইয়ের সামনে বলাৎকার করে- এমন জন্তুর কাছে। পশু ইসলামের ফর্মাবরদার। আর আমি আমার ভালমানুষিয়ানা এবং উদারতা নিয়ে মুসলমান নই। অদৃষ্টের পরিহাস বটে।

ভাইবোনেরা আমার, আমাদের ভালুমানুষিয়ানার দাম দিচ্ছি। বড় চড়া দাম। রক্ত অশ্রু অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা প্রাণের বিনিময়ে- বড় চড়া দাম। অথচ বাংলাদেশের পাটচাষী তার ফসলের দাম পায় না। রোদে-বৃষ্টিতে অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাদের আবাস জীর্ণ কুঁড়েঘর। ভরপেটে দু'বেলা অন্ন তাদের কাছে স্বপ্ন। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবে না, যেহেতু কূলকিনারা অসম্ভব। সেই পাটে আদমজী ইস্পাহানীরা শুধু ধুনকুবের হয় না, ঐ ফসলজাত বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা অস্ত্রে সজ্জিত হয় পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী। সেই অস্ত্র আজ আমাদের বুকে বিঁধছে। ভালমানুষিয়ানার দাম এইভাবে দিতে হয় কি না? কেউ কোথায় দিয়েছে?

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আমাদের ভালমানুষিয়ানা ও সরলতার সুযোগ নিয়েছিল। আজও তার কামাই নেই। পূর্বে আমাদের তারা বাঙালী হতে দেয়নি। মুসলমান বানানোর চেষ্টা নিয়েছে। এর উপর ফিরিস্তি আজ দেয়া সম্ভব নয়। আপনারা জানেন। মিসর, ইরান, তুরানে মুসলমান থাকতে পারে- মিশরী ইরানী তুরানী হয়েও। কিন্তু আপনি আমি বাঙালী হলে আর মুসলমন থাকতে পারি না। শোষণের চাকা সদা সচল রাখতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের তাঁবেদার কিছু দেশী দালাল সব সময় এই দাগাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। এমন কি আমাদের প্রতি কটাক্ষ করতে জিন্না সাহেবের পর্যন্ত এতটুকু বাধেনি।

ওদরে জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। তাই তো হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু মাদারীর পুরাতন খেল চালু করতে ওদের কসুর নেই।

পঁচিশে মার্চের রাত থেকে নেকড়ের মত যখন বাংলদেশের নিরীহ-নিরস্ত্রের উপর পোষা জন্তুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন তারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী হত্যা করতে লাগল। মনে রাখবেন, এই হত্যা খুচরা

নয়। পাইকারী। কতলে আ'ম! ধর্ম ছাড়া আরও হাজার রকম মানবিকতার মিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানেরা মধ্যে বর্ণের দিক থেকে এক। দেখতে একই রকম। পঁচিশে মার্চ থেকে নামটা উচ্চারণ করতে ঘৃণা হয়, টিক্কা খান ও অনুচরেরা বাঙালী ধ্বংস করতে নামল। এক মাস পরে যখন নিজেদের কৃতকর্মের চেহারা ওরা দেখতে পেল, তখন আবার সেই পুরাতন ফন্দি-সাম্প্রদায়িকতায় ফিরে গেল। প্রথম কিস্তি, হিন্দু মুসলমানকে নির্যাতন করছে, তাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। কিন্তু শয়তানের জন্মগত খাসলৎ অভ্যাস কি সহজে যায়? জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ফন্দি পুনরায় চালু হলো। এবার বেছে বেছে হিন্দু হত্যা, হিন্দুর গৃহদাহ ওরা শুরু করল। তাই বলে কেউ মনে করবেন না, মুসলমানদের তখন টিক্কা খান ভগ্নিপতির আদরে আপ্যায়িত করছিল। হিন্দুর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে, মুসলমানের ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্যে। তফাৎ এতটুকু। বাঙালী ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে পাঞ্জাবী মুসলমান (হায় মুসলমানদের নামধারী!) সেনারা এতটুকু নড়েনি। কৌশল বদলেছিল, নীতি যথারীতি অব্যাহত । এইভাবে মুসলমানদের কাছে গোঁসাই ঠাকুর সাজার ফন্দি। নিজেদের অপরাধের বোঝা হাল্কা করার অপচেষ্টা ওরা নিয়েছিল। এইভাবে আমার মৃত সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চলে।

কিছুটা সফল হলো বৈকি পাঞ্জাবাগত এই হানাদারের দল নেজামে ইমাম ইসলাম, জামাতে ইসলামীর ধর্মান্ধ পশুর দল যারা এতদিন গণঅভ্যুত্থানের সামনে কেঁচোর মত মাটিতে মিশেছিল, তারা তাদের মিলিটারী আব্বাজানের ডাকে এবং উৎসাহে কেউটের মত তৎপর হয়ে উঠল। নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামীর গুণ্ডারা বাঙালী নয়। পাঞ্জাবী মিলিটারীরা সত্যি ওদের বাবা ও বাপজান। নচেত বাংলাদেশের মাটিতে জন্মে, বাংলার মা-বোনের বেইজ্জতি দেখেও ওরা কীভাবে মিলিটারীর সঙ্গে হাত মিলায়? যারা দেশকে বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে পারে, তারা মা-বোনকেও বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিতে সক্ষম। বাংলাদেশের যুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, কবি, লেখক-আশা করি এই কথাটা স্মরণ রাখবেন।

কিন্তু সকলেই তো নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামীর অনুচর নয়। সাড়ে সাত কোটির মানবজননী বাংলাদেশের কি সাচ্চা সন্তান নেই, জন্মভূমির অপমান যাদের বুকে যন্ত্রণার ঝড় তোলে; দেশের চাষীমজুর ও অন্যান্য সকলের দুঃখ-কষ্ট যাদের বিচলিত করে। তারা এগিয়ে এসেছে বৈকি। শুধু এগিয়ে আসেনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাতিয়ার হাতে। আমাদের মুক্তিবাহিনীর দিকে তাকান। কতো সামরিক অফিসার নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল, পুলিশ ভায়েদের গৃহসুখ , স্নেহমমতা ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। জন্মভূমি প্রেমের বেদীতে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। আর আছে আমাদের দেশের তরুণেরা-যাদের অধিকাংশ স্কুল-কলেজের ছেলে। নিজেদের সকল সাধ-আরাম-আয়েস হারাম ভেবে যারা সৈনিকজীবনের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। হিন্দু-মুসলমান এখানে এক-কাতার। যে বিভেদ মারফৎ বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ বছরের পর বছর শোষণ করেছে, তা মুছে দিয়ে এক-কাতারে দাঁড়িয়েছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান। নতুন বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। নতুন আদর্শের প্রদীপ জ্বালিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। সেই প্রদীপের শিখা-রোশনাই অনির্বাণ রাখার দায়িত্ব আমাদের, আমার যারা ঠিক লড়াইয়ের ময়দানে নেই, তারাও জন্মভূমির মুক্তিসংগ্রামে শরীক। মনে রাখবেন, এই লড়াই সর্বাত্মক লড়াইয়ের পর্যায়ে পড়ে। আজ আমরা প্রত্যেকেরই সৈনক- হাতে হাতিয়ার থাক বা না থাক। পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি সামগ্রী যে কেনেনা সেও লড়াইয়ের ময়দানে আছে বৈকি। শত্রুক সেও ঘায়েল করছে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। যে পাটচাষী পাট চাষ করে না, ধান চাষ করে সেও লড়াইয়ে শরীক। কোন সভ্য দেশে নজীর নেই, দুশমনেরা আমাদের প্রতিটি বাজারে চাল-ডাল ধ্বংস করে দিয়েছে, যেন আমাদের অন্ন না জোটে এবং দুর্ভিক্ষ আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়- যার ফলে গোলামি আমরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেব। এই চালেঞ্জ-তালু-ঠুকা-স্পর্ধার মোকাবিলা করছে সেই চাষী যে প্রচুর পরিমাণ ফসল ফলানোর চেষ্টায় কোমল বেঁধেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা যাতে শত্রু না পায় তার জন্যে সতর্ক-সে পাট করছে না। এই কৃষক কোন সৈনিকের চেয়ে কম নয় যদিও স্রেফ কাস্তেধারী, অস্ত্রধারী নয়। এমনিভাবে জন্মভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমরা সকলেই শরীক হতে পারি।

আমরা লড়ব বৈকি। যতদিন একটি হানাদার সেনা (আশ্চর্য, এগুলো আবার ধর্মে মুসলমান) আমাদের জন্মভূমির মাটির উপর থাকবে ততদিন আমাদের সংগ্রামের বিরতি নেই। বৃটিশের শিকল ছিঁড়ে আমরা গোলামির নতুন জিঞ্জির পরেছিলাম- এতদিন পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী যাকে ইসলামী জেওর বা অলঙ্কার বলে জাহির করেছে। সেই জিঞ্জির ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে। আমার আর ধোঁকাবাজির শিকার হবো না।

আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ব- যেখানে শোষণ চিরতরে নির্বাসিত- যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মেহনতের দাম পায় যথাযথ মর্যাদায়- যেখানে জাগতিক অসহায়ত কারো মনুষ্যত্বের বিকাশ-পথে বাধা নয়। আমরা গড়বো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পমুক্ত শ্রেয়বোধ প্রিয়বোধে দীপ্ত খাড়া শিরদাড়াঁ নাগরিকের কলকণ্ঠঙ্কৃত নতুন বাংলাদেশ। জয় বাংলা ।

(শওকত ওসমান রচিত)

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও বাংলার নারী

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

গত ২৫শে মার্চ রাত ১২টা থেকে বাংলাদেশে যে আন্দোলনের শুরু হয়েছে, সে আন্দোলন আমাদের মুক্তির আন্দোলন, সে আন্দোলন আমাদের বাঁচার আন্দোলন, স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বর্বর জঙ্গীশাহী সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমাদের বুকের রক্ত শোষণ করে আমাদের সোনার বাংলাকে নিঃস্ব করে তার বুকে মেরেছে ছুরি। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে তারা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের শস্য-শ্যামলা মাকে তারা পরিয়েছে শ্বেত বসন, মাঠের ফসলে জঙ্গীশাহী বিমান থেকে ফেলেছে বিষ। আমাদের ঐতিহ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বৃদ্ধ অধ্যাপকদেরও তারা রেহাই দেয়নি। বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্রদেবকে বিছানা থেকে পথে টেনে এনে জঙ্গীশাহী তাঁর বুকের উপর করল বেয়নেট চার্জ। এমনি করে মারা হয়েছে মনিরুজ্জামানকে ও আরো অনেককে। জগন্নাথ হল, ইকবাল হলের ছাত্ররা রাত ১১টার দিকে নিদ্রামগ্ন ছিল। সেই অসস্থায় তাদের উপর চালান হয়েছে মেশিনগান। ঘুম থেকে তারা উঠতে পারেনি। যখন তাঁরা পড়াশুনা করে ঘুমিয়েছিল তখন তাদের মনে ছিল কত আশা, কত স্বপ্ন। কিন্তু না, তারা সেই যে ঘুমিয়েছিল- সে ঘুম তাদের আর ভাঙ্গেনি। তারা আর ঘুম থেকে ওঠেনি, আর উঠবেও না কোনদিন। রোকেয়া হলে রাত ১২টায় জ্বালিয়ে দিল আগুন। ঘুমন্ত হল আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। আরো কত হাজার হাজার মানুষকে এই হিংস্র জানোয়ারদের বর্বরতার শিকার হতে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ভাবতে পারেন? কল্পনা করতে পারেন? কি নির্মমভাবে জঙ্গীশাহী আমাদের রক্ত দিয়ে আমাদের জন্মভূমিকে রক্তস্নান করিয়েছে?

হিংস্র পশুর মত টিক্কা খান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের উপর ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়ে। দম্ভভরে বলেছিল জঙ্গীসর্দার ইয়াহিয়াকে ‘‘আমার হাতে ক্ষমতা দাও, আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করে দেব।’’ হ্যাঁ, নেমেছিল সে তার সবটুকু ক্ষমতা নিয়ে, কিন্তু পেরেছিল কি? পারেনি, পারবেও না। ২৪ ঘণ্টা অতীত হয়ে কতদিন পার হয়ে গেল তবুও পারেনি। শেষ পর্যন্ত হালে পানি না পেয়ে হাল ছেড়ে পালিয়ে গেল। এবার আর এক মিরজাফর

ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসেছে গদিতে। দেখা যাক ক'দিন এর আয়ু? এই ক'দিনেই ডাঃ মালিকের অবস্থা হয়েছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

যাক সে কথা। জঙ্গী সরকার যেভাবে আমাদের অগণিত মা-বোনদের নিঃস্ব করে গৃহছাড়া করেছে আমাদের ভাইকে হত্যা করেছে, আমাদের বোনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে-সেই হানাদারদের আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতেই হবে। আজ আমাদের দেশে যে সংগ্রাম চলছে সে হল মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অর্থাৎ নারীদেরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যেমনভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছে আমাদের ভাইয়েরা। ভাইয়েদের সাথে আমাদের হাতে হাত মেলাতে হবে। এখন দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের আজ ঘরে বসে থাকলেও চলবে না। আমাদের ভূমিকা আমাদেরকেই পালন করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রী বোনদের কাছে আমার আবেদন, তোমারা এস- এগিয়ে এস- আজ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমাদের ভাইয়ের মত আমরাও মেশিনগান-মর্টার হাতে নিয়ে শত্রুনিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি। আমাদের এগিয়ে আসতেই হবে। বোনেরা আমার এগিয়ে এস। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আমরা কেন ঘরে থকব? মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তোমরা কেন ঘরে থাকবে? পথে নামো। আজ আমাদের ঘরে থাকার দিন নয়, আমাদের সামনে আজ বহু কাজ। ঝাঁসির রানীর বাহিনীর মত আমাদেরকেও সেনাবহিনী গঠনে অগ্রণী হতে হবে। আমাদেরকে নার্সিং-এ অংশগ্রহণ করতে হবে আহত ভাইদের সুস্থ করে তাঁদেরকে আবার দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনে পাঠাতে হবে। যেদিন দেশমাতৃকাকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করতে পারব- সেদিন আবার আমরা আমাদের ঘর আলোকিত করব-আবার স্বপ্নের জাল বুনব। শুধু বোনদেরই এগিয়ে আসলে চলবে না। মায়েদেরও এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। মায়েরা তাঁদের সন্তানকে উৎসাহিত করবেন এই মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই সংগ্রাম আমাদের সকলের সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর অগ্নিমন্ত্রে আমাদের সকলকে দীক্ষিত হতে হবে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। জয় আমাদের হবেই। আমাদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না।

(মিস ডলিনাথ রচিত)

সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাংলাদেশ

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

.... সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পকিস্তানের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর যাবৎ পশ্চিম শাসক ও শোষক গোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বার বার শুধু জনগণের কণ্ঠই রোধ করেনি অধিকন্তু জনগণের অন্তরে আশা ও ভাষার মূর্ত প্রতীক নির্ভীক মুখপত্রগুলোর উপরও চালিয়েছে বিবেকহীন ধারলো কাঁচি।

১৯৯৪ সন থেকেই পশ্চিমা শাসক ও শোষক গোষ্ঠী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই পথটি বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, নিজস্ব স্বার্থে তারা জনগণের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির উপরও জঘন্য হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশ তার অনন্য শিকার। আর সেই শাসকচক্র বাংলাদেশে তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক দালাল গোষ্ঠীর মতোই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কিছু তোষামদকারী ও চাটুকারের দল খুঁজে পেয়েছিল। নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ

করার জন্য তারা সব সময়ই জনগণের স্বার্থকে নিদারুণভাবে বলি দিয়ে গেছে। অপরদিকে স্বীয় স্বার্থের প্রতি নজর দিয়ে যারা শোষিত জনগণের অন্তরের কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলো, তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও চরম দারিদ্র।

বিগত চব্বিশ বছরে বাংলার জনগণের প্রিয় মুখপাত্র দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও জনতার আরো কয়েকটি পত্রিকা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকের সেদিনকার সে দুরবস্থা কোনদিনই ভোলার নয়। তবু তারা হার মানেনি কোনদিন ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে- সকল প্রকার দুঃখ-দারিদ্র, জেল-জুলুম, অন্যায় ও নির্যাতনের কাছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁরা ছিল একাত্ম এবং সোচ্চার। অগ্নিক্ষরা ছিল তাঁদের লেখনী।

সরকারী বিধিনিষেধ, জেল-জুলুম এবং সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়াও পশ্চিমা শাসক ও শোষক পদলেহী বিছুসংখ্যক এদেশীয় পত্রিকার মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক তাঁদের প্রভুদের চেয়েও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ক্ষেত্রে অনেক বেশী বর্বরতার পরিচয় দিয়েছেন।........ তাছাড়া স্থাবর ও অস্থাবরসহ প্রায় কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। মালিকপক্ষ ছাড়াও বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কয়েকজন লোক অপ্রয়োজনীয় আগাছার মতো সম্পাদকের আসন গেড়ে বসে আছেন- যারা সবসময়ই জাতীয় স্বার্থ, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সর্বপ্রকার শোষণ, শাসন ও নির্যাতন চলাকালেও একতা, সংহতি ও ইসলামের জিগীর তুলে বাঙালী জাতির ন্যায্য অধিকারকে নির্দয়ভাবে চাপা দিয়ে গেছেন।.......

এছাড়া বাংলাদেশের বাইরে- পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব সম্পাদক এবং সাংবাদিকই 'পাকিস্তান টাইমস' এর দীর্ঘস্থায়ী সম্পাদক জেড, এ, সুলেরীর চেয়ে গুরুত্বের দিক থেকে কোন অংশেই কম নয়। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী জাতিকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি তার লেখনীতে সর্বপ্রকার ছলা, কলা ও ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে কোনদিন কার্পণ্য করেননি।

সারা বাংলাদেশ আজ একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে মুক্তির লাখো কোটি মশাল। তার আগুন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার দিকে দিকে। স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অগণিত বাঙালী শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীর দল। তারা প্রত্যেকেই আজ এক-একটি মুক্তিসেনায় পরিণত হয়েছে। জীবনকে বাজি রেখে তারা লড়ে যাচ্ছে মুক্তির জন্য। দুর্জয় সাহসে অপ্রতিরোধ্য গতিতে শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছে। সে আক্রমণে পশ্চিমা জঙ্গীশাহীর তখতে তাউস কেঁপে উঠেছে।

এ মুহূর্তে কি করছেন শত্রুকবলিত আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিকরা? কি আজ তাদের নৈতিক এবং ঐতিহাসিক দায়িত্বে? বিবেকসম্পন্ন মননশীল সেসব সাংবাদিককে কোনকিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও ছিল একটি সংগ্রামী ভূমিকা। কিন্তু আজ যখন তারা সম্পূর্ণ পরাধীন-বিবেক যেখানে বিধিনিষেধের বাহুল্যে ক্ষতবিক্ষত- চোখের সামনেই যেখানে ২৫শে মার্চের পর একমাত্র বাঙালী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা বলেই Eastern News Agency- কে অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ENA ছাড়াও দি পিপল, সংবাদ, স্বরাজ, বাংলার মুখ, একতা, স্বাধিকার, বাংলার বাণী, গণশক্তি, গণবাণী, হলিডে, এক্সপ্রেস ও আরও অনেকগুলো দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙালী জাতীয়তাবাদ, আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও তাদের সংবাদকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এহেন অন্যায়কে তারা কিভাবে সহ্য করে যাচ্ছেন? শুধু তাই নয়- হানাদার এহিয়া সরকারের সর্বৈব মিথ্যা সংবাদ কিভাবে তারা দিনের পর দিন প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন? আমরা জানি বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা। তবুও বলবো, আজ যারা বাংলাদেশের নির্যাতিত ও শোষিত জনগণ এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তারা তাদের

চেয়েও কি মানসিক দুরবস্থায় আছেন। হার না মানা সেসব বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিকরা তো মরে যান নি! মুক্তিপ্রত্যাশী সেসব সাংবাদিকরা দুর্বার আকাংক্ষা নিয়ে এখনো জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও মনোবল যোগানোর জন্য লেখনীতে অগ্নি ঝরিয়ে যাচ্ছেন। বাঙালী জাতি তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা কোন দিনই ভুলে যাবে না। মুক্তিসংগ্রামে তাদের অমূল্য অবদান অমর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালী জাতির সংগ্রামী চেতনার এবং ইতিহাসে ।

পশ্চিমা হানাদার বাহিনী- যারা পৃথিবীর বুক থেকে বাঙালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন- যাদের আক্রমণে ১৪ লক্ষ নিরস্ত্র লোক নিহত- যাদের অত্যাচারে ৯০ লক্ষ নিরপরাধ, নিঃসহায় মানুষ নিজেদের আবাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে- তাদের ক্ষমা নেই। বাঙালী জাতি তার সমুচিত প্রতিশোধ নিতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু তাই নয়- বাংলাদেশের যেসব পত্রিকা মালিকপক্ষ ও সাংবাদিক গোষ্ঠী আজো সেই নরঘাতক ঔপনিবেশিক সরকারের নারকীয় কার্যক্রমকে সহায়তা করছেন এবং মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন তাদেরও ক্ষমা নেই। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। এর যথাযোগ্য প্রতিদান তারা পাবেনই। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনদিনই তাদের ঠাঁই হবে না। আত্মশুদ্ধি এবং দোষ স্খলনের পথ এখনো খোলা আছে। আমরা তাদের সংগ্রামী আহ্বান জানাই তারা যেন হানাদার এহিয়া সরকারের তাঁবেদারী ও দালালী ত্যাগ করে, এখনো জনগণের মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসেন।

বাঙালী জাতি হানাদার জঙ্গীশাহীর কোন প্রকার চাতুরিতেই আর বিভ্রান্ত হবে না। তারা জানে বাংলাদেশে অসামরিক পুতুল সরকার নিয়োগ, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও আলোচনার জন্য ভারত সবকারকে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে তাদের আন্তরিকতা ও সততা কতটুকু আছে। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই হচ্ছে বাঙালী জাতির শেষ কথা! বাঙালী জাতি তাদের জীবনে আর কখনো ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না, বরং পশুশক্তির সমূলে উচ্ছেদ করাই হচ্ছে তাদের বজ্রকঠোর শপথ। সে সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিদীপ্ত বিবেকসম্পন্ন সাংবাদিক শ্রেণীই বা কেন পিছিয়ে থাকবেন। বাঙালী জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে তাদেরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আজ যখন সে দিন অত্যাসন্ন তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিনা দ্বিধায় তাদের এগিয়ে আসা উচিত। পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান মুক্তিসূর্যের দীপ্ত আভাস ফুঠে উঠেছে। তাকে জীবন্তভাবে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণ ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার অনেকটা দায়িত্বই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর ন্যস্ত।

(গাজীউল হাসান রচিত)

আমরা তাদের ভাতে মরবো

১অক্টোবর, ১৯৭১

রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে দিয়ে জিন্না এভিন্যু হয়ে ফকিরাপুল আমার গন্তব্যস্থল। রেলওয়ে হাসপাতাল পেরিয়ে শ'দুয়েক ফুট যাওয়ার পরই রাস্তার ডান দিকের টেলিফোন ভবনের স্থানে মেশিনগানের ট্রিগারে হাত দিয়ে শুয়ে থাকা কয়েকজন সৈনিক দৃষ্টিগোচর হবে। জানোয়ারের রুক্ষ হিংস্রতা নিয়ে তারা অদৃশ্য শত্রুর দিকে নিশানা করে রয়েছে। এ ছাড়াও টেলিফোন ভবনের চারদিকে প্রকাশ্য ও গোপন জায়গা থেকে প্রহরারত রয়েছে আরও শ'খানেক সৈনিক। দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারা সশস্ত্র। কিন্তু টেলিফোন ভবনের মূল ফটকে অস্ত্রের সমাবেশ বেশী চোখে পড়বে না। সেখানে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল হাতে কয়েকজন অবাঙালী মোহাজের

রাজাকারকে দেখা যাবে। তাদের চোটপাট দেখার মতো। টেলিফোন ভবনে ঢুকতে প্রত্যেককেই তল্লাশী করা হয়। শার্টের কলার থেকে শুরু করে দেহের বিভিন্ন অংশে নিষ্ঠার সাথে বোমা, অটোমেটিক সমরাস্ত্র, এসিডের বোতল রয়েছে কিনা পরখ করে দেখা হয়। এ টেলিফোন হাউজ তাদের রক্ষা করতেই হবে। কারণ এ ভবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হলে পশ্চিমের সাথে পূর্বের তার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা বিকল হলে একমাত্র ভরসা থাকবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ওয়্যারলেস সিস্টেম। আমি বাসা থেকে যে রিকশায় উঠেছিলাম তার চালকের বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ দাড়ির অর্ধেকেরও বেশীতে সাদা ছাপ লেগেছে। রিকশায় উঠে বসার পরেই হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞেস কজরলেন, ‘‘বলতে পারেন সাহেব, এটা কার দেশ?’’ আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম। রিকশাওয়ালার বললেন, ‘‘এটা হারামজাদা বদমাশ পাঞ্জাবীদের দেশ, না মানুষের দেশ?’’ আমি চারদিকে তাকিয়ে আস্তে কথা বলতে অনুরোধ জানালাম। বুড়োর দু’চোখে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে। বুড়োর কাহিনী হলোঃ পাঁচদিন রিকশা চালিয়ে সঞ্চয় করেছিলেন তের টাকা। একটি ছোট্ট কাপড়ের থলেতে তার জীবনের নিঃশ্বাসের মতো মূল্যবান সঞ্চয়গুলো গোপন করে রেখেছিলেন। মালীবাগের কাছে মোড়ে এক পাঞ্জাবী বর্বর সৈন্যের লোভের লুটেরা হাত তার সে সঞ্চয় কেড়ে নিয়ে গেছে। বুড়ো বললো, ‘‘হারামজাদাটি আমার রিকশা থামিয়ে আমার কাছে টাকা চায়। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রথমেই রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমাকে আঘাত করে। আমার মুখের দিকে তাকালে চোর-ডাকাতের মনেও দয়া হতো। কিন্তু তার মনে দয়া নেই। আবার রাইফেল উঠানোর পর থলে থেকে আমার সঞ্চয় তাকে দিয়ে দেই। বলতে পারেন সাহেব, আর কতদিন এ ভাবে চলবে? আল্লার গজব পড়বে না। তাদের ওপর! আল্লা আর কত সহ্য করবে? হে খোদা, তাদের ওপর তোমার গজব নাজেল করো।’’ বুড়ো এরপর থেমে গিয়ে একমনে রিকশা চালাতে শুরু করলেন। এ তো শুধু বুড়োর অভিযোগ নয়। রাস্তা থেকে পথচারীদের হাতের ঘড়ি খুলে নেওয়া, পকেট হাতড়িয়ে টাকা-সিগারেট বের করে নেয়া তো সাধারণ ব্যাপার। একটি দেশের বাহিনীর নয়, নিকৃষ্টতম লুটেরা ছ্যাঁচড়া চোরেরা পর্যন্ত এ ধরনের লুটতরাজ করে না। সৈন্যদের দূর থেকে আসতে দেখলেই হাতের ঘড়ি, চোখের গগলস খুলে পকেটে লুকিয়ে রাখা তো সাধারণ ঘটনা। দু-এক টাকার বেশী পকেটে নিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় না।

টেলিফোন ভবনের সামনে আসার পর দেখলাম একটি কিশোরের দেহ জনৈক রাজকার তল্লাশী করছে। কিছু না পেয়ে পকেট থেকে কলম নিয়ে ক্যাপ খুলে নাকের সামনে তুলে তা পরীক্ষা করে দেখলো। উর্দুভাষী লোকজন এ অপমানজনক তল্লাশী ব্যবস্থা থেকে নেহাই পাচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো তারাই। তারাই মালিক-মোখতার।

এ টেলিফোন ভবনের অভ্যন্তরে ২৫শে মার্চ রাত বারটায় এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে। রাত বারটা বাজার কয়েক মিনিট আগে হিংস্র হায়েনার ক্ষিপ্রতা নিয়ে একদল রক্তলোলুপ এ্যালসেসিয়ান টেলিফোন ভবনের কন্ট্রোল রুমে ঢুকে পড়ে। কন্টোল রুমে কয়েকজন বাঙালীর ডিউটি ছিল। বাইরের হত্যাকাণ্ডের খবর সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন রাতেও তারা ডিউটি করছিলো। আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক যা করার সে কাজই করছিলো। হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে রক্তখেকো কুকুরগুলো সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাদের ওপর গুলি চালাতে শুরু করে। বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই মনে করে কয়েকজন কর্মী কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রপাতি চোখের পলকে যতদূর সম্ভব বিনষ্ট করে দেয়।

এর ফলেই ঢাকা শহরের সব বেসামরিক টেলিফোন ২২ দিনের মতো অকেজো ছিল।

হঠাৎ কি মনে করে গুলিস্তান এলাকায় রিকশা ছেড়ে দেই। দিনের বেলাও চারদিকে থমথমে ভাব। এখানে কয়েকটি পশ্চিম পাকিস্তানী রেডিমেড শার্ট বিক্রির দোকান রয়েছে। দু-একটা দোকান ঘুরে দেখলাম। মালিক মুখে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। বিক্রি নেই। একজন দোকানদারের সাথে পরিচয় ছিল। তাই কণ্ঠে সহানুভূতির

রেশ নিয়ে বেচাকেনার খবর জিজ্ঞেস করলাম। উর্দু ভাষা ব্যবহার করলাম। কারণ উর্দুভাষী দোকানদারদের সাথে বাঙালীর বাংলা ভাষায় কথা বলাও প্রায় দেশদ্রোহিতার শামিল। কোন অবস্থাতেই অধিকৃত এলাকায় বাঙালীত্ব প্রকাশ পায় এমন কিছু করা হারাম। প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে।

'বেচাকেনা কেমন চলছে' প্রশ্নের উত্তরে দোকানদার যা বললো তার সারমর্ম হচ্ছে-কোন বাঙালী পাকিস্তানী কাপড় কেনে না, আর অবাঙালীরাও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অর্থ ব্যয় করতে চাচ্ছে না।

এরপর গেলাম বায়তুল মোকাররম ও স্টেডিয়ামের একটি শাড়ির দোকানে। দোকানদার বললো, তাঁতের শাড়ি কিছু বিক্রি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাড়ি সারা দিনে একটিও বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ।

দখলীকৃত এলাকার আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোটি কোটি বাঙালী ইয়াহিয়াশাহীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের এমনি প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছেন। এমনিভাবে কোটি বাঙালী জনতা বাঙালী জাতীয়তাবাদের উদগাতা শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান 'আমরা তাদের ভাতে মারবো' বাণীকে বাস্তবায়িত করছেন।

('ইলিয়াস আহমদ' ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

যুদ্ধই একমাত্র পথ

১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন তারা শত্রুর সঙ্গে লড়ছে পাঞ্জা। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট যে, যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। একই সঙ্গে বাঙালীরা ইতিহাসের এ-সত্যও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কোন স্বাধীনতাই অল্প কয়েকদিনের যুদ্ধে অর্জন করা যায় না। কোন দেশে কোন কালে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং আমাদের আবেগ যতই তীব্র হোক না কেন, সত্যকে, অভিজ্ঞতাকে, বাস্তবকে, যুক্তিকে, অস্বীকার করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে, আমরা প্রচণ্ড আবেগে বার বার মনে করেছি দু-একদিনের মধ্যেই আমরা সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারবো, কিন্তু এখন আমরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, যুদ্ধের বাস্তব কলাকৌশল শিখেছি, এখন আমরা যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছি-তাই আমরা জানি যুদ্ধ শুধু আবেগের ব্যাপার নয়, যুদ্ধ যুক্তির ব্যাপার, পরিশ্রমের ব্যাপার, বুদ্ধির ব্যাপার, জীবন উৎসর্গ করার ব্যাপার। শুধু আবেগ থাকলেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। কারণ তাহলে এতদিনের বাংলাদেশে হানাদারদের অস্তিত্ব থকতো না। যুদ্ধ শুধু অস্ত্রেরও ব্যাপার নয়, কারণ তাহলে এতদিনের মধ্যে হানাদাররা নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করে দিতে পারতো, আমাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে তারা এতো দিশেহারা হয়ে পড়তো না। যুদ্ধজয়ের জন্য পারিপার্শ্বিকতার সাহায্য লাগে। যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মাটির সমর্থন, যে মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয় সেই মানুষের সমর্থন- এ দুটোই হানাদারদের বিরুদ্ধে, আর এ দুটোই আমাদের পক্ষে। কিছু পিছনে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাবো যে, যুদ্ধ করার জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি নেইনি। আমরা ধারণা করেছিলাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের পাওনা আদায় হবে। দেশের লোক বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যই শেখ মুজিবুর রহমানকে ভোট দিয়েছিল। শেখ মুজিব আশা করেছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনাসাধারণের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশবাসী সেই আশাই করেছিল। দেশের মানুষ বুঝতে পারেনি যে, ধীরে ধীরে তারা এক চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার

হতে যাচ্ছে। সে কথা বুঝতে পারলে আমরাই সর্বপ্রথম তাদের ওপর আঘাত হানতে পারতাম। সমস্ত পরিস্থিতিই আমাদের অনুকূলে ছিল। বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ও বাঙালী সৈন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেখ মুজিব সেনানিবাসে আবদ্ধ পাকিস্তানী, সৈন্যবাহিনীকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ, যশোরের পরিস্থিতি ও যুদ্ধ ও রংপুর-রাজশাহীর পরিস্থিতি ও যুদ্ধ এবং সিলেটের পরিস্থিতিও যুদ্ধ যাঁরা দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারকারীদের ধ্বংস করার জন্য কেবল প্রয়োজন ছিল পূর্বপ্রস্তুতির। উপযুক্ত প্রস্তুতির নাম অর্ধেক যুদ্ধজয়। চট্টগ্রামের সেনানিবাস থেকে ২৫শে মার্চের আগেই শত শত বাঙালী সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেয়া হয়, বহু বাঙালী সৈন্যের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়। অথচ সে পথ বন্ধ করতে পারলে, চট্টগ্রামে ও চালনা বন্দরে দূরপাল্লার কামনা বসাতে পারলে ও বিমানবন্দর দখল বা অকেজো করে দিতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু আমরা কেন তা করিনি? কেন আমরা হানাদারদের তৈরি হওয়ার সুযোগ দিলাম? কেন আমরা অসহায়ের মতো তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হোলাম? এর তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের মতো আশা করেছিলো আলোচনাই একমাত্র পথ।

আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক শাসকবৃন্দ এবং সামন্তপ্রভূ ও বড় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে শোষণ করা বন্ধ করতে পারে না। ছয়-দফা বাস্তাবায়িত হলে শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যেতো। শেখ মুজিব বার বার চেয়েছিলেন যে-কোন প্রকারে হোক বাংলাদেশকে আর শোষণ করতে দেবো না, বাংলাদেশকে শোষণ করার পথ বন্ধ করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতন্ত্রের ভক্ত শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব যেমন বলেছিলেন ‘কিসের গোলটেবিল, কার সঙ্গে গোলটেবিল’, আজ দেশের সাধারণ মানুষও বলছে ‘কার সঙ্গে গণতন্ত্র?’ পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রীদের সঙ্গে কি গণতন্ত্রের পথে মিত্রতা করা যায়? তাদের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যুদ্ধ। যারা হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছেন সেই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধারা আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, শত্রুর সঙ্গে কোনরকম আপোষ করা চলে না। বিশ্বাস করার অর্থ অনিবার্য মৃত্যু। শক্রুর শেষ রাখতে নেই। শত্রুর বিনাশ সম্পূর্ণ না হওয়ার পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা তাই নিশ্চিন্ত হতে পারে না। একাধিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পেরেছি যে, তারা সবাই দুটি সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। একঃ শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই। ‘নিউইর্য়ক টাইমস’ পত্রিকাই বলেছেন, প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হানাদররা ৩ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করেছে। এর দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোঝা যায়। আধুনিক অস্ত্র যেমন এদের রয়েছে তেমনি মনের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙালী-বিরোধী। তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বাঙালীরা ছোট জাত, তারা শাসিত হতেই জন্মেছে, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। সাধারণ সৈনিকদের এই মজ্জাগত ধারণার জন্যই তারা দুঃসাহসী হয়ে ‘ইয়া আলী’ ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় ও এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে এবং আমাদের সাহসী বুদ্ধিমান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেঘোরে মারা পড়ে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার পাক- সেনা খতম হয়েছে, পাক-সেনাদের মনোবলও ভেঙ্গে পড়েছে, তবু জয় নিশ্চিত জেনেও শত্রুকে খাটো করে দেখা চলে না। দুইঃ শত্রু কোনদিনই অপরাজেয় নয়। কারণ শত্রু রয়েছে অন্যায়ের পক্ষে, অসত্যের পক্ষে, সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। আমরা রয়েছি সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ কোনদিনই পাক-সেনাদের অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন জানাবে না। কিছু দালাল যা গজিয়েছে তা নতুন কিছু নয়। কারণ ফ্রান্সের মতো দেশেও হিটলার মার্শাল পেঁতার মতো বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। সুতরাং দালাল নতুন কোন ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দালালরা আসলে সুবিধাবাদী। হাওয়া ঘুরেছে বুঝতে পারলেই তারা তাদের ভোল পাল্টে ফেলবে। সুতরাং বিদেশে দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থনশূন্য পাক-সেনারা চরমভাবে পরাজিত হবেই।। আঘাতের পর আঘাত হানলে পাহাড়ও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ইতিহাসের শিক্ষাই তাই।। সুতরাং আঘাতের পর আঘাত হানতে হবে।

আজ যারা যুদ্ধ করছে তারা কি কোনদিন যুদ্ধ করেছিল? তাদের কি যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা ছিল? তাদের হাতে কি আগের থেকেই অস্ত্র ছিল? এর উত্তর হচেছ- না। কিন্তু তবু কেমন করে যুদ্ধ চলছে, কেমন করে অস্ত্র এলো? এর উত্তর হচ্ছে- যুদ্ধ করতে চাইলে,স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে চাইলে অস্ত্র এসে যায়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও হয়, যুদ্ধ জয়ও হয়। আলজিরিয়া তর প্রমাণ, ভিযেতনাম তার প্রমাণ। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইচ্ছাটাই বড় কথা।

আমাদের যোদ্ধারা, যুবকেরা বার বার বলেছেন যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলী বিচার করছেন, সে ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন আকর্ষণ নেই। তাঁরা বলছেন, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, যাচ্ছি। আমাদের নেতারাও সেই কথা বলেছেন। কারণ, তাছাড়া বাংলাদেশের শোষণ বন্ধ হওয়ার আর কোন পথ খোলা নেই। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ শোষিত হয়েছে। তাদেরকে শোষণমুক্ত করতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। শেখ মুজিব শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার একমাত্র নাম যুদ্ধ। আমাদের যুবকরা প্রাণ দিয়ে শোষণের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে আজ বদ্ধপরিকর। দেশের মানুষ চায় বাংলাদেশের টাকা বাংলাদেশে থাকবে, আমরা সবাই সেই টাকা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবো। কেউ যেন বলতে না পারে, আমি আমরা ভাগ পাইনি, আমি ব্যথিত, আমি শোষিত। সুতরাং সেই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে, আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে যারা সাহায্য করবে তারাই আমাদের বন্ধু।

('জাফর সাদেক' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

কয়েকটি ছবি- একটি ইতিহাস

৩ নভেম্বর, ১৯৭১

- কি ভাই, কি দেখছেন? ও, ছবিগুলো? আচ্ছা দেখুন। একের পর এক ছবিগুলো দেখে যাচ্ছিলাম আমি।

প্রথম ছবিটি একটা তুলসী গাছের। অবশ্য এতে দেখার কিছু নেই। শুধু উপলব্ধি। ছবিটি তোলা হয়েছিলো ১৩ই এপ্রিল। ময়মনসিংহ শহরের কোন এক হিন্দুপারা থেকে। ক্ষতবিক্ষত একটি দোতলা দালানের পাশে দেখা যাচ্ছে গাছটি, বোবার মতো দাঁড়িয়ে। বাড়িতে কোন লোকজন নেই। হয়তো তাদের সবাই প্রাণ হারিয়েছে পাকস্তানী সৈন্যদের মেশিনগানের গুলিতে। অথবা সবাই প্রাণভয়ে পালিয়েছে ওপার বাংলায় শরণার্থী হয়ে। ছবিটি দেখে মনে হচ্ছিলো, কেউ আর মাথা নীচু করে, নতজানু হয়ে পূজা দেবে না সকাল -সাঁঝে-তুলসী তলায় বসে প্রার্থনা জানাবে না হরি-মাধবের কাছে আর কোনদিন।

দ্বিতীয় ছবিটি কোন এক নবদম্পতির-মুখোমুখি অবস্থায়। তবে জীবিত নয়, মৃত। হাতে মেহেদীর কাঁচা রং। তরুণের মুখটা থ্যাবড়া হয়ে গেছে-চেনার জো নেই। তরুণীর বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছে-টকটকে লাল রক্তিম কলজেটা দেখা যায় শুধু! এদের বিয়ে হয়েছিলো ২৪শে মার্চ। আর ছবিটি তোলা হয়েছিলো ২৬শে মার্চ-ঢাকা মিটফোর্ড থেকে। ২৫শে মার্চ। গভীর রাতের নির্জন নিস্তব্ধতায় এ নবদম্পতির মাঝে ছিলো এক মধুময় পরিবেশ। কিন্তু অকস্মাৎ গর্জে উঠলো পশ্চিমা বর্বর সেনাদের কামান। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওরা। চিরদিনের মতো নিঃশেষ হলো ওদের পরস্পরের সকল চাওয়া-পাওয়া।

তৃতীয় ছবিতে বুড়ীগঙ্গার সীমাহীন জলরাশি। একটি বৃদ্ধ সাঁতরে যাচ্ছেন প্রাণপণে। কিন্তু জানা নেই কোথায় যাবে, কখন যাবে বা আদৌ কোথাও গিয়ে উঠতে পারবে কিনা। ছবিটি ২৯শে মার্চ সকালে তোলা। হয়তো এ বৃদ্ধ ছিল রাজধানীর কোন এক ঝাড়ুদার, সরকারী অফিসের পিয়ন, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী- নতুবা ছিলো বড়দের সরকারী অফিসার কিম্বা কারখানায় মলিক। ইয়াহিয়ার জঙ্গী সেনাদের বেয়নেট ও বুলেট থেকে কোনমতে রক্ষা পেয়ে অতি সন্তর্পণে পালাচ্ছেন। শহর ছেড়ে, তার সর্বস্ব ত্যাগ করে। হয়তো চলে যাচ্ছেন কোন এক দূরপল্লীতে, অথবা অতি কষ্টে দেশ ছেড়ে বিদেশে। যেখানে আর দেখা যাবে না পশ্চিম জল্লাদ বাহিনীর চেহারা- শোনা যাবে না সন্তানহারা জননীর অথবা বেয়নেট উচিয়ে আসবে না কেউ হৃদপিণ্ডটি বিঁধে ফেলতে।

এটি চতুর্থ ছবি। তোলা হয়েছিলো ২৭শে এপ্রিল ভৈরবের পুলের উপর থেকে। ছবিতে অসংখ্য মরা লাশ- ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোতে । কে জানে কতদিন এরা নদীতে ভেসে চলেছে এমনি করে। ফুলে ওঠা বীভৎস দেহ ওদের। কতকগুলো কাক-শকুন বসে আছে এদের উপর।

এর পরের ছবিটি তোলা হয়েছিল কুমিল্লা শহরে। ৪ঠা মে সকালে। ছবিটির একপাশে দেখা যাচ্ছে একদল লোক লুট করছে দোকানের মাল। অপর পাশে খাকী পোশাক পরা একজন লোক ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছেঃ ঠিক এর পরে ছবিতেও এরাই। ব্যতিক্রম শুধু এ্যাকশনে। কারণ এটিতে লুটেরার দল 'হ্যাণ্ডস-আপ' হয়ে একলাইনে দাঁড়িয়ে। আর সেই ক্যামেরাম্যান স্টেনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে তখনও অপেক্ষমাণ । হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রিগারে চাপ পড়বে। কড় কড় করে উঠবে স্টেনগান। অসহনীয় যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে থাকবে লুটেরার দল। এরপরের দৃশ্যে হয়তোবা এরা পড়ে থাকবে অবাঞ্ছিত আর্বজনার মতো কপালে হাত রেখে। ওদের প্রাণবায়ূ তখন অনন্ত অসীমের সন্ধানে উর্ধ্বগামী।

এবারের ছবিতে ছনের ছাউনি দেয়া একটা ঘর। দুটো কুকুর মুখোমুখি বসে। মনের সুখে লেজ নাড়ছে ওরা। আর একটি ছাগল ওদিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইস্‌! এ ঘরটা তৈরি না হলে বেচারা ছাগল আর এ কুকুর দুটো ভর দুপুরের এ কাঠফাটা রোদে কি মুসকিলেই না পড়তো। ছবিটি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি পাক জঙ্গীশাহীর কোন এক অভ্যর্থনা শিবিরের সম্মুখভাগ থেকে নেয়া। কিছুদিন আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এ অভ্যর্থনা শিবির। শত্রু কবলিত ঢাকা বেতার অহরহ মিনতির ফাঁদ পেতে চাইছিলো শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এতোই দুর্ভাগ্য যে, কেউ গেলো না পাক-জঙ্গীশাহীর অভ্যর্থনা কুড়াতে, এতো সাধের শিবিরে এক রাত ঘুমাতে, বিষ মেশানো তাদের দুধ-কলা খেতে।

এ ছবিটি একদল তরুণ রাইফেল হাতে ট্রেনিং নিচ্ছে। চেহারায় তাদের দারুণ জিজ্ঞাসার ভাব। চোখে সংগ্রামের সীমাহীন দীপ্তি। হয়তো এরাই হবে বাঙালী মুক্তিবাহিনী। উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে আক্রমণ চালাবে গেরিলা কায়দায়, নতুবা অবতীর্ণ হবে সম্মুখসমরে। আজ হোক বা কাল হোক বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করবেই এরা। মায়ের বুকে ফিরে আসবে সান্ত্বনা-প্রিয়ার মুখে হাসি। ছবিটি তোলা হয়েছিল বাংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকা থেকে।

এর পরের ছবিতে পাক-তস্করদের ২০টি শবদেহ পড়ে আছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে। বঙ্গশার্দুল মুক্তিসেনাদেরই এ কাজ। হয়তোবা এদের কোন এক গেরিলা ইউনিট লুকিয়ে ছিলো ঝোপের আড়ালে , টহলদার পাক-সেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছিলো ওরা। শত্রুকে সম্পূর্ণ খতম করে ওদের অস্ত্র-গোলাবারুদ দখল করে নিয়ে নিমিষেই উধাও হয়ে গিয়েছিলো ওরা। আর পাক-সেনারা পড়ে রইলো বাংলার কুকুর-শেয়ালের খাবার হিবেবে। ছবিটি তোলা হয়েছিল পূর্ব রণাঙ্গনের কসবা এলাকা থেকে।

ছবিগুলো দেখা হলে চলে এলাম আমি। পথে এক পা দু'পা করে হাঁটছিলাম, আর ভাবছিলাম শুধু ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, সে অনেক কথা! হয়তো বন্ধুটি ক্যাপশন লিখবে ছবিগুলোর। এরপর তার এ্যালবামে সাজিয়ে রাখবে একে একে। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে। এরপর চলে যাবে এক বছর, দু'বছর- দশ বছর, বিশ্ব বছর বা আরও কয়েক বছর। কিন্তু ছবিগুলো? এগুলো ঠিকই থেকে যাবে এ্যালবামে। এরপর হঠাৎ একদিন এ্যালবামটা পড়বে বন্ধুটির কোন এক ভবিষ্যৎ বংশধরের হাতে। সে ছবিগুলো দেখে যাবে, তা থেকে শিক্ষা নেনে- তরে ঠিক ছবি হিসেবে নয়, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হিসেবে।

(জাহাঙ্গীর আলম রচিত)

মুক্তি সংগ্রামে মায়ের প্রেরণা

৪ নভেম্বর, ১৯৭১

মুক্তাঞ্চলেই মায়েদের সভা ডাকা হয়েছিল। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলছিল সভার কাজ। একে একে সবাই বিদায় নিয়ে গেলেন। সারাদিনের খাটুনিতে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। টেবিলের উপর মাথাটা রেখে চোখ বুজেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি আনুর মা ভাবী এসে দাঁড়িয়েছেন আমার টেবিলের কাছে।

আমাকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসতে দেখে বললেন, ‘‘মাথাটা ধইরছে বুঝি, টিইপ্যা দিমু।’’ হেসে বল্লাম, ‘‘না, তেমন কিছু না, ও এমনি সেরে যাবে ।’’ ‘‘না না সরম কইর না, খাডনী পইড়ছে ধরব না ক্যান।’’ আনুর মা ভাবী সত্যি সত্যি হাত লাগাতে আসছে দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বললাম, ‘‘তেমন কিছু মাথা ধরেনি। সভা শেষ হবার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। যাক ওসব। আচ্ছা ভাবী সভা তো হলো। সবাইকে বললাম এবং সবাই স্বীকার করলেন প্রত্যেকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের জন্য কাপড়, জামা , কাঁথা সেলাই করে দেবেনে। সত্যি, হবে তো?’’ ‘‘অইব না মানে? আইজ থাইক্যা হগলে ল্যাইগা যাইব। মুক্তিবাহিনীর ছাওয়ালগুলা আমাগো ছাওয়াল না? ছাওয়ালগো বাঁচান আমাগো ফরজ না?’’ একটা গর্বিত দীপ্তিতে আনুর মা ভাবীর মুখখানি ঝলমল করে উঠল। মাতৃত্ব ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে। বিস্মিত হলাম এই অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলার তেজস্বিতায়, মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদে। একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা ভাবী, আনুর কোন সংবাদ পেয়েছ?” আনোয়ার ওরফে আনু ভাবীর একমাত্র ছেলে। আর একটি ছেলে ছিলো, নাম হাবিব। কারখানায় কাজ করতো। এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে দু'বছর আগে। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে, যার যার স্বামীর বাড়িতে থাকে। আনুই ছিল ভাবীর কাছে। বোশেখের শেষের দিকে বিয়ে ঠিক হয়েছিলো একটা লক্ষ্মী মেয়ের সাথে। সে বিয়ে আর হতে পারেনি। এরই মধ্যে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী বাংলাদেশের উপর চালিয়েছে নারকীয় আক্রমণ। রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে সারাটা দেশ। যে মেয়েটির সথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে খুনী পাকসেনা। মেয়েটির কোন হদিস নেই। আনু তার মাকে নিয়ে চলে এসেছে মুক্তাঞ্চলে, তার মামার বাড়িতে। এখানে এসে আনু শুধু ছটফট করতো আর বলতো, ‘‘মা , আমাকেও কিছু করতে হবে।’’

ভাবী প্রথমে ছয় পেতেন, আনুকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন- ‘‘আমাকে দেখাই তোর এখন ফরজ কাম।’’ আনুও বেশীকিছু কথা বাড়াতো না।

একদিন আনু ফিরলো বিকেলে। মুখখানা থমথম করছে। মাকে ডেকে বললো, ‘‘শুনছ মা, রিজিয়াকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে।’’ রিজিয়া মেয়েটির সাথেই তা বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

আনুর মা ভাবী আফসোস করেছিল সংবাদটি শুনে কিন্তু তার জন্যে আরও কিছু অপেক্ষা করছিল। আনুই বললো, ‘‘মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে যাবো। রিজিয়াকে উদ্ধার করবো।’’

আনু মুক্তিবাহিনীতে যাবে শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন আনুর মা ভাবী। বোকার মত জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘রিজিয়াকে উদ্ধার কইরা কি কইরবি?’’

‘‘বিয়ে করবো, তার দোষ কি মা? আমারই সাথে তার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। আমারই তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল। আমি পারিনি। আমারই দোষ। ও যদি বেঁচে থাকে আর ওকে যদি উদ্ধার করতে পারি তবে আমি ওকেই ঘরের বউ করে আনব।’’ আনু লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলে ফেলে কথাটি। আনুর মা ভাবী আনুর কথার জবাব দিতে পারেন নি। ঠিকই তো। রিজিয়ার দোষ কি? আজ যদি তার দুই মেয়ের এই অবস্থা হতো? ছেলের কথায় রাগ হয় না। তার - গর্বই হয়। এর কয়েকদিন পরে আনু মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এখন সে আছে পূর্ব রণাঙ্গনে। তারই কুশল জিজ্ঞাসা করলাম ভাবীকে।

‘‘তার লাইগ্যাই ফিরা আইলাম। এইহানে আইবার আগে একখানা চিডি আইছে। তোমর কাছে পইড়া শুনুম বইলা লইয়া আইছি। তোমাগো কথা শুইনতে শুইনতে ভুইলা গেছলাম। মনে হইতে ফিরা আইছি।’’

আনুর মা ভাবী তার জামার বুকের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করলেন। আটদিন আগেকার লেখা চিঠি। আনু লিখিছেঃ

মা,

কয়েকদিন তোমাকে কোন খবর দিতে পারিনি। কারণ আমাদের দুটো লড়াই লড়তে হচ্ছে। মা, তোমার দোয়ায় দুটো লড়াইতেই আমর জিতেছি। হানাদার পাকসেনাদের আমরা মেরে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়ে দুটো ঘাঁটি দখল করেছি। দুটো লড়াইয়ে আমরা ৮১ জন পাকসেনাকে মেরেছি। তোমর দোয়ায় আমাদের কারো গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। জান মা, লড়াইতে যাওয়ার আগে আমি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে তোমার মুখটা স্মরণ করতাম,আর আমার দেহে শক্তির বান ডাকতো। কেন এমন হয় মা? আমার মনে হয় মায়েরাই সকল শক্তির উৎস। তাইতো আমরা দেশকে মা বলি ডাকি, বলি দেশমাতা। আর একটি খবর বলি মা, একটা ঘাঁটি থেকে আমরা ১৩ জন মেয়েকে উদ্ধার করেছি। বর্বর দস্যুরা ওদের উলঙ্গ করে আটকে রেখে ওদের ওপর বর্বর পাশবিক অত্যাচার করতো। সবগুলো মেয়েই রেজিয়ার বয়সী। উদ্ধার করার পর কি কান্না ওদের। দুইজন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। আমিই ওদের বাঁচিয়েছি। জানো মা, ও দুজনের কাছে রিজিয়ার গল্প বলেছি, বলেছি- রিজিয়াকে উদ্ধার করতে পারলে আমি ওকে বিয়ে করবো,সম্মান দেবো। ওরা তাতে কিছুটা সান্তনা পেয়েছে। আমাকে ওরা ভাই ডাকে। ওরাও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমাদের হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশ্রুষা করে।

মা, আমার দেশকে যাঁরা ধ্বংস করেছে তাদেরে ধ্বংস করবো। আমরা পশুদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। তুমি দোয়া করো মা। আমরা জিতবো, তারপর একদিন তোমার কোলে মাথা রেখে খুউব করে ঘুমাবো।

ইতি-

তোমার আনু।

পড়া শেষ হলো। আনুর মা ভাবীর চোখে থেকে টস টস করে জলে পড়ছে।

"কেঁদো না ভাবী, আনু নিশ্চয়ই ফিরবে। মন খারাপ করো না।" আনুর মা ভাবীকে সান্তনা দিতে গেলাম।

"মন খারাপ না। খুশী লাইগতাছে। আনু আমাগো দেশের লাইগ্যা লড়তাছে। এর থাইক্যা খুশীর আর কী অইতে পারে। কারবালায় কাশেমের মা যুদ্ধে যাওনের আগে পাগড়ী বাইন্ধা দিছিলো। আমিও তারে নিজের হাতে কাপড় পরাইয়া দিছি। আনু আমার কাশেম।" চোখের জল মুছে ফেলে আনুর মা ভাবী হাসলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি।............

(জেবুন্নাহার আইভি রচিত)

মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গ বীরাঙ্গনা

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

নারী জাতির ললাটে গৌরবের টিকা দিয়ে কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন-

যুগে যুগে একা হয়নিক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

আজকের যখন বাংলাদেশের এক অন্ধকারময় দুর্দিনে পশ্চিমা পশুদের বিতাড়নের জন্য দিকে দিকে আমাদের সংগ্রামী যুবকগণ জীবনকে তুচ্ছ করে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন, তখন বাংলাদেশের মা-বোনেরাও এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। পশ্চিম পাকের বর্বর পশুগুলো বাংলাদেশের মা-বোনদের ওপর যে পাশাবিক অত্যাচার করেছে মানবতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের মা-বোনেরা এই অবমাননার কথা কোনদিন ভুলতে পারেন না। তাঁরা দেখেছেন তাঁদের সামনেই সন্তানদের কিরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে- তাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্বামীর করুণ মৃত্যু,স্বজনদের রক্তাক্ত নিধন। আর দেখেছেন অসংখ্য মা এবং কন্যার ওপর বর্বরতম পাশবিক অত্যাচার। আজো বোধ করি কয়েক হাজার মা-বোন পশুসৈন্যদের শিবিরে শিবিরে ছাউনিতে ছাউনিতে গ্লানিকর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই করুণ বেদনার কথা ভুলি নাই, ভুলতে পারি নাই। তাই বাংলাদেশের মা-বোনেরাও আজ সংগ্রামের পথকেই বেছে নিয়েছেন।

নারীর স্থান যে শুধু ঘরে নয়, বাইরের জগতেও যে তার সমাজকল্যাণমূলক এবং দেশসেবার প্রচুর কাজ আছে, বাংলাদেশের জাগ্রত নারী সমাজ তা প্রমাণ করেছেন। আজকের মুক্তিসংগ্রামেও বাংলাদেশের ললনাগণ সেই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমরা জানি, আমাদের কোন কোন রণাঙ্গনে অনেক উৎসাহী ছাত্রী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে পাক-সেনাদের খতমের কাজে তাঁদের সংগ্রামী ভাইদের সাহায্য করছেন। কিন্তু নারীর পক্ষে শুধু অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করাই আধুনিক যুদ্ধের বড় কথা নয়-নারীর পক্ষে আহত সৈনিকদের সেবার মাধ্যমে বাঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করাও একটি বড় এবং মহান কাজ। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের বহু সক্ষম ছাত্রী ও মহিলা আজ এই সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের সেবায় আমাদের বহু সংগ্রামী বাঙালী উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় মেয়েদের জীবন যে কত সমস্যার মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে সেকথা ভেবে আমরা বেদনায় অস্থির হই। সেখানে খাদ্যভাব, অর্থাভাব এবং চিকিৎসার নিদারুণ অভাব ছাড়াও রয়েছে নিরাপত্তার অভাব। দখলীকৃত এলাকায় যে-কোন মুহূর্তে যে কোন স্থানে পশ্চিম পাকের পশুসেনারা অথবা রাজাকার বাহিনীর গুণ্ডারা যে-কোন মেয়েকে তাদের পাশবিক আনন্দের শিকারে পরিণত করতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, দখলীকৃত এলাকায় এই সংকটের মুখে বাস করেও আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। দখলীকৃত অঞ্চলের যে গ্রামে মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীরা আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে তাঁদের জন্য রুটি প্রস্তুত করতে বসেন, ভাত রান্না করেন এবং পরম উৎসাহ সহকারে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা এই যে, গ্রামের মেয়েরা মুক্তবাহিনীর সেননীদের জন্য খাবার তৈরি করে যে কি এক গভীর তৃপ্তি অনুভব করে তার সীমা নেই। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি গ্রাম ও শহরের সর্বত্র দখলীকৃত বাংলাদেশের মেয়েরা কি অসীম প্রতীক্ষায় দিন গুণছে- কখন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাফল্যে বিজয়ের দিন আসবে আর বাংলাদেশ এই পশুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবে। এই আন্তরিক শুভেচ্ছার মূল্য যুদ্ধের দিনে কম নয়। আমরা মনে করি, মহিলারা মুক্তিবাহিনীর সেনানীদের খাবার প্রস্তুত করে, তাদের উৎসাহ প্রদান করে যেভাবে সাহয্য করছে তারও অপর নাম সংগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের মহিলা সমাজও তাই কৃতিত্বের দাবীদার।

কিন্তু বাংলাদেশের মহিলারা কৃতিত্ব চান না- পার্থিব কোন কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশের মহিলারা কাজ করেন না। সন্তানের মুখে, ভাইয়ের মুখে, স্বামীর মুখে, পিতার মুখে তাঁরা যদি দেখতে পান অমলিন হাসি, তবে সব কষ্ট, সব ত্যাগকে তাঁরা সার্থক মনে করেন। দেশজুড়ে এই হাসিমুখ যদি তাঁরা দেখতে পান তবে তাই হবে তাঁদের সবচেয়ে বড় পাওয়া, সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

আরো একটি উপায়ে বাংলাদেশের মহিলারা এই সংগ্রামে সাহায্য করতে চলেছেন। মায়েরা সন্তানকে বোনেরা ভাইকে এবং স্ত্রীরা স্বামীকে বার বার তাগিদ দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রেরণ করছেন। রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে এমনি একজন মহীয়সী মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির বয়স বাইশ বছর। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। ছেলেটির পিতা যদিও দেশপ্রেমিক-তবুও একমাত্র ছেলের প্রতি অসীম দুর্বলতা। বস্তুত তিনি ছেলেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু মা বলেছেন, না-আজ যখন মা-বোনের ইজ্জত ভুলুণ্ঠিত করেছে পাক-সেনারা তখন আমার ছেলেকেই সেই ইজ্জত রক্ষার্থে প্রথম যুদ্ধে যেতে হবে।

ছেলেটিকে হাসিমুখে তিনি যুদ্ধে পাঠিয়ে এখন পবিত্র প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। তাঁর ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আবার তাঁর কোলে ফিরে যাবে। তাঁর মনে দুঃখ নেই, কোন সংশয় নেই। সেই মহীয়সী মায়ের কথা মনে পড়ে শ্রদ্ধার আমার মাথা নত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আজ এমনি মায়ের পবিত্র মুখ আমরা দেখতে পাব। সেই মুখগুলো শুধু পবিত্র নয়- যেন বঙ্গজননীর মুখচ্ছবির মতই সে মুখগুলো সোনালী অরুণাভায় সমুজ্জ্বল। আর তাঁদের সেই সংগ্রামের মূল্যও আমাদের মুক্তিসংগ্রামে অপরিসীম মূল্যে স্বাক্ষরিত।

(নূরজাহান মযহার রচিত)

বাংলার মুখ

২২ নভেম্বর, ১৯৭১

হেমন্তের সন্ধ্যা দ্রুত নেমে এলো। আমরা এখানে এসে পৌঁছুনোর অপেক্ষাতেই যেন সে বসেছিলো। এসে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ত্বরা পড়ে গেল। আমার চার পাশে, সমুখের ওই বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর আর এই দূরের গ্রামগুলোর কোলে ঘেঁষে ঘেঁষে নীল ধোঁয়ার মতো কুয়াশারা জমে উঠেছে। চাপা কান্নায় ভেজা দৃষ্টির মতো হালকা কুয়াশার জমে উঠেছে ঢাকার উপকণ্ঠের এই বনানীর প্রান্ত ছুঁয়ে ছুয়ে।

একটু আগেই আমরা এই ছোট্ট উপবনটিতে এসে পৌঁছেছি। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু জিনিসপত্র রয়েছে-কিছু অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটি হালকা মর্টার, কিছু বিস্ফোরক, গোলাবারুদ ও তিনটি হালকা মেশিনগান। এ সবই আমরা পেয়েছিলাম শালদা নদীর তীরে পাকিস্তানী-সৈন্যদের বেলুচ রেজিমেন্টের ১০৩ ব্রিগ্রেডের একটা কোম্পানীর সঙ্গে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ের পর। এই লড়াইয়ে শত্রপক্ষের ১৪৩ জন নিহত হয়েছিল। আর আমাদের পক্ষে একজন বীর মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনজন আহত হছেন। শালদা নদীর তীরের এই লড়াইকে আমরা আমাদের কোন বড়রকম বিজয় বলে মনে করি না। কারণ এ লড়াইয়ে আমাদের একজন মুক্তিসেনারও আহত হওয়ার কথা ছিল না। এই লড়াইয়ে আমাদের গেরিলা বাহিনীর যে ইউনিটটি অংশগ্রহণ করেছিলো তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত, অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। আমাদের আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনাটিও ছিলো নিখুঁত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শত্রবাহিনীর প্রতিটি সৈন্য নিহত হবার কথা ছিলো। কিন্তু ওদের কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ গরম আলোচনা হয়েছে, আমাদের সামান্যতম ভুলত্রুটি ও শিথিলতার কঠোর সমালোচানাও করা হয়েছে।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, আমরা পাঁচজন মুক্তিসেনা সঙ্গে করে যেসব অস্ত্রশস্ত্র এনেছি ওজনে বেশ ভারী ছিলো। আমাদের এক-একজনের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিলো। এগুলো পিঠে-কাঁধে ঝুলিয়ে একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা আমাদের হাঁটতে হয়েছে। হাঁটতে হয়েছে নদীতীরের বালুকারাশির ওপর দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে জলাভূমি ভেঙে ভেঙে। আবার কখনো হেঁটেছি ছবির মতন শান্তস্নিগ্ধ ছোট ছোট সব গ্রাম আর ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পিঠে আর কাঁধের বোঝা নামিয়ে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হাতিয়ারটা নিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা একটা ঝোপের পাশে এসে বসলাম। সঙ্গীরাও আমার পথ অনুসরণ করলো।

এই উপবনটিতে এসে পৌঁছুনোর পরমুহূর্ত থেকেই একটা পাখির ডাকের জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বাংলাদেশের এমনি সব বন-উপবন মুখর করা একটি অত্যন্ত পরিচিত পাখির ডাক।

সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বেশীক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হলো না। কয়েক মিনিট পরেই শুনতে পেলাম আমাদের সেই আকাংক্ষিত পাখির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচজন সঙ্গীত একজনের কণ্ঠে সে ডাক প্রতিধ্বনিত হলো। একটু পরেই দেখতে পেলাম তিনজন শীর্ণকায় লোক। গ্রামের সাধারণ ক্ষেতমজুর ছাড়া তাদের আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়। এদের আগে কখনও দেখিনি। এরা তিনজনই ভয়ংকরভাবে রোগা। এদের বুকের পাঁজরের হাড়গুলো মাঠের বা গ্রামের খাল-নালার ওপরকার বাঁশের সাঁকোর মতো উঁচু উঁচু। এরা তিনজনেই আমাদের গেরিলা বাহিনীর অত্যন্ত দক্ষ সৈনিক। আগে ইপিআর প্যারামিলিটারী গ্রুপে কাজ করতেন। তাদের সঙ্গে আমরা অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিলাম। আজ রাতেই এই এলাকা আমরা ছেড়ে যাবো। যাবো-ঢাকা শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, শত্রবাহিনীর চেকপোস্টগুলোর কাছাকাছি। ওই তিনজনের

সঙ্গে কথাবার্তার পর বুঝলাম এ স্থান ত্যাগ করতে আরও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের এগোতে হবে এবং তাও ওদের সিগন্যাল পেলে তবেই। সুতরাং হাতে আমাদের অঢেল সময়। ওরা আমাদের জন্যে কিছু খাবর এনেছিলেন- ঢেকিভাঙ্গা চালের আটার রুটি আর হাঁসের মাংস। পাশের গ্রামের এক গৃহস্থ পরিবার আমাদের জন্যে এই খাবার পাঠিয়েছে।

হাঁসের মাংসের হালকা একটা গন্ধ পেলাম।- বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো- বুকের অনেক গভীরে একটা বেদনা, ভারী একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার আর বিক্ষিপ্ত কুয়াশার সিঁড়ি ভেঙে আমার সমুখে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো আমার মা, আমার নিঃসন্তান বিধবা বড়ো আপার মুখ। বুকের ভিতরের যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ যেন আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো। হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠের তৃণের মতোই আমার দুচোখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিলো।

তাড়াতাড়ি করে কোন রকমে খাওয়া সেরে আমি আবার সেই ঝোপটার পাশে এসে বসলাম। একটা পোড়া সিগ্রেট ধরিয়ে সমুখে তাকিয়ে ছিলাম। সমুখের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়- দেখা যায় আমার প্রিয় নগরী আমার ঢাকার প্রান্তদেশ পর্যন্ত। চারপাশে বহুদূর বিস্তৃত ঝোপঝাড় থাকলেও এখান থেকে সমুখের অনেক দূর দূর এলাকা দেখতে পাচ্ছিলাম। কারণ, আমি যে জায়গাটিতে বসে ছিলাম সেটি ছিলো বেশ উঁচু- বলা যায়, এই বনান্তরে একটা উঁচু ঢেউয়ের চূড়ায় বসেছিলাম।

সমুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কিছুটা উদ্দেশ্যহীন এক দৃষ্টি নিয়ে। একটু পরেই জ্বলে উঠলো ঢাকার উপশহর সাভারের আলোকমালা। দেখতে পেলাম ঢাকা বেতারের হাইপাওয়ার ট্রান্সমিটারের টাওয়ার লাইট, লাল একটা জ্বলন্ত বুলেটের মতো ঝুলছে।

সহকর্মীদের সঙ্গে দু'একটা কথার মাঝ দিয়ে আমার সময় কাটছিলো। কাজের কথাই বলছিলাম। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ যা ঘটনা নিয়েও আমরা কথা বলছিলাম।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা রওয়ানা হবো। কিন্তু মাঝখানের সময়টা বড়ো অসহ্য মনে হচ্ছিল। আর এই অসহ্য ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই বেশ কিছুটা নির্ভাবনা ও নির্লিপ্ততার ভাব নিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। সমুখে ফেলে দেয়া জ্বলন্ত সিগ্রেটের থেকে শেষ ধোঁয়ার শীর্ণ রেখাটি তখন বিসর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে ছোট্ট একটা শঁটিঝোপের দিকে মিলিয়ে যচ্ছিল।

শঁটিবনে হারিয়ে যাওয়া ওই বিশীর্ণ নীল ধোঁয়ার মতোই মনটা আমার হারিয়ে গেল পিছনে ফেলে আসা নাম-না-জানা অনেক গ্রাম-জনপদ, নদী, নদীর তীরভূমি-মাঠ, মাঠের মাঝখানের বিজন বটগাছটি-আপনমনে ঘাস ছিঁড়ে খাওয়া কতগুলো গরু। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের একান্তে বাঁধা একটা গরু-লম্বা মুখ তুলে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের গ্রামটির দিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের মাঝখানে চিলতে একটুখানি জায়গায় জমে থাকা পানির ধারে ধারে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুলের মতো অসংখ্য বক-কয়েকটা অল্প উঁচু দিয়ে ইতস্তঃত উড়েছে।

হঠাৎ করে আমার চিন্তার নীল বিশীর্ণ রেখাটি যেন শঁটিবন ছড়িয়ে আরো অনেক- অনেক দূরে হারিয়ে গেল। উপশহর সাভারের ওই ঝিলমিল আলোকমালার চেয়ে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার গ্রাম-গ্রামের মাঠের সেই বিজন বটতলাটি, যেখানে কেটেছে আমার শৈশবের দিনগুলোর অনেক অলস দুপুর, চারপাশের গ্রামের বৃত্তরেখার অনেক ওপরে ছড়ানো আমার সেই শিশু আমির কল্পনাগুলো যেখানে রামধনু হয়ে থাকতো।

অত্যন্ত গরীব এক কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলাম আমি। তবু আমার মা-বাবার সাধ ছিলে, আশা-আকাংক্ষা ছিলো-আমি বড়ো হবো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবো-সীমাহীন দারিদ্রের কশাঘাত থেকে পরিবারটিকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমার মা-বাবার গোটা জীবন-তাদের আজীবন বাঁচার লড়াই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো লেখাপড়া শিখতে। গাঁয়ের নওশের মাষ্টারের পাঠশালে যেতাম। পাঠশালা বসতো সকালে, কারণ নওশের মাষ্টারকেও আমার বাবার মতো মাঠে কাজ করতে হতো শুধু পেট চালানোর জন্যেই। দুপুরে আমার মাঠে কাটতো। আমাদের একটি গাই গরু ছিল। পাঠশালার পড়া সেরে আমি তাকে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতাম। দুপুরে মাঠের মাঝখানের বটগাছের তলায় বসে যেন এক দারুণ একাকীত্ব আমার ঘিরে ধরতো। একটা বাঁশির অভাব আমি বোধ করতাম।

একদিন অনেক রাতে মায়ের কোলে ঘুমানোর সময় মাকে কথাটা বলেছিলাম। মা রাজী হয়েছিলেন, আমাদের গাঁ থেকে দু'মাইল দূরে বৈশাখী মেলা বসলে আমাকে একটা তালপাতায় রাঙা বাঁশি কিনে দেয়া হবে।

এরপর থেকে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে আমার কল্পনার ভাসতে লাগলো তালপাতার একটা বাঁশি। মুহূর্ত দিন গুণতে গুণতে সত্যি সত্যিই সেই দিনটি ফিরে এলো । মা আমাকে দু'আনা পয়সা দিলো। সাতরাজার ধন মানিকের মতো ওই দু'আনা পয়সা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে চঞ্চল এক হরিণশিশুর মতো আমি ছুটে যাচ্ছিলাম। পুকুরের পাড়ে বসেছিলেন ফকির দাদু। আশি বছরের এক সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ। গাঁয়ের সব ছোটরা তাঁকে দাদু বলতো। আমাকে ওভাবে ছুটে যেতে দেখে তিনি আমায় ডাক দিলেনঃ কোথায় যাচ্ছো দাদুভাই। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বললামঃ আমি-আমি মেলায় যাচ্ছি- বাঁশি কিনতে। মা আমাকে দু'আনা পয়সা দিয়েছে। বৃদ্ধ আমার শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, মেলা থেকে ফেরার সময় বৃদ্ধকে ওই একই জায়গায় আমি দেখেছিলাম। তিনি অবশি সকাল-সন্ধ্যে ওই জায়গাতেই বসতেন। সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন বিকেলের হলুদ রোদ গাছের চূড়োয় চূড়োয়। বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞেস করলেনঃ কই দাদুভাই তোমার বাঁশি কই? আমি সহজভাবে বললামঃ কিনিনি তো! বৃদ্ধ বললেনঃ তবে তুমি যে বললে বাঁশি কিনবে? বললামঃ সারাদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে আমার খুব ক্ষুদে পেয়েছিলো, মুড়ি কিনে খেয়ে ফেলেছি। বৃদ্ধ অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত ধরে তাকিয়ে ছিলেন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠেছিলেনঃ বেশ, বেশ, করেছো দাদুভাই! মুড়ি খেতে আমারও বেশ ভালো লাগে- এখন সব নতুন চালের মুড়ি তো, বেশি মিষ্টি লাগে- তাই না দাদুভাই।

মিষ্টি আমার মোটেই লাগেনি। প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় মুড়িগুলো গিয়েছিলাম মাত্র। মেলায় ঘুরে ঘুরে রকমারি মিষ্টি আর নানা ধরনের নানা স্বাদের খাবার দেখার পর ওই শুকনো মুড়িগুলো মিষ্টি লাগার কথাও নয়। তাছাড়া বৃদ্ধ যতোই উচ্ছ্বাস আর হাসির সঙ্গে কথাগুলো বলুন কেন, আমার কাছে তা বিষণ্ণ মনে হয়েছিল।

সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মাও আমার বাঁশি কেনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। মা দারুণ স্নেহের আবেগে বুকে টেনে ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম। মায়ের দু'চোখে জল। কান্নার বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো টলটল করতে মায়ের গাল বেয়ে পড়লো। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না- উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম আমাদের ভিটের এক প্রান্তে একটা ডালভাঙ্গা সজনে গাছের তলায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকের অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীদের আলো আর আমার বিধবা আপার ধরানোর চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে আমিও কাঁদছিলাম।

সেদিন আমাদের দাদুভাইয়ের কণ্ঠের সেই বেদনাভারাক্রান্তের বিষণ্ণতা, আমার মায়ের এই আবেগাকুলতা, চোখের জল, আমার কান্না- এসবের কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনি।

অর্থ খুঁজে পেয়েছি আরও অনেক পরে- দীর্ঘ একুশ বছরের পর, ঢাকায়-গত ২৫শে মার্চের বীভৎস রাতে। একটি সংবাদপত্র অফিসের ছাদে বসে। আমাদের গায়ের ভিটের সেই ডালভাঙা সজনে গাছের চারপাশের অন্ধকার আর হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠা জোনাকীর আলোর মধ্যে নয়, চারদিকে পাকিস্তানী বর্বরদের স্বয়ংক্রিয় রাইফফেল, মেশিনগান, মর্টার ও ট্যাঙ্কের গোলাগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বিধবা আপার ধরানো চুলোর অগ্নিশিখা দেখতে দেখতে নয়, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, সদরঘাট, শাঁখারী বাজার, তাঁতীবাজার, চকবাজার, পিলখানা আর ফার্মগেটে হাজার হাজার ঘরে পাকিস্তানী বর্বরদের লাগানো ভয়াবহ আগুন দেখতে দেখতে।

সেদিন রাতে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম আমার সেই গ্রাম, গ্রামের মাঠ আর বৈশাখী মেলায় ঘুরে বেড়ানো আমার সেই শিশু আমিকে। দেখতে পাচ্ছিলাম প্যান্ট পরা নগ্ন গায়ের সেই চঞ্চল শিশু- তার মাথাটা ওরা গুলির আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছে-কালো পীচের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তধারা -মাথার খুলির টুকরোগুলো- সেইদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের গাঁয়ের সেই দাদুভায়ের কান্নাভারাক্রান্ত কণ্ঠের অর্থ, বুঝতে পেরেছিলাম আমার মায়ের আবেগাকুল বুকের দ্রুত স্পন্দন আর চোখের জলের অর্থ। বুঝতে পেরেছিলাম আমার সেই শিশু আমির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার অর্থ।

অতীতের এইসব টুকরো টুকরো স্মৃতির কথা ভাবতে অজান্তেই কখন যে হাতের এল-এম-জি'টাকে ইস্পাতের সাঁড়াশির মতো দু'হাতে চেপে ধরেছিলাম তা আমার মনে নেই।

(সাদেকীন রচিত)

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

........ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী ঘটনা। এর পটভূমিতে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও জীবনদানের করুণতম গাথা। অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বাধীন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়নি। বিশ্বের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত নৃশংসতম ও বর্বর পাক-সৈন্যদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের এ স্বাধীনতার সূর্যোদয় সম্ভবপর হয়েছে। অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের মতই আমাদের মুক্তিযুদ্ধও প্রথমদিকে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন- পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম স্তরে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলেছিল। এই গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালানোর উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নাজেহাল করা। মূলত কতগুলি ফ্রন্টে বিভক্ত করে শত্রুকে কোণঠাসা করে আনা গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি। এই ফ্রন্টগুলি হলো অর্থনৈতিক, সামরিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষতি সত্ত্বেও শত্রুকে কোণঠাসা করার জন্য বাংলাদেশ গেরিলাদের বিভিন্ন পুল, রেলওয়ে, ব্রিজ, কালর্ভাট, প্রধান প্রধান সড়ক প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করতে হয়। শত্রুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আঘাত হানার জন্যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের অনেক শিল্পকারখানাও নষ্ট করতে হয়।

পরে শত্রুমুক্ত করার তথা স্বাধীনতা অর্জনের চরম মুহূর্তে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে নিশ্চিত পরাজয় বর্বর হার্মদ পাক-সৈন্যরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে বহু বছর পিছিয়ে

দেবার মানসে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের উপর ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় এবং সার্বিক অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। তাই বিজয়ের পরে আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হবে বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সব মন-প্রাণ নিয়োগ করা।

মুক্তিসংগ্রামের থেকে মুক্ত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন আরো কঠিন ও কঠোর । এ বিরাট দায়িত্ব স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এবং সরকারও এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রতিশ্রুত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানী হার্মাদ নরপিশাচরা স্বেচ্ছায় হাতের অস্ত্র ছাড়েনি। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তারা পরাজয়ের শেষ মুহূর্তে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জের কল-কারখানাগুলি নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এছাড়া দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃষকরা ঠিকমত চাষাবাদ করতে পারেনি। শিল্প ও কৃষি দেশের প্রধান দুইটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর মারাত্মক আঘাত পড়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত নয় মাস যাবৎ বাংলাদেশের অধিবাসীদের ওপর যে দুর্যোগ ও কালরাত্রি নেমে আসে তাতে ১২ লক্ষাধিক লোক নিহত হয়, ১ কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশের অভ্যন্তরেই গৃহহারা হয়। এই ছিন্নমূল অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করার অনুকূলে ছিল না। অন্যান্য সকল লোকমাত্রেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং কল-কারখানা, কৃষিকার্য, স্কুল, কলেজ, কোর্টকাচারী প্রভৃতি সবকিছু বন্ধ অবস্থায় ছিল।

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল স্বর্ণতন্তু পাট। এই পাটচাষের প্রতি কৃষকদের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মনোনিবেশ করতে হবে। বিশ্বে এর অসম্ভব চাহিদা অনস্বীকার্য। এছাড়া চাও বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য ফসলের মধ্যে অন্যতম। এ দুটি ব্যবসায় বৃটেনের বাংলাদেশের সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এমন ধারণা নিত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই দুটি শিল্পে ব্যাঘাত না সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বৃটেন বাংলাদেশ সমস্যায় পাক-জাঙ্গীশাহীকে শেষের দিকে সমর্থন করেনি।

এছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পের পুনর্গঠনে বহু অর্থের প্রয়োজন। এটা কিছু সময়সাপেক্ষও বটে। বাংলাদেশে সম্পদের অভাব নেই। আর বাংলাদেশ সরকারের বিরাট ও নিরঙ্কুশ জনসমর্থন আছে। তাই মনে হয় বাংলাদেশে এই সমস্ত সমস্যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে। দেশের সাংগঠনিক কার্যে মানুষ চরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সহনশীলতা দ্বারা দেশকে গড়ে তুলবেন।

দেশের সাংগঠনিক কার্যে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করতে হবে। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই এ ব্যবস্থা সীমিত রাখলে চলবে না। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সাহায্য তর্কাতীত। তাই রণবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতকেই এগিয়ে আসতে হবে সবচেয়ে আগে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জল, নৌ ও বিমানপথের যোগাযোগ স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অবশ্য ইতিমধ্যেই বনগাঁ, বেনাপোল, শিয়ালদহ ও যশোরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে, তথাপি তা আরো প্রসারিত করার আমু ব্যবস্থা দুই সরকারকেই করতে হবে- যদিও তা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্থলপথ ও জলপথের এই অসুবিধাগুলি আকাশপশে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করে অনেকাংশে দূর করা যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে সত্বর বিমান যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এটা ঠিক, যুদ্ধে অনেক বিমানক্ষেত্রে রানওয়েগুলির ক্ষতি হয়েছে, তথাপি সেগুলির সংস্কার খুব বেশী সময়সাপেক্ষ নয়।

বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্যে বদ্ধপরিকর, দেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখায় যা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে কায়েমী স্বার্থের কোন স্থান থাকবে না, পুঁজিবাদ বা আমলাতান্ত্রিকতা কোন অসুবিধা করতে পারবে না, নতুন করে কোন সুবিধাবাদী চক্রকে গড়ে উঠতে দেয়া হবে না। সরকার এটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, সংগঠন ও পুনর্গঠনের জন্যে রয়েছে যেটা সেটা

হলো দেশের সর্বত্র অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রসারিত করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। ইতিমধ্যেই সরকার দেশের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক সম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, বাংলাদেশে আর কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে দেশ আর কলুষিত হতে পারবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা যুবকদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানী রক্তলোভী হার্মাদরা বাংলাদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক কর্মী, সাহিত্যিক প্রভৃতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাই দেশের পুনর্গঠনে অধিকতর সহায়ক হবে জানতে পেরেই ইয়াহিয়ার লুটেরারা বেছে বেছে এদের হত্যা করে। কাজেই নানা দিক দিয়ে সরকারের অসুবিধা হবে। অবশ্য যতই বাধা থাকুক না কেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আবার দেশ গঠনেও আত্মনিয়োগ করতে পারবে। সাংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোণিতমূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি- এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্যে এবং দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্যেও আমরা তেমনি প্রাণ পণ করব। এ ব্যাপারেও আমরা বিশ্বে নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হব।

(নাসিম চৌধুরী রচিত)

বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

.... ডিসেম্বর, ১৯৭১

যুদ্ধ একদিন শেষ হয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে গড়ে তুলতে হয় নতুন জীবন,সভ্যতা। মানুষ যুদ্ধ চায় না। চায় শান্তি। তবু যুদ্ধ চলে আসছে মানব অস্তিত্বের আদিকাল থেকে। আমরা যুদ্ধ চাইনি। তবু যুদ্ধ চেপে বসেছিল আমাদের উপর। নয় মাস ২২ দিন পরে বাংলাদেশের পাক দখলদার বাহিনী সর্বত্র আত্মসমর্পণ করেছে। এখন আমাদের ভাববার পালা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন নিয়ে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশ গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করা। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দুঃখ-দারিদ্রকে দূর করে, সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল দেশ। এখানে গড়পড়তায় প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার হার ৯০০ জনের উপরে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ এখানে খুব বেশী। আমাদের প্রধান এবং প্রাথমিক সমস্যা এই বিরাট জনসংখ্যার মুখে অন্ন যোগান।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ৩৫.৩ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ হল ২২.৫ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে বৎসরে একাধিকবার আবাদ করা হয় এমন জমির পরিমাণ হল ৩ মিলিয়ন একর। তাই বলতে হয় মোট ফসল উৎপাদন জমির পরিমাণ হল ৩৮.৮ মিলিয়ন একর।

একটা দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় দু'ভাবেঃ

(১) নতুন জমিকে কর্ষণ উপযোগী করে; এবং

(২) আবাদী জমিতে ফসলের উৎপাদন মাত্রা বাড়িয়ে।

বাংলাদেশে বর্তমানে চাষ করা হয় না কিন্তু চেষ্টা করলে কর্ষণ উপযোগী করা যায় এমন জমির পরিমাণ প্রায় ১ মিলিয়ন একর। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, যেমন কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে এই ভূমিকে কর্ষণ উপযোগী করা সম্ভব। বিগত কয়েক বছরে অনেক উন্নয়নগামী দেশে খাদ্য উৎপাদনের মাত্রা দ্রুত বেড়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত নতুন জমি আবাদ করে। কিন্তু বাংলাদেশে আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়। তাই ফসল বাড়াবার প্রধান উপায় হিসাবে এখানে গ্রহণ করতে হবে বর্তমানে যে আবাদী জমি আছে তাতেই অধিক ফসল ফলানোর উপায় উদ্ভাবন করে- উন্নত কৃষিপ্রণালীর প্রয়োগ ঘটিয়ে।

বাংলাদেশে ফসলের ফলনের মাত্রা খুবই কম। যেখানে বাংলাদেশের ধানের গড়পরতা ফলনের পরিমাণ একরপ্রতি ৯০০-১০০০ পাউণ্ডের মত সেখানে জাপানে একরপ্রতি ধানের ফলন হচ্ছে ২০০০ পাউণ্ডের উপর। আমাদের দেশে ধানের ফলন-মাত্রা কমের একটি বড় কারণ জমিতে যথাযথভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের জমিতে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রদান করে ফসলের হার অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। যেমনঃ একর প্রতি ৪০ আউন্স নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিয়ে দেখা গিয়েছে যে, এর ফলে আউশ ধানের ফলন ৩৭ ভাগ, আমন ধানের ফলন শতকরা ৪০ ভাগ ও বোরো ধানের ফলন শতকরা ৪৬ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

আমাদের দেশে মাটির নীচে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তার সাথে বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস যুক্ত করে নাইট্রোজেন ঘটিত সার যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার পরিমাণ হল ৯.৩৪ মিলিয়ন কিউবিক ফুট। এই গ্যাস আমরা বহুদিন ধরে ব্যবহার করতে পারবো। সার উৎপাদনের কাজে জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আবাদী জমির কম করে শতকরা ৬০ ভাগ শীতকালে পতিত থাকে। এর প্রধান কারণ শীতকালে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়পরতায় দেড় ইঞ্চির বেশী নয়। শীতকালে জলসেচের ব্যবস্থা করে তাই বহু জমিতে ফসল ফলান সম্ভব। এইভাবে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা বহুলভাবে সমাধা করা চলে। পাকিস্তানী আমলের সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা ৫ ভাগ জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত আরো অনেক জমিতে সেচ-ব্যবস্থা সম্ভব।

বাংলাদেশের এক বিরাট সমস্যা বন্যা। বন্যার পানি প্রতিবছর যথেষ্ট পলিমাটি বহন করে বাংলার মাটিকে উর্বর করে। কিন্তু বড় বন্যা হলে তাতে বাংলাদেশের ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সরকারি হিসাব মতে বাংলাদেশে যখন মাঝারি রকমের বন্যা হয়, তখন প্রায় ৯ মিলিয়ন একর জমি জলমগ্ন হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধান এ পর্যন্ত চালান হয়েছে। তা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভারতের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক কারণে, ভারতের সাথে এতদিন বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা সবম্ভব হয়নি। কিন্তু এই সহযোগিতার প্রতিবন্ধক এখন দূর হয়েছে।

একটা দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্তমান যুগের রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা এখন মোটামুটি সব অর্থনীতিবিদই স্বীকার করেন। কিন্তু সব পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে যেমন পরিকল্পনা তৈরির নির্ভুলতার উপর, তেমনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে কার্যর্কর করার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে তাদের নিষ্ঠা ও সত্যতার উপর। কেবল আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গণসংগঠনের। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, যে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে দেশকে শত্রুকবল

থেকে মুক্ত করল, তাদের দেশপ্রেম ও কর্মশক্তিকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগাতে হবে। এদের সাহায্যে গ্রামবাংলার কৃষি অর্থনীতিতে দ্রুত বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব।

(ডা. এবনে গোলাম সামাদ রচিত)

অগ্রগামী মুক্তিবাহিনী

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তানী বর্বর সেনারা মুখের উপর এক বিরাশী-সিক্কার চড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ার উপক্রম। গত মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সমানে জ্বালাতন করে, বাংলার বুকে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে, সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানে পরিণত করে, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করেছে ভেবে, বাংলার পথে পথে শকুনী-গৃধিনী এবং শিবাদলের অট্টহাসিতে ভরে তুলেছিল বাংলার আকাশ। কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি তাদের বোধের অন্তরালে কখন যে জেগে উঠেছে, অনুধাবন করতে পারেনি অদূরদর্শী বর্বর হায়েনার দল। আচমকা কোন দিক থেকে গালের উপর পড়ল বিরাশী সিক্কার চড়।

আর অমনি বন্ধুর দল হায় হায় করে উঠলো। নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বিতাড়িত হয়ে সাধারণ পরিষদে হাজির। গণতন্ত্রের জিগির তুলে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন তুলে, পাকিস্তানের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানী বন্ধুরা আরামকে হারাম করে বিশ্বের দরবারে হাজির হলো। বন্ধ কর, যুদ্ধ বন্ধ কর।

কারণ কী? কারণ আছে তো বটোই। মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। একের পর এক পতন হচ্ছে নিরাপদ দুর্গগুলোর। সাহায্যদ্রব্য আনয়নের এবং পাঠানোর পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দুটি প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম এবং চালনা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বিমান বাহিনী যে সাহায্য করবে সে উপায়ও নেই। কুল্লে দু'খানা বিমান এখন পাকিস্তানের বেঁচেবর্তে আছে, তাও আবার লুকানোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেননা সারা বাংলাদেশে জানোয়ারগুলোর আর লুকানোর কোন ঠাঁই নেই। মুক্তিবাহিনী খুঁজে খুঁজে ওদের আঘাত করছে, শেষ করছে। সারাবাংলা এখন হয়ে উঠেছে শয়তানের মৃত্যুফাঁদ।

বাংলাদেশের অর্থে কেনা সমরসম্ভার নিঃশেষিত প্রায়। এতদিন যে ধর্মের আফিমের নেশায় বুঁদ হয়েছিল সারা পাকিস্তানের সুবিধাবাদী জল্লাদ আর দালালের দল, আজ তাদেরও নেশা ভাঙতে শুরু করেছে। জাতীয় সংগ্রামের আগুনের আঁচে আফিমের নেশাও চড়াৎ করে ভেঙে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী মহাপ্রভুদের মনোরঞ্জনার্থে আর অস্ত্র ধরতে রাজী নয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অনেকেই। আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জবানবন্দীতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে।

এবার দিন গুণবার পালা সামরিক জান্তার এবং তাদের চেলাচামুণ্ডা মওদুদী, ভুট্টো, কাইয়ুম খান, নুরুল আমিন, মাহমুদ আলী প্রমুখের। নিয়াজী বাংলার মাটিতে বসে ইয়ানফসী, ইয়ানফসী শুরু করেছে। ঢাকা বেতার তবু আজো প্রলাপ বকছে। ওদেরই কথার প্রতিধ্বনি তুলে নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অনুভব ভুলের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

মুক্তিবাহিনীর মর্টার শেলের আঘাতে এবং মেশিনগানের গুলিতে সচকিত দালালের দল কোন বিবর খুঁজছে? বোমার আঘাতে প্রকম্পিত ঢাকা নগরীতে আজ কি আর বর্বরদের জীবনের উচ্ছলতার কোন অবশিষ্ট আছে? না,

নেই। যশোর দুর্গ পতনের পর, ময়নামতি দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পর, সিলেট জেলা, রংপুর এবং যশোর-খুলনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত হওয়ার পর আর কি ভাবছে বাংলার স্বার্থবিরোধী, বাঙলার চরম শত্রু পাকবাহিনী এবং তার অনুচরেরা?

আজ মুক্তিবাহিনীর পথ রোধ করবে কে? কোথায় সে শক্তি? নিঃশেষিত শক্তি পাকিস্তানের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। যারা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে তাদের নিজেদের স্থান করে নিতে হবে সেই করবে।

দুঃসাহসী মুক্তিবাহিনীর দৃঢ়পণ, বজ্রমুঠিতে ধরে রাখা হাতিয়ার আজ বদ্ধপরিকর সব অনাচারী, অত্যাচারী, জুলুমবাজদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য। লাখো শহীদের রক্তলাল-বাঙলায় উদিত আজ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। উত্তাল বিজয়-উল্লাসে মুখরিত বাংলা আকাশ-বাতাস।

আজ শোন বর্বরের দল, হয় মৃত্যুবরণ করো নয় পরাজয়ের কালি ললাটে লেপন করে আত্মসমর্পণ করো। বাংলার মাটিতে ঠাঁই নেই তোমাদের।

দুর্জয়, দুর্বার বাঙলার মুক্তিবাহিনী এগিয়ে চলো। সংহার করো, নিঃশেষ করো অনাচারী বর্বরদের। বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তোমাদের বিজয়-আহ্বান জানাতে প্রস্তুত।

সুদূর দিনাজপুরের বাংলাবান্ধা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত দৃঢ় দুর্দমনীয় হোক তোমাদের পদক্ষেপ। মনোবলহীন, ক্লীব, কুৎসিৎ হানাদার আজ মৃত্যুর দিন খুঁজছে বন্দীপ্রায় বিবরে।

তোমাদের জয়যাত্রায় শরীক সাতে সাত কোটি বাংলার মানুষ। গণহত্যাকারীদের নিঃশেষ করো বাংলার মাটি থেকে

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

এখন অনেক কাজ

২২ ডিসেম্বর, ১০৭১

বাংলাদেশ এখন মুক্ত, কিন্তু আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এই সবে শুরু। মুক্ত বাংলার আকাশে নতুন সূর্যের প্রভাতী আবিরে সদ্য স্নান করে উঠেছি আমরা একটা জাতি। তাই নতুন জাতির জন্ম হোল-এখনই না বলে-একটি বাস্তব সত্য মিথ্যার কারামুক্ত হোল একথাই ঠিক। সত্য বনাম মিথ্যার চূড়ান্ত এই মুখোমুখি সংঘর্ষে পতন হয়েছে মিথ্যার, কিন্তু এ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে সত্যও হয়েছে মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত। সে জন্যেই এখন বিজয়ের উল্লাসে বুঁদ হয়ে আমাদের খুখীর তুফানে ভেসে যাওয়া চলবে না। এখন অনেক কাজ।

কারামুক্ত হলেই মুক্তি নয়, মুক্তির জন্য দরকার বেশুমার ত্যাগের-অনাবিল একতার। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আমরা শোষিত, ধর্মের নামে ভণ্ডের অত্যাচারে জর্জরিত। আমাদের আকাশে এখন নতুন সূর্য- কিন্তু মাটিতে ২৪ বছরের ভাগাড়ের ধ্বংসাবশেষ। শকুনেরা চব্বিশ বছর ধরে- আমাদের মরা আত্মাকে নখ দিয়ে ছিঁড়েছে, গায়ের

জোরে এই ভাগাড়েই কামড়াকামড়ি করেছে একে অন্যে। এই চব্বিশ বছরের নৃশংস ভাগাড়কে, শকুনের উচ্ছিষ্ট এই হাড়গোড়ের পাহাড়কে অপসারণ করে যদি সজীব করতে পারি তাহলে হবে আমাদের সত্যিকারের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ''জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক।'' নজরুল বলেছেন, ''সজীব করিব মহাশ্মশান''। এই শপথই আমাদের সত্যিকারের মুক্তির শপথ।

আমাদের অনেক ক্ষত-জাতীয় দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত। এই মুক্তির প্রভাতে আমরা হয়তো মনের ক্ষতই উপলব্ধি করছি গভীরভাবে।

আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৫২-র সেই ভাষা আন্দোলনে, আমাদের এখনই ফিরে যেতে হবে ১৯৪৮-এর মোহাম্মদ আলী জিন্না সেই সমাবর্তন বক্তৃতায়, সে বক্তৃতায় জিন্না বলেছিলেন,- ''পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুই হবে।''

আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ বরকত, সালামের মায়ের কথা- আজকের খসরু ড্রাইভারের মায়ের মতই। এ স্বাধীনতাকে তাদেরও ভাগ আছে সমান সমান। স্বাধীনতার প্রত্যেকটি শহীদকে আমাদের জানতে হবে। এ যুগের দধীচির মতই। এবং সেখান থেকে শুরু করতে হবে এই নতুন জাতির পুনর্গঠন।

শত্রুরা আমাদের অর্থনীতিকে যেনম তছনছ করেছে তেমন তছনছ করেছে সংস্কৃতি ও জাতীয় সম্ভ্রমকে। একটা জাতির বিকাশে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা যেমন বাধ্যস্বরূপ, তেমনই সমান প্রতিবন্ধক হল সাংস্কৃতিক সংকট। আমাদের সামনে এখন দুটোরই সংকট অতিমাত্রায়। জাতির অর্থভাণ্ডার আজু মুক্তির ঊষালগ্নে যেমনই শূন্য, সংস্কৃতিও একইভাবে শূন্য। শত্রুরা জাতীয় তহবিলের অর্থের মতোই শেষবেলায় রাইফেল দিয়ে লুটিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী তথা শিল্পী গোষ্ঠীকে।

সব খুইয়ে মুক্তি পেয়েছি বলে আমাদের হতাশায় ভেঙ্গে পড়া ভুল- শূন্যতা আমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের ধ্বজাধারীরা সাথে কোন তহবিল নিয়ে আসেনি- আমাদের সম্পদ নিয়ে তারা মোড়লী করেছে এতকাল। আমাদের মাটিতে ফসল ফলে- আমাদের ভেতর থেকেই এসছিলেন জাতীয় সংস্কৃতিক বা বুদ্ধিজীবীরা। সুরের ইন্দ্রজাল বা মধুকণ্ঠ আমাদেরই ঘরের ফসল। তাই শূন্য দেখে ভেঙ্গে যাওয়া মানেই পূর্ণতার পথে কাটা দেওয়া। শত্রুর শিবিরে নির্যাতিতা বোনদের দেখে আমাদের শিউরে ওঠার প্রয়োজন নেই। তাদের সামনে আমরা মুখ তুলেই দাঁড়াবো। আমাদের ছেলেরাই দেবে তাদের এই চরম ত্যাগের বখশীস। তাদের ত্যাগের মর্যাদা দিতে যদি আমরা না পারি তাহলে অসংখ্য-শহীদকেও আমরা অপমানিত করবো- কারণ শহীদের আত্মার সঙ্গে এই নির্যাতিত আত্মার যোগ খুবই নিবিড়।

আমরা জীবন দিয়েই নতুন জীবন লাভ করেছি। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এসেছে আমাদের এই মুক্তির প্রভাত, তাই সেই ত্যাগ দিয়েই এই মুক্তিকে আমাদের বরণ করতে হবে- ভোগ দিয়ে শুরু করে নয়। আমরাই প্রমাণ করেছি- ভোগের জগৎ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই আজ চব্বিশ বছর পরে ভোগের চিরনিবৃত্তি হোল।

আজ নতুন দিনের এই প্রভাতবেলায় আমাদের আরো ত্যাগের জন্য শপথ নিতে হবে। কারণ, কোন মতেই আবার যেন আমাদের এই মুক্ত আকাশ কালো মেঘে না ঢেকে যায়, কোনোমতেই যেন আজকের এই মুক্ত বাতাস আবার বিষিয়ে না যায়।

অর্থ নাই- তাতে কী? আমাদের মাটিতে সোনা ফলে। যে সোনার বাংলাকে কবি ভালবেসে গেছেন, কবি যে বাংলার মুখ দেখে আশান্বিত হয়েছেন- সে বাংলাকে আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙলী আবার ভরিয়ে তুলতে পারবো।

শকুনেরা চলে গেছে, ফেলে গছে অজস্র হাড়গোড়। তাই আমরা এখনও মুক্ত নই, শকুনমুক্ত মাত্র। এই জন্যেই আনন্দ মিছিলে আমাদের উল্লাস করার মত সময় নেই- এখন ত্যাগের মুহুর্ত। ঝটিকাবিধ্বস্ত জাতির ভাঙ্গা কাঠামোকে পূর্ণ উদ্যম গড়ে তোলার কাজে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরই। মনে রাখতে হবে, ব্যথা আমাদের এবং তা আমাদেরই দেহে। তাই এখন শুধু উল্লাস নয়, এখন অনেক কাজ।

(হাফেজ আলি রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত আরও বাংলা কথিকা	''শব্দসৈনিক'' ফেব্রুয়ারি ১৯৭২	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১

রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে

১৪ আগস্ট, ১৯৭১

আজ উনিশশো একাত্তর সালের চৌদ্দই আগস্ট। মাত্র এক বছর আগেও এই দিনে আমি ছিলাম ঢাকায়। আমার প্রিয় পরিজন, পরিচিত পরিবেশের মধ্যে। আমার চোখে কত স্বপ্ন, দেশ স্বাধীন, স্বাধীন দেশে এই প্রথম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনে দেশে আসবে বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নাগরিক স্বাধীনতা। সর্বোপরি দেশের মানুষ পাবে তাদের হারানো অধিকার।

এই অধিকার আমরা পাইনি। তার বদলে পেয়েছি বুলেট। পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অকস্মাৎ' ঘুম ভেঙে গেছে, চারদিকে কামান আর ট্যাঙ্কের গর্জন। অসহায় মানুষের ভীত আর্তনাদ। রক্তে ঢাকা শহর ভেসে গেছে। সারা বাংলাদেশ ভেসে গেছে। আর সেই রক্তের স্রোতে ভাসমান স্তূপীকৃত লাশ। শিশু-নারী-বৃদ্ধ-যুবকের মৃতদেহ। এই লক্ষ মানুষের মৃতদেহের স্তূপের নীচে ইয়াহিয়া চাপা দিতে চেয়েছে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার লাভের ইচ্ছা। ইয়াহিয়ার সৈন্য আমার ভাইকে হত্যা করেছে, আমার বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। আমার পিতার সাধের গোলার ধান পুড়িয়ে ছাঁই করে দিয়েছে। আমার মাকে দিয়েছে এক-বুক হাহাকার উপহার। গত ২রা জুন তারিখে আমার কৈশোর আর যৌবনের হাজারো স্বপ্নমাখা ঢাকা শহর ছেড়ে যেদিন মুক্তাঞ্চলের দিকে পা বাড়াই, সসিদন জ্যৈষ্ঠের বাংলার তপ্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলেছি, মাগো, আবার যেন তোর কোলে ফিরে আসতে পারি। ফিরে আসতে পারি স্বাধীন বাংলার পতাকাশোভিত তোর ছায়া-সুনিবিড় নীড়ে। খুনী ইয়াহিয়ার দস্যু সেনাবাহিনী আমার চোখ থেকে স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে, আমার কণ্ঠ থেকে গান কেড়ে নিয়েছে, আমার দেশের সবুজ শ্যামল আঁচল রঞ্জিত করেছে আমারই ভাই আর বোনের রক্তে। কিন্তু সে আমার মৃত্যুঞ্জয় কালজয়ী আবহমানের স্বাধিকার-চেতনা হরণ করতে পারেনি। তাই আজ মুক্ত বাংলার বুকে লক্ষ মুক্তিফৌজ প্রস্তুত। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমি আমার দেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিফৌজের পাশে রয়েছে। যদি মরতে হয় স্বাধীনতার জন্য মরবো, যদি বাঁচতে হয় স্বাধীন জাতির গৌরব ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচবো।

চৌদ্দই আগস্টের কথা বলছিলাম। এই দিনটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু গত ২৫শে মার্চ বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া মধ্যরাতের বর্বরতায় যে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে, তার আবার স্বাধীনতা-দিবস কি? বাঙালীর স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করবো ঢাকায়, রাজপথ থেকে ইয়াহিয়ার দস্যুচক্রের রক্তচিহ্ন মুছে, শিশুঘাতী নারীঘাতী বর্বরতার শেষচিহ্ন লুপ্ত করে স্বাধিকার-চেতনার নতুন উৎসবে মুখর হবে ঢাকা, উদ্ভাসিত হবে সারা বাংলাদেশ। বিশ্বাস করুন, এই প্রত্যয় নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমার বিশ্বাস বাঙালীমাত্রেই এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন।

চৌদ্দই আগস্ট আমারও স্বাধীনতা দিবস হতে পারতো। কিন্তু তাকে হতে দেয়া হয়নি। যা হতে পারতো আমার প্রাণের, ধানের, গানের সৌরভ, তাকে করা হয়েছে আমাকে দমনের-নির্মমভাবে দমনের হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার আজ ভেঙে গেছে। তাই চৌদ্দই আগস্ট আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবনে মৃত। আর এই একটি

দিবসের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নব-জন্মগ্রহণ করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলা। বঙ্গবন্ধু যার নেতা। আমি, আপনি সকল বাঙালী যে স্বাধীনতার অগ্নিরথের আরোহী।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোতে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় সমঅংশীদারিত্ব দেয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না করাচী ও ইসলামাবাদের শাসক চক্রের। তারা চেয়েছে বাংলাদেশে একটি অর্থনৈতিক কলোনী প্রতিষ্ঠা করতে। আর এই কলোনী শাসনের জন্য চেয়েছে বাঙালীর উপর একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভুত্ব। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ততোধিক সংখ্যালঘু একটি আমলাতান্ত্রিক সামরিকচক্র গত তেইশ বছর বাংলাদেশকে শাসন করেছে, তাদের অনুগৃহীত তেইশটি পরিবার বাংলাদেশেকে যথেচ্ছ শোষণ করেছে, তাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার করে রেখেছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কোন কোন খ্যাতনামা রাজনৈতিক ভাষ্যকার সম্পূর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অশ্বেতাঙ্গদের উপর মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের শাসনের অনুরূপ। পিণ্ডির শাসকচক্র ও প্রিটোরিয়ার শাসকচক্রের ফ্যাসিস্ট, অগণতান্ত্রিক ও মানবতাদ্রোহী ভূমিকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বাঙালীর ভাষা, বাংলাদেশের সংস্কৃতি-এক কথায় যা কিছু বাঙালীর জাতীয় চেতনার মহত্তম প্রকাশ, ১৯৪৮ সাল থেকে তাকে বার বার ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে, এই একটিমাত্র লক্ষ্য থেকে। এবং সেই লক্ষ্য হল বাঙালীর রাজনৈতিক অধিকার হরণ। বাংলাদেশে পিণ্ডির একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা।

এই প্রভূত্বের বিরুদ্ধে, এই নির্মম শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে যিনিই কথা বলেছেন, বাংলাদেশের বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, করাচী এবং পিণ্ডির শাসকচক্রের চোখে তিনিই হয়েছেন দেশদ্রোহী। বৃটিশ আমলের আমলা গোলাম মোহাম্মদ শেরে বাংলা ফজলুল হকের মত বরেণ্য নেতাকে বলেছেন দেশদ্রোহী, তার বিচার করতে চেয়েছেন। মীরজাফরের বংশধর ইস্কান্দার মীর্জা হুমকি দিয়েছেন, তিনি গুলি করে মারবেন বয়োবৃদ্ধ নেতা মওলানা ভাসানীকে। ইংরাজ আজলের পা-চাটা সিপাই আইয়ুবের চক্রান্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশের বাইরে সুদূর বৈরুতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। আজ আইয়ুবের বিশ্বাসঘাতক দক্ষিণ হস্ত ইয়াহিয়ার চক্রান্তে প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত। চলছে তার প্রাণ হননের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

বাংলাদেশের এমন একজন বরেণ্য নেতা নেই, যিনি পিণ্ডির প্রাসাদ-চক্রীদের কাছ থেকে দেশদ্রোহী আখ্যা পাননি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধিকারের দাবি যিনিই করেছেন, তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে। পিণ্ডির এই নির্মম পীড়ন-চিহ্ন আজ যারা বাংলাদেশের শরীরে। ১৯৪৭ সালের পর এমন একটি বছর নেই, যে বছর বাংলাদেশে রক্ত ঝরেনি, মায়ের বুক খালি হয়নি, সন্তানহারা বাপের বুকফাটা আর্তনাদ বাংলাদেশে আকাশ বিদীর্ণ হয়নি। বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখ কি একটি? ১৭ই মার্চ, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ৭ই জুন, ২০ শে জানুয়ারি, ২৫ শে মার্চ কত রক্তাক্ত তাখির আর এই তারিখের বীভৎস বর্বরতার কথা বলবো? সবশেষের তারিখ এই ২৫ শে মার্চ তারিখ। ছাত্র-যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী মজুর, ঘুমন্ত বস্তিবাসী নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষকে অকাতরে হত্যা করা হল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে, এবং তা'হল বাঙালীর স্বাধিকার হরণ।

তাই বাংলাদেশ আজ বিদ্রোহী। স্বাধীনতার রক্তপতাকার নিচে জমায়েত হয়েছি আমরা কোটি কোটি বাঙালী। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালীর প্রিয় মুজিব ভাই। এই একটি নাম আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী প্রেরণা। বাঙালীর স্বাধিকার চেতনার সঙ্গে এই একটি সংগ্রামী মানুষকেও হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে পিণ্ডির খুনী চক্রীদের মধ্যে।

আমি সূর্যসম্ভাবনার বিশ্বাসী। বুড়িগঙ্গার পলিমাটিতে তৈরি নতুন জীবন সম্ভাবনাতেও আমি আস্থাবান। এত রক্ত আমরা দিয়েছি, এই রক্তপিচ্ছিল পরে স্বাধীনতার সূর্যোদয় অবশ্যম্ভাবী।

আমরা আবার ফিরবো ঢাকায়। আমাদের নতুন স্বাধীনতা-দিবসে উৎসব হবে। প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উৎসব দিবসটি পালনের জন্য আমি অপেক্ষা করছি। আমি জানি, আমার স্বপ্ন, আমার প্রতীক্ষা সফল হবেই।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

প্রতিধ্বনি

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

সেখানে অন্যায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, যেখানে মানুষ মানুষের রক্ত চোষে, যে দেশে রক্তের স্রোত বয়, পংকিলতা আর কুটিলতার শত আচ্ছাদন ভেদ করে সেখানেই ফুটে ওঠে নতুন সূর্য। রক্তনদীর ঢেউ চুরমার করে দেয় শোষণ-নির্যাতনের যাঁতাকল। এটাই চিরন্তন সত্য। আর এই মহাসত্যের ভিত্তিতে এই নরম রোদের দেশবাংলায় আজ আমরা হয়েছি সৈনিক। পক্ষান্তরে পাক জঙ্গিশাহী বাংলাদেশে শোষণ, নির্যাতন ও নির্বিচার গণহত্যা চালিয়েও যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারনি বরং বাংলাদেশের অর্থের ওপর নির্ভরশীল গোটা পশ্চিম পাকিস্তানই টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ইয়াহিয়া চক্র।

বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় খুনী টিক্কার পরিবর্তে ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগ এমনি একটি চক্রান্ত। এর পেছনে জঙ্গিশাহীর চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত বাঙালী গবর্নর নিয়োগ করে বাঙালীদের বিভ্রান্ত করে যুদ্ধকে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসন চালু হচ্ছে বলে বিশ্ব-বিবেককে ধোঁকা দেয়া।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের তৃতীয় কারণটি হচ্ছেঃ ইয়াহিয়া খান একটা ব্যাপারে অত্যন্ত সুনিশ্চিত যে, বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকার গবর্নর আজ হোক, কাল হোক মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের হাতে নিহত হবেই। সুতরাং জঙ্গিশাহীর কথা হচ্ছে, মরবেই যখন পশ্চিম পাকিস্তানী কেন, একজন বাঙালীই মরুক। চূড়ান্ত এবং প্রধান কারণটি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসনের মুখোশ ভেঙ্গে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করবার জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বাগানো। কারণ বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জঙ্গিশাহীকে সাহায্যদান বন্ধ করে দিয়েছে।

ডাক্তার মালিককে গবর্নর নিয়োগের দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে গেছে বিশ্ববিবেকের কাছে। তাই বিশ্বের নামকরা পত্রপত্রিকা ও বেতারে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া চক্রের কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্রডকাস্টিং কমিশনের রিপোর্টার মি. শ্যোন ও কনার ঢাকা সফর শেষে বলেছেন, ‘‘টিক্কা খানকে সরিয়ে ডা. মালিককে দখলীকৃত এলাকার গবর্নর নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য বিদেশী সাহায্য বাগানো এবং বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করা।’’

এ প্রসঙ্গে গার্ডিয়ান পত্রিকার মি. মার্টিন এডিনি বি-বি-সি থেকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অসামরিক গবর্নর নিয়োগ করা হলেও সামরিক তৎপরতার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।’’ অর্থাৎ ‘‘বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর পাক বর্বরতা ঠিকই চলবে এবং বেসামরিক গবর্নর ডা. মালিক সামরিক বাহিনীর হাতের পুতুল মাত্র।’’

জন্মভূমি থেকে হানাদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেশকে মনের করে গড়ে তুলতে আজ আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দুর্বার প্রথিরোধের সম্মুখে টিকতে না পেরে দখলীকৃত এলাকায় জাতিসংঘের রিলিফ কর্মী নিয়োগের আরেকটি চক্রান্ত এঁটেছে জঙ্গীশাহী। কিন্তু আমরা জানি এই রিলিফ কর্মী নিয়োগের আসল উদ্দেশ্য কি। জঙ্গীশাহী চাচ্ছেঃ রিলিফ কর্মীর কথা বলে বাংলার বুভুক্ষ জনতাকে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যাবে, তেমনি বিশ্বজনমতকে বাঙালীর দরদি সেজে ধোঁকা দেয়া যাবে।

আমরা এও জানি, জাতিসংঘের এই তথাকথিত রিলিফ কর্মীদের বাংলাদেশে নিয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে জঙ্গীশাহীর বর্বরতা-ও পৈশাচিকতায় সহায়তা করা। অর্থাৎ এদের ভূমিকা হবে দস্যুবাহিনীর দালালদের প্রতি আমাদের যে ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে এদের প্রতিও তাই করা হবে।

এই প্রসঙ্গে বি-বি-সি থেকে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনীর একজন মুখপাত্র জাতিসংঘকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তাদের রিলিফ কর্মীদের জঙ্গীশাহীর দালাল বলেই গণ্য করা হবে এবং তারা দালালদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থারই আওতায় পড়বে। ‘বি-বি-সি থেকে আরও বলা হয়, ‘এ ব্যাপারে জাতিসংঘ থেকে কোন মন্তব্য করা হয়নি। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ গেরিলা বাহিনীর মুখপাত্রের এই হুঁশিয়ারি জাতিসংঘকে বেশ খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছে।’

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে বলা হয়, ‘ডেমোক্র্যাট দলের নেতা এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর পার্সীও পাকিস্তান সরকারকে আমেরিকান সাহায্য দান বন্ধের দাবী জানান।’

বি-বি-সি রিপোর্টার মিঃ মার্টিন বেল সম্প্রতি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের জন্য ভারত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শরণার্থীদের অসীম দুঃখ-দুর্দশাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন- শুনেছেন পাক জঙ্গীশাহীর চরম বর্বরতা ও পৈশাচিকাতর অনেক করুণ কাহিনী। কিন্তু তিনি লাখ লাখ লাঞ্ছিত মানুষের শুধু একটা প্রমাণই দেখেছেন। শুনেছেন একই কথা। চাপ চাপ যন্ত্রণায় সে কথা চাপা পড়ে যায়নি বরং আরো বলিষ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা বিশ্বে। আর সে কথাটি হচ্ছে বাঙালীর অন্তর মথিত হৃদয়-সঙ্গীত ‘জয় বাংলা।’

(শহীদুল ইসলাম রচিত)

অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বরণে

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন বাংলাদেশের ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতির প্রতিবাদ করেছিল। সেই থেকে এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে, দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মাঝে ১৯৬২ সালের শিক্ষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি চিরকালই ছিল জনসাধারণের স্বার্থের থেকে বিযুক্ত। নানারকম প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে প্রবর্তিত হয়নি, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারেও

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। শিক্ষালাভের সুযোগের ক্ষেত্রেও দেশের দুই অংশে ইচ্ছাকৃতভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তানে এর সংখ্যা ছিল অনেক কম। গত বছরে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ২৪ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তানে সে সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারের চেয়ে বেশি।

শুধু স্কুল-কলেজের সংখ্যা নিয়েই কথা নয়। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুল-কলেজের যে পাঠ্য তালিকা তৈরী করা হয়, তা প্রকৃত শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক ছিল না; বরঞ্চ ভাষার চাপ, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং অগণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তনে এই পাঠ্য তালিকা ছিল গঠনশীল চিত্তের পক্ষে ক্ষতিকর। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তার ও বক্তব্যের স্বাধীনতা হরণ ছিল সরকারী শিক্ষানীতির অঙ্গ। শিক্ষার প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকার যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাও স্বাধীন ও ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ রুদ্ধ করেছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের বিষয়েও সরকারী উদাসীনতা ছিল এই নীতির অংশস্বরূপ।

আইয়ুব সরকারের আমলে যে নতুন শিক্ষানীতির অবতারণা হয়, তাতেই এই অগণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়ে। বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্ররা স্বভাবতঃই এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিবাদকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছাত্রসমাজের প্রাপ্য। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও, তা শুধু শিক্ষানীতির প্রতিবাদস্বরূপ ছিল না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খান যে একনায়কত্ববাদী শাসনের প্রবর্তন করেন, ১৭ই সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভ সেই অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। যখন সারাদেশ প্রকৃতপক্ষে এক সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে পীড়িত হচ্ছিল, তখন ছাত্ররাই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল এবং প্রাণের বিনিময়ে সে আন্দোলনে তারা সাফল্য অর্জন করেছিল। একনায়ক আইয়ুবের সেই ছিল প্রথম পশ্চাদপসরণ। আর এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে ১৯৬৯ সালে- যখন আইয়ুবকে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হয়।

এরপর ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া-সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে দেখা গেল শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনের আরো স্বীকৃতি ঘটেছে। প্রস্তাবিত নীতিতে শিক্ষা-প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণের ধারণা কিছুটা গৃহীত হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির জন্য যে দাবী শিক্ষক ও ছাত্ররা করেছিলেন, তা স্বীকার করা হয়নি। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রস্তাবও সেখানে ছিল না। কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা, এই শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা দেয়া হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকেই মেনে নেয়া হয় নীতি হিসাবে। আশা করা গিয়েছিল যে, দেশে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। তার আগেই সামরিক শাসনের বর্বরতম আঘাত নেমে এসেছে দেশের মানুষের উপর।

আজ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। দেশকে শত্রুমুক্ত করার পরে সার্বিক পুনর্গঠনের সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার নব রূপায়ণ ঘটবে। যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্ত, সেই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের কলঙ্কস্বরূপ। শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে সকলকে। শিক্ষার ভিত্তি প্রসারিত করে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে আমাদের। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কাজের সুযোগ। সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার এই অভিপ্রেত পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে না।

আজ আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত। ইতিহাসে অতুলনীয় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার যেদিন উদঘাটিত হবে, সেদিনই ১৭ই সেপ্টম্বরের আন্দোলন সার্থকতায় উপনীত হবে।

(ডক্টর আনিসুজ্জামান রচিত)

ইয়াহিয়া জবাব দাও

প্রথম সওয়াল

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

আমার সওয়াল খুব ছোট। ইচ্ছে করলে এক কথায় জবাব দিতে পারেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ১৯৭০ সনে আপনি ইলেকশন কেন দিয়েছিলেন? একদম সোজা জবাব দেবেন। সাফ, সাফ। তালিবালি করবেন না। কারণ, আপনার খাসলৎ আমাদের জানা আছে। খালি আপনার নয়, পাঞ্জাবে যত ইসলামের চ্যাম্পিয়ান আছে, সকলের খাসলৎ আমাদের জানা। সাংবাদিক হিসেবে আপনার সঙ্গে সফর করবার বদ-নসীব বা খোশ-নসীব আমার হয়েছে। বেলা এগারোটা না বাজতে আপনার ছাতি শুকিয়ে যায়, আপনার বড় পেয়াস লাগে। আপনার তেষ্টা আবার সাধারণ পানিতে যায় না। পেগের পর পেগ হুইস্কি জরুরৎ হয়।তাই বলছি সাফ-সাফ জবাব দেবেন। বাংলাদেশের মানুষের চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন, আর তা চেষ্টা করবেন না।

আসুন, আসুন, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এবার ঢুক্ করে জবাবটা বলে ফেলুন, আপনি নির্বাচন বা ইলেকশান কেন দিয়েছিলেন?

এখন মনে হচ্ছে আপনি নির্বাচনের মানে জানতেন না। ইলেকশান মানে জনগণের রায়। তখন বাংলার মানুষ কী চেয়েছিল? দেশের সাচ্চা জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসুক। ইলেকশানের ফল বেরুনোর পরই আপনি বললেন, শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং আপনার যে জনগণের রায়কে সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা বোঝা যায়। আর কথাটা আপনি মুখ দিয়ে বলেননি আর কোন জায়গা দিয়ে বাতাসে বের করেছিলেন? তার প্রমাণ তখন ছিল না। আপনি মুখই ব্যবহার করেছিলেন।

তবে ওয়াদার খেলাফ করলেন কেন আগা মোহাম্মদ এহিয়া খান? তার ফলাফল কি আপনি জানেন না? জেগে ঘুমাচ্ছেন? আপনার নাম নারীঘাতী, শিশুঘাতী- অন্ধকারে আগুন-লাগানো চণ্ডাল নামে দুনিয়ায় পরিচিত যারা বেঁচে আছে, তারা নিজের বাপ-দাদার বাস্তভিটা থেকে খারিজ। আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে হয়রান। তাদের বুকফাটা আহাজারী, দুর্দশা-সব আপনার ওয়াদা খেলাফের ফল।

অথচ নির্বাচন বা ইলেকশানের পর কী আপনি বগল বাজাননি? নিজের ঈমানদারী দুনিয়ার কাছে জানাতে বুক টান টান করে ফুলিয়ে দাঁড়াননি? আপনার বোধ হয় খেয়াল নেই? একটু শলা দিয়ে উস্কে দিচ্ছি। আপনার প্রচার বিভাগের পুস্তিকা মানে ছোট কেতাবে-Election in the world's third largest democracy- "দুনিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাজ্যে নির্বাচন" এর পাতায় পাতায় কী নিজের সাফাই গাননি? বইটা এবার

খুলে দেখুন। বাংলা তর্জমা করে বলছি, কান খুলে শুনুন দেখিঃ 'সেনাবাহিনী সাধারণত বেসামরিক শাসনভার গ্রহণ করে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এই নির্বাচন ঠিক নাটকীয়ভাবে তার বিপরীত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণের কাছে তার কথা, প্রতিশ্রুতি, ঈমান ঠিক রেখেছেন, স্বাধীন এবং ন্যায্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছেই তিনি ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন।"

শুনলেন ত? আপনার প্রচার বিভাগের কেতাব এ কথা বলছে। আরো জানিয়েছে, ঐ বইয়ের দ্বিতীয় পাতা খোলেন, "The Election results underlined the political maturity, sound commonsense and practicality of the average voter......Parties preching regionalism, tribalism, racialism and religious Bigorty have been short shrift. অর্থাৎ "এই নির্বাচন থেকে বোঝা যায়, জনসাধারণ রাজনৈতিক দিক থেকে কত পাকা। তাদের সাধারণ জ্ঞান কত খাঁটি। যেসব পার্টি আঞ্চলিক, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলেছে, সাধারণ মানুষ তাদের তওবা করার সময় পর্যন্ত দেয়নি।

এরপরও কী আপনি বলতে পারেন শেখ মুজিব দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল? যা ঘটছে সব হিন্দুদের কারসাজি? সব গণ্ডগোল ভারতের ফন্দী- এসব ধুয়া আপনি তুলতে পারেন? না তোলার কোন সুযোগ আছে, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান?

আজ সর্বদা আমানুল্লাহ খান যে বাংলাদেশে আপনার জনসংযোগ-অফিসার, তিনিই তা ঐ পুস্তিকা লিখেছিলেন তার দপ্তর থেকে প্রকাশিত।

সর্দার আমানুল্লাহ পাঠানের বাচ্চা। তাকেও আপনি ঝুটটা বানিয়ে ছেড়েছেন। এ-ই ঘটে ভুনিয়ায়। মিথ্যেবাদীর সঙ্গে যে বসবাস করে, সেও সিথ্যুকে পরিণত হয়। সঙ্গ দোষ।

ইয়াহিয়া, জাবব দাও, তুমি কেন ওয়াদা খেলাপ করলে?

(শওকত ওসমান রচিত)

ঝিলামের চার ভাই

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে অবস্থানকালীন কয়েকটি ঘটনার স্মৃতি আমার মনে আজও অনেক অনেক ঘটনার সাথে জেগে রয়েছে। অজস্র ঘটনার সমষ্টি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আমার অবসর সময়ে জাতীয় অনেক অনেক চিন্তার মেঘ এসে আবৃত করে ফেলে। আমি যেন সম্বিতহারা হয়ে পড়ি। হৃদয়ের কোন সূর্য তারে এক অদৃশ্য হস্তের টোকায় যে শব্দ ধ্বনি উত্থিত হয় তা যেন বেদনার মতো শীতল। আগ্রাসী নিস্তব্ধতা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে ছেঁকে ধরে। আমার উন্মনা উদাসী মন আমার শ্যামল বাংলার পথ-ঘাট, গঞ্জ-গ্রাম, বন্দর-নগরের পরিধি পেরিয়ে চলে যায় (এক সময়ে আমাদেরই দেশে অংশ হিসেবে বিবেচিত) পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলাম, নওশেরা, লায়ালপুরে। সেখানকার খেটেখাওয়া মজুর চাষীদের পূর্ণ কুটিরে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্লান্ত-অভুক্ত কোন পরিবারের মরুভূমি আবাসে।

সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের একটি স্টীল ফার্নিচারের দোকানের সামনে। আমার কাছে একটি গোপন বার্তা। এ বার্তাটি নিয়ে একজন মুক্তিসেনা চলে যাবে মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্পে। এ বার্তার

আলোকে রাতের কমান্ডো আক্রমণের ধারা রচিত হবে। বার্তা যার হাতে দেওয়ার নির্দেশ তাকে আমি চিনি না। আমার হাত থেকে যিনি বার্তা নেবেন তিনিও আমাকে চেনেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়কে প্রথম দৃষ্টিতে চিনে নেয়ার একটি বিশেষ সংকেত ছিল।আমাদের শার্টের বিশেষ একটি দৃশ্যমান স্থানে একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। আমরা দু'জন দু'জনকে চিনলাম এবং কৌশলে বার্তাটি হস্তান্তর করলাম। এরপর আমার কাজ শেষ। তেজগাঁর কোন এক স্থানে চলে যাবো পরবর্তী নির্দেশ গ্রহণের জন্য। অনেক চেষ্টা করে একটা বেবী ট্যাক্সি পাকড়াও করলাম। গ্যারিসন শহর ঢাকা নগরীতে বেবী ট্যাক্সি পাওয়া দুস্কর। চালকের অভাবে অধিকাংশ যানই মালিকদের গৃহে পড়ে রয়েছে। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকে পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালানোর পর বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে অসংখ্য বেবী ট্যাক্সি চালকও মার্কিন ও চীনের বুলেটের শিকার হয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন জীবনধারণের তাড়নায় তাদের কেউ কেউ রাস্তায় বেবী ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু রাস্তায়ও ভয়। কারণ শাহেনশাহ ইয়াহিয়ার লুটেরা বাহিনী যানবাহনের অভাবে ডিউটি করার জন্য সাইকেল-রিকশায় আর বেবী ট্যাক্সিতে আরোহণ করে কিন্তু ভাড়া দেয় না। ভাড়া চাওয়ার দুঃসাহস দেখলে চালক সাথে সাথে ভারতীয় চর বা মুক্তিবাহিনীর এজেন্টে পরিণত হয়ে যান এবং এদের প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার অবাধ অধিকার জল্লাদ বাহিনীর রয়েছে। এমনকি রাজাকারাও এ জাতীয় হত্যা চালাতে পারে। হত্যার জন্য কোন জবাবদিহি হয় না, বুলেটের হিসাব দিতে হয় না। এ জাতীয় হত্যার জন্যে উপরি বাহবা পাওয়া যায়।

বেবী ট্যাক্সিতে আমি উঠে বসেছি। এমন সময় একজন দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সৈনিক আমাদের থামাতে ইশারা করলো। সৈনিকটি কাঁধে একটি অটোমেটিক চীনা রাইফেল। রাইফেলের নলটি আমাদের দিকে উদ্যত নয় বলে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তবু যেন আমার মনে হলো বেবী ট্যাক্সির দিকে প্রতিটি বুটের পদক্ষেপ যেন আমার মৃত্যুর সময়সীমাকে ঘটিয়ে আনছে। একটি চীনা সীসার গুলি আমাকে প্রাণহীন করে দেবে। যেমন ১০ লক্ষ বাঙালীকে তারা প্রাণহীন করে দিয়ে ৭ কোটি ৪০ লাখ বাঙালীকে রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য অবিস্মরণীয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করেছে।

কিন্তু না- সৈনিকটি আমাকে গুলি করল না। বাঙালীর জাত তুলে গালাগালিও করলো না। আমাকে লাথি মেরে বেবী ট্যাক্সি থেকে ফেলেও দিলো না। শুধু উর্দুতে জিজ্ঞেস করলো আমি কোথায় যাবো। আমি বললাম তেজগাঁ ফারমগেট। সে বেবী ট্যাক্সিতে উঠে বললো, আমিও ওদিকে যাবো। প্রতিবাদ করার সাহস আমার ছিল না। আমি সরে জায়গা করে দিলাম। সৈনিকটি কাঁধ থেকে রাইফেলটি হাতে নিয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে তা দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। জিপিও ছাড়িয়ে, প্রেসক্লাব সামনে ফেলে হাইকোর্টের কাছে আসার পর নির্বাক সৈনিকটি সবাক হলো। সে আমার নাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম। জিজ্ঞেস করলো আমি মুসলমান কি না। বললাম নামেই তো বুঝতে পারছো। সৈনিকটি আবার চুপ করে গেলো।

আবার সে মুখ খুললো। অনেকটা জনান্তিকেই যেন বললো- তোমরা বেশ আছো! তোমরা বেশ আছো!

আমি এবার কথা জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম। আমি বললাম, আপনারাও তো বেশ আছেন। বাঙালী কেমন আছে একথা তাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার কাছে যে হায়েনাটি বসে আছে কত বাঙালীর রক্ত তার দেহে লেগে রয়েছে। হয়তো আমার কোন বোন এ পশুটির লালসার শিকার হতে অস্বীকার করায় বেয়নেটের খোঁচায় জীবনকে আলিঙ্গন করেছে। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলো না! তাই আবার বললাম- আপনারা তো বেশ আছেন। ভালো খাওয়া, ভালো পোশাক আর জীবনের নিরাপত্তা। প্রশ্নে একটু যেন জ্বলে উঠলো।

বললো সে তার কথা। সুখে থাকার কথা। ঝিলামের সুদেহী দীর্ঘকায় যুবকটি বললো তার কথা। সে বললো- সকালে নাস্তা দেওয়া হয় এক চামচ সেমাই আর এক চামচ ভিটামিন। ব্যস। এ খাবার খেয়ে হয়তো বেঁচে থাকা যায়; কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। খাওয়ার মান অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ক্ষিধে পেলেই সৈন্যরা দোকানে ঢুকে খেয়ে নেয়। পয়সা চাওয়ার সাহস করে না দোকানদাররা।

একটি বিমর্ষ কণ্ঠ থেকে শব্দ ঝরে পড়ছিলো। আমি খেতেও পারিনে। খেতে গেলেই ভাইদের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমার আম্মার মুখ ভেসে ওঠে।

ভাবলাম ভাইদের হয়তো খুব ভালোবাসে। তাই বিদেশ, বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে এসে ভাইদের কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছে। বললাম- তারা বুঝি ঝিলামে রয়ে গেছে? সৈনিকটি বললো- না। তারা মাশরেকী পাকিস্তানের মাটির নিচে শুয়ে আছে।

এই সৈনিকটির চার ভাই বাংলাদেশের যুদ্ধে রত ছিল। তিন ভাই ফেনী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছে। আমার পাশে বসা এই জানোয়ারটি আরও অনেক জানোয়ারের মতো আমার বাংলাদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ ও শিশু-হত্যার জন্য দায়ী। তার খাকী রং আমাদের অনেক অনেক রক্তে রঞ্জিত। তবু পশুটির সাথে আমি বসে রয়েছি বলে আমার চাঞ্চল্য চাপা রাখতে হলো। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো যে, সে তার মাকে কি জবাব দেবে। যে মায়ের চার সন্তান ছিল, এখন তার মধ্যে তিনজনই চিরদিনের জন্য অনুপস্থিত হয়ে গেছে। তেজগাঁ আসার পর সে নেমে পড়ে। আমি এবং বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

(‘ইলিয়াস আহমদ’ ছদ্মনামে সলিমুল্লাহ রচিত)

রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম

৬ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বছরের অর্ধভাগ পেরিয়ে গেলো। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছ’মাস পূর্ণ হয়েছে। একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ছ’মাস সময় তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের কাছে এই ছ’মাস সময়ের ব্যাখ্যা অনেক বেশী, অনেক ভিন্নভাবে মূল্যবান। কেননা যে সামরিক এক নায়কতন্ত্রের হিসাব কষা ধারণা ছিলো মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেখানে ছ’মাস প্রতিনিয়ত সংগ্রামমুখর একটি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্ব আমাকে নিঃসন্দেহে সগর্বিত জবাব দেবার অধিকার দেয়, আমি গর্ববোধ করি।

আমরা গর্ববোধ করি, আমরা যুদ্ধ করেছি। আমরা গর্ববোধ করি আমাদের বাঁচার সংগ্রামে। কারণ আমরা যুদ্ধ করে বেঁচে আছি, আমরা যুদ্ধ করে মরছি। আমাদের অস্তিত্ব আজ তাই পশ্চিম পাকিস্তানী সামন্ত প্রভু, ভূস্বামী পুঁজিপতি কিংবা বর্বর সামরিকতন্ত্রের অনুগ্রহ নয়, আমাদের অস্তিত্ব আমাদের অর্জিত অধিকার। এ কারণে আমি গর্ববোধ করি।

আমরা সবাই যুদ্ধ করে বেঁচে আছি কিম্বা বেঁচে থাকার জন্যে যুদ্ধ করছি, আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্য যুদ্ধ করছি- এ আমার অহংকার ও এ আমার সম্মান। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অস্তিত্বকে আমরা নিরাপদ না করে পারি না, আমরা সে জন্য যুদ্ধ করছি। আমরা যুদ্ধ করছি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ। মনে পড়ে ছ’মাস আগের কথা। ২৮শে মার্চ ঢাকা থেকে বেরিয়ে চলেছি

গ্রামের দিকে। ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ। যানবাহন নেই। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকায়, এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছি। আমার একজন সহযাত্রী বন্ধু নিজের হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে পুরে অতি সন্তর্পণে একটি রেডিও সেট নিয়ে এসেছিলেন। ফরিদপুরের দিকে পদ্মায় আমরা নৌকা নিয়ে চলেছি। রেডিও সেটটি হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ শুনলাম, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি। সহসা বুকের মধ্যে লাল রক্ত যেনো ফিনকি দিয়ে উঠলো। স্থানকাল ভুলে আমরা ক'জন সহযাত্রী আনন্দে একসংগে চিৎকার করে উঠলাম, চিৎকার করে উঠলাম আমরা বেঁচে আছি, আমরা বাঁচবো।

হয়তো পদ্মার বক্ষ থেকে আমাদের সেদিনের সেই উল্লাসধ্বনি ক্ষণিকেই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রক্তের মধ্যে সেদিন যে প্রবল উত্তাপ অনুভব করেছিলাম তা আজো ভোলা যায়নি। জানি না, যুদ্ধের জন্যে কখনো এমন হয় কিনা। এতো দিন নিজের মানসিকতা সম্পর্কে যতোটুকু সচেতন হয়েছি, তাতেও জানি যে নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের সপক্ষেই আমার মানসিক প্রস্তুতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন যুদ্ধের সংবাদে, আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের ঘোষণায় পবিত্র আনন্দে ফেটে পড়েছিলাম। দীর্ঘ শীতরাত্রির নিরুত্তাপ নিঃশব্দ অন্ধকারের পর এই যেনো প্রথম আমাদের রক্তের মধ্যে দারুণ উত্তাপ বোধ করেছিলাম। যুদ্ধ কোনো মানুষকে এমন জীবিত করে তোলে এর আগে কখনো এমন ভাবতে পারিনি। পঁচিশে মার্চের সেই ভয়ংকর দুঃসহ অন্ধকার ২৬, ২৭ ও আটাশের দিবালোকেও ছিলো এরো বেশি স্পষ্ট, সমাচ্ছন্ন। আর বহু হাতড়িয়েও সে অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, নিজের সবকিছু নিয়ে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও এলামেলো ভাষারাজী নিয়ে ক্রমাগত যেনো কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি; কোথায় তা জানিনে, তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, ভয়ানক অস্বাভাবিক অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।

দীর্ঘ পাঁচদিন পর এই আমাদের প্রথম ভোর হলো। জানিনে ইতিহাসে কারো জীবনে কখনো দীর্ঘ পাঁচ দিন পর রাত শেষ হয়েছে কিনা, কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে পঁচিশে মার্চের সেই দীর্ঘ রাত্রি আমার কাছে শেষ হয়েছিলো পুরো পাঁচদিন পরে। পুরো পাঁচদিন পর এই প্রথম বুঝলাম, ভোর হচ্ছে, আলো আসছে। অথচ আমরা তখন কোনো বন্দী শিবিরে ছিলাম না, ছিলাম না দেয়াল ঘেরা কারান্তরালে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যখন প্রথম শুনলাম আমরা যুদ্ধ করছি, বিশ্বাস করুন, আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তখনই কেবল অনুভব করলাম যে, দীর্ঘ পাঁচদিন পর ভোর হলো। তখন কেবল বোধ করলাম যে আমি বেঁচে আছি। নিজের পায়ে হাত দিলাম, রক্তের উত্তাপ নিলাম। দেখলাম আমি মরিনি।

আমি তাই জানি না আর কোনো মানুষের যুদ্ধের সংবাদ এমন শিহরণ এনেছে কি না। কিন্তু আমি জানি, আমরা সেদিন অস্ত্র হাতে পথে না নামলে আমরা মরে যেতাম, এই মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তুলে মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারলে আমরা মরে যেতাম। অথবা বেঁচে থাকতামথ- কিন্তু সে দুই-ই মৃত্যু।

কারণ আমরা জানি, এ আমাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধ, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেন হানাদার দুস্যুদের অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকে তাদের ওপর মরণ আঘাত হেনে। তারা যুদ্ধ করেন, এক- একটি অঞ্চল মুক্ত করেন হানাদার দস্যুদের পাপপঙ্কিল অধিকার থেকে। সেখানে উড়িয়ে দেন বাংলাদেশের ভালোবাসার বিজয় পতাকা। সেখানে খুলে দিয়ে আসেন আমাদের উত্তর পুরুষের; আগামী সুখী-স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনের সোনালি স্বপ্ন; ওরা তাই যুদ্ধ করে; যুদ্ধ করে বাঁচে, যুদ্ধ করে মরে- মরেও বেঁচে থাকে।

আমরা বেঁচেও মেরে ছিলাম, তাই আমরা যুদ্ধ করছি- আমরা মরেও বেঁচে থাকবো। তাই আমরা রক্ত দিচ্ছি, আমরা রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের দুর্জয় স্বপ্নের ফুল। ফ্রন্টে আমাদের মুক্তিসেনারা অবিরাম যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য; ঘরে আমাদের জায়া-জননী, ভগ্নীরা যুদ্ধ করছে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য, শরণার্থী শিবিরে শিবিরে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনের সংগে যুদ্ধ করছে বেঁচে

থাকার জন্য, আমাদের অস্তিত্বের জন্যে। হানাদার আক্রমণকারীর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, তার যুদ্ধ সাময়িক, কিন্তু আমরা যারা বাঁচার জন্য যুদ্ধ করছি- এ যুদ্ধের শেষ নেই।

(মহাদেব সাহা রচিত)

রেনেসাঁর সূচনাঃ বাংলাদেশ

৪ নভেম্বর, ১৯৭১

রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ কথাটা আজ নানা সূত্রে- বিশেষ করে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ প্রগতি উপলক্ষে বারংবার উচ্চারিত। রেনেসাঁর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সামনে রয়েছে বহু আলোচিত ইওরোপীয় রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে বাংলার রেনেসাঁধর্মী নবজাগরণ। বর্তমানে বাংলায় যে মুক্তি আন্দোলন বাঙালী জীবনে দুকূলকপ্লাবী জোয়ার সৃষ্টি করেছে, আমি তাকে জাতীয় জীবনে রেনেসাঁর লক্ষণ বলে চিহ্নিত করতে চাই। এই জাগরণ বা অভ্যুত্থানকেই রেনেসাঁ না বলে রেনেসাঁর লক্ষণ বলতে চাই এই কারণে যে, রেনেসাঁ মুখ্যতঃ গঠনধর্মী, আর এখন আমরা একটি অচলায়তন ভাঙ্গার কার্যে ব্রতী- ভাঙ্গার পরে গড়বার পালা- স্বভাবতঃই সে দায়িত্বও হবে দুরূহ এবং তাতে প্রয়োজন হবে মুক্তিযুদ্ধের মতোই চরিত্র ও সংকল্পের প্রতি একনিষ্ঠতা। বর্তমান সংগ্রামে যে দুর্জয় শক্তি ও মানসিক বলের পরিচয় বাঙালী দেখিয়েছে- তা মুক্ত নবজীবনকে অঙ্গীকার করার প্রবল বাসনা থেকেই জাগ্রত।

বাঙালীচিত্তের এই নবজীবন প্রয়োগের পশ্চাতে যেসব অনুপ্রেরণা কার্যকরী সেসবের লক্ষণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব রেনেসাঁর সূচনা কত স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

স্বাধীনতা নিজেই একটি জাতির জীবনে অনুপ্রেরণাস্বরূপ হতে পারে এবং তার নবজাগরণ সূচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সে আশাকে সফল হতে দেয়নি। বৃহত্তম জনসমষ্টির ভাষা-সাহিত্য- সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করার চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তার জাগরণ সম্ভাবনাকে-সুপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় মেতে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী পাঞ্জাবী চক্রান্ত। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর ফল হয়েছে বিপরীত। জলস্রোত যেমন আপন গতিপ্রবাহেই সব বাধাকে অতিক্রম করে সম্মুখগামী- তেমনি বাঙালীর নবজীবন তৃষ্ণাও কোন ষড়যন্ত্র বা বাধাকে গ্রাহ্য করেনি বরং বিরুদ্ধতা তার শক্তিকে সংহত করেছে। রেনেসাঁর বিশেষত্বগুলিকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমনঃ

১। জাতির অতীত ঐতিহ্য থেকে রস আহরণ এবং তার পুনর্মূল্যায়ন।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ।

৩। অপরিময়ে জীবনতৃষ্ণা।

মাটির রস যেমন বৃক্ষদেহে সঞ্চারিত হয়ে তাকে সজীব রাখে, তেমনি ঐতিহ্যও একটি জাতির জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। পাকিস্তানী শাসকচক্র প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালীর যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্য সম্পদের ওপর। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সৃষ্টি হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও লোকশ্রুতিকে হিন্দুয়ানীর গোড়া অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা হয়, নজরুলের

সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর উল্লেখের জন্যে তাকে পৌত্তলিক বলে উপেক্ষা করা হয়- সর্বোপরি দেশের শতকরা ৬৫ জনের ভাষা বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলে ফতোয়া জারি করে বাঙালীর প্রাণরস শুষ্ক করে দেবার ষড়যন্ত্রের মেতে ওঠে এই কীর্তিমানেরা। কিন্তু মনন-সমৃদ্ধ বাঙালী সেদিন ধরে ফেলে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপ। সে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করল, বাংলার আবহমান কালের ঐতিহ্য-ইতিহাস. সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্তই তার রক্তধারায় প্রবাহিত। বাংলা ভাষা তার বুকের রুধিরের চেয়েও প্রিয়। প্রমাণ দিতে হলো বুকের রক্ত দিয়েই। ভাষার জন্যে প্রাণদান। লিখিত হলো নব ইতিহাস। বাঙালী মুসলমান তার ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও খর্জুর কুঞ্জের পরিবর্তে আম্রবীথির শোভা নিরীক্ষণ করলেন। শুরু হলো বাঙালীর আত্মঅন্বেষা এবং তার পুনর্জাগরণ। ইওরোপের এবং উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও দেখি ঐতিহ্যের পুনরালোচনা এবং তার থেকে শক্তি সঞ্চয়। সুতরাং ঐতিহ্যের নব-স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালী জীবনেও রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছে এ ঘোষণা করা চলে নির্দ্বিধায়।

২। সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ রেনেসাঁর একটি বিশেষ লক্ষণ। সংস্কারের আবাসস্থল হলো অচল মন। যে মন নিত্য বহমান, সে মনে কখনো সংস্কারের জড়বুদ্ধি আশ্রয় পায় না, সেই অচল মনের নিত্যসংগ্রাম বিশ্ব মানবসমুদ্রের চিন্তা-তরঙ্গে। মধ্যযুগের অন্ধকার অতিক্রম করে ইউরোপ রেনেসাঁ যুগের আলোকোজ্জ্বল পথে পা বাড়ালো মুক্তিবুদ্ধির প্রদীপ হাতে নিয়ে। উনিশ শতকে বাংলার চিত্ত বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল ইউরোপের এই সচল মনের স্পর্শেই। মানস-মুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদক্ষেপের বেলায়ও একথা অনেকখানি সত্য। এই আলোকাভিসারের প্রথম যাত্রী ঢাকার শিখা গোষ্ঠী। সংস্কারমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের সেদিনের ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল অর্থপূর্ণ প্রয়াসের ফল ভেতরে ভেতরে আজও অবশ্যিই ক্রিয়াশীল। মহৎ আজ বা আন্দোলন- তা যতো সামান্যই হোক- এইভাবেই যুগাতিক্রমী হয়। সেদিন তাঁদের আন্দোলন নির্বিরোধে হয়নি। বর্তমান জাগরণের সূত্রপাতে বাধা এসেছে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল পাঞ্জাবীচক্রের তরফ থেকে। তাদের আশংকা, আলোকপ্রাপ্ত বাঙালী হবে শোষণের প্রতিবন্ধক। তাই ওদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেয়াল গাঁথার আরা আমাদের নিয়ত প্রয়াস দেয়াল ভাঙ্গার। শিক্ষার সংকোচন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের লাঞ্ছনা, বাংলার ঐতিহ্যকে বিদেশীয় বলে ঘোষণা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা এক-জাতীয়তার ধারণাকে বিনষ্ট করার অপপ্রয়াস-এর প্রত্যেকটি বাঙালীকে অন্ধকারে রাখার ষড়যন্ত্রের অংশ।

তবে এ ষড়যন্ত্রের পূর্ণ স্বরূপ বাঙালীর নিকট পরিষ্কার। সর্বপ্রকার অচলায়তানকে দূর করে জাতির যাত্রা এক মহাজীবনের পথে, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এক বাঙালী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পথে।

এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যি স্বীকারযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর এই রাজনীতি-প্রাধান্যের যুগে যেহেতু সব রকম আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজনীতির অবস্থান, সুতরাং বাংলাদেশের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি এখানেও নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধজয়ের দ্বারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সমগ্র জাতির পরম লক্ষ্য এক বিপুল জীবনের আহ্বান সেই আহ্বানের পথে সার্থক পদক্ষেপেই পথে বাঙালী জীবনের সার্বিক জাগরণ বা রেনেসাঁ।

(সুকুমার হোড় রচিত)

রণাঙ্গণে বাংলার নারী

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

পবিত্র রমজানের কঠোর উপবাস পালন করছেন এখন দেশ রণাঙ্গন বাংলার প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষেরা। অশেষ পুণ্যের মাস এই রমজান। সাধারণভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার বিরত থাকাই রমজানের বাহ্যিক উপবাস অনুষ্ঠান। এ ছাড়া কায়মনোবাক্যে সংযম পালন করা রমজান মাসের অবশ্য করণীয় ইবাদত।

এবারের রমজান এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনের এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগসন্ধিক্ষণে। এখন আমাদের সন্তানরা দেশকে শত্রুমুক্তি করার সার্বক্ষণিক যুদ্ধে নিয়োজিত, আমাদের সর্বস্তরের জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ তথা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। পবিত্র রমজানের কঠোর সিয়াম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ হয়েছে আমাদের মা-বোনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কৃচ্ছ্রসাধনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাধানমন্ত্রী পবিত্র রমজান উপলক্ষে তাঁর বেতার বাণীতে বলছেন, গত বছরের রমজান মাসে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ এক প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করেছে, প্রকৃতির নির্মম তাণ্ডবে সেবারে এখানে সংঘটিত হয়েছে এক ব্যাপক, ধ্বংসযজ্ঞ, বিপুলসংখ্যক মানুষের আকস্মিক মৃত্যু। আর এবারের রমজানে আমরা সাত মাস আগে সূচিত এক আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরতিহীন পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করছি, যে আক্রমণ আমাদের ওপরে এসেছে এক পশু প্রকৃতির সামরিক জান্তার কাছ থেকে একান্তই অতর্কিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জীবনের তাগিদে আমরা সেবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছিলাম, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছিলাম বানের জলে ভেসে যাওয়া ক্ষেতেখামারে, আত্মীয়স্বজনহারা ঘর-সংসারে। আর এবারের জাতীয় জীবনের তথা বাংলাদেশ ও বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আমরা আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জীবনযুদ্ধই দেশ রণাঙ্গন বাংলার ধর্মপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যে এবারের রমজান সমাসের পুণ্যময় শপথরূপে অভিষিক্ত হয়েছে।

বরকতের মাস রমজান। এ মাসে আমাদের মুসলিম পরিবারে সাধারণ বাড়তি খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইফতারী, সেহরী ইত্যাদির সরঞ্জাম হয়ে থাকে ব্যয়বহুল। সারাদিন উপবাস পালনের ওপর প্রচুর খাদ্য, ঘ্রাণযুক্ত ও সুস্বাদু খাবার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এবারে অন্য রকম। বাংলার গৃহিনীরা এবারে সর্বময় সংযম ও কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী। অল্পে তুষ্টির সুশিক্ষাই তারা আজ গ্রহণ করেছেনথ- গ্রহণ করেছেন জাতীয় স্বার্থের কারণেই।

আজকের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালামের সেই সুমহান হাদিসের শিক্ষাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- বলা হয়েছে, এক বেলার খাবার, উপস্থিত পরিধানের জন্য এক প্রস্থ কাপড় এবং এক রাতের মতো মাথা গুঁজবার আশ্রয় বা ঘুমোবার বিছানা যার আছে, সে কাঙাল নয়। তার জীবনে থাকা উচিত পূর্ণ পরিতৃপ্তি। আমরা পরিতৃপ্ত। রমজানের সত্যিকার সংযম সাধনার শুভ মুহূর্তে আমাদের বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। আমাদের পরিতৃপ্তি শুধু একটা নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার বিরত থাকাতেই নয়, বরং এই বরকতের মাসে ব্যয়বাহুল্য অর্জন করে। আমাদের পরিতৃপ্তি উপবাসের চেয়ে কঠোর ত্যাগ বুকের সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে। আমাদের পরিতৃপ্তি দেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার কাজে আমাদের রক্তবীজ সোনামণিদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে।

ত্রিশ দিনের আনুষ্ঠানিক উপবাস পালনের শেষে যে ঈদ- সে ঈদকে আমরা কিসের মূল্যে আনন্দমুখর করে তুলবো, সে ভাবনা থেকেও আজ বাংলার মা-বোনরা নির্লিপ্ত নন। আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার পশুশক্তি যেদিন আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হবে, সেদিনই জমে উঠবে আমাদের ঈদের উৎসব। এ জন্য যতো ত্রিশ দিনই আমাদের কেটে যাক, আমরা করে যাবো সংযম-সাধনা। একটি স্বাধীন জাতির ভবিষ্যৎ হিসাবে যেদিন আমাদের বংশধররা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করবে, সেদিনই তো শুভ সমাপ্তি হবে আমাদের উপবাস পালনের।

এবারে আমরা দেখেছি, পুজোপার্বনে আমাদের দেশ ঢাকা-ঢোল, সানাই-কাঁসা, শঙ্খঘণ্টায় মুখরিত হয়নি। কেবল কানে শুনেছি মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দ। পূজামণ্ডপে রক্তচন্দনের লেপ দেখিনি, দেখেছি রক্ত। দুর্বৃত্ত হানাদার সৈন্যদের রক্ত। আমাদের দুঃসাহসী গেরিলা সন্তানদের হাতের অস্ত্র অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে চলছে এক একটি হানাদারের বক্ষদেশ। পুজোর আনন্দ আমরা উপভোগ করেছি মহিষাসুর বধের মাধ্যমে। বাংলা মাকে প্রত্যক্ষ করেছি জাগ্রত রণচন্ডীরূপে।

আমাদের সন্তানরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। আমাদের মা-বোনরা কেউবা তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার ভুক্ষা পালন করেছেন, কেউবা গৃহবাসে যুদ্ধকালীন কর্তব্য পালন করছেন। এ কর্তব্য বড় কঠোর, ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মতোই বাংলার মা-বোনরা আজ মেনে নিয়েছে জাতির এই মুক্তিযোদ্ধাকে। এ যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় তাই হয়ে উঠেছে সুনিশ্চিত।

(বেগম উম্মে কুলসুম মুসতারী শফি রচিত)

দেয়ালের লিখন

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

সব ভালো, যার শেষ ভালো। আর সব খবরের সেরা খবর শেষ খবর। সেই শেষ সংবাদটা কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে দেয়ালের লিখন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, বিবেচক ব্যক্তিরা, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা আগেভাগেই দেয়ালের লিখন পড়তে পারেন, পড়ে সাবধান হতে পারেন।

দেয়ালের এই লিখনকে কেউ কেউ হয়তো বলবেন ভবিতব্য, আমি কিন্তু বলি- ইতিহাসের মার।

মরণকালে যাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়, সংকীর্ণ আত্মস্বার্থে যারা কাণ্ডাকাণ্ড, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। দেয়ালের লিখন তারা পড়তে পারে না।

ইতিহাসের চরম মারের হাত থেকে তাদের কেউ বাঁচতে পারবে না।

ইতিহাসের মার দুনিয়ার বার। সেই মারের রকমটা কেমন, শুনবেন? ইতিহাসের সেই মারের চোটে দখলীকৃত বাংলাদেশে একটা নতুন ছুতোর-শিল্প গড়ে উঠেছে। ঢালাও কারবার চলছে সেই ছুতোর-শিল্পের। তার নাম হচ্ছে কফিন-শিল্প। ঢাকা, যশোর, ময়নামতি, ক্যান্টনমেন্টে দিনরাত তৈরী হচ্ছে শুধু কফিনের বাক্স। কফিনের বাক্সের যোগাড় দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ছুতোর-মিস্ত্রিরা। পাক হানাদারদের কর্নেল জাঁদরেলরাই

বেনামীতে কফিন সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারী নিয়ে বেশ টু-পাইস কামাতে শুরু করেছে। আর কামাইয়ের এই নতুন রাস্তাটা যাতে চালু থাকে, নতুন নতুন লাশ সরবরাহের রাস্তাটাও তারা তৈরী করে রেখেছে। মৃত্যুর এই ঠিকাদাররা সহজে তো আ এমন লাভের কারবার ছাড়তে পারে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব তরতাজা জল্লাদ আমদানী করা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর কবল থেকে, তাদের তো আর বিদেশে জ্যান্ত ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাদের লাশগুলো কফিনের বাক্সে পুরে তাদের স্বদেশে পাঠানো হবে।

বলিহারী আশা।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধকে যখন এই জল্লাদরা নির্বিচারে হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, নৃশংস হত্যার নব নব কৌশল উদ্ভাবন করে চরম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে হত্যা করেছে, তখন তারা এদেশের সেই শহীদদের দাফনের কথা ভাবেনি, মৃত্যুর পরে তাদের কবরে ঠাঁই মেলেনি। পথে-ঘাটে-ভাগাড়ে এদেশের বাপ, মা-ভাই, বোনের মৃতদেহ পড়ে থেকে পচেছে, শেয়াল-শকুনের খোরাক হয়েছে- কবরের কোলে তাই ঠাঁই দেয়া হয়নি, ইয়াহিয়ার জল্লাদরা সে সুযোগটুকুও দেয়নি। নিরপরাধ সদ্য বিবাহিত হারুনকে হত্যা করে ঠাটারী বাজারের পথের ওপারে ফেলে গিয়েছিল জল্লাদরা। হুকুম দিয়ে গিয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ সেই লাম ছুঁতে পর্যন্ত পারবে না। তেমনি পড়ে থেকেছে যুবক হারুনের মৃতদেহ, ঠাটারী বাজারের পথের ওপরে। জল্লাদদের জীপ বার বার সেই মৃতদেহের ওপর দিয়ে গিয়েছে, এসেছে। আর দানবীয় অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে ইয়াহিয়া, জল্লাদরা। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির ডোমের গাড়ী হারুনের নশ্বর দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে এসেছে ভাগাড়ে।

এ ইতিহাস শুধু এক হারুনের ইতিহাস নয়। ইয়াহিয়ার জল্লাদদের হাতে নিহত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বা্বা-মা, ভাই-বোনকে তারা শেয়াল-শুকুনের খোরাকে পরিণত করেছে।

আজ তারা আশা করে তাদের জল্লাদের দেহ কফিনের বাক্সে পুরে স্বদেশ পাঠাবে দাফনের জন্যে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হবার নয়। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী জল্লাদদের কাউকেই স্বদেশের মাটিতে যেতে দেবে না- জ্যান্ত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই না। এই বাংলাদেশের মাটিতেই নির্বান্ধব জল্লাদের অন্তিমশয্যা রচিত হবে। কফিনের বাক্স যেমনকার তেমনি পড়ে থাকবে।

অনেক বিলম্বে হলেও এই অনিবার্য পরিণতির কথা জল্লাদদের প্রভুরা বোধ হয় কিছু কিছু অনুমান করতে পারছে। তাই তাদের এবং তাদের ভাড়াটিয়াদের কণ্ঠে ইদানিং যেন দরদের বান ডাকছে। তাই তারা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর তরুণদের উদ্দেশে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনী গাইছে। আহা, কুলোকের কুপরামর্শে বাংলাদেশের এইসব সরল-নিরীহ ছেলেরা না-হক প্রাণ দিচ্ছে! ওহো, কি দুঃখের কথা!

একেই বলে গরুর শোকে শুকনের কান্না। বাংলাদেশের তরুণদের জন্যে জল্লাদ ইয়াহিয়া গোষ্ঠী আর তার দালালদের কি দরদ।

বলি বেহায়া খান, বাংলাদেশের এই তরুণদের, তাদের মা-বাপ, ভাই-বোনকে কিভাবে তোমরা হত্যা করেছো। সে কথা আমরা ভুলে যাব ভেবেছ? ভুলে যাব ভেবেছ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির কথা? তোমরা ঘাতকরা হঠাৎ এক-একটা জায়গা ঘেরাও করে শিশু-কিশোর-যুবকদের ট্রাকে উঠিয়ে পাগলায় নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দ লাভ করেছো। তারপর বুড়িগঙ্গার পানিতে তাদের ফেলে দিয়েছো। শিশু-কিশোর-যুবকদের চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহ থেকে নিঃশেষ রক্ত শুষে নিয়ে হত্যা করেছ তোমরা। তারপর ফেলে এসেছ ভাগাড়ে। শকুনে শকুনে সেখানকার আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের কণ্ঠে দরদের বান ডাকছে। তোমরা বেহায়া, তোমরা পশুরও অধম, দানবের চেয়েও নৃশংস।

ততোধিক ঘৃণ্য তাদের দালালরা, যারা আজ ইনিয়ে বিনিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদছে।

ঢাকার রেডিও স্টেশন পাগলার সেই বধ্যভূমি দূরে নয়, যেখানে হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু, কিশোর ও যুবককে বেয়নেটের খোঁচায় আর রক্ত নিংড়ে নিয়ে ইয়াহিয়ার ঘাতকরা হত্যা করেছে। বধ্যভূমির আকাশে শুধু শকুন আর শকুন। সে বীভৎস নারকীয় হাহিনী জানে ঢাকার প্রতিটি মানুষ, শকুন-ছাওয়া আকাশ সকলে দেখেছে আর শিউরে উঠেছে। কিন্তু শিউরে ওঠেনি ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দালালরা। তাই দিনের পর দিন মুক্তিশপথে দৃপ্ত বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের জন্যে মায়াকান্না কাঁদতে কণ্ঠটাও একটু কাঁপে না।

কোনদিন কি তোমরা পাগলার কাছে বুড়িগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাবে হাজার হাজার শিশু-কিশোর তরুণ কণ্ঠের চাপা গোঙানি। আরও কান পেতে থাকলে শুনতে পাবে শান্ত বুড়িগঙ্গার প্রাণের অশান্ত চাপা গর্জন। শুনতে পাবে বুড়িগঙ্গার আকাশ, পাগলার বাতাস সারা বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের ডাক দিয়ে বলেছে-

তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো,

তোমরা এর প্রতিশোধ নিয়ো।

সেই চাপা অথচ বজ্রনির্ঘোষ, সেই অবরুদ্ধ লাঞ্ছিত পরাধীন প্রাণের ক্রুদ্ধ হাহাকার যদি তোমরা শুনতে পেতে তাহলে বুঝতে-বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণপ্রাণ শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও কেন জানোয়ার হত্যার শপথ গ্রহণ করেছে। শুনলে বুঝতে পারবে তোমাদের জন্যে শেষ সংবাদে কোন বার্তা অপেক্ষা করছে।

(আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী রচিত)

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলার মাটিকে,বাংলার আকাশ-বাতাস-মাঠ-প্রান্তরকে এবং বাংলার মানুষকে এমন নিবিড় করে বোধ করি আর কোন বাঙালী ভালোবাসতে পারেনি। বাংলাদেশকে ভালোবেসে, বাংলার নির্যাতিত শোষিত লাঞ্ছিত মানুষকে ভালোবেসে শেখ মুজিবের ন্যায় দুঃখ ও নির্যাতন আর কোন মানুষ সহ্য করেননি। বাংলার মাটির প্রবাহ শেখ মুজিবের রক্তে সৃষ্টি করেছে তরঙ্গ, বাংলার নিঃশ্বাস যেন শেখ মুজিবের নিজের শরীরের নিঃশ্বাসে পরিণত হয়েছে- বাংলার সমগ্র অস্তিত্বের সাথে তিনি যেন একাত্ম হয়ে পড়েছেন। তাই বাংলার শরীরে যখন যে ব্যথা বেজেছে সে ব্যথা যেন শেখ মুজিবের শরীরেও ঝংকার তুলেছে। বাংলার মাটিতে যুগে যুগে মানুষ জন্মেছে, কিন্তু 'চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি' যিনি বলেছেন, সেই বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাংলার প্রাণের সাথে একাত্মতা এমন গভীরভাবে কেউ অনুভব করেননি- আর পরবর্তীকালে শুধু বাক্যে নয়, শুধু অনুভূতি দিয়েও নয়, দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে, জীবনের সকল আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে, সকল শক্তি ও সাধনা দিয়ে যিনি বাংলার সাথে একাত্মতা প্রমাণ করেছেন তিনিই বাংলাদেশের নয়নমণি শেখ মুজিব। বাংলার অস্তিত্ব থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ‘‘তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব’’ অথবা ‘‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর’’ এই কবিতা শুনে যিনি বাংলার প্রেমে তন্ময় হতেন, তিনি আজ আর প্রিয় জন্মভূমি বাংলার থেকে দূরে-বহু দূরে শত্রুর কবলে, দানব পশুর পাহারায় আবদ্ধ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ আজ রক্তস্নাত আর জননী বঙ্গভূমির সবচেয়ে আদরের দুলাল শেখ মুজিব আজ হৃদয়হীন পাষণ্ডের দেশ পাকিস্তানে বন্দীজীবনের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত। আজো বাংলার মাটিতে ‘‘কাঁঠালপাতা করিতেছে ভোরের বাতাসে’’ এবং ‘‘সেখানে খয়েরী ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে’’- কিন্তু এই দৃশ্য দেখে যে মানুষটি সবচেয়ে অভিভূত হতেন, যে সিংহপুরুষ সমগ্র বাংলাদেশকে হৃদয়ের কাছে আঁকড়ে ধরতে হাত বাড়াতেন সেই শেখ মুজিব বাংলা থেকে বহু দূরে শত্রুর কারাগারে শত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে দিন অতিবাহিত করে চলেছেন। বাংলাদেশের কাছে এর চেয়ে দুঃখের, এর চেয়ে মর্মান্তিক বুঝি আর কিছুই হতে পারে না। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কি এক নিঃসীম শূন্যতা অনুভব করি, মনে হয়-

যতদূর যাই,

নাই নাই সে পথিক নাই,

মনে হয়ঃ প্রভাতের অরুণ আভাসে

ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে

পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে

ভাষার অতীত তীরে

কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে

যতদূর চাই

নাই নাই পথিক নাই।

কিন্তু না। কে বলে শেখ মুজিব আমাদের মধ্যে নাই। তুমি যদি বাঙালী হও, তুমিও যদি বাংলাদেশের মাটি ও আলো-বাতাসকে শেখ মুজিবের মতই ভালবেসে থাকো, তুমি একবার চোখ নিচু করে তোমার হৃদয়ের দিকে চেয়ে দেখ- দেখবে শেখ মুজিব তোমার হৃদয়ে বাংলার প্রেমের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছেন আর তোমার হৃদয়কে বার বার নাড়া দিয়ে আহ্বান করছেন ‘‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’’ তুমি যদি মুক্তিযোদ্ধা হও, সংগ্রামী বাঙালী হয়ে পাকিস্তানের হানাদার কুকুরগুলোকে বিতাড়নের শপথ গ্রহণ করে থাকো- তুমি তোমার হৃদয়ে শেখ মুজিবকে খুঁজে পাবে, তোমার বাহুতে অজেয় শক্তি হয়ে, তোমার বক্ষে দুর্বার সাহসের প্রবাহ হয়ে শেখ মুজিব সর্বদা জাগ্রত রয়েছেন। শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির প্রতীক- তিনি আমাদের ছেড়ে দূরে থাকতে পারেন না, তিনি আছেন আমাদের সবার পশে পাশে, আমাদের সবার একান্ত নিকটে। পিণ্ডির কয়েদখানা শেখ মুজিবের দেহকে আবদ্ধ করে একটি বর্বর আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে; কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, বাংলাদেশের আজাদীর জনক শেখ মুজিবকে বিশ্বের কোন শক্তির সাধ্য নেই আবদ্ধ করে, কোন শক্তির সাধ্য নেই তাঁকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। তবু দুঃখ হয়, দুঃখে প্রাণমন সংকুচিত হয়ে আসে এই ভেবে যে, পাকিস্তানের বর্বরদের মধ্যে কি নিদারুণ বেদনার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবের। বাংলাকে ভালবেসে জীবনে যিনি সর্বদা যে কোন নির্যাতনকে এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত, বাংলার সেই সবচেয়ে দরদি সন্তান আজ একটি বাঙালীর মুখ দেখতে পারছেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি দেখছেন সেই হীনতম জানোয়ারগুলোর মুখ, যাদের স্মরণ করলেও আজ প্রত্যেকটি

বাঙালীর হৃদয় প্রতিহিংসায়, ঘৃণায় ও ধিক্কারে সংকুচিত হয়ে ওঠে। কবিগুরুর ভাষায়- আল্লাহকে বারবার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেঃ

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো;

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, বেসেছ তাদের ভালো?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেঃ শেখ মুজিব কি অন্যায় করেছেন, যার জন্য আজ এই নিদারুণ শাস্তি তাঁর ভাগ্যে নেমে এলো? বাংলাদেশকে ভালোবাসা, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য শপথ গ্রহণ করাই কি শেখ মুজিবের একটি অন্যায় কর্ম? আর তারই জন্য কি এই মহান নেতার ভাগ্যে এমন বিপর্যয়?

(ডক্টর মাযহারুল ইসলাম রচিত)

দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

আজ দেশের প্রায় সকল এলাকাই শত্রুমুক্ত। এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, যাকে ভালোবাসার অপরাধে বুলেট, বেয়নেট, মর্টার, মেশিনগানে, লক্ষ লক্ষ প্রাণের অবসান ঘটেছিল। হারিয়েছিল কতজন স্বামী, সন্তান পিতা-ভ্রাতা। আত্মীয়পরিজন ভরা সুখের সংসার সর্বস্বহারা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কতজন বাহির হয়েছিল পথে- সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে।

আজ শত্রুমুক্ত অঞ্চলে ফিরে আসছে সবাই- কিন্তু বসতি গড়ে তুলবে এ কোন মাতৃভূমির কোলে চির সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা যার প্রতিরূপ এক পশুশক্তির দাহনে জনশূন্য, শস্যশূন্য, গৃহশূন্য দগ্ধ হাহাকারের এক চরম অভিশাপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বর্বর ইয়াহিয়ার অনুচরবর্গের অঞ্চল ত্যাগের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হত্যাযজ্ঞের অবশিষ্টরূপে রয়েছে দগ্ধ গৃহ, লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভগ্নাংশ, স্বজনসম্পত্তি হারা, শোকার্ত, বুভুক্ষু ও পঙ্গু একদল নরনারী, অনাথ শিশু আর বালক-বালিকা।ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শত শত মৃতদেহের ভাগ নিয়েছে শিয়াল, কুকুর আর শকুনের লড়াই। শূন্য ভিটায়, ভগ্নগৃহে কারো বুকে জ্বলছে পিতা-মাতা, ভ্রাতা আর বন্ধু বিয়োগের বেদনা- স্বামী-সন্তান আর সুখের সংসার হারিয়ে কেউ বা কাঁদছে ভূলুণ্ঠিত হয়ে, কারো বা বেদনা ভাষাহীন। বর্বর হামলায় অঙ্গহীন, চক্ষুহীন, পঙ্গু নরনারী নিজেদের ভবিষ্যত অন্নসংস্থানের দুশ্চিন্তায় অর্ধমৃত। প্রিয় বিয়োগের বেদনা, সন্তান আর সম্পদ হারানোর শোক অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিকও নয়- আর এ শোকে সান্ত্বনার ভাষাও নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিস্ফল শোকও পরিহার করতে হবে। অত্যাচারীর কবলমুক্ত পুনর্জীবিত আমরা। আমাদের এই নবজন্ম ও জীবন পরিচালনার সন্ধিক্ষণে পশ্চাতের শোক, দুঃখ, অনুশোচনাকে দূরে সরিয়ে একতা, শান্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ সংগঠনে সক্রিয় হয়ে নতুন উদ্যমে বাঁচতে ও বাঁচাতে হবে। এই ভগ্নহাটের দগ্ধভূমিতে এই শোকার্ত, নির্যাতিত পঙ্গুদের মাঝেই আমাদের কর্মক্ষেত্র বিছাতে হবে। আত্মনিয়োগ করতে হবে বিপন্ন, বিপর্যস্ত, নিরন্ন এই জনসমাজের কল্যাণমূলক সংগঠনের দায়িত্বে।

দীর্ঘ সংস্কারের অভাবে মুক্তাঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অব্যবস্থা ও ময়লা নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মশামাছির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে নানা রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

তদুপরি রক্তলোলুপ খান সৈন্যদের পলায়নের প্রাক্কালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে নিহত পরিত্যাক্ত গলিত মৃতদেহ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যোগে এ সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যা সত্বর নিরসনে অগ্রণী হওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলের ভগ্ন, অর্ধভগ্ন নলকূপ মেরামত, প্রয়োজনবোধে নতুন নলকূপ চালু করার ব্যাপারে কর্তপক্ষকে অবহিত করা, নর্দমা ইত্যাদি সংস্কারে নিজেদের মনোযোগী হওয়া- যেখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লা ফেলার ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা, জল ফুটিয়ে পান করা- স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় এই সমস্ত দায়িত্বগুলিতে মেয়েরা নিজেদের দৃষ্টান্তে অপরকেও সতর্ক করতে পারেন। নালা-নর্দমায় জীবাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগ, ঘরে ঘরে টিকা-ইনজেকশনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ইত্যাদিতে বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূলে মেয়েরা যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন।

বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত প্রায় পল্লী ও শহরগুলির যেখানে আহত-পীড়িতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা সহজসাধ্য নয়, সেখানে সকলে একতাবদ্ধ হয়ে গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, ঘরোয়া চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলে ও সাধ্যানুযায়ী সহায়তা দানে মেয়েরা এগিয়ে আসতে পারেন- আর্তের সেবা, সাহায্য পথ্য ও পানীয়ের সমস্যা সকলের সম্মিলিত যত্নে সমাধান হয়ে যাবে।

তা ছাড়া, বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিয়মিত বিদ্যালয় চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাঠাভ্যাসে দীর্ঘ অনভ্যস্ত ছেলেমেয়েদের একত্রিত করে সমান সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে গেলে শিক্ষাদান কার্য অনেকটা এগিয়ে যাবে।

উপস্থিত আমরা সকলেই লুণ্ঠিত, সর্বস্বান্ত- তবুও তার মধ্যে কিছুটা সামর্থ্য আর সঙ্গতি যাদের আছে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে, আর সঙ্গতি যাদের আছে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে, কল্যাণমূলক কিছু কাজ পরস্পরের সহযোগিতা আর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে আরম্ভ করতে পারি। শীতবস্ত্রের প্রয়োজনে সুতো-কাঁটা সংগ্রহ করে বসে গেলে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অপরের প্রয়োজনেরও সাহায্য করতে পারি। রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যাণ্ডেজ, বন্ধনী, নবজাত শিশু আর প্রসূতির উপযুক্ত বস্ত্রাদি, সাময়িক সাহায্য, কিছু ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, শিশুদের পাঠ্যবইও আমরা এ থেকে করে নিতে পারি।

হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম অত্যাচারের শিকারে পরিণত, নির্যাতিত-নিপীড়িত- যারা সমগ্র মাতৃজাতির অবমাননার কালিমা নিজের গায়ে মেখে জীন্মৃতঃ জনচক্ষুর অন্তরালে পড়ে আছে, আসুন আমরা এগিয়ে যাই ব্যথায় বিমূঢ় লাঞ্ছনা, বেদনা আর অপমানের বিষপানে জর্জরিত নিরূপায় সেই মা, বোন, বধূ আর কন্যাদের মাঝে। তাদের দুঃসহ. দুঃখ ও লজ্জার গুরুভার যদি সমগ্র অন্তর দিয়ে লাঘব করতে না পারি, তবে বৃথাই আমরা মাতৃ অংকে জন্ম নিয়েছি। সমবেদনার প্রলেপে, দরদের অশ্রুতে আমরা মুছে নেব তাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত। ডেকে নেব আমাদের সর্ব কাজে, সর্বস্তরে। বেঁধে দেব তাদের ভাঙ্গা ঘর, ফিরিয়ে দেব তাদের সুখ-শান্তি, সম্মান।

তবে একতা, শৃঙ্খলা, শান্তি আর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যেন আমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যাই। হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা আর সাম্প্রদায়িকভাবে বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন আমাদের এই কল্যাণব্রতকে কলুষিত না করতে পারে। সকল স্বার্থ, নিন্দা, ভয়, ভেদ, বিবাদের সমস্যাজয়ী বাংলার নারী- আমরা আমাদের দেশকে, জন্মভূমিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে যদি এগিয়ে যাই, তবে সমস্যা যতই দুরূহ হোক না কেন, সুসমাধান যে হবেই এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

(বাসনা গুণ রচিত)

স্বদেশ স্বকাল

২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশে পাকিস্তানের মৃত্যু হলো আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সেই সাথে শেষ হলো শাসনের এবং শোষণের একটি কলংকজনক অধ্যায়। হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক তুলনাহীন বেঈমানকে, যে ভাইয়ের মুখোশ পরে সিন্দাবাদের গল্পের সেই অসহ্য দৈত্যটার মত বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল গত চব্বিশ বছর ধরে, অবশেষে আমরা উৎখাত করলাম বাংলাদেশের মাটি থেকে। স্বেচ্ছায় ঘাড় থেকে নামেনি লোভী দৈত্যটা বারবার প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে একটি পরাজিত আহত কুকুরের মত সে আত্মসমর্পণ করেছে প্রাণ বাঁচাবার নিতান্ত জৈবিক তাড়নায়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের কবর রচিত হবার সাথে সাথে মৃত্যু হলো উগ্র সাম্প্রদায়িকতার, যে বিষ একদিন বাংলাদেশের মানুষের উপর উগড়ে দেবার চেষ্টা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী প্রাসাদষড়যন্ত্রীরা। বিগত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানী প্রভুরা এই উৎকট বিষবৃক্ষটিকে বাংলাদেশের মাটিতে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন শাসন এবং শোষণ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, একজন বাঙালীকে অন্য একজন বাঙালীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এর জন্যে আমদানী করার চেষ্টা চলেছিল সাম্প্রদায়িকতার, যা মানুষকে ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করতে এবং অর্থহীন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

এই সচেতন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুরা- এ কথা সত্যি, কিন্তু এই বিষবৃক্ষটির লালনে এবং পুষ্টিসাধনে নিরন্তর সহায়তা যুগিয়েছে একদল বাংলাদেশের ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী- যারা সামান্য কিছু লাভের আশায় নিজেদের বিবেক, বুদ্ধি ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমা প্রভুদের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে পদলেহী কুকুরের মত। সাম্প্রদায়িকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে জিইয়ে রাখবার জন্যে এরা সব রকম ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে- এমনকি বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে বিনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেও এদের বিবেকে বাধেনি। এরাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে, উর্দু হরফে বাংলার প্রচলনের, এরাই ফরমান দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ বর্জনের, এরাই মুখর হয়েছে বাঙালী আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিরুদ্ধে। সর্বস্তরে এই উৎকট ব্যাধিটিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে সমগ্র দেশব্যাপী গড়ে তুলেছে বিএনআর, পাকিস্তান কাউন্সিল ইত্যাদি মগজ ধোলাইয়ের প্রতিষ্ঠান। এরাই বিকৃত করে রচনা করেছে ইতিহাস, এমনকি সুকুমারমতি শিশুদের মনটিকে পর্যন্ত বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে- সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে। এদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাঙালীর বাঙালিত্ব, তার আচার অনুষ্ঠান, তার ভাষা, তার আজন্মের অন্তরঙ্গ সংস্কৃতি। পশ্চিমা প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়ে এরাও গান ধরেছিলঃ বাঙালীয়ানা আসলে হিন্দুয়ানীরই নামান্তর মাত্র। বাংলা ভাষাটাই নাকি হিন্দুদের ভাষা- মায়ের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানের তাতে কোন অধিকার নাই। অতএব একজন সাচ্চা পাকিস্তানী হতে হলে এইসব বাঙালীয়ানা সযত্নে পরিহার করতে হবে এবং তার বদলে গ্রহণ করতে হবে পশ্চিমা প্রভুদের প্রেরিত সেই ঘৃণ্য, ব্যাধিটিকে, যার নাম সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা। বাংলাদেশে বাঙালী সংস্কৃতি চলবে না, তার বদলে বরণ করতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধোলাই হয়ে আসা 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' নামক আজব বস্তুটিকে। এসব কুকীর্তির বিনিময়ে কুচক্রী প্রভুদের কাছ থেকে কিছুই যে ইনাম মেলেনি তা নয়। এই পাপের পথে পদচারণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কুখ্যাত শিক্ষকটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ লাভ করেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ঘৃণ্য মীরজাফরটি পেয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ। এবং একইভাবে লাভবান হয়েছে তাদের সমগোত্রীয় ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এই সমস্ত ঘৃণ্য দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত কোদিনই বিভ্রান্ত

করতে পারেনি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে- ফেলে আসা কয়টি উজ্জ্বল গণআন্দোলন এবং আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায় এই মন্তব্যের সপক্ষে রায় দেবে। নগ্ন অর্থনৈতিক শোষণ যখন বাংলাদেশের মানুষকে নিক্ষেপ করেছে এক অকল্পনীয় দুঃসময়ের বিবরে, তাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে চক্রান্তের আসল রূপটি।

মুক্ত বাংলাদেশে তাই আজ সাম্প্রদায়িকতার কোন ঠাঁই নেই। আপন ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে আমরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার সূর্যালোকে আলোকিত হয়েছি। ধর্মকে তাই আজ আমরা আর রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি নই। আমার সোনার বাংলাদেশে তাই আর সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে কোন কথা নেই- প্রতিটি মানুষের আপন আপন ধর্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকার নিয়ে বাঁচবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মুক্তবুদ্ধিকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে, এ কথা আলোচনা করতে গিয়ে এই মুহূর্তে- অনেক দিন আগে পড়া সুসাহিত্যিক শ্রী মনোজ বসুর একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্পের কথা আমার মনে পড়ছে। দেশ বিভাগকালীন অর্থহীন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার পটভূমিতে লেখা গল্পটি। এক গ্রামে পাশাপাশি বাস করত দু'টি পরিবার- একটি হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। এই দুই পরিবারের সম্পর্ক ছিল নিবিড় সম্প্রীতির এবং অন্তরঙ্গতার। তারপর- এক সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের একটি ছোট্ট ঢেউ সেই সুদূর গ্রামটিতেও গিয়ে লাগল এবং ফাটল ধরল সম্পর্কের। একে অন্যকে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। বন্ধ হয়ে গেল মেলামেশা পর্যন্ত। দু'বাড়ির দুটি ছোট ছেলেমেয়ে কিন্তু এতসব জানতো না। তাই বাপ-মা'র নিষেধ সত্ত্বেও তাদের লুকিয়ে মেলামেশা বন্ধ হয়নি।

একদিন হিন্দু বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটি মুসলমান বাড়ির মেয়েটিকে বলল, 'জানিস মুসলমানরা হিন্দুদের দেখলেই কেটে ফেলছে।'

তুই কিচ্ছু জানিস না, মেয়েটি বলল। আসলে হিন্দুরাই মেরে ফেলছে মুসলমানদের। একটু নীরবতা। তারপর মেয়েটি বলল, আচ্ছা তুই 'হিন্দু' দেখেছিস?

ছেলেটি বলল, নাতো! তা তুই মুসলমান দেখেসনি? মেয়েটি উত্তর করল, না রে! দরকার নেই বাবা ওসব হিন্দু-মুসলমান দেখে।

ছোট্ট ছেলেমেয়ে দুটি খুবই আশ্বস্ত বোধ করল এই ভেবে যে, ওদের কাছাকাছি কোন 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' নেই।

গল্পটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কি হাস্যকর এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, যার নিরর্থকতা ছোট্ট দুটি ছেলেমেয়েও তাদের সহজাত বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে।

উগ্র ধর্মান্ধতা অনেক দেখেছি আমরা, বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছি তার বিষাক্ত নখরে। তাই বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে এই কুৎসিৎ বিষবৃক্ষটিকে ঠাঁই দিতে আর প্রস্তুত নই আমরা।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)

বাংলার সংগ্রামী জনতা প্রস্তুত

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মোহাম্মদপুর কলোনীর একমুঠো মাটি একটা কাগজে মোড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কালচে মাটি। রক্ত আর মাটি মিশে জমাট বেঁধে গেছে। কার রক্ত? হয়তো মুনীর চৌধুরী কিংবা ডাঃ ফজলে রাব্বির। ডাঃ আলীম চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, গোলাম মোস্তফা, সিরাজউদ্দিন হোসেন খান-কার রক্ত মিশে আছে এ মাটিতে? জানিনে। হয়তো সকলের রক্তই মিশে একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বরতার জঘন্যতম নিদর্শন। বুদ্ধিজীবীদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বিশ্বমানব ঘৃণায় শিউরে উঠেছে; বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের কণ্ঠ। মোঙ্গল হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণ করেছিলো। বাগদাদের রাজপথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েও তার তৃপ্তি হয়নি। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগ যুগ ধরে সযত্নে সঞ্চিত গ্রন্থাগারে আগুন দিয়ে বহ্নি-উৎসব করেছিলো। রাশি রাশি পোড়া গ্রন্থের ছাই ইউফ্রেটিস নদীর জল কালো করে দিয়েছিলো। ৮০০ বছর পর ঢাকার বুকে বিংশ শতাব্দীর হালাকুরা যে ঘটনা সংঘটন করলো তাতে অতীতের হালাকুও লজ্জা পেতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শরিক। কারাবরণ করতে হয়েছিলো তাঁকে। ফজলে রাব্বি বিখ্যাত হৃদরোগ চিকিৎসক, ডাঃ আলীম চৌধুরী চক্ষুরোগ বিশারদ, সন্তোষ ভট্টাচার্য ইতিহাসের অধ্যাপক, সাংবাদিক মোস্তফা, নজরুল, কেউ-ই রেহাই পেলো না। বাংলাদেশের মাটিকে, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসার এবং পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী হবার চরম খেসারত দিতে হলো তাঁদের। থোকা থোকা রক্তে বাংলা মায়ের পায়ে আল্পনা এঁকে গেলেন তাঁরা।

বাংলাদেশের বিগত চব্বিশ বছরের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশের জনতার রক্তদানের ইতিহাস। ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরায় সামান্য মানবিক দাবী আদায়ের জন্য আনোয়ার, হানিফ, কম্পরাম এদের সাতজনকে প্রাণ দিতে হলো। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী করার অপরাধে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসকচক্রের সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হলো বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারদের। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে বাস কর্মচারী ওয়াজিউল্লা প্রাণ দিলেন। ১৯৬৬ সালে ছয়-দফা দাবী, বাংলার স্বাধিকার দাবিতে আবার কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুনে লাল হলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, টঙ্গীর মাটি। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ১১- দফার দাবীতে আসাদ, ডাঃ শামসুজ্জোহা,মতিউর, রোস্তম এমনি শত শত লোক বুকের রক্তে দেশমাতৃকার তর্পণ করলেন। ১৯৭১ সালে স্বৈরাচারের অবসানের জন্য আবার শুরু হলো প্রাণ বলিদান পর্ব। ফারুক, ইকবাল, পাবনার এ্যাডভোকেট আমীরুদ্দীন, যশোহরের মসীউর রহমান, রাজশাহীর বীরেন সরকার, ঢাকার ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডঃ গোবিন্দ দেব, ডাঃ ফজলে রাব্বি, ডাঃ আলীম চৌধুরী এমনি লক্ষ লক্ষ লোকের বুকের রক্তে বাংলার মাটি আজও ভেজা। একটা অপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল রক্তদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে শত্রুর কলুষ স্পর্শ থেকে মুক্ত করেছে।

বিগত চব্বিশ বছরে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতা পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছে। সেই মহান অপূর্ব সংগ্রামের পরিণতি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনতার চূড়ান্ত বিজয়, আজকের গণজপ্রতান্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হবার সংগে সংগেই বাংলাদেশের জনতার সংগ্রামের অবসান হয়েছে- এই চিন্তা ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনতা আজ এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংগ্রাম হলো দেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর হানাদাররা বিগত নয় মাসে সুপরিকল্পিত উপায়ে একদিকে যেমন বাংলাদেশের মনীষা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বত্র এক প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালিয়ে সোনার বাংলাদেশকে আপাত-শ্মশানে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, কলকারখানা এবং হাজার

হাজার বাড়ি তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আত্মসমর্পণ করবার প্রাক্কালে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলো লুট করে সমস্ত টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানের Gold Reserve রাখা হতো করাচী স্টেট ব্যাঙ্কে। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে কোন স্বর্ণ রক্ষিত হতো না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সদ্যজাত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যে কোন দেশের অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধির জন্যে স্বর্ণের একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান শুধু বাংলাদেশ সরকারের একার হাতে নিবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের যে সাড়ে সাত কোটি জনতা তাদের অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং নিষ্ঠার দ্বারা বাংলার মুক্তি অর্জন করলো, সেই সাড়ে সাত কোটি জনতাকেই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কঠিন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর করবে। আর এ কথাও জানা যে, বাংলার সংগ্রামী জনতা এককণ্ঠে সেই দাবীর প্রতি জানাবে তাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা। প্রস্তুত সংগ্রামী বাংলার সংগ্রামী জনতা। জয় বাংলা।

(গাজীউল হক রচিত)

বাংলাদেশের পুনর্গঠন-৩

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ধর্মের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে জাগতিক তথা রাজনৈতিক কাজে লাগানো হয়েছিল বলেই ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান টেকিনি। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির পটভূমি ছিল ধর্ম। সাম্প্রদায়িকতা; কিন্তু বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ লক্ষ প্রাণের রক্তে অর্জিত হলো- তার সংগ্রামী পটভূমিতে যে সত্যটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল তা হলো দেশপ্রেম। দেশের মাটির প্রতি দেশবাসীর ভালোবাসা- দেশের সংগ্রামী শাসনক্ষমতার সংগে দেশবাসীর প্রাণের মিলন। আজ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি নবজাত রাষ্ট্রের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সামনে নতুন স্বপ্নের হাতছানি- কল্পনার অজস্র বিস্তার।

এদেশ কেমন হবে- এ প্রশ্নের উত্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন। 'আপনারা কিভাবে এ দেশকে গড়ে তুলতে চান'- এর উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ কেমন হবে। সত্যিই অনেক ধ্বংসস্তুপের মধ্যে মাথা তুলে যে নতুন রাষ্ট্র আজ এলোমেলো, এবড়োথেবড়ো. বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে আছে তাকে আমাদের মনের মতো করে সাজাতে হবে- রূপায়িত করতে হবে আমাদের প্রতিটি স্বপ্নকে।

এই স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সহযোগী চেতনার। হানাদার বাহিনীর চলাচলের পথ দুর্গম করে তোলার জন্য একদিন যে পুল, কালভার্ট আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম- আজ সেই পথেই আমাদের নিত্যদিনের যাত্রা। এই বাড়ির পাশের পুলটির পুনঃনির্মার্ণের জন্য আপনি কি সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবেন? নিশ্চয়ই নয়। আপনার কাজ হবে প্রাথমিকভাবে পার্শ্ববর্তী মানুষের মধ্যে এমন এক চেতনার জন্ম দেয়া- এমন এক নতুন কর্মপ্রেরণাকে সঞ্চারিত করা, যাতে শারীরিক সাধ্যের অন্তর্গত পরিশ্রমে দেশের যে কোনো পুনর্গঠন কাজে নির্দ্বিধায় অংশ নিতে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসে। এ ভাঙা পুলটি আপনারাই পুনঃনির্মাণ করতে পারেন। অর্থের সংগে কর্মের নিষ্ঠা যুক্ত না হলে অপচয়কে রোধ করা যায় না।

বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সর্বপ্রথম এই ভেঙে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যতশীঘ্র সম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেঘনা নদীর ওপর ভৈরব রেলব্রিজ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতো বড়ো বড়ো সেতুগুলোর পুনঃনির্মাণের কাজে সরকার ইতিমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এ বৃহৎ দায়িত্বগুলো নিশ্চয়ই সরকারী ব্যবস্থাধীনেই ত্বরান্বিত হবে- কিন্তু বাড়ি পাশের, গ্রাম-গঞ্জের ছোটখাট পুলগুলো গ্রামীণ স্থানীয় চেষ্টায় মেরামত করা অসম্ভব কিছু নয়। এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

আপনার বাড়ির পাশের যে স্কুলটি কিম্বা আপনার বাড়ির পাশের মসজিদটি, যা কিছুদিন আগে হানাদার বাহিনীর কামানের গোলা বা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপনাদের দায়িত্ব নিজেদের প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজনীয় পুনঃনির্মাণ। সরকারকে ছোটখাটো পুনর্গঠনের দায়িত্বের দিকে টেনে না এনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে দেয়া। আজকে অর্থনৈতিকও সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি যে মহান দায়িত্ব সরকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সমবেতভাবেই সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

দীর্ঘদিন শত্রুকবলিত বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদন অসম্ভব রকম হ্রাস পাওয়ায় এবং বহিঃবিশ্বের সংগে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ায় গ্রামে গ্রামে তেল, কেরোসিন, লবণ, সাবান, কাপড়, ঔষধপত্র প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। যোগাযোগের অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারী-মুনাফাখোর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াবে। স্থানীয়ভাবেই গ্রামে গ্রামে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসামরিক প্রশাসন গ্রামে গ্রামে চালু হবার সময় এসে গেছে। সুযোগসন্ধানী যারা সময়ের সুযোগ নিতে চাইবে- দেশদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তিই তাদের প্রাপ্য হবে।

আগামী শুভ নববর্ষের পদার্পণের সংগে সংগেই পূর্ণ উদ্যমে শুরু হবে বাংলাদেশ সরকারের তথা বাংলাদেশবাসীর পবিত্র দায়িত্ব- শরণার্থীদের পুনর্বাসন। এই পবিত্র মানবিক দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের সাহায্য, সহানুভূতি ও সশ্রম আত্মত্যাগ অপরিহার্য। এ দায়িত্ব সরকারের নয়- এই পুনর্বাসনের নৈতিক ও মানসিক দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় যে সমস্ত দালাল অনেক ভাবে অপরের সম্পত্তি, বাড়িঘর ও অস্থাবর মালামাল নিজেদের দখলে রেখেছিল- সরকারী হস্তক্ষেপের পূর্বেই সবকিছু ফিরিয়ে দিয়ে তাদের কর্তব্য হবে পুনর্বাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করা। অবৈধভাবে অপরের সম্পদ ভোগ-দখলের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আপনার বাড়ির পাশেই তার নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে দীর্ঘ দশ মাসের অনিশ্চিত জীপনযাপনের পর আজ যারা ঘরে ঘরে ফিরবেন- পুরনো বিদ্বেষ, স্বার্থের ব্যাঘাত সবকিছু ভুলে গিয়ে আমাদের উচিত হবে ফিরে আসা শরণার্থীদের দিকে বন্ধুত্বের কোমল হাতকেই প্রসারিত করা। ভাই, বন্ধু ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পরস্পরের সহযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। জনসাধারণের মধ্যে এই শুভবুদ্ধির প্রসার ঘটাতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘৃণা নয়, প্রতিবেশী বলে বুকে টেনে নিতে হবে পরস্পরকে।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টার সফলতা জনসাধারণের সহযোগিতা নির্ভর। যাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, তাদের জন্য ঘর তুলতে হবে- প্রয়োজনবোধে অর্থ, প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে সাহায্য করতে হবে আমাদের যে অশুভ শক্তি একদিন তার অসহনীয় বর্বরতা দিয়ে এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া করেছিল- অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়েই আমরা সেই শক্তিকে পরাজিত করেছি। সেই ত্যাগের মহান আদর্শ, সেই সহযোগিতার ঐতিহ্যই বাংলাদেশের প্রতিটি পুনর্গঠনে আমাদের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করুক, ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই আমাদের সরকারের হাতকে শক্তিশালী করুক। ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই আমাদের আকাংক্ষিত সোনার বাংলাদেশ নতুন আলোয় স্নাত হবে।

(নির্মলেন্দু গুণ রচিত)

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

.....১৯৭১

পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পাকিস্তান কখনো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। তিনি চক্রান্তের রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং তাঁর আমল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তল্পিবাহকদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও চক্রান্তের জাল বিস্তার পেতে তাকে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, গোলাম মোহাম্মদ, ইসকান্দার মির্জা, এরা সবাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্য ছিলেন এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির গুপ্ত পথ বেয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি নিয়োগপত্র নিয়ে ক্ষমতায় আসেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপরিকল্পিত পন্থায় বিভিন্ন সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করেন তিনি।

পাঞ্জাবের মালিক ফিরোজ খান নূন করাচীর আই, আই, চুন্দ্রিগড় ও সেই একই চক্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। আইয়ুব খান ছিলেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন পেশাদার সৈন্য। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে- একটি সামরিক 'জুন্টার সহায়তায়। আইয়ুব খানের অনুচর কালাতের খান, মোনায়েম খান, সবুর এরাও কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গদীনসীন হননি।

পাকিস্তানের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও ক্ষমতায় এসেছেন সামরিক বাহিনীর দৌলতে, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অন্ধকার পথ বেয়ে। আর তাই লিয়াকত আলী খান থেকে ইয়াহিয়া খান- পাকিস্তানের গত তেইশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

যেহেতু চক্রান্ত, দলাদলি ও ষড়যন্ত্রের পঙ্কিলতার মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর জন্ম, লালন-পালন ও মৃত্যু সেহেতু ওই তিনটি প্রক্রিয়ার প্রতিই তারা আস্থাবান ছিলেন। জনগণের কথা তাঁরা ভাবতেন না, কিম্বা ভাববার অবসর পেতেন না। জনগণের কোনো তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। জনগণের আশা-আকাংক্ষা, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া আর দাবী-দাওয়ার প্রতি সব সময় এক নিদারুণ নিস্পৃহতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এই শাসকচক্র।

তাই এই গণবিমুখ শাসকচক্রের হাতে পড়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এক দুঃসহ সময় অতিবাহিত করেছে গত তেইশ বছর ধরে। ধনীরা আরো ধনী হয়েছে। গরীবের দল আরো গরীব হয়ে গেছে। যেহেতু এই শাসকচক্র পাঞ্জাবী ভূস্বামী, পাঞ্জাবী ধনপতি, পাঞ্জাবী আমলা-মুৎসুদ্দি ও পাঞ্জাবী সামরিক 'জুন্টা'র দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো, সেহেতু পাকিস্তানের বাকি চারটি প্রদেশ, পূর্ববাংলা, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সাধারণ মানুষ এই শাসকচক্রের হাতে আরো বেশি লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও শোষিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়েছে পূর্ববাংলা ও পূর্ববাংলার মানুষ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ অধ্যুষিত পূর্ববাংলা এই শাসক চক্রের হাতে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। যদিও পাকিস্তানের আয়-করা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ আসত পূর্ববাংলা থেকে, তবু পূর্ববাংলাকে তার আয়ের সিকি ভাগও ভোগ করতে দেওয়া হতো না। সব তারা ব্যয় করত পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে কলকারখানা তৈরীর কাজে। যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ আসত পূর্ববাংলা থেকে, তবুও শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে

ব্যয় করা হতো মাথাপিছু চার টাকা ছয় আনা তিন পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র এক পাই শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু একাত্তর টাকা চার আনা পনেরো পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা বারো আনা পাঁচ পাই। সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু টাকা দুই আনা সাত পাই, আর পূর্ববাংলার জন্য মাথাপিছু মাত্র নয় আনা ছয় পাই।

বৈষম্যের এখানেই শেষ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বছরে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে সেই একই বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে চার কোটি দশ লক্ষ টাকা। যে বছরে রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা। সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে নয় লক্ষ বারো হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত পূর্ববাংলার অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা মাত্র চারজন। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার শতকরা ছিয়ানব্বই জন।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর বঙ্গবাসী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচজন, আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের হার হচ্ছে শতকরা পঁচানব্বইজন।

আর দেশরক্ষা বিভাগ? শতকরা ৯১.৯ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী, আর শতকরা ৮.১ ভাগ পূর্ব বাঙালী। কী নিদারুণ বৈষম্য! কী ভয়াবহ শোষণ! পূর্ববাংলার সদাজাগ্রত মানুষ তাই সংঘবদ্ধভাবে এই শোষণের অবসান দাবি করল। স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুলল তারা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কথাই বলা হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়।

পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোনো বিরোধ ছিল না, এখনও নেই। পাকিস্তানের যে কোনো অঞ্চলের মানুষের ওপরে যে কোনো রকমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ সবসময় সোচ্চার হয়েছে। পূর্ববাংলার জনগণ শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধিকার চেয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের দাবি তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্বল প্রদেশগুলোর ওপরে যখন শাসকচক্র জোর করে এক ইউনিটের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে, তখন পূর্ববাংলার জনগণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর জনগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারাও এক ইউনিটের বিলোপ সাধনের দাবি তুলেছে।

বেলুচিস্তানের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর যখন জঙ্গী আইয়ুবশাহী তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে, যখন অসংখ্য নরনারীকে লক্ষ্য করে মেশিনগানের গুলি চালিয়েছে, তখন পূর্ববাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে- এই গণহত্যার নায়ক আইয়ুব খানের বিচার দাবি করেছে।

পাকিস্তানের শাসকচক্র সবসময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিরোধের ঘোলা জলে নির্বিঘ্নে সাঁতার কেটে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। সারা পাকিস্তানের একসঙ্গে আইয়ুব খানের ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। পূর্ববাংলা, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান আর পাঞ্জাব এক সঙ্গে গর্জে উঠল।

খাইবার থেকে টেকনাফ প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, প্রতিটি স্তরের মানুষ গণতন্ত্রের পতাকা হাতে নিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জন্ম দিল।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা পাকিস্তানের মানুষ দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হলো গণবিমুখ শাসকচক্রেকে উৎখাতের লড়াইয়ে। ১৯৬৯- এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পাকিস্তানের শাসকচক্রের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে জনতার এই একতায় ফাটল না ধরাতে পারলে তাদের একচেটিয়া শোষণ আর গণবিমুখ শাসনব্যবস্থাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। জনতার মধ্যে ভাঙন ও বিরোধ সৃষ্টির সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের জন্ম দেয়া-হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ, পাঞ্জাবী-পাঠান বিরোধ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যখনই গদিচ্যুত হবার সম্ভবনা প্রকট হয়ে উঠছে, তখনই যে কোন একটি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তির পথে চালিয়ে, আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়ে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করেছে তারা।

১৯৬৯- এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করেও যখন শাসকচক্র ব্যর্থ হলো, তখন একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আইয়ুব খান সরে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান চক্রান্তের পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলেন। মুখে বলতে লাগলেন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আসলে তাঁর পরিকাল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি পৃথক-পৃথকভাবে মিলিত হতে লাগলেন- কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। উদ্দেশ্য ছিলো পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে লাগিয়ে দেয়া। সকল দলের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছিলেন তিনি। নিজেকে সাধু-সজ্জন হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন সবার কাছে। নির্বাচনের দিন তারিখ ঘনিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শুরুতে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হলো পূর্ব বাংলার মানুষ। সর্বনাশা ঝড় আর সামুদ্রিক জলচ্ছ্বাসে দশ লাক্ষ মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রাণ হারালো। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ সহায়- সম্বলহীন হয়ে পড়ল। পৃথিবীতে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর হয়নি। এই দুর্যোগের সময়ে হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য , বিদেশী সাংবাদিক বিদেশী সাহায্যকারীতে ভরে গেল পূর্ব বাংলার ঝড় উপদ্রুত অঞ্চল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকচক্রের একটি লোকও এলেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সান্তনা জানাবার জন্যে। বাতাসে অনেক কথা শোনা যেতে লগল। নানা প্রশ্ন উঠল নানা মহল থেকে। ত্রাণ কাজের নাম করে বিদেশী সৈন্য কেন নামবে আমাদের মাটিতে? আমাদে সৈন্যরা বসে বসে করছে কি? এত বড় দুর্যোগ ঘটে গেল কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা নীরবে ইসলামাবাদে বসে করছেন কি? বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার আনতে হলো কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টারগুলো গেলো কোথায়? নানা গুজব ছড়াতে লাগল দ্রুত। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক জানালেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়। দশ লাক্ষ লোক তোমরা ঝড়ে হারিয়েছো। কিন্ত আরো দুঃখ আছে তোমাদের কপালে। আরো অনেক প্রাণ তোমাদের দিতে হবে শীঘ্রই। বিদেশী সাংবাদিকের এই উক্তি তখন থেকেই নানা আলোচনা, সমালোচনা, সন্দেহ এবং জল্পনা কল্পনার জন্ম দিয়েছিল পূর্ববাংলায়। অনেকের মনেই সন্দেহ জেগেছিল, আমরা কি কোনো বিশ্বরাজনীতির দাবা খেলার ছকের মধ্যে পড়ে আছি?

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো। যথা সময়ে শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সারা পাকিস্তান ব্যপী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলো পাকিস্তানের নাগরিকরা। নির্বাচনের ফলাফল বেরবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি প্রদেশে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও একচেটিয়া শোষণের অবসানকারী দুটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দল দুটি হলো- আওয়ামী লীগ আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।

আর প্রদেশ তিনটি হলো- পূর্ববাংলা, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। বাকি দুটি প্রদেশ সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জয়ী হলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেও একচেটিয়া শোষনের অবসান ও সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতে দেখা গেল, যে সমস্ত দল ও গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে এসেছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করে এসেছে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণের দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছে- সেই সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে বর্জন করেছে।

পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন তাঁরা। আওয়ামী লীগের এই বিজয়ের পেছনে যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমর্থন ছিল তার প্রমাণ হলো, ঢাকার মীরপুর-মোহাম্মদপুর, খুলনার খালিশপুর, রংপুরের সৈয়দপুর ও ঈশ্বরদী প্রভৃতি অবাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম নামক সাম্প্রদায়িক দলের প্রার্থীদের পরাজিত করেছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল পাকিস্তানের শাসক ও শোষকচক্রের নাভিশ্বাস তুলে দেয়। তাঁরা ভেবেছিলেন নির্বাচনে কোন একটি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা নিয়ে কলহ দেখা দেবে, এবং সেই কলহের সুযোগ নিয়ে পুরোনো পাপীরা আবার নতুন করে ক্ষমতা দখল করে বসবে।

কিন্তু ফলাফল যখন উল্টো হয়ে গেল তখন আবার চক্রান্তে লিপ্ত হলো ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারক-বাহক পাকিস্তানের শসকচক্র। আবার সেই পুরনো বিভেদের রাজনীতির দাবা খেলা শুরু করল তারা। এবং এই দাবা দেখার সুযোগ্য সহযোগী হিসেবে ভুট্টো আর কাইউম খান দুজনেই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রকারীদের গোত্রভুক্ত।

খান আবদুল কাইউম খান হলেন সেই হিংস্র বর্বর রাজনীতিবিদ যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে গণহত্যা আর জেল-জুলুমের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলে পরিণত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

আর জুলফিকার আলী ভুট্টো হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র হিসেবে তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন ছয়-দফার প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন। পরে আইয়ুব খানের সভাসদের দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সহসা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচাতে থাকেন। আজলে তিনি একজন চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, বৃহৎ ভূস্বামী।

ভুট্টো আর কাইউম খানকে দলে টেনে নিজেদের শক্তিশালী করলেন শাসকচক্র। তাঁরা দেখলেন পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। তাদেরকে যদি চিরতরে দাবিয়ে দেয়া যায় তাহলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকেও বানচাল করে দেয়া যাবে- এক ঢিলে চার পাখি মারতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

তাই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকচক্র নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে, ভুট্টো ও কাইউম খানের মাধ্যমে, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মাটিতে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা সামাজিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর চেষ্টাও করলেন তাঁরা- তাঁদের অনুচর মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামের দালালদের মাধ্যমে। কিন্তু, পূর্ব বাংলার সদাসচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় শাসকচক্র আবার বিপদে পড়ে গেলেন।

তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর মুখোশের কিছুটা খুলতে বাধ্য হলেন। শাসকচক্রের কলের পুতুল ভুট্টো হঠাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন, জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিতে হবে, নইলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন তিনি। তিনি জানালেন, জাতীয়

পরিষদের সভা বসার আগে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও ক্ষমতার বিলিবন্টন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হবে। তা না করা পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা হবে না।

এই ধরনের একটি অযৌক্তিক দাবি ও অন্যায় আবদার গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল হলেও এটাই ছিল শাসকচক্রের চক্রান্তের আসল চেহারা-গোপন বৈঠক ও আলোচনায় স্থির করা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইয়াহিয়া খান যে এই সিদ্ধান্তের অন্যতম ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ভুট্টোর হুমকির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের ৩রা মার্চে আহূত সভা কোনো কারণ না দেখিয়েই অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুতলবী ঘোষণা করে দিলেন- যদিও জাতীয় পরিণষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য তখন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ঢাকা এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কাইউম খান ও ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য সব দলের সদস্যরা ছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের এই হঠকারী ঘোষণা স্বাধিকারকামী পূর্ব বাংলার জনগণের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল। শাসকচক্রের চক্রান্তের কথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না।

আওয়ামী লাগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে শান্তিপূর্ণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানালেন। জনগণ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করল। ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী এই অহিংস জনতার ওপর বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করল। সহসা ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে একরাতে তাঁর বর্বর সৈন্যেরা প্রায় দু-হাজার দেশপ্রেমিককে খুন করলো। কিন্তু এই প্ররোচনার মুখেও শেখ মুজিবর রহমান জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানালেন। জনগণ শান্ত রইল। তখন শাসকচক্রের ভাড়াটে দালালরা পূর্ব বাংলায় বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটা দাঙ্গা বাধাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এ সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন- পূর্ব বাংলার বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, বাঙালী-অবাঙালী সবাই সমান অধিকারের দাবিদার, সবাই পরস্পরের ভাই। শাসকচক্র দাঙ্গা বাধাতে টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ও গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করে ঢাকায় পাঠান হলো।

জেনারেল টিক্কা খান হচ্ছেন সেই জেনারেল- যিনি বেলুচিস্তানের নিরীহ জনগণ যখন ঈদের নামাজে অংশ নেওয়ার জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁদের ওপরে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে কয়েক'শ বালুচকে হত্যা করেন। সেই টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলায় পাঠানো তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টিক্কা খান এলেন এবং তার কিছুদিন পরে ইয়াহিয়া খানও দলবল নিয়ে এলেন ঢাকায়। ১৬ই মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। মুখে আলোচনার বাণী। এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত আর অন্যদিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক বিরাট সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ইয়াহিয়া খান আর সামরিক 'জুন্টা'র প্রধানরা।

জল এবং বিমান পথ হাজার হাজার সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব বাংলার মাটিতে। সামরিক নিবাসগুলোকে আরও সুদৃঢ় করলেন। ঢাকা সৈন্যশিবির ও বিমানপোতের চারপাশে অসংখ্য বিমানধ্বংসী কামান বসান হলো। মেশিনগান বসান হলো বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে। একদিকে আলোচনার প্রহসন চলল আর অন্যদিকে চলল দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি।

২৫ শে মার্চ, ১৯৭১

এল সেইদিন, যে-দিনটির জন্যে পাকিস্তানের শাসকচক্র ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ থেকে অপেক্ষা করছিল রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যাবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং যাবার আগে তার বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষ নিধনযজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো। ট্যাঙ্ক, মেশিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করল তারা।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী, পুরুষ, দুগ্ধপোষ্য শিশু, ছাত্র, কেরানী, বুদ্ধিজীবী-কেউ বাদ গেল না তাদের এই নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে। ইয়াহিয়া খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়ালডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিল।

মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে অসহায় বাংলার মেহনতি মানুষ আর দুর্জয় মনোবল আর তার সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে। বাংলার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, আনসার আর পুলিশ বাহিনী তাদের মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্যে অস্ত্র তুলে নিল হাতে। আর অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে পুরো দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করতে লাগল।

হিংসার এই উন্মত্তার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠন ছাড়া আর অন্য কোনো পথ রইল না। বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিরা তাই মুজিবনগরে সমবেত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

পাকিস্তান এখন বাংলাদেশের মানুষের কাছে মৃত।

পাকিস্তানের এই অপমৃত্যুর জন্যে বাংলাদেশের মানুষ দায়ী হয়। দায়ী পাকিস্তানের শাসকচক্র, যারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নকে লক্ষ লক্ষ লাশের নীচে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। পাকিস্তানের এই মৃত্যুর জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলও দায়ী নয়। দায়ী লিয়াকত আলী খান থেকে শুরু করে গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ইস্কান্দার মীর্জা, খাজা শাহাবুদ্দিন, খান আবদুল কাইউম খান, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সবুর খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান আর জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা-মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীর দল- যারা গত চব্বিশ বছর ধরে পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে।

বাংলাদেশ এখন প্রতিটি বাঙ্গালীর প্রাণ।

বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না।

সেখানে তারা গড়ে তুলবে এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে মানুষ প্রাণ ভরে হাসতে পারবে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ছে।

লড়ছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক পেশাদার বাহিনীর সঙ্গে। লড়ছে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবনকে অর্জন করার জন্য।

বাংলার মানুষের এইমুক্তির লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত অঞ্চলের মেহনতি মানুষকেও শোষণমুক্ত হবার প্রেরণা যোগাবে।

(জহির রায়হান রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
৯। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত রণাঙ্গন সম্পর্কিত কয়েকটি কথিকা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-এর দলিলপত্র	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১

দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

এক

মুজিবনগরে এসেছিলাম প্রায় দু'মাস আগে। তাই এ দু'মাস শুধু পরের মুখেই শুনেছি দেশের দখলীকৃত এলাকার কথা। শুনেছি পশ্চিম পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর গণহত্যা, নির্মম অত্যাচার, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের লোমহর্ষক কাহিনী। তাই, মনে মনে ভাবছিলাম একবার বাড়ি যাব। স্বচক্ষে দেখে আসব দেশের ও দশের অবস্থা। পারলে ওদেরকে একটু প্রবোধও দিয়ে আসব। আর বলে আসব 'তোমাদের মুক্তির দিন আগত প্রায়।'

কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হয় না। প্রথমত, আমি যে দায়িত্বে ন্যস্ত তা কার হাতে দিয়ে যাই। তার ব্যবস্থাও যখন করলাম তখন দেখা দিল নতুন ফ্যাসাদ। বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাংক্ষীদের দু'একজন ছাড়া সবাই নিষেধ করে বললেন, 'গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। ওরা পেলে আপনাকে গুলি করে মারবে।'

তবু সব উপেক্ষা করে একদিন রওয়ানা দিলাম, অতি ভোরে। হাঁটতে হাঁটতে সকাল ১১টা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। বন-জঙ্গল ও গাছপালার ঘেরা একটা ছোট্ট গ্রাম। তারই মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে এই ক্যাম্প। বাড়িটার চারদিকে এক মাইলের মধ্যে নেই আর কোন বাড়িঘর। তবে এলাকাটা এমন জনমানবহীন সব সময় ছিল না। সোনার বাংলাকে দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণে যারা শ্মশানে পরিণত করেছে, তাদেরই লেলিয়ে দেওয়া খুনী সৈন্যরা গত এপ্রিল মাসে সমগ্র এলাকাটিকে উজাড় করে দিয়েছে। বহু লোককে ওরা গুলি করে মেরেছে, প্রায় সমস্ত বাড়িঘর ওরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই এসবের পরও যারা বেঁচে ছিল তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

ক্যাম্পের কাছে যেতেই কে একজন 'হল্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ডানে তাকিয়ে দেখি রাইফেল হাতে একজন তরণ। সম্ভবত কয়েক মাস আগে সে কোন কলেজে পড়ত। কাছে এসেই জিজ্ঞেস করল, আমি কে এবং কি জন্য ওখানে গিয়েছি। বললাম, আপনাদের কম্যাণ্ডার সাহেবের সাথে দেখা করব, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে।

সৈনিক আমাকে দাঁড়িয়ে রেখে আরেকজনকে ডেকে আনতে গেল, কয়েক কদম আগে। মধ্য-বয়সের দ্বিতীয় লোকটি কাছে এসে অতি বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন আমার পরিচয় এবং কম্যাণ্ডার সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের কি প্রয়োজন। তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দানের পর তিনি আমাকে একটা গাছের গোড়ায় বাঁশের চটায় তৈরী একটা বেঞ্চিতে বসতে বলে ভেতরে গেলেন। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে আমাকে কম্যাণ্ডার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

র‍্যাঙ্ক তার ক্যাপ্টেন বটে, কিন্তু তিনি হলেন ঐ ক্যাম্পের সর্বাধিনায়ক। আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধ করছেন তারই নির্দেশে। সারাদিন সারারাত বসে বসে তিনি খবরাখবর নেন শত্রুর

গতিবিধির। তারপর স্ট্রাটেজী ঠিক করে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠান এ্যাকশনে, মাঝে মাঝে তিনি নিজেও এ্যাকশনে যান, তবে তা নির্ভর করে এ্যাকশনের গুরুত্বের উপর।

দোহারা চেহারার লোক এই ক্যাপ্টেন বা কম্যাণ্ডার। তাকে আগে কোথায় দেখেছি বলে আবছা আবছা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। তবে তিনি আমাকে দেখেই বলে ফেললেন। বললেন, রহমতের খবর কি? বললাম, ২৩শে মার্চ পর্যন্ত তার খবর জানতাম। বিজলীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে সে সময় রহমত ঢাকায় ছিল। তারপর আর কিছু জানি না। সাথে সাথে মনে পড়ল এ ক্যাপ্টেনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে দেখেছি। তখন তিনি ছাত্রলীগ করতেন। দেখেছি প্রতিটি আন্দোলনে, প্রতিটি মিছিলের পুরোভাগে। তাছাড়া, তাকে দেখেছি সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের টেবিলে। কলেজ ছাত্র সংসদের খবর নিয়ে তিনি যেতেন রিপোর্টারদের কাছে।

বললাম, আপনি ত ডাক্তার হয়েছেন, শুনেছি আর্মি মেডিক্যাল কোরে গিয়েছেন। আর এখন দেখছি কম্যাণ্ডারগিরি করছেন। হেসে বললেন, ‘এখন দরকার এ্যাকশনের, যুদ্ধের। তাই জল্লাদের আর্মি মেডিক্যাল কোর থেকে পালিয়ে এসে যুদ্ধে নেমেছি।’.......

মার্চ-এপ্রিলের মত আজ আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা আনাড়ী যোদ্ধা নয়। তারা আজ পুরাপুরি ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তারা আজ মেশিনগান চালাতে পারে, মর্টার চালাতে পারে এবং গ্রেনেড ও ডিনামাইট ব্যবহার করতে পারে। প্রয়েজনীয় অস্ত্র হাতে থাকলে এদের দশজন অন্তত একশো-দুশো শত্রুসেনাকে ঘায়েল করতে পারে।

ক্যাপ্টেন ও তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করে দেখলাম ওরা নির্ভয়, মৃত্যুকে ওরা আজ পরোয়া করে না। মৃত্যুর সাথে ওরা আজ পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত। কথাটা ক্যাপ্টেন নিজেও আমাকে এক পর্যায়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ওদের নিয়ে আমাকে অসুবিধায়ও পড়তে হয় অনেক। বাঘ যেমন নরমাংসের গন্ধ পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তেমনি ওরাও কোনস্থানে শত্রুপক্ষের উপস্থিতির খবর পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শত্রুর কাছে কি অস্ত্র আছে আর ওদের কাছে কি আছে তার বাছবিচার ওরা করতে চায় না।’

ক্যাম্প থেকে ফিরে আসছি, এমন অতি পরিচিত একজন মুক্তিযোদ্ধা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘আচ্ছা মতিন ভাই, আমাদের মুজিব ভাই কি বেঁচে আছেন? ওনাকে কি ফিরে পাব?’’

এ প্রশ্নে নতুনত্বের কিছু ছিল না। এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিন অসংখ্যবার। তবু তাকে বললাম, তিনি ত বলে গেছেন, তিনি হুকুম দিতে না পারলেও যেন আমরা নিজ নিজ কর্তব্য করে যাই। সুতরাং বর্তমান সময় ওসব বিচার না করে তিনি যা চেয়েছিলেন তা সমাধা করায় আত্মনিয়োগ করাই কি শ্রেয় নয়?’

তিনি বললেন, ‘তা ত ঠিক। আমরা তাই করছি এবং করে যাব। প্রয়োজনবোধে প্রাণ দেব। কিন্তু মুজিব ভাইকে ছাড়া যে বাংলাদেশের অস্তিত্বই চিন্তা করতে পারি না! জানেন, আমার বাবা ও দুই ভাইকে ঘাতকরা হত্যা করেছে। তবু বেঁচে আছি। কিন্তু মুজিব ভাইকে হারালে যে বাঁচতে পারব না।’

দুই

......সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

ক্যাম্পে কিছু সময় কাটানোর পর ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে একজন সুবেদার মেজরের হাওলা করে দিয়ে বললেনঃ ‘ওনার সাথে কথা বলুন, আমরা শিকারে যাচ্ছি।’

সুবেদার মেজর ৩৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক। কয়েক বছর আগে বাঙালীর গৌরব বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢুকেছিলেন একজন সৈনিক হিসাবে। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ছিলেন যশোর ক্যান্টমেন্টে। তারপর থেকে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছেন দখলকার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি জানেন না, তাঁর পরিবারের কে আজ বেঁচে আছে আর কে বেঁচে নেই। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন ''পরাধীন জাতি হিসাবে বাঙালীদের বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? পশ্চিমারা যেভাবে জাতি হিসাবে আমাদের অপমান করেছে, সর্বনাশ করেছে- তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আর সব কথার সেরা কথা বাংলাদেশকে শত্রুকবলমুক্ত করতেই হবে। তারপর বাপ-ভাই-এর অভাব হবে না বাংলাদেশে।''

অবাক হয়ে ভাবলেন এই আধাশিক্ষিত লোকটির কথা। কি অসীম দৃঢ়তা! কি গভীর আত্মপ্রত্যয় বিরাজ করছে তার মাঝে! বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বাঙালীর অপমানের প্রতিশোধই আজ তার কাছে বড়। নিজের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-পুত্রদের বেঁচে থাকা না থাকার প্রশ্নটি আজ তার কাছে গৌণ।

এতদিন পরে বুঝতে পারলাম কি করে যশোর ক্যান্টনমেন্টে মাত্র দুই কোম্পানী বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের অন্ততঃ ৫/৭ গুণ শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও যুদ্ধ করতে করতে পথ করে নিতে পেয়েছিলেন। সেদিন তাদের পাঞ্জাবী-অধিকর্তা লেঃ কর্নেল বেঈমানী করেছিল। ষড়যন্ত্র করে সন্ধ্যার সময় অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু এরা বাঙালীর জাতশত্রুদের হুকুম মোতাবেক আত্মসমর্পণ করেনি। অন্যান্য বাঙালী অফিসারদের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করেছে। একজনের প্রাণের বদলে ১০ জনের প্রাণ নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুবেদার মেজরের কাছে শুনলাম ক্যাপ্টেনের পশু-শিকারে যাওয়ার কাহিনী। তিনি বললেন, 'একটু আগেই খবর এসেছে ৪০-৫০ জন খানসেনা এসে আস্তানা গেড়েছে। গত রাতেও তারা নাকি ওখানে ছিল। আজ রাতে ওদেরকে দলবলে খতম করতে হবে। স্থানটাও এখান থেকে বেশ দূরে। তাই ক্যাপ্টেন জন পনেরো মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে এখনই রওয়ানা হতে যাচ্ছেন।'

বললাম, '৪০-৫০ জন সুদক্ষ শত্রুসৈন্যের মোকাবেলায় আমাদের ত আরও বেশী মুক্তিযোদ্ধা যাওয়া দরকার।'

তিনি হেসে দিয়ে বললেন, 'না, না, তা মোটেই নয়। আমাদের ১৫ জনই ওদের ৫০ জনের মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট। ইনশাআল্লাহ, ঐ ১৫ জনের হাতেই ওদের অন্ততঃ ৩০ জন খতম হবে এবং অন্যরা কুকুরের মত পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে।'

কথা প্রসঙ্গে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম উভয় পক্ষের হতাহতের তুলনামূলক হার। তিনি একটা রেকর্ড বের করে বললেনঃ হতাহতের হার হচ্ছে ১:৫০- অর্থাৎ গড়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার বদলে ৫০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আমি বললাম, 'এমনটা কি করে সম্ভব? যুদ্ধে দু'পক্ষের হতাহতের এমনতর অনুপাতের কথা ত কোনদিন শুনিনি।'

জবাবে তিনি বললেনঃ 'আমরাও আগে শুনিনি। কিন্তু এখন নিজের চোখে দেখছি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ওদের খতম করা। আর ওদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণে বাঁচা। তাই, প্রাণের বাঁচার তাগিদে ওরা এখন আর আমাদের সাথে যুদ্ধই করতে পারছে না, আর কোনদিন পারবেও না।''.........

সুবেদার মেজরের সাথে কথা বলার সময় সেখানে এসে হাজির হলেন একজন তরুণ পূর্বতন সি-এস-পি অফিসার। কয়েক মাস আগেও তিনি ছিলেন কোন এক মহকুমার প্রশাসক।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফশার্ট, পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যাণ্ডেল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার এ অবস্থা কেন? জবাবে জানালেন, 'এর চেয়ে বেশী যোগাড় করাও সম্ভব নয়। তদুপরি, আমার সহমুক্তিযোদ্ধারা যেখানে এক-কাপড়, এক-জামায় দিন কাটাচ্ছেন সেখানে কারো পক্ষে কি বিলাসিতা শোভা পায়?'

ভদ্রলোক চলে গেলে সুবেদার মেজরের কাছে সব শুনতে পেলাম। সাবেক মহকুমা প্রশাসক আজ একজন মুক্তিসেনা হিসাবে কাজ করছেন। আর দশজন যেখানে থাকেন, যা খান- তিনিও সেভাবে থাকেন, খান।

এসব শুনে ভাবতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পরলাম। সুবেদার মেজর কিছুক্ষণ পর বললেনঃ এত কি ভাবছেন? সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, ভাবছিলাম ওই ভদ্রলোকের কথা।

একটি মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন তিনি মাত্র সেদিনও। আমরা যারা যুদ্ধ করি, সাংবাদিকতা করি অথবা যারা রাজনীতি করেন তারা ত বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়েই ওসব পেশা গ্রহণ করেছিলাম। শেখ সাহেবের যে বিচার প্রহসন হতে পারে তা তিনি নিজেও জানতেন। কিন্তু এরা? এরা ত ছিলেন পাকিস্তান সরকারের সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত কর্মচারী। রাজনীতি ছিল এদের জন্য নিষিদ্ধ। এরা ইচ্ছে করলে মুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে পারতেন। কিন্তু এরা নিজেদের আলাদাভাবে ভাবতে পারেননি। ভেবেছেন জাতির একজন হিসাবে। তাই জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মুক্তিসংগ্রামে। সত্য বলতে কি, এই দায়িত্ববোধের আদর্শই বর্তমান মুক্তিসংগ্রামের সবচেয়ে মূল্যবান পাথেয়।

তিন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে বের হয়ে পড়লাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। বেলা তখন সাড়ে ১২টা। পথ রয়েছে ২২ মাইল। অথচ সোজাপথে গেলে এ দূরত্ব অর্ধেকে হ্রাস করা সম্ভব ছিল।

যাত্রার সময় সুবেদার মেজর আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন সামনের কতিপয় এলাকা সম্পর্কে। কেননা ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনী ও শত্রুপক্ষ তখন সক্রিয় ছিল। তবে তিনি আমার সাথে একজন গাইডও দিয়েছিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়।

মাঠ-ঘাট পেরিয়ে মাইল তিনেক যাওয়ার পর আমরা একটা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। চারদিকে তাকিয়ে আমি জঙ্গল আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। মাত্র মিনিট তিনেক সময়ের ব্যবধান। তারপরই ১৮-১৯ বছরের এক যুবককে সাথে নিয়ে আসলেন। আমাকে নিয়ে রওনা হলো সেই তরুণ সঙ্গী।

আমরা দুজন চলছি। তরুণ চললো আগে আগে, আমি তার পেছনে পেছনে। তরুণকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র। এখন মুক্তিবাহিনীতে কাজ করছে। যশোর জেলায় তার বাড়ি। বহু আগেই বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে ছিলো বিধবা মা আর ভাইবোন। গত এপ্রিল মাসে পাকিস্তানী সৈন্যরা তার কলেজে পড়া বোনকে ধরে নিয়ে যায়। ছোটভাই তাতে বাধা দিলে তাকে গুলি করে হত্যা করে। অবশ্য পরে ছোট বোনটিকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, বাড়ি থেকে দূরে। এই খবর পেয়ে সে যখন বাড়ি গিয়েছিলো তার

শোকাহতা মা নাকি তাকে বলেছিলেনঃ বাবা তুই যদি আমার সন্তান হোস, তাহলে এই ঘৃণ্য অপরাধের যোগ্য প্রতিশোধ তুই নিবি। যা, এক্ষুনি বের হয়ে পড়- মা-বোনদের অপমানের প্রতিশোধ তোকে নিতেই হবে।

মায়ের দোয়া মাথায় নিয়ে সেই সে তরুণ ছাত্রটি বেরিয়ে এসেছে, আর ঘরে ফেরেনি। এরপর মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ছোট ভাইবোনের হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে। নিজের হাতে হত্যা করেছে পাঁচজন খান সেনাকে। তবু তার শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। যেদিন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ মুক্ত হবে, বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে উড়বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় পতাকা, সেদিনই হবে তার সত্যিকারের প্রতিশোধ নেওয়া।

মাতৃভূমির স্বাধীনতাযুদ্ধের সেই বীর সৈনিকের নিষ্ঠা ও অবিচলতার প্রমাণ তার কথা থেকেই। অমিততেজ বাঙালী তরুণ আমাকে বললঃ দেখুন, যারা আমার বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছিলো, আমিও পেয়েছিলাম তাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করার সুযোগ; কিন্তু তা আমি করিনি। তা আমি করতে পারি না। সহকর্মীদেরও এমন অপকর্ম থেকে নিবৃত করেছিলাম- কেননা আমরা যে পাশবিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছি। ওরা পশু, ওরাই পারে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মানবিক মূল্যবোধকে পদদলিত করতে- আমরা তা করতে পারি না।

আমরা একটা বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঠের এখানে সেখানে লোকজন কাজ করছে। কেউ ধান কাটছে, কেউ ঘাস তুলছে ক্ষেত থেকে। একটা পাটক্ষেতের আড়ালে কজন ক্ষেতচাষী ধানখেত থেকে ঘাস তুলছে। তাদের দিকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ আমাকে বললো, ওরা আমাদেরই লোক। আরো বললো- বাংলাদেশের মুক্তিসেনারা এমনি করে ছড়িয়ে আছে গ্রাম-গ্রামান্তরে বাংলার মাঠে-ঘাটে সর্বত্র। ঐ যে সামনে নদীটা দেখছেন তার ওপারেই রয়েছে একটা বাজার। বাজারে আগে পাকিস্তানী সৈন্যের ঘাটি ছিলো। তাদের সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বেশীরভাগ খানসেনা মারা পড়েছে। আর যারা বেঁচে ছিলো তারা সবাই প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়েছে। তারপর বহুদিন এদিক আর ওরা আসেনি। কিন্তু গতকাল নাকি একটা দল এসেছিলো। শুনেছি আজো আবার আসতে পারে। তাই আমাদের মুক্তিসেনারা পশুদের যোগ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

খানিকটা সামনেই ছিলো নদী পারাপারের খেয়া। খেয়াঘাটে গিয়ে পাটনীর সাথে কিছু কথা বলে তরুণ বিদায় নিলো। অতপর তীরে গিয়ে আমি নেমে পড়লাম। পাটনীও আমার পেছনে পেছনে নেমে পড়লো। সে আমাকে নির্দিষ্ট একটা রাস্তা এড়িয়ে যেতে বললো। আমি যখন সেই বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, আনন্দে তখন আমার বুকটা ভরে উঠলো। সেখানে সবগুলো দোকানেই উড়ছিলো স্বাধীন বাংলার পতাকা। নিজের মনেই খানিক দাঁড়িয়ে গেলাম। সেখানে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। বললাম : সালাম, আমার স্বাধীন বাংলার বিজয় পতাকা, তোমাকে সালাম।

আরো মাইল তিনেক এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে বর্বর পাকিস্তানী সেনাদের পাশবিকতার চিহ্ন। চারদিক ধ্বংসের ছাপ লেগে আছে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড, আগুনে জ্বালিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম লণ্ডভণ্ড করেছে কতো সুখের সংসার। খুব পিপাসা পেয়েছিলো। বারান্দায় এক বৃদ্ধকে দেখে এগিয়ে গেলাম। বললাম, বুড়িমা পানি খাবো। বৃদ্ধার বয়স ৭০/৭৫ হবে। একটা ছেলেকে পানি আনতে বলে তার দুঃখের কথা শুরু করলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে এসেছি। বলাম মুজিবনগর থেকে। বাড়ি যাবো।

'বাড়ি যাবো' এ কথাটা শুনেই বৃদ্ধা আঁৎক উঠলেন, বললেন- বাড়ি যেয়োনা, পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলবে, ওরা মানুষ নয়, ওরা পশু। দেখছো না, আমার ঘর খালি। আমার সোনার ছেলেদের ওরা হত্যা করেছে। আমার আর কেউ নেই বাবা। তবু আমি কেনো যে বেঁচে রইলাম। বলতে বলতে বৃদ্ধা আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বললাম-বুড়িমা কাঁদবেন না। আপনার ছেলে গেছে, আমরা রয়েছি তো আপনার সন্তান- আপনার আরো কতো সোনার ছেলে দেশের জন্যে যুদ্ধ করছে, তাদের দোয়া করুন।

পানি খেয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, বৃদ্ধা বললেন- আচ্ছা বাবা বল তো, ঐ যে আমরা ভোট দিয়েছিলাম, সেই মুজিবর ভালো আছে তো? সে বেঁচে থাকলে এর শোধ নেবেই।

দেখলাম গ্রামের সাধারণ বৃদ্ধাও বঙ্গবন্ধুর খবর রাখে- তার হৃদয়ে রয়েছে তার জন্যে অফুরন্ত দরদ। আরো অবাক হলাম এ ভেবে, যে দেশে এমন বৃদ্ধা রয়েছে সে দেশের ছেলেরা বীর সৈনিক না হয়েই পারে না।

এরপর যেখানে গেলাম সেটি যশোরের প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মশিউর রহমানের নির্বচনী এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব। কোথাও কোনো মানুষ দেখা গোল না। এই জনশূন্য পথে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার উপর একটি লোকের সাথে দেখা। ২৭/২৮ বছরের লোকটির মুখে দাড়ি। পরনে পাঞ্জাবি। দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে লোকটি সম্ভবত জামাতপন্থী কেউ হবেন। দু'জন পাশাপাশি চলছি, কারো মুখে কোনো কথা নেই। আরো কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে নিতান্ত কৌতূহল ও উদ্বেগ বশেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, মশিউর রহমান সাহেবের খবর কি?' প্রশ্ন করেই নিজের মনেই শংকিত হলাম কি জানি কি হয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনে লোকটি আমার দিকে এমন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন যে তাকে দেখে মনে হবে তিনি যেন কোন ভাবনার সাগরে ডুবে আছেন। সারা চোখ-মুখে তার উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হয়তো এক্ষুনি দু'চোখ বেয়ে নামবে অশ্রুর বন্যা।

ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এমন বিচলিত হলেন কেনো? তাকিয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা সেই অপরিচিত লোকটির চোখ বেয়ে তখন অশ্রু পড়াতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে আমাকে বললেনঃ দেখুন, শেখ সাহেব কিংবা মশিউর রহমানের কথা তো কেউ এমন প্রকাশ্যে বলাবলি করতে সাহস করে না। তাই আপনার কথা শুনে আমার অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আপনি বোধ হয় এ এলাকায় নতুন এসেছেন?

পরে আলাপে জানতে পারলাম লোকটি স্থানীয় একটি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্যে প্রাণপণ খেটেছেন। মাইল খানেক একসাথে গিয়ে তিনি ভিন্ন রাস্তায় চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলেন যেন প্রকাশ্যে এমন কথা আর কাউকে আমি জিজ্ঞেস না করি।

মশিউর রহমানের পৈত্রিক গ্রাম সিংহঝুলি। সেখানে গড়ে উঠেছে ছোটখাটো একটা উপশহর। তার উপর দিয়ে চলে গেছে যশোর-চৌগাছা সি এণ্ড বি রোড। রোড থেকে মাত্র এক মাইল দূরে আছি। সি এণ্ড বি রোড পার হবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি-হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো একটি লোক। বললো, বসে পড়ুন সাহেব, বসে পড়ুন। ঐ যে মিলিটারীর গাড়ি আসছে যশোরের দিক থেকে। লোকটি একরকম জোর করে আমাকে রাস্তার একপাশে বসিয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাজারের উপর। গাড়ির গতি থামলো মাত্র মিনিট খানেকের জন্যে। চারদিকে একবার নজর করে ভোঁ করে চৌগাছার দিকে ছুটে চললো তারা।

লোকটির কাছেই শুনলাম, ঐ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর হাতে বারবার প্রচণ্ড মার খেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা আজকাল এদিকে বড়ো একটা এগুতে সাহস করে না। যদিওবা আসে একদণ্ড অপেক্ষা করার ভরসা পায় না।

মিলিটারীর গাড়িগুলো চলে যাওয়ার সংগে সংগে আমি তাড়াতাড়ি সি এণ্ড বি সড়ক পাড়ি দিলাম। যাবার সময় দু'পাশে তাকিয়ে দেখলাম ধ্বংসস্তুপের সীমাহীন চিহ্নরাশি। সারা বাজারের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়িই হার্মাদ

দস্যুরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর জনাব মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ি তো ছিলো এই দস্যুদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। সুতরাং সে বাড়ির যে কিছুই অক্ষত থাকবে না তা বলাই বাহুল্য।

রাত তখন সাড়ে আটটার মতো হবে। কোথায় রাত কাটাবো ঠিক করে উঠতে পারছি না। একজনকে রাত কাটানোর অনুরোধ জানালে দেখিয়ে দিলেন স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের বাড়ি। তবে একথাও শুনলাম ঐ সদস্য আগে জামাতে ইসলামীর লোক ছিলেন। সোজা গেলাম তার বাড়িতে। ডেকে বললাম, আমি আপনার এখানে রাত কাটাতে চাই, আমাকে থাকতে দিতে হবে। আর যদি আমাকে মিলিটারীর বা রাজাকারের হাতে তুলে দিতে চান, তাও করতে পারেন। তবে তার আগে খেতে দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন বড়ো বেশি ক্ষুধার্ত।

ভদ্রলোক ছোট ভাইকে ডেকে আমার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি আগে জামাতপন্থী ছিলাম। কিন্তু গতকাল থেকে আমি বাঙালী এবং এখন এটাই আমার একমাত্র পরিচয়। জানেন, গতকাল মিলিটারী আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি এসে তাকে ২০টি যুবক ও কয়েকটা মেয়ে সংগ্রহ করে দিতে বলে। তিনি দুইদিনের সময় চেয়েছিলেন মাত্র। তারপর সৈন্যরা তার বাড়িতে ঢুকে চেয়ারম্যান সাহেবের পুত্রবধু ও যুবতী মেয়েকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বুঝতেই পারছেন। বলতে বলতে মুহূর্তে ভদ্রলোকের মুখ-চোখের লক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে গেলো। দেখলাম, তার সারা মুখে ঘৃণা ও গ্লানির চিহ্ন পরিস্ফুট। বাঙালী কি আর ভাইয়ের অপমান সইতে পারে?

চার

৩ অক্টোবর, ১৯৭১

মেম্বার সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল। তথাকথিত ইসলাম-দরদীদের বর্বর মানবতাবিরোধী কাজই যে জামাতপন্থী এ মানুষটিকে সত্যিকারের বাঙালীতে পরিণত করেছে তার কথাবার্তায় তা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষটির কথাবার্তা থেকে আরো বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিটি গুলি, প্রতিটি অত্যাচার বাঙালীর ঐক্যকে দিন দিন সুদৃঢ় করে তুলেছে।

গালগল্প শেষ করে যখন শুয়ে পড়লাম তখন রাত প্রায় ১টা। চোখে তন্দ্রার ভাব আসলেও পুরোপুরি ঘুম বলতে যা বুঝায় তা তখনও আসেনি। এমনি সময়ে গগনবিদারী একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চমকে উঠলাম। এটা যে মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের কাজ তা বুঝতে বাকী থাকল না। তবে কোথায় তারা এ বিস্ফোরণ দ্বারা কি নষ্ট করেছে তা তখনও জানতে পারলাম না। এরই কয়েক মিনিট পরে রেললাইনের দিকে আরেকটি প্রচণ্ড শব্দ হল। পরের দিন ভোরে জানতে পারলাম গেরিলারা সিংহঝুলির কাছে জোড়াপুলটি উড়িয়ে দিয়েছে। যশোর থেকে চৌগাছায় সৈন্য আনা-নেওয়ার জন্য এ পুলটির গুরুত্ব ছিল অনেক। আর দ্বিতীয় বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানা গেল যে তা দিয়ে গেরিলারা একটি মালগাড়িসহ রেললাইন উড়িয়ে দিয়েছে। মালগাড়ির পাহারাদার কয়েকজন রাজাকার প্রাণ হারিয়েছে।

সকাল তখন প্রায় ৮টা। আমি মেম্বার সাহেবের বাড়ি ছেড়ে নিজের পথে বের হয়ে পড়বো ঠিক এ সময়ে ঐখান থেকে মাইল চারেক দূরে শুরু হল মর্টার ও মেশিনগানের গোলা বর্ষণ। গোলা বর্ষণ চলছে তো চলছেই। থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাই ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত মেম্বার সাহেব আমাকে ঘরের বাইরে পা দিতে নিষেধ করলেন। ইত্যবসরে একটা সাহসী তরুণকে পাঠান হল ব্যাপারটা জেনে আসতে। ঘণ্টা দু'এক পরে তরুণ এসে যা জানাল তা হচ্ছেঃ প্রত্যুষের দিকে কে বা কারা যশোর-ঝিনাইদহ রাস্তার এক জায়গায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে গেছে। স্থানীয় রাজাকাররা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে খবর দিলে তারা পতাকা থেকে মাইল তিনেক দূরে এসে অবস্থান নেয় এবং সেখান থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করে। পতাকা যেখানে উড়ান

হয়েছে তার আশেপাশে কোথাও হয়তো মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে- এ ভয়েই পাঞ্জাবী সৈন্যরা ঘটনাস্থলের তিন মাইল দূর থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করে।

যাহোক, সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তারা অবিরাম গোলাবর্ষণ করে কল্পিত শত্রুর উদ্দেশে। তারপর রাস্তার দু'পাশে ও সামনে গোলাগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এগিয়ে এল ঘটনাস্থলে। এতে প্রায় আরও ১ ঘণ্টা সময়। পতাকাটা তখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে থেকে পতপত করে করে মুক্তির গান গাইছিল। কিন্তু মানবতার দুশমন পাঞ্জাবী সৈন্যরা তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুজি করেও কোন মুক্তিসেনাকে জীবন্ত বা মৃত খুঁজে পেলনা। কিন্তু তবুও ক্যান্টানমেন্ট গিয়ে যে নিজেদের বীরত্বের কাহিনী ঢাকায় নিয়াজীর কাছে পাঠাতে হবে- তাই তারা কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে।

সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ৪ঘণ্টা সময়ে শুধু মাত্র কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে কত হাজার রাউণ্ড গোলা-গুলি অপচয় করেছে এবং তার মূল্যই বা কত হাজার বা কত লাখ টাকা তা কেবল সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে তা হল নিজেদের টাকায় কিনতে হলে অথবা অন্যের কাছ থেকে না পেলে কি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এমনভাবে গোলাগুলির অপচয় করতে পারত?

জবাবও আমি নিজের কাছ থেকে পেয়েছি। নিশ্চয়ই তারা এমনটা পারত না।

আমি আরো ভেবে দেখেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সামরিক জান্তা এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ করেছে। বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে দুদিন আগে বা পরে তল্পীতল্পা গুটিয়ে যেতে হবে। সেদিন হয়ত বর্তমান জান্তা ক্ষমতায় থাকবে না- যেমন নাই আইয়ুব ভুট্টোর চক্র। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষকে যে এ টাকা সুদে আসলেই শোধ করতে হবে। বাংলাদেশের সোনালী সূত্র-পাট বেচা টাকা ছাড়া যে এ কাজ কত দুঃ সাধ্য হবে তা আমরা যেমন জানি, তারাও তেমনি জানে। তার প্রমাণ ইতি মধ্যেই মিলেছে। যুদ্ধের তিন মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই সামরিক জান্তাকে সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঋণের কিস্তি পারিশোধের ব্যাপারে নিজেদের অপারগতার কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। নতুন ঋণের জন্য নাকে খৎ দিতে হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ধর্ণা দিতে হয়েছে রাজধানীতে রাজধানীতে। সুতারাং যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হলে তাদের পক্ষ নিজেদের সগৌরবে দেউলিয়া ঘোষণা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।...

(মতিন আহমেদ চৌধুরী রচিত)

মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে

৪ অক্টোবর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ছমাস পূর্তি হয়েছে গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই ছমাসে মুক্তিযুদ্ধ কতটা এগিয়েছে তার খতিয়ান নিতে গেলে দেখা যাবে আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। বরং বাংলাদেশের বর্ষণমুক্ত শারদ আকাশের মতই বাংলার মুক্তিযুদ্ধও এক সফল ও প্রসন্ন প্রভাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পথ আমাদের দুর্গম। যাত্রাপথও বিপদসঙ্কুল। তবুও এই যাত্রাশেষে স্বাধীনতা ও মুক্তির সোনালী ঊষা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এই দৃঢ়বিশ্বাসে আজ আমাদের বুক ভরে উঠছে। গত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, তখন আরো দেব-কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। সেই সে মার্চ মাস থেকে রক্তদান শুরু, বাংলার মানুষ এখনো জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য রক্ত দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই রক্ত ও প্রাণদান এখন আর একতরফা নয়। বাঙালীর হাতে এখন অস্ত্র। বাংলাদেশের যুবশক্তি এখন মুক্তিবাহিনীতে রূপান্তরিত। তাদের হাতে রোজ খতম হচ্ছে শত শত হানাদার সেনা। তাই গভীর প্রত্যয়ে বুক বেঁধে আজ আমরাও বলতে পারি- "রক্ত দিয়েছি, আরো দেব। ইনশাআল্লাহ গোটা বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদারদের কবলমুক্ত হয়ে ছাড়বো।"

গত ছ'মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তিনটি ফ্রন্টে বিস্তৃত হয়েছে। যুদ্ধ এখন আর একটি ফ্রন্টে সীমাবদ্ধ নয়। এই তিনটি ফ্রণ্ট হচ্ছে- এক, রণাঙ্গনে সম্মুখযুদ্ধ এবং দখলকৃত এলাকায় ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা। দুই. অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা। তিন. বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি এবং ইসলামাবাদের জঙ্গী ফ্যাসিস্ট চক্রের উপর ক্রমাগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি।

হানাদারদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের সাফল্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষ তিনদিনের যুদ্ধের কথা। এই তিনদিনের যুদ্ধে ১১৯ জন খানসেনা নিহত হয়েছে। ঢাকা শহরের অদূরে ইছামতী নদীতে হয়েছে আরো চমকপ্রদ যুদ্ধ। কয়েকটি লঞ্চযোগে সশস্ত্র হানাদার সৈন্যকে যখন নদী অতিক্রমের চেষ্টা করছিল, তখন নদীর উভয় তীর থেকে মুক্তিবাহিনী মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় দলে দলে গ্রামবাসী। ফলে বহু হানাদার সৈন্য নিহত হয়। পাঁচজন আহত সৈন্যকে গ্রামবাসী পিটিয়ে মেরে ফেলে। অবশিষ্ট লঞ্চগুলো দ্রুত পলায়ন করে। পদ্মা ও ইছমতী নদীতে এ পর্যন্ত হানাদার সৈন্য বোঝাই একুশটি লঞ্চ ও অন্যান্য যান হয় ধ্বংস, নয় ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। ঢাকা শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও হানাদার সৈন্যদের জন্য খুব ভীতিপ্রদ। শহরের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বাঁশ ও লোহার ডাণ্ডা দিয়ে রোড ব্লক করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। রাতে গেরিলাদের চলাচলে বাধা দেয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রাতে গেরিলারা যখন সত্য সত্যই অপারেশনে বের হন, তখন তাদের ভয়ে বীরপুঙ্গব খানসেনারা আর ঢাকার রাস্তায় থাকেন না। তারা ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয় নেন। অবাঙালী রাজাকারদের বাধ্য করা হয় এই রোডব্লক পাহারা দিতে।

এটা গেল সম্মুখযুদ্ধ ও গেরিলা তৎপরতার কথা। এবার অর্থনৈতিক ফ্রন্টের যুদ্ধের খবর শুনুন। বাংলাদেশে কোন বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য কিনছে না। ফলে হাহাকার উঠেছে বাইশ পরিবার ও অবাঙালী ব্যবসায়ী মহলে। বাংলার চাষী পাট বুনছে না, ধান বুনছে- ফলে কারখানায় বাঙালী মজুর উৎপাদন চালাচ্ছে না। ফলে কি দাঁড়িয়েছে, তারই একটা হিসাব দিয়েছেন 'ইকোনমিক টাইমস' পত্রিকার রিসার্চ ব্যুরো। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে। শিল্পোৎপাদন, কৃষি উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় পাকিস্তান এক দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে। বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানি শতকরা ৮০ ভাগ কমে গেছে। পাকিস্তানের সমগ্র বিদেশী মুদ্রার শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগই আসে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি করে। এছাড়া আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যে ২৫০ কোটি টাকারও বেশী ক্ষতি হয়েছে। একদিকে এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি অন্যদিকে বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়ার ফ্যাসিস্টচক্রের মাসে খরচ হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে যেখানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে ছিল ২২ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। গত দু'মাসে এই তহবিল আরো শূন্য হয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির আণ্ডার-ইনভয়েসিং ও আমদানীর ওভার-ইনভয়েসিং এর দরুণ বিদেশে পাকিস্তানের মূলধন দেদার চলে যাচ্ছে। বৃটেন ও ফ্রান্স পাকিস্তানে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ওদিকে আবার খবর প্রচারিত হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্ক কনসরটিয়াম ইয়াহিয়া চক্রকে আবারো জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, তাদের কোন সাহায্য দেয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বে জনমত সৃষ্টি ও রাজনৈতিক চাপের ক্ষেত্রে ইয়াহিয়া-চক্রের অবস্থা আরো খারাপ। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্ত ইস্তাহারে এই প্রথমবারের মত 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি বাতিল করা হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মানুষের 'অনপহরণীয়' অধিকার রক্ষার দৃঢ়সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশ্ব শান্তি কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, আফ্রো-এশীয় কমিটি, সাংবাদিক সমিতি একবাক্যে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট জঙ্গীচক্রের বর্বরতার নিন্দা করেছেন এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করেছেন 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। আরব রাজ্য কাতারের প্রধান শাসক বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধানন্ত্রীর কাছে এক তারবার্তায় তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে উল্লেখ করে কার্যতঃ বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। সিংহলের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ গুণবর্ধন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তিদাবীতে সিংহলের পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। এছাড়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ককালে ভারত বাংলাদেশ সমস্যার যে রাজনৈতিক সমাধান দাবী করেছে, তার প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইডেন, ইকুয়েডর ও নরওয়ে জোরালো সমর্থন জানিয়েছে। উগাণ্ডা, জাম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডস এবং চিলিও বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত সমাধান দাবী করেছে।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান আবার মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, ঢাকায় নতুন মীরজাফর ডাঃ মালিক ওরফে মল্লিকের নেতৃত্বে যে অসামরিক সরকার বসানো হয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্বের কোন যোগ্যতা তাদের নেই। কয়েকজন অখ্যাত ও অপরিচিত লোক নিয়ে এই তাঁবেদার সরকার গঠনর করা হয়েছে। করাচী, পেশোয়ার, তুরঘামের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে 'জঙ্গীশাহী নিপাত যাক'। লাহোরের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। ফলে ইয়াহিয়া-চক্র বেসামাল হয়ে পড়েছেন। চারদিকের অবস্থা দেখে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এদের ভরাডুবির আর দেরী নেই। তাই সাহসে বুক বেঁধে আজ আমরা বলতে পারি-

পূর্ব দিগন্তে রক্ত সূর্য শিশু রোদের জন্ম দিচ্ছে-

মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা, কীর্তনখোলায় তার প্রতিভাস

আমরা মুক্তি সৈনিক, আমাদের জয় অনিবার্য,

আমাদের হাতের মুঠোয় স্বাধীনতা ও মুক্তির পতাকা।

(আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত)

মুক্তিফৌজের ক্যাম্পে

..........অক্টোবর, ১৯৭১

সেদিন একটা মুক্তিফৌজ-এর ক্যাম্পে গিয়েছিলাম রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু মনের মধ্যে আরো একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। সেটা হলো বাংলাদেশের সেই সমস্ত কিশোরদের দেখা, তাদের কথা শোনা, যাঁরা মা-বাবা আত্মীয়-পরিজন সবার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দুর্বার শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুর ওপর। সত্যি বলতে কি এটা আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। তাই যখন রিপোর্ট সংগ্রহের ছুতো করে সেই সুযোগটা অকস্মাৎ এসে গেল তখন আর এক মুহূর্ত দেরী না করে ক্যাম্পে যাবার আয়োজন আরম্ভ করলাম।

ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে তিনটা। চারদিকে সারি সারি টেন্ট খাটানো। প্রায় আধমাইল দূরে কোলাহলমুখর বসতি। আমরা এতদূর থেকেও আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম প্রতিটি ঘরের চালে ও গাছের ডালে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। ক্যাম্পে দেখলাম এক জায়গায় কতগুলি ছেলে তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ তাদের জুতোর কাদা ধুয়ে ফিতে পরাচ্ছে, আবার এক জায়গায় কয়েকজন মিলে জয়বাংলা পত্রিকা পড়ছে। সবার চোখে মুখে যেন একটি ভাষাই সোচ্চার, সবার মনেপ্রাণে একই দৃঢ়তা ও প্রত্যয়। দেখে মনে হলো এরা সবাই যেন এখনই জীবনার্ণবের অমৃত উৎসে অবগাহন করে উঠেছে। হঠাৎ দেখলাম পাশের একটা টেন্ট থেকে একটা কিশোর চপল হরিণের মত চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ওর গভীর অতল চোখগুলো দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে সেগুলো জ্বলে উঠতে পারে নির্মম দহনে। ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভাল লাগল যে আমি আলাপ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ‘‘তোমার নামটা কি?’’ প্রথমে কোন উত্তর করল না। তার চোখে স্পর্শ দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে রইল। মনে হলো ও যেন আমার কপালের ত্রিবলী আর মুখের বিভিন্ন রেখার মাঝে কী এক পাঠ্য খুঁজে পেয়েছে। আর তাই পড়ে নিচ্ছে নিঃশব্দে। কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হয়ে বলল- ‘নাম?’ আবার একটু থেমে বলল ‘‘আমার নাম জানেন না? আমরা তো আমাদের সবার নাম জানি। আমাদের সবার নামই তো এক- বাঙালী’’ চমকে উঠলাম ওর কথা শুনে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম ওর কথায়। ও বলল, ‘‘আপনি তো রিপোর্টার।’’ আমি বললাম, ‘‘হ্যাঁ। শুনলাম মুক্তিবাহিনীর মাত্র তেরজন গেরিলা আড়াইশ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য মেরেছিল। এবং আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। যদি আপনার ইচ্ছা হয়,আমার থেকেও সব ব্যাপার জানতে পারেন।’’ আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত বড় সাহসিকতার যে সেও একজন ভাগীদার তাতে তাঁর কোন বিকার নেই। এগুলি যেন এখন তাদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। আমি আরো ঘন হয়ে ঘাসের উপর বসলাম। সে বলতে রইলঃ গত পরশু দিন আমাদের মেজর এসে খবর দিলেন পাকিস্তানী বাহিনীর কয়েক ব্যাটেলিয়ন নিয়ে আড়াইশ জনের মত সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের অদূরে অধিকৃত এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। একথা শোনার পর আমরা সবাই তাদের খতম করতে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মেজর আমাদের তের জনকে বেছে তৈরী হতে বললেন। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা খবর পেয়েছিল হানাদার বাহিনীর সাথে এল-এম-জি, এইচ-এম-জি প্রভৃতি ছাড়াও তিন ইঞ্চি মর্টার আছে। আমরা সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা দিলাম শত্রুর ঘাটির দিকে। যখন সেই জায়গাটায় পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জায়গাটা একটু উঁচুনিচু ও টিলাবহুল। কিছুটা দূরে কী এক বড় নদীর এক ক্ষীণ শাখা প্রবাহিত। বহু দূরে দেখা যাচ্ছিল শত্রুর ক্যাম্পের নিষ্প্রভ ও কম্পিত শিখা। জানেন, সেদিকে চোখ পড়তে আমাদের রক্ত এত চঞ্চল হয়ে উঠল, শত্রুহননের জিঘাংসা এত প্রবল হয়ে উঠল তা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ তো ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়, জন্তু হত্যা করায় এত আনন্দও আছে। কিন্তু আমাদের সে অধৈর্য কমাণ্ডারের আদেশে প্রশমিত করতে হলো। ঠিক হলো রাত সাড়ে এগারটার দিকে আমরা আক্রমণ চালাব। কমাণ্ডার আমাদের দলের দু’জনকে নিয়ে শত্রুক্যাম্পের জায়গাটা পরিদর্শন করতে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে তারা ফিরে এসে আমাদের জানালেন পরিস্থিতি আমাদেরই অনুকূল এবং আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে, A.B.C এই তিন পদ্ধতিতে। তখন রাত সাড়ে আটটা। আরো তিনঘণ্টা, ১৮০ মিনিট, কত সহস্র সেকেণ্ড! উফ ভাবতেও অসহ্য লাগল। এত সময় কীভাবে কাটাব, ঐ নোংরা পাপী পশুগুলি আরো দুঘণ্টা বাংলাদেশের নির্মল পবিত্র বাতাসে নিঃশ্বাস টানবে। ভাবতেও গা রী-রী করে জ্বলে উঠল। কিন্তু কমাণ্ডারে আদেশ। একচুলও এদিক-ওদিক করার জো নেই। বসে রইলাম দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে। সদ্য পানিতে ফেলা এ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের মত চাঁদটা ঝুরো ঝুরো লঘু মেঘের ভেতর ঢুকে গলে যাচ্ছে, আধো আধো হয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম। নাকে ভেসে আসছিল অদূরের ঝোপ থেকে কোন বনফুলের গন্ধ। হঠাৎ কার হাতের রূঢ় নাড়ায় তন্ময়তা ভেঙ্গে গেলো। চকিতে তাকিয়ে দেখলাম কমাণ্ডার। ইশারায় জানাল সময় হয়ে গ্যাছে।

খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম। জন্তু বধ করার সময় হয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম- কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে, কখনো খর পায়ে। শত্রুক্যাম্পের থেকে একটু দূরে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে আমরা A.B.C পদ্ধতিতে ভাগ হয়ে দাঁড়ালাম। A ও B দুই দল L-M-G, H-M-G, S-M-G সাধারণ রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল দুই টিলার আড়ালে। এখান থেকে শত্রুক্যাম্প মাত্র চারশ গজের মত দূরত্ব। আর C দলের দুইজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে আমাদের উল্টো দিকে শত্রুক্যাম্পকে আমাদের উভয়ের মধ্যে রেখে প্রস্তুত হয়ে রইল। ঠিক সাড়ে এগারটা বাজতে সে দল বাদে আমাদের সবার অস্ত্র গর্জন করে উঠল। হঠাৎ-আক্রমণে শত্রুসৈন্যগুলি কিছু বুঝতে না পেরে ক্যাম্পের ভিতরেই চুপ করে বসে রইল। বাইরে যে কয়জন ক্যাম্প গার্ড দেয়ার জন্য ছিল, তারা, সে আবছা আলোতেও দেখলাম মৃত্যুযন্ত্রণায় দাপড়াচ্ছে। ক্যাম্পের ভিতরের সৈন্যগুলোর কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম তারা কিছু একটা ফন্দী বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। চারিদিকে নীরব। আমাদের অস্ত্রগুলিও তখন নীরব। কারণ আমাদের উপরে কড়া নির্দেশ অযথা গুলি নষ্ট করা যাবে না। হঠাৎ ওদিকে যারা বসে ছিল তাদের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল ও একসঙ্গে বহু মর্মান্তিক আর্তরব সেই ভয়াল নীরবতাকে খান খান করে তুলল, আর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষেরও আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শোনা গেল। আমরা বুঝতে পারলাম প্রথমে আমাদের হঠাৎ আক্রমণের সময় তারা কিছুক্ষণ নীরব থেকে এই ফন্দি বের করেছিল যে যেহেতু আমরা সামনে দিয়ে আক্রমণ করছি, তাই তারা নিঃশব্দে ক্যাম্পের পিছন দিক দিয়ে আমাদের অস্ত্রের রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে ও সেখান থেকে দূরপাল্লার রকেট ও মর্টারের সাহায্যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে তারা যেদিকে পিছন ফিরে সরে আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করছে সেখানেই আমাদের দলের দুজন রকেট লাঞ্চার নিয়ে বসে আছে। তাই যখন তারা আমাদের সেই দুজনের রকেট লাঞ্চারের রেঞ্জে এসে পড়ল অমনি আমাদের পক্ষের রকেট লাঞ্চার গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এগারজন ছত্রভঙ্গ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় শত্রুসৈন্যের উপর এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কোণঠাসা করে আনলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের কমাণ্ডারের আদেশে শত্রুসৈন্যরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করল। গুণে দেখলাম চল্লিশজন। মৃতদের সংখ্যা ২১০ জন হয় নাকি আর গুনিনি বলে একটু হেসে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু লক্ষ করে দেখলাম সেই হাসিতে কী এক বিষন্নতার ছাপ, যেন একটু ভিজে ভিজে। পরে একটু থেমে আবার বলল, ‘‘না গুণে ভালই করেছিলাম। কারণ মৃতের সংখ্যা একটু বেশীই ছিল। আমার দুজন বন্ধুও কাল শহীদ হয়েছে। তার ছলছলে চোখ দুটো দেখে আমার চোখ ভিজে আসলো। দেখলাম চারদিকে গোধূলি থমথমে হয়ে উঠেছে। তাকে আর সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। কাল প্রথম সূর্যোদয়ে সে আবার হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে কোন রণাঙ্গনে। জিঘাংসার মদমত্ততায়ই হয়ত তার কেটে যাবে প্রতিটি সূর্যোদয়, প্রতিটি সূর্যাস্ত। এই সময়টুকু যদি দিনান্তের বিধুবতায় সে আত্মবিশ্লেষণে বসে প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় তার চোখ ভরে আসে তবে মন্দ কী!

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

দুর্জয় বাংলা

১২ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলা চিরদুর্জয়-চির দুঃসাহসী তার দূরন্ত সন্তান। বাংলাদেশের গা বেয়ে ঝরছে রক্ত আর রক্ত, বাংলার মা-বোনের বুকে দুঃসহ কান্না আর কান্না। রক্তের বদলে রক্ত নিয়ে, মার অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে লাঞ্ছনা ঘুচিয়ে দিতে বাংলার দূরন্ত দুলাল আজ বদ্ধমুষ্টি। কন্টকপথে বিরামহীন যাত্রায় শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন তার ব্রত। শপথের গান উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত-

বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণদল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল
সূর্যসেন তিতুমীরের বীর্যগরিমা
রবিঠাকুর নজরুলের ছন্দভঙ্গিমা

* * * *

সংগীতের মূর্ছনা শেষ হয় না ভাবাবেগের আবেশ গড়িয়ে। কারণ কঠিন বাস্তব রক্তাক্ত সংগ্রামের পথের রক্ত পথিক বাংলাদেশের লৌহদৃঢ় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর দুর্জয় সাহস আর রণকৌশলের সাহায্যে পাক-হানাদার, তার পদলেহী কুকুর রাজাকারের দল ভীতসন্ত্রস্ত। বাংলাদেশের সুদূর উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের রক্তস্বাক্ষর খোদিত।

কিছুদিন আগেই রাজশাহীর আরানী ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে মুক্তিফৌজ কেবল বীরত্বের পরিচয় দেয়নি- দিয়েছে অসম সাহসিকতা ও রণকৌশলের পরিচয়। টহলদার পুলিশ ও রাজাকাররা অগ্রসরমান বীর সেনাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেলেও অধিকতর ক্ষিপ্রতার সাথে পুলিশদের কাবু করে ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে গেরিলা যোদ্ধারা সক্ষম হন। তারা কয়েকজন পুলিশকে গ্রেফতারও করেছেন, সেই সাথে কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রও হয়েছে হস্তগত। ‘এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন’। সচিত্র বিবরণই তার প্রমাণ।

পাহাড়পুর-পবিত্র বৌদ্ধ বিহার ভূমি- যেখান থেকে একদিন বৌদ্ধধর্মের অহিংসার মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হোত। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, পর্যটনেচ্ছু পথিক, ইতিহাসের তথ্যাভিলাষী শিক্ষক-ছাত্র যেখানে পদচারণা করেছে সবিস্ময়ে, সংগ্রহ করেছে নানান তথ্য- সেই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তুপ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তুপে হিংসার অনল জ্বালিয়েছে পাক হানাদাররা অহিংসার পাদপীটে। ধর্মদ্বেষী সেই পাক পশুদের দশজন খতম হয়েছে মুক্তিবাহিনীর হাতে।

দিনাজপুরের গোসাইনগঞ্জে, রংপুরের কারনাইতে হানাদার রাজাকাররা গেরিলাদের অব্যর্থ নিশানার লক্ষ্যবস্তু হয়ে করেছে মৃত্যুবরণ। পেয়েছে পাপের চরম শাস্তি। সিলেট, ময়মনসিংহের রণাঙ্গন থেকেও আসছে মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের খবর। কুমিল্লার শান্তধরে গোমতীর তীর মুক্তিসংগ্রামের রণঝনঝনায় ঝংকৃত। ময়নামতীর গুহাবাসী দানবের দল শালদা নদী অধিকার করতে এসে পেয়ে গেছে ইহলোক ত্যাগ করার ছাড়পত্র। পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগের অধিকার তারা চিরদিনের জন্য হারালো। কায়েমপুরের ক’জন পাকসেনার ভাগ্যে ঘটেছে একই পরিণতি।

খবর! খবর! নিঃশব্দ শব্দেরা কাগজের পাতায় আর নিরূপদ্রব নির্জীব খবর নয়-তাজা জীবন্ত জ্বলন্ত শব্দের স্ফুলিঙ্গ আজকের খবর। কামানের গোলা, মেশিন-গানের গুলি, মর্টারের ভয়ংকর শব্দ আর তারই মোকাবেলায় মুক্তিবাহিনীর তরুণ গেরিলার হাতের গ্রেনেডের সশব্দ বিস্ফোরণ, এলএমজি’র ঘন ঘন অগ্ন্যুদগার, মুমূর্ষু পাকসেনার রাজাকারের অসহায় আর্তনাদ, জয় আর সাফল্যেও উন্মাদনায় দুরন্ত দামাল তরুণ দলের উল্লাসধ্বনি কাঁপাচ্ছে বাংলার দিগদিগন্ত। এই প্রচণ্ড সশব্দ সংবাদ শত্রুবুকে সৃষ্টি করেছে হৃদকম্পন। তাই পাক-সরকার আর সেনাবাহিনীতে লোক পাচ্ছে না নতুন করে। মুহুর্মুহু গ্রেনেড বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আর পদার্পণ করতে নারাজ। তারা জানে বাংলার নদী, অরণ্য, পাহাড়, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুছোবল। হাতে অটোমেটিক রাইফেলই থাক আর মেশিনগান থাক- একা কিংবা দশজনই হোক- প্রতিহিংসায় গর্জমান ভয়ংকর সর্পের বিষমুখে ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষাৎ যম বাংলার গেরিলা। তথাকথিত ‘কাফের মারা’র জেহাদী জোশ আজ মারের চোটে অন্তর্হিত। তাই আত্মসমালোচনার আত্মস্বরে

পশ্চিম পাকিস্তানীরা ক্ষতবিক্ষত- ২৫শে মার্চের হামলার কী প্রয়োজন ছিল? বেলুচ-পাঠান-সিন্ধীরা গালে হাত দিয়ে ভাবছে বাংলার মানুষের কী দোষ? তারা চেয়েছিল স্বাধিকার। তারা চেয়েছিল দেশের বেশিরভাগ লোকের মঙ্গল। সে মঙ্গলের আলো ছড়াতো সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত সিন্ধী-পাঠান-বেলুচদের ঘরে ঘরে। একদিন বেলুচরা মাথা নোয়ায়নি বলে তাদের জীবনেও নেমেছিল টিক্কা খানের পাশর অত্যাচার। ৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঈদের জামাতে পাক-বাহিনী ফেলেছে বোমা। মুক্তিবাহিনীর সাফল্যই ঘরে-বাইরে পাকহানাদারদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। দুর্জয় বাংলার দুর্জয় প্রাণের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(বদরুল হাসান রচিত)

মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই মুহূর্তে একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রতি প্রহরে মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা নতুন নতুন এলাকায় তাদের বিজয় ধ্বনিত করে তুলছে। তাদের বিজয়দৃপ্ত পদচারণা মানুষের মুক্তি এবং মানবিকতার শাশ্বত বাণীকে চিরন্তন এবং মহিমান্বিত করে তুলছে। শত্রুরা হটছে, পিছু হটছে, মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলেছে, সামনে চলেছে। মানবিকতার শত্রু পাক-হানাদাররা মৃত্যুমুখী যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে এসে ঠেকেছে, বাঙালীরা মহিমাময় মুক্তিতোরণের দ্বারে এসে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা পায়ে পায়ে চলেছে, সামনে চলেছে, চলেছে মুক্তির মহাসঙ্গীত উৎসে। পাক হানাদাররা পায়ে পায়ে মরছে, আরো মরছে, মরছে ঘৃণা এবং গ্লানির অন্ধকারে। ওদের মৃত্যু সহজ, সম্ভব- তাই সত্য। আমাদের অমরত্ব ন্যায়ত্ব, সত্যত্ব তাই অবধারিত। ওরা লাঞ্ছিত সমগ্র মানুষের বিবেকের বিচারে। আমরা নন্দিত সমগ্র সভ্যতার সান্নিধ্যে। সভ্যতার বিনাশে ওদের পাশবিক তৃপ্তি। সেই সভ্যতার স্থায়িত্ব আমাদের একমাত্র মুক্তি।

সভ্যতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যে যুদ্ধ বাংলাদেশের সীমানায় বন্দী ছিল, হানাদার হায়েনারা সে যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে আরো বৃহত্তর পৃথিবীতে। পাকিস্তানীরা সমগ্র মানুষের রক্তে স্নাত হতে চাইছে। চাইছে পৃথিবী জুড়ে তাদের বর্বর মৃত্যু, হত্যাযজ্ঞ নির্বিচারে শুরু করতে।

এদের থামতে হবে। এদের থামাতে হবে। এদের অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে হবে। এদের বিনাশ করতে হবে। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানুষকে বাঁচাতে হবে।

আজ মানুষকে বাঁচাবার লড়াই। বিস্তারিত মুক্তাঞ্চলে অন্ততঃ তারই বিরামহীন প্রচেষ্টা চলেছে। ওরা সবকিছু ধসিয়ে, পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে পিছু হটছে- আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলার শ্রমে জড় হচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাংলার বহু অঞ্চল মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেগুলোর অনেক স্থানেই এখন জ্বলছে। পশ্চিমারা পিছু হটার প্রাক্কালে অনুসরণ করছে পোড়ামাটি নীতি। জ্বালিয়ে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি।

খুলনার দক্ষিণাঞ্চল ঘুরে দেখে এলাম। কয়েকদিন আগে এই অঞ্চলে পাক-হানাদারদের সাথে প্রচণ্ডভাবে লাড়াইয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনী খুলনার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করেছেন। এই এলাকা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল শাজাহান মাস্টারের সাথে। তিনি দেবহাটা থানার টাউন শ্রীপুর হাই-স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। আজ তিনি কলম ছেড়ে স্টেনগান হাতে নিয়েছেন। শিক্ষকের চেয়ার ছেড়ে সৈনিকের বাঙ্কারে বসেছেন।

দশমাস আগেও যিনি ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসে বসতেন, আজ তাদেরকে নিয়েই তিনি বৈরীদের মুখোমুখী লড়াই করতে বসেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ কি লাভ, কি হবে স্কুলে, যদি ভবিষ্যতের ছাত্রদের না বাঁচানো যায়।

একটা আশ্চর্য দেশপ্রেম এবং সাহস ভদ্রলোককে আজ এতখানি দুর্বার করে তুলেছে যে অন্ততঃ একটা রাত দেখলেন না ঘুমিয়ে- মুক্তিবাহিনীর সরবরাহ কর্মে কাটিয়ে দিলেন। আমার মনে হোল শিক্ষকরা মহান, কিন্তু ক্যাপ্টেন শাজাহানের মত নিরলস শিক্ষকরা? নিশ্চয় ভবিষ্যৎ জবাব দেবে।

শাজাহান মাস্টার সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন শরীফপুর গ্রামে। গ্রামটি খুবই ভালো। অবাক বিস্ময়ে আমি লক্ষ্য করলাম গ্রামে একটা বাড়িও নেই। আমার চোখকেই যেন ক্ষণমুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনো কোনো পোড়া ঘর থেকে তখনও মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। গ্রামের অস্তিত্বটাই যেন হরণ করেছে কোন এক পাষাণ দানব। ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেনঃ হ্যাঁ-এই গ্রামের এগার হাজার লোকের বাসযোগ্য গৃহাদি ছিল। কিন্তু এখন আপনি দেখছেন- তার একটাও নেই। আমি মাস্টার সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি বললেনঃ দীর্ঘ বাইশ ঘণ্টা তীব্র সংঘর্ষের পর পাক-হানাদাররা পিছু হটবার সময় সব বাড়িতে পেট্রল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা মাত্র চার ঘণ্টা আগে এই গ্রাম দখল করেছি। এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে তিনি বললেনঃ এর নাম রতন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এলেন। চোখে তাঁর অশ্রুধারা। ঠোঁট দুটো একটু নড়লো। কোন শব্দ উচ্চারিত হোল না। আবার ফিরে গেলেন। মাস্টার সাহেব জানালেন, বৃদ্ধার পেশা ছিল দুধ বিক্রী করা। চারটে গাই গরুই ছিল তার সম্বল। এবারে আসুন আমার সাথে। শাজাহান সাহেব আমাকে যে গোয়ালঘরের কাছে নিয়ে এলেন সেখানে সে কি বীভৎসতা, কি দুর্গন্ধ- চারটে গরুর বিকৃত পোড়া দেহ পড়ে আছে। চার ধারের মাটিতে পোড়া চর্বির তেল গড়িয়ে গড়িয়ে ভিজিয়ে তুলছে। নাকে কাপড় চেপে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। আমি বললাম, ক্যাপ্টেন সাহেব আমার বড় খারাপ লাগছে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

ভাঙ্গা ধরা গলায় ক্যাপ্টেন শাজাহান কথা বললেন। আমি চমকে উঠলাম। তিনি বললেনঃ ও, আপনি আমার এক ছাত্রের বৃদ্ধা অচল মাকে ওরা ঘরে পুড়িয়ে মেরেছে তা দেখবেন না? তারপর বললেনঃ আর কটাই বা দেখবেন? ওরা যেখানে যেখানে যাচ্ছে সর্বত্র গ্রাম, ধানের গাদা, গরুর গোয়াল, পাটের ঘর, সাঁকো, পুল সবই তো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা শরীফপুর গ্রামই না-এমন বহু শরীফপুর ওরা প্রতিদিন তৈরী করছে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, আমরা আবার গড়ে তুলবো পোড়া ঘর ভাঙা ভিটেগুলোকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার চোখ চলে গেল বড় একটা ভিটের ওপর, যেখানে ঘরের চারকোণের চারটে পোড়া ফাটা কাঠই অবশিষ্ট আছে- আর সব ফাঁকা। আমার মনে হোল এই ফাঁকা ঘরকে এরা একদিন ভরাট করবে, এই পোড়া নির্জনতার বুক চিরে এরা তুলে আনবে জীবনের স্পন্দন, নির্মাণ করবে পুনরায় সেই শান্তির নীড়-ছোট ছেলে-মেয়েদের কলকাকলিতে আবার ভরে উঠবে ঘরের আনাচ-কানাচ, সোনার বাংলায় আবার জেগে উঠবে সোনার গ্রাম। সেই সাধনায় এরা রত-রত শিক্ষক, রত ছাত্র, রত গ্রামের কৃষক-শ্রমিক।

সন্ধ্যা হলে এলো। ভাবছিলাম এবার আমাকে ফিরতে হবে। এমন সময় সাইকেলে একজন লোক এলো। হাতে তার একটা ভাঙ্গা সাইকেল। ক্যাপ্টেন সাহেবকে জানালেনঃ আমাকে মাফ করবেন, এক্ষুণি আমাকে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যেতে হচ্ছে। যে ছেলেটি এসেছিলো তাকে দেখিয়ে বললেনঃ ওর নাম মৃণাল কান্তি মুখার্জি। ও আমার অত্যন্ত স্নেহের ছাত্র ছিল। এখন ও একজন মুক্তি সৈনিক। ও খুব সাহসী যোদ্ধা। একবার দেবহাটা থানায় ও এগার জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১০০ জন পাকবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। ১৮ জনকে হত্যা করেছিল। লেঃ মৃণাল বাবু আমাকে হাত বাড়ালেন। তার সাথে পরিচয় হোল। তার ডান আর বাম হাতে ব্যান্ডজ বাঁধা। বললাম, এ কেন? তুচ্ছভাবেই জবাব দিলো যোদ্ধা মৃণালঃ কয়েকদিন আগে দুই হাতে হারামীদের ব্রাশ

লেগেছিল। ও কিছু না, শত্রুদের খতম না করা অবধি আমরা ক্ষান্ত হবো না। তার দৃঢ় জীবন্ত শব্দগুলো আমার বিস্ময় এনে দিল

তারপর ওঁরা আমার কাছ থেকে বিদান নিয়ে চলে গেলেন সাইকেলে চেপে। হাত নেড়ে ক্যাপ্টেন শাজাহান সাহেব বললেনঃ 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে'-। আমি হাত নেড়ে বললামঃ জয় বাংলা।

(মুসা সাদেক রচিত)

ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল

৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অনেক ঝড়ঝাপ্টার পরেও- দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়া সত্বেও সহজ স্বাভাবিক সবুজ শ্যামলিমা সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। গ্রামবাংলার সেই চিরন্তন দৃশ্যই দেখছিলাম দু'চোখ ভরে, আর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিলাম সামনের দিকে। পথে ছোট একটি খাল পড়ল। এটি পার হয়ে যেতে হবে। দেখলাম খালের পুলটি ভেঙ্গে পড়ে আছে আর তার পাশ দিয়েই নতুন একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। হানাদার বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামবাসীরা পুলটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। এখন আবার তারাই নতুন করে সাঁকো তৈরী করেছে।

খালের ওপারে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে বিধ্বস্ত একটি বাড়ি। না, কোন ঝড়ের তাণ্ডবে ওটি বিধ্বস্ত হয়নি। ইতিহাসের কলঙ্ক ইয়াহিয়ার উন্মত্ত জানোয়ারগুলো বাড়িটিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এগিয়ে গেলাম বাড়িটির ভিতরে। কোন মানুষ নেই, আছে শুধু চাপ চাপ রক্ত। বাঁধানো উঠোনের এক প্রান্তে একটি কুকুরের মৃতদেহ পড়ে আছে। ওটির পায়ে গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম, পশুগুলোর হিংস্রতার কাছে কুকুরটিও রেহাই পায়নি।

হ্যাঁ, বলছিলাম খুলনা জেলার একটি মুক্তাঞ্চলের কথা। ওই ফ্রন্টের মুক্তিবাহিনীর একটি ছোট দলের অধিনায়ক আমার বন্ধু আনোয়ার। গত পরশুদিন গিয়েছিলাম ওর ক্যাম্পে। পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী। তাদের মধ্যে একজন বললেন, 'যে বাড়িটি দেখলেন ওটি স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি। পশুগুলো তাকে এবং তার দুই পুত্রকে হত্যা করেছে এবং তার একমাত্র মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।' সবচেয়ে মর্মান্তিক যা শুনলাম তা হল, মাস্টার সাহেবের এক বছরের শিশুপুত্রটির পা ধরে একটি জানোয়ার সিমেন্ট বাঁধানো উঠানে সজোরে নিক্ষেপ করে শিশুটির মাথাটিকে চৌচির করে ফেলেছে। তখন আর একটি জানোয়ার পাকিস্তানী পতাকা একখণ্ড বাঁশের মাথায় লাগিয়ে শিশুটির মাথার ভিতরে পুঁতে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চিৎকার করে উঠেছিল।

এ ধরনের শত শত জল্লাদী তাণ্ডবের কথা শুনতে শুনতে উপস্থিত হলাম স্থানীয় বাজারে। সেখানে দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা পতপত করে উড়ছে। বাজারে বেশ লোক সমাগম হয়েছে। কেনাকাটার মাঝে আলাপ হচ্ছে কোন কোন এলাকা মুক্ত হলো, কটা জানোয়ার খতম হল ইত্যাদি হরেক রকমের কথা। প্রতিটি মানুষের দৃঢ় মনোবল দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বীর প্রসবিনী বাংলার আজ এক অভূতপূর্ব সাজ।

বাজার থেকে অল্প দূরেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। সেখানে গিয়ে শুনলাম আনোয়ার ক্যাম্পে নেই, রণাঙ্গনে। তার দলের একজন যোদ্ধা আহত হয়ে ক্যাম্পে শুয়ে আছেন। তার কাছে গিয়ে বসলাম, চারিদিক থেকে অনবরত গোলাগুলির শব্দ হচ্ছিল। এক-একটি প্রচণ্ড শব্দের সাথে আহত তরুণটি চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। আমাকে দুঃখ করে বললেন, সামান্য আঘাতের জন্য তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে। এতক্ষণ রণাঙ্গনে থাকলে নিশ্চয়ই সে কয়েকটি হায়েনার জীবন নিতে পারতো। ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে। কিন্তু সে বিশ্রাম চায় না। তার ইচ্ছা কালই সে যুদ্ধে যাবে। কিন্তু আমি দেখেছি তার আঘাত বেশ গুরুতর। কম করে আর ৩/৪ দিন তাকে বিশ্রাম নিতে হবে। সত্যি, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য অনুসারী আজ এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই আগুনের দুর্জয় শক্তির স্পর্শে শত্রুর সকল প্রতিরোধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। মৃত্যু তাদের কাছে আজ খেলা মাত্র। আহত যোদ্ধাটির উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল।

ক্যাম্প থেকে আর একজন তরুণের সাথে এগিয়ে গেলাম রণাঙ্গনের দিকে। কানে আসছিল শুধু শব্দ আর শব্দ। যাবার পথে গ্রামবাসীদের দেখলাম কেউ চাষ করেছেন, কেউবা মাছ ধরছেন, আবার কিছু লোককে দেখলাম তাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত করতে। ওদের চোখ-মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মুক্তিবাহিনীর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে বিনা দ্বিধায় তারা দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন। মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়া ডালকুত্তা বাহিনীর আক্রমণে যারা আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে, নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা একে একে ফিরে আসছেন। কবরের মাঝে আবার গড়ে উঠেছে জনবসতি।

যেতে যেতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে পরিখা খনন করে তার ভিতর মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান তৈরী হয়ে আছেন যে-কোন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য। ওদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিজয়ের গর্বে তারা প্রত্যেকে গর্বিত। স্বাধীনতার পবিত্র আলোকে ওদের মুখ-চোখ উদ্ভাসিত। তারা জানালেন হানাদার বিতাড়িত হওয়ার পর মুক্ত এলাকা রক্ষার ভার তাদের উপর পড়েছে। এবং তারা দৃঢ়তার সাথে সে দায়িত্ব পালন করছেন। আর ওদের সহযোদ্ধারা প্রচণ্ডতম আক্রমণে কচুকাটা করে চলছেন পররাজ্যলোভী ডালকুত্তাদের। তাদের এই আক্রমণে মনোবলহীন ভাড়াটিয়া হায়েনার দল পরাজয়ের বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পিছু হটছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পতাকাবাহী এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা বাংলার দশদিগন্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজয়ের বার্তা। চূড়ান্ত আঘাত হেনে শেষ হানাদারটিকে খতম করার দুর্জয় সংকল্পে অটল বঙ্গশার্দুল এই বীরবাহিনী সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে জানিয়ে দিচ্ছে- তাদের সম্পূর্ণ মুক্তির দিন সমাগত।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলাম তার দুই মাইলের ভিতরেই তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। কাজেই আর সামনে যাওয়া যাবে না। এবার ফিরতে হবে। ফিরে এলাম ক্যাম্পে। একটু আগেই আনোয়ার ফিরে এসেছে। শুয়ে আছে ওর ক্যাম্পখাটে। কিন্তু ওরে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুনলাম যুদ্ধ করার সময় ওর পায়ে হঠাৎ গুলি লাগে। কিন্তু ও কাউকে না বলে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন হানাদারেরা পিছু হটে গিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের এগিয়ে যাবার পালা তখন আনোয়ার ওর দুজন সহযোদ্ধাকে বলেছিল ওকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারা ওকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদেরকে দেখলাম তখনও তারা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি-গেঞ্জি, কাঁধে স্টেনগান আর চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। ওরা চলে গেল ওদের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।

আনোয়ারের কাছে যুদ্ধের খবর শুনলাম। ওই দিনই আরও তিনটি থানা শত্রুমুক্ত হয়েছে, আর ও নিজেই ৪টি হানাদারকে খতম করেছে। পশ্চিমারা এখন আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষায় বেশী তৎপর। কাজেই পালানোর সময় অধিকাংশই মারা পড়ে। রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। 'বজ্রকণ্ঠ' অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর বাণী শোনা যেতেই আনোয়ার কঠিন হয়ে উঠল। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম ওর চোখেমুখে এক কঠিন শপথের ছায়া। 'বজ্রকণ্ঠ' শেষ হয়ে যেতেই আমাকে বলল, বঙ্গবন্ধু আজ শত্রুর হাতে বন্দী। কিন্তু সবসময় মনে

হয় তিনি আমাদের সাথেই আছেন, নির্দেশ দিয়ে চলছেন সামনে এগিয়ে যাবার, জননী বাংলার শৃঙ্খল মোচন করার। তিনি যতই দূরে থাকুন আর যেখানেই থাকুন না কেন, আশীর্বাদই আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে মৃত্যুভয়কে হরণ করে সামনে এগিয়ে যাবার। এমনি অনেক কথা বলতে বলতে আনোয়ার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ গুম গুম করে প্রচণ্ড দুটো শব্দ হল একেবারে কাছেই। আমাকে বিস্মিত করে ওর খাটের পাশে রাখা রাইফেলটা নিয়ে ও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই পায়ের যন্ত্রণায় কুকিয়ে উঠল। ততক্ষণে আমি ওকে ধরে ফেলেছি। আমি ধরতেই ও সম্বিত ফিরে পেল। আমাকে বলল, মনে ছিল না আমি আহত। ওই শব্দ শুনলে কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। আবার ওকে শুইয়ে দিলাম।

(তপন ভট্টাচার্য রচিত)

রণাঙ্গন ঘুরে এলাম

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলার স্বাধীনতা এখন অবধারিত সাফল্যের পথে যাত্রা করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে এখন পশ্চিমী হানাদার বাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে হদ্দম মার খাচ্ছে এবং পিছু হটছে। অচিরেই তারা লক্ষ্য করবে কিছু হটার পরিণামে তারা বঙ্গোপসাগরের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসার এবং ফিরে যাওয়ার দুটো রাস্তাই বন্ধ। শেষের সেদিন কি ভয়ংকর আর মাত্র কয়েক দিনেই তারা হাড়ে-মাংসে টের পাবে। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা এখন এগিয়ে, শুধু এগিয়ে চলেছে। শত্রু এখন ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। খুলনা, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম মুক্তিবাহিনীর কবজার মধ্যে প্রায় এসে গেছে। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা এ মুহূর্তে মুক্তিবাহিনীর দখলে এবং এসব এলাকার কয়েক কোটি মানুষ এখন স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে শান্তিতে জীবনযাপন শুরু করেছে। প্রতিটি রণাঙ্গন এখন মুক্তিবাহিনীর উল্লাস-ধ্বনিতে মুখরিত- 'জয় বাংলা' নিনাদে প্রকম্পিত। খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালির যুদ্ধরত মুক্তিফৌজ ভাইদের সাথে আলাপ করে এবং এইসব রণাঙ্গন সফল করে আমার যেন বরাবর মনে হয়েছে- এ কি সেই বিধ্বস্ত বাংলা, না জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর ঢাকা? এই বছরের প্রথম দিকে সমগ্র ঢাকার আকাশ-বাতাস নগর বন্দর যে নামে যে ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠতো- বরিশাল খুলনার রণাঙ্গনগুলোর জয়ধ্বনি তার সাথে কত আশ্চর্যভাবে একাত্মং যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরার রণাঙ্গনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে 'জয় বাংলা' 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তা যেন বরিশাল-পটুয়াখালি রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকেও শোনা যায়। বাংলার সব রণাঙ্গনের রঙ আজ এক, সব রণাঙ্গনের ধ্বনি আজ এক, সব রণাঙ্গনের চিত্র আজ এক। মুক্তিবাহিনী সর্বত্র জিতছে, শুধু জিতছে। রণাঙ্গন এবং সেই সাথে বাংলার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা শেখ মুজিব ও জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত, নিনাদিত। সব রণাঙ্গনেই একই রবঃ যাত্রা করো- যাত্রা করো- এগিয়ে চলো- এগিয়ে চলো। বাগেরহাট রণাঙ্গনে এসে মনে হলো সেই ইতিহাসের গ্রীকবাহিনীর বিজয়যাত্রার ছবি আমার

সামনে। মনে হলোঃ বীর আলেকজাণ্ডারের গ্রীকবাহিনী যে বিজয়যাত্রার দৃপ্ত পদধ্বনিতে সাফল্যকে অতিক্রম করেছিল এখন সেই বাহিনীরই আরেক রূপ। এদের যাত্রা যেন শুধু সফলতার ইঙ্গিতকেই চেনে। শুধু বিজয়ের যাত্রাকেই স্বীকার করে। একেকটা বাহিনী একেকটি এলাকা থেকে এসে একটু থেমে আবার যাত্রা করছে। শত্রুর সাথে ওরা কেউ হয়তো বারো ঘণ্টা বুঝেছে, কেউ তিরিশ ঘণ্টা। তারপর সে জিতেছে- শত্রুকে- হারিয়েছে, বিবেকের সম্মান আদায় করেছে। সবাই এসে মিলিত হয়েছে। এতক্ষণ ওরা লড়েছে। কিন্তু কেউ বিশ্রাম চায় না। তাই আবার ওদের যাত্রা শুরু। অকস্মাৎ একটি রবে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ওরা যাত্র করছে কোথায়? ওদের ধ্বনিতে ওরা জানায়ঃ চলো চলো, ঢাকা চলো। কুর্মিটোলা ভাঙো, ভাঙো শত্রুদের, হানো হানো। এখানে দীর্ঘ সতের ঘণ্টা পশ্চিমী হানাদাররা লড়ছে। অতঃপর তারা মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা মুক্তিবাহিনীর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এখন ওদের তারা খাওয়ার পালা। এখন ওদের পরাজয়ের পালা। রণবিধ্বস্ত বাগেরহাটের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে আলাপ হল নবম সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর জলিলের সাথে। তিনি দেখলাম দারুণ ব্যস্ত। মাথায় একটা সবুজ ক্যাপ, পায়ে বুট, এক হাতে একটা দূরবীন এবং অন্য হাতে একটি স্টিক। আমাকে দেখে স্টিক উঠিয়ে বললেনঃ জয় বাংলা। আমি তাঁর কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলামঃ শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ? ছোট্ট জবাবে বললেনঃ বহু। তারপর বামহাত দিয়ে স্টিক তুলে হাত বিশেক দূরে নির্দেশ করলেনঃ দেখুন। একটা মিলিটারী জিপ বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মধ্যে তিনটে রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ হানাদার, একজনের মাথাটা আছে কি নেই বোঝা মুস্কিল- দেখা শেষ না হতেই কমাণ্ডার জলিল সাহেব স্টিকটা আরেকটু ডাইনে সরিয়ে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেনঃ ঐ বাঙ্কারে ওদের কমপক্ষে বিশটা লাশ পড়ে আছে। একটু সামনে ডাইনে সরে গিয়ে দেখলামঃ হানাদারদের সেই দুর্ভেদ্য বাঙ্কারের মধ্যে থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে- আমাদের মুক্তিবাহিনীর সৈনিকদের শেল এসে বাঙ্কারটা দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে দেয়। নবম সেক্টরের কমাণ্ডার জলিল সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এবার আপনি বলুন ক্ষয়ক্ষতি। কমাণ্ডার সাহেব এরপর কয়েকটি গ্রুপকে সামনের অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে যাত্রা করবার জন্য আদেশ দিয়ে আমাকে বললেন, এখানে আমরা শত্রুদের কারো ফিরে যেতে দেইনি। আমাদের আরো দ্রুত সম্মুখপানে যেতে হবে। ওদের কারো ফিরতে দেয়া হবে না। সুতরাং বাংলার এই মুক্তিবাহিনীর এই অপ্রতিরোধ্য গতিকে না থামিয়ে সামনে চলার গতিকে আরো দ্রুতময় করে তুলবো আমরা। হেসে আমাকে বললেনঃ চলি, জয় বাংলা।

বাংলাদেশের পতাকা হাতে ট্রুপ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, পশ্চাতে উড়ছে ধূলি, তার পাশ দিয়ে কমাণ্ডারের গাড়ি এগিয়ে গেল। মুক্তিবাহিনীর পশ্চাতে বিকেলের শেষ সূর্যের বিদায়ী রঙ কাত হয়ে পড়েছে- তারা চলে গেল- দূরে, অনেক দূরে- একসময় চোখের নিশানার ওপারে- এখানে তখনও শত্রুদের বাঙ্কার থেকে কালো ধোঁয়ার রেশ উঠছে, চারদিকে শত্রুদের মৃতদেহ পড়ে, পড়ে বিধ্বস্ত সামরিক যান, তার ওপর চার-চারটি হানাদারের নিষ্প্রাণ দেহ। আরো ওপাশে হানাদার বাহিনীর একটি তাঁবুর ভস্মাংশ, তারও ওপাশে পশ্চিমা দস্যুর একটা ভগ্নকামান, দুটো বিক্ষত ট্রাক, ট্রাকের ওপর দিয়ে তখনও রাবারপোড়া ধোঁয়া উঠছে। এখানে হানাদাররা ছিল। এখন হটছে তারা। চোখ তার ওপারে এক বৃদ্ধার এবং গ্রামের আরো কতকগুলো পুরুষ-রমণীর দিকে ফিরে গেল। তারা এতসময় আমাদের মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন কর্মে সহযোগিতা করছিলো। এবার তারা সবাই সমস্বরে ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের দিকে ফিরছে। আমি এগিয়ে গেলাম। সবাই গ্রামের দিকে ফিরছে, কিন্তু এক বৃদ্ধা, সাদা একমাথা চুল, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ততক্ষণে। বৃদ্ধার দৃষ্টি তখনও সেই পথপ্রান্তে- যেদিক দিয়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ভায়েরা এগিয়ে গেছে। বৃদ্ধার মুখের ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম, তাঁর চোখে অশ্রুধারা। জিজ্ঞেস করলামঃ কি মা, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বৃদ্ধাটি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেনঃ ‘আমার মণি গেছে যুদ্ধে। খানদের খতম করে ও শহরে ফিরবে।’ তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর আর আমি শুনতে পেলাম

না- অথচ লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর ঠোঁট দুটো তখনও নড়ছে। আমার যেন মনে হলো বৃদ্ধা মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হাজার মণিদের মাথায় বর্ষিত হোচ্ছে, মণির মায়ের ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত নির্মিত হোচ্ছে।

(মুসা সাদেক রচিত)

মুক্তাঞ্চলে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ! আমার বাংলাদেশ! বাংলাদেশ আজ স্বীকৃত সত্য! বাংলাদেশ আজ প্রতিটি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের আর্তি, বাংলাদেশ আজ সকলের হৃদপিণ্ডের শব্দ হয়ে বাজবে। আমাদের প্রাত্যহিক কাজে, চিন্তায়, স্বপ্নে, জাগরণে সুষুপ্তিতে বাংলাদেশ অবিশ্রাম ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের ভালোবাসায়, বাঙালীর প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগ, চিন্তা-অনুরাগে, পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের সহানুভূতিতে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে।

কিন্তু শত্রুএখনো বাংলাদেশে আছে। শত শত শত্রু আত্মসমর্পণ করছে, অনেকে আবার আত্মসমর্পর্ণ না করে পালাতে গিয়ে মরছে- মৃত্যু তাদের জন্য নির্ধারিত। এতোদিনের অত্যাচার আজ সমাহিত হওয়ার কালে, অস্ত্র তাদের দিকে উদ্যত হয়েছে, ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম। তাই শত্রুসৈন্যের পরাজয় এতো দ্রুত, এতো করুণ। কিন্তু পলায়নের পর কি চিহ্ন আমরা পাচ্ছি অতীতের বাংলাদেশের? ছোট-বড় শতেকের মতো শহরে, ৬০ হাজার গ্রামে তারা কি স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে? মিত্রশক্তির সহায়তায় মুক্তিবাহিনী একের পর এক গ্রাম ও শহর দখল করে এগিয়ে চলেছে এবং যেখানেই তারা যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন শুধু ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস। যেন মানবসভ্যতার শত্রুচেঙ্গিশ খাঁর দলিত জনপদ ও গ্রাম, যেন নাৎসী বাহিনীর অত্যাচারে বিক্ষত কোন গ্রাম বা শহরের ওপর দিয়ে পথ চলা- যেন এক অচেনা জগতের পথে, কোন ঝঞ্ঝাহত গ্রামের ওপর দিয়ে। বাংলার চিরপরিচিত গ্রাম, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, যেদিকে চোখ ফেরাই শুধু ধূ ধূ করে হাওয়া। পরিচিত যশোরের সেই ছোট ছোট ঘর আর জনবহুল রাস্তা আজ ম্রিয়মাণ। তবু মুক্তিবাহিনীর আর মিত্র বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে যে কি উল্লাস! তারা আবার সেই হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে। দুহাত বাড়িয়ে তারা জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। বুকের থেকে একটি বিরাট পাথরের বোঝা নেমে গিয়ে তারা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। যেখানে সেখানে পথে পথে ধ্বংসের ছবি লাফিয়ে উঠছে। শত্রুর অত্যাচারের কাহিনী। লজ্জা ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে স্থানীয় জনগণের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বুক, স্বজন পরিজন হারানোর ব্যথা, সম্পদ হারানোর দুঃখ, গৃহহীন মানুষের অসহায় কান্না- কিন্তু মুক্তির নিঃশ্বাস টেনে, দুচোখ মেলে বলছে আর গান গাইছে- সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের জয়।

কোথাও পথের ওপর দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ছে পাগল একটি মানুষ। খবর নিয়ে জানা গেলো কিছুদিন আগেও সে ছিলো একজন বেসরকারী অফিসের অধস্তন চাকুরে। শত্রুসৈন্যরা তার পিতা-মাতা সকলকে হত্যা করেছে এবং সে হয়ে গেছে পাগল। মুক্তিবাহিনী থেকে খবর জানতে চাইলো তার, কিন্তু হায়, তার আর পূর্বের সেই সুখের বা দুঃখের স্মৃতি স্মরণে নেই। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু বেয়ে পড়লো, মিত্র বাহিনীর জওয়ানরা সহানুভূতি জানালো। তারা এগিয়ে চললো। তাদের হাতে অনেক কাজ। আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে। পেছনে যারা প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে আসছে তাদের

কর্তব্য সকলের দেখাশোনা করা। তারা দেখবে জনগণের সমস্যা, দুঃখ আর বেদনা। দুঃখের প্রতিকার করবে অসামরিক প্রশাসনের কর্মচারীবৃন্দ এবং সেই কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি শত্রুমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা, জনগণের মনে পূর্বের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং সুখের সন্ধান দেবার দায়িত্ব তাদেরই, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে সাধারণ মানুষ। সরকার আর জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ সত্যিকার সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

আরো কিছুদূর যেতে যেতে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ হলো শত্রুদের সঙ্গে, শত্রুসৈন্য মরলো, আত্মসমর্পণ করলো বহু। কিছুদূরে গিয়ে চোখে পড়লো একজন আহত মানুষ। তার হাতে একটি স্টেনগান তখনো, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ এবং সে তখনো জীবিত। একজন মুক্তিযোদ্ধা তার মুখে জল দিয়ে ডাকলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা, নাম। তবু নিরুত্তর সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা তরুণটি। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ তাকে রাজাকার বলে সন্দেহ করলো, অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করলো। কেউ কেউ বললঃ কেড়ে নাও অস্ত্র, বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত সাজা হয়েছে, পথের ধারে তাকে ফেলে রাখা, ধুঁকে ধুঁকে মরুক। কিন্তু অনেকেই জানতে চাইলো প্রকৃত ঘটনাটি। সহসা ক্যাপ্টেন এলো, আহতের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে গ্লাস থেকে আরেকটু জল মমতা-মাখা হাতে তুলে দিলো, জিজ্ঞেস করলো ঠিকানা। আহত জবাব দিলো, আস্তে আস্তে- যেন মাধ্যাহ্ন সূর্য ধীরে ধীরে গ্রাস করছে কালবোশেখীর কালো মেঘ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় সে বললো তার মনের কথাঃ

ঠিকানা আমার চেয়েছো বন্ধু-
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি? দুঃখ যে দিলে করবো না অভিমান?

*   *   *

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
        তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
        সূর্যোদয়ের পথে।

*   *   *

আমার হদিস জীবনের পথে
মন্বন্তরে থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।

*   *   *

বন্ধু, আজকে বিদায়!
        দেখেছো উঠলো যে হাওয়া ঝড়ো,
ঠিকানা রইলো,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো।
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো ।।

বলতে বলতে আহত অনামা সৈনিক মুর্ছিত হয়ে পড়লো। সকলের মনে প্রশ্ন জাগলো- কে এই অজানা বীর! হয়তো সে একা একা শত্রুকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলো, হয়তো মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলো সে। কিংবা সে একজন গেরিলা বাহিনীর সদস্য।

তাকে তাড়াতাড়ি সামরিক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে আবার পথ চলা শুরু। কখনো মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেনের বার বার মনে পড়তে লাগলো এবং বিড় বিড় আবৃত্তি করতে লাগলোঃ

আমার হদিস জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছুদূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে।

* * *

(বিপ্লব বড়ুয়া রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান থেকে	'শব্দসৈনিক' ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	আগস্ট, ১৯৭১

একটি উর্দু কথিকা

১৪ আগস্ট, ১৯৭১

আজ ১৪ই আগস্ট- মৃত পাকিস্তানের জন্মদিন। এই মৃত শব্দটি শুনে চমকে উঠবার কোন কারণ নেই। গত ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতে ইয়াহিয়া, টিক্কা এবং নিয়াজী সমবেতভাবে পাকিস্তানকে হত্যা করেছে। ২৫ বছরের ভরা যৌবনে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটল। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দেশকে কেন্দ্র করে এই দেশের বিশেষ এক অঞ্চলে কি ধরনের শোষণ-অত্যাচার-চক্রান্ত চালানো হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে বলছি।

গত ২৪ বছরের ইতিহাস অত্যাচার এবং বর্বরতার ইতিহাস। ফ্যাসিজমের একটা জীবন্ত চিত্র। এই চব্বিশ বছরে এদেশের শাসক এবং শোষক গোষ্ঠী গণতন্ত্রের সমস্ত শত এবং দাবীকে পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করেছে। মনুষ্যত্ববোধ এবং মানবিকতাকে বিকৃত করবার চেষ্টা করেছে। বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ- শোষক এই ভয়ে ভীত হয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এর সমস্ত সুফল বাঙ্গালীদের জীবনে বিরাট কল্যাণ ডেকে আনবে। তাই গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তার চক্রান্ত চালিয়ে যেতে লাগল। এবং ধর্ম ও সংহতির নামে গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করা হল। শোষকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল বাঙ্গালীরা ধর্মভীরু। ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে নেবে। ইসলামের নামে অর্থনৈতিক শোষণ এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ শুরু করল। এই শোষণ থেকে বেলুচিস্তান এমনকি সিন্ধুকেও মুক্তি দেয়া হল না। সিন্ধুর জনগণের কবি শেখ আয়াজকে তারা কারারুদ্ধ করল।

সীমান্ত প্রদেশের জনগণের কবি ফারেগ বোখারীকে জেলে পুরে নির্যাতন চালাল। উপমহাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খান আবদুল গফফার খানকে মানবতামুখী কার্যকলাপের দোষে তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করল। এমনকি নির্যাতিত বেলুচীদের মৌখিক দাবীগুলোকে নস্যাৎ করে দেবার জন্য ঈদের জামাতে অমানুষিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়েছিল।

সাম্প্রতিক একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা উল্লেখ করছি। প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৬০% ভাগ দিত বাংলাদেশ এবং মাত্র ৪০% ভাগ দিত পশ্চিম পাকিস্তান। বর্তমান শাসকচক্র সুস্পষ্ট ভাবে জানত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর তাই বাংলাদেশে যুদ্ধের আগুন আরো প্রচণ্ডভাবে জ্বালিয়ে পাকিস্তানের সৈন্যদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে যাতে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা এইসব সৈন্যের ব্যয়ভার আর তাদের বহন করতে না হয়। একবার ভেবে দেখুন, যে দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের পরিচিত, যে দেশের জলবায়ুতে তাদের দৈনন্দিন জীবন অভ্যস্ত নয় সে দেশে ১৫শ মাইল দূর থেকে এসে এই নদীমাতৃক সমতল ভূমিতে তারা কি পেতে পারে- একমাত্র অসহায় মৃত্যু ছাড়া?

নাট্যকার খুনি ইয়াহিয়া এই রক্তাক্ত নাটকের পরিকল্পনা অনেক পূর্বেই করেছিল। এই নাটকের সবচেয়ে ঘৃণিত ও ভয়ঙ্কর চরিত্র টিক্কা খাঁ'কে সে একবার প্রশ্ন করেছিল, ''বলো, তুমি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আয়ত্বে আনতে পারবে কি না?''

টিক্কা বিনা দ্বিধায় চট করে উত্তর দিয়েছিল, হুজুর ৭২ ঘণ্টা নয়, বলুন ২৪ ঘণ্টার ভেতরে আমি বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব। শুধু দশ-বিশ লাখ বাঙ্গালীর রক্তের প্রয়োজন।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নাট্যকার ঘাতক ইয়াহিয়া আহাম্মকের স্বর্গ ইসলামাবাদ চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে সেই রক্তাক্ত নাটকের মঞ্চ বাংলাদেশ।

২৫শে মার্চের সেই ভয়াল রাতে নরঘাতক টিক্কা তার সশস্ত্র বর্বর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র, নিরীহ বাংলাদেশের মানুষের উপর। কামানের কুটিল গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'জয়বাংলা' ধ্বনি আরও প্রচণ্ড রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে-বাতাসে। টিক্কা খান এতে হতভম্ব হয়ে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, এদেরকে নির্বাচারে হত্যা করার আদেশ দিল। পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর পশুরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সমগ্র বাংলা জুড়ে চালাল হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম তারা পুড়িয়ে দিল। বাংলার মাটিতে শুধু রক্ত আর রক্ত। একদিকে এইসব অত্যাচার অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তি ও মনোবল দিন দিন বেড়েই চলল। বাংলার জনতা এক হয়ে একটা ইস্পাতের দেয়াল হয়ে গেল। রক্তলোলুপ হায়েনারা জানত না এরা বাংলার সন্তান, এরা সুন্দরবনের ভয়ঙ্কর বাঘের সাথে খেলে, প্রচণ্ড ঝড়ের সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং মৃত্যুর চোখের উপর চোখ রেখে হাসে।

গত ২৫শে মার্চের পরে টিক্কা খাঁর ২৪ ঘণ্টা- ঘণ্টা থেকে দিনে, দিন থেকে মাসে অতিক্রম করল। এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫ মাস। অর্থাৎ শত্রুকবলিত বেতার থেকে প্রত্যহ তারা প্রচারণা চালাচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক বলে। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অফিসের দরজায় দরজায় তালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, কারখানার চাকা নিস্তব্ধ, মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে বর্বর সৈন্যরা পালাবার পথ খুঁজছে, সত্তরজন সামরিক পদস্থ অফিসার প্রাণভয়ে আকাশ পথে পাড়ি জমিয়েছে। এইসব অফিসাররা তো আকাশপথে পাড়ি জমাবেই, বিপদ আসবে শুধু সাধারণ সৈন্যদের উপর। কেনই বা আসবে না? তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াই তো শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। সামরিক পদস্থ কোন অফিসার যুদ্ধে মারা গেলে তাদের মৃতদেহ কাঠের তৈরী কফিনে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সাধারণ সৈন্য মারা গেলে তাদেরকে বাংলাদেশের মাটিতে মাটিচাপা দিয়ে দায়সারা কাজ সারে। এটাই তো ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ।

মিথ্যের সম্রাট ইয়াহিয়া খান ইরানে গিয়ে বলেছে, হিন্দুদের ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। চমৎকার! মিথ্যার সম্রাট চমৎকার। তোমার ওষ্ঠদ্বয়ই শুধু চওড়া নয়, মিথ্যে বলায় তোমার জিভের দৌরাত্ম্যও অসীম। নিজের ঘৃণিত কার্যকলাপকে ঢেকে ফেলার জন্য আর কত মিথ্যে তুমি বলবে? শোন এহিয়া খাঁ, কান খুলে শোন, বাংলাদেশ স্বাধীন এবং এটা ধ্রুবতারার মত জীবন্ত সত্য। তোমাদের তথাকথিত পাকিস্তান মৃত। তার গলিত শবদেহকে সত্বর কবরস্থ কর, নইলে পচন ধরা দেহের দুর্গন্ধ বাতাস বিষাক্ত করে তুলবে। মারাত্মক বীজাণু ছড়াবে বাতাসে বাতাসে। ইরানের সেই নোংরা বিবৃতিতে তুমি আরও বলেছ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তুমি শাস্তি দেবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয় যার স্পন্দনে স্পন্দিত তাকে তুমি শাস্তি দেবে কি করে? শেখ মুজিব শুধু একজন ব্যক্তির নাম নয়, তার ব্যক্তিত্ব সমস্ত বাঙ্গালীর জন্য একটা আলোকস্তম্ভ, যে আলো পথনির্দেশ করবে একটা শোষণহীন জাতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জেনে রেখো, আমরা যারা বাঙ্গালী তারা তোমাদের মতো শোষকদের এ দেশের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করব। বাংলাদেশে-নব ইতিহাস সূচীত হবে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে রবীন্দ্র-নজরুলের সঙ্গীত মুখরিত করে তুলবে। বিশ্বের ইতিহাসে ফেরাউন, নমরুদ, ইয়াজিদ, চেঙ্গিস, হালাকুর নামের সাথে আর একটা নাম কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। সে নাম তোর। নরঘাতক হায়েনা ইয়াহিয়া, সে নাম তোর।

(উর্দুতে মূল রচনা : জাহিদ সিদ্দিকী। অনুবাদ : আশরাফুল আলম)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের কয়েকটি কথিকা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	........১৯৭১

ইসলামের দৃষ্টিতে

....জুলাই, ১৯৭১

মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন অথবা যে স্বভাবেরই হোক না কেন, আল্লাহতায়া কতগুলো বিষয় থেকে তাকে কখনো বঞ্চিত করেন না। একজন মানুষ অবিশ্বাসী হতে পারে, নাস্তিক বা কাফের হতে পারে, অথবা আল্লাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে পারে, কিন্তু তবুও মানুষ হিসাবে তার কতগুলো অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। সেসব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কারোরই নেই। এ অধিকারগুলো হচ্ছে- আলোর অধিকার, বাতাসের অধিকার, পানির অধিকার এবং মৃত্তিকার অধিকার। অর্থাৎ মানুষকে আলো থেকে বঞ্চিত করবার, বাতাস থেকে বঞ্চিত করবার, পানি থেকে বঞ্চিত করবার এবং মৃত্তিকা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই।

আল্লাহতায়ালা চরমতম পাপীকেও এ সমস্ত অধিকার থেকে মাহরুম করেননি। সুতরাং যেখানে আল্লাহতায়ালা শাশ্বতরূপে কতগুলো অধিকারের সংগে মানুষকে যুক্ত রেখেছেন সেখানে পৃথিবীর কোন প্রচল শক্তিরই অধিকার নেই সেই কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার। যখন মানুষ নিষ্ঠুর হয়ে আল্লাহর নাফরমান হয়ে এসমস্ত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে চায়, তখন সে মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ পাপী বলে চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে যে নৃশংস অন্যায় লীলা চলছে সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী এবং আল্লাহতায়ালার শাশ্বত ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের ঘরসংসার, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে জীবনযাপন করছিল- সে সমস্ত মানুষকে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পথে যারা বের করেছিল তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী। যে মানুষ ক্ষুদ্র এক মাটির ওপর ঘর বানিয়ে সংসার যাপন করেছে, যে মানুষ উৎসবে-আনন্দে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক নির্লিপ্তি হচ্ছে সেসব মানুষকে তাদের সকল প্রকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা শুধু যে মানবিক বিচারে অন্যায় তাই নয়, এটি জঘন্যতম পাপাচার এবং ইসলামের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত। কোরান শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহতায়ালা ফলবান বৃক্ষের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নদী এবং সমুদ্রের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, বাতাস এবং মৃত্তিকার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে এই চারটি সম্পদের মধ্যে প্রকাশিত দেখতে চান।

অর্থাৎ কোন মানুষ খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে না, পানির অভাবে পিপাসার্ত থাকবে না, বাতাসের অভাবে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবে না এবং মৃত্তিকার অভাবে গৃহহারা হবে না। সুতরাং, যে সমস্ত লোক বাংলাদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, বঞ্চনা এবং হত্যাকাণ্ডে সময়কে কলুষিত করছে, তারা ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করলেও পৃথিবীতে তারাই একমাত্র ইসলামবিরোধী। সুতরাং আল্লাহর লানৎ তাদের ওপর একদিন না একদিন পড়বেই।

যারা নিষ্পাপ, নিরপরাধ- যারা শুধু বাঁচার অধিকারের কথা ঘোষণা করতে চাচ্ছে তাঁদের জয় একদিন হবেই। বাংলাদেশের মুসলমান অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এ সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে যারা অন্যায়ভাবে মারণ অস্ত্র ধারণ করেছে, আমি ইসলামের নামে তাদের বিরুদ্ধে অভিশাপ ঘোষণা করছি।

আমাদের জয় হবেই, আমাদের জয় অপরিহার্য ।।

(সৈয়দ আলী আহসান রচিত)

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ

৮ অক্টোবর, ১৯৭১

।। দ্বিতীয় অংশ ।।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরান শরীফের সুরা তওবাতে মুনাফেকদের সম্পর্কে হুজুর (ছঃ)কে নির্দেশ করে বলেছেনঃ

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماوهم بجهنم. وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهمو بما لم ينالوا.

অর্থাৎ, হে নবী, অবিশ্বাসী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন এবং তাদেরকে দমন করুন। এদের বাসস্থান হয়েছে দোযখ। এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। ঐ সমস্ত মুনাফেকগণ কথায় কথায়ই আল্লাহর নামে কছম খায়, পক্ষান্তরে তারা গর্হিত কথাবার্তা বলে ও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কুফুরী কাজ করে এবং লোকসম্মুখে ঐ সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে যেগুলির সাথে তাদের অন্তরের কোন মিল নেই। অর্থাৎ, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের কুমতলব হাসেল করার জন্য ঐ সমস্ত অলীক ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে বেড়ায়, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ওরা হচ্ছে মুসলমান নামধারী বেঈমান। এজন্য ঐ সমস্ত বেঈমানদের কথায় কর্ণপাত করে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ওদের ভাঁওতাবাজির উপযুক্ত জওয়াব দেওয়ার জন্য আল্লাহতালা মুসলমানদের উপর নির্দেশ জারি করেছেন।

আল্লাহতালা সুরা নেছা-তে আরো বলেছেনঃ

الذين امنو يقاتلون في سبيل الله . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان.

অর্থাৎ, যাঁরা বিশ্বাসী ও সৎ তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর যাঁরা অবিশ্বাসী এবং অসৎ তারা মিথ্যা নির্দেশক বা শয়তানের পথে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যুদ্ধ করে। তাই হে বিশ্বাসী ও সৎ

লোকগণ, তোমরা শয়তানের বন্ধু- অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টিকারী, বেঈমান, মুনাফেক ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাবেন, তাঁরা শহীদ ও অমর হয়ে থাকবেন এবং পরকালে অসীম সুখের অধিকারী হবেন। যেমন কোরান শরীফে আছেঃ

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে যাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হবেন; হে মানুষ, তোমরা তাঁদেরকে মৃতব্যক্তি বলে অভিহিত করো না, বরং প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কারণ তারা হলেন শহীদ এবং শহীদকে কখনো মৃত বলে অভিহিত করা ঠিক নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেছেন, আমার নির্দেশিত জেহাদে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অংশগ্রহণ করে তাতে তোমরা উত্তীর্ণ হতে পারো কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে আমি যুগে যুগে বিভিন্ন জেহাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করব এবং কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখব, আমার নির্দেশের আজ্ঞাবহ হয়ে আমার এ সমস্ত অগ্নিপরীক্ষায় তোমরা কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পারো। তোমাদের মধ্যে যাঁরা এ সমস্ত কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারবে, একমাত্র তাঁদের জন্যই রয়েছে অসীম সুখময় বেহেস্তের শুভ সংবাদ। যেমন নাকি আল্লাহতালা কোরানে উল্লেখ করেছেনঃ

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين- الذين اذا اصابتهم مصيبة قالو انا لله وانا اليه راجعون.

অর্থাৎ, আমি কতগুলি জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। সেগুলো হল এইঃ

(১) আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবেশে ফেলে দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করব, যেখানে চতুর্দিক থেকে ভয় ও আতঙ্ক তোমাদেরকে গ্রাস করতে চাইবে।

(২) তোমাদেরঅনাহারে ফেলে ক্ষিধের জ্বালায় কষ্ট দেব কিন্তু আবার কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত রাখব, অর্থাৎ তখন কোন খাবার দ্রব্য তোমরা খুঁজে পাবে না।

(৩) তোমাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে দেব; অর্থাৎ অত্যাচারীরা তোমাদের ধনদৌলত লুট করে নেবে ও বিনষ্ট করে দেবে, অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

(৪) আমি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র. আত্মীয়-স্বজন এবং অত্যন্ত আপনজনকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব, অর্থাৎ মেরে ফেলব।

(৫) তোমাদের ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ এবং শস্য-সামগ্রীতে ভরা ক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগ-যথা ঝড়-তুফান, বন্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেব।

আমি তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বিপদে ফেরে পরীক্ষা করে দেখব- যাতে তোমরা ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, ক্ষিধের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে, ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য হতে বঞ্চিত হয়ে, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনহারা হয়ে, ফলে সুসজ্জিত বৃক্ষ ও সুফলা জমির ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার উপর থেকে ভরসা ছেড়ে দিয়ে একেবারেই হা-হুতাশে পড়ো এবং ন্যায় পথ থেকে সরে দাঁড়াও। ঐ সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আমার নাম স্মরণ করে দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্য নিয়ে এবং সৎপথে থেকে ঐ সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যাও, অর্থাৎ ন্যায়নীতির

ভিতর দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করো। মনে রাখবা, সৎপথ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে ধৈর্য সহকারে ঐ সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করা এবং এ সমস্ত দুর্যোগ যদি কোন অত্যাচারী লোকের দ্বারা সংগঠিত হয়ে থাকে, তবে তাদের ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়ানোর নামও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ।

অতঃপর আল্লাহতালা বলেছেনঃ যে সমস্ত লোক ঐ সমস্ত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর এই সমাধানের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়ে সৎ ও ন্যায়নীতির ভিতর থেকে জেহাদের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বিপদের মোকাবিলা করে, আর ঐ কথা বলে- আমরা আল্লাহরই সিদ্ধান্তের উপর রাজী রয়েছি এবং তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে আমার বেহেস্তের শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।

কোরান শরীফের এই আয়াতের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিগত ২৫শে মার্চ থেকে নরঘাতক জল্লাদ ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে যে গণহত্যা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এবং এর মাধ্যমে এদেশের জনগণের উপর যে ভয়াবহ ও দুর্বিষহ বিপদ নেমে এসেছে, এগুলোও মানুষের উপর আল্লাহতালার বিরাট পরীক্ষা। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অবশ্যই আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। এবং সেজন্য প্রয়োজন হচ্ছে অসীম সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে জেহাদ করে যাওয়া। এই বিপদের দিনে অবশ্যই আমাদেরকে ন্যায়-নীতি মেনে চলতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

অক্টোবর, ১৯৭১

।। তৃতীয় ও শেষ অংশ ।।

পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী বিগত ২৪ বৎসর যাবৎ শুধু বাংলাদেশের জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত করে নাই, উপরন্তু এদেশের জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের ন্যায্য অধিকার চিরতরে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে বিগত ২৫শে মার্চ থেকে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। তারা হিংস্র পশুর ন্যায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত, দোকান-পাট লুট করছে ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, প্রায় এক কোটি লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে ও তিন কোটি লোককে নিজেদের ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে এবং বলপূর্বক এদেশের মানুষকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে ও তাদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ওরা আমাদের সাথে যে ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তা হচ্ছে ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। কোরানের দৃষ্টিতে ওরা শয়তানের বন্ধু এবং দোযখী। অতএব আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহতালা আরও বলেছেনঃ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم ٥

অর্থাৎ, সুপরিকল্পিতভাবে যদি কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করে তবে এর একমাত্র বদলা হচ্ছে দোযখ। এমনকি কোন অমুসলমানকেও যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তবে তার জন্যেও একই শাস্তির কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। দোযখীদের সাহায্য করাও দোযখের কাজের মধ্যে গণ্য। আল্লাহতালা বলেছেন, আমার বান্দা যত বড় গোনাহ বা অন্যায়ই করুক না কেন, সে তার অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যদি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তা আমি মার্জনা করে দেব। কিন্তু কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করে, অন্যের অধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, অপরের মনে কষ্ট দেয় ও নারীর অমর্যাদা করে সে আমার যত এবাদত বন্দেগীই করুক না কেন আর যত ক্ষমাই চাক না কেন, তাকে ক্ষমা করার কোন অধিকার আমার নেই। তাকে একমাত্র ক্ষমা সে-ই করতে পারে, যার সঙ্গে সে এহেন আচরণ করলো। রাসূলুল্লাহ

(ছঃ) বলেছেন, এ ধরনের আচরণ করে যে ইহলীলা ত্যাগ করবে, সে সবচেয়ে নিম্নস্তরের হতভাগ্য ব্যক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের লোক হীনতর ইতর প্রাণী শূকর ও কুকুরের চেয়েও বেশী নিকৃষ্টতর। যেমন আল্লাহতালা তাকে কোরানে বলেছেনঃ اولائك كالانعام بل هم اضل
সুতরাং, চিন্তা করুন ওরা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে অন্যের অধিকার নষ্টের কাজে লিপ্ত রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা কত বড় অপরাধী! নারীদের উপর বলাৎকার করা ইসলামের কঠোর ভাষায় নিষেধ আছে। হুজুর (ছঃ) বলেছেন-

الزني لايزني حين يزني وهو مؤمن

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি মুসলমান থাকা অবস্থায় কোন নারীর সাথে জেনা বা অবৈধভাবে পাশবিক লালসা চরিতার্থে মিলিত হতে পারে না। সুতরাং পাক হানাদার পশুরা যেভাবে বাংলাদেশে নারীধর্ষণ চালাচ্ছে, তাদেরকে আমরা ইসলামের নামে সংহতির ধ্বজাধারী মুসলমান বলে মেনে নিতে পারি না। তারা হল মুসলমান নামধারী বেঈমান ও মুনাফেক। অতএব, এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ও সার্বিক অসহযোগিতা প্রদান করে ওদের বেঈমানীর সমুচিত জবাব দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের ইসলামিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি আমাদের এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করি, তবে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরাও ওদের সম-অপরাধী বলে গণ্য হব। কারণ, ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে প্রতিটি বিশ্বমানবকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অর্থ শুধু অস্ত্রধারণ করে জেহাদই নয়- অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিক সাহায্য প্রদান, অন্যায়কারী ও তাদের সহযোগীদের সাথে সার্বিকভাবে অসহযোগিতা করা, এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের নানাভাবে সাহায্য প্রদান করা, এর বিরুদ্ধে মানুষকে বুঝিয়ে গণসমর্থন গড়ে তোলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয়ের উপর দৃঢ়বিশ্বাস ও আশা পোষণ করা এবং পুরোপুরি ধৈর্য সহকারে সৎ ও ন্যায়নীতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উজ্জ্বল ও স্বর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখাও ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, হে বাঙালী ভাইবোনেরা, আসুন আমরা অন্যায়কারী পশ্চিমা হানাদার পশু ও এদের পদলেহী দালাল কুকুরদের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে জেহাদ চালিয়ে আমরা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

نصر من الله وفتح قريب.

(আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর রহমান রচিত)

বাইবেল পাঠ ও আলোচনা

.....নভেম্বর, ১৯৭১

আজ আমরা আলোচনা করব যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যু সম্পর্কে। প্রথমেই পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র থেকে কটি অংশ পাঠ করে নেই।

.....“প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল।”

"তখন পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল, ...তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমি ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। ....তখন যীশুকে দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকেরা চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও। ...পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই। তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।"

একথা বললে ভুল হবে না যে, জগতে যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব ছিল ঈশ্বর-নিরূপিত। যীশু জগতে এসেছিলেন মানুষকে তার পাপের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোক-সরণীতে পৌঁছে দিতে। তিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য- মুক্তির পথ দেখাবার জন্য। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে আমিই পথ, সত্য ও জীবন- আমাতেই তোমরা পরিত্রাণ পাবে। বলেছিলেনঃ সৎ হও, পবিত্র জীবনযাপন কর; কারণ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর পবিত্র। আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দেব।' তাঁর সমস্ত বক্তব্য ছিল মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে। জীবনভর তিনি অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই সামাজিক প্রভুত্বের ক্ষমতালোভী যাজক-পুরোহিত ও গোঁড়াদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা প্রতিবাদ করেছেন। কারণ, এই সমস্ত ভণ্ড ধর্মগুরুরাই তখন মানুষকে এক মহাভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থে। এরাই নিজেদের কুটিল চক্রান্তে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে নিজেদেরকে মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে বসাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মানুষ তখনকার দিনে সরাসরি ঈশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পারতো না। আসতো ঐসব যাজকদের কাছে।

কিন্তু খ্রীষ্ট এসে মানুষকে দেখালেন প্রকৃত সত্যকে। কারণ, পাপী মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসীম সমমর্মিতা। মানুষকে ভালোবেসে তাই তিনি স্বর্গ ছেড়ে মাটিতে এসেছিলেন মানুষের অতি কাছে। এর ফলে পুরোহিত সম্প্রদায় ভিন্ন সকলের কাছে তিনি শুধু আপন হয়েই ওঠেননি- সকলের হৃদয়ে তাঁর জন্য পাতা হয়েছিল শ্রদ্ধার আসন। সকলেই তাঁর ধর্ম উপদেশ শুনতে ভালোবাসত। সকলেই তাঁকে প্রকৃত ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্র সেদিন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা তখন সর্বদাই যীশুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে। তাঁর দোষ ধরতে চেষ্টা করেছে, তাঁকে জনসমাজে-অপদস্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তারা যীশুর প্রাণনাশের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। আজও যেমন সুবিধাবাদী, বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই, সেদিনও অভাব হয়নি। যীশুর বারোজন শিষ্যের একজন এসে যোদ দিল এই ষড়যন্ত্রে- শুধুমাত্র অর্থের প্রলোভনে।

এই বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের সাহায্যে চক্রান্তকারীরা লোকচক্ষুর আড়ালে রাতের অন্ধকারে গেৎশিমানী বাগান থেকে যীশুকে বন্দী করল। ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষ পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার জন্য নিভৃতে নির্জন স্থানে শিষ্যদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে হাজির করা হয়েছিল বিচারকের কাছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল- এ ব্যক্তি ঈশ্বর-নিন্দুক, কারণ এ নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে। আরও অভিযোগ করা হল, এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, কারণ এ নিজেকে যিহূদীদের ইব্রীয়দের রাজা বলে ঘোষণা করেছে। বলা বাহুল্য, সে সময় সমগ্র প্যালেস্টাইন দেশ রোম-সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যাহোক, যীশুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল তার জন্য পুরোহিত-তন্ত্র হাজির করেছিল বহু মিথ্যা সাক্ষীকে। রোম সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন দেশাধ্যক্ষ পীলাত। তার সামনে চলল এক বিচারের প্রহসন। তিনিও বুঝলেন যাজকরা হিংসার বশে যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে। বুঝলেন, ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে এনেছে রাজদ্রোহিতার

অভিযোগ- যাকে অবজ্ঞা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যুগে পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল বিস্তৃত। তারা পীলাতকে ভয় দেখাল যে, যদি পীলাত যীশুর বিচার না করে তবে তিনি রোম সম্রাটের প্রকৃত বন্ধু নন।

পরিশেষে পীলাত নিজের ভালো দেখলেন। চাইলেন তার বিরুদ্ধে যেন সম্রাটের কাছে কোন নালিশ না যায়। তাই তার বিচার প্রহসনে দাঁড়িয়ে গেল। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিচার বিচার খেলাটা শেষ হয়ে গেল। প্রকাশ করা হল রায়- ঐ ব্যক্তিকে চরম দণ্ড দেওয়া হল। না, ফাঁসী নয়- আরও নির্মম, নৃশংস ও লাঞ্ছনার মৃত্যুদণ্ডাদেশ-ক্রুশীয় মৃত্যু। হাতে, পায়ে পেরেক গেঁথে ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে যীশুকে হত্যা করা হল- যিনি ছিলেন নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ ব্যক্তি। যিনি এসেছিলেন মানুষের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের শুচিতা, শুভ্রতা ফিরিয়ে আনতে। যিনি এসেছিলেন মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করে অনন্ত, অমৃত জীবনের সন্ধান দিতে।

এখন প্রশ্ন হল, তাঁর মৃত্যুতেই কি সব শেষ হয়ে গেল? তিনি কি হেরে গেলেন পাপী প্রতিক্রিয়াশীল পুরোহিত-তন্ত্রের কাছে? তাঁর মৃত্যু কি তাঁর সাথে মানুষের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল? না। এর উত্তরে অসংকোচে বলা যাবে, তা নয়। অন্ধকারের পরে আসে আলো- এটা বিতর্কিত নয় কিন্তু প্রাকৃতিক সত্য। যীশু প্রমাণ করলেন মৃত্যুর পরে তেমনি আসে পুনরুত্থান। মৃত্যুর তিন দিন পর কবর থেকে অমোঘ মৃত্যুকে পরাজিত করে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। তাঁর পুনরুত্থান তার প্রতি বিশ্বাসী মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিল। মানুষকে বললেন, আমাকে বিশ্বাস কর। বললেনঃ ভয় নেই আমি আছি, আমি তোমাদের শক্তি দেব। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর- পরাজিত হবে না। আমার মতো বিজয়ী হবে। পাপের সাথে যুদ্ধ কর- অবশ্যই তোমরা পাপকে জয় করতে পারবে। কারণ, আমি তোমাদের পরিত্রাণ কর্তা- তোমাদের শক্তিদাতা। মৃত্যুকেও তোমরা জয় করবে, আমার মতো মৃত্যুঞ্জয়ী হবে- ঈশ্বরের রাজ্যে, অনন্ত জীবনের দেশে তোমরা পৌঁছাতে পারবে। তখন অনায়াসেই বলতে পারবে- মৃত্যু, তুমি নাই।

কবির ভাষায়ঃ

‘মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে।’

(ডেভিড দাস রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১২। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	২০ নভেম্বর, ১৯৭১

[অফুরন্ত আনন্দের বন্যা নিয়ে ঈদ আসে আমাদের দ্বারপ্রান্তে। রমজানের শেষে এবারও এসেছে ঈদ-উল-ফিতর। কিন্তু এবারের ঈদ বয়ে আনেনি সেই আনন্দবন্যা।

পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলার মাটি বাংলার আকাশ আজ রক্তরাঙা। এবারের ঈদ তাই আমাদের জীবনকে অগ্নিশপথের আলোকে বিচার করার দিন। এগিয়ে চলার মুহূর্ত। এখন শুনবেন ‘রমজানের ওই রোজার শেষে”- একটি স্মৃতি আলেখ্য। -স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা।]

রমজানের ওই রোজার শেষে

1st Voice (Male)

বাংলার আকাশে আবার শওয়ালের চাঁদ উদিত। অঘ্রাণের কুয়াশামাখা দিগন্তে এক ফালি খণ্ড চাঁদে কত আলো আর আনন্দের প্রত্যাশা! কিন্তু সেই আলো আর আনন্দ আজ এমনভাবে নিভে গেল কেন? আকাশে যেন চাঁদ নয়, চাঁদের করোটি। ঈদের আহত চাঁদের গা বেয়ে যেন ঝরছে চাপ চাপ রক্ত। বাংলার আকাশ আজ লাল, মাটি আজ লাল। হেমন্তের পাখি গান গায় না। নবান্নের ধান কুমারী মেয়ের মত বাতাসের প্রথম সোহাগে আর আন্দোলিত হয় না বাংলাদেশের সবুজ ক্ষেত্রে। শওয়ালের চাঁদ, তবু তুমি এসেছো মৃত্যুদীর্ণ বাংলার আকাশে। আলো আর আনন্দের সব পশরা দূরে রেখে। এসেছো রক্তাক্ত দেহে। এসেছো নিহত শিশুর আর নারীর লাশের ছবি বুকে গেঁথে-

2nd Voice (Femal)

“ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্,
এনেছে এজিদ বাংলার বুকে মোহাররমের চাঁদ।
এসেছে কাসেম এসেছে সখিনা সারা দেহে হায় তপ্ত খুন
আজ নয় ঈদ, আজ কোটি মুখে ইন্নালিল্লা......রাজেউন।
ওরে বাংলার মুসলিম তোরা কাঁদ্,
এনেছে এজিদ আবার এদেশে মোহাররমের চাঁদ।”

1st Voice (Male)

শওয়ালের চাঁদ নয়, মোহাররমের চাঁদ। না, তা কি করে হয়? রমজানের পর কি মোহাররম না শওয়াল?

1st Voice (Female)

শওয়াল। কিন্তু বাংলার আকাশে এখন রমজানের পর মোহাররম। শওয়ালের চাঁদ পথ ভুলে গেছে। এজিদের তরবারির ভয়ে, বর্বরতার ভয়ে বঙ্গোপসাগরে উঁকি মারতে এসে সে পালিয়ে যায় তার সব আলো আর

আনন্দ নিয়ে দূরে আরবের মরু বিয়াবানে। এবার দামেস্কে নয়, ঢাকায় হয়েছে এজিদের অভ্যুদয়। তার সীমার সেনারা ঘুরছে বাংলার পথে পথে। লুট করছে নারীর ইজ্জত, হত্যা করছে রোজাদার বাঙালীকে। এজিদের বাবা যেমন একদিন বর্শার আগায় পবিত্র কোরান বেঁধে বিভ্রান্ত করেছিল আরবের মুসলমানদের, এ যুগের এজিদ ইয়াহিয়াও তেমনি ইসলাম আর কোরানের দোহাই পেরে বিভ্রান্ত করতে চাইছে বাংলার মুসলমানকে। সে যুগের এজিদ ছিল মুসলমান। এ যুগের ইয়াহিয়াও মুসলমান। এজিদ কারবালায় হত্যা করেছে দশ হাজার মুসলমানকে। আর ইয়াহিয়া বাংলাদেশে হত্যা করেছে কয়েক লাখ মুসলমানকে।

1st Voice (Male)

ঠিক। ঠিক। এজিদ বলেছিল, আরবের মুসলমানকে খেলাফৎ দেব না। আমি চাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ইয়াহিয়া বলছে, বাংলার মুসলমানকে আমি গণতন্ত্র ও স্বাধিকার দেব না। আমি চাই মিলিটারী ফ্যাসিজম কায়েম। রাখতে। আলোচনার নামে এজিদের বন্ধু কুফার বিশ্বাসঘাতক মুসলমানেরা মহানবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কারবালায়। তার পিপাসার্ত স্ত্রী, পুত্র, শিশুকে এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দেয়নি খেতে। এ যুগের ইয়াহিয়া আলোচনার নামে বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করেছে। আজ তিনি কোথায় কেউ জানে না। কেউ জানে না।

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে]

তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব
বাংলাদেশের প্রাণে গানে চিরঞ্জীব
শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।।

2nd Voice (Female)

বঙ্গবন্ধু আছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর বুকে। ইয়াহিয়া বা টিক্কার মত নরপশুদের সাধ্য নেই এই নামটি বাঙালীর বুক থেকে মুছে দেয়।

1st Voice (Male)

নবীর নয়নমণি ইমাম হোসেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কুফাবাসী বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন মুসলমান। বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলার কয়েকজন কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক মুসলমান। নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ, কাসেম, সোলায়মান, খাজা খায়রুদ্দি, গোলাম আযম, মাহমুদ আলী গয়রহ। এদের চরম শাস্তির দিন আজ সমাগত। বাংলার বুক থেকে এই নামগুলোর অপবিত্র অস্তিত্ব মুছে দিতে হবে।

2nd Voice (Female)

এবার নিয়ে দু'বার- দু'বছর মোহাররমের চাঁদ এলো আকাশে শওয়ালের চাঁদের পরিবর্তে। গত বছর ঠিক রোজার ঈদের আগে বারোই নভেম্বরের কাল-রাত্রিতে বিশ লাখ বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রচণ্ড ঝড়ে। সেদিনও ইয়াহিয়া পিণ্ডির শাদ্দাসী বালাখানায় বসে হেসেছে। বাংলার মানুষকে বাঁচাতে, বিপন্ন মানবতার ত্রাণে নেবে আসেনি এই মনুষ্যদেহধারী জানোয়ার গোষ্ঠী।

1st Voice (Male)

গত ঈদেও সারা বাংলা কেঁদেছে। কেউ গায়নি প্রাণভরে- ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ- গেয়েছে মোহাররমের মর্সিয়া, ঈদের জামাতে হয়েছে- জানাজার জামাত।

2nd Voice (Female)

বাংলার মানুষের কণ্ঠে শুনেছি তারই আর্ত ক্ষোভ-
"বাঁচতে চাইলে বাঁচবে এমন কথা তো নেই
প্রমাণ পেলে তো হাতে হাতে
বিশ লাখ শিশু নারী ও যুবক আজকে নেই
মরে গেছে তারা এক রাতে
বাঁচতে গেলেই বাঁচবে এমন কথা তো নেই।।

প্রভু, তুমি এই পুণ্যির মাসে ধন্যি,
ঝড়ে নেভায়েছো লক্ষ প্রাণের বহ্নি
সাগরে ডুবেছে আমার স্বপ্ন-শিশুরা
তোমার ধ্যানেতে নিরত এখনো যীশুরা
আর যারা আছে, তারা প্রাণ দেবে নীরবে-
নাহলে তোমার পুণ্যিমাসের কি রবে?

কাফনে জড়নো চাঁদের শরীর গলিত লাশ
দ্বীপাঞ্চলের বাতাস এখন দীর্ঘশ্বাস
গোলাপের মত কত ফোঁটা ফুল লুণ্ঠিত
মৃত্যু মলিন ঠোঁটে চাপা ক্ষোভ কুণ্ঠিত।"

1st Voice (Male)

গেলবার প্রকৃতির হাতে মারা পড়েছে লাখো মানুষ। সেই মৃত্যুদীর্ণ বাংলার বুকে আবার আঘাত হানতে দ্বিধা করেনি রক্তপাগল নরপশু ইয়াহিয়া। এ বছর মরেছে দশ লাখ। ১ কোটি মানুষকে হতে হয়েছে দেশছাড়া। বাংলার ঘরে ঘরে আজ হাজার সখিনার শরীরে শ্বেতবাস। কাসেমের লাশে ভরে গেছে বাংলার প্রান্তর। শওয়ালের চাঁদের ছদ্মবেশ ধরে আবার বাংলার আকাশে উঠেছে মোহাররমের চাঁদ।

2nd Voice (Female)

আবার শয়তান সীমারের ছুরি উদ্যত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীর বুকে। পবিত্র রমজান মাসে কারফিউ জারি করা হয়েছে ঢাকা শহরে। ঘরে ঘরে চলছে, সার্চ, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। শওয়ালের চাঁদ, তুমি মুখ ঢাকো। তোমার আলোয় যারা মোনাজাতের হাত তুলবে পশ্চিমমুখো হয়ে পবিত্র কাবাঘরকে সাক্ষী রেখে, যারা জামাতে শামিল হয়ে করবে এবাদত, তারা আজ কোথায়? তাদের কঙ্কালের স্তূপে, তুমি কিসের আলো ছড়াবে- আনন্দের, না শোকাশ্রুর?

[নেপথ্যে গান]
ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দিবি শোন আসমানি তাগিদ।।

1st Voice (Male)

না শোকাশ্রুর নয়, সংকল্পের। এবারের শওয়ালের চাঁদ বাঁকা খঞ্জর হয়ে বাংলার মানুষকে পথ দেখিয়েছে। উঠুক মোহাররমের চাঁদ বাংলার আকাশে। আমরা কাঁদবো না। অশ্রু ফেলবো না। বাংলার তরুণের হাতে আজ অস্ত্র। ঈদের চাঁদের বাঁকা শরীরের মত বাঁকা তলোয়ার। শত্রুনিপাতের সংকল্পে আজ ঐক্যবদ্ধ লক্ষ বাঙালী তরুণ। ওই দ্যাখো, সীমারের চোখে আজ ভয়। এজিদের চোখে ঘনায়মান পরাজয়ের আতঙ্ক।

[আবার গান]
রমজানের ওই রোজার শেষে.............

2nd Voice (Female)

রমজানের রোজার শেষে এবারের ঈদ খুশীর ঈদ নয়, সঙ্কল্পের ঈদ। সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়ার খুশির ঈদ। শত্রুবধের খুশির ঈদ। দেশ ও মাতৃভূমির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার খুশির ঈদ। আত্মোৎসর্গের ঈদ। শহীদী দরজা খুলে দেওয়ার ঈদ। গাজী হওয়ার- বিজয়ী হওয়ার আনন্দের ঈদ।

[আবার গান]

রমজানের ওই রোজার শেষে........

1st Voice (Male)

হেমন্তের আর্দ্র কুয়াশামাখা চাঁদের কি সজল মিনতি- বাংলার যুবশক্তি রুখে দাঁড়াও। বাংলার আকাশে বজ্রে ও বিদ্যুতে কি গভীর কানাকানি- বাংলার মানুষ, বজ্রকঠিন শক্তিতে আঘাত হানো। ঈদের জামাতে শামিল হয়ে যে হাত উর্ধ্বে তুলে ধরবে মোনাজাতের জন্য, সে হাত দৃঢ়মুষ্টিতে পরিণত করে শেষ আঘাত হানো হানাদার দস্যুদের উপর। বাংলার বাতাস থেকে মোহাররমের মর্সিয়া মুছে দাও, বাংলার আকাশ থেকে মোহাররমের চাঁদকে বিদায় দাও। আসুক পুণ্য বিজয়ের ঈদ, শওয়ালের চাঁদ। চূড়ান্ত বিজয়ের চাঁদ আলো আর আনন্দ ছড়াক শত্রুমুক্ত বাংলার আকাশে। রমজানের রোজা, ত্যাগ, কৃচ্ছ্রতা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের সত্যি সত্যি আসুক প্রকৃত খুশির ঈদ। গানে গানে ঝঙ্কৃত হোক কোটি বাঙালীর হৃদয়, আর সেই দৃঢ় প্রত্যাশায় বুক বেঁধে বলি- মোবারক হো ঈদ, ঈদ মোবারক।

[গান- রমজানের ওই রোজার শেষে ......।।

(রচনাঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রযোজনাঃ মেসবাহ আহমেদ)

রক্তে রাঙা ঈদ

শরীফ- দেখছিস ঐ ভাঙা বাড়িটার দেয়ালের ওপর দিয়ে, পোড়া গাছটার মাথা ছুঁয়ে ঈদের চাঁদ উঠেছে- একফালি সরু চাঁদ!

কবীর- হ্যাঁ, অসংখ্য শহীদের বুকের পাঁজরার হাড় যেন চাঁদ হয়ে ফুটে উঠেছে আকাশের গায়ে। পড়িসনি- নজরুলের ‘কৃষকের ঈদ’?

শরীফ- নিশ্চয়ই পড়েছি। বাংলার নিঃস্ব শোষিত জনগণের মর্মকথাকে নজরুল প্রাণস্পর্শী ভাষায় ছন্দে প্রকাশ করেছেন-

জীবনে যাদের হররোজ রোজা
ক্ষুধায় আসে না নিদ
ক্ষুধাতুর সেই কৃষকের ঘরে
এসেছে কি আজ ঈদ?

কবীর- আমারও প্রশ্ন তাই রে- লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ বুকে নিয়ে সারা বাংলা যখন গোরস্থান- নির্যাতিত শিশু, নারী, বৃদ্ধার কান্নায় বাংলা যখন ক্রন্দসী, মজলুম মানুষের ফরিয়াদে বিশ্বের বাতাস ভারাক্রান্ত তখন ঈদকে খুশির ঈদ বলে মোবারকবাদ জানাতে পাচ্ছি না।

শরীফ- তবু তো প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। রোজই সূর্য উঠছে ভোরকে রাত্রির কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে। আবার সে সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যে আসে ছায়াভীরু পদক্ষেপে-

কবীর- কিন্তু আমরা কি আগের মত- সেই ভয়ংকর রাক্ষুসে রাত ২৫ শে’র পূর্বে, যেমন করে সকালের সূর্যের আলোয় নেয়ে উঠতাম- তেমনটা কি এখন পারি? সন্ধ্যা মায়াময় গন্ধ ছড়ায় না। একটা ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ অন্ধকারে গা ঢেকেই পাক হানাদাররা আমাদের আক্রমণ করেছিল- আজও করছে- দিন-রাতে আমরা সবসময়ই মৃত্যুর মুখোমুখি- শয়তানের সম্মুখীন।

শরীফ- জানি কবীর, আমরা তাই গতানুগতিকভাবে ঈদকে মোবারকবাদ জানাতে পারবো না, জানাতে পারবো না, তেমন করে খুশির ঢেউয়ে গা ভাসাতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে ঈদ-উল ফিতর তো ফিরে যাবে না আমাদের দ্বার থেকে।

কবীর- না, ফিরিয়েও দিবো না আমরা- আমরা নতুনভাবে ঈদকে স্বাগত জানাবো। (নেপথ্যে মেশিনগানের শব্দ) ঐ শোন- গুলির শব্দ- সংঘর্ষ চলছে হানাদারদের সাথে মুক্তিবাহিনীর- (একটু হেসে) ঢাকায় ঈদের চাঁদ দেখলে ছোট ছেলেরা পটকা ফুটাতো উল্লাসে- আজকের পটকা ঐ গুলির আওয়াজ, বোমার আওয়াজ।

শরীফ- বেশ তো আজকের ঈদকে আমরা সম্বর্ধনা জানালাম বন্দুকের গুলি ছুড়ে, শপথ নিয়ে কসম খেয়ে- বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে ঈদের প্রকৃত তাৎপর্যে খুশির বন্যা বইয়ে দেবো ঘরে ঘরে। আমাদের জীবনের ঈদকে যারা চির ম্লান করে দিতে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, আমাদের মা বোনের ইজ্জত নিয়েছে তাদের পশুহস্তকে চূর্ণ করেই পালন করবো ‘ঈদোৎসব’।

মা- হ্যাঁ বাবা শরীফ, তোরা কি কেবল গল্প করবি? একটু কিছু মুখে দিবি না? ইফতার করেছিস দু’টুকরো রুটি খেয়ে-

শরীফ- দেবো মা- এক মাসের সিয়াম আমাদের চরিত্রে এনেছে দৃঢ়তা, হৃদয়ে দিয়েছে বল, অনুভূতিকে করেছে তীক্ষ্ণ, বাহুতে দিয়েছে লড়াই-এর শক্তি-

কবীর- সেই শক্তিকে আমরা নিয়োগ করব শত্রুবিতাড়নের সংগ্রামে।

নার্গিস- ভাইয়া শুনেছ, পাক বেতার কি জঘন্য প্রচার চালাচ্ছে!

শরীফ- কীরে?

নার্গিস- ওরা বলছে ঈদের দিনে মুক্তিবাহিনী ঈদের জামাতে আক্রমণ করবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে-

কবীর- ওরা প্রচারপত্রও ছেড়েছে ঢাকা শহরে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে।

নার্গিস- কী জঘন্য! আমরা ইসলাম ধর্মের শত্রু-এই কথাটাই প্রচার করতে চায় তারা, অথচ মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে ইসলামের কি নাম তারা করলো?

শরীফ- যারা মানবতার শত্রু; তারা ইসলামের সকল ধর্মের শত্রু।

কবীর- তাছাড়া মসজিদের উপর গোলাবর্ষণ করে ভেঙে চুরমার করেছে খোদার ঘর! কারা নামাজরত মুসল্লিদের হত্যা করে রক্তে ভাসিয়েছে মসজিদের পবিত্র অঙ্গন? আমরা না পাক হানাদাররা?

শরীফ- আজ বিশ্বের সকলেই জানে ওদের ঐ ধর্মবিরোধী বর্বরতার ইতিহাস- তবু তাদের মিথ্যা ভাষণের বিরাম নাই।

কবীর- আসল মতলব কি জানিস! ৪৮ সালে পেশোয়ারের সীমান্ত এলাকায় ঈদের জামাতে বোমাবর্ষণ করে কাইউম-লীগ সরকার হাজার হাজার পাঠানদের হত্যা করেছিল- ৫৮ সালে আয়ুবী আমলে এই নররাক্ষস টিক্কা খান বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতে বোমা ফেলেছিল- এবার বাংলাদেশে একই পৈশাচিকতার পুনরাবৃত্তি করতে চায় ওরা।

নার্গিস- আর তাই করে দোষ চাপাতে চায় বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জনগণের উপর।

শরীফ- কিন্তু ওদের সে পরিকল্পনা সফল হবে না। আজকের বাঙালী অনেক বিচক্ষণ- আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না। লানৎ নেমে আসবে ওদের মাথায়।

শরীফ- শহীদ-ই-ঈদগাহে জমায়েত ভারী- আমাদের দুঃখকে আমরা ভুলেছি শহীদের আত্মদানের শিক্ষায়, বীর সেনাদের বীরত্বের গৌরবে, শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণায়। রক্তে রাঙা ঈদের চাঁদ শত্রুমুক্ত শোষণমুক্ত বাংলার পতাকায় ছড়াবে নতুন আলো।

(বদরুল হাসান রচিত জীবন্তিকা)

রক্তরাঙা ঈদুল ফিতর

১। মাহে রমজান- ত্যাগ ও তিতিক্ষার এক অপূর্ব প্রতীক। সংযত চরিত্রের মানুষের জন্য এ মাস এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু আজ বাংলার মাটিতে যে দাবানল জ্বলে উঠেছে তাও এবারের রমজান এবং ঈদুল ফিতর পেয়েছে নতুন অর্থ। এবং তারাই আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষ। ক্ষতবিক্ষত বাংলা। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। নতুন শপথে ভাস্বর এবারের ঈদুল ফিতর। আনন্দ নয়, সংগ্রামী প্রত্যয় দৃঢ় তাই বাংলার মানুষ।

আজ নয় নয়, নয় কোন আভরণ
রক্তে রক্তে বাজে দুন্দুভি শপথ নেয়ার দিন
আজকে প্রাণের মহফিলে বাজে
রুদ্র রৌদ্র বীণ ।।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের বুকে
হানে যারা খঞ্জর
নয় ক্ষমা নয় হানো হানো তারে
দুর্জয় দুর্বার
উদ্যত মুঠি করো না শিথিল
মুক্তি সেনানী বীর ।।

আজকে তিমির পল্ললে শোন
জীবনের মহাগান
জয় সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি
জয় জয় মহীয়ান।
রক্ত রঙিন বাংলার বুকে
অতন্দ্র প্রহরায়
জাগে নির্ভীক লাখো সৈনিক
নাই ভয়, ভয় নাই
বঞ্চিত আজি জাগ্রত ওই
এসেছে মুক্তিদিন ।।

(২) দুর্জয় সাহস, দৃঢ় মনোবল নিয়ে প্রতিরোধ করছে শত্রুর হামলা। প্রতিদিন এই বাংলার মানুষ নতুন এক সম্ভবনায় হয়ে উঠেছে উজ্জীবিত। অপূর্ব এই মহাজাগরণ। বাংলার মাটি, বাংলার মানুষ আজ ধন্য। পূর্ণতার এক

জীবনের সন্ধানে আজ দেখছে নতুন স্বপন। নতুন সূর্যদিন ডাকছে ওদের হাতছানি দিয়ে। এক দিগন্তে থেকে অন্য আরেক দিগন্তে আজ তাই চলছে প্রাণের উল্লাসে।

এগিয়ে চলো
দিগন্ত থেকে দিগন্তে আজ
এগিয়ে চলো ।। এগিয়ে চলো ।। এগিয়ে চলো ।।

হিংস্র শ্বাপদ ওই হানাদার
নিঃশেষে নাম মুছে ফেলো তার
বাঙালীর তরে বাংলার মাটি
নিশংক আজ বলো।।

মায়ের বোনের ভাইয়ের রক্তে
ভিজে গেছে এই মাটি
প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম তাই
এ মাটি অনেক খাঁটি ।।

এ মাটির বুকে কোন অনাচার
সইবো না কেউ সইবো না আর
হাতে হাতিয়ার নির্ভয় প্রাণ
জ্বেলে দাও সব আলো।।

(৩) আজ নয় হিসেব নিকেশের দিন, আজ নয় আনন্দ উৎসবের দিন- আজ শুধু সংগ্রাম, ঘরে-বাইরে দুঃসহ দারুণ সংগ্রাম। কাপুরুষ হানাদারদের নিঃশেষে খতম করে তবেই আমরা হবো নিশ্চিন্ত। আজ এই দিনে আমরা তাই শপথ নিই- দেহের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা অর্জন করবো আমাদের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আমাদের জীবনের চেয়ে মহান।

বাংলার নামে আজ শপথ নিলাম
মুজিবের নামে আজ শপথ নিলাম
বাংলাকে করবোই মুক্ত
শত্রুর বিষদাঁত ভাঙবোই ভাঙবোই
আজ আর নয় কোন শর্ত।।

কৃষক শ্রমিক চায় মুক্তি মুক্তি
ছাত্র মজুর চায় মুক্তি মুক্তি

সাড়ে সাত কোটি এই জনতার ইচ্ছা
মুক্তির জন্য হয় হোক মৃত্যু।।

বাংলার বুকে যারা জ্বেলে দিল দাবানল
তারে আজ ক্ষমা নয়, ক্ষমা নয়
লেলিহান অগ্নির দুঃসহ প্রান্তে
দুশমন পুড়ে আজ হোক ছাই।।

শহর নগর চায় মুক্তি মুক্তি
বাংলার গ্রাম চায় মুক্তি মুক্তি
ত্রাসের কাঁপন লাগে শত্রুর বক্ষে
বাংলার বুকে ওরা একেবারে রিক্ত।।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত সঙ্গীতালেখ্য)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠান থেকে	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	.....১৯৭১

বিপন্ন যখন

...অক্টোবর, ১৯৭১

এই অন্ধকার, নিটোল নিশছিদ্র অন্ধকার, অন্তহীন হোক- সে প্রার্থনা করল মনে মনে। আর সেই সুতীব্র অন্ধকারের কামনার সাথে অসাড় হয়ে যাওয়া চেতনা ফিরে আসে নিঃশব্দে, এবং যখন নিজেকে সে আবিষ্কার করল কচুরিপানার ভরা জলাশয়টির এক প্রান্তে। এক গলা জলের মধ্যে মাথায় কচুরিপানা চাপিয়ে কতক্ষণ লুকিয়ে রয়েছে তার নিজেরই মনে নেই। আমার মা, বউ, চার বছর বয়সের ফুটফুটে ছেলেটি- কেউ বেঁচে নেই, নৈঃশব্দের হু-হু ধূসর পটভূমিতে এই সব মনে এল এখন। ছোট ছোট মাছ অথবা জলের পোকা ক্রমাগত তার শরীরের অনাবৃত অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটি তীব্র অনুভূতি, সে ঠিক জানে না তা কি, তার সমস্ত শরীরে ওঠানামা করছে। আস্তে করে কচুরিপানা সরিয়ে সে মাথা তুলল এবং একটি আহত জন্তুর মত ভীত দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। কিছুই চোখে পড়ছে না। অন্ধকার, তার চারপাশে এখন মৃত্যুর মত শীতল অন্ধকার।

এবার উঠি, সে ভাবল এবং অশক্ত পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। যেহেতু ক্লান্তিতে এখন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, তার পদক্ষেপ সংক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো।

জলাশয় পেরিয়ে মাঠ, তার পর আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। তারপর, কি আশ্চর্য, তেঁতুল গাছের পেছনে উঁকি মারে মৃত্যুশয্যার বিবর্ণ ম্লান চাঁদ। দু'এক পা এগোতে এই প্রথম স্পষ্ট বুঝতে পারল ক্ষিধে পেয়েছে তার, এক্ষুনি কিছু খেতে না পেলে সে বোধ হয় মরে যাবে। সতর্ক চোখে তাকায় চারিদিক, কোন বাসগৃহ চোখে পড়ে না- কোন নিকানো আঙিনা বা অস্পষ্ট কোন আলো রেখা। এ গাঁয়ে বোধ হয় কেউ বেঁচে নেই। আখের ক্ষেতের আশেপাশে লুকিয়ে নেই কোন সতর্ক প্রহরা। সে ভাবলো এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফলন্ত ক্ষেতের কিনারে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কয়েকটি আখ ভেঙ্গে নিয়ে একটিতে কামড় বসাল।

এখন সে একটার পর একটা আখ চিবিয়ে চলছে। শক্ত খোসায় লেগে একপাশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই। আখের খোসা ছাড়ান খণ্ডগুলো দাঁতে পিষতে অল্প মিষ্টি অথচ নোনতা তরল পদার্থে মুখের ভেতটা ভরে উঠছে। এখনো পাকেনি, পাক ধরতে সেই আশ্বিন মাস, পুজোর সময়। আর বোধ হয় আমার ক্ষিধে নেই, সে ভাবল এবং আখ চিবানো বন্ধ করল। মাথা ঝিম ঝিম করছে, সমস্ত শরীরে অসহ্য ক্লান্তি এবং ক্রমশ ভারী হয়ে আসা চোখের পাতার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে অজস্র দৃশ্যাবলী। না, ঘুম আসবে না এখন- কারণ সেই বীভৎস দৃশ্যটি এখনো তার চেতনায় অনির্বাণ। ঘাসের উপর শরীরটা ছেড়ে দিতেই স্মৃতিরা ফিরে এল দ্রুত লয়ে, প্রপাতের মত- তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অতীতের সেই নির্দয় মুহূর্তটির নৈকট্যে।

আমার নাম জীবন, জীবন দাস- তার মনে পড়ল। মনে পড়ল বিধবা মাকে, জোয়ান বউ সরমাকে, আর চার বছরের ফুটফুটে বাবুকে। গত পরশু সকালে ওরা বেঁচে ছিল, সুস্থ ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। অথচ, কি আশ্চর্য, ওরা এখন নেই। হিংসার জানোয়ারগুলো নিরস্ত্র নিষ্পাপদের গুলি করে মেরেছে। আর আমি, ঊনত্রিশ

বছরের ক্লীব, অক্ষম যুবক আমি, মা ছেলে- বউকে ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি নিজের মহামূল্য প্রাণটি বাঁচাতে- একথা ভাবতে চোখের জলে ঝপসা হয়ে এল তার সামনের দৃশ্যাবলী।

এখন, এই বিষণ্ন রাতে, তার মনে পড়ল কয়েকদিন আগের একটি অনিশ্চয় রাত্রিকে।

: আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। অন্তরঙ্গ শয্যায় সরমা বলেছিল তাকে।

তা ভাবনা হবারই কথা। যদিও শহর থেকে যাত্রী বোঝাই লঞ্চের আসা যাওয়া হঠাৎ করেই বন্ধ হয়েছে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক মন-কেমন-করা গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল দক্ষিণ খুলনার সুদূর নিস্তরঙ্গ এই গ্রামটিতেও। একটা প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছে নাকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মিলিটারি আর বাংলাদেশের শহর গঞ্জে বাস করা মানুষগুলোর মধ্যে। কারণটা কি, ওরা সঠিক জানে না কেউ- কেবল গ্রামের একমাত্র কলেজে পড়া ছেলে রফিকের কথাবার্তা থেকে একটা ধোঁয়াটে উপলব্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে ওরা। হাতে টাকা নেই, মাঠে ফসল ফলে না, অনাবৃষ্টি বন্যা অনাহার, দুঃস্বপ্নের অনাবাদী বছরে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য দাওয়ায় উঠে বসে পাওনাদারের মত- এ সবকিছুই নাকি পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাদের ষড়যন্ত্রের ফল। যে বিপুল ষড়যন্ত্রে বিরান হয়ে যায় উর্বর, বর্ধিষ্ণু জনপদ- ফলবতী হয়ে ওঠে আজন্মের অনুর্বর মরুভূমিও। বছরের পর বছর অত্যাচার, অনাচার আর শোষণের অবসান ঘটাতে এই জীবনান্ত যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধে আমরা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ জিতবই- রফিকের কণ্ঠে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ঝলমল করে।

: আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে। সরমা আবার পুনরাবৃত্তি করে।

ভাবনা আবার কিসের? সরমাকে নয়, যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে জীবন। শহরে নাকি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে। ক্ষ্যাপা কুকুরীর মত হয়ে গেছে মিলিটারী। মানুষ পেলেই গুলি। কোন বাছবিচার নেই। সরমার গলায় উদ্বেগ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

: তা শহরে যাই হোক গাঁয়ে তার কি? আমাদের এখানে ত আর যুদ্ধ হচ্ছে না। জীবন সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে।

: কিন্তু যদি হয়?

: পাগল! এই অজপাড়াগাঁয়ে মিলিটারী আসপে মরতি? আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এখেনে?

সব আশঙ্কাকে জোর করে সরিয়ে পাল্টা এক প্রত্যয়ের প্রশ্নকে বউয়ের দিকে ছুড়ে দিয়েছে জীবন। চুপ করে গেছে সরমা।

গত পরশুর ভয়ঙ্কর সকালের কথা মনে পড়ল এখন। যথারীতি সূর্য উঠেছিল, নদী থেকে এলোমেলো হাওয়া উঠে এসে গ্রামের গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রশান্ত সকালে আকাশে অনেক সঞ্চারণশীল মেঘ চোখে পাড়েছিল এবং স্পষ্ট মনে আছে জীবনের, বাড়ির পাশের গাছপালা থেকে যথারীতি পাখিদের ডাকাডাকি শুনেছিল ঘুম থেকে উঠেই।

মুখ-হাত ধুয়ে, দু'মুঠো পান্তা খেয়ে, রোজকারের মত রফিকদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। এই আসাটা প্রায় একটি অভ্যেসে পরিণত হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুদিন থেকেই- কর্যত শহরে গণ্ডগোল শুরু হবার পর থেকেই। কেবল জীবন নয়, গ্রামের অনেকেই রফিকদের বাড়িতে ভিড় করত রেডিওর খবর শুনতে।

রফিকদের বাড়িতে পৌঁছে জীবন শুনতে পেল রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর হচ্ছে এবং তার চারপাশে ছোটখাটো একটি উৎসুক জনতা। খান সেনারা মার খাচ্ছে। ক্রমাগত জিতে চলছে মুক্তিবাহিনী,

এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গনে। শিগগির বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবে, রফিকের দৃপ্ত ঘোষণা ভোর বেলাকার এক মিষ্টি স্বপ্নের আমেজ বয়ে আনে যেনবা।

বেলা একটু বাড়তে দূর থেকে অবিরত এক যান্ত্রিক আওয়াজ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। লঞ্চের শব্দ অথবা কোন স্টীমারের। প্রত্যাশায় ব্যাগ্র গ্রামবাসীরা ভাবে। অনেকগুলো জিজ্ঞাসা পাক খায়ঃ যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেল তবে? হেরে গেছে খান সেনাদের দল? সেই শুভ ঘোষণা করতে আসছে বিজয়ী মুক্তিসেনারা?

দুপুরের দিকে তারা এল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে থাকা পাখির মত অসহায় গ্রামটির ওপর। গানবোট থেকে দূরপাল্লার কামানের শব্দ জেগে উঠতেই আগন্তুকের পরিচয় গোপন থাকেনি। গ্রামবাসী প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এ রকম একটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা ওদের কল্পনাতেও অনুপস্থিত ছিল। এখন, এই নির্দয় দুপুরে, অকস্মাৎ তাকে শরীরী হয়ে উঠতে দেখে বৃষ্টির মত আতঙ্ক নামে এবং তা গড়িয়ে গড়িয়ে যায় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

গানবোটের কামানের শব্দ শুনেই দৌড়ে বাড়ি ফিরেছে জীবন। ওদের বাঁচাতে হবে- আমার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর সন্তানকে। এই একটিমাত্র চিন্তায় সে একাগ্র এখন ।

দাওয়ায় বসে মা চীৎকার করে কাঁদছে, সরমার মুখ মৃতের মত ফ্যাকাসে, ছোট্ট বাবু অবাক হয়ে চেয়ে আছে- বাড়িতে পা দিতে তার সামনের দৃশ্যপটটি ছিল এই রকম।

-চল, পালাতি হবে। মিলিটারী।
কথা নয়, যেন কাঁদছে জীবন।
-না মা, কিছছু নিতে হবে না। খালি হাতে চল। শিগগির।

মা-বউ-ছেলেকে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল জীবন। এখন, এই অভাবনীয় সংকটকালে, মৃত্যু যখন একটু ওপাশে ছাঁ করে দাঁড়িয়ে, একটি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার আশ্রয়ের বড় প্রয়োজন।

অথচ সেই নিশ্চিন্ততার আশ্রয় ওদের জোটেনি। রাস্তার মোড়ে সৈন্যের পোশাক পরে মৃত্যু ওদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে ছিল। যমদূতগুলোর মুখোমুখি হতে আর্ত চিৎকার করে উঠেছে মা, গলা ছেড়ে কেঁদে উঠেছে সরমা, আর সেই সাথে ওদের হাতের মেশিনগানগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে লুটিয়ে পড়েছে মা, সরমা আর বাবু। অথচ, কি আশ্চর্য, জীবনের চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় এক ঝাঁক গুলি এবং সেই সাথে রাস্তার পাশের আগাছা ভর্তি খানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়। দ্রুত ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে শুনতে পেল বাবুর গোঙানি, ভারী ভারী বুটের আওয়াজ, বিজাতীয় ভাষার বীভৎস উল্লাসধ্বনি, সহসা কোন নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উচ্চগ্রামে উঠে হারিয়ে যায় নিঃশব্দে। গুলির শব্দ থেমে যেতে এবং বুটের আওয়াজ ক্রমশ অপসৃয়মান মনে হতে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসেছে জীবন। রাস্তায় তার চোখের সামনে পাশাপাশি এলোমেলো শুয়ে তার জননী, তার জায়া, তার একমাত্র সন্তান, ওরা মরে গেছে- এই নির্মম সত্যটি উপলব্ধির পরও চোখে জল এল না তার।

অনেকক্ষণ বিরতির পর আবার খুব কাছাকাছি শোনা গেল গুলির আওয়াজ এবং আর্তচীৎকার। জীবন আর দেরী করেনি। ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আবার মড়ার মত পড়ে রয়েছে। এই মৃত্যুপুরী থেকে, এই নরককুণ্ড থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই, তার লুপ্তপ্রায় চেতনায় তখন একটিমাত্র সিদ্ধান্ত।

দূর গাঁয়ের এই পরিত্যক্ত জলাশয়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাটা দিন এবং সমস্ত সন্ধ্যে। কারণ, গানবোটের আওয়াজ মনে হয়েছে কখনো দূরে, আবার কখনও খুব কাছে। রাইফেল, মেশিনগানের আওয়াজ ভেসে এসেছে অনেক বার।

এখন, এই বিবর্ণ শেষরাতে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে মানুষটি, যার নাম জীবন, আর যার জীবন এক অন্তহীন অর্থহীন যন্ত্রণার উপাখ্যানে পরিণত। সব হারিয়েও আমি এক অন্ধকারের জন্তুর মত পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আমার বিষে নীল হয়ে যাওয়া পদ্মপাতার জীবনকে বাঁচাতে এ কি এক হাস্যকর প্রহসন,এলোমেলো ভাবনারা ঘুরেফিরে আসে।

এই মুহূর্তে, নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ হতে লোকটি আবিস্কার করে- আজন্মের অন্তরঙ্গ মৃত্যুভয় অকস্মাৎ অপসারিত। তার এখন মরতে কোন ভয় নেই, ভয় নেই সেই সব হিংস্র ঘাতকদের মুখোমুখি দাঁড়াতে। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, সারা শরীরে মাখতে চাই আমার সন্তান-হত্যার রক্ত, একটি অমোঘ প্রতিজ্ঞা ক্রমশ ওকে জড়িয়ে ধরছে নিবিড় করে। অতএব, আমি ফিরে যাব। একটি আশ্চর্য সিদ্ধান্তে নিজেই অবাক হল জীবন।

এখন, ভোররাতের আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে, একটি মাত্র কামনা করে হঠাৎ ঋজু হয়ে বসা মানুষটি- অস্ত্র চাই, একটি অমোঘ শাণিত অস্ত্র, যা দিয়ে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে পারি আমার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হার্মাদদের ওপর।

হঠাৎ জীবনের স্মৃতিতে তার ফেলে আসা বাড়িটি একটি ছায়াছবির দৃশ্য হয়ে ভেসে ওঠে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন। তারপর ধানের গোলার নীচে এসে থমকে দাঁড়ায় যেন ক্যামেরার চোখ। ওই তো স্পষ্ট চোখে পড়ছে- তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটিকে, বিকেলের সূর্যালোক তার অবয়বে প্রতিফলিত।

ফেলে আসা বাড়িটি এক দুর্বার আকর্ষণে ডাকছে জীবনকে। চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে গোলার নীচে কাটপাতার তলে লুকিয়ে রাখা হঠাৎ বিপদের অবলম্বন সেই চকচকে ফলার বর্শাটি।

আমি এখন বাড়ি যাব। শেষরাতের হালকা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাব- বিড় বিড় করে নিজেকে শোনায় জীবন। আর তখন সে স্পষ্ট শুনতে পেল- একটি চার বছরের কচি ছেলে তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, শোধ নেবে না বাবা?

উঠে দাঁড়ায় জীবন। শোধ নেবে সে।
সব মৃত্যুর প্রতিশোধ।

(অসিত রায় চৌধুরী রচিত)

আজকের বাংলায়

১৬ অক্টোবর, ১৯৭১

ঘাট থেকে ফিরে এলো গোলাপজান। তার কোলের বাচ্চাটার নোংরা কাপড়-চোপড় ধুয়ে নিয়ে। উঠোনে সেগুলো একটা বাঁশের ওপর মেলে দিতে দিতে সে লক্ষ্য করলো- কলিমুদ্দিন তার ফেরীতে যাবার সরঞ্জামগুলো

সাজিয়ে নিচ্ছে। গোলাপজান ত্রস্তে একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। মেঝেতে তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে তার বছর পাঁচেকের ছেলেটা। ওকে নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে গোলাপজানের এতো ভীতি। গতকাল রাতে যখন ওর সামনে একটা আধপোড়া শুকনো রুটি ও খেতে দিয়েছিল, তখন ছেলেটা কিছুতেই তা গিলতে চায়নি। ওর একমাত্র জেদ ভাতই খাবে আর কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত গোলাপজান সকালেই ভাত রেঁধে দেবে বলে বহু সাধ্যসাধনা করে রুটিটা খাইয়েছিল। এখন, যদি ও উঠেই জেদ ধরে এই আশংকায় যতোক্ষণ কলিমুদ্দিন ঘরের ভেতর ছিল, গোলাপজান ওর সাথে কথা বলেনি। বারান্দায় আসতেই ও স্বামীর উদ্দেশে বলে উঠল-

'আইজ তুমার ফেরীতে জাওনের কাম নাইক্যা।'

'ক্যান, কি অইছে, ঘরেত চাউল নাই, খাওনের কিছু নাই, এড্ডা পয়সাও নাই, হে খেয়াল আছে? এমতেই আইজ দশদিন বাইর অই নাই, প্যাটেত খাওন লাগবো না?'

'থাউকগা অবাবর, তুমারে বাড়িত থাকন লাগবো, আমারে ডর করতাছে।'

'ডর! কি তামাসা করতাছস, ডর কিয়ের লাইগ্যা?'

'হেই কতাই ত কইত্যাছি, ঘাটেত ত্যানাবানি ধুইয়্যা, গোসল কইর‍্যা উঠতাছিলাম, দেহী নাকি, দুইডা মেলেটারি, আমারে দেইখ্যা খাড়াই গ্যালো, আর চিকখোর পাইড়্যা, এশারা কইরা কি য্যান কইব্যার লাইগলো, তারপর আমারে ছটপটাইয়া বাড়িত যাওন দেইক্যা তাগোর কি হাসি। হাচা কইতাছিগো, ডর লাগতাছে, তুমি যাইও না।'

'তোক তাগোর মনে লাগছেরে সোন্দরী, আর আমগো বাবনা কিরে, তোর কপালটা ফির‍্যাই গ্যাল। আচ্ছা থাউক, আমি যাইগ্যা।'

গোলাপজানের উদ্দেশে রসিকতার কথা কয়টি বলে কলিমুদ্দিন তার অ্যালুমিনিয়নের হাঁড়িপাতিলগুলো বিক্রির উদেশ্যে রাস্তায় নামলো।

শহরে এমনিই মানুষজন কম। মিলিটারীদের সাথে শেখ সাহেবের দলের কি একটা গোলমালে মিলিটারীরা সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুট করেছে তাদের সমস্ত সম্পত্তি। ভালো ভালো ঘরের মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। রাস্তাঘাটে অনেক ধর্ষিতা রক্তাক্ত তরুণীর লাশ অথবা অচৈতন্য দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। শহরের প্রতিটি নর্দমা ভরে আছে গলিত মৃতদেহে। একটা ভ্যাপসা পচা কটুগন্ধে ওর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। শহর জনশূন্য। কৃচিৎ-কদাচিৎ কোন বাড়িতে দেখা যায় বুড়ো অথবা আধবুড়ো দাড়িটুপিওলা এক-আধজন মুরুব্বী চেহারার লোক। শহরের সব লোক পালিয়ে গেছে গ্রামে। পথচলিত দু'একটা লোকের মুখে কলিমুদ্দিন এ খবরও পেয়েছে, শহরের লোক গ্রামে চলে যাওয়ায় এখন মিলিটারীদের লক্ষ্য গিয়ে পড়েছে গ্রামে। তারা শহরে যে সমস্ত অত্যাচার চালিয়েছে, এখন ব্যাপক হারে তা চালাচ্ছে গ্রামে। হঠাৎ এসব কথা ভাবতে ভাবতে কলিমুদ্দিনের ভীষণ হাসি পেলো। বোধ হয় একটু জোরেই হেসে উঠলো ও। আরে কি বোকা সে। যেখানে শহরে মানুষ নাই বললেই চলে, যা এক-আধজন আছে, তারাও আতঙ্কে খাওয়াদাওয়া ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, দোকানপাট-হাটবাজার সব ভস্মীভূত-ধ্বংস-প্রায়, আর এরমধ্যে সে কিনা বের হয়েছে হাঁড়িপাতিল বেচতে।

আবার মাইল চারেক হেঁটে শহরতলীর বস্তিবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই তার যেন ক্লান্তিতে সারা দেহ অবসন্ন হয়ে পড়লো। কি করবে সে এখন? একটু জিড়িয়ে নিয় বাড়ির দিকে হাঁটবে? কিন্তু, অন্ততঃ কিছু চাল না নিয়ে সে বাড়ির দিকেই বা যাবে কি করে? হঠাৎ এই মুহূর্তে তার ভীষণ রাগ হলো মিলিটারীদের

উপর। সত্যিই, কি অন্যায় গোটা দেশটাকে ওরা একেবারে ছারখার করে দিল। এতো সুন্দর সাজানো শহর, মানুষজন, বাড়িগাড়ি, সব যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কলকাকলিতে ভরা এতো বড়ো শহরটা, এখন যেন মৃতের শহর। কোথাও প্রাণের কোন কিছু নাই। পথেঘাটে কুকুরেরা লুটোপুটি করে খাচ্ছে মানুষের গলিত অর্ধগলিত শবদেহগুলি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে তার মনে পড়লো গোলাপজানের কথা, তার মুখে শোনা আজ সকালের ঘটনাটা। আঁৎকে উঠলো সে। অজান্তেই ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সে হাঁটতে শুরু করলো বাড়ির দিকে। তার সাজানো সংসার আজো যেখানে অন্ধ স্যাঁতসেঁতে বস্তিবাড়িতে মোটামুটি সম্ভ্রমের সাথেই টিকে আছে- গতকাল পর্যন্ত যেখানে শকুনীর দৃষ্টি পড়েনি- এতোক্ষণ সেখানে যে কি তাণ্ডবলীলা চলেছে কে জানে! আচ্ছা, মিলিটারীরা কি গোলাপজানকে ধরে নিয়ে গেছে? তাই যদি হয়- সলিম, তার বড়ো ছেলেটা, সে কি করছে? নাকি সংগীনের এক খোঁচায় তাকে....না, আর সে ভাবতে পারে না তা তিন মাসের কোলের বাচ্চাটার কথা। ভয়ে-উত্তেজনায় সে হাঁটতে থাকে, তার পা যেন আর উঠছে না মাটি থেকে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে সে বসে পড়লো রাস্তার পাশের বাবলা গাছটার নীচে, ঘাড় হতে তার ফেরীর বোঝাটা নামিয়ে। এক সময় তার মনে হলো আর বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নাই, এতোক্ষণে সব শেষ। এখন বাড়ি গিয়ে যে দৃশ্য সে দেখবে, তা সে দেখতে চায় না। তা সে সহ্য করতে পারবে না।

নাঃ, সে সে যাবেই না আর ওদিকে। বরং বরং সে কামালের সাথে দেখা করবে। উকিলপাড়ার চৌধুরীদের বড়ো ছেলে কামাল, তাদের কামাল ভাই। কামালদের বাড়িটা যেখানে ছিল, সেখানে তখন ইট-সুরকির একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ পাকসেনাবাহিনীর বাহাদুরীর সাক্ষ্য হয়ে জমে আছে। যখন এ ঘটনা ঘটে তখন কামাল বাড়িতে ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্য হতে কামালের ছোটবোন আই-এ ক্লাশে পড়া কুমকুমকে ওরা শুধু জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেছে। আর সবাইকে......যাকগে, এখন সেকথা ভেবে তার কি লাভ। কামাল কোথায় আছে তা সে জানে। বোঝাটা ঘাড়ে নিয়ে সেদিকে পা চালালো কলিম।

এরপর-বিকেলের কিছু আগে কলিমুদ্দিকে দেখা গেল, দুই ফুট চওড়া গ্রেটার রোডে। কোর্ট হতে মাইল দু'য়েক যে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলে হাতের ডাকদিকে চোখে পড়ে তীর চিহ্ন দেওয়া একটা কালো কাষ্ঠফলক, ইংরেজীতে যার গায়ে লেখা Sector Headquarter-B Prohibited Area- সেদিকে। এ লেখা অবশ্য সে পড়তে পারে না, তবে একথা সে জানে ওখানে অনেক মিলিটারী থাকে। এই ভরভেলায় ওই রাস্তায় কলিম কেন যে বোঝাটা নিয়ে চলছে, তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার দু'পাশে যে সমস্ত বড়িঘর, সেগুলো জনশূন্যই, তবু দেখা গেল, দু'পাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইতে চাইতে আর হাঁকতে হাঁকতে কলিমুদ্দিন সে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে এসে পৌঁছল সে কাষ্ঠফলকের সামনে। ওখান হতে সোজা ভিতর দিকে চলে গেছে মিলিটারীর ছাউনীটায় যাবার রাস্তা, জঙ্গলে ঘেরা। একটা গেটের মতো তৈরী করা আছে। আর তার কাছে গোটা পাঁচেক মিলিটারী প্রহরী- কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। সিগারেট ফুঁকছে আর হাসাহাসি করছে।

ওদের দেখেই কলিমুদ্দিন একটা লম্বা-চওড়া সালাম ঠুকে দিল, কোন জবাব এলো না। তাজ্জব বনে গেল। মিলিটারীগুলো। যেখানে ওদের দেখলেই সবাই পালায়, সেখানে এ ব্যাটা নিঃসংশয়মুখে ওদের সামনে দিয়ে শুধু যাচ্ছেই না, সালাম ও দিচ্ছে। একজন মিলিটারী ওকে ধমক দিয়ে উঠল- 'আবে ভাগ্, ইহা তেরা হাণ্ডি কোন খরিদেগা?- 'অহনই যাইত্যাছি সাব, খুব পেরেসান অইছি, পসীনা মুছ্যা লই।' বলে কলিমুদ্দিন মাথার গামছাটা খুলে ঘাম মুছল। মিলিটারীগুলো অবাক বিস্ময়ে ওর ভীতিহীনতা লক্ষ্য করছে। ঘামটাম মোছা শেষ হলে কলিমুদ্দিন ওর টুকরি হতে বের করলো এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট। ম্যাচ দিয়ে ফস্ করে সিগারেটটা জ্বেলে প্যাকেটটা আর ম্যাচটা রেখে দিল টুকরির মধ্যে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে টুকরীর মধ্য হতে কি যেন একটা বের করল। তারপর-ক্ষিপ্রগতিতে সে জিনিসটা ছুড়ে দিল মিলিটারীদের দিকে।

ততোধিক ক্ষিপ্রতায় একটা মিলিটারীও তার দিকে হাল্কা মেশিনগান হতে গুলি ছুঁড়িলো- অব্যর্থ লক্ষ্য- দুটো বুলটেই কলিমুদ্দিনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। লুটিয়ে পড়েছে সে রাস্তায়। ছটফট করছে সে, আর দমকে দমকে তার বুকের রক্ত রাস্তায় লাল লাল ছোপ এঁকে যাচ্ছে।

আর ওদিকে গ্রেনেডের বিকট শব্দে যখন ছাটনী হতে সৈন্যরা উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো, তারা দেখলো, তাদের প্রহরী পাঁচজন শতটুকরোয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে এদিকে-সেদিক ছড়িয়ে আছে। গেটের মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত, তখনও চারপাশে ধুঁয়ো উড়ছে, কাপড় আর পোড়া মাংসের কটু গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মিলিটারীগুলো তার দিকে এগিয়ে গেল- দেখলো, তার দেহটা আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। একটা প্রশান্তির তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত সে মুখে যন্ত্রণার চিহ্নও নাই।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে

২ নভেম্বর, ১৯৭১

প্রেরণার আলোয় যে হৃদয় দীপ্ত, সে হৃদয় প্রকাশের উন্মাদনায় উন্মুখ। এই প্রেরণা জীবনের প্রেরণা এই আলো মেঘের পরে মেঘ জমা আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো আলো নয়। অনেক অনেক আলো।

জীবনকে সুখের ঐশ্বর্যে শান্তির পরশ বুলিয়ে আপন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে পেতে চাই। ঐশ্বর্য বা শান্তিই প্রেরণার উৎস।

প্রেরণার দীপশিখা যে হৃদয়কে স্পর্শ করেছে, সে হৃদয় অনির্বাণ- কেননা এই দীপশিখা দেহকে একদিনে উত্তপ্ত করেনি। সময়, হ্যাঁ প্রচুর কালহননের পর বিবেকতাড়িত মন একটি বিশেষ মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হৃদয় তখন প্রকাশের প্রতীক্ষায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আমরা প্রেরণা পাই। আলো জ্বলে, আলো নেভে না। তথাপি ঝড় ওঠে। বাতাস ছোটে। দীপশিখায় কাঁপন জাগে। কখনো মৃদু, কখনো ভয়ঙ্কর। তাই বলে কি নিভিয়ে দেবে প্রেরণার আলো। নীরব অন্ধকার ঠেলে দেবে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? না, দিতে পারে না কস্মিনকালেও না।

প্রেরণার আলো অন্তরে জ্বলেছে। জেনেছি প্রেরণার উৎস কোথায়। শুধু পাইনি ফসলটুকু। কিন্তু শুনেছি তো কবির কণ্ঠে, "সেদিনও এমনি ফসল বিলাসী হাওয়া মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।"

'পাকা ধান আর রূপসীর শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ। মনে হলে কেমন যেন আবেশ জাগে। উত্তাপও। অথচ না পাওয়ার একটা জলার্ত বেদনা।

না না না, এ হতে পারে না। পেতেই হবে। আলোর রশ্মিটা দিব্যদর্শন করেছি। আর বেশী দূরে নয়। তিমির রাত্রির অবসান হবে। ভোর হবে। পাখি ডাকবে। আবার জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যোদয় প্রাণভরে উপভোগ করবো। হঠাৎ চমকে উঠবো, একি সন্ধ্যা তুমি, এমনি অকালে!

- হ্যাঁ, আমি, চমকে উঠলে যে বড়! এই নাও, মালাটা রাখ।

সন্ধ্যার চোখে-মুখে দুষ্টুমি হাসি। হাতে বকুলমালা। শয্যা থেকে ওঠা সন্ধ্যার মিথিল বৈশিষ্ট্য দৃকপাত করতে অজান্তেই কেমন যেন শৈথিল্য আসে। অন্যমনস্ক হতে চায়। কিন্তু শুধুই কয়েকটি মুহূর্ত। অন্যমনস্ক চিত্ত আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে একটি কথায়- এমন করে আমাকে দেখছ কি? আকাশের দিকে চোখ মেলে দেখ।

ও তাই তো! আমাকে আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে। আমার দৃষ্টি হবে প্রসারিত। আকাশ। মাটি। স্বদেশ। ভালবাসা।

সন্ধ্যা আমাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই আমার দৃষ্টিপথ সৃষ্টি করে দিলো একটি সরল সংলাপে। আমি হাত বাড়িয়ে মালাটি নিয়ে নিলাম। নিমেষে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যা।

'বকুল' ও সন্ধ্যা'। এই দুটোর মধ্যে কেমন যেন দূর অস্তিত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। 'বকুল'-'সন্ধ্যা' না হয়ে 'মালতী'-সন্ধ্যা হতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যা মালতী নিয়ে এল না। এল বকুল নিয়ে। প্রভাতসূর্যোদয় মুহূর্তে। একটি বকুলমালাও জীবনের মহৎ প্রেরণা।

এমনি মহৎ প্রেরণার উৎস খুঁজে বেড়াবো। স্বদেশের লাখো লাখো সন্ধ্যা প্রভাতসঙ্গীতের সুর নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করবে। আবার চিনতে পারবো নিজেকে। উপলব্ধি করতে পারবো।

সন্ধ্যা, এই মুহূর্তে আমি তোমার স্মৃতিচারণ করছি। তোমার সরল সংলাপ আমার মনে পড়ছে। পঁচিশে মার্চের কয়েকদিন আগে বলেছিলে, তুমি ভয়ানক ঘরকুনো। একদিন মিছিলেও যোগ দিলে না। এত ঘরকুনো আমার ভাল লাগে না- তোমার কথায় সেদিন লজ্জা পেয়েছিলাম। এ লজ্জা যে আমার দীনতা তাও বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে ঠিক সেই মুহূর্তে পরাজয়টা স্বীকার করে নিতে পারিনি। কঠিন জবাব দিয়েছিলাম- যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না সন্ধ্যা। হাউকাউ করে, মিছিলে ঘুরে স্বাধিকার পাওয়া যায় না।

রূঢ় জবাবে তোমাকে সাময়িক স্তব্ধ করতে পেরেছিলাম হয়তো কিন্তু বিবেককে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। পরক্ষণেই ভীরু হৃদয় আমার সংকুচিত হয়েছিল। সন্ধ্যা, তুমি জানতে না এসব শ্লোগান মিছিল সভা শোভাযাত্রা আমার বড্ড ভয় করতো! কিন্তু আজ? তুমি জান না কেমন করে আমি জনতার মিছিলে লিখেছি আমার নাম। আমি এখন মিছিলের ভিড়ে। ছিন্নমূল মানুষের মাঝে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেমন করে লাখো লাখো ছিন্নমূল প্রাণ জীবনের জয়গান করে। কেমন করে মরিয়া হয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার সংগ্রামে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো তুমিও এতক্ষণে তস্করদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ।

জান, বুকের ভেতরটা মাঝে মাঝে কেমন যেন করে। তোমার মুখখানি মনে পড়লে একটা অজানিত আশংকায় কেঁপে উঠি। না জানি তুমি কোথায় কেমন করে আছো! অবশ্যি আমি একটি শক্তিও অর্জন করে ফেলেছি। আত্মসান্ত্বনার বিপুল শক্তি। আগে তো সপ্তাহখানেক না দেখলে কেমন ভেঙ্গে পড়তাম। কই, এখন তো আর তেমন হয় না। বলতে পার কোথায় পেয়েছি এই সান্ত্বনা। এই সংযমশক্তি। আমার মনে হয় কি জানো, এর পেছনে প্রেরণা আছে। তোমার ভালোবাসাই এই প্রেরণার উৎস।

সন্ধ্যা, আমার অনেক আশা। হয়তো তুমি এক মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিতা। ঘরের বাইরে। ঝড় কেটে গেলে তুমিও একদিন সুন্দর একটি ঘরের মানুষ হবে। বাংলার লাখো লাখো সন্ধ্যা তোমার মতো সংলাপী হবে। তারা আমার সহোদরা। একদিন বধূ হবে। মা হবে। বীর সন্তানের জননী। তোমার মধ্যে আমি কোথায় আমার মায়ের আদল খুঁজে পাই। আমার মাও যে এমনি কথা বলে। বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে আমি তোমার অস্তিত্ব খুঁজি। দিনমণি বিদায় নিলে আমরা অন্ধকারে জলে জলে স্থলে, কখনোবা কালো পাহাড়ের গায়ে মিলে যাই, অতন্দ্র

রাত জাগি, হানাদার শত্রুশিবির নিশ্চিহ্ন করে অন্যমনে পরিপূর্ণ ভিন্নজগতে- তখন সত্যি ভুলে যাই তোমার কথা। ভুলে যেতে হয়। সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে যখন ক্যাম্পে ফিরি, তখন নিশুতি রাতে অসহায় ছিন্নমূল মানুষের কান্নার শব্দ ভেসে আসে। রাতজাগা দু'একটি পাখি পাখা ঝাপটায়। আমি বাতাসে তোমার ঘন ঘন নিঃশ্বাস শুনতে পাই। অনুভব করি। তুমিও বুঝি এতক্ষণেও কোনও ক্যাম্পে ফিরছ।

সূর্য ওঠার এখনও দেরী। বাকি রাতটুকু আমাদের পাড়ি দিতে হবে। জমাটবাঁধা অন্ধকার ব্যারিকেড সবল বাহুতে উপড়ে ফেলে আবার প্রভাতসঙ্গীতের সুর শুনব। জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাতসূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবো। তুমি আমার বকুলমালা হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ হাসবে।

(মেসবাহ্ আহমেদ রচিত)

রণশিবিরের একটি প্রত্যক্ষচিত্র

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

ছেলেটার কর্মক্ষিপ্রতা এবং কর্মপটুতা আমার প্রথম নজরে পড়ে। অথচ ও আমাকে দেখেনি- এতখানি একান্তচিত্তে সে হাতের যুদ্ধাস্ত্রগুলো নাড়ছিলো। রবিনবাবুর কাছে তার এলাকার কথা শুনতে শুনতে পারি যে বার-তের বছরের ছেলেটার দিকে বেশ মনোযোগী হয়ে পড়েছি তা তিনি লক্ষ্য করে বললেনঃ হ্যাঁ, ও ছেলেটার নাম আলো। ওর বাবা হালিম মাস্টার আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। ওর আর এক ভাই ছিল। এখন তারা কেউ নেই। ও একা।

আমি আগেই শুনেছিলাম, খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের এই গ্রামটার ওপর হানাদার পাকবাহিনী জওয়ানরা দুবার হামলা করে। এবং শেষে এসে গ্রামের কাঁচাবাড়িগুলো পেট্রল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবশ্য মুক্তিসেনা ভায়েরা তার মাশুলও আদায় করেছে এদের কাছ থেকে। তবু হানাদারদের অত্যাচারের পরিচয়টা সরেজমিনে জানতে আমি দীর্ঘ এগার-বার মাইল কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার সময়ে সেখানে পৌঁছে যাই। গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ভায়েরা আমার পরিচয় জানার পর দলপতি রবিনবাবুর কাছে নিয়ে যায়। রবিনবাবু আমাকে জানালেনঃ আপনার কোন সিকিউরিটির অভাব হবে না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে রাতে গ্রামের ধ্বংসচিত্র দেখানো যাবে না- প্রধানতঃ আমাদের গ্রামের সবাইকে কড়া ডিফেন্স দিতে হচ্ছে। রাতের আঁধারে দেখলাম গ্রামের খানা, ডোবা, নালা, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের এক-একটা মজবুত বাঙ্কার- সবাই অস্ত্র হাতে অতন্দ্র প্রহরী।

সকালে রবিনবাবুর সাথে বিধ্বস্ত গ্রামের পোড়া বাড়ি, ভাঙ্গা ঘর, শূন্য উঠোন দেখে মনটা খা খা করে উঠলো। অথচ বাংলার এই গ্রাম একদিন নবান্নের ধানে গানে, ছেলেমেয়েদের কলকাকলীতে মুখর ছিল। তাদের অনেকে আজ হানাদারদের হাতে বলী হয়েছে। অনেকে চলে গেছে অন্যত্র নিরাপত্তার সন্ধানে। একটা আশ্চর্য নির্জনতার কালো গ্রামটাকে বিষাদে যেন ঘিরে রেখেছে। তবু, তবু দেখলাম- যারা আছে, যারা এখনো বাপদাদার ভিটে না ছেড়ে সাহসে নির্ভর করে আছে- তারা সেই নির্জনতার বুকে জীবন জাগিয়ে তোলার সাধনায় রত। ধীরে ধীরে তারা সকল প্রতিকূলতার মুখেও তাদের অধিকার রক্ষার সাহসে প্রত্যয় গড়ে তুলেছে মনের ভিতরে, বাইরে।

গ্রামের সবদিকে ঘুরে দেখে বেলা প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ রবিনবাবুর সাথে মুক্তিসেনা বন্ধুদের গ্রামের অফিসে ফিরলাম। টিনের ছাউনি দেয়া একটু ছোট ঘর, দুটো তক্তপোষ, একটা টেবিল, একটা চেয়ার- এই ওদের অফিস। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রবিনবাবুর কথা শুনছিলাম। কর্মরত ধবধবে ফরসা ছেলেটার দিক থেকে চোখ তুলে রবিনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললামঃ কিন্তু ও একা কেন? রবিনবাবুর মুখের ওপর একটা কষ্টের ছাপ দেখলাম। রবিনবাবু একবার ছেলেটার দিকে এক নজর দেখলেন তারপর ম্লান কণ্ঠে বললেনঃ হ্যাঁ, ও একা। ওর ভাই মনি ক্লাস নাইনে পড়তো। সে আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রথম গ্রুপের সাথে যোগ দেয়। মনির ছিল আশ্চর্য সাহস। পাকসেনারা প্রথমবার এসে গ্রামের মোড়ল হাজীসাহবের বাড়িতে আগুন দেয়। মনি আগুন নেভাতে গিয়ে পুড়ে মারা যায়। মনির মা কয়দিন পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আলো মুক্তিসেনাদের সাথে আসতে চাইতো। কিন্তু ওর মা ওকে বুকে জড়িয়ে রাখতো সর্বদা। কিন্তু এমনটা ঐটুকু ছেলের ভাগ্যে আছে, কে বলবে বলুন? শেষবার যখন পাকসেনারা সমস্ত গ্রাম ধরিয়ে দিল, তখন একপ্রান্তে ওদের সাথে আমাদের ফাইট চলছে, অন্যদিকে গ্রামের নিরীহ নারী-পুরুষ উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে ব্যস্ত। হালিম মাষ্টারের স্ত্রী, হালিম মাষ্টার ও আলো ইতস্ততঃ দৌড়ানোর প্রাক্কালে অকস্মাৎ এক মিলিটারী ট্রাকের সামনে পড়ে যায়। বেঈমান পাকবাহিনীর লোকেরা হালিম মাষ্টারের ফরসা সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করে ট্রাকে তুলে নেয়। বাধা দেওয়ার সাহস দেখাবার অপরাধে হালিম মাষ্টারকে গুলি করে মেরে ফেলে। আলো ভয়ে ত্রাসে মা-মা-মা করে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে- দস্যু ট্রাকটি ঘর ঘর শব্দ করে আলোর জলভরা চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের কাঁচা বাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

রবিনবাবু এখানে থামলেন।

আমি বল্লামঃ তারপর?

রবিন্দ্রবাবু বললেনঃ বহুকষ্টে আগুন আমরা নেভালাম- কিন্তু আপনি তো দেখেছেন এতবড় গ্রামে মাত্র গোটা ছয়-সাত বাড়ি রক্ষা হয়েছে।

আমি আলোর দিকে তাকালাম। রবিনবাবু বললেনঃ আর ঐ আলো- তারপর দিন এলো আমাদের কাছে- বললেঃ আমি মুক্তিসেনা। তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাবো।

রবিনবাবু অল্প থেমে বললেনঃ আমার মনে হয়েছিল ওকে ফিরিয়ে দিই। গ্রামের কারো কাছে ও থাক- কেননা ও যে ওর পরিবারের শেষচিহ্ন। কিন্তু ওকে ফিরাতে পারিনি। ওর চোখের জলভরা প্রতিবাদ আমাকে জয় করলো। তারপর থেকে আলো আমাদের সাথে ওই শিবিরের প্রাণ ও। ও গুলি ছুড়তে চায় বার বার। কিন্তু ও যে একেবারে বার বছরের শিশু। ওকে আশ্বাস দিয়েছিল আর কিছুদিন পরেই ও গুলি চালাবে। মুক্তিসেনা ভায়েরা সারারাত টহল দিয়ে সকালে প্রত্যেকের অস্ত্র আলোর জিম্মায় জমা দিয়ে যায়। এরপর সারাদিন অস্ত্রের সাথে আলোর খেলা। সে প্রত্যেকটা রাইফেল-স্টেনগান খুলবে, পরিষ্কার করবে, তেল দেবে। ওর হাতে অস্ত্রগুলো যেন শাণ পেয়ে চিক চিক করে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় ওই আলোই আবার প্রত্যেকের হাতে জীবন্ত অস্ত্রগুলো তুলে দেয়- এই ওর কাজ। এই কাজেও এত পটু যে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। আলোর দিকে চোখ ফিরে গেল দুজনেরই। আলো আশ্চর্য একাগ্রতায় তখনও কর্মরত। একঝাঁকড়া কালো চুল মাথায়- একটি কচি ফর্সা মুখ, ডগডগে দুটি চোখ- নরম নরম দুটি হাতে কি ভীষণ ব্যস্ততা আলোর। আলো কার মতো দেখতে? হয়ত ওর বাবার মত, নয়তো ওর মায়ের মতো- কিন্তু তারা যে আজ কেউ নেই। এমন অসম্ভব একটি দুঃস্বপ্ন ঐটুকু আলোর জীবনে ঘটেছে ভাবলে বড় পাষণ্ডেরও বোধ করি কষ্ট লাগে।

আলো কাছে গেলাম।

মিষ্টি করে বললামঃ তোমার নাম বুঝি আলো? স্টেনগানের খুলে ফেলা অংশগুলি আঙ্গুলের নরম কারসাজিতে এক মিনিটে ঠকাঠক শব্দে লাগিয়ে নিয়ে মুখ তুলে ছোট করে বললেঃ হ্যাঁ তারপর ডানহাতে স্টেনগানটা রেখে বামহাতে একটা ৩০৩ রাইফেল নিয়ে একান্ত চেনা ভঙ্গিতে পার্টগুলো খুলে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

আমি বল্লামঃ তোমার বাবা-মা কেউ নেই বুঝি?

আলো একটু কাজ থামালো। তারপর বললোঃ ওরা বাবাকে গুলি করে মেরেছে। ডান হাতে একটা বেতের ছড়ি দিয়ে তারপর মাথায় কিছু দেশী তুলো সেঁটে রাইফেলের ব্যারেলটা পরিষ্কার করতে করতে আলো কিছু একটা বলার জন্য মুখ তুললো- কিন্তু কিছু বললো না।

আমি বললামঃ গ্রামে তোমার কোন আত্মীয় নেই? আলো আমার দিকে তাকালে। আমি বললামঃ এই ধরো চাচীমা, খালাম্মা, এমন কেউ? আলোর কচি মুখটা এর পলকের ব্যবধানে অন্য ধাতুর মনে হল। আমার দিকে থেকেও অন্যদিকে তাকালো। বললেঃ আমার মাকে ওরা নিয়ে গেছে- আনতে যেতে হবে। আলোর গলাটা এখন অন্যরকম শোনাল। আমি ওর বাহুর ওপর একটু নাড়া দিয়ে বললাম- ওদের কাছ থেকে আনতে পারবে তুমি? রাইফেলের খোলা ব্যারেলের মধ্য থেকে বেতের ছড়িটা বের করে নেয় আলো, তারপর ব্যারেলের ছিদ্র দিয়ে দূর আকাশের গায়ে চোখ রেখে আলো মাথা নাড়ে। তার সামর্থ্যের ইঙ্গিত দেয়। আলোর কচি নরম মুখটার ওপর চোখ পড়তেই আমার যেন মনে হলোঃ ব্যারেলের ছিদ্র দিয়ে আলো দূরে, অনেক দূরে, নীল নীল চোখ মেলে শত্রুহননের সাহসগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছে, শত্রুর পরাজয়ের পথগুলি চিহ্নিত করছে- মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে তার বাবা হালিম মাস্টার, ভাই মনির মৃত্যুর বদলা নিতে। প্রস্তুতি নিচ্ছে দস্যুদের নাগাল থেকে তার মাকে ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার।

(লেখকের নাম জানা যায়নি)

স্বীকারোক্তি

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১

ছাপাখানাটা শহরের মাঝখানে এবং আবাসিক এলাকায়। এ অঞ্চলে আর কোন ছাপাখানা ছিল না। পরে যখন আরো দুটো ছাপাখানা বসে শহীদ সাহেব চিন্তিত হয়, অবশ্য সেটা সাময়িক। ছাপাখানার কাজে কোন ভাটা পড়েনি, যেমন আজ আসত তেমনি আসতে লাগল।

একতলা বাড়ীর উঠোনের একপাশে বাঁশের চালায় দুটি যন্ত্র নিয়ে ছাপাখানা। একটা ট্রেডল, একটা ফ্ল্যাটবেড। একপাশে শহীদ সাহেবের বসার ঘর, যেটা অফিস বলে বিবেচিত। শহীদ সাহেব প্রায় পঁয়ত্রিশ বয়স, মাথার একপাশের চুল অর্ধেক সাদা-কালো। ইংরেজী সাহিত্যে এমএ, কিন্তু বরাবর ছিল ব্যবসার দিকে ঝোঁক, তাই চাকরি না নিয়ে অল্প মূলধন জোগাড় করে ধরেছে এই ব্যবসা।

ব্যবসায় প্রথম দিকে তেমন সুবিধা হচ্ছিল না। তাই কমার্সের সব বই নিয়ে বসে যায়, বিশেষ করে ছোট ব্যবসা কেমন করে চালাতে হয় এ ব্যাপারে পড়াশোনা করে একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং এখন তার কাছে

এম-কম পাস করা লোকেও অনেক কিছু শিখতে পারে। লেখাপড়ার ফল হিসেবে ছাপাখানার এখন বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। পাঁচজন লোক নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল, এখন পঁয়ত্রিশজন খাটছে।

পত্রিকা বের করার ইচ্ছা ছিল, তাই মাসিক বেরিয়েছে- এবার বাসনা দৈনিকের। বন্ধুবান্ধবের ধারণা শহীদ তা পারবে।

শহীদ সাহেব ভীষণ নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী। সময়মত পাওনা দিয়ে দেওয়া এবং সময়মত কাজ আদায় করতেও ছাড়ে না। তার সঙ্গে ব্যবসা করতে এসে সবাই খুশী। শ্রমিকরাও। বড় ঝড় বড় গাছের উপর দিয়েই যায় প্রবলভাবে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক-একটা ঝড় আসে যা ঘাসকেও রেহাই দেয় না। মার্চ মাসে বাংলাদেশে সে ঝড় এসে গেল। দোসরা মার্চ থেকে সব কিছু বন্ধের সাথে শহীদ সাহেবের ছাপাখানাও গেল অচল হয়ে। সাত তারিখ থেকে শেখ সাহেবের ডাকে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল কর্মীরা মাঝে মাঝে এসে ঘুরে যেতে লাগল, বেশীর ভাগই বাড়ি চলে যাবে ঠিক করে।

দশ তারিখে শহীদ সাহেব সব কর্মীদের নিয়ে মিটিং-এ বসে যায়।

বলে, আমরা এখানে কেন জমায়েত হয়েছি আপনারা জানেন।

জানে, সবাই জানে, তাই সবাই চুপ।

শহীদ সাহেব বলে চলে, দেখুন আমরা রাজনীতি করতে চাই বা না চাই, রাজনীতি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। আজ দেশ যে পর্যায়ে গেছে সেখান থেকে আমাদের আর ফেরার উপায় নেই। এ ব্যাপারে আমাদেরও ত্যাগ স্বীকার করেত হবে। দেখুন, কাজ হোক আর না হোক মাইনে আমাকে গুণতেই হবে। তবে আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন, এ মাসের পনের দিনের টাকা নিয়ে দেশে চলে যান, পরে আমি চিঠি দিয়ে ডেকে আনব, আর বাকী টাকা দু'মাসের মধ্যে কিস্তিতে শোধ করে দেব। প্রেসের আয় কত তাতো আপনারা সবাই জানেন।

শ্রমিকরা প্রতিবাদ না করে এই ব্যবস্থা মেনে নেয়।

ভরা বসন্ত তখন বাংলাদেশে। চৈত্র পবনে বাতাস উতলা। ঝুমকো লতার চাওয়ায় মনের বেদনা উদাস হয়ে দেখা দেয়। মুকুলগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। এমন এক বসন্ত-রাতে অকস্মাৎ সেই ঝড়টা চূড়ান্ত রূপে এসে গেল। পঁচিশে মার্চের রাতে।

ঘুমন্ত দশ লক্ষ লোক খুন করে বিশ্বের দরবারে সাহসিকতার চরম দেখানোর সুযোগ ইয়াহিয়ার নেকড়েগুলো ছাড়েনি।

এক মাস কেটে গেছে ছাপাখানার কোন কর্মীর দেখা নেই। শহীদ সাহেব আর তালা খোলেন না। কি হবে খুলে? ব্যবসা, টাকা-পয়সার কথা চিন্তা হলেই বুকের কাছটা কেমন করে ওঠে তার, মাথা ঘুরে যায়।

কয়েকদিন পর শহীদ সাহেব ছাপাখানা খোলেন, সরকারী চিঠি এসেছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব খুলে রাখার হুকুম।

ধুলো ঝেড়ে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবছেন এমন সময় প্রতিবেশী রসুল সাহেব উঁকি দেন।

বলেন, কি ভাই, অফিস খুলেছেন, বহুত আচ্ছা।

ভদ্রলোক অবাঙালী।

খাতির করে ডেকে বসান শহীদ সাহেব।

দু'চারটে কথা বলে রসুল সাহেব বেশ হৃষ্ট মনে চলে যান। আর শহীদ সাহেব গালে হাত দিয়ে ভাবেন এক মাস আগেও এই রসুল সাহেব যেতে-আসতে সালাম দিয়ে যেতেন, গায়ে পড়ে করতেন আলাপ, আর আজ? এই রসুল সাহেবের দয়ার উপরেই নির্ভর করছে এ পাড়ার লোকগুলোর জীবন-মরণ।

প্রায় তিন মাস কেটে গেছে। ছাপাখানা তেমনি অচল। তবে প্রতিরোধের কাজ দিন দিন জোরদার হচ্ছে। শুধু বোমা নয়, ঢাকা শহরে রীতিমত সামনাসামনিও লড়াই হচ্ছে। চোরাগুপ্তি সংগঠনের সাথে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা দুটো পত্রিকা চলছে, গোপনে একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে চলে যায়- লিফলেট-হ্যাণ্ডবিলও বিলি চলছে।

দু'দিন গভীর রাতে রসুল সাহেব লক্ষ্য করেন শহীদ সাহেবের ছাপাখানায় আলো- আর ট্রেডল মেশিনটাও চলছে। ভাবেন, এত রাতে কি কাজ। বলেন ত কোন কাজও নেই।

রোজকার মত শহীদ সাহেব অফিস খুলে বসেন, ঝিরঝিরিয়ে নেমেছে বৃষ্টি, ভিজে বাতাসে ঘুম ঘুম ভাই। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন চোখের পাতা তার জড়িয়ে গেছে। এক সময় দেখতে পান তার অফিসটা কখন তিনতলা বাড়ি হয়ে গেছে, নীচতলায় চলতে অফসেট মেশিন, লাইনোটাইপে কম্পোজ হচ্ছে। তার দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক বাংলাদেশ', কাগজের শেষ পাতায় নীচের দিকে কোণায় তার নাম লেখা, সম্পাদকঃ শহীদ আহমদ।

এই সময় ভীষণ ঘরঘর শব্দে তার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখে একটা মিলিটারী জিপ সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ঘাড় কাৎ করে শহীধ সাহেব দেখেন জিপটা রসুল সাহেবের বাসার সামনে থেমে গেল। জিপ থেকে নামেন রসুল সাহেব, কি যেন বলেন, তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে এদিকেই কি দেখান।

জিপটা মুখ না ফিরিয়ে ব্যাক করে ছাপাখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। লাফ দিয়ে নামে সশস্ত্র দু'জন পশ্চিমা সেনা।

একজন সেনা পরিষ্কার বাংলায় বলে, শহীদ আহমদ কার নাম?

আমার নাম। কি দরকার বলুন। ভাবেন রসুল সাহেব হয়ত কোন সরকারী কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন।

কোন জবাব না দিয়ে সৈনিক বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে শহীদ সাহেবের মুখের সামনে তুলে ধরে।

একটা হ্যান্ডবিল বড় বড় হরফে লেখা- মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করুন। কিন্তু অত বড় অক্ষরগুলো কেমন চিনে উঠতে পারেন না শহীদ সাহেব, সব কেমন গুলিয়ে যেতে থাকে। তা অবশ্য মুহূর্তের জন্যে।

পর মুহূর্তের শহীদ সাহেব সহজ গলায় বলেনঃ ও হ্যান্ডবিলটা তো, ওটা আমার প্রেসেই ছাপা হয়েছে।

(বুলবন ওসমান রচিত গল্প)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কয়েকটি কবিতা	....	জুন-ডিসেম্বর, ১৯৭১

৮ জুন, ১৯৭১

শব্দের তারতম্যে

শিকদার ইবনে নূর

শব্দকে আমার বড় ভয় ছিল
পৃথিবীর নানা রকম শব্দকে,
বিশেষ বয়সে এসে অতর্কিত
বাবার পায়ের শব্দ, সেকেলে
খড়ম পড়া মায়ের চলার শব্দ,
প্রিয়তমার কাঁকন নিক্কন; ট্রেনের
চাকার শব্দ, মোটরের বিস্ফোরণ,
প্রাচীন ইটের স্তুপে টায়ারে
আর্তনাদ- অকারণ ট্রাফিক হুইসিল,
এবং বিদগ্ধ দিনে রাজ পথে
রোদ্রের বিলাপ- ইত্যাদি অনেক শব্দে
শব্দময় পৃথিবীকে আমার ভীষণ ভয় ছিল।
অথচ অবাক হই, ইদানীং
আমি এক অত্যাশ্চর্য শব্দের মিছিল।
আমার আত্মায় শব্দ, শব্দ নাচে
প্রতি লোমকূপে, ধমনীতে, ফেনায়িত
রক্তের কণায়, জাগরণে, বিলম্বিত
ঘুমের সত্তায়।
শব্দ বাজে-সোনামুখি ধানের
শীষের মত, চতুর্দশী কৃষাণী
মেয়ের চুলে রক্ত লাল
শাপলার খোপার মত;
আমার সমস্ত দেহে, হৃৎপিণ্ডের
রক্তের ধারায়-শব্দ বাজে।

বাংলার শ্যামল মাঠে, আঙ্গিনায়
পৈশাচিক পদশব্দ, নিসর্গের
বুক চিরে কামান গোলার শব্দ
বিধ্বস্ত মায়ের চোখে দুগ্ধপোষ্য
শিশুদের কচিকণ্ঠে শব্দের আগুন,
আমার পৃথিবী জুড়ে শব্দ শব্দ শব্দ শুধু;
কাজেই, এখন আর শব্দকে, ভয় নেই,
আমিও নিজেই এক অত্যাশ্চর্য
শব্দের মিছিল।

('শব্দ সৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

৯ জুন ১৯৭১

আবার দেখবো *

আবার দেখবো বাংলার পথে-ঘাটে
কৃষাণের লাঙ্গল জোয়াল-
সোনালী ধানের ক্ষেতে শালিকের আনাগোনা-
পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ের ঝড় তোলা পানসী-নৌকা দেখবো।
দেখবো মাঠ থেকে ফেরা ষোড়শীর সোনালী মুখ
ভিজে দেহ, হিজল-বট-আমের বনে
দোয়েল-শালিকের মেলা। দেখবো ডানপিঠে ছেলের
দুরন্তপনা। বাড়াভাত নিয়ে বসে থাকা মায়ের
উদ্বিগ্ন মুখ আবার দেখবো।

আবার দেখবো রমনার কৃষ্ণচূড়ায়
থোকা থোকা লাল ফুল।
পল্টনের বাতাসে অনেক শপথী কণ্ঠ।
দেয়ালে দেয়ালে চোখ মেলে চেয়ে থাকা
সবুজ ইচ্ছে দেখবো। দেখবো-
ভার্সিটির চত্বরে অনেক উন্মুখ স্বপ্নের
চঞ্চলতা শহীদ মিনারে নতুন শপথের
বজ্রমুষ্ঠি আবার দেখবো-

রেসকোর্সে মুজিবের দৃপ্ত কণ্ঠ। ক্লান্ত দুপুরে
বৈরাগীর সুরেলা কণ্ঠ- সন্ধ্যায় ঘরফেরা
মানুষের তালহীন কণ্ঠস্বর অবিশ্রান্ত শুনে যাবো-
আবার। আবার দেখবো- আমার চিরপরিচিতা।
রূপসী বাংলাকে।

* স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত। লেখকের নাম জানা যায়নি।

.....জুলাই, ১৯৭১

আমার প্রতিদিনের শব্দ
সৈয়দ আলী আহসান

(১)

আমার সমস্ত চেতনা যদি
শব্দে তুলে ধরতে পারতাম-
জীবনের নৈমিত্তিক আচার
অকুণ্ঠ অভিবাদন,
কখনও রহস্যের অস্পষ্টতা
আবার কখনও সূর্যের তাপ
এবং রাত্রিকালে সমস্ত সুন্দর
গাছের পাতার নিদ্রা
তমসার অবগাহন যখন
সময়কে গ্রাস করেছে
যখন নিঃশ্বাসের ছায়া
স্বচ্ছ কাচে কুয়াশা ফেলেছে
তখন আমার ভাষার শরীরে
প্রকাশের যে যন্ত্রণা
তা আমি প্রতিবার কবিতা লিখতে যেয়ে
অনুভব করেছি-
তার কেশে সমস্ত আকাশের মেঘ
তার নয়নে চিরকালের নদীর উদ্বেলতা
এবং বাহুতে প্রান্তরের বিস্তীর্ণ আশ্রয়।
সে আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(২)

বিষণ্ণ নির্জনতা যেখানে চিরদিন রাজত্ব করে
এবং লম্বা ঘাস বসে থাকে সিঁড়ির ফাটলে
চাঁদ, সূর্য, শীত, গ্রীষ্ম এবং তুষার
যেখানে দেয়ালের রং মুছে দেয়

কয়েকটি ইঁদুর যখন ছুটোছুটি করে
তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়-
এ-পরিত্যক্ত অট্টালিকায় কে বাস করতো?
একটি সাপ তখন কোনো উত্তর না দিয়ে
সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন অন্ধকারে হারিয়ে যায়-
আমার ভাষার শব্দ
সময়ের অন্ধকারকে প্রকাশ করবার জন্য
আহত শরীর নিয়ে উদ্ভ্রান্ত
রবীন্দ্রনাথের প্রাচুর্য, সৌভাগ্য এবং আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত
হৃতশ্রী আমার শব্দ আজ সমস্ত ক্ষুব্ধ ইচ্ছার
উপমা হতে চাচ্ছে-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(৩)

দ্বিখণ্ডিত শিশুর মৃতদেহ নিয়ে
অট্টহাস্যে যারা রাত্রির নীরবতাকে
ভয়াল করলো,
যারা আমার কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করবে ভেবে
সকাল বেলার শিশিরকে রক্তিম করলো-
(মাতৃদুগ্ধের মতো স্রোতস্বিনী
অজস্র শবের আর্ত দৃষ্টি নিয়ে প্রবাহিত)
মধ্যযুগের অন্ধকারকে লজ্জিত করে
যে-সব সারমেয় তাদের করাল
দ্রংষ্ট্রারেখায় আমাকে
আতুর করতে চাচ্ছে
আমার প্রতিদিনের শব্দে তাদের
ধ্বংস উচ্চারিত হোক,
মাতৃভূমি আমার, আমার সপ্রেম
অনুরাগকে যারা কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে
আমার অজেয় শব্দে-
তাদের সর্বনাশ চিহ্নিত হোক-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।

(৪)

ভয় থেকে উন্মাদ উদ্দেশ্যহীন পলায়ন
যখন আর সম্ভবপর হচ্ছে না
যখন রুদ্ধশ্বাস জীবনে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে
আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আর রাত্রির অন্ধকারে দেখেছি
আকাশ থেকে এক একটি তারা খসে পড়ছে
এবং অসহ্য একটি স্তব্ধতায়
আবেগের সমস্ত তরঙ্গগুলো
অশ্রুতে হারিয়ে যাচ্ছে,
তখন আমার শব্দে নতুন বিস্ময়ের উন্মোচন ঘটুক-
আমার প্রতিদিনের শব্দ।।

লেখকের নিকট থেকে প্রাপ্ত)

---

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জ আমি

নেওয়াজিস হোসেন

রক্তে আখরে লেখা
পঁচিশের মর্মন্তুদ রাত্রির
ভয়াল পরিধি- নীল-স্বপ্নের
সাত কোটি রজনী জলের
সমুদ্রে কান্না শব্দে তরঙ্গ শিহরিত।
বাংলাদেশ-
কুচক্রী শক্তিসমূহের লালসার
পাদপীঠ কখনো নয়;
এ নির্ভুল শাশ্বত সত্য যোজনার জবাব
প্রস্তুত রণাঙ্গণে-
সাড়ে সাত কোটি সুদৃঢ় বজ্রমুষ্ঠি।
ক্ষমার অযোগ্য পশুশক্তির
নির্মম শাস্তি দিচ্ছিঃ
নিঃস্নেহে জীবনের শত্রুকে আহ্বান করে
মৃত্যুর খোলা দরজা।
শব্দ দেয় উৎফুল্ল উপহার আমায়
বিপুল বিপ্লবী সাড়া।
স্বজন হারানোর বেদন বিক্ষোভের সবটুকু বহ্নি
আজ প্রাণ মনে উত্থিত।
নির্মেঘ আকাশে অযথা মেঘাবির্ভাবকারীর
কখনো যদি পুনরাবির্ভাব হয়,
তাহলে চ্যালেঞ্জের জন্যে প্রস্তুতঃ
অগ্নিমূর্তি এক আমি সত্তা।

('শব্দসৈনিক- ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

কমাণ্ডার

নাসিম চৌধুরী

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান, মর্টার, রকেটে, গোলায়,
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি।
এবার তোমার অর্ডার দেবার, পালা-
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার।

দেখ, চারিদিকে প্রস্তুতির আয়োজন শেষ,
কী ভয়াল সুন্দর অন্ধকার ঘনিয়েছে চারিদিকে
এতক্ষণ যে মুমূর্ষু আলো ছড়াচ্ছিল
কৃষ্ণপক্ষের অসুস্থ চাঁদ,
সেটাও টুপ করে খসে গ্যাছে কোন রহস্যলোকে
এখন শুধু অন্ধকার-
কি বিশ্বাসী বন্ধুর মত ঘিরে আছে চারিদিক

আর দেখ কী লোমহর্ষক নীরবতা!
কুলায় ফিরে গ্যাছে সর্বশেষ পাখী
শুধু একটানা ঝিল্লীর ঝংকার।
এটাইতো শত্রুনিশ্চিহ্নের মাহেন্দ্রক্ষণ
কমাণ্ডার
আর দেরী নয়, শুধু অর্ডার।

কমাণ্ডার
শুধু তোমার একটি অর্ডার
দেখবে কী দুর্জয় করে তোলে আমাদের।
কী প্রচণ্ড সাড়া জেগে ওঠে রক্তের ধারায়

কী প্রখর জ্বলে ওঠে চোখের তারা

কী অট্টশব্দে গর্জন করে ওঠে প্রতিটি অস্ত্র
আর তার সাথে কী সুন্দর মেলাবে
শত্রুর আর্তরব।
কমাণ্ডার, এবার শুধু অর্ডার করো, অর্ডার
তোমার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে
ছুটে যাব আমরা
ঐ দূরে যেখানে শত্রুরা ফেলেছে ক্যাম্প
যেখানে প্রতিটি বাঙ্কারে শুয়ে আছে
হিংস্র ঘাতকের দল
আর পেন্টাগনের জেনারেলদের মত
কুটিল বক্র ট্রেঞ্চগুলি লুকিয়ে রেখেছে যে
হিংস্র হায়েনাদের
সেখানে ছুটে যাব কী তুমুল প্রাণের আবেগে
গর্জে উঠবে আমাদের মুষ্টিচ্যুত গ্রেনেড
সেই ধ্বংস উৎসবের আশায় বসে আছি
কমাণ্ডার
শুধু আদেশ দাও এবার।

কমাণ্ডার
আমরা প্রস্তুত
কামান মর্টার গানে, রকেটে গোলায়
যুদ্ধের কড়া সাজে, বেল্টে-বুটে
আমরা সেজেছি যথারীতি
এবার তোমার অর্ডার দেবার পালা
দাও অর্ডার
কমাণ্ডার।

কমাণ্ডার
এখনো কী সময় হয়নি তোমার?
এখনো কী দৃষ্টি রাখবে ঘড়ির কাঁটায়?

উৎকর্ণ হবে ঘাসের প্রতিটি শিহরে?
দায়িত্ব কী পালন করবে তুমি
সংসারী কৃষাণীর মত
ভেবে-দেখে, কম্পনে-ত্রাসে?

দায়িত্ব গ্রহণ কী তবে বৃদ্ধত্ব গ্রহণেরই নামান্তর শুধু।
নইলে হিসাবের প্রয়োজন কী
ঘড়ি আর আঁধারের গাঢ়তা নিয়ে?
জানি তা আনবে আরো সুচারু সফলতা
কিন্তু আমাদের কাম্য তা নয়।

আমরা চাই বিশৃঙ্খল বেঠিকের মাঝে
ভয়াল বিজয়।

আমাদের যাত্রা হবে হঠাৎ আচম্বিতে
মনের তাড়ায়।
নিমেষে উগড়াবো যতগুলি জ্বালা আছে মনে
চকিতে ছুঁড়ে দেবো যতগুলি গোলা পাবো চোখে
হিসাবের জের আর টানবো না ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে
আনবো না বিজ্ঞান অংকের মাপ
শুধু যাবার আবেগে চলে যাব।

কমাণ্ডার
যদি ঐ বিদেশী পদবীটার সাথে জড়তা ওতপ্রোত থাকে
তবে তা ছুঁড়ে ফেলো বিষাক্ত ঘৃণায়
ভুলে যাও সময়ের নির্দিষ্টতা
চলো এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি
শত্রুগুলোর ওপর
তাদের নিশ্চিহ্ন করে দি
আমাদের বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতায়।
তারপর ক্ষতি হয়ে পড়ে থাকি
বে-নিয়ম পৃথিবীর পরে।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

---

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

রিপোর্ট ১৯৭১

আসাদ চৌধুরী

প্রাচ্যের গানের মতো শোকাহত, কম্পিত, চঞ্চল
বেগবতী তটিনীর মতো স্নিগ্ধ, মনোরম
আমাদের নারীদের কথা বলি, শোনো।
এ-সব রহস্যময়ী রমণীরা পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে
বৃক্ষের আড়ালে স'রে যায়-
বেড়ায় ফোঁকর দিয়ে নিজের রন্ধনে
তৃপ্ত অতিথির প্রসন্ন ভোজন দেখে
শুধু মুখ টিপে হাসে।
প্রথম পোয়াতী লজ্জায় অনন্ত হ'য়ে
কোঁচরে ভরেন অনুজের সংগৃহীত কাঁচা আম, পেয়ারা, চালিতা-
সূর্যকেও পর্দা করে এ-সব রমণী।
অথচ যোহরা ছিলো নির্মম শিকার
সকৃতজ্ঞ লম্পটেরা।
সঙ্গীনের সুতীব্র চুম্বন গেঁথে গ্যাছে-
আমি তার সরকার- তার রক্তে স্বরলিপি লিখি।
মরিয়ম, যীশুর জননী নয় অবুঝ কিশোরী
গরীরেব চৌমুহনী বেথেলহেম নয়
মগরেবের নামাজের শেষে মায়ে-ঝিয়ে
খোদার কালামে শান্তি খুঁজেছিলো,
অস্ফুট গোলাপ-কলি লহুতে রঞ্জিত হ'লে
কার কী বা আসে যায়।
বিপন্ন বিস্ময়ে কোরানের বাঁকে-বাঁকে পবিত্র হরফ
বোবা হ'য়ে চেয়ে দ্যাখে লম্পটের ক্ষুধা,
মায়ের স্নেহার্ত দেহ ঢেকে রাখে পশুদের পাপ।
পোষা বেড়ালের বাচ্চা চেয়ে-চেয়ে নিবিড় আদর
সারারাত কেঁদেছিলো তাহাদের লাশের ওপর।
এদেশে যে ঈশ্বর আছেন তিনি নাকি

অন্ধ আর বোবা

এই ব’লে তিন কোটি মহিলারা বেচারাকে গালাগালি করে।
জনাব ফ্রয়েড,
এমন কি খোয়াবেও প্রেমিকারা আসে না সহজ পায়ে চপল চরণে।
জনাব ফ্রয়েড, মহিলারা
কামুকের, প্রেমিকের, শৃঙ্গালের সংজ্ঞা ভুলে গ্যাছে।
রকেটের প্রেমে পড়ে ঝ’রে গ্যাছে
ভিক্টোরিয়া পার্কের গীর্জার ঘড়ি,
মুসল্লীর সেজদায় আনত মাথা
নিরপেক্ষ বুলেটের অন্তিম আজানে স্থবির হয়েছে।
বুদ্ধের ক্ষমার মূর্তি ভাঁড়ের মতন
ভ্যাবাচেকা খেয়ে পড়ে আছে, তাঁর
মাথার ওপরে
এক ডজন শুকুন মৈত্রী মৈতী ক’রে
হয়তো বা উঠেছিলো কেঁদে।
র‍্যাঁবো, পাউণ্ড চোরের মতন
পা-টিপে পা-টিপে জ্যোতির্ময়
স্যারের কেলাস থেকে চ’লে গ্যালো।
কাচের গ্লাসের মতো ভেঙ্গে গ্যালো ছাত্রাবাস।
পৃথিবীর সব চিন্তা কাগজের চেয়েও দ্রুত পুড়ে গ্যালো,
বারুদের গন্ধে ধন্য গ্রন্থাগার ব্যাণ্ডেজে সুন্দর।
জনাব উ থান্ট,
জাতিসংঘ ভবনের মেরামত অনিবার্য আজ।
আমাকে দেবেন, গুরু, দয়া ক’রে তার ঠিকাদারী?
বিশ্বাস করুন রক্তমাখা ইটের যোগান
পৃথিবীর সর্বনিম্ন হারে একমাত্র আমি দিতে পারি
যদি চান শিশুর গলিত খুলি, দেওয়ালে দেওয়ালে শিশুদের রক্তের আল্পনা
প্লিজ, আমাকে কন্ট্রাক্ট দিন।
দশ লক্ষ মৃতদেহ থেকে
দুর্গন্ধের দুর্বোধ্য জবান শিখে রিপোর্ট লিখেছি- পড়, পাঠ কর।
কুড়ি লক্ষ আহতের আর্তনাদ থেকে
ঘৃণাকে জেনেছি-পড়, পাঠ কর।

চল্লিশ হাজার ধর্ষিতা নারীর কাছে
জুলুমের সবক নিয়েছি-পড়, পাঠ কর।
দুঃখের স্মৃতিতে ডোবা আশি লক্ষ শরণার্থী
শিখিয়েছে দীর্ঘশ্বাসে কতোটুকু ক্রোধ লেখা থাকে।
কোলকাতার কবির মতো কে পারে শোনাতে
'আমি তোর জন্ম সহোদর?'
অনাহূত বিবেকের ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী প্রতিনিধি হ'য়ে
ক্লান্তিহীন, বিশ্রামবিহীন আমি ছুটে যাই শান্তির সভায়
কখনো দিল্লীতে, মস্কো, লন্ডন, প্যারীর
জনাকীর্ণ সমাবেশে আমি খুঁজি একজন রাসেলের মুখ,
প্রেমের লিপিকা পড়ি জেনেভার জুরীদের কাছে-
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলো রেখে
চ'লে আমি ক্যানাডার বিশাল মিছিলে শ্লোগান শোনাতে।
মানুষের জয় হোক, নিপীড়িত জনগণ জয়ী হোক অন্তিম সমরে।
অসত্যের অন্যায়ের পরাজয়ে খুশী হোক বিশ্বের বিবেক,
পলাতক শান্তি যেন ফিরে আসে আহত বাংলার ঘরে ঘরে।

(শব্দসৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ থেকে সংকলিত)

কোন এক নিবেদিতাকে

টি, এইচ, শিকদার

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
দেখেছি পথের ভিড়ে, একুশের
সুকান্ত মিছিলে।
এবং কখনো কোন-জলসায়
ভার্সিটির তর্কের আসরে, পাঠাগারে
মেটেরিয়া মেডিকার স্তূপীকৃত
জ্ঞানের সমুদ্রে।

নিবেদিতা,
তোমাকে দেখেছি আমি আগেও অনেক
বঙ্গোপসাগর তীরে, কিংবা কোন সবুজাভ
হিলট্র্যাক্ট জুড়ে সাঁওতালী ছেলের হাতে,
মুক্তোময়ী ঝিনুকের খোলের ভেতরে।

তখনো তোমার চুল ভার্জিনিয়া
তামাকের দেশে, মূর্ছিত নেশার মত
তীব্রতর সুবাস ছড়ায়;
তোমার ভুরুতে আঁকা সমুদ্র-কাজল
বৃষ্টির নূপুর হয়ে সঙ্গীত শোনায়।

সুচরিতা,
আজকে তোমাকে আমি দেখেছি আবার-
রক্তাক্ত বাংলাদেশে, খুলনা, কুমিল্লা, ঢাকা,
রংপুর, সিলেট আর কুষ্টিয়ার বিষণ্ন সেক্টরে;-

আহত আত্মার পাশে, ট্যাংকের
ভয়াল-চোখ গর্জনের মুখে,
প্রসন্ন ফুলের মত উৎসর্গের তরে।
কি আশ্চর্য! এখন তোমার মন
অন্যভাবে, অনন্য ইচ্ছায়
নিবেদিত, সাত কোটি রক্তের সত্তায়ঃ
সহস্র ধ্বংসের বাজ, মেশিনগান, মর্টারের স্তূপে
অক্টোপাশ-ডানা দেখি অনির্বাণ ভিসুভিয়েসের;
এবং তোমাকে দেখে, সমর্পিতা,
যদি আমি হতে পারি অন্য এক নিবেদিত প্রাণ।।

(‘বেতার বাংলা’-মার্চ ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি)

নামফলক

অনু ইসলাম

মহান শহীদানের স্মরণে লেখা
প্রস্তর ফলকে বন্ধু তোমাদের নাম।

আমি হাঁটছি ২৫শে মার্চ থেকে
আমি হাঁটছি কালো-লাল এবং
সবুজ থেকে ঝলসানো স্বাধীনতা
পর্যন্ত।

এখন বন্ধুরা
স্থির হয়ে তাকিয়ে দ্যাখো
কেমন করে ঢেকে রেখেছি
তোমাদের স্মৃতিগাঁথা আমার বুকের মর্মরে।

জানো এখন আমার চোখ থেকে
সব আলো ফুরিয়ে গ্যাছে।
দ্যাখো আমার চোখ দুটি কেমন করে
ঢেকে রেখেছি
রাশ রাশ জানা অজানা নামে।

আমি তবুও পড়তে পারি
(শিশু শিক্ষায় যেমন পড়তাম)
মানুষের হৃদয়ের পটে পটে
লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম।
(ওরা মানুষ নয় বীর)
সালাম
বরকত,
মুক্তিযোদ্ধা
এবং শেখ
যে একটি মানচিত্র!

আমার বুকের নীচে
রক্তের ঝরণা-
ঝরণার গানে গানে
শুধু শুনি লক্ষ নাম-

সালাম
রফিক
মুক্তিযোদ্ধা।

('শব্দসৈনিক'-ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত। কবিতাটি প্রচারের তারিখ জানা যায়নি)

৫ নভেম্বর, ১৯৭১

হে স্বদেশ হে আমার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিক

তোমার দেহের মতো খর-কৃপাণের মতো
দীর্ঘ ও উদ্যত ঋজু
সারি সারি
শাল-তরু-শ্রেণী
দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই পাশে;
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চুমু খেলে
ভয়ে ও বিহ্বলতায়
যেমন কম্পন জাগে
তোমার দু'গালে ঠোঁটে, আজকে রাত্রেও তেমনি
উদগ্রীব অপেক্ষার
রুদ্ধ শিহরণ সাড়া
শাখে শাখে, শকুনের ডানার ঝাপটে যেন
ঢেউ ওঠে ভয়াল সাগরে;

তোমার ত্বকের রং যেন
তপ্ত কাঞ্চনের মতো
লেগে আচে সড়কের প্রতি ধূলিকণা সাথে,
চোখের মণির মতো সজল নিবিড় কালো
জমছে খণ্ড খণ্ড মেঘ
সারাটা আকাশময়
হয়তো নামবে বৃষ্টি একটু পরে,
যেমন শোনিত চুঁয়ে চুঁয়ে
পড়ছে তোমার পথে পথে
তাল ও তমাল শাখে,
শত্রুর সৈন্যের বেয়নেটে

তোমার প্রাণের মতো
উষ্ণ লাল রক্ত
যেমন ঝরছে

মাঠে মাঠে গঞ্জে বাটে;
ক'জন চলেছি আমরা
সড়কের, পর দিয়ে এই
একটি ট্রাকে ঠাসাঠাসি
উঁচিয়ে সঙীন দৃপ্ত
আমরা চলেছি এই
নীরন্ধ্র রাতের মাঝামাঝি
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত ঋণ
রক্ত দিয়ে শোধ করে দিতে;

শুধু আলো হাওয়া চাঁদ
বা সূর্যকিরণ নয়
তোমার শরীরে মাগো
বিকট দুর্গন্ধ আছে,
ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন সব
কচি কচি যোদ্ধাদের
ঘামে ভেজা ছেঁড়া গেঞ্জি
ময়লা বিছানা হ'তে
বিবমিষা ছুটে আসে;

তোমার দেহের সাথে
এ দুর্গন্ধে মাগো
আমাদের ভবিষ্যৎ যেন
নবজাতকের মতো
হাত পা বাতাসে ছুঁড়ে খেলা করছে;

শুধু খালে বিলে মাঠে
নদীতে নালায় জলে
বা সীতাকুণ্ডর
পর্বতমালায় নয়,

এইসব বৃষ্টিভেজা
কাদামাখা তাঁবুতে তাঁবুতে যেন

তোমার মানচিত্রখানি
কতগুলি
ছোট ছোট জারুল চারার মতো
উষ্ণ তাজা
হৃদয়ের সাথে লেপ্টে আছে।
বিভিন্ন টিলায় ট্রেঞ্চে
রাইফেলে ট্রিগারে হাত চেপে
দেখছি প্রতিদিন

হাজার হাজার জীর্ণ অবসন্ন ধর্ষিতা নারীও
পুরুষের সাথে
শত্রুর সন্ত্রস গুলি বেয়নেট বেড়াজাল
কি করে এড়িয়ে মা আমার
হেঁটে চলছে দল থেকে দলে
দৃপ্ত পায়ে

কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে
ভেঙেপড়া
প্রথম সূর্যের ক্ষীণ
আলোর রেখার মতো
কম্পমান সম্ভাবার দিকে!

বহু পরে
অনেক রাতের শেষে
আঁধারের আস্তরণ ভেঙে
নির্দয় নিশ্চিত সূর্য
জরাজীর্ণ
দেয়াল ফাটলে বট
বৃক্ষের চারার মতো
যখন বেরিয়ে আসবে
ফেটে পড়বে

বহু প্রতীক্ষিত
সেই আনন্দিত ক্ষণে

হয়তো দেখবে
তোমার ঘরের পাশে
উজ্জ্বল পৈঠার, পর
দু'একটি ফোঁটা
পুরানো মলিন রক্ত
লেগে আছে,
তখন কি
মনে পড়বে
প্রিয়তমা
আমরা ক'জন মিলে
অবিচল প্রত্যাশায়
তোমার প্রেমের ঋণ
রক্ত-ঋণ
সহস্র সহস্র কোটি
হায়েনার চীৎকারের মতো
সেই এক
পৈশাচিক অন্ধকার রাতে
চলে গেছি
রক্ত দিয়ে
শোধ করে।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

আমার স্বর্গের নামে

মযহারুল ইসলাম

(এক)

সব কথা সব অনুভূতি যেন কোন এক বিষন্ন উদ্বেগে
হতবাক হয়ে আসে, ক্ষোভাচ্ছন্ন চেতনার উদ্দাম আবেগে
বাংলার মাঠে ঘাটে শহরে বন্দরে গ্রামে গ্রামে
রক্তঝরা মুহূর্তের তিমিরাঞ্চল-ছায়া নামে
শ্মশানের ভস্মে আর দুর্দিনের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে
আমাদের কাল শুধু বেদনায় ম্লান হয়ে আসে।

(দুই)

বাংলা দেখেছে তার সন্তানের মৃতদেহে
কেমন ভরেছে মাঠ নদী
বাংলা দেখেছে তার সন্তানের রক্তে রক্তে
হিমসিক্ত স্রোতের প্রবাহ
বাংলা জেনেছে তার অপমানে লাঞ্ছনায়
অন্ধকার নামে নিরবধি
বাংলা বুঝেছে তার নির্যাতন নিপীড়নে
কি দুঃসহ যাতনা-প্রদাহ।

ইতিহাস তবু কথা বলে
মুক্তির সোনাসূর্য প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে পূর্বাচলে।

(তিন)

চারিদিকে শুধু সংগ্রাম আর যুদ্ধ
হাতিয়ার হাতে চলে মহা জয় যাত্রী
বাংলার গ্রাম প্রান্তরে ঘাট প্রতিরোধ বিক্ষুব্ধ
পূর্বগগনে কাটে অভিশাপ-রাত্রি।

অযুত মৃত্যু, অনেক রক্ত সীমাহীন নিগ্রহ
পেরিয়ে এসেছে আজকের দিন অগ্নিশপথে স্নাত

দিকে দিকে জাগে মহা অভিযান বিপ্লব বিদ্রোহ
বিজয়ের দিন মুক্তির দিন সম্মুখে প্রতিভাত।

(চার)

বাংলা আমার, স্বদেশ আমার, আমার বাংলাদেশ
রূপে রূপময়ী, চিরমধুময়ী স্বর্গ আমার বিশ্বে
সুজলা তটিনী আকাশ চেয়ে দেখি অনিমেষ
সবুজে শ্যামলে নৃত্যে ও গানে নবীনা দৃশ্যে দৃশ্যে।

বিশ্বে আমার স্বর্গ বাংলাদেশ
জাগ্রত আমি সেই স্বর্গের নামে
তার প্রেমে নব-চেতনার উন্মেষ
তারই অনুরাগে নামি মহাসংগ্রামে।।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

বাংলাদেশ

মিজানুর রহমান চৌধুরী

গুরুদেব,
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।
ফাগুনের আমের বনে
মুকুলের গন্ধ আজ আর নেই
বারুদের গন্ধে ভরেছে ফাগুনের বাতাস।
অবারিত মাঠ গগন ললাট
আজ উত্তপ্ত।
দস্যুদের শেলের আঘাতে
বাংলার শ্যামল রূপ বিপর্যস্ত।
মেশিন গান, মর্টার আর বোমার আঘাতে
বাংলার আকাশ বাতাস ভরে গেছে।
হে রবীন্দ্রনাথ
তোমার সোনার বাংলা আজ
শ্মশান হয়ে গেছে।

হে বিদ্রোহী
ওরা সাত কোটির মুখের গ্রাস
কেড়ে নিতে চায়।
ওরা বুলেটের আঘাতে বাঙালীকে
নিশ্চিহ্ন করতে চায়।
ওই শোনো আকাশে বাতাসে
নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন রোল
ওই দেখ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
রক্তের হোলি খেলায় মেতে গেছে।

এস বন্ধু সেই শমসের নিয়ে
আর একবার পদ্মার জলে মোরা

লালে লাল হয়ে মরি।
বাংলার পথ-প্রান্তর রক্তলেখায় পূর্ণ
এস বন্ধু আজ মোদের রক্তলেখায়
ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিই।

জীবনানন্দ

তুমি দেখেছিলে রূপসী বাংলার
রূপ মনোহর।
পাখীর নীড়ের মত চোখ দেখেছিলে-
নাটোরে বনলতা সেনের।
বাংলার ভাঁটফুল কদম্বের ডালে
ধানসিঁড়ি নদীটির পারে
ফিরে আসতে চেয়েছিলে
এই বাংলায়।
কিন্তু বন্ধু
রূপসী বাংলার রূপ আজ বিবর্ণ
পশ্চিমা হানাদারের নির্মমতায়
বাংলার মাঠে ঘাটে হাহাকার ধ্বনি
প্রিয়া আজ দানবের হাতে বন্দিনী
ধর্ষিতা তরুণীর দিগন্ত বিদারী কান্না
আজ বাতাসে কেঁদে মরছে।
আশীর্বাদ করো বন্ধু
প্রিয়ার দৃষ্টির অগ্নিশিখায় যেন
শত্রুর মুখ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুকান্ত

নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার করে বলেছিলে
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে
কিন্তু নরদানবের পৈশাচিকতায়
অসংখ্য শিশু আজ অধিকার হারা।
বুভুক্ষু জনতার অসহায় ক্রন্দন
লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের ম্লান মুখ

গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
এসো আজ সিগারেটের মত জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত মুখে বারুদ নিয়ে।
এসো এই সংগ্রাম মাঝে
নতুন আলোর মন্ত্র নিয়ে।
ঠিকানা তোমার পেয়েছি বন্ধু
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভ, কম্বোডিয়া নয়
আলজিরিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম নয়
স্নেহ মায়া মাখা, মমতা ঘেরা
এই বাংলায়।।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল

মুসা সাদেক

মহামান্য বিচারকমণ্ডলীঃ

এখন থেকে দুই দশক পূর্বে
পবিত্র ধর্ম এবং আইনের দোহাই সাজিয়ে
বিশ্ববিবেক, বিশ্বমানবতার ধ্বজা উঁচিয়ে
আপনাদের আদালতে যাঁদের বিচার করেছিলেন
আদালতে শেষতম শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন
ঈশ্বর-দণ্ড-প্রাণ রক্ষার অধিকার কেড়েছিলেন
তারা প্রত্যেকেই নিরপরাধী এবং প্রত্যেকেই পুণ্যবান
এবং পবিত্র আইনের শ্লীলতাহানির অভিযোগে
মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে আপনারা অভিযুক্ত।
ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না- দুই দশক বিলম্বে
আসামীর কাঠগড়ায় আপনারা দাঁড়িয়ে
তার খাসা একখানা প্রমাণ নির্মাণ করলেন অন্তত।

বিশ্ববিবেকের যেসব মহানতম ব্যক্তিত্বকে
আপনারা সেদিন মানব সত্তা এবং সভ্যতা হন্তা হিসেবে
চিহ্নিত করেছেন, তার জন্য আমাদের দারুণ বিলাপ
এবং বিশ্বব্যাপী শোক সভার ঘটা অচিরেই শুরু হবে।

মহামান্য আদালতঃ
আমি অবশ্য কোটি কোটি মানুষের দুর্দশা এবং দুর্ভাগ্যের জনক
ফুয়েরারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছি
আমি অবশ্যই ফুয়েরার দোসর বেনিটো মুসোলিনীর কথা ভাবছি
ষাট লক্ষ ইহুদী নিধনের পুরোহিত মহাত্মা আইখম্যানের নামও উল্লেখ করছি।
আমি অবশ্যই কূটনীতিক হের হেস, প্রচারবিদ গোয়েবলস, সমরবিদ তেজো
প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদের নামও উপস্থাপন করছিঃ
যাঁদেরকে আপনারা অবৈধ আইনের সত্তা অনুসরণ করে
ধর্মের দোহাই পেড়ে পাপাত্মা বলে চরম দণ্ড দিয়েছেন।

এই সব মহাপ্রাণদের ন্যুরেমবার্গ-ট্রায়াল-প্রহসনের মাধ্যমে দণ্ড দিয়ে
সমগ্র বিশ্ব সভ্যতার যে অপূরণীয় ক্ষতি আপনারা করেছেন
আজ তার হিসাব হবে, আজ তার বিচার হবে
না হলে মানব সভ্যতার বুকে মহা অভিশাপ ধার্য হবে।

হে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারমণ্ডলীঃ
ঈশ্বরের অসীম করুণা যে সত্য, ন্যায়, ধর্ম এবং বিচার
অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে- তোমরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছো
অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের তোমরা আসামী
ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের আসামীদের উত্তরসূরীরা আজ বিচারপতিদের আসনে।
ভিয়েৎনামের লক্ষ লক্ষ হত্যাযজ্ঞের পুরোহিত মহাত্মা রিচার্ড নিক্সন
বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যার যোগ্য জনক পুণ্যাত্মা এহিয়া
এবং অসংখ্য মাইলাই- ঐতিহ্যধারী পুণ্যাত্মারা।
আজকের মহামান্য আদালতের মহিমান্বিত বিচারকমণ্ডলী।
আজকে বিচার হবে অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের বিচারকদের
আজকে বিচার হবে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ অপরাধে হোচিমিনের
আজকের বিচার হবে বাংলাদেশ অপরাধে শেখ মুজিবের।।

('শব্দসৈনিক' -ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত)

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা

রফিক নওশাদ

বন্ধু তোমার শদীহ মিনার রক্তে আমার রাঙিয়ে দেবো
স্বাধীনতার জয় পতাকা এই মিনারেই উড়িয়ে যাবো।

বাংলার বুকে বেদনার ছায়া- হাসে না বাংলা সহজ গানে
হিংস্র শ্বাপদ তীক্ষ্ণ নখরে সবুজ কুঁড়িয়ে মৃত্যু আনে।
ঘন কালো রাত কালো শৃঙ্খল দুর্গম আজ পথের রেখা
তবুও রক্তে বান ডাকে জানি মুক্তি পথের মিলবে দেখা।

যুদ্ধক্লান্ত বন্ধু আমার, ঘুমাও শহীদ- মুক্তি সেনা-
তোমার রক্তে শপথ নিলাম শত্রুকে আজ হয়েছে চেনা।
গণ-শত্রুর কলজে ছিঁড়ে পিষবো পায়ে কসম ভাই-
আমার ভায়ের রক্তের ঋণ শুধতে হবে আপোষ নাই।
সব শোষণের হিম কারাগার পদাঘাতে জানি পড়বে ধসে
গণ-যুদ্ধের রক্ত-ফসল তুলবো এবার যুদ্ধশেষে।

এদেশ আমার, কোটি জনতার- পরাধীনতার লগ্নশেষ
কৃষ্ণচূড়ার লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা- হাসে স্বদেশ।

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

অন্বিষ্ট রাজ্যঃ আমার বাংলা

প্রণব চৌধুরী

আমি পেয়েছি খুঁজে এক বাস্তবিক মানোরম রাজ্য।
এ রাজ্যের কোথাও নির্ধারিত কোন সামরিক শাসনের নেই
কড়া বিধি, খাঁচাবন্ধের ভয়।
এখানে সবার নির্বিকার বাধাহীন চলাফেরা,
মা'র কোলে দোল খাওয়া নিগূঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম,
নিরপরাধ আঁচলে মাথা ঝুঁকানো স্বামীর সোহাগ
পুত্তলি ... ...

এ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো কথা, মূলত,
এখানে চিরায়ত নিয়মের সব পথঘাট, প্রান্তর, জলাশয় নদী
ছায়ান্ধ অন্ধকারে কতোকাল ঢেকেছিল ভয়াবহ জঙ্গল।
অতঃপর একদিন এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধ হাত বুলিয়ে গভীর প্রেম,
একে একে সব আঁধারের পাষাণ পাহাড়, সারি সারি
সভয় জঙ্গল কেটে ভয়াল বাঘের চামড়ায়
শুতে দিল আজীবন ভীরু হরিণী;
মায়ের অনিঃশেষ স্নেহের মতো বাড়ালো সূর্য মুখ
এ সূর্য আর ডুবলো না কোনদিন
ডুবে আবার প্রাত্যহিক বিশাল কালো নদীতে
মাথা বাসানোর বুক ফুলালো না,
এ রাজ্যে সেই থেকে অন্ধকার নেই, প্রতি মূহূর্ত সূর্য,
সূর্য আর ডোবে না প্রত্যহ
শুধু 'আলোয় ভুবন ভরা' 'আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি'।।*

(স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত)

---

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দিন এলো

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

রাত্রির শেষ-তমসার শেষ- পূর্ব দিগন্ত লাল
বন্দরে শুনি গর্জন আর সমুদ্রে উত্তাল
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে- শংকার রাত শেষ
ধ্বংসের স্তূপে শিহরণ জাগে- জীবন্ত উদ্দাম।
গর্জন-ভীতি শংকিত বুকে দুর্জয় সংগ্রাম।
নবতর আজ চেতনার ধ্বনি- জীবনের ধ্বনি
কাল শেষ হয়ে গেলো- রাত্রির শেষ- দিগন্ত আজ লাল।

বেদনার দিন, শোষণের দিন, জালিমের কাল শেষ
শাদ্দাদ কাঁপে ভীত-শংকিত। সব নমরুদ মুহ্যমান।
দুর্গের দ্বার ভেঙেছি ওদের কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞায়-
আমাদের আজ দুর্বার গতি- দুর্জয় হলো বাংলাদেশ
দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেলো- শংকার রাত হয়েছে শেষ।

দিন এলো আজ বিজয়ের দিন- উল্লাস-ধ্বনি দেশে।
বেদনার কথা মিলনের বাণী বিরহবিধুর মন
সচেতন সব বঞ্চিতগণ- বিবেকের জাগরণ
নব উত্থান- নতুন জাতির হৃদয়ে সূর্যোদয়।
চঞ্চল চোখে উদ্দাম আশা মৃত্যুর পরাজয়।

[‘শব্দসৈনিক’- ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে সংকলিত]

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা' থেকে সংকলিত	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	...ডিসেম্বর ১৯৭১

এহিয়া বধ কাব্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারীঃ

কহ বীর ত্বরা করি কীবা সমাচার?
কিভাবে দলিছে, মিত্রসেনা রণাঙ্গনে
এহিয়া চমুরে? ভূপাতিত ইয়াহিয়া
গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা বজ্রাঘাতে?

পুরুষঃ

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ-শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; শত শত মিত্রসেনা বলী
তেমতি ধায় যশোর শত্রুদুর্গ পানে
চূর্ণিয়া বিচূর্ণ হত করিতে তাহারে।

যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, পাক-চমুর পলাইয়া রণে
হেরি যমাকৃতি মুক্তিসেনা রথীদলে।
হুঙ্কারে, বিষম ঘামে ব্যথিত কুমতি
পলাইলা, পলাইয়া সত্রাসে চৌদিকে।
মহারোষে যমসম মুক্তি মিত্র সেনা
ঘেরিলা, ঘেরিলা অবরুদ্ধ খান সৈন্য
বেড়াজাল মাঝে যথা ক্ষীণপ্রাণ মীন।
সমর্পিল অস্ত্র যত দীন করজোড়ে
মাগিল জীবন ভিক্ষা নরাধম কূল।
যশোহর দুর্গশিরে বিজয় কেতন
বাঙ্গালার মুক্তিসেনা উড়ায় গৌরবে।

নারীঃ

যশোহর দুর্গ তবে হয়েছে পতন?
কহ বীর ত্বরা আর আর রণাঙ্গনে
কিভাবে যুঝিছে মিত্র অক্ষৌহিনী সেনা?

পুরুষঃ

সিলেট কুমিল্লা টাংগাইল নোয়াখালী
জিনি হেলাভরে, আন্দোলিয়া নীলাকাশে,
ঘোর রবে গরজিয়া ভীষণ সরবে
চলিয়াছে মিত্রসেনা ঢাকা অভিমুখে
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করীযুথ যথা।
অগ্নিময় আকাশ পুড়িছে কোলাহলে
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে
উগড়ে আগ্নেয়গিরি অগ্নিস্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে শত্রু উঠিছে কাঁপিয়া
কাঁপিছে মালিক বিভীষন প্রাণভয়ে
থরথরি পিণ্ডিনাথ কাঁপে সিংহাসনে।
অলংঘ্য সাগর সম মিত্র অক্ষৌহিনী
বেড়িছে তাহারে। রক্ষা নাহি এবে তার।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, সবশেষে
নাশে বৃক্ষে; মহারথী মিত্র অক্ষৌহিনী
তেমতি দুর্বল করে এহিয়া পামরে
নিরন্তর। অবিলম্বে সমূলে নির্মূল
হইবে কুমতি। রক্ষিবে না কভু তারে
চীন আমেরিকা; রক্ষিবে না খান সেনা
আপনার জন। তুরঙ্গে কুরঙ্গে যেবা
মৃগেন্দ্র কেশরী নখে ছিন্নভিন্ন করি
নাশে প্রাণ, শৃগালের পদতলে চাপি
পিষ্ট করি সংহারে ক্রোধান্ধ ঐরাবত
তেমতি নাশিবে প্রভঞ্জন-সেনা সম
মিত্রসেনা ঘোর রণে এহিয়া পামরে।

নারীঃ

ধর্ম-নাম লয়ে যেবা ধর্ম নাশিয়াছে,
ধর্ম তারে করিবে না ক্ষমা। ধর্ম কভু
ক্ষমিবে না ঘোর অধর্মীরে। নরহন্তা
পাশব শ্বাপদ লভিবে না প্রাণভিক্ষা।

পুরুষঃ

পৃথিবীর রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি ছত্র ধরি
তারে রক্ষিবারে চাহে, বজ্রাঘাত হতে
রক্ষা নাতি হার। লুকালে জলধিতলে
মিত্রসেনা জল সেচি অতল সলিল
আনিবে ধরিয়া তারে মৃত্যুদণ্ড লাগি।
অধর্মের পরাজয় জানো সুনিশ্চয়।

নারীঃ

জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়

উভয় কণ্ঠেঃ
জয় মুক্তিবাহিনীর জয় জয় জয়
জী জীবনের জয়, জয় বাংলার জয়।

...ডিসেম্বর, ১৯৭১

পুরুষঃ

দুরাত্মা দানব দল মদমত্ত হয়ে
হানিয়াছে বঙ্গবক্ষে নিষ্ঠুর আঘাত
কাপুরুষ সম। সদা রুধিরাক্ত দেহে
কাঁদিছে জননী। হিংস্র হায়েনারা সবে
প্রমত্ত উল্লাসে ফেরে রাতের আঁধারে
প্রসারিত লোলজিহ্বা প্রেতের মতো।
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের স্তূপ মৃতদেহ,
ধর্ষিতা নারীর দেহে রাখি পদ ভার
বিধাতার জয়গান গাহিছে দানব।
পাকিস্তানের গলিত শব কাঁধে বহি

ইসলাম বাঁচাইতে করিছে বাসনা
পামর এহিয়া।

নারীঃ

ইসলাম কি বাঁচিবে তাহে?
মানবতা হত্যাকারী জল্লাদের
হাতে ধর্ম কভু লভিবে কি প্রাণসুধা?

পুরুষঃ

ধর্ম কহে না কভু নিষ্পাপ শিশুদেহে
করিতে আঘাত। ধর্ম কভু কহে নাই
নারীদেহ পশুসম করিতে দলন।
ধর্ম কভু কহে নাই সুতীক্ষ্ম শাণিত
অস্ত্রে নারীদেহ খণ্ডবিখণ্ডিত করি
রক্তমাখা মুখে গাহিতে ধর্মের গান।
যদি কেহ অস্ত্রাঘাতে শিশুহত্যা করে
যদি কেহ মদমত্ত পাশব ক্ষুধায়
নারীদেহ করিবে দলন তার লাগি
রহিয়াছে অনির্বা অনন্ত নরকণ।

নারীঃ

ইয়াহিয়া পাকসেনা মুখে ভাই বলি
ভ্রাতৃবক্ষে হানিয়াছে পাশব আঘাত
নারীরক্তে করিয়াছে ক্ষমাহীন পাপ
বাংলার বুকে।

পুরুষঃ

তারি লাগি দৃঢ়পদে
চলিয়াছে মুক্তিসেনা ক্ষমাহীন ক্রোধে
বিধাতার বজ্রসম করিতে সংহার
পাক পশু সেনা। ক্ষিপ্ত কেশরী যেমতি
বনভূমি প্রকম্পিয়া প্রচণ্ড গর্জনে পশুদেহ
ছিন্নভিন্ন করি তপ্তরক্তে করে

তৃষ্ণা নিবারণ, মদমত্ত করি
যথা শঠ শৃগালের পদতলে দলি
প্রতিহিংসার আগুন যত করে প্রশমন
তেমতি দুরন্ত ক্রোধে বীর মুক্তিসেনা
সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহারে জর্জরিত করি
পাক সেনা যত, প্রতিশোধ বহ্নি করে
নির্বাপণ। শত্রুরক্তে করি স্নান সদা
নিভাইছে প্রতিহিংসার প্রজ্বলিত চিতা।
ক্রুদ্ধ সিংহসম মুক্তিসেনা আগমনে
দানবের দল ভীত শ্বাপদের মতো
পুচ্ছ নামাইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়াছে
আত্মরক্ষা লাগি। দিকে দিকে ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠে বাংলার জয়,

নারীঃ

জয় সত্যের জয়, জয় ধর্মের জয়-

উভয় কণ্ঠেঃ

জয় মুক্তিবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় জীবনের জয়, জয় মানবতার জয়।

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

নারীঃ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মাঝে
কিবা খেলা চলিয়াছে কহ সমাচার

পুরুষঃ

নিরাপত্তা পরিষদে চীন আমেরিকা
স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে কুকীর্তি স্থাপিল
ধরা মাজে। স্বর্ণ বঙ্গে দুরাত্মা এহিয়া
কনক কমল বনে ঐরাবত যথা
লণ্ডভণ্ড করে সব বিস্মারিল তাহা।
বিস্মারিল দানবের প্রচণ্ড ক্ষুধায়
জ্বলিতেছে এবে বাংলার জনপদ।

স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি তোষণ করিছে
দুরাত্মা দানবে। ভারত আগ্রাসী কহি
মুক্তিযুদ্ধ দংশিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে
উঠিয়াছে মাতি, আনিয়াছে পরিষদে
প্রগলভ প্রস্তাব ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
মহান ভারত! অস্ত্র করো সংবরণ।

নারীঃ

অতঃপর কি করিল মহান রাশিয়া?

পুরুষঃ

গর্জিয়া উঠিল রাশিয়ার প্রতিনিধি
ধূর্ত শৃগালেরে দেখি সঘনে গর্জিয়া
যেমতি কেশরী ধায় বিদ্যুৎ গতিতে
ধরিতে তাহারে, পাপিষ্ঠ ভ্রমিছে দেখি
যেমতি গর্জিয়া ওঠে সুর, সুরপতি
হানে বজ্র পাপিষ্ঠের শির লক্ষ্য করি
রাশিয়ার প্রতিনিধি তেমনি গর্জিয়া
হানিল বজ্রের প্রচণ্ড আঘাত। ভেটো দিয়া
কহিল অশনি স্বরে, পাপী পাকিস্তান
কোটি লোক করিয়াছে নিজ গৃহ হারা,
দশ লক্ষ মানুষের রক্ত মাখি হাতে
মহাপাপ করিয়াছে পামর এহিয়া।
শৃগাল হইয়া সিংহে করিছে আঘাত
ভারত সীমান্ত দেশ করি আক্রমণ।
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে হিংস্র হয়ে
ছিন্নভিন্ন করেছিল বাংলার দেহ?
কোথা ছিলে তুমি বীর চীন আমেরিকা
জল্লাদ বাহিনী যবে ক্রুর লালসায়
আহুতি দিছিল ভোগে লক্ষ লক্ষ নারী?
মানবতা বিসর্জিয়া আসিয়াছ এবে
পশু লাগি করিতে ক্রন্দন, দানবের

রক্ষা করিবারে? কিন্তু হীন ইচ্ছা তব
হবে না সাধিত। যতদিন পাক সেনা
না ছাড়িবে বাংলার মাটি যতদিন
গলবস্ত্রে পামর এহিয়া চাহিবে না
ক্ষমা ভারতের পায়ে, অস্ত্র ততদিন
কোষবদ্ধ করিবে না ভারত কেশরী।

নারীঃ

ভেটো লভি দিশাহারা হইয়াছে তারা
কলংক জর্জর মুখে কথা নাহি আর।
হীনতার পরিচয় সর্ব অঙ্গে মাখি
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যাচে
দস্যুর জীবন ভিক্ষা। লজ্জা নাহি পায়
নিক্সন সরকার। নির্লজ্জ হয়েছে
চীন প্রগলভ কুমতি। এতদিন ধরি
গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলি ভিয়েৎনামে
লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করি আমেরিকা
বাংলার গণতন্ত্র হত্যা অনুষ্ঠান
করিবার ষড়যন্ত্রে রত। বিসর্জিয়া
মানবতা, সাম্যবাদ বুলি প্রকাশিছে
চীন আপনার ক্রুর গূঢ় অভিলাষ
ভারত বিদ্বেষ। মানবতা নিয়াছে সে
বলি আপনার হীন স্বার্থ বেদিমূলে
রক্ষা কি পাইবে তাহে পামর এহিয়া?

পুরুষঃ

পৃথিবীর শক্তি যদি ছত্র ধরি থাকে
এহিয়ার শিরের উপর রক্ষা নাহি
রক্ষা নাহি তার। লুকাইয়া থাকে যাদি
সমুদ্রে পর্বতে কিম্বা মরুভূমি মাঝে
রক্ষা নাহি পাবে, রক্ষা নাহি পাবে
কভু এহিয়া চমুর। যশোহর জিনিয়াছে,
জিনিয়াছে মিত্রসেনা সিলেট সমর
চলিয়াছে বীর সেনা বীর পদভারে

করিতে হেলায় জয় ঢাকার অংগন,
ব্যূহ ভাঙ্গি পলায়িত এহিয়া চমুর
এস্তভীত শ্বাপদ যথা মহা শংকায়
সন্দর্শিয়া বীরেন্দ্র কেশরী প্রাণভয়ে
উর্ধ্বশ্বাসে করে পলায়ন। সূর্যকর
মুক্ত হবে রাহুগ্রস হতে, ধ্বনিতেছে
গগন বিদারী কণ্ঠ, বাংলার জয়-

নারীঃ

জয় ন্যায়ের জয়, জয় ধর্মের জয়

উভয় কণ্ঠেঃ

জয় মিত্রবাহিনীর জয়, জয় জয়
জয় বাঙালীর জয়, জয় সত্যের জয়।

(রচনাঃ গাজিউল হক। আবৃত্তিঃ উম্মে কুলসুম ও আশফাকুর রহমান।)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটি রূপক অনুষ্ঠান- 'জল্লাদের দরবার' (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	...১৯৭১

জল্লাদের দরবার

১১ জুলাই, ১৯৭১

নকীবঃ (চিৎকার করে হাঁকছে) জনাব সদরে-মূলুক, খানা-এ-তালুক, প্যায়ারে মোহাম্মদ কেল্লা ফতে খান বাহাদুর-

ফতেঃ সিপাহসালার টিটিয়া খান, যুদ্ধের খবর কি?

সিপাহঃ যুদ্ধ শেষ। আমাদের সেনারা এখন ক্যাম্পে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে। আর ঘুমুচ্ছে।

দুর্মুখ খানঃ জনাব সদরে মুলুক, গোস্তাকি মাপ। আমি দুর্মুখ খান। মাঝে মাঝে অতিব সত্য কথা না বললে কেমন যেন অম্বলের মতো বুক জ্বলে যায়।

ফতেঃ তোমার কি বক্তব্য, বলে ফেল দুর্মুখ খান।

দুর্মুখঃ আমাদের সিপাহসালার বুড়ো হলেও মনটা জোয়ানই আছে। উনি এই মাত্র বললেন আমাদের সেনারা নাকি যুদ্ধ শেষ করে এখন ক্যান্টনমেন্টে বসে তুন্দুরী রুটি খাচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে।

ফতেঃ তুমি কি বলতে চাও?

দুর্মুখঃ হুজুরে আলা, আপনি তো তিন মাস হ'ল হার্ট আর মাথা ঘুরানি ব্যামোতে আপনার 'মসরকী বাঙ্গালে'' পা রাখতে পারেননি। যদি মেহেরবানী করে একবার ''বাংলাদেশে'' যান তাহলে দেখতে পাবেন, ওইসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদী মানে মুক্তিবাহিনী প্রতিদিন আপনার প্যায়ারে সেনাদলকে এ্যায়সান ধোপা পাটকান পাটকাচ্ছে যে, সেইসব আমাদের সেনারা তুন্দুরী রুটি খাবার বদলে হাসপাতালের বেডে খাবি খাচ্ছে। ওরা ঘুমুচ্ছে ঠিকই- তবে সে ঘুম সহজে ভাঙবার নয়। উঃ কি মার হুজুর- একেবারে বদন বিগড়ে দিয়েছে।

ফতেঃ খামোশ নালায়েক! মুক্তিবাহিনী-মুক্তিবাহিনী-মুক্তিবাহিনী! আমাকে পাগল না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

দুর্মুখঃ গোস্তাফি মাফ জনাব। ভুলে গিয়েছিলাম, ওদের মুক্তিবাহিনী বলা চলবে না। মানে ঐসব দুষ্টু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা।

ফতেঃ দুমুর্খ খানের একথা কি সত্য টিটিয়া খান?

সিপাহঃ জনাব, মারতে গেলে মার খেতে হয়- এইটাই আমাদের যুদ্ধকৌশল।

ফতেঃ তাহলে ওইসব দেশদ্রোহীদের হাতে আমার সাধের সেনাদল এখনও মার খাচ্ছে।

দুর্মুখঃ খাচ্ছে মানে? এ মার এমন মার যে হজম করা মুস্কিল। মেরে একে বারে তক্তা করে দিচ্ছে। আহা!

ফতেঃ দুর্মুখ খান, তোমার এই কথা শুনে আমার মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। পানি।

সিপাহঃ জনাব, আপনি বিচলিত হবেন না। আমাদের বীর সেনাবাহিনী জান দিয়েও দেশ রক্ষা করবে।

দুর্মুখঃ দেশ রক্ষা নয়- বলুন তারা এখন পেট রক্ষায় ব্যস্ত।

ফতেঃ তার মানে? বেশ খোলাসা করে বলো দুর্মুখ খান।

দুর্মুখঃ তার মানে বুঝলেন না জনাব? আপনার সেনাদল বাংলাদেশের বুকে অভিযান। চালাবার নামে নিরীহ মানুষ গুলোকে হত্যা করেছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুটতরাজ করেছে, ব্যাঙ্ক লুটেছে। এইসব লুটের টাকায় আপনার এক-একজন গরীব সেনা রাতারাতি ক্রোড়পতি বন গিয়া।

ফতেঃ এ তো আনন্দের বিষয়। খোশ খবর।

দুর্মুখঃ কিন্তু নিরানন্দে আপনি তাদের ভাসালেন জনাব। আচমকা একশো আর পাঁচশো টাকার নোটগুলোকে কাগজ করে দিয়ে আপনার ওইসব ক্রোড়পতি সেনাদের আপনি একেবারে পথে বসালেন। তারা বলছে, কেল্লা ফতে খান আমাদের পথে বসালেন।

ফতেঃ সিপাহসালার, এ কথা কি সত্য? এই দেখো মাথাটা আবার-

সিপাহঃ আংশিক সত্য জনাব। লুটের টাকা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা পুরো মাইনে না পাওয়াতে মানে ডিফেন্স সারর্টিফিকেটে মাইনে দেওয়াতে দিলে বড়ই দুঃখ পেয়েছে।

ফতেঃ কি আর করা যাবে সিপাহসালার। যুদ্ধের ব্যয়, খয়রাতি সাহায্য বন্ধ, ব্যবসা অচল। এই সব মিলে কোষাগার প্রায় শূন্য। উঃ মাথাটা কেমন যেন-

সিপাহঃ ভাববেন না জনাব। আমাদের সেনারা মাইনে না পেলেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

দুর্মুখঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, কুছ পরওয়া নাহি হ্যায়। পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের সময় আমাদের স্বনামধন্য লালকানার নবাব নন্দন বলেছিলেন, যদি আমাদের ঘাস খেয়ে বাঁচতে হয় তবু হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। ভাগ্যিস সতেরো দিনে যুদ্ধ থেমেছিলো।

সিপাহঃ তুমি পরিহাস করছো দুর্মুখ খান!

দুর্মুখঃ এ পরিহাস নয় সিপাহসালার। বাস্তব আর মুখের বজ্রঠাণ্ডা। বুলি এক নয়। এর মধ্যেই শোনা যাচ্ছে, আমাদের কিছু সেনা নাকি আর বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ খুন করতে রাজী নয়।

ফতেঃ ওফ! মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল!

সিপাহঃ বিচলিত হবেন না জনাব। এ নিতান্ত কিছু সেনার মুখের কথা- মনের কথা নয়।

দুর্মুখ ঃ আমাদের বৃদ্ধ সিপাহসালার আজকাল কি তাঁর প্রতিটি সেনার অন্তরের গভীরতর তলদেশ অন্বেষণ করে এ কথা বলছেন? আপনার বীর বেলুচ সেনারা যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। তারা নাকি এখন বলছে, কাফের হত্যার নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা যাদের খুন করছি তারা নিরীহ মানুষ, তারামুসলমান, তারা আমার ভাই।

ফতে ঃ ওফ-মাথাটা আবার-

সিপাহ ঃ জনাব, আপনার মাথাটাকে অতো ঘোরাবেন না। আপনার প্রেসার আবার বেড়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখুন। সব ঠিক করে দেবো।

ফতে ঃ কি করে আস্থা রাখি টিটিয়া খান! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে বলেছিলেন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমিও বিশ্বকে বুক ঠুকে বলেছিলাম, দেখে যান বিশ্ববাসী, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব স্বাভাবিক করে ফেলেছি। কিন্তু কতোকগুলো বিদেশী মানুষ এদেশে এসে আপনার জারি-জুরি সব ফাঁস করে দিল। আমার মুখ হাসালেন।

দুর্মুখ ঃ শুধু মুখ হাসালেন না, চোখের জলে লোমশ বুক ভাসালেন। আচ্ছা জনাব, যুদ্ধটা বন্ধ করে দিলে হয় না?

ফতে ঃ কি বললে?

দুর্মুখ ঃ একটু ভেবে দেখুন, আপনার জন্মদাতাও অবশেষে যুদ্ধে ক্ষ্যান্ত দিয়ে নিরালায় বসে আত্মজীবনী লিখছেন আর দিলখুশবাগে পায়চারী করছেন। আপনিও না হয় সব কিছুতে ইস্তফা দিয়ে সাকী আর সুরা নিয়ে খোশমহলায় বাকি জীবনটা আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেবেন। কি দরকার এসব ঝুট ঝামেলা!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান, তোমার এই ঔদ্ধত্য স্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। রসনা সংযত করো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে বহিষ্কার করতে পারি।

দুর্মুখ ঃ পারেন না জনাব। কারণ আমি আপনার হৃদয়ের গভীরে বাস করি। সেখান থেকে আমাকে বিতাড়িত করবেন কি করে।

সিপাহ ঃ জনাব আমি তাহলে এখন চলি।

ফতে ঃ আসুন। তবে হ্যাঁ, স্মরণ রাখবেন সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চরমভাবে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত বিশ্রাম আমাদের হারাম।

সিপাহ ঃ আমি আবার বলছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আর ক'দিন পর ওদের আমরা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো জনাব।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) দেখবেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মিলিত নিঃশ্বাসে আপনারা শেষে উড়ে না যান! নিজেদের গোড়া শক্ত করে রাখবেন।

সিপাহ ঃ এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। আমি চললাম জনাব। খোদা হাফেজ।

ফতে ঃ খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ ঃ জনাব, আমাদের সিপাহসালারের ভীমরতি ধরেছে। ওকে অবসর দিন।

ফতে ঃ আমিও তাই ভাবছি।

নকীব ঃ জনাবে আলা, লারকানার নবাবজাদা আপনার দর্শনপ্রার্থী।

ফতে ঃ উঃ লোকটা আবার ঝামেলা করতে আসছে।

দুর্মুখ ঃ সে কি জনাব, বাদশাজাদা আপনার প্যায়ারের দোস্ত। সেই দোস্তকে এখন বরদাস্ত না করার কারণ?

ফতে ঃ যখন প্রয়োজন ছিল দোস্তি করেছি।

দুর্মুখ ঃ আর এখন প্রয়োজন শেষে ছোববার মতো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন এইতো!

ফতে ঃ এইটাই আমাদের নীতি। যাও, নবাবজাদাকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব ঃ জো হুকুম জনাব।

দুর্মুখ ঃ আমি কি চলে যাবো জনাব?

ফতে ঃ না-না-থাক। বুঝলে দুর্মুখ খাঁ, এক এক সময় তোমাকে সহ্য করতে পারি না সত্য, আবার তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে পারি না। আসুন, নবাবজাদা, আসন গ্রহণ করুন। তারপর কি সংবাদ?

নবাব ঃ আমাদের পক্ষে আর প্রকাশ্যে চলাফেরা দুঃসাধ্য খাঁ সাহেব। কোন রকেম ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে চলছি।

ফতে ঃ কেন?

নবাব ঃ আমার দলের সদস্যরা আজকাল কাবলে তাগাদা শুরু করেছে। তারা বলছে, আমরা এতো তকলীফ করে সদস্য হলাম, আর এখন পর্যন্ত ক্ষুদে উজির হওয়া তো দূরের কথা, মাইনেটা পর্যন্ত পেলাম না।

ফতে ঃ (হেসে) নবাবজাদা বর্তমান পরিস্থিতি বড়ই ঘোলাটে।

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদা সেটা জানেন হুজুর, কারণ ওঁর হাত দিয়েই তো ঘোল ঢালিয়েছেন।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাফ করবেন।

নবাব ঃ খাঁ সাহেব, আপনি আমার কাছে ওয়াদা করেছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঠাণ্ডা করেই ক্ষমতা আমার হাতে অর্পণ করবেন।

দুর্মুখ ঃ লাগ ভেল্কি লাগ, চোখে মুখে লাগ।

ফতে ঃ নবাবজাদা, আমার ওয়াদার পূর্বে আপনি আপনার দেশবাসীর কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, আপনার কতো একর জমি যেন গরীবদের মধ্যে দান করবেন। আপনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন?

নবাব ঃ সেটা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ফতে ঃ আর এটাও আমার কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বৈ কি! কারণ-

দুর্মুখ ঃ কারণ, এই দেশ হুজুরের বাপ-দাদার খাশ তালুক না হলেও গোটা মালুকের একছত্র মালিক উনি।

ফতে ঃ স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান।

নবাব ঃ আমি এসেছি এই জন্যে যে, আর আপনার কাছ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাবো খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ প্রতীক্ষায় থাকু-ব্যবস্থা হবে।

নবাব ঃ তাতো বুঝলাম। কিন্তু কবে!

দুর্মুখ ঃ ঠিকই তো। এ কথা তো ছিল না!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান-

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাপ করা হোক জনাব।

ফতে ঃ আর চার মাস অপেক্ষা করুন নবাবজাদা। যদি দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারি, যদি পৃথিবীর মানচিত্রে এ রাজ্যের অস্তিত্ব থাকে- তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সম্পূর্ণ বিমুখ করবো না।

দুর্মুখ ঃ হুজুর পাঠানের বাচ্চা- এক কথার লোক। পাঠান জীবন থাকতে ওয়াদা খেলাপ করে না।

ফতে ঃ নিশ্চয়ই।

দুর্মুখ ঃ অবশ্য নেহাৎ বেকায়দায় পড়ে দু'চারবার বাধ্য হয়ে জনাবকে কথার বরখেলাপ করতে হয়েছে তবে পৃথিবীর গ্রেটম্যানরা ওসব করেই থাকেন।

ফতে ঃ দুর্মুখ, তোমাকে আমি কোতল করবো। তুমি গাধার বাচ্চা।

দুর্মুখ ঃ হুজুর আমার মা-বাপ। যা বলবেন তাই সত্যি।

নবাব ঃ আমি চলি। আবার আসবো। খোদাহাফেজ।

দুর্মুখ ঃ লারকানার নবাব নন্দন একটু চটে গেছেন।

ফতে ঃ কুছ পরওয়া নাহি। এই দেখো, আবার মাথাটা ঘুরে উঠল। বাতাস দাও-পানি খাওয়াও।

১৬ জুলাই, ১৯৭১

সিপাহ ঃ কি ব্যাপার দুর্মুখ খান? তুমি একাকী দরবারে বসে যে?

দুর্মুখ ঃ এসেছি একা, যাইবো একা। দোসর নাহিকো আর।

সিপাহ ঃ কাব্য করতেও জানো নাকি?

দুর্মুখ ঃ বাংলায় কিছুদিন ছিলাম। তাই শ্যামল মাঠভরা ধানের বাতাসে হৃদয়ে একটু কাব্য সঞ্চার হয়েছিল সিপাহসালার ।

সিপাহ ঃ বাংলাকে তুমি ভালোবাসো?

দুর্মুখ ঃ অমন সোনার বাংলাকে কে না ভালোবাসে জনাব। বাংলার মাটি, বাংলার আকাশ, সোনাঝরা রোদ্দুর প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগায়।

সিপাহ ঃ কই আমার মনে তো কোন স্পন্দন জাগে না!

দুর্মুখ ঃ সিপাহসালার, জীবনে আপনি কোনদিন হেসেছেন?

সিপাহ ঃ না।

দুর্মুখ ঃ কোনদিন কেঁদেছেন?

সিপাহ ঃ না।

দুর্মুখ ঃ তবে কি করে আপনার হৃদয়ে স্পন্দন জাগবে? আপনি যে মৃত নক্ষত্রের মতো। হৃদয়টাকে হত্যা করেছেন আপনি।

সিপাহ ঃ না। আমি উল্কার মতো আকাশের বুকে অশুভের বার্তা নিয়ে দেখা দিই। তাইতো আমার ছায়া দেখলে লোকে শিউরে ওঠে।

দুর্মুখ ঃ আমার মনে হয় সিপাহসালার, শৈশবে, কৈশোরে আপনি কারও স্নেহ-ভালোবাসা পাননি। তাই আপনার হৃদয় থেকে স্নেহ, ভালোবাসা শুকিয়ে গেছে। অন্তর বিদ্রোহ করেছে। আচ্ছা সিপাহসালার, আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার এতোটুকু স্নেহ-ভালোবাসা নেই?

সিপাহ ঃ প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ ঃ নিজের স্ত্রীকেও কি কোনদিন একটু ভালোবেসে-

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান! বেয়াদপি আমি পছন্দ করি না। ভালোবাসা! স্নেহ! মমতা! ওসব হচ্ছে ন্যাকামি, ভাঁড়ামি। আমি ঘৃণা করি ওসবকে। ওই মোহে যারা আচ্ছন্ন তারা বেয়াকুব।

দুর্মুখ ঃ আচ্ছা আপনি তাহলে কি ভালোবাসেন, সিপাহসালা?

সিপাহ ঃ মানুষ খুন করতে আমি ভালোবাসি। রক্ত! মুঠো-মুঠো রক্ত হাতে নিলে আমি আনন্দ পাই- আমার বুকজোড়া তৃষ্ণা নিবারণ হয়- হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগে- স্পন্দন, শিহরণ জাগে।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) ইতিহাসের এক নতুন চরিত্র! বিশ্বের বিস্ময়!

সিপাহ ঃ জানো দুর্মুখ, যুদ্ধে মানুষ খুন করলে কোন গুণাহ হয় না। তবে জানি না আমার কিসমৎ আমাকে কোথায় নয়ে চলেছে।

দুর্মুখ ঃ জাহান্নামে জনাব।

সিপাহ ঃ কি বললে দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ না, মানে ইয়ে বলছিলাম কি, জনাবের বয়স অনেক হয়েছে, তাই জাহান্নামে যাবার পাসপোর্ট পেতে দেরী নয়। তবে হুজুর, বেহেস্তে যাবেন না। ওখানে আপনি শান্তি পাবেন না। কারণ সেখানে যতসব মহাত্ম ব্যক্তিরা খোদার ধ্যানে মগ্ন। ওসব ন্যাকামিপনা দেখলে আপনার গা খিসমিস করবে- হাত চুলকাবে। তার চাইতে আপনি দোজখবাসী হবেন। সেখানে আপনার

অনেক বাপ, দাদা, চাচা, মামুর সাক্ষাৎ পাবেন। আপনি সেখানে গেলে একেবারে দোজখ গুলজার হবে। কবে যাবেন জাহাপনা? আগে থেকে জনাবের যাতে ঢাকেশ্বরী মিলের ফাইন কাফনের কাপড় আপনার হাতে দিতে পারি। আমাদেরও তো একটু কর্তব্য আছে।

সিপাহ ঃ খামোশ কমবকত!

দুর্মুখ ঃ এইতো আবার চটে যাচ্ছেন। যতো বুড়ো হচ্ছেন ততই মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে। শিশুহত্যা নারী হত্যা করে আপনি যেরকম না করেছেন- তাতে মেজাজের মুখে লাগাম না দিলে বুড়ো বয়সে অপঘাতে মরবেন।

সিপাহ ঃ আমাকে মারবার সাধ্য কারও নেই।

দুর্মুখ ঃ আছে জনাব-আছে- ওই মাথার ওপর যিনি বসে আছেন তার মার আপনি রকেট-বোমা দিয়েও ঠেকাতে পারবেন না। সেই মার দুনিয়ার বার।

সিপাহ ঃ আমি কাউকে পরোয়া করি না দুর্মুখ।

দুর্মুখ ঃ আপনি খোদাকে মানেন?

সিপাহ ঃ যাকে দেখি না তাকে মানি না।

দুর্মুখ ঃ তাহলে ইসলাম রক্ষার জন্য বাংলার বুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলেন কেন?

সিপাহ ঃ মসনদ ক্ষমতা রক্ষাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দুর্মুখ ঃ ও! ''ইসলাম বিপন্ন- ইসলাম রক্ষা সাচ্চা মুসলমানের ফরজ'' ইত্যাদি বজ্র বুলি তাহলে বাম্প? আসলে-চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

সিপাহ ঃ বাঁচতে পারছি কই?

দুর্মুখ ঃ কি বললেন!

সিপাহ ঃ না- কই কিছু না! যাক, ওসব রাজনীতি নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। ওসব তুমি বুঝবে না।

দুর্মুখ ঃ ২৩ বছর পর এবার বুঝেছি। চোখ খুলে গেছে। সূর্যের আলোর মতো সব ঘোর কেটে গেছে।

সিপাহ ঃ তুমি বড় চালাক দুর্মুখ খান। তোমার বুদ্ধির প্রখরতায় এক এক সময়- যাক, চলো জাঁহাপনার মন্ত্রণা কক্ষে যাওয়া যাক।

দুর্মুখ ঃ সে কি জনাব, আমাকে আপনি সহ্য করতে পারেন না অথচ আমাকে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে জাঁহাপনার সামনে হাজির হতে চান? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না তো সিপাহসালার!

সিপাহ ঃ না মানে, তুমি দরবারে না থাকলে দরবার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

দুর্মুখ ঃ যাক, তাহলে এতদিন পরে আমার অস্তিত্বটুকুকে স্বীকার করলেন। সত্যিই আমি যে কি আনন্দিত সিপাহসালার যে, এই মুহূর্তে আপনার মৃত্যু হলে এতো আনন্দিত হয়তো হতে পারতাম না।

পিসাহ ঃ দুর্মুখ খান! বেয়াদপ- বেতমিজ-

দুর্মুখ ঃ ক্ষ্যাপা কুকুরটা বিদায় হলো তাহলে। খোদা, তোমার দুনিয়া থেকে এই আবর্জনাগুলোকে সরিয়ে নাও। নইলে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষ তোমাকে অভিশাপ দেবে। তোমার আরশ কেঁপে উঠবে। এ্যায় পরওয়ারদিগার, তুমি রহমানুর রাহিম। রহম করো- নিরীহ, নিষ্পাপ বঙ্গসন্তানদের প্রতি তুমি রহম করো। ওরা সত্য, ন্যায়ের পূজারী। ওরাই তোমার সৃষ্টির গর্ব। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরাত্মা যেখানে অত্যাচারিত নির্যাতিত, সেখানে কেন তুমি নিশ্চুপ!

নবাব ঃ দুর্মুখ খান-

দুর্মুখ ঃ এই যে আসুন নবাবজাদা।

নবাব ঃ জাহাপনা কোথায়?

দুর্মুখ ঃ মন্ত্রণা কক্ষে।

নবাব ঃ কেউ কি মন্ত্রণা কক্ষে গেছে?

দুর্মুখ ঃ জী হ্যাঁ। ত্রিরত্নের এক রত্ন এইমাত্র অন্দরে গেলেন, এবার আপনি গেলেই ত্র্যহস্পর্শ।

নবাব ঃ কোন গোপন সলাপরামর্শ হচ্ছে নাকি?

দুর্মুখ ঃ (হেসে) আজ তেইশ বছর ধরেই তো এই দরবারের মন্ত্রণা কক্ষে কতো চক্রান্তের জাল জন্ম নিল- আবার ভাঙলো- আবার গড়লো। মাকড়শার মতো এই দরবার জালে ছেয়ে গেছে। তাইতো নিজেদের জালে নিজেরা ফেঁসে গিয়ে এখন আর পালাবার পথ পাচ্ছে না।

নবাব ঃ তুমি বড় বাজে বলো।

দুর্মুখ ঃ মাঝে মাঝে একটু চরম সত্যি কথা না বললে মুখটা কেমন যেন তেতো তেতো লাগে।

নবাব ঃ আমার হাতে ক্ষমতা আসলে আমি তোমাকে একটা মন্ত্রিত্ব দেবো। দু পয়সা পাবার লাইন ধরিয়ে দেবো।

দুর্মুখ ঃ সাবাস নবাবজাদা- সাবাস! গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে নিজের পেট বাঁচান নবাজাদা।

নবাব ঃ আমি অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ ওসব ধাতু ছাতু হয়ে যাবে নবাজাদা। সত্যিই, আপনার অবস্থার কথা চিন্তা করলে আমার মরা কান্না কাঁদতে ইচ্ছে করে।

নবাব ঃ কেন? কেন? কাঁদার কি আছে!

দুর্মুখ ঃ কাঁদবো না! জাঁহাপনা আপনার গলার দড়ি ধরে ডুগডুগি বাজালেন। দর্শকের সামনে আপনি লেজ নেড়ে নাচলেন, ডিগবাজী খেলেন, খেল দেখালেন। তারপর ভাঙ্গা থালে হাতে করে দর্শকের পায়ে হাত দিয়ে পয়সা নিয়ে জাঁহাপনাকে দিলেন। জাঁহাপনা মুচকি হেসে পকেটে সব পয়সা পুরলেন- আর আপনি বসে বসে এখন উকুন বাছছেন- আর এক টুকরো কলার জন্যে জাঁহাপনার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। এদিকে লোকে আপনার পেছনে কাঠির খোঁচা দিয়ে মজা লুটছে- আর আপনি দাঁত খিচুচ্ছেন। এইতো পরিণাম!

নবাব ঃ খামোশ বেয়াদপ। তোমাকে- তোমাকে আমি-

দুর্মুখ ঃ আহা- আপনার এ্যালকোহলী চেহারা লাল হয়ে গেল। রাগ করবেন না নবাবজাদা। একটু ঠাট্টা করলাম মাত্র।

নবাব ঃ তুমিই কি এই মন্ত্রণা কক্ষের দ্বাররক্ষী?

দুর্মুখ ঃ না জনাব, আমি হৃদয়ের দ্বাররক্ষী! হৃদয়ের বন্ধ দরজা আমি খুলে দিয়েছি।

নবাব ঃ উন্মাদ! যতোসব উন্মাদ-

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদাও মন্ত্রণা কক্ষে চলে গেলেন। আমি উন্মাদ! কিন্তু তোরা- তোরা কি? তোরা জল্লাদ। তাই এই জল্লাদের দরবার ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। (Change over)

।। মন্ত্রণা কক্ষ।।

ফতে ঃ শুনুন সিপাহসালার টিটিয়া খান, শুনুন লারকানার নবাবজাদা, পিণ্ডির মসনদ আজ ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে চলেছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহীরা আমাদের লক্ষ্য করে একের পর এক তীর ছুঁড়ছে। বাংলাদেশের বিদ্রোহের ফলে দারুণ অর্থসংকট দেখা দিয়েছে আমার রাজ্যে। শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ হয় না- যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে আমার কোষাগারে। আপনারাই বলুন, এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

দুর্মুখ ঃ (স্বাগত) আহত মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র শেয়াল আর বেড়ালের কাছে মুক্তি চাইছে। হাসি পায়।

সিপাহ ঃ আমাদের আহাম্মুখ খান, চিটজাদা কি উপদেশ দিচ্ছেন?

ফতে ঃ ও ব্যাটাদের মাথায় কিছু আছে নাকি! বাঁদরের বাচ্চারা আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেয়ে এখন জিব চাটছে।

দুর্মুখ ঃ না জনাব। ওদের গোঁফ-দাড়িতে এখন কাঁঠালের আঠা জড়িয়ে গেছে। তাই এখন ঘরের কোণে বসে কাঁঠালের আঠা ছাড়াচ্ছে।

নবাব ঃ অনেকটা সত্য। ওদেরই জন্যে রাজ্যের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে ভেঙ্গে পড়েছে।

ফতে ঃ সিপাহসালার, বাংলাদেশে খাজনা-কর আদায় কেমন হচ্ছে?

সিপাহ ঃ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি জনাব।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু কোনই ফয়দা হচ্ছে না। কারণ বাংলার দামাল ছেলেরা সব তহসীল-অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে।কার বাপের সাধ্য যে বোমা খাবার জন্যে খাজনা আদায় করতে যাবে!

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান, অবান্তর কথা বলে জাঁহাপনাকে অসুস্থ করে তুলো না।

দুর্মুখ ঃ কবে কখন জাঁহাপনা সুস্থ, প্রকৃতিস্থ থাকেন সিপাহসালার!

ফতে ঃ খামোশ দুর্মুখ খান। এটা মন্ত্রণা কক্ষ।

দুর্মুখ ঃ এই মন্ত্রণা নিয়েই তো আপনার যতো যন্ত্রণা।

ফতে ঃ সিপাহসালার, মসরেকী বাঙ্গাল থেকে পাট বিক্রয়ের কি ব্যবস্থা করলেন?

দুর্মুখ ঃ পাট সব লোপাট জনাব।

ফতে ঃ তার মানে?

দুর্মুখ ঃ জনাব, বাংলার ওই বিদ্রোহী নেকড়েগুলো আপনার পাটের গুদামগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে- কারণ, আপনারা যাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে অস্ত্র কিনতে না পারেন। তা ছাড়া বাংলার মুক্ত অঞ্চলের যাবতীয় পাট বাংলাদেশ সরকার ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানী করছেন। ওই পাট দিয়েই আপনাদের সাট করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! উঃ মাথাটা আবার ঘুরে উঠল।

সিপাহ ঃ দুর্মুখের কথায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন না-জনাব। এবার মাশরেকী বাঙ্গালে পাট খুব কম পয়দা হয়েছে।

ফতে ঃ নসীব- সবই বদনসীব সিপাহসালার। বিপদ যখন আসে তখন চারিদিক দিয়ে আসে।

দুর্মুখ ঃ আলবৎ। খোদা যখন দেন তখন একেবারে ছাপ্পর ফারকে দেন। আর যখন মারেন, তখন পানি খাবারও সময় দেন না।

ফতে ঃ উঃ পাঁচ ডিভিশন সৈন্য দিয়েও আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন না। সিপাহসালার! অথচ বোমাবাজ টিটিয়া খানের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল।

দুর্মুখ ঃ বোমাবাজ, ধরিবাজ যাকেই পাঠান- বাংলা মুলুকে গিয়ে সবাই ডিগবাজী খাবেন। কারণ আল্লাহ খোদ মদত করছেন বাঙালীদের। তাইতো বীর প্রসবিনী বাংলা আজ ধন্যা।

ফতে ঃ ওফ্- বাংলা-বাংলা-বাংলা। সিপাহসালার বাংলাকে আপনি পোড়ামাটি করে দিন। মৃতদেহের ভাগাড়ে পরিণত করুন মাশরেকী বাংলাকে। কুকুর-শেয়ালের সামনে বাঙালীদের লাশগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন।

দুর্মুখ ঃ চমৎকার।

সিপাহ ঃ অবশেষে তাই করবো আলমপনা। আমি টিটিয়া খান- আমার রোষানলে সব ভস্মীভূত হবে। পুড়িয়ে দেবো বাংলার মাটি, জ্বালিয়ে দেবো ক্ষেত খামার। বাংলার মাটিকে আমি বন্ধ্যা করে দেবো।

দুর্মুখ ঃ আপনার মাথার ওপর শকুন উড়ছে সিপাহসালার!

সিপাহ ঃ দুর্মুখ খান!

নবাব ঃ দুর্মুখ ঠিকই বলেছে সিপাহসালার। বিদ্রোহ শুধু বাংলার মানুষের মধ্যে নয়- বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে।

ফতে ঃ আপনি আমার সৈন্যদের ভেতরের খবরও রাখেন নাকি নবাবজাদা!।

নবাব ঃ নিশ্চয়ই। চোখ-কান আমার সদা সজাগ। খাঁ সাহেব হয়তো জানেন না যে, ইতিমধ্যে আমাদের 'ম্যাসাকার বাহিনী' বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে পালাচ্ছে- আত্মসমর্পণ করছে- আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে।

ফতে ঃ তারপর- তারপর নবাবজাদা?

নবাব ঃ শুধু তাই নয়, আমাদের বেলুচ সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এমন কি আমাদের সৈন্যদলের কিছু অধিনায়ক তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তারা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছেন খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ ঃ তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কিত্ কিত্ খেলা শুরু করবো। আগেই বলেছি কাকের মাংস কাকে খায়। তাইতো বলছি আলমপনা, আপনাদের মাথার ওপর শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা সাবধান!

ফতে ঃ এদিকে ভারত আমাদের সামনে বিরাট মহীরুহ। যুদ্ধের হুমকি দিয়েও ফয়দা হ'ল না। এই জাতশত্রুকে খতম করতে না পারলে-

দুর্মুখ ঃ ভারত অস্ত্র শাণিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবার জন্যে বসে আছে। মার আমরা খাবো ঠিকই- তবে তারা মলম লাগিয়ে দেবে বলেছে।

ফতে ঃ অসহ্য- অসহ্য! সিপাহসালার, অবিলম্বে ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করুন। যুদ্ধের দামামা বাজান। যুদ্ধ-যুদ্ধ চাই। হয় উত্থান- না হয় পতন। হয় ইতিহাসের মানচিত্রে আমরা টিকে থাকবো- না হয় মুছে যাবো। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সিপাহ ঃ কিন্তু জাঁহাপনা-

ফতে ঃ এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। বাঁচা কিম্বা মরা, দুটোর একটা বেছে নিন। মাশরেকী বাঙ্গালকে কবজায় আনতে হলে, ভারত আক্রমণ ছাড়া অন্য উপায় আর নেই সিপাহসালার। এ কি আপনার মুখটা অমন ছাইয়ের মতো, অমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন! যান, মুখে পানির ছিটে দিয়ে বিছমিল্লাহ বলে অগ্রসর হোন। আর নবাবজাদা, আপনিও বিদায় গ্রহণ করুন।

সিপাহ ঃ খোদা হাফেজ।

ফতে ঃ খোদা হাফেজ।

দুর্মুখ ঃ উফ! দুই রাহু বিদায় হল। আলমপনা, আপনি একটা অষ্টধাতুর মাদুলী গলায় বাঁধুন। যেভাবে শনির দল আপনাকে ঘিরে ধেরেছে-

ফতে ঃ দুর্মুখ! তোমার ওসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগছে না। যক্ষ্মার বীজাণুর মতো কে যেন সর্বদা আমার বুকেরভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। সাড়া শরীরে যেন শক্তি পাচ্ছি না। একটা দাহ, বুঝলে দুর্মুখ, কিসের যেন একটা দাহ সর্বদা পুড়িয়ে মারছে। জ্বলে যায়- আমার সর্বশরীর জ্বলে যায়।

দুর্মুখ ঃ কিসের দাহ জানেন না? শিশুহত্যা, নারীহত্যার গুণাহ। ওদের অভিশাপের দাহ আপনাকে দগ্ধ করছে। এর কোন দাওয়াই নেই জনাব। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

ফতে ঃ শিশুহত্যা-নারীহত্যা। হ্যাঁ- মানুষের বাচ্চাগুলোকে আমি খুন করেছি- নারীর ইজ্জত লুটেছি- হত্যা করেছি। আমি খুনি-আমি জল্লাদ- আমি বেঈমান। দেখেও নাও- দেখে যাও বিশ্বাবাসী। আমি নিরীহ বাঙ্গালীর লহুতে রক্তস্নান করেছি- বাঙালীদের লাখো লাশের ওপর বসে আমি মসনদী করছি। আমি বিশ্বের বিস্মরণ- আমি মহাত্রাস- আমি জল্লাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জল্লাদ-

আমি খুনী- আমি কশাই। হা-হা-হা-আরও রক্ত চাই- আরও রক্ত চাই- আমি রক্তবীজ- আমি রাক্ষস-হা-হা-হা-....

দুর্মুখ ঃ নাটক জমে উঠেছে। যবনিকার আর দেরী নেই। তারপর নতুন পালা শুরু।

১ আগস্ট, ১৯৭১

।। বাদশা কেল্লা ফতে খান হাসছেন।।

দুর্মুখ ঃ আলমপনা, সকাল থেকে আপনি শুধু হাসছেন। এ এক আশ্চর্য পরিবর্তন।

ফতে ঃ কেন হাসছি বল তো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ অনেক রকম হাসি আছে জনাব। আনন্দের হাসি, দুঃখের হাসি, শয়তানের হাসি-

ফতে ঃ আমার হাসি শুনে কি মনে হচ্ছে তোমার?

দুর্মুখ ঃ ইথারের বুকে কান পাতলে এমনি অনেক অট্টহাস্য শুনতে পাই। সুলতান মামুদ, নাদির শা, চেঙ্গিস, হিটলার সকলে বোধ করি এভাবেই হাসতেন।

ফতে ঃ রাজা-বাদশারা এভাবেই হাসে মূর্খ।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু জাঁহাপনা, কোনদিন কি মায়ের হাসি দেখেছেন? যখন মায়ের কোলে শিশুর মধুর হাসি মুখ দেখে বুক ভরিয়ে যায়? কোনদিন কি রাস্তার ওই উলঙ্গ ছেলেটার মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখেছেন? দেখেছেন কি গ্রাম-বাংলার কৃষকের প্রাণের খোলা হাসি? না, দেখেননি। কারণ সেইসব হাসি আপনি কেড়ে নিয়েছেন।

ফতে ঃ বাংলা-মাশরেকী বাঙ্গালা। শোন দুর্মুখ খান, বাংলার মানুষের মুখের হাসির চাইতে সেখানকার জমিন আমার কাছে-

দুর্মুখ ঃ জানি জনাব, বাংলাদেশটা আপনাদের কাছে সোনার থালা, আর বাঙালীদের কাছে বাংলা ওদের মা। সেই মাকে কোনদিন কি আপনি ওদের কাছে থেকে কেড়ে নিতে পারবেন?

ফতে ঃ দুর্মুখ, বাদশা কেল্লা ফতে খান যেখানে থাবা চালায় সেখান থেকে খালি মুঠি কোনদিন ফিরিয়ে আনেন না।আর খোদা না খাস্তা যদি বাংলাদেশ আমার হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে গোটা বাংলাদেশটাকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত করবো। এই আমার কসম।

দুর্মুখ ঃ জনাব, শুনি নাকি ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই নতুনের ভিত্তি রচিত হয়। আশ্চর্য সাহস ওই বাংলার দামাল ছেলেগুলোর-এখনও হিংসের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

ফতে ঃ ওই বিদ্রোহীরা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আমার নীদ হারাম করেছে। কিন্তু কমবকতরা জানে না বাদশা কেল্লা ফতে খান জিন্দেগীর চলার পথের কোন কাঁটাকে পাশ কাটিয়ে যায়নি- বরঞ্চ দু'পায়ে দলে গেছে।

দুর্মুখ ঃ জনাব, শুনি নাকি বাংলাদেশের পথে কাঁটার চাইতে কাদা বেশী। সেই হাতী এবার কাদায় পড়েছে জাঁহাপনা।

ফতে ঃ তার অর্থ?

দুর্মুখ ঃ আলমপনা, দীর্ঘ চার মাস অতিবাহিত হতে চললো, আপনার জবরদস্ত বীর জোয়ানরা স্বাধীনতাকামী ছেলেগুলোঠাণ্ডা করতে পারল না। এদিকে ওই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আরও শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ হচ্ছে। আমাদের সৈনিকরা বুকে থাবা মেলে এগিয়ে যাচ্ছেথ- কিন্তু পরক্ষণে মাজা ভেঙ্গে ছাউনীতে ফিরছে। কেউ আর নাড়িভুঁড়ি এলিয়ে চিতোচ্ছে। আহা রে, আমাদের সোনার চাঁদ সেপাহীদের রক্তাক্ত দেহ দেখে- (কান্নার সুর কণ্ঠে)

ফতে ঃ কেঁদো না-কেঁদো না দুর্মুখ খান। আমার মাথা ঘুরছে। এ্যাই- দাওয়াই কা বেতল লে আও।

দুর্মুখ ঃ অতো দাওয়াই খাবেন না জনাব। এমনিতেই ভুল বকছেন- আবার ঘন ঘন দাওয়াই পেটে পড়লে, একেবারে ক্ষেপে যাবেন জনাব।

ফতে ঃ খামোশ কমবকত! তমিজ-সে বাত করো!

দুর্মুখ ঃ বড় দুঃখে বলি জনাব। আমার বুকটা দুঃখে জার জার।

ফতে ঃ বেচেখান হয়ো না দুর্মুখ খান। যুদ্ধের সাফল্যের ওপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ক্রুর রাজনীতি আমার হাতিয়ার।

দুর্মুখ ঃ মেহেরবানী করে বান্দাকে যদি একটু খুলে বলতেন-

ফতে ঃ শোন দুর্মুখ- গোলা, বারুদ, সুরা, নারী আমার জীবনের সবচে' পেয়ারা চীজ। মাগার পিণ্ডির এই তক্তে তাউস আমাকে ছাড়ল না। উনোসত্তরের বাংলা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ল। সেই বাংলার জনতার জ্বলন্ত লাভা আছড়ে পড়ল পিণ্ডির মসনদে। কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাঙ্গালীদের বঙ্গবন্ধু।

দুর্মুখ ঃ জানি জনাব। এবং সঙ্গে সঙ্গে মসনদচ্যুত হলেন আপনার ধর্ম-আব্বা হুজুর জনাব খানে খান বেকুব খান।

ফতে ঃ উত্তাল তরঙ্গে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে এই তক্তে তাউস। আমি হাল ধরলাম। ছলনা আর মিষ্টি কথার অস্ত্র প্রয়োগকরে অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করলাম। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে, ওই বঙ্গবন্ধু মানুষটার মধ্যে এতো আগুন আছে। আগে যদি জানতাম, তাহলে নির্বাচনের প্রহসন করতে গিয়ে-

দুর্মুখ ঃ সং সেজে বুক চাপড়াতে হতো না।

ফতে ঃ তবু আমি বঙ্গবন্ধুকে প্রলোভন দেখালাম- ছলে বলে বশ করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আজ পর্যন্ত মানুষটাকে নীতিচ্যুত করতে পারলাম না। তাই চাঁদির জুতো ফেলে চামড়ার জুতো চালালাম কিন্তু-

দুর্মুখ ঃ কিন্তু সেই জুতো যে ফিরে এসে আপনার মুখে পড়বে তা কি আর ভেবেছিলাম জনাব!

ফতে ঃ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ গোস্তাফি মাফ করবেন জনাব। আচ্ছা আলমপনা, এখন আপনার এই খাশ তালুক রক্ষার কি ব্যবস্থা করছেন?

ফতে ঃ শোন, আমি নিজেই একটা আইন তৈরী করছি। আর সেই আইন মোতাবেক আমিই হবো এই তক্তে তাউসের একচ্ছত্র অধিপতি।

দুর্মুখ ঃ একেই বলে রাজরাজড়ার মাথা!

ফতে ঃ আরও শোন, আমার ওইসব পোষা কুকুর যারা এইটুকরো মাংসের জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ সর্দার, বেঈমান হতে পারে- তাদের আমি নফর করবো। বিশ্ব দেখবে, আমার ছত্রচ্ছায়ায় গণপ্রতিনিধিরাই রাজ্যভার গ্রহণ করেছে।

দুর্মুখ ঃ মারহাব্বা- মারহাব্বা, জনাব! আপনাকে যে মা গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি সত্যিই বিশ্বের বিস্ময়!

ফতে ঃ কেমন লাগলো পরিকল্পনা?

দুর্মুখ ঃ অদ্ভুত! জনাব- অদ্ভুত! আমি শুধু ভাবছি, এতো বুদ্ধি নিয়ে আজও আপনি বেঁচে আছেন কি করে।

ফতে ঃ (হেসে) সত্যিই তুমি রসিক পুরুষ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ একটা ছোট্ট গল্প বলি জনাব। বিয়ে-পাগল এক মূর্খ ব্যক্তি স্থির করল সে এক ধনীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে, শ্বশুর-শাশুড়িকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই মুর্খকে কোন মেয়েই পছন্দ করল না। অবশেষে এই মূর্খ রাগে-দুঃখে তার বুড়ি মাকে বললো- মাগো, আমার বিয়া আমি আর দেইখ্যা যাইতে পারুম না।

ফতে ঃ (উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন) হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-[আচমকা হাসি বন্ধ করে ক্রোধে] এ্যাঁ। কি বললে, দুর্মুখ খান! বেহুদা বততামিজ, কমিনে- নিকাল যাও- [গর্জে উঠলেন' উঃ মাথাটা আবার-

।। দরবার কক্ষ।।

নবাব ঃ বন্দেগী খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ আসুন লারকানা নবাবজাদা। কি সংবাদ?

নবাব ঃ আমার কিছু বক্তব্য আছে খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ আমিও কিছু বলতে চাই নবাবজাদা। শুনছি, ইদানীং আপনি নাকি আমার কার্যের সমালোচনা করছেন?

নবাব ঃ আমার দলের স্বার্থে-

ফতে ঃ উফ্ - স্বার্থ-স্বার্থ! শুনুন নবাবজাদা, আমি এসব পছন্দ করি না।

নবাব ঃ খাঁ সাহেব কি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন?

ফতে ঃ না নবাবজাদা। কার ওপর ক্ষুব্ধ হবো? আপনারা যে আমার ভাই- অতি আপনার জন। আমার সততা, সারল্যকে-

দুর্মুখ ঃ নবাবজাদা জনাবকে ভালোভাবেই চেনেন। আমাদের আলমপনা সারল্যে শিশু, মহসীনের ন্যায় দয়ার সাগর-সততায় ইয়ের মতো আর কি।

ফতে ঃ নবাবজাদা- এই মসনদ, এই গুরুভার আমি বইতে পারছি না। আপনাদের বৃহত্তর স্বার্থে এই রাজদণ্ড আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম। সময় আসলে এই মসনদের সব আপনাদের হাতে অর্পণ করে-

দুর্মুখ ঃ জনাব আবার রংমহলায় ফিরে যাবেন।

ফতে ঃ না, আমি মক্কা শরীফে যাবো।

দুর্মুখ ঃ (স্বগত) এই বারেই কানা মরেছে।

নবাব ঃ কিন্তু আমার দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আর ধৈর্য রাখতে পারছে না খাঁ সাহেব।

ফতে ঃ তাঁদের ইচ্ছার ওপর আমার রাজকার্য নির্ভর করে না।

নবাব ঃ যদি তাঁরা বিদ্রোহ করে?

ফতে ঃ তাহলে বাংলার মানুষের মতো তাদের কলিজাগুলো ছিঁড়ে আনা হবে।

দুর্মুখ ঃ (স্বগত) একেই বলে কাকের মাংস কাকেই খায়।

নবাব ঃ জাঁহাপনা, শক্তির আতিশয্যে আপনি ভুল পথে চলছেন।

ফতে ঃ (হেসে) জীবনের পাশাখেলায় আমি কোনদিন হারিনি নবাবনন্দন। পশ্চিম খণ্ডে যদি বিদ্রোহ হয় তাহলে আপনি- না-না- আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা, ভরসা আছে নবাবজাদা। কারণ-

দুর্মুখ ঃ কারণ কাকের বাসাতেই কোকিলের বাচ্চা মানুষ হয়ে কু-কু করে ডাকে।

নবাব ঃ জাঁহাপনা, আমি একা কি করবো? বাংলার মাটিতে আগুনের লেলিহান শিখা, সিন্ধুর আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা, পাঞ্জাবের বাতাসে পুঞ্জীভূত অস্ফুট প্রতিবাদ ধ্বনি- দারুণ অর্থসংকট, ব্যবসা, বাণিজ্য, কল-কারখানা সব বন্ধ। এতগুলো সমস্যা-

ফতে ঃ উঃ সমস্যা- সমস্যা-সমস্যা। এতোগুলো সমস্যা সমাধান আমার এক চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্মুখ ঃ ভাববেন না জনাব। মাথার ওপর আমাদের মামারা আছেন, দুর্যোগে কেটে যাবে। নাকের বদলে নড়ন পাবো- সেই ভালো। নবাবজাদা তো এখন থেকেই "চীন-মার্কিন" ভাই ভাই বলে চেঁচাচ্ছেন।

ফতে ঃ কি লাভ। আমি এতো করে আমার মার্কিন বন্ধুকে দিয়ে পূর্ব বাংলার সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব করলাম, কিন্তু আমাদের শত্রু ভারত-সম্রাজ্ঞী অমনি কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করল।

দুর্মুখ ঃ জনাব, আমি বলি কি, এতোসব ফন্দিফিকির না করে একেবারে চোখ-কান বুঁজে বিসমিল্লাহ বলে ভারতআক্রমণ করে ফেলুন।

নবাব ঃ আমি তোমার সঙ্গে একমত দুর্মুখ খান।

সিপাহ ঃ বন্দেগী জাঁহাপনা। আমিও একমত এদের সঙ্গে।

ফতে ঃ কিন্তু সিপাহসালার কোথায় দাঁড়িয়ে, কিসের ভরসায়, কি নিয়ে যুদ্ধ করবেন? বাংলার জমিন, বাংলার মানুষ ওই হাজার হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের শত্রু। এদিকে কোষাগার শূন্য, চার মাসের যুদ্ধে প্রচুর অস্ত্র, সৈন্য আমরা হারিয়েছি। তাই ভেবে দেখুন, ঘরের শত্রুর পাশে দাঁড়িয়ে, ভুখা শরীরে, খালি হাতে ভারতের ন্যায় শক্তিশালী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বাতুলতা।

দুর্মুখ ঃ যথার্থ বলেছেন জনাব। দীর্ঘ চার মাস ধরে আমাদের বীর সেনানীরা কতকগুলো ডানপিটে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার রাজধানী ঠেকাতে পারছে না। আর-

সিপাহ ঃ তাহলে জাঁহাপনা, আপনি আপাতত ভারতকে একটা কড়া হুমকি দিন। তাতে দুটো সুফল হবে। এক. যদি বিদ্রোহীরা ভবিষ্যতে বাংলার কিছু জমি দখল করে, তাহলে আমরা বিশ্বকে জানাবো ভারত আমাদের ভূখণ্ড জোর করে দখল করেছে। আর দ্বিতীয়তঃ ভারত-সম্রাজ্ঞী নারী। আপনার ন্যায় সিংহপুরুষের হুঙ্কারে অবশ্যই ভীত হবে।

দুর্মুখ ঃ (হেসে) ভারত-সম্রাজ্ঞী জানেন যে, ফাঁকা কলসীর আওয়াজ বেশী।

ফতে ঃ খামোশ বেয়াদপ। ঠিক আছে টিটিয়া খান, আপনার যুক্তি মতোই ভারতকে একটা হুমকি দিন। সেই সঙ্গে এটা নিয়ে দিন, এবারের যুদ্ধে আমরা একা নই। হুঁশিয়ার।

দুর্মুখ ঃ আপনার হুংকারে ভারত-সম্রাজ্ঞী একটু মুচকি হাসবে জনাব। বিশ্ব জানে আপনার ভীমরতি ধরেছে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! সিপাহসালার যুদ্ধের খবর বলুন।

সিপাহ ঃ আমাদের বীর সৈন্যরা বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে জনাবে আলা।

দুর্মুখ ঃ তা-ঠিক। তবে মাঝে মাঝে কমবকত বাঙালী ছেলে-ছোকরারা ঢাকার বুকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, গ্যাসঘাঁটি উড়িয়ে দিচ্ছে। শহর-গ্রামে রেললাইন সেতু, রাস্তাঘাট, সামরিক ছাউনী গুড়ুম-ফটাস হয়ে যাচ্ছে। জনাবের ভুঁড়িয়াল সৈন্যরা, পোষ্যপুত্রেরা মাঝে মাঝে জিব বার করছে। সে এমন কিছুই নয়। সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ফতে ঃ উফ! মাথাটা আবার ঘুরছে।

দুর্মুখ ঃ ঘাবড়াবেন না জাঁহাপনা। আপনার নতুন চালানের সামান্য কিছু সৈনিক বিদ্রোহ করলেও- সব ঠাণ্ডা, সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে জনাব।

ফতে ঃ সত্যই কি সব স্বাভাবিক টিটিয়া খান?

সিপাহ ঃ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন আলমপনা। ব্যবসা-বাণিজ্য চালু করতে পারলেই-

ফতে ঃ কেন? ওদেশের ব্যবসাদাররা দোকান খুলছে না?

দুর্মুখ ঃ সব ভাগল-বা জনাব।

সিপাহ ঃ তবে আমি নয়া এলান জারি করেছি জনাব। এক সপ্তাহের মধ্যে কেউ যদি তার দোকান না খোলে তাহলে সেই দোকানে আমরা নিজেদের লোক বসাবো।

নবাব ঃ নিজেদের লোক মানে?

দুর্মুখ ঃ মানে জনাবের ওইসব জারজ সন্তানদের- মানে আর কি জনাবের খাস তালুকের খাস আদমীদের বসানো হবে।

নবাব ঃ সে কি ভালো হবে টিটিয়া খান সাহেব?

সিপাহ ঃ ভালো-মন্দের বিচার এখন রাখুন। বাঁচার কথা ভাবুন নবাব সাহেব। ওই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা না করা পর্যন্ত-

ফতে ঃ হ্যাঁ, বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করতেই হবে। ভেবেছিলাম বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করলে বিদ্রোহের আগুন নিভে যায়। কিন্তু আগুন আরও জ্বললো। এবাব বাঙ্গালীর দরদী বন্দুকে খতম করতে হবে। জানিয়ে দিন বিশ্ববাসীকে- বঙ্গবন্ধুর বিচার করা হবে। প্রয়োজন হলে তাঁকে ফাঁসির দড়িতে জীবন দিতে হবে।

দুর্মুখ ঃ জনাব, গোস্তাফি মাফ করবেন। বঙ্গবন্ধুকে খতম করলে বীর প্রসবিনী বাংলা বীরশূন্য হবে না। আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধু- প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা এক- একজন সিপাহসালার। কাটা বঙ্গবন্ধুরে খতম করবেন জনাব? একটি মশাল থেকে আর একটি মশাল জ্বলে উঠেছে। হাজারো হাতের উদ্যত শাণিত তরবারী পিণ্ডির মসনদ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। কি দিয়ে তাদের রুদ্ধ করবেন?

ফতে ঃ স্তব্ধ হও- স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। এ কি! দরবার এতো অন্ধকার কেন? কিসের যেন আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। কারা যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। ঐ, ঐ- জনতার স্রোত, গলিত লাভা এদিকে ছুটে আসছে। আগুন, আগুন! বন্ধ করো- সিংহদ্বার বন্ধ করো। আলো, আলো- আরও আরো জ্বেলে দাও। উঃ-

নবাব ঃ জাঁহাপনা মূর্ছা গেছেন। পিণ্ডির মসনদ, তুমিও একদিন মুক্তিকামী জনতার পায়ের তলায় গুঁড়া হয়ে যাবে। মহাকাল, ইতিহাস- শুধু তোমরা সাক্ষী থেকো।

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১

নবাব ঃ পিণ্ডির মসনদ, অপেক্ষা করো- আমি আসছি। তোমার কলঙ্কিত জীবনের হবে অবসান। আমার এতোদিন প্রতীক্ষার সেই শুভদিন সমাগত। অনাগত দিনে তুমি আমাকে পেয়ে প্রাণ পাবে- ধন্য হবে। যে করে যেমনভাবে হোক তোমাকে হোক তোমাকে আমার চাই।

ঈমান ঃ (ইকো) হা-হা-হা- হা-হা-হা-

নবাব ঃ কে? কে?

ঈমান ঃ সিন্ধুর কুলাঙ্গার-পাকজাঁহার বেঈমান লারকানার নবাবজাদা, সিংহাসনের পানে একদৃষ্টে চেয়ে কিসের সুখস্বপ্ন দেখছো?

নবাব ঃ কে! কে তুমি অদৃশ্য পুরুষ?

ঈমান ঃ (ইকো) আমি ঈমান। তুমি আমাকে চেনো না। কারণ বেঈমান, শয়তান তোমার দোস্ত। আমি ন্যায়, আমি সত্য, সুন্দর। আমি নিয়ম- আমি বিবেক- আমি মানবতা! কোনদিন আমাকে চিনবার চেষ্টা করেছো কি?

নবাব ঃ না। ওসব নিয়ে নির্লিপ্ত থাকার সময় আমার নেই। আমি আমার দেশের কথা ছাড়া-

ঈমান ঃ (ইকো) দেশ! হা-হা-হা-! সুন্দর শয়তান, মানুষ তোমাকে কতো রূপেই না দেখলো। দেশ! দেশের জন্য কি করেছো আর করছো তা একবার ভেবে দেখেছো কি! স্বার্থের নামী জুয়াড়ী তুমি। দেশকে জুয়ার বাজিতে এনেছো। দেশের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছো। আসলে তুমি, পাকিস্তান সামরিক জুন্তার এর উগ্রদলের হাতের পুতুল। মিলিটারী ব্যুরোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ভাড়াটে কণ্ঠ তুমি।

নবাব ঃ না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী- আমি গণতন্ত্র চাই।

ঈমান ঃ (ইকো) মিথ্যা কথা। তুমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নও। ওটা তোমার পোশাকী কথা। তুমিই বলেছো, পাকিস্তানের হৃদপিণ্ড হচ্ছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু। মানে পাঞ্জাবের সামরিক গোষ্ঠী। তুমি যদি সত্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে- তাহলে বলতে পাকিস্তানের প্রাণ তার জনগণ। আর সেই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বাস বাংলায়। অতএব বাংলাদেশেই হচ্ছে পাকিস্তানের হৃদপিণ্ড।

নবাব ঃ আমি স্বীকার করি না।

ঈমান ঃ (ইকো) তা জানি। স্বীকার করার সৎসাহস তোমার নেই। কার এক অশুভ লগ্নে, রাজনীতিতে তোমার হাতেখড়ি। আর সে থেকেই তোমার পিপলস পার্টি জন্ম থেকেই সামরিক জুন্তার শক্তিশালী অংশের তাঁবেদার। আর আজ যে পিণ্ডির বাদশার মুখের পানে চেয়ে আছো- সেই বাদশাও সামরিক জুন্তার ভৃত্য মাত্র। আমি জানি, এই সামরিক গোষ্ঠীর অস্ত্র হিসাবে তুমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে ঝড় ডেকে আনলে- বাঙ্গালীর রক্ত নেবার জন্য পিণ্ডির বাদশাকে সহযোগিতা করলে।

নবাব ঃ না-না- এসব মিথ্যা! আমি কারো খেলার পুতুল নই। আমি যা কিছু করছি- আমার দেশের স্বার্থের জন্য। বাংলার মানুষের ঔদ্ধত্য আমি বরদাস্ত করিনি কোনদিন- করবোও না।

ঈমান ঃ (ইকো) ক্ষমতালিপ্সু, অন্ধ তুমি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হল, ক্ষমতার স্বাদ কেমন তা বুঝতে পারলে না। কতো রঙ্গই না দেখাচ্ছো। তুমি কি ভেবেছো, পিণ্ডির এই মসনদ কেল্লা ফতে খান সাগ্রহে তোমার হাতে তুলে দেবেন?

নবাব ঃ শাহানশা ওয়াদা করেছেন।

ঈমান ঃ (ইকো) ওয়াদা। বিশ্বের সেরা নরঘাতী দানবের ওয়াদা! চমৎকার। তাই বুঝি পিণ্ডির বাদশার পেয়াদা হয়ে পিকিং দৌড়েছিলে?

নবাব ঃ অনেকটা তাই। কারণ বিশ্বের কোন বৃহৎশক্তির সমর্থন না পেলে মসনদ বিপদমুক্ত হবে না।

ঈমান ঃ কিন্তু কি পেলে? চীনের নীতির পটপরিবর্তন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছো নিশ্চয়ই? দেখলে তা চীন সরকার শুধুমাত্র তোমাদের দু'চারটি উপদেশ দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তুমি ব্যর্থ হলে। এবার কি পিণ্ডির বাদশা তোমার প্রতি খুশী হয়ে মসনদের ভাগ দেবেন? তুমি ইনাম পাবে না।

নবাব ঃ তোমরা সবাই অনাগত দিনের দিকে চেয়ে থাকো। এই মসনদ আমার হাতে আসবে। আমিই হবো এদেশের ভাবী প্রধান উজির।

ঈমান ঃ অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছো লারকানার নবাবজাদা। সত্যিই তুমি যদি জননায়ক বলে দাবী করো, তাহলে কি ভেবেছো সৈরাচারী সামরিক গোষ্ঠী জননায়ককে পেয়ার করে? অসম্ভব। তুমি কি ভেবেছো, যে কেল্লা ফতে খান সামরিক গোষ্ঠীর প্রতীত সে মুখের কথায় মসনদ ত্যাগ করবে?

নবাব ঃ যদি স্ব-ইচ্ছায় ওয়াদামতো কেল্লা ফতে খান মসনদ ত্যাগ না করে তাহলে আমি প্রতিহিংসার আগুনে গোটা পাক জাহান পুড়িয়ে দেবো।

ঈমান ঃ জ্বালাময়ী ভাষা প্রয়োগ করতে ওস্তাদ লোক তুমি। কিছুদিন আগেই তো বাদশার সঙ্গে তোমার তীব্র মতপার্থক্য শুরু হল। তুমি প্রকাশ্যে অভিযোগ করলে- 'জনগণের পরিষদ' আহ্বান করবে বলে বাদশাকে হুঁশিয়ার করে দিলে- আবার সেই তুমি পোষা কুত্তার মতো পিকিং দৌড়ালে।

নবাব ঃ এর পশ্চাতে রহস্য আছে। বিচিত্র- বিশ্বের বিস্ময়। তোমাদের ২৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠগুলি রক্তে ভেজা। বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভরপুর তোমাদের অন্তর। তাই পাকিস্তানের রাজনীতির মঞ্চে তোমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশের রাজনীতি চরম সঙ্কটের সম্মুখীন- এদেশের রাজনীতি পথভ্রষ্ট। তাই কোন বাদশা, কোন প্রজা তোমাকে সহ্য করতে পারে না। তুমি যেন ধূমকেতু। তুমি এক অশুভ ব্যক্তি।

নবাব ঃ খামোশ! আমাকে তোমরা সবাই মিলে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে চাইছো। কিন্তু না- পারবে না। আমার এতোদিনের আশা-পরিকল্পনাকে তোমরা ভেঙ্গে দিতে পারবে না।'

ঈমান ঃ (ইকো) পঙ্গু-পরাজিত নায়ক, তুমি এখন মাঝ-দরিয়ার পাঁকে পড়েছো। তুমি তলিয়ে যাবে। যদি বাঁচতে চাও- তাহলে সাচ্চাইয়ের হাত ধরো।

নবাব ঃ আমাকে প্রলোভন দেখিও না।

ঈমান ঃ (ইকো) বেয়কুব, প্রলোভনের জন্যেই তো বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধিকার, গণতন্ত্রকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছো- বাংলার রক্তগঙ্গা বইয়েছো- তোমার দেশের মানুষের জীবনকে নিয়ে স্বার্থের জুয়াখেলা শুরু করেছো। গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার, ধোঁকাবাজি তোমার দেশের জনগণও আর সহ্য করবে না। সেখানেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। সব স্বার্থ ভস্মীভূত হবে।

নবাব ঃ আমাকে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান তুমি দিতে পারো?

ঈমান ঃ (ইকো) একটিই পথ। সেটা হচ্ছে সত্য-সুন্দরের পথ। শান্তি-সংহতি-সৌভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রসর হয়ে মানুষের অন্তরের গভীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। গোটা বিশ্বের মানবকল্যাণে নিজেকে-

উৎসর্গ করো। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো। তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করো। তবেই তো মানব ইতিহাসের সাচ্চা দেশপ্রেমিক বলে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবে। গন্ডিমুক্ত হও- একলা চলো।

নবাব ঃ কিন্তু কি করে সর্ব বাঁধনমুক্ত হবো আমি! আমি যে আমার গোটা সত্তাটাকে বন্ধক দিয়েছি! আমি মুক্ত হতে চাইলেও- সামরিক জুন্তা আমাকে মুক্তি দেবে না।

দুর্মুখ ঃ আরে নবাবজাদা, মসনদের সামনে বসে কি ভাবছেন? ও- নবাবজাদা-

নবাব ঃ কে! ও! দুর্মুখ খান!

দুর্মুখ ঃ হা- খোদা! আজকাল থেকে থেকে অন্য জগতে চলে যাচ্ছেন নাকি!

নবাব ঃ আচ্ছা দুর্মুখ খান, তুমি তো বিচক্ষণ ব্যক্তি। আচ্ছা বল তো দুর্মুখ খান, আমি যা কিছু করেছি ও করছি সবই কি স্বীয় স্বার্থের জন্যে?

দুর্মুখ ঃ দুষ্ট লোকে অবশ্য তাই বলে। ওরা বলে আপনিই নাকি স্বচ্ছ পানি ঘোলা করেছেন। আবার অনেকে বলে- আপনি নাকি মুশকিল আসান। ভেবে দেখুন, ভেঙ্গে-পড়া গদীহারা পিণ্ডির বাদশা বেকুব খান আপনাকে মুশকিল আসান হিসেবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। পিকিং-এর সঙ্গে পাকিস্তানের দোস্তীয় বন্ধনে আপনি বেঁধে দিয়েছেন। আবার বাংলাকে কোতল করবার পরামর্শ দিয়ে মিলিটারী জুন্তার মুশকিল পথ বাতলে দিলেন। কিন্তু আমি ভাবছি নবাবজাদা, আপনি তো সকলের মুশকিল আসান- কিন্তু আপনার মুশকিল আসান কে করবে?

নবাব ঃ তুমিও কি আমাকে বিদ্রুপ করছো দুর্মুখ খান?

দুর্মুখ ঃ তোবা-তোবা! আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ-এও কি সম্ভব!

নবাব ঃ ধিক্কার-বিদ্রূপ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যে পথটিকেও বেছে নিচ্ছি সে পথই আমাকে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে। জানি না, অনাগত দিন আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, না আমাকে-

দুর্মুখ ঃ ইতিহাসের আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করবে। গোস্তাফি মাপ করবেন, শেষের টুকু আমিই বলে দিলাম। এ কি, কোথায় চললেন নবাবজাদা?

নবাব ঃ এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাইরে থেকে আসি।

(Change over-Music)

।।দরবার।।

ফতে ঃ একে একে সবাই আমাকে পরিত্যাগ করছে। সবাই আমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। সর্বশক্তিমান যে আগুন আমি জ্বেলেছি মাশরেকী বাঙ্গালে, সেই আগুনের তাপ যেন পিণ্ডির দরবারে বসে পাচ্ছি। কিন্তু কি করবো আমি? অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে আমাকে পৃথিবীর মানচিত্রের এক অংশে সুপরিকল্পিত উপায়ে আগুন জ্বালাতে হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি। উঃ ভাবতে পারছি না আর। এই-কোই হ্যায়?

দুর্মুখ ঃ বান্দা হাজির জনাবে আলা। ফরমাইয়ে-

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! তুমি!

দুর্মুখ ঃ আমিই হাজির হলাম জনাব। আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে কাউকে দেখলাম না।

ফতে ঃ কমবকতদের আমি বিতাড়িত করবো।

দুর্মুখ ঃ এখন কে কার হুকুম তামিল করে জনাব। দরবার, হারেমের সকলের চোখেমুখে কেমন যেন হতাশা-কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক-

ফতে ঃ আতঙ্ক! হতাশা! এই সব আতঙ্ক-হতাশাকে আমি গলা টিপে হত্যা করবো। যার কণ্ঠে শুনবো আমি হতাশার বাণী, তার জিবটা আমি ছিঁড়ে নেবো।

দুর্মুখ ঃ আপনার অন্তরের গোপনেও কি হতাশা নেই জনাব?

ফতে ঃ না নেই। আমি পাঠান কা বাচ্চা।

দুর্মুখ ঃ এই হুঙ্কার আপনার মুখের-মনের নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সমর্থন হারানোর জ্বালা আপনার হৃদয়কে দগ্ধ করছে। আমেরিকা কর্তৃক অস্ত্র সাহায্য বন্ধ, চীনের পাল্টা সুর, মশরেকী বাঙ্গালের সেনাবাহিনীর হত মনোবল, মুক্তিবাহিনীর বিক্রম আপনাকে, ধীরে ধীরে হতাশা-নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে।

ফতে ঃ বন্ধুহীনতায় আমি কিছুটা দুর্বল হয়েছি সত্যি-নানারকম চাপ, হুমকির সম্মুখীন হয়ে আমি বিচলিত হয়েছি সত্য- আমার অগণিত সৈন্যদের মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করেছে সত্য-কিন্তু তাই বলে মাথা নীচু করে বিশ্বের দরবারে বিচারাধীন হতে আমি রাজী নই। এ পরাজয় আমার আত্মহত্যার শামিল।

দুর্মুখ ঃ কিন্তু জনাব, এখনও কি ভেবেছেন বাংলা মুলুকে আপনার রাজ কায়েম রাখতে পারবেন?

ফতে ঃ হ্যাঁ পারবো। প্রয়োজন হলে বাংলার প্রতিটি ঘরকে আমি ভস্মস্তূপে পরিণত করবো- বাংলার মানুষের লাশে ওদের নদীর বুক ভরে যাবে। তবু -তবু বাংলার জমিন আমি ছাড়বো না।

দুর্মুখ ঃ হাসালেন-নিতান্তই হাসালেন। আপনি কি আর ছাড়বেন- ওরা ছাড়িয়ে নেবে।

ফতে ঃ দুর্মুখ খান।

দুর্মুখ ঃ হ্যাঁ জনাব। পিণ্ডিতে বসে বাংলার খবর কতোটুকু একবার যান না বাংলায়! আপনার সৈন্যদের মাঝে গিয়ে একবার দাঁড়ান। তাদের আশা দিন, ভরসা দিন।

ফতে ঃ বাংলায় যাবার আমি প্রয়োজন মনে করি না।

দুর্মুখ ঃ বলুন বাংলায় যাবার সৌভাগ্য আর হবে না। ২৫শে মার্চে নিশ্চয় 'হে বাংলা বিদায়-চিরবিদায়' বলে সেলাম জানিয়ে চলে এসেছেন?

ফতে ঃ দুর্মুখ খান! তমিজ-সে বাত করো। বাংলায় যাবার সময় হলেই যাবো।

দুর্মুখ ঃ সেই ভালো। কারণ খতরনাক স্থানে বুঝে-সুঝে সাবধানে যাওয়াই মঙ্গল। কোথায় মাইন পাতা আছে, ঘুপ-ঘাপ কোথায় বোমা পড়ছে বলা যায় না। এই দেখুন- খবরে প্রকাশ, আপনার ভাবী পুতুল সরকারের একটা পুতুলকে মুক্তিবাহিনী বোমের ঘায়ে খতম করেছে। অশান্তি কমিটির

কয়েকজন চামুণ্ডাও আচমকা মারে পটল তুলেছে। ত্রিপুরা- নোয়াখালীতে আপনার জেট বিমান দিয়েও বিদ্রোহীদের কাত করা যাচ্ছে না।

ফতে ঃ মরুক-মরতে দাও ওদের। ওদের স্থানে আর একটি পুতুল খরিদ করতে আমার বেশী কষ্ট হবে না।

দুর্মুখ ঃ আরও খবর আছে। চাঁদপুরে অস্ত্র বোঝাই একটা মার্কিন জাহাজ বাংলার নৌ-কমাণ্ডোরা ডুবিয়ে দিয়েছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া।

ফতে ঃ তোমার এই কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে আমার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিচ্ছে। কতোগুলো অপদার্থের ওপর বাঙ্গাল মুলুকের দায়িত্ব দিয়েছি।

দুর্মুখ ঃ সৈন্যদের আর অপরাধ কি? তারা লড়ছে-মরছে। আর আহত সৈনিকরা চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিচ্ছে। এই ধরুন না, মেহেরপুরে আমাদের সৈন্যদের উপর বিদ্রোহীরা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা কোনদিক সামলাবে? তাই যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। আরও চমকপ্রদ খবর আছে জনাব। আপনার পোষ্যপুত্র নবাবজাদা একটুর জন্যে রক্ষা পেয়েছেন।

নবাব ঃ বন্দেগী খাঁ সাহেব।

দুর্মুখ ঃ আসুন নবাবজাদা, জাঁহাপনাকে একটু সান্ত্বনা দিন।

নবাব ঃ আমি আর কি সান্ত্বনা দেবো- কি ভরসা দেবো দুর্মুখ? একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে আমরা নিমজ্জিত। মার্কিনীরা অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করল। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, কানাডা সকলেই বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দাবী করছে।

ফতে ঃ দাবী! কিসের দাবী! কারও কোন দাবী-কোন আব্দার আমি বরদাস্ত করবো না। আমি জানি আমি বন্ধুহীন-আমি নিঃসঙ্গ। কিন্তু এর শেষ আমি দেখতে চাই।

নবাব ঃ তবে খাঁ সাহেব, আমাদের চীনা বন্ধুরা-

ফতে ঃ থামুন থামুন। চীনা বন্ধু! কি আশ্বাস নিয়ে এলেন আপনি চীনা দোস্তদের কাছ থেকে? নৈরাজ্য- কিছু উপদেশ আর কিছু সান্ত্বনা ছাড়া চীনা দোস্তরা কি দিয়েছে আপনাকে?

দুর্মুখ ঃ চীন বলেছে বাংলাদেশের সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করে নিতে। আরে বাবা, নবাবজাদা কতো কাঠখড়ি, পুড়িয়ে, পাক-জাঁহার ভাবী পেরধান মন্ত্রী হবার আশ্বাস নিয়ে চীনে গেলেন অস্ত্র আর মদত আনতে। চীনা সাহেবদের হৃদয়ে কি নবাবজাদার জন্য এতটুকু করুণা-

নবাব ঃ স্তব্ধ হও দুর্মুখ খান। খাঁ-সাহেব, চীন যে এভাবে আমাদের নিরাশ করবে তা ভাবতে পারিনি।

দুর্মুখ ঃ কপালে যখন আগুন লাগে-তখন তুষের আগুনের মতোই জ্বলতে থাকে।

ফতে ঃ হ্যাঁ ঠিকই বলেছো দুর্মুখ খান! অথচ ক্ষমতা নেবার জন্য সকলের লোলুপ জিহ্বা মসনদটাকে গ্রাস করার জন্য ব্যস্ত।

নবাব ঃ আপনার এই উক্তি কার প্রতি খাঁ-সাহেব?

ফতে ঃ আপনাদের প্রতি নবাবজাদা। মসনদের ভাগ নেবার জন্য একদিকে শক্তিশালী সামরিক জুন্তা, অন্যদিকে আপনি, আপনি, নুরুল আমিন, দৌলতানা, কায়ুম প্রভৃতি।

নবাব ঃ চীন সফরের পূর্বে আপনি আমার নিকট কি ওয়াদা করেছেন আশা করি ভুলে যান নি।

ফতে ঃ না-না-ভুলে যাইনি-যাবো না। আমি বিদায় নেবার পূর্বে মসনদটাকে টুকরো করে আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে যাবো। আমি ষোল আনা বুঝে দিয়ে যাবো।

দুর্মুখ ঃ কবে সেই দুর্দিন আসবে জনাব?

ফতে ঃ জানি না। বুঝলেন নবাবজাদা, বড় আশা করেছিলাম আপনাদের নিয়ে-তাই আজ আমার এই পরিণতি। বড় আশা করেছিলাম টিটিয়া, পিয়াজী, দান্দাল গভর্নরকে নিয়ে-বড় আশা করেছিলাম আমাদের দুর্দিনে একমাত্র দোস্ত চীন অন্তত নিঃসন্দেহে আমাদের সক্রিয় সমর্থন জানাবে। ব্যর্থ-আপনি ব্যর্থ নবাবজাদা!

নবাব ঃ এখন থেকে আমাদের অন্য কারও ওপর ভরসা না করা বাঞ্ছনীয়!

ফতে ঃ চীনের প্রতি আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলেই আমি বড়মুখ করে বলেছিলাম-

দুর্মুখ ঃ সে মুখ এভাবে ভোঁতা হবে তা কি জানতেন? চীনে নবাবজাদার প্রতি চীনা ছাত্রদের বিক্ষোভ রীতিমত অপমানকর। যে দেশে বিক্ষোভ, প্রদর্শনী, মিছিলের জন্য সরকারী অনুমতি লাগে, সে দেশে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সরকারের সমর্থন ও অনুমতিতেই হয়েছে।

ফতে ঃ চীনও শেষে কি দোস্তের প্রতি অবিচার করবে?

নবাব ঃ খাঁ সাহেব, এখন থেকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে সংযত উক্তি করাই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখবেন আমরা ধীরে ধীরে বন্ধুহীন হয়ে পড়ছি-নিন্দিত হচ্ছি।

ফতে ঃ তবু আমি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চাই। বন্ধুহীন, অসহায়, রিক্ত আমি। তবু আমি মরণ-ছোবল দেবো। এ ছাড়া কোন উপায়, কোন পথ নেই নবাবজাদা। চরম অবস্থার সম্মুখীন আমি।

দুর্মুখ ঃ সামনে অন্ধকার-পেছনে অতল গহবর। ইতিহাস তুমি লিখে যাও-মহাকাল তুমি দেখে যাও-বন্য পশু কিভাবে মরণ গহ্বরে তলিয়ে যায়। বিশ্ববাসী তোমরা প্রত্যক্ষ করো, কেমনভাবে সত্যের অগ্নিতে মিথ্যার মৃত্যু ঘটে।

।।জয় বাংলা

(রচনাঃ কল্যাণ মিত্র। অংশগ্রহণেঃ রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ (মিতা), নাজমুল হুদা মিঠু, প্রসেনজিং বোস, অমিতাভ বোস, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহলানবীশ, করুণা রায় প্রমুখ।)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৭। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত জীবন্তিকা অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	......১৯৭১

মিরজাফরের রোজনামচা

১ নভেম্বর, ১৯৭১

ভাগ্নেঃ (ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে) মামা- মামাগো-

মামা ঃ কেরে ? কে?

ভাগ্নেঃ দরজা খোল মামা শীগগীর। আমি তোমার ভাগ্নে হাঁদু।

মামা ঃ চিৎকার করিসনে- আসছি দাঁড়া। (দরজা খোলার শব্দ)

ভাগ্নেঃ মামা মামাগো- (ক্রন্দন)

মামা ঃ ওকি কাদছিস কেন? এই মলো, বলি কাঁদছিস কেন গবেট?

ভাগ্নেঃ মামাগো চোখের সামনে খুন করল।

মামা ঃ খুন! মিলিটারী কাকে মারল?

ভাগ্নেঃ না।

মামা ঃ তবে মুক্তিবাহিনী কি রাজাকারকে মারলো?

ভাগ্নেঃ বলছি না।

মামা ঃ (রেগে) তবে কি তোর সাতগুষ্ঠির পিণ্ডি চটকালো?

ভাগ্নেঃ না।

মামা ঃ তবে কে কাকে খুন করল?

ভাগ্নেঃ একজন বাঙালী রাজাকার আর একজন খান রাজাকারকে আমার চোখের সামনে ধরাম করে গুলি করে পেড়ে ফেলে দিল।

মামা ঃ এই হতভাগা, শীগগীর আমার টেবিল থেকে মিরজাফরের রোজনামচাটা আর পেনটা নিয়ে আয়।

ভাগ্নেঃ এই নাও।

মামা ঃ এবার বল।

ভাগ্নেঃ আমি ওই মোড়ের ওপর দোকানে বসে চা খাচ্ছি। আমার পাশের টেবিলে একজন বাঙালী আর একজন খান রাজাকারের মধ্যে বেশ গরম কথাবার্তা চলছিল।

মামা ঃ কি কথাবার্তা হচ্ছিল তোর কানে গিয়েছে!

ভাগ্নে ঃ যাবে না মানে? থিয়েটারের অভিনেতাদের যেমন কান প্রমটের দিকে থাকে, এদিকে অভিনয়ও করে যায়,- আমিও তেমনি চা খেতে খেতে ওদের দিকে কান খাড়া করে রেখেছিলাম।

মামা ঃ ওরে বাবা হাঁদু, তোকে কতদিন বলেছি বাপ-ইনট্রোডাকশন বাদ দিয়ে কথা বলবি। ইয়াহিয়া খানের মতো যতো আজেবাজে কথার ঝুড়ি উপুড় করে দেবে। আসলে কি ঘটল তাই বল?

ভাগ্নে ঃ তারপর? মুখ ছেড়ে হাতাহাতি। খানটা বাঙালীকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। তারপর বাঙালীটা মুখের রক্ত মুছে নিজের রাইফেলটা হাতে নিয়েই খানের বুকে গুরুম করে গুলি চালালো। খান রাজাকার আল্লা বলে বুক ধরে পড়ে গেল- । তারপর-

মামা ঃ তারপর খান পটল তুললো এইতো? একটা আপদ গেছে।

ভাগ্নে ঃ কিন্তু মামা, যদি গুলিটা আমার বুকে লাগতো?

মামা ঃ লাগেনি তো-তবে আর ভয় কি? এরকম ঘটনা তো রাজাকারদের মধ্যে আকছার ঘটছে। লুটের মাল নিয়ে খুনাখুনি, বন্দী রমণী নিয়ে রক্তারক্তি। ইয়াহিয়ার এ এক জ্বালা। ওদিকে দলে-দলে কাতারে-কাতারে বহু বাঙালী রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পা চেপে ধরে আত্মসমর্পণ করছে। রাজাকাররা নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক গোপন খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্নে ঃ তাই নাকি মামা?

মামা ঃ দুনিয়ার কোন খবরই রাখিসনে? শুধু মামার ভাত রেধেঁই মলি?

ভাগ্নে ঃ তোমার মতো ঘোড়েল সাংবাদিক যার মামা তার চিন্তা কি? আচ্ছা মামা তুমি এসব সংবাদ সংগ্রহ করে সরবরাহ কর কোথায়?

মামা ঃ কোথায় এ্যাঁ? হা-হা-হা- শোন, গোপনে এইসব সংবাদ সরবরাহ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, বেতার আর প্রচার দপ্তরের কাছে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দেই। বাংলার মুক্ত অঞ্চল থেকে এসব খবর প্রচার করা হয় বিশ্বে।

ভাগ্নে ঃ এ্যাঁ, বলো কি মামা।

মামা ঃ গোপন কথা ফাঁস করে ভুল করলাম নাতো?

ভাগ্নে ঃ জান যাবে- তবু কথা বেরুবে না। -হ্যাঁ।

মামা ঃ সাবাস ভাগ্নে।

ভাগ্নে ঃ তাহলে বাংলাদেশ সরকার সব দপ্তরই একরকম খুলে ফেলেছেন।

মামা ঃ আছিস কোথায় রে বেটা হাঁদু। বাংলাদেশ সরকার এমন কি কাস্টম ডিপার্টমেন্টও খুলে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। বাংলাদেশ কাস্টমকে সকলে নিয়মমতো শুল্ক দিচ্ছে।

ভাগ্নে ঃ এসব কথা শুনলে, সত্যি বলছি মামা বুকটা খুশীতে ডগোমগো করে। আচ্ছা মামা শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার নাকি বিমান আর নৌবহর গড়েছেন?

মামা ঃ গড়েছেন মানে? এইতো সেদিন বাংলাদেশ নৌবাহিনী চাটগাঁর কাছে পাক-সৈন্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। একটা পাকিস্তানী জাহাজ 'নাসিম' আর একটা গ্রীসের। নাম 'এলভোস'।

ভাগ্নে ঃ আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে মামা।

মামা ঃ এই খেয়েছে।

ভাগ্নে ঃ আচ্ছা মামা শুনলাম, ইয়াহিয়া মামু নাকি ভারত আক্রমণ করার জন্যে লুঙ্গি ঝেড়ে ভাল করে গিঁট মেরে মালকোচা দিয়ে ভারতের সঙ্গে লড়বার জন্যে "ইয়া আলী বলে ডন বৈঠক মারছে আর বুক চাপড়াচ্ছে?

মামা ঃ হ্যাঁ। শেষে লুঙ্গি হারিয়ে ল্যাঙ্গট পরে "মাইয়ারে মাইয়া" বলে পিঠে হাত দিয়ে ব্যাক গিয়ারে দৌড়ুতে হবে। বুঝলি হাঁদু, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। গুণ্ডাধিপতি ইয়াহিয়ার পাখনা গজিয়েছে।

ভাগ্নে ঃ হা-হা-হা-যথার্থ বলেছো মামা। আচ্ছা লড়াই করে কি জিততে পারবে ইয়াহিয়া মামা?

মামা ঃ অসম্ভব। ইয়াহিয়া এখন "কলকে ছোট-তামুক বড়" পান করছেন।

ভাগ্নে ঃ সে আবার কি?

মামা ঃ বুঝলিনে? মানে গেঁজা। গুলগাপ্পি মেরে হামবড়াই ভাব দেখাচ্ছে। ওর ছয় জেনারেল দিনরাত পাম্প দিচ্ছে ইয়াহিয়াকে। কারণ বাংলাদেশ আজ বাস্তব-জ্বলন্ত সত্য। বাংলাদেশে খান দস্যুসেনারা বাঙালীদের হাতে প্যাদানী খেয়ে মরছে-হাড়গোড় ভেঙ্গে বদন বিগড়ে পড়ে আছে।

ভাগ্নে ঃ ইয়াহিয়া মামুজান জানে বাংলাদেশ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

মামা ঃ শুধু কি তাই, খান সাহেবের ট্যাঁক শূন্য। ব্যবসা. বাণিজ্য, আমদানী, রপ্তানী নেই। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো একে একে মৌলভী সাহেবের পেছন থেকে কেটে পড়ছে। কেউ আর খান সাহেবকে টাকা, অস্ত্র দিয়ে চোট খেতে রাজী নয়।

ভাগ্নে ঃ তাছাড়া তো বাংলাদেশে জাহাজ, রেল, সেতু পোঁ-পোঁ করে চোকের নিমিষে উড়ে যাচ্ছে। পাট লোপাট হয়ে যাচ্ছে। চা বাগানগুলো-

মামা ঃ চা রপ্তানী করা ছেড়ে এখন আমদানী করতে হচ্ছে। ইয়াহিয়াকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বোমাবাজ ট্যাঁটোন খান, বাংলার মামদো ভূত মামুদ আলী, বোতল ট্রেড মার্কা ভুট্টো, কুপুত্তর মালকে বেটা, গুণ্ডা নিয়াজী, টেকো নুরুল চাচা কতো কেমেকারী-কতো কসরৎই না করলেন। কিন্তু কোন ফয়দা হ'ল?

ভাগ্নে ঃ মোটেই না। বরঞ্চ আরও পানি ঘোলা হ'ল।

মামা ঃ তাই ইয়াহিয়া এখন বাঁচার জন্যে শেষ চেষ্টা করছে। ইয়াহিয়া দেখছে, আমি যদি যাই তাহলে ভোগ করার জন্যে আমিও কাউকে রেখে যাবো না। মরি যদি সবাইকে নিয়েই মরবো। তাইতো ভাগ্যের জুয়াখেলা শুরু করেছেন। তাইতো বাঁচেগা ইয়া মরেগা বলে ভারত আক্রমণ করতে চাইছে।

ভাগ্নে ঃ আচ্ছা মামা, ইয়াহিয়া ভারত আক্রমণ করে কিভাবে বাঁচবার পথ পাবে?

মামা ঃ এই পরিষ্কার ব্যাপারটা বুঝতে পারলিনি হাঁদু। ইয়াহিয়া এখন ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচাতে চায়। ইয়াহিয়া বেটা ভাবছে ভারতের সঙ্গে চুলকিয়ে ঘা করে যুদ্ধ বাধাতে পারলেই, রাষ্ট্রসজ্ঘ সাদা পতাকা বাঁধা বাঁশ কাঁধে করে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলবে- "থাম বাপ-সকল মারামারি করিসনে।" তারপর সিজ ফায়ার। রাষ্ট্রসজ্ঘের তখন পাক-ভারত মীমাংসার জন্যে মাথা ব্যথা শুরু হবে। আর মুখ্য বাংলাদেশ সমস্যা তখন ধামাচাপা পড়বে। ব্যাস-খেল খতম!

ভাগ্নে ঃ ইরি বাপ্! খানের মাথায় এতো বুদ্ধি!

মামা ঃ শয়তানি বুদ্ধিতে খান সাহেবরা চিরদিনই ওস্তাদ ব্যক্তি। কিন্তু এসব বুদ্ধি লাসটিং করে না বেশীদিন।

ভাগ্নে ঃ হা-হা-হা- মামা একেবারে রসে টুইটুম্বুর। বাংলার মানুষ আজ খান সেনার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু মামা ঠিক আছে।

মামা ঃ ঠিক থাকবো না কেন রে ছোঁড়া? আমিও বিয়ে করিনি-তুইও বিয়ে করলিনে? আমাদের কিসের চিন্তা? প্রয়োজনে অস্ত্র ধরবো। দেশের জন্য যদি মরি তাহলে জানবি-আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষের পুণ্যের ফল।

(কল্যাণ মিত্র রচিত)

এ সত্য রুধিবে কে?

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

(একটি ঝোপের আড়ালে গভীর আঁধারে নারায়ণ পজিশন নিয়ে বসে আছে। দূরে মর্টার ও মেশিনগানের ক্রমাগত শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু কাছে সামান্য একটি শব্দ হোল-সঙ্গে সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ করে উঠলো)

নারায়ণ ঃ হল্ট। হু কামস দেয়ার?

মাইকেল ঃ ফ্রেণ্ড।

নারায়ণ ঃ পাস্ ওয়ার্ড!

মাইকেল ঃ বুলেট পিলেট মর্টার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ ঃ ও. কে.

মাইকেল ঃ তারপর এদিককার খবর কি নারায়ণ?

নারায়ণ ঃ খুব চলছে অর্থাৎ খুব চালাচ্ছে। জানোই তো, খান-সেনারা এখন হাওয়ায় গুলি ছোড়ে, আমরা ছুড়ি হয়তো একটা, আর ওরা ছুড়বে এক ধামা।

মাইকেলঃ উদ্দেশ্য?

নারায়ণ ঃ উদ্দেশ্য অতি, পরিষ্কার, যেন আমরা আর কাছেই না যাই। তা না হলে কখনো শুনেছ কোন সেনাবাহিনী হাঁটু কাঁপায় আর এলোপাতাড়ি আকাশের দিকে গুলি ছোঁড়ে?

মাইকেলঃ না, তবে অপূর্ব চীজ এই খান বাবাজীদের কল্যাণে তাও এ জীবনে দেখে যেতে হোল। যাক সে কথা, শ্রীমতী বড়ুয়া কি ফিরেছে?

নারায়ণ ঃ কে, শান্তি? না এখনও তো ফিরলো না। কথা ছিল ডক্টর সিদ্ধার্থ বড়ুয়ার কাছ থেকে কিছু ঔষধ নিয়ে সবুজ গ্রামে গিয়ে রহমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সেখান থেকে তো দুজনেরই ফেরার কথা। এদিকে তো রীতিমতো সুবিধে একেবারে তৈরী হয়েই আছে, খালি একবার ঘোড়া টানার অপেক্ষা।

মাইকেলঃ এতো ব্যস্ত হয়ো না। রহমান ভাই এখনই এসে পড়বেন। আসলে কি একটা জরুরী ব্যাপারেই নাকি তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণ ঃ আমিও তাই শুনেছি। আমার মনে হয় চরম আঘাত হানার সময়-হল্ট, হু কাম্স দেয়ার?

রহমান ও শান্তিঃ ফ্রেণ্ড।

নারায়ণ ঃ পাস্ ওয়ার্ড।

রহমান ও শান্তি ঃ বুলেট পিলেট মটার, পিলেট পিলেট মর্টার।

নারায়ণ ঃ ও. কে.

মাইকেলঃ কে, রহমান ভাই? তোমার দেরী দেখে আমরা ব্যস্ত হচ্ছিলাম। নাও চলো, যা দেখে এসেছি তাতে এখনই হানাদারদের আঘাত হানতে হবে। গোটা পঁচিশেক যা ফট ফট করছে তা একবারেই সাবার হয়ে যাবে।

রহমান ঃ না মাইকেল, এখন আর পঁচিশ-পঞ্চাশের ব্যাপার নয়, এখন হাজারের ব্যাপার শুরু হয়েছে।

নারায়ণ ঃ অর্থাৎ?

রহমান ঃ অর্থাৎ চরম মুহূর্ত এসে গেছে।

মাইকেলঃ হ্যাঁ, চরম মুহূর্ত। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কাজ আমরা শেষ করে এনেছি। এবারে শুত্রুর ওপর হানবো আমরা চরম আঘাত। (নেপথ্যে ক্ষীণ ক্রমাগত গুলির শব্দঃ সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে মুজিবের কণ্ঠস্বরঃ প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে..... ইত্যাদি)

নারায়ণ ও মাইকেলঃ চালাও কিস্তি ডাঙ্গা দিয়ে! এই তো চাই।

রহমান ঃ হ্যাঁ এবার কিস্তি ডাঙ্গা দিয়েই চলবে। এবার মানুষের শত্রু, সভ্যতার শত্রুজানবে কটা ধানে কটা চাল। এবার তারা জানবে অন্যায়ের দ্বারা, অত্যাচারের দ্বারা ন্যায়কে, সত্যকে, মানবতাকে হত্যা করা যায় না। শান্তি!

শান্তি ঃ রহমান ভাই।

রহমান ঃ তোমার ওপরে যে আদেশ এসেছে তা বুঝতে পেরেছ?

শান্তি ঃ হ্যাঁ, রহমান ভাই।

রহমান ঃ তুমি প্রস্তুত?

শান্তি ঃ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহমান ভাই...হল্ট ও কামস দেয়ার?

জনৈক ঃ (কাঁপা গলায়) ফ্রেণ্ড।

শান্তি ঃ পাস্ ওয়ার্ড।

জনৈক ঃ পিলেট বুলেট মর্টার, বুলেট বুলেট মর্ডার। (সঙ্গে সঙ্গে শান্তির হাতের স্টেনগান গর্জে ওঠে, একটি আর্ত চিৎকার। সবাই ছুটে এগিয়ে যায়।)

মাইকেল ঃ কে লোকটি রহমান ভাই?

রহমান ঃ রাজাকার দেখছি। পকেটে পাওয়া কাগজই তার সাক্ষী। গোয়েন্দাবাজি করতে এসেছিল।

শান্তি ঃ আহা, বেচারা গতকালকার পাসওয়ার্ড সম্বল করে এসেছিল দালালী করতে, ও হয়তো জানতো না সত্যের প্রহরীরা সদা জাগ্রত।

রহমান ঃ তোমায় ধন্যবাদ শান্তি, তুমি সময়মতো ধরে ফেলেছিলে। যাক্ যা বলছিলাম। চরম মুহূর্ত এসে গেছে। এতদিন আমরা কেবল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছি। সারা বাংলাদেশের রাস্তাঘাট অকেজো করে দিয়েছি, ব্রিজ উড়িয়েছি, রেললাইন ধ্বংস করেছি। এবং সুযোগ পেলেই শত্রুকে আঘাত করেছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখিয়ে দেওয়া যে খালি হাতে শুরু করলেও আমরা তাদের কাপুরুষোচিত অতর্কিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হবার পদার্থ নই, আমরা এক মরে বহু হই। আমরা শত্রুর সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছি, সে ইচ্ছা করলেই সামনে-পিছনে-ডাইনে-বাঁয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারবে না। সর্বত্র আমাদের ঘাঁটি, সবখানে আমাদের দুর্গ। হানাদাররা এখন যশোরে, রংপুরে, সিলেটে, কুমিল্লায়, ঢাকায়, চট্টগ্রামে আলাদা হয়ে আছে, বন্দী হয়ে আছে। কথায় কথায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের আর যেতে হবে না; একখানে দাঁড়িয়েই তাদের দেখে যেতে হবে সত্য কিভাবে অসত্যের ওপর জয়লাভ করে।

নারায়ণ ঃ তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কি?

রহমান ঃ এখানেই বসে থাকা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মুক্তিবাহিনী এখান দিয়েই যাবে, এগিয়ে যাবে সামনে। সবুজ গ্রাম, অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে এখান থেকেই সরাসরি মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে। এইবার আমরা চারদিক থেকে হানাদারদের আক্রমণ করবো। আমরা দেখিয়ে দেবো বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।

নারায়ণ ঃ রহমান ভাই, আজ আমার বারবার মনে পড়ছে ঢাকার সেই ভয়াবহ পঁচিশে মার্চ, সেই হাহাকার, সেই আর্তনাদ। আমি এখনও যেন শুনতে পাই খান-সেনাদের বুলেটে ঢলে পড়া আমার মায়ের সেই শেষ আদেশঃ খোকা তুই প্রতিশোধ নিবি, প্রতিশোধ নিবি তোর মায়ের, তোর দেশের।

(নেপথ্যে ঢাকার হাহাকার, মায়ের আর্তনাদ ও শেষ আদেশ দূর থেকে ভেসে আসবে)

মাইকেলঃ আমিও ভুলিনি নারায়ণদা আমার বোনের হাহাকার। আমি এখনও শুনতে পাই আমার বোন মেরীর- তার বান্ধবী রাবেয়া, মরিয়ম, লক্ষ্মীর চীৎকার। তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার বার বলেছেঃ প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই। আমরা মরে যাচ্ছি-তোমরা বেঁচে থাকবে, প্রতিশোধ নেবে। প্রতিশোধ। (নেপথ্যে মহিলাদের চীৎকার ও সংলাপ ক্ষীণভাবে ভেসে আসবে)

শান্তিঃ সত্যিই কি আমরা বেঁচে আছি মাইকেল? সত্যিই কি আমরা তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি? সত্যিই কি আমরা বৃদ্ধ বাবার আদেশ আমি পালন করতে সক্ষম হয়েছি? আমাদের সবার চোখের সামনে আল্লাহর ঘর মসজিদ, মন্দির, ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গুঁড়িয়ে দিলো খানরা, আমার বাবা বাধা দিতে চাইলেন, বেয়োনেট দিয়ে তারা হত্যা করলো তাঁকে। আমরা ঝোপের আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখলাম বাবার বুক দিয়ে গল গল করে রক্তের নদী নামছে। বাবা বলতেন কাউকে ঘৃণা করতে নেই, কারুর প্রতি হিংসা করতে নেই। কিন্তু, কিন্তু যে মানুষ নয়, যে পশুরও অধম, যে মানুষেরই শত্রু তাকেও কি ঘৃণা করবো না? (নেপথে-মার ঢালো বাঙালীকা)

রহমানঃ তুমি আমি ঘৃণা না করার কে? যারা গুলি খেয়ে মরেছে, যে নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে, যে শিশু আগুনে পুড়ে মরেছে তাকে জিজ্ঞেস করো ঘৃণা করা উচিত কিনা। যে মানুষ, তার বিরুদ্ধে তো আমাদের কোন যুদ্ধ নেই-কিন্তু যে অমানুষ, যে মানুষের শত্রুতাকে আমরা ধ্বংস করবোই।

শান্তিঃ ঠিকই বলেছ রহমান ভাই। আচ্ছা রহমান ভাই, চট্টগ্রামে আমরা যে দুভার্গ্যের মুখে পড়েছিলাম তাতো বললাম, কিন্তু তুমি তো কিছুই বললে না তোমার কথা।

রহমানঃ আজ আমাদের ব্যক্তিগত কোন সংবাদ তো নেই শান্তি। আমাদের জিজ্ঞাস্য একটিঃ বাংলাদেশ কেমন আছে। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের একমাত্র নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। আর সে জন্যেই তোমরা সবাই নিজেদের কথা বলোনি, বলোনি কি দুঃখের পাহাড় বুকের মধ্যে প্রতিদিন বহন করছো।

নারায়ণঃ বলিনি এই জন্যে যে, বলার সময় নেই আমাদের। চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত সময় নেই আমাদের। তবু আজ এই মুহূর্তে সেইসব বেদনার কথা আমাদের মনে পড়ে গেল যা স্মরণে এলে হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই জানতে বড় ইচ্ছা আমাদের তোমার কথা, তোমার ব্যক্তিগত কথা।

রহমানঃ (করুণ কণ্ঠে) কমরেড, তোমরা আমার জীবনের মরণের বন্ধু। তোমাদের বলতে আমার বাধা নেই। কুষ্টিয়ায় ছিলাম আমরা। এই হতভাগ্য আমি বাদে আমাদের আর সবাই হারিয়ে গেছে অনন্তে। তাদের হাত-পা বেঁধে আমাদেরই ঘরে পুড়ে আগুন লাগিয়ে দেয় নরপশুরা। (নেপথ্যে ক্ষীণ শব্দঃ বাঁচাও-বাঁচাও)

সবাইঃ আহা!

(দূর থেকে ক্ষীণ মার্চের শব্দ ভেসে আসবে)

রহমানঃ ঐ শোন, মুক্তিবাহিনী এগিয়ে আসছে। বন্ধুগণ, প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি রচম সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে। তখন তাকে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, মুক্ত আকাশ ও বদ্ধঘর- এর যে

কোন একটি বেছে নিতে হয়। তাকে বলতে হয় সে সম্মান চায়, না অসম্মান চায়? জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা সেই চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। আমরা ছাব্বিশে মার্চেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি- প্রাণ দেবো, কিন্তু স্বাধীনতা চাই। সেই সিদ্ধান্ত আজ আমরা চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করার কাজে লিপ্ত। কাজ যখন শেষ হবে তখন আমি নিজে আর আমরা অনেকেই বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করছি, প্রাণ দিচ্ছি।

শান্তি ঃ আমরা যুদ্ধ করছি শোষণের বিরুদ্ধে। একজন মানুষ যাতে আরেকজন মানুষকে শোষণ করতে না পারে, সেজন্যেই আমরা প্রাণ দিচ্ছি।

(মার্চের শব্দ আরো কাছে চলে আসবে)

মাইকেল ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন সবাই সমান অধিকার পাবে, কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না, মানবিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই কায়েম করতে হবে।

নারায়ণ ঃ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও তাই চায়। তারা চায় কেউ যেন আর তাদের ঠকাতে না পারে, চব্বিশ বছর ধরে যে শোষণ তা যেন আর না হয়। কেউ যেন বলতে না পারে আমি শোষিত, বঞ্চিত।

রহমান ঃ বন্ধুগণ! বঙ্গবন্ধুর সেই মহান ঘোষণার কথা পুনরায় বলেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি ও অন্যান্য নেতৃবর্গ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেনঃ এদেশের সম্পদ সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। দেশের মানুষকে প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি প্রদানের জন্য সমাজতন্ত্র-ভিত্তিক একটি শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার কথাই তাঁরা বারবার বলেছেন। আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর সেই মহান লক্ষ অর্জনের পথে চলেছে। তাদেরকে কোন অন্যায় অত্যাচারী শক্তি বাধা দিতে পারবে না।

(মার্চ আরো কাছে চলে এসেছে)

শান্তি ঃ আমরা সত্যের সৈনিক, তাই আমরা অজেয়। দেশের মাটি আমাদের বন্ধু, দেশের মানুষ আমাদের সহায়। আমরা যতই সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবো, দেশের মানুষ ততই আমাদের সাহায্য করবে; তারপর এক সময় সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুর উপর। এভাবে চারপাশ থেকে শত্রুকে আমরা ঘিরে ধরবো-পিষে মারবো তাকে।

(মার্চের শব্দ কাছে)

রহমানঃ বন্ধুগণ, আমরা জনতার প্রতিনিধি, জনতার অংশ, জনতার বন্ধু। আমরা ন্যায়ের পথিক, আলোক পথিক, মানবতার প্রতীক। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রাণ দেবো, জয়ী আমরা হবোই। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মায়, মরে যায়, আবার জন্মায়, আবার মরে যায়- জীবনের প্রবাহ এভাবেই চলে আসছে, চলে আসছে আদিকাল থেকে। সাধারণভাবে একজনের জীবন আর একজনের জীবনের চেয়ে কি বেশী মূল্যবান?

না, তা নয়। কিন্তু যে জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য বিসর্জিত হয়, যে জীবন ন্যায়ের জন্য বিসর্জিত হয়, সে জীবনের ক্ষয় নেই। সে জীবন অব্যয় অক্ষয় অমর। আজ আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য, ন্যায়ের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছি, যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। আজ আমরা মুখোমুখি দাঁড়াবো অন্ধকারের সঙ্গে। কে আমাদের জয়কে ঠেকাবে? কে আমাদের পথ রোধ করবে? কে বাধা দেবে ইতিহাসকে? সত্যকে? ন্যায়কে?

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

কে আমাদের রুখবে?

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

(মুক্তিবাহিনীর শিবির। গেরিলাদল হানাদারদের আক্রমণ করার পূর্বমুহূর্তে প্রস্তুত। গেরিলা অধিনায়ক নিয়াজ তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন)।

নিয়াজ ঃ তবু বন্ধুগণ লড়াই আমাদের করতেই হবে। সমস্ত প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদকে বরণ করে নিয়ে শত্রুধ্বংসের জন্য নিজেকের নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের এক উদ্দেশ্য, এক লক্ষ্য-বাংলার মাটিতে যারা রক্ত ঝরিয়েছে, বাংলার বুকে যারা আগুন জ্বালিয়েছে, বাংলাকে যারা শ্মশান করেছে, তাদের ক্ষমা নেই। তাদের আমরা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করব, বাংলার মাটি মুক্ত করব শয়তানদের কবল থেকে। আর এমনই শিক্ষা আমরা দেবো যেন ভবিষ্যতে কেউ আবার বাংলার মাটিতে পা রাখতে জায়গা না পায়। বন্ধুগণ প্রস্তুত!

সমস্বরে ঃ প্রস্তুত কমরেড।

নিয়াজ ঃ তবে এগিয়ে যাও-নির্ভয়, নির্ভীক। ভয়ংকর ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কাপুরুষ হানাদারদের উপর। ওদের নিঃশেষ করে দেবে। প্রভাত আলোর মতো তোমাদের গতি হবে সম্মুখে। এগিয়ে যাও।....মানিক, তুমি স্বপনাকে ডেকে নিয়ে এসো।

মানিক ঃ নিয়াজ ভাই আসতে পারি?

নিয়াজ ঃ এসো মানিক, স্বপন কোথায়? ও এসেছ, শোন তোমাদের উপর একটা কাজের ভার দেবো, এর সফলতার ওপর নির্ভর করছে আমাদের পরবর্তী আক্রমণ। যেমনই করেই হোক এ কাজ তোমাদের করতেই হবে।

স্বপন ঃ প্রাণ থাকতে পিছিয়ে আসবো না নিয়াজ ভাই। হয় সাফল্য, না হয় মৃত্যু।

নিয়াজ ঃ সাবাস। এই হচ্ছে বাংলার সন্তানের, বাংলার মুক্তিযোদ্ধার কথা। এই তো চাই।

মানিক ঃ আমরা নিয়েছি এগিয়ে চলার শপথ-চলাই আমাদের গতি, চলাই আমাদের জীবন।

নিয়াজ ঃ হ্যাঁ, চলাই আমাদের জীবন।

(জনান্তিকেঃ হল্ট, হু কামস দেয়ার) (মহিলা কণ্ঠঃ ফ্রেণ্ড)

রেখা এসে গেছে। ও তোমাদের সংগে যাবে। দিনের বেলায় যেতে হবে। বিপদসংকুল যদিও, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে।

রেখা ঃ জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। বিপদের কথা শুনলে মন আমার আনন্দে নেচে ওঠে। বিপদহীন, শংকাহীন জীবন বড্ড ঠুনকো লাগে কমরেড। আমি চাই মৃত্যুর মাঝে জীবনের গান গাইতে।

স্বপন ঃ আর সে গান রক্তরাঙ্গা নির্ভীক জীবনের গান।

মানিক ঃ রোদ্রোজ্জ্বল সংগ্রামী জীবনের গান।

নিয়াজ ঃ নির্ভয় নিঃশঙ্ক চলার শপথ যে নিয়েছে তার কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। দুস্তর সমুদ্র বা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় কিছুই তার পথ রোধ করতে পারে না।
(বিস্ফোরণের শব্দ দূর থেকে)
শুনলেন তো, ফরহাদপুরের ব্রিজ উড়ে গেলো। হানাদারদের পথ আজ থেকে রুদ্ধ হয়ে গেল।

রেখা ঃ এবার আমরা বাকী পথটুকুও বন্ধ করে দেবো। আজ ওরা গ্রামে-গ্রামে দলবদ্ধ পাগলা জানোয়ারের মতো হামলা চালাচ্ছে। ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে পোড়াচ্ছে। মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে হত্যা করছে।

নিয়াজ ঃ আর মা-বোনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে শয়তানরা ১০০টা বন্দীশিবির করেছে। আর সেখানে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে অকথ্য নির্যাতন করছে। মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছেলেখেলা করছে। এ নির্যাতন বন্ধ করব, নির্যাতনকারীর মৃতদেহের স্তুপে লেখা হবে হানাদারের গ্লানিকর পরাজয়।

মানিক ঃ নিয়াজ ভাই, আমাদের কি কাজের ভার দেবেন বলেছিলেন না?

নিয়াজ ঃ ও হ্যাঁ, শোন, নগরপুরে দুশমনদের একটা শক্ত ঘাঁটি আছে। এ ঘাঁটিটা আমাদের নষ্ট করতে হবে। এ ঘাঁটিটা নষ্ট হলে আমরা নদীপথ এবং সড়ক উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। শহরে আঘাত হানার পক্ষেও সুবিধা হবে।

স্বপন ঃ এ আক্রমণে আমি নেতৃত্ব দেবো নিয়াজ ভাই, আমাকে শুধু পাঁচটা ছেলে দেন। আমি শয়তানদের ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে আসবো।

রেখা ঃ নেতৃত্ব তুমি দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু এভাবে এতো অল্প ছেলে নিয়ে গেলে কতখানি সফল হবে ভেবে দেখেছ?

স্বপন ঃ এখন এতো ভেবে দেখার সময় নেই। এখন জানি শুধু শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।

নিয়াজ ঃ না, স্বপন। বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েই তোমরা এগিয়ে যাবে। আমরা ত্রিমুখী আক্রমণ চালাবো। তিনটে দল থাকবে, তার একটার নেতৃত্ব নেবে তুমি।

মানিক ঃ আমার কাজ কি নিয়াজ ভাই?

নিয়াজ ঃ তোমারও কাজ আছে। তুমি থাকবে রক্ষণভাগে। আক্রমণ শুরু হলে, শহর থেকে শয়তানদের সাহায্য আসতে পারে। তুমি এই সাহায্য আসার পথে বাধা সৃষ্টি করবে। কোনভাবেই যেন তারা সাহায্য নিয়ে আসতে না পারে।

রেখা ঃ আর আমি? আমি কি করব?

নিয়াজ ঃ তুমি আমার সংগে ওষুধের ব্যাণ্ডেজ সব নিয়ে থাকবে। প্রয়োজন হতে পারে। একটা স্ট্রেচার নিয়ে নিয়ো। মানিক নায়েক কাসেম, বাবলা, রশিদ, কালু, স্বপন তোমার সংগে থাকবে। নায়েক মোহর আলী রফিক, বিজন, মনি এবং আমি নায়ক নিযামুদ্দিনকে নিয়ে নেবো। নাও প্রস্তুত হয়ে নাও, অস্ত্রশস্ত্র সব নিয়ে নাও। শয়তানদের গুলির জবাব দিবে-বেশী গুলি অহেতুক খরচ করো না।

(ক্ষণ বিরতি)

প্রস্তুত, এগিয়ে যাও, কিন্তু সাবধান কেউ অহেতুক উত্তেজিত হয়ে উঠবে না। বিপদের মুখে যে ধীরমস্তিষ্কে, শান্ত মাথায় কাজ করতে পারে সে-ই কামিয়াব হয়। যাও, এগিয়ে যাও।

(মেশিনগান ও রাইফেলের গুলি)

মানিক ঃ কাসেম ভাই, ডাইনে চেপে যান, বাঁদিকের মেশিনগানটা বন্ধ করতে হবে।
(গুলি চলতেই থাকবে)

স্বপন ঃ রফিক-বিজন বাঁয়ের খাঁড়ি দিয়ে উঠে যাও, পাশের বাংকারের মেশিনগানটা স্তব্ধ করে দাও। মোহর ভাই থামো, এগিয়ে যেয়ো না, থামো........

মানিক ঃ বাবলা, কাসেম ভাই কোথায়?
(মর্টারের শব্দ ও মেশিনগানের গুলি)

নিয়াজ ঃ মিনিটে ৫টা করে সেল করো, ডাইনে, আর একটু ডাইনে। ঠিক হয়েছে, বাছাধনদের ট্রাকটা একেবারে গেছে। মর্টার থামাও।

স্বপন ঃ রফিক চার্জ।
(গ্রেনেডের বিস্ফোরণ)

মানিক ঃ বাবলা চার্জ (গ্রেনেডের বিস্ফোরণ) এবার জয় বাংলা বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো।
(সমস্বরে-জয় বাংলা)

হ্যাণ্ডস আপ। ঐ দেখ একটা শয়তান পালাচ্ছে, (গুলির শব্দ) যাক মরেছে। স্বপন ভালই হয়েছে, নাও ভাই অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদগুলো নিয়ে নাও।
(কাতরানোর শব্দ)

স্বপন ঃ কে কাতরাচ্ছে!...বিজন দেখ তো ভাই। ...আরে এ কি কাসেম ভাই...কাসেম ভাই-
(আর্তনাদ করে ওঠে)

কাসেম ঃ আমাকে নিয়াজ ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলো।

মানিক ঃ নে, ধরাধরি করে ওঠা। চল চল।

স্বপন ঃ তার আগে ক্ষতস্থানটা বেঁধে নে।

নিয়াজ ঃ কি, কি হয়েছে স্বপন?

স্বপন ঃ কাসেম ভাইয়ের গুলি লেগেছে।

নিয়াজ ঃ কাসেম।

মানিক ঃ কাসেম ভাই!

কাসেম ঃ কেঁদো না ভাই। কেউই বেঁচে থাকার জন্য আসে না। একদিন তাকে যেতেই হয়। আমার দুঃখ নেই, আমি আমার জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছি। এ মৃত্যু আমার অনেক গৌরবের। দুঃখ করো না।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৮। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭১

সোনার বাংলা

২৯ অক্টোবর, ১৯৭১

সবাই ঃ আসসালামু আলায়কুম।

ছোটমিয়া ঃ ওয়ালায়কুম আসসালাম।

রুস্তম ঃ কি জমির ভাই ভাবছ কি? আমাদের ছোটমিয়া গো, ছোটমিয়া। আশফাক ভাই কাল যাবার সময় আমাকে বলল, ‘চলো বেড়িয়ে আসি।’

জমির ঃ কাল তাহলে তুমি ছোটমিয়ার ওখানে গেছিলে? তা ভালই হয়েছে।

কাজলীর মা ঃ কি জমির ভাই, আশফাক ভাই আজ আসবে না?

ছোটমিয়া ঃ আশরাফ ভাই আজ আর আসবেন না। উনি রক্ষীবাহিনী গঠনের ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই কাল আমাকে বললেন, ‘তুমি ভাই আসরে যেয়ো’।

কাজলীর মা ঃ ভালই হয়েছে।

ছোটমিয়া ঃ জমির ভাই, এবার তোমাদের খবর-টবর বলো। এখন সারা বাংলাদেশ জুড়ে তো যুদ্ধের দামামা বাজছে। একদিকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাড়ে সাত কোটি মানুষ, আর অন্যদিকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী।

রুস্তম ঃ ওদিকে আবার জুটেছে ‘চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা’।

কাজলীর মা ঃ তার মানে, কি বলছ রুস্তম!

জমির ভাই ঃ রুস্তম আজকে আবার ভালো কথা বলছে মনে হচ্ছে। কার কথা বলছ রুস্তম!

রুস্তম ঃ ও, দেখেছো তো শুধু শুধু আমাকে বোকা ভাবো, এখন দেখো বুদ্ধি হয়েছে কিনা।

জমির ভাই ঃ বুদ্ধি তো হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কার কথা বলছ আগে সেটা বলো।

ছোটমিয়া ঃ বলো, রুস্তম। কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া ভাল না। কথা পরিষ্কার করে বলা উচিত।

রুস্তম ঃ বলব? ওই রাজাকারদের কথা বলছি। খান সৈন্যেরা যত না চেঁচায়, তার চেয়ে বেশী লাফায় রাজাকাররা।

জমির ভাই ঃ তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো, রাজা যতো বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।

কাজলীর মা ঃ ঠিকই বলেছ জমির ভাই, রুস্তম কিন্তু ঠিকই ধরেছে।

ছোটমিয়া ঃ রুস্তমেরও ধ্যান-ধারণা আছে। আজ বাংলার প্রতিটি মানুষ সচেতন, তারা প্রত্যেকে নিজের দেশকে শত্রুর কবলমুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। প্রাণ যায় তবু স্বীকার, স্বাধীনতা চাই-ই।

জমির ভাই ঃ আমরা দখলদার বাহিনীকে তাড়াবোই। প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ছেলেরা ট্রেনিং নিচ্ছে, মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হচ্ছে।

রুস্তম ঃ ট্রেনিং আমি নিচ্ছি, দুশমনের বিষদাঁত ভাঙ্গতেই হবে। এমন শিক্ষা দিবো জীবনে যেন আর কোনদিন-

কাজলীর মা ঃ থেমে গেলে কেন, বলো।

ছোটমিয়া ঃ রুস্তম বলতে চাচ্ছে, দুশমন যেন আর কোনদিন বাংলার মুখে না হয়, বা বাংলার নামও মুখে না আনে। তাই না রুস্তম?

রুস্তম ঃ ঠিক বলেছ ছোটমিয়া। শক্ত কথা তো একটু আটকে যায়। তবে শিখে নিয়েছি। তাই না ছোটমিয়া?

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, মানুষ ঠেকতে ঠেকতেই শেখে।

জমির ভাই ঃ এই রাজাকাররা শিখছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে এমনই মার খাচ্ছে যে বদবুদ্ধি সব কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

কাজলীর মা ঃ যাবে না, অন্যায় কদিন থাকবে বলো। দুদিন হয়তো মানুষকে কষ্ট দেবে, তারপর যেতেই হবে।

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, অন্যায় বেশীদিন থাকতে পারে না। একদিন তাকে দূর হতেই হবে। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবেই।

জমির ভাই ঃ এই যেমন দেখ না, আমতলীর বসিরউদ্দিন খবর দিয়ে গেল, বিশজন রাজাকার পালিয়ে এসেছে, মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

রুস্তম ঃ কেন, তিড়িং বিড়িং ফুরালো? হাতে তো রাইফেল নিয়ে গাঁ-গেরামের হাঁসটা মুগরীটা ছাগলটা খুব জুত করে খাওয়া হচ্ছিল, কেন সে শখ মিটে গেল?

কাজলীর মা ঃ শখ মিটবে না? মুক্তিবাহিনীর মার জানা আছে না-এমনই মার দেয়, ল্যাজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড়।

রুস্তম ঃ মুক্তিবাহিনীর ভয়ে খানসেনাদের রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম হয়ে গেছে।

জমির ভাই ঃ কথাটা একেবারে সত্য বলেছ রুস্তম। আর তার জন্যেই তো ওরা নিজেরো কোথাও যাওয়ার আগে রাজাকারদের পাঠিয়ে দেয়। হালচাল দেখে তারপর এগোয়।

রুস্তম ঃ কথায় আছে না, সাবধানের মার নেই।

ছোটমিয়া ঃ কথাটা ঠিকই, কিন্তু এক করেও দখলদার পাকবাহিনীর কুল রক্ষা হচ্ছে না। ওরা ভেবেছিল ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের ইচ্ছাকে, সমগ্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু

বাংলার মানুষের ইচ্ছাই বাংলার মানুষকে জাগিয়েছে। আজ বাংলার মানুষ ঘরে-বাইরে সংগ্রামী। একদিকে লড়াই করছে দুঃসাহসী বীর মুক্তিবাহিনী, অন্যদিকে সহায়তা করছে বাংলার সাধারণ মানুষ।

জমির ভাই ঃ আর ভাই রাজাকারদের অবস্থা হয়েছে 'বিনা জলে মাছের মতো' খাবি খাচ্ছে।

কাজলীর মা ঃ তার জন্যেই উপায় না দেখে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা দিচ্ছে। বুঝলে ছোটমিয়া, ওদের নাক কানগুলো কেটে দিতে হয়। কি কষ্টই না মানুষকে দিচ্ছে।

রুস্তম ঃ ওরা যেমন যেমন করে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তেমন তেমন করে শোধ তুলে নেওয়া উচিত।

ছোটমিয়া ঃ ওটা ভুল ধারণা। যারা নিজে এসে ধরা দেয়, তাদের উপর অত্যাচার করাটা ভুল। ওতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়। আর তাছাড়া রাজাকার মানেই যে খারাপ একটা কিছু তা নয়। তুমি কি বলো জমির ভাই।

রুস্তম ঃ জমির ভাইয়ের মনে লাগেনি কথাটা, তুমিই একটু বুঝিয়ে বলো ছোটমিয়া।

কাজলীর মা ঃ সেই ভালো ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া ঃ আচ্ছা জমির ভাই, ভাল-মন্দ মিলিয়েই মানুষ- কিন্তু সব মানুষই কি খারাপ? তা নয়। আজ বাংলাদেশের রাজাকার যারা তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণের দায়ে রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। অনেকে হয়তো সামরিক লোভে পড়ে রাজাকার হয়েছে। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারছে তখনই দলে দলে সরে আসছে। তখন তাদের আর শাস্তি দিলে ভুল হবে। মানুষেই ভুল করে, তাই না? কি বলো জমির ভাই?

জমির ভাই ঃ ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তবে দুর্বলের উপর আমাদের রাগ নাই, কিন্তু দখলদার সৈন্যের অত্যাচারের জবাব আমরা দেবো।

ছোটমিয়া ঃ ঠিকই, দুশমনদের যোগ্য জবাবই আমরা দেবো। তাদের সমস্ত শক্তি আর দম্ভ আমরা নিঃশেষে চূর্ণ করব।

কাজলীর মা ঃ এ জন্যেই তো ঘরে ঘরে ছেলেরা আজ ট্রেনিং নিচ্ছে। মা-বোনেরা তৈরী হচ্ছে।

ছোটমিয়া ঃ নিশ্চয়ই কেননা এ সংগ্রাম আমাদেরই স্বাধীনতার সংগ্রাম।

রুস্তম ঃ ছোটমিয়া, বলছিলাম এতো সুন্দর সুন্দর কথা হলো এরপর একটা গান হলে হতো না?

জমির ভাই ঃ ঠিকই ছোটমিয়া, একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া ঃ বেশ, তাহলে শোন, একটা দেশাত্মবোধক গান শোন।

(দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া ঃ গান তো শুনলে, বেশ ভালই লাগলো, না কি বলো?

রুস্তম ঃ এরকম গান শুনলে রক্তটা একেবারে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

জমির ভাই ঃ ঠিকই

কাজলীর মা ঃ সবই তো হতো। ছোটমিয়া, হাতে তো সময়ও নাই।

ছোটমিয়া ঃ হ্যাঁ, হাতে আজকে আমাদের আর সময় নেই, চলো আজকের মতো উঠি।

রুস্তম ঃ চলো।

১ নভেম্বর, ১৯৭১

জমির ভাই ঃ আসসালামু আলায়কুম।

সবাই ঃ ওয়ালায়কুম আসসালাম।

ছোটমিয়া ঃ এসো জমির ভাই। খবর সব ভাল তো?

রুস্তম ঃ জমির ভাই নিশ্চয় খবর নিয়ে এসেছে। আজ আসরে আবার 'নেট'-এ এলো দেখছ না?

জমির ভাই ঃ রোজদিন নিজে দেরী করে আসো। আজ তাই খুব ঠাট্টা হচ্ছে, না?

কাজলীর মা ঃ ঠাট্টা করেনি জমির ভাই। রুস্তম সত্যি বলছে। একটু আগে ছোটমিয়াকে বলছিল জমির ভাই খুব খাটছে।

ছোটমিয়া ঃ খুব ভালো কথা। জমির ভাই শুধু কেন, তুমিও তো খুব খাটো।

কাজলীর মা ঃ নিজের কথা কি নিজে বলা যায় ছোটমিয়া? অন্যের উপর দিয়ে যদি যায় ভালো কথা।

রুস্তম ঃ কি যে বলো। একটু কাজ করি, তা আবার বলে বেড়াতে হবে নাকি? কাজ তো করতে হবেই। সব মানুষ কাজ করছে আর আমি একলা বসে থাকবো নাকি?

জমির ভাই ঃ কি বলছো রুস্তম। তুমি কাজ করো না একথা বলছে কে?

ছোটমিয়া ঃ ওটা কেউই বলেনি, তবে রুস্তম মনে মনে সন্দেহ করছে, হয়তো সবাই ভাবছে রুস্তম কাজ করে না। তাই না রুস্তম?

রুস্তম ঃ ঠিকই ছোটমিয়া।

ছোটমিয়া ঃ তা কেউ ভাবে না রুস্তম। যে কাজ করবে সে তার মূল্য অবশ্যই পাবে। আজকে আমাদের সবাইকে খাটতে হবে। বর্বর ইয়াহিয়ার সৈন্যেরা আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, খেতখামারে ফসল নষ্ট করেছে, আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকার সময় তো কারোরই নেই।

কাজলীর মা ঃ এর জন্যেই তো। দিন-রাত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরছি। এই সংগ্রামে আমাদের মা-বোনদেরও দায়িত্ব আছে-কর্তব্য আছে, সেটা তাদের বুঝাচ্ছি। নিজের নিজের সংসার গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করছি।

জমির ভাই ঃ এক হিসেবে এটা তোমার বিরাট দায়িত্ব। আমাদের সবার সবারই প্রতি দায়িত্ব আছে। তুমি ঠিকই করছ।

ছোটমিয়া ঃ আজকের এই দিনে আমাদের মা-বোনরা কেউই বসে নেই। যার যা কাজ করে যাচ্ছেন। এতদিন তোমরা ছিলে অন্দরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আজ সংগ্রামে তোমাদেরও ডাক পড়েছে।

আজ তোমরাও বেরিয়ে এসেছো বাইরে। আজ তো কোন প্রশ্নই ওঠে না কি করব, কেন করব।

রুস্তম ঃ দেখো ছোটমিয়া। এই লড়াই শুরু হয়ে কতো মানুষ ঘরবাড়ি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছে। কতো ভাই ভাইকে হারিয়েছে।

জমির ভাই ঃ ও কথা তুলে মন খারাপ না করাই ভালো, তাই না ছোটমিয়া?

কাজলীর মা ঃ আগে বাপু শোনই কথাটা কি বলতে চাইছে। কথার মাঝে বাগড়া দেওয়া-

ছোটমিয়া ঃ থামো, হয়েছে। রাগ করে জমির ভাইকে এমন করে না ধমকালে হতো না? যাক রুস্তম কি বলতে চাইছো বল তো?

রুস্তম ঃ কি আর বলব, মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

কাজলীর মা ঃ ও মা, এতটুকু কথা শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেলে চলবে কি করে রুস্তম। তুমি না সৈনিক, তুমি না লড়াই করো?

জমির ভাই ঃ আমি ওভাবে কথাটা বলিনি ছোটমিয়া। আমি ভাবছিলাম, রুস্তম হয়তো কথার তোড়ে আসল কথাই চাপা দিয়ে দেবে, তাই বলেছিলাম। যাক রুস্তম বল।

ছোটমিয়া ঃ আচ্ছা এবার বলো রুস্তম। এখন আর অভিমান করার সময় নেই রুস্তম। আর ওটা তোমার সাজেও না। আজ আমরা বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত। কোথাও কোনদিকে চাইবার সময় নেই আমাদের। এখন সোজা কথা বলো, সোজা কাজ করো। অযথা দুঃখ করে সময় কাটিয়ে লাভ আছে? মনে বল রাখো, বুকে সাহস রাখো, চোখ-কান খুলে রেখে লড়াই চালিয়ে যায়।

রুস্তম ঃ হক কথার এক কথা। ঠিকই বলেছ ছোটমিয়া। তাই তো বলছিলাম আমি। আজ ভোরে গাবতলীর মাঠ দিয়ে কাসিমপুরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় দেখা মানকের সাথে। ওই যে মানকে গো-মজিরুদ্দিন লাতিটা।

কাজলীর মা ঃ মজিরুদ্দিন লাতির আবার কি হলো! খুব ভালো লোক-কিছু হয়েছে নাকি?

জমির ভাই ঃ কৈ, আমি তো শুনিনি কিছু হয়েছে নাকি?

রুস্তম ঃ না কিছু হয়নি। আগে কথাটা শুনোই না বাপু, তারপর পিড়িং পিড়িং করো। বাঁধা সারিন্দার তার হাত লাগলেই পিড়িং।

ছোটমিয়া ঃ থামো রুস্তম। কথাটা খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে । বলো।

রুস্তম ঃ হ্যাঁ, তারপরে মানকে তো মুষড়ে, মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে তোর। মুখ এমন শুকনো কেন? বলে কি জানোয়ারগুলো যেখানেই যাচ্ছে সাধারণ পাড়াগাঁয়ের মানুষগুলোকে মেরে খতম করে দিচ্ছে।

ছোটমিয়া ঃ কাপুরুষ শক্তি প্রয়োগ করে নিরীহের উপরে। এ জন্যেই আমরা আজ রুখে দাঁড়িয়েছি, মরণপণ করে লড়াই করে যাচ্ছি।

রুস্তম ঃ আমিও তাই বললাম। যুদ্ধ করছি, করব, কিন্তু শেখ মুজিব বলেছেন, দেশকে স্বাধীন করবো। তাই স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ আমরা করবই।

জমির ভাই ঃ ঠিক বলেছ রুস্তম। গ্রামে গ্রামে আজ এ জন্যেই আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। যেখানেই দুশমনকে পাও, মারো-ইঁদুরের মতো মেরে মেরে খতম করো।

কাজলীর মা ঃ এর জন্যই তো খানসেনারা শিবির থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। কখন কোনদিকে মারা পড়ে ঠিক আছে।

ছোটমিয়া ঃ মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে গেরিলাদল। আর সঙ্গে সহযোগিতা করছে বাংলার সংগ্রামী মানুষ। প্রতিটি বাড়ি হয়ে উঠেছে দুর্গ। প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠেছে সৈনিক।

রুস্তম ঃ ইয়াহিয়া বুঝতে পারেনি, না বুঝেই ভীমরুলের চাকে ঢিল দিয়েছে। এখন ভীমরুলের কামড়ের চোটে চোখ-মুখ অন্ধকার।

কাজলীর মা ঃ এখন তো খান সেনাদের অবস্থা ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

ছোটমিয়া ঃ ভীরু কাপুরুষরা যতো অত্যাচার করছে, আমাদের মানুষের মনে সাহস এবং শক্তি ততোই বেড়ে যাচ্ছে। মানিককে বুঝিয়ে দিয়েছো তো 'শয়তান জ্বালাতে পারে, মারতে পারে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একযোগে লেগেছে-আমরা কামিয়াব হবোই। বর্বরদের তাড়াবোই আমরা।

জমির ভাই ঃ মনে বল ধরতে হবে, আল্লার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, এবং লড়াই করে যেতে হবে। তাই না?

কাজলীর মা ঃ আমারও কথা তাই জমির ভাই।

ছোটমিয়া ঃ আজকের সংগ্রামে জনসাধারণের সাহায্য-সহযোগিতা এবং শক্তি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং সংগে সংগে দরকার অটুট মনোবল, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে-আমরা জিতব, জিতব, জিতবই। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হবেই।

রুস্তম ঃ মানকেকে খুব বুঝালাম-ছোটমিয়া। তারপরে মানকের সে কি তড়পানি। বলে কিনা, ঠিক বলেছিস রুস্তম লড়াই যখন করছি, তখন আর ভাবব না, দুশমনকে তাড়িয়ে তবে আরাম করবো। মানকে আবার আশফাক ভাইয়ের কাছে গেলো।

জমির ভাই ঃ রক্ষীবাহিনীতে নাম লেখাতে, না?

কাজলীর মা ঃ ঠিকই করেছে। পঙ্গুও মনের জোরে পাহাড় ডিঙায়। আর আমাদের তো সবই আছে।

রুস্তম ঃ কি ব্যাপার জমির ভাই, কথায় কথায় তোমাদের খেয়ালই নাই।

জমির ভাই ঃ কি হলো আবার?

রুস্তম ঃ গান শুনবে না? ছোটমিয়া একটা গান শোনাও।

ছোটমিয়া ঃ ওহো, আমারও খেয়াল নেই। আচ্ছা এবার তাহলে একটা গান শোন, দেশাত্মবোধক গান। (দেশাত্মবোধক গান)

ছোটমিয়া ঃ গান তো শোনা হলো, হাতে সময়ও নাই আর-চলো আজকের মতো উঠি।

কাজলীর মা ঃ চলো, জমির ভাই, রুস্তম চলো যাই।

সবাই ঃ চলো, চলো।

(মুস্তাফিজুর রহমান রচিত)

জনতার আদালত

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

কুঁকড়্যা ঃ শুন রাসুবু আমি খুব ভালো কর‍্যা বুঝ্যা লিয়্যাছি, আমাধের দুষমুন আমাধেরই শায়েস্তা কইরতে হবে। তুমি যে একটু আগে বুলল্যা, দানেশ মিয়ার ব্যাটা রাজাকারে ভর্তি হয়া ধরাখে সরা জ্ঞান করছে-তা ঠিক। আইজক্যাল ওই খালি লুটপাটই কইরছে না, আরো ম্যালা কিছু আছে।

রাসু ঃ আরে খুলে না বললে কি আর আমি জানিনে। দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম তো পাণ্ডা, ওর সাথে যোগ দিয়েছে মোমিন বেপারীর শালা আর কালু মিস্তিরীর ভাই। সেদিন দেখো না বলা নাই কওয়া নাই, একদল মিলে এসে আমার গাছের ডাবগুলো পেড়ে নিয়ে গেল, কি না ওদের কে অফিসার এসেছে, সে খাবে। শোন কথা, বেটারা যেন সব বাপের সম্পত্তি পেয়েছে। তা কে বলতে যাবে বল আমার বোনের ছেলেটা গিয়ে জিজ্ঞেসে করেছে, তাতেই রাগ কতো, এই মারে কি সেই মারে।

কুঁকড়্যা ঃ তুমার ডাব খায়্যাছে। আমার একদিন জাল দিয়্যা মাছ মার‍্যা লিয়্যা গিয়্যাছে। আমি ছিল্যাম না, না হোলে সেদিন আর জান লিয়্যা যাত্যে দিত্যাম না। আমিও তক্কে তক্কে আছি, আর একদিন পাল্যে হয়।

রাসু ঃ আরে শুধু ফল পাকুড় গেলে তো কথাই ছিল না। ওদের জ্বালাতে আজকাল বো- বিটীরই কি ঘাট-ঘাটালীতে যাওয়ার জো আছে। সেদিন আমেনা বুবুর বড়ো মেয়েটাকে পানি নিয়ে আসার সময় ধরে, সে যা-তা, আমেনা বুবু যখোন গিয়ে বলল- হ্যাঁরে রহিম, এক পাড়ার ছেলে-মেয়ে, আমার বাশেরা কি তোর বোন নারে। তো সে হারামজাদা কথায় তো কান দিলই না, যা-তা বলতে শুরু করলো মনে হয় নোড়া দিয়ে ওর মুখ ভেঙ্গে দিই।

কুঁকড়্যা ঃ আমিও শুন্যাছি আবার হই চই হ্যয়াছিল বুল্যা নাকি রহিম আমেনা বুবুকে শাসিয়্যা গেছে- বাশেরাকে চুরি করা লিয়্যা যাবে বুল্যা। শুন কথা, দিন দিন হচ্ছে কি? আমাধের সহ্যের বাহেরে চল্যা গেলছে, মোড়ল ভাই আসুক, তুমরাও সবাই আছ, আজই ওদেরকে ডাক্যা আন্যা আমরাই ওদের বিচার করব। তুমরা সবাই মোড়ল ভাইকে বুলব্যা। আইজই য্যানে একটা ব্যবস্থা করে।

মোড়ল ঃ কি ব্যাপার, কুঁকড়্যাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে যেন। নোতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

রাসু ঃ এইতো মোড়ল ভাই এসেছে। বল কুঁকড়্যা ভাই, একটু গুছিয়ে বলো তো।

কুঁকড়্যা ঃ আমি খুব রাগ্যা গেছলি, আমি সাজিয়্যা বুলতে পারবো না, তুমি বুল।

মোড়ল ঃ কি হয়েছে রাসু বুবু?

রাসু ঃ কি হয়েছে তা' আমি বলব আর তুমি জানবে? তোমার কি নিজে থেকেই খবর রাখা উচিত ছিল না মোড়ল ভাই। থাকগে যা বলি শোন। এই যে দানেশ মিয়ার ছেলে রহিম, গুণ্ডাপাণ্ডার দল নিয়ে রাজাকারে নাম লিখিয়ে গোটা গ্রামটাকে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছে, এর তোমরা কোন বিহিত ব্যবস্থা করবে, না আমাদেরকে দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মোড়ল ঃ তোমরা কি বলতে চাও, আমি এসব কোন খবর রাখি না, না কোন চেষ্টা করছি না। নিজে কদিন রাস্তায়-হাটে ডেকে সাবধান করে দিয়েছি এরপরও যদি তাদের অত্যাচার বন্ধ না হয় বা রাজাকারের দল থেকে নাম না কাটায় তখোন বাধ্য হয়েই মুক্তিবাহিনীর লিস্টে ওদের নাম তুলে দিতে হবে।

কুঁকড়্যা ঃ যদ্দিন সে ব্যবস্থা না হয়, তদ্দিন কি আমরা সহ্য করবো ভাব্যাছো মোড়ল ভাই। এতো বাড়া বাড়্যাচ্ছে ওরা যে আইজকাল কাণ্ঠা ঘাঁটাতে বৌ-বিটীর হাঁটাচলা বন্ধ হবার যো হয়্যাছে। কেউ কিছু বুললেই ভয় দেখায়। আইজকাল ত পকেটে ছুটু বন্ধুক লিয়্যাই ব্যাড়াই।

রাসু ঃ হ্যাঁ, বাপেদের কাছ থেকে বন্ধুক পেয়েছে ত, গুলি-বারুদের হিসেব নাই। আরে মানুষ না হয় দুর্বল, খোদা কি দেখছে না, তোদের বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবি তোরা।

কুঁকড়্যা ঃ বাদ দ্যাও বুবু ওসব কথা, মোড়ল ভাই। আমি এখুনই যায়্যা ডাক্যা আনছি ওদেরকে। হয় তুমি এখুন ওদের বিচার কইরব্যা না হলে কিন্তু খুন খারাবী হয়্যা গেলে আমার দোষ দিতে পাইরব্যা না, হ্যাঁ।

মোড়ল ঃ আরে, কুঁকড়্যা ভাই, মাথা গরম করো না, শোন শোন...

কুঁকড়্যা ঃ শুনাশুনির কিছু নাই। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। আমি কিছু বুইলবো না, যা বোলার তুমিই বুলো, আমি খালি ডাক্যা আনছি, বুইঝল্যা-আমি চননু।

(একটু বিরতি)

মোড়ল ঃ রাসু বুবু তুমি একটু বসো, আমি আর দু'চারটে মুরুব্বীকে ডেকে আনি, হাজার হলেও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ব্যাপার, সবারই থাকা উচিত। আর, এইত নিয়ামত চাচা এসে গেছে, বসো চাচা বসো, পেছনে ওই অন্ধকারের দিকে কে বসে আছে। আবেদ ভাই নাকি-আঃ হা, পেছনে কেন, সামনে এসে বসোনা, এসো হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসো ওখানেই বসো, আরে ডাক্তার সাহেবকে আড়াল করে দিয়ো না, একটু গুছিয়ে বসো।

রাসু ঃ আচ্ছা মোড়ল ভাই দানেশ মিয়াকে একটু ডেকে নিলে হতো না, ছেলের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে দানেশ ভাইয়েরও কিছু জেনে রাখা ভাল। পরে আবার না বলে যে, আমরাই অন্যাই করেছি।

মোড়ল ঃ এতো রাগা তোমরা রেগেছ রাসু বুবু, যে, মানুষ পর্যন্ত চিনতে পারছ না, সামনের সারির ওই বামদিকে ওটা কে বসে আছে দানেশ ভাই না, লজ্জায় এতোক্ষণ কথা বলেনি বুঝলে। দেশ ও দশের এই দুর্দিনে কারো ছেলে যদি শত্রুর সাথে পাঞ্জা মিলিয়ে এমন সব জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, তবে স্বভাবতই সে বাপের মুখ লজ্জায় বন্ধ হয়ে যায়।

রাসু ঃ আচ্ছা মোড়ল ভাই, এই যে পাকিস্তানের মিলিটারীদের অমানুষিক অত্যচার, লুট, গ্রাম পোড়ানো, খুন আর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করা- আর দেশেরই কিছু লোকের ওদের দিকে হয়ে ওদেরকে সহযোগিতা করা, এর কি কোন ব্যবস্থা নাই? কিছু একটু বলো না- এরকম সময়ে আমাদের কি করা উচিত?

মোড়ল ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের সবাইকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই, দেখ-পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের শত্রু তারা শুধু শোষণ করার জন্য আমাদেরকে জুলুম করে ওদের গোলাম করে রাখতে চায়। ওদের মেরে নিঃশেষ করে দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব নিয়েছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। রীতিমত যুদ্ধ হচ্ছে এবং শুনলে অবাক হবে, খোদা সহায় আছেন বলেই, সব জায়গাতেই পাকিস্তানী সৈন্যরা মার খাচ্ছে আর পিছু হটছে। আমাদের কাজ হলো- সব রকমে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে অসহযোগিতা করা এবং এমন কিছু না করা, যাতে আমাদের দেশের পয়সা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।

রাসু ঃ তা কি করে সম্ভব? ওরা আমাদের ধার ধরছে থোরাই? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই ত করছে।

মোড়ল ঃ খুব সম্ভব। ওদের মনোবল এতো ভেঙ্গে গেছে, যে, আজকাল কোন জায়গায় আর নিজেরা এগোচ্ছে না। আমাদেরই ভাই-ছেলে দিয়ে তৈরী করা রাজাকার আল-বদর বাহিনীকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের ছেলেরা যাতে ওদের কাজ না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারপর-ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যতো ক্ষতিই হোক, একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য ক্রয় করা চলবে না। আমরা যারা দেশে অসহায় হয়ে পড়ে আছি, তারা এভাবেই মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, তাতে করে যুদ্ধরত আমাদের ভাইদের কাজ এগিয়ে যাবে।

কুঁকড়্যা ঃ এই যে মোড়ল ভাই। তোমার আসামীরা। সবাইকে নিয়্যা আস্যাছি। যা বোলার তুমি বোলো।

মোড়ল ঃ এই যে রহিম, বাদশা মিয়া, শাকের ভাই, বসো, সব বসো।

রাসু ঃ এঃ আদর করে আবার বসতে বলা হচ্ছে। ওরা ভদ্রলোকের মধ্যে বসার যোগ্য?

মোড়ল ঃ থাম রাসু বুবু। অমন করে কাউকে বলতে নেই। দোষ থাক্ গুণ থাক্, ওরা আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে। আমাদেরই ভাই-ভাইপো। আমরা মানুষের কাজের সমালোচনা করতে পারি, কাজকে ঘৃণা করতি পারি- মানুষকে নয়।

কুঁকড়্যা ঃ তুমার ওই ব্যবহারেই ত ওরা অতো আস্কারা পায়্যাছে। হুঁঃ কথায় আছে-ছেল্যাক থাবা, বুড়্যাক বাবা, তা না ভাই-সোনা কর‍্যা কর‍্যা...

মোড়ল ঃ তুমি থাম কুঁকড়্যা ভাই। শোন রহিম, তোমরাও শোন বাদশা ভাই। তোমরা রাজাকার হয়েছ ভাল কথা, যদিও আমাদের সেটুকুই বরদাস্ত করা উচিত নয়। অন্যান্য স্থানের রাজাকাররা শুধু নামেই রাজাকার, তারা কাজ করছে। আমাদের তোমরা তাতো করছই না, উল্টে তোমাদের অত্যাচারে গাঁয়ের লোকের সুখ-শান্তি শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ। এমন কোন নোংরা কাজ নাই যা তোমরা করোনি। আর এই সভা যে শাস্তি তোমাদের দেবে- তা তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। কারণ, গ্রামবাসীরা তোমাদের অত্যাচারে জর্জরিত। তোমাদের বিচার করার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে।

(সমস্বরে কয়েকজনে)

সমস্বর ঃ আমরা ওদের মুখ দেখতে চাই না। ওদের গ্রাম থেকে বের করা হোক। ওদের যোগ্য শাস্তি দেয়া হোক।

কুঁকড়্যা ঃ মাইরের বদল মাইর। ওরা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে, আমরা তার বদলা মার‍্যা লিবো।

মোড়ল ঃ দেখছ তা রহিম, তোমাদের বিষয়ে মানুষ কতো উত্তেজিত। যাহোক, ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়। এবার যদি তোমরা কথা দাও যে আর কখনও অন্যায় করবে না আর উপস্থিত সবার কাছে ক্ষমা চাও.....

কুঁকড়্যা ঃ ওসব বুঝিন্যা। এই বুটারা- পাঞ্জাবীরা তোধের বাপ। দেশের লোক ভাল লাগে না। এই দেখ শাস্তি কি দিই। (লাঠির শব্দ)

(উঃ হু-হু-রে, আঃ ওরে বাবারে)

মোড়ল ঃ থাম কুঁকড়্যা ভাই। এবারের মতো ওদেরকে ক্ষমা করা হলো। তবে জানিয়ে রাখি, মুক্তিবাহিনীর তালিকায় তোমাদের নাম দেয়া আছে, ওরা তোমাদের গতিবিধির ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সাবধান না হলে ভবিষ্যতে মারা পড়বে বলে দিলাম।

কুঁকড়্যা ঃ হ্যাঁ- তেড়িবেড়ি কইরব্যা তো মইরব্যা।

(আনোয়ারুল আবেদীন রচিত)

গ্রামবাংলা

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

মাস্টার ভাই ঃ সবাই এসে গেছে? ময়না বু'তো এখনো এলো না? রাত হয়ে যাচ্ছে, তাছাড়া শীতের মধ্যে লোকজনকে বেশীক্ষণ আটকে রাখাও যাবে না। তুমি ওদের খবর দিয়েছিলে তো?

বনি ঃ হ্যা, ভাল করে বলে দিয়েছি, কাজের কথা আছে, লোকজন আসবে, সাঁঝ লাগতেই ইদলপুরের স্কুলে চলে এসো।

মাস্টার ভাই ঃ তাহলে ওরা আসবে। যাক এবার আমরা কথাবার্তা শুরু করি। দেখ তো বাইরে কার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বনি ঃ ভালই হয়েছে, ময়না বু এসে গেছে। এসো বুবু এসো।

ময়না বু ঃ আঁধারী রাত, আসতে একটু কষ্ট হলো বাপু। হারিকেন জ্বালিয়ে আসতে পারিনি।

মাস্টার ভাই ঃ ভয়ের কি আছে? ভয়কে জয় করে চলতে হবে।

ময়না বু ঃ ভয় নয়, তবে, 'সাবধানের মার নাই।' শয়তান জল্লাদ বাহিনীর চেলাগুলো কোথায় কখন কিভাবে আসে কেউ জানে?

মাস্টার ভাইঃ ময়না বু'র কথাটা ঠিকই 'সাবধানের মার নাই।' শয়তানগুলো তো নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, মারলেই হলো। তাছাড়া মনুষ্যত্ব বলতে ওদের নাই কিছুই। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালী মারো, বাংলার শক্তিকে নিঃশেষ করে দাও।

বনি ঃ আমরাও কিন্তু কসম করেছি, ওই জানোয়ারগুলোকে না তাড়াতে পারলে, আমরাও আরাম করব না। দেখ না, দিনে মাঠে কাজ করি, রাতের বেলায় মুক্তিবাহিনীর সাথে দুশমনকে মারতে যাই।

ময়না বু ঃ এটা আমাদের করতেই হবে। দেশ যখন শত্রুমুক্ত হবে, তখন বসে বসে গল্পগুজব হৈ-হল্লা ঠাট্টা-তামাসা করা যাবে, কি বলো?

বনি ঃ আমার কথাটাও তাই। যারা আমাদের জানের দুশমন তাদের আমরা শেষ করবই।

মাস্টার ভাইঃ আজকে এই শপথ নিয়েছে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ, প্রতিটি স্তরের মানুষ আজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে।

বনি ঃ কিন্তু একটা কাজ খুব ভাল হয়েছে মাস্টার ভাই, কথায় আছে না, সাপের লেজ আর শত্রুর শেষ রাখতে নাই। মুক্তিবাহিনী একথা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে-দেশের শত্রুদালাল, এই দালালগুলোকে মেরে শেষ করছে।

ময়না বু ঃ পাকিস্তানের দালালগুলোই তো পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে ঐ জল্লাদ বাহিনীকে, ওরা কাকে চেনে বলো তো? ওরা এদেশের মানুষ, না, কাউকে চেনে? দালালারাই তো লোকজনকে চিনিয়ে দিচ্ছে, ধরিয়ে দিচ্ছে।

বনি ঃ এ জন্যেই তো আমরাও একটা একটা করে দালাল শেষ করছি। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে এতটুকু কাজ করবে, তাকে আমরা কিছুতেই রেহাই দিব না। আমরাও দালালদের চিনে চিনে মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিব।

মাস্টার ভাইঃ হ্যাঁ, দেশের এই মারাত্মক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী এবং সুযোগসন্ধানী সেইসব শয়তান, যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মানুষের নিঃসহায়তার সুযোগ নিয়ে মানুষকে জ্বালাতন করছে, তাদেরকে আমাদের খতম করতে হবে। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে- এইসব দালালদের শেষ না করলে গেরিলা বাহিনীর গোপন আস্তানাও গোপন থাকবে না। অতএব আমাদের সংগ্রামের নিরাপত্তার জন্য, সাফল্যের জন্য আমাদের ঘরের দুশমনের চিহ্ন রাখব না। এরাই হচ্ছে জাতির কলংক, এদের ঠাঁই নেই বাংলার মাটিতে।

ময়না বু ঃ ওদিকে আবার মুক্তিবাহিনীর লড়াইয়ের খবর ভাল। চট্টগ্রাম, চালনা-দুটো বন্দরেই বিদেশী জাহাজ আসতে চাচ্ছে না।

বনি ঃ কেন ময়না বু?

ময়না বু ঃ আমাদের গেরিলারা কড়া পাহারার মধ্যেও হরদম জাহাজ ডুবাতেই আছে। অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই জাহাজ এরই মধ্যে অনেকটা ডুবেছে। তাছাড়া দিন কয়েক আগে একটা তেলবাহী জাহাজও ডুবিয়ে দিয়েছে। এত কড়া পাহারার মধ্যেও এ দুর্ঘটনা ঘটাতে শয়তান পাকবাহিনী তো, হকচকিয়ে গেছে।

বনি ঃ শুধু জাহাজই না ময়না বু, লঞ্চ, নৌকা কিছুই নিরাপদ না। নৌকা করে শয়তানগুলো যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনী গুলি করে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ওদের এখন তরাস ধরে গেছে, ডাঙাতেও ভয়, পানিতেও ভয়।

ময়না বু ঃ জুলুম করার আগেই একথা ভাবা উচিত ছিল। অন্যায় করলে তার প্রতিফল পেতেই হবে। আমাদেরই টাকায় গুলি কিনে আমাদেরই খুন করবে, এতো হতে পারে না। এ জন্যেই দিন কয়েক আগে দুটো জাহাজ বাংলাদেশ থেকে পাট নেবে বলে এসেছিল, গেরিলারা ও-দুটোও ডুবিয়েছে।

মাস্টার ভাই ঃ বঙ্গবন্ধু পল্টন ময়দানে বলেছিলেন আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব'। আজ দেখো সে কথাটা কতখানি সত্য। শয়তানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে। এখন পাগলা কুকুরের মতো দিশেহারা হয়ে ছুটছে। বিদেশ থেকে সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার সম্পদ নিয়ে যে শক্তিমত্ততা দেখাতো আজ তার সেসব জারিজুরি ভেঙে গেছে।

বনি ঃ এবারে তো বাংলাদেশের মানুষ পাট ভেঙে ফেলে ধান বুনে দিয়েছিল, যার জন্য পাটের উৎপাদনও কমে গেছে অনেক।

মাস্টার ভা ঃ শুধু পাটই না-চা তামাক এগুলোরও কোন উৎপাদন নাই। চায়ের বাগানগুলো এখন মুক্তিবাহিনীর কব্জায়, যার জন্য জল্লাদ সৈন্যদের ভাগ্যে আর চা জুটছে না, এখন নিষিদ্ধ পদার্থের মতো চা খাওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে গেছে জল্লাদবাহিনীর। যে অন্যায় তারা করেছে তার তিল তিল করে শোধ তুলে দিবো আমরা।

বনি ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম মাস্টার ভাই, সেদিন তুমি বললে না, কতগুলো খানসেনা খতম হয়েছে?

মাস্টার ভাই ঃ গত এক মাসের হিসেব ২৪৭০ জন জল্লাদ সেনা, আর তাদের অফিসার খতম হয়েছে এবং রাজাকার পুলিশ মিলিয়ে খতম হয়েছে ২২০০ জন। ২৪টা সামরিক গাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে, ৫টা মিলিটারী স্পেশাল ট্রেন নষ্ট হয়েছে।

ময়না বু ঃ খুব ভাল হয়েছে-'যেমন কর্ম তেমন ফল।' বাংলাকে দেখেছে, বাংলার মানুষকে দেখেছি। বাংলার মানুষও যে প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে লড়াই করতে পারে, জুলুমের প্রতিকার করতে পারে, এবার বুঝেছে।

বনি ঃ লড়াইয়ের খবর-টবর বলো মাস্টার ভাই।

মাস্টার ভাই ঃ আমাদের মুক্তিবাহিনী একটা গুরুত্বপূর্ণ সড়কের অধিকাংশ স্থানই দখল করে নিয়েছে, সড়কটা হচ্ছে দিনাজপুর-ফুলবাড়ির মধ্যে। এই সড়কের পার্শ্বে দুশমনদের যেসব রাজাকার ছিল, এখন সেগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে, মুক্তিবাহিনীর কাজে লেগেছে। এখানের লড়াইয়ে ৪৫ জন পাকসেনা খতম এবং তিনজন আহত হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি সেক্টরেই তুমুল লড়াই চলছে।

বনি ঃ লড়াই আরো জোরদার হয়েছে। দুশমনরা পিছু হপতে শুরু করেছে। টাঙ্গাইল তো মুক্তই হয়ে গেছে মাস্টার ভাই।

ময়না বু ঃ আস্তে আস্তে সবই মুক্ত হবে বনি। ধৈর্য ধরতে হবে, মনের বল রাখতে হবে। তাই না মাস্টার ভাই?

মাষ্টার ভাই ঃ ঠিকই। লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চোটে জল্লাদবাহিনীর পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা লড়াই করছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিজের দেশকে উদ্ধার করার জন্য, আর ওদের সৈন্যরা বেতনভোগী পেশাদার সৈন্য-ডুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। দেশের জন্য যার দরদ আছে তার শক্তি ওই ভাড়াটিয়া সৈন্যদের চেয়ে দশগুণ বেশী।

বনি ঃ এটা একেবারে খাঁটি সত্য কথা। দেশকে ভালবেসে দেশের জন্য জন্য জান দিতে যাওয়া কি কম কথা মাষ্টার ভাই? এর থেকে বড় গৌরব আর কি আছে? কিন্তু এই দালালগুলো বুঝতে পারেনি সে কথা। তাই মরছেও দমাদম।

ময়না বু ঃ 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

বনি ঃ ঠিক বলেছ-ময়না বু, লোভের খেসারত দিচ্ছে। ইসাহাকের ঠ্যাং খোঁড়া হলো, সুলতানউদ্দিন মরলো, মোনেম খাঁ, একে একে সব মরবে।

মাষ্টার ভাই ঃ ফসলের জমিতে যেমন আগাছা রাখতে নাই, ঠিক তেমন একটা সমাজে বা জাতির মধ্যে বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক রাখতে নাই। যাক শোন, তোমাদের একটা কথা বলি, সবাই খেয়াল রাখবে কে আমাদের মধ্যে মোনাফেকী করার সুযোগ নিচ্ছে-তার নাম চাই, নাম দিতে হবে মুক্তিবাহিনীকে। গ্রামে গ্রামে লোক লাগাও, ময়না বু তোমার পক্ষে এ কাজটা করা অনেক সহজ, তুমি অন্দরমহলের মারফত খবর পাবে। খবরগুলো পৌঁছে দিও।

ময়না বু ঃ আচ্ছা মাষ্টার ভাই। তা মাষ্টার ভাই বলছিলাম কি, রাত তো অনেক হলো, আমি উঠি।

বনি ঃ তুমি একলাই যাবে না, আমরাও যাবো।

মাষ্টার ভাই ঃ হ্যাঁ চলো, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে, চলো আমরাও যাই।

বনি ঃ কাল সকালে তুমি একবার আমার সাথে দেখা করো, কথা আছে।

মাষ্টার ভাই ঃ চলো, যাই।

সবাই ঃ চলো।

৩০ নভেম্বর, ১৯৭১

মাষ্টার ভাই ঃ যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন মারাত্মক। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে আর পাকিস্তানী শয়তানগুলো প্রাণের ভয়ে পিছে হটে যাচ্ছে। বনি, আমাদের আরো সজাগ আরো সতর্ক হতে হবে।

বনি ঃ আমরা সতর্ক আছি মাষ্টার ভাই। মানুষের মনের শক্তি কেমন বেড়ে গেছে শুনেছ। মুক্তিবাহিনী যতোই এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ ততই যেন নতুন শক্তি অর্জন করেছে।

মাষ্টার ভাই ঃ এটা তো খুবই স্বাভাবিক বনি। বাংলার মানুষ যেমন আমাদের গেরিলাদের আশ্রয়স্থল, আমাদের গেরিলারা এবং মুক্তিবাহিনী ঠিক তেমনি বাংলার মানুষের ভরসাস্থল।

বনি	ঃ	পরশু কালিগঞ্জ গেছিলাম। মুক্তিবাহিনীর গানবোটে চড়ে। গায়ের লোক আমাদের বোট দেখে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে নদীর পাড়ে এসে হাজির, আর আমাদের দেখে কতো খুশী!...কে যায়? কে?
বসির ভাই	ঃ	আমি বসির। কে, বনি নাকি?...আরে মাস্টার ভাই দেখছি। আসসালামু আলায়কুম।
মাস্টার ভাই	ঃ	ওয়ালায়কুম আসসালাম। এসো বসির ভাই। কোথায় যাচ্ছিলে?
বসির ভাই	ঃ	ময়নাবুবুর কাছে যাচ্ছিলাম। কাল কিছু কাপড়-চোপড় ময়নাবুবু জোগাড় করেছে, মুক্তাঞ্চলের গরীব-দুঃখীকে দেওয়ার জন্য, ওগুলো নিয়ে আসি।
বনি	ঃ	আমিও কিছু জোগাড় করেছি, তাহলে তুমি সেগুলোও নিয়ে যেয়ো, আমি আবার অন্য কাজে আটকা পড়ে গেছি, সময় পাচ্ছি না।
বসির ভাই	ঃ	ঠিক আছে নিয়ে যাবো। তারপর কি গল্প করছিলে তোমরা।
বনি	ঃ	গল্প না, বসির ভাই। সত্যি ঘটনা।
মাস্টার ভাই	ঃ	বনি পরশুদিন কালিগঞ্জে গেছিল তারি গল্প করছে।
বসির ভাই	ঃ	কও শুনি। আমিও যাবো একদিন!
বনি	ঃ	যা বলছিলাম, মাস্টার ভাই, ঘাটে যখন বোট ভিড়ল, লোকে কি খুশী। এর মধ্যে এক বুড়ো মানুষ হঠাৎ বলে উঠল 'বাপুরে, আজ তোমাদের গানবোট দেখে আমরা ছুটে আসছি তোমাদের দেখার জন্য। আর দুদিন আগে ওই শয়তানের বাচ্চারা যখন আসত, নদীর দুই পাড়ে গাঁয়ের লোক কে যে কোথা পালাবে, তার হিসাব পেতো না। মেশিনগান ফিট করে রাখতো। সমানে গুলি চালাতো পাড়ে, কে মরবে, কে বাঁচবে, বলা মুস্কিল ছিলো।
মাস্টার ভাই	ঃ	মানুষের মনে ভয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এলাপাতাড়ি গুলি চালাতো, সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কিছু যেতো-আসতো না- কিন্তু আজ শয়তানরা বুঝতে পেরেছে, বাংলার মানুষ তাদের চরম ঘৃণা করে। মুক্তিবাহিনীকে পরম আদরে তারা ডেকে নেয়, কিন্তু জল্লাদদের দেখলে ঘৃণায় মরে যায়।
বসির ভাই	ঃ	কথাটা কিন্তু ঠিক। অত্যাচার করে যে মানুষের মুক্তির ইচ্ছাকে দমানো যায় না সেটা শয়তানগুলো বুঝেছে।
মাস্টার ভাই	ঃ	আর আজ বেঈমানের জাতগুলো তাই 'পোড়া মাটি নীতি' অবলম্বন করেছে। তারা যে অঞ্চল ছেড়ে পিছু হটে যাচ্ছে সে অঞ্চলটা সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ধান-চাল লুটপাট করে দিয়ে যাচ্ছে, বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে।
বনি	ঃ	তাতেই কি মানুষকে কোনদিন দাবিয়ে রাখতে পারবে?
মাস্টার ভাই	ঃ	না, মোটেই না। এ জন্যই তো আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমাদের আ দাবিয়ে রাখা যাবে না।
বসির ভাই	ঃ	মাস্টার ভাই, চলো না হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে যাই, ময়না বুবুর ওখানে।

বনি ঃ কথাটা ঠিকই বলেছ বসির ভাই। চলো মাস্টার ভাই ময়না বুবুর ওখানেই যাই, কাজের কথাও হবে, একটু গল্প করাও যাবে।

বনি ঃ ময়না বু....ও ময়না বু।

ময়না বু ঃ কে? বনি নাকিরে- আরে ভাই, কাজ করছি।

বসির ভাই ঃ আমরাও এসে গেছি ময়না বু,

ময়না বু ঃ এসো এসো, মাস্টার ভাইও দেখছি, বসো।

মাস্টার ভাই ঃ কাপড়-চোপড় তো অনেক জোগাড় হয়েছে দেখছি ময়নাবুবু। ভালই করেছ। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবন তো ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটছে, মুক্ত হওয়ার পর মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। অধিকৃত অঞ্চলে মানুষের জীবন কাটছে একটা বিভীষিকাময় ঘোরের মধ্যে। স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, ঘুম নাই, আরাম নাই। এদিকে শয়তানগুলো আর রাজাকার- বদর বাহিনীর জানোয়ারগুলো মানুষের ঘর থেকে তাদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গেছে। তাদের জীবন-ধারণের জন্য ন্যুনতম অন্ততঃ কিছু করতেই হবে। ময়না বু আমি কিছু জিনিস, ঔষধপত্র আর কাপড়-চোপড় জোগাড় করে দেবো।

ময়না বু ঃ আমরা তো মানুষের সেবা করতে পারি। তাই এই সেবার ভারটা আমি হাতে তুলে নিয়েছি।

মাস্টার ভাই ঃ আজ বাংলা মা-বোনেরা এভাবেই তো দেশের সেবা করছে, সেবা করার জন্য এগিয়ে এসেছে ময়নাবুবু। আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যে যা কাজ করতে পারে, সে তাই করবে। যেকোন কাজ দ্বারাই মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করা যায়। যে মুক্তিবাহিনীর জন্য মরচা খোঁড়ে, তাদের শত্রুর অবস্থানের খবর এনে দেয় অথবা মুক্তিবাহিনীর গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যায়, সেও মুক্তিসংগ্রামের সামিল, সেও মুক্তসংগ্রামকে সাহায্য করছে।

ময়না বু ঃ যুদ্ধের খবর-টবর কিছু বলো মাস্টার ভাই।

বনি ঃ তাহলে আমিই বলি- যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে তুমুল লড়াই চলছে। ক্যান্টনমেন্টের উপর চরম আঘাত হানছে। এদিকে আবার জল্লাদবাহিনী মসজিদে মসজিদে ওদের জন্য দোওয়া করতে বলেছে। বেটারা মরে মরে ভূত হচ্ছে আর আতংক বাড়ছে।

বসির ভাই ঃ নোয়াখালীর কথা শুনেছ? মুক্তিবাহিনী বিলোনিয়া দখল করে এখন ফেনীর দিকে এগিয়ে চলেছে। পথে ছাগলনাইয়া দখল করে নিয়েছে। ছাগলনাইয়া ফেনী থেকে মাত্র চার মাইল দূরে।

ময়না বু ঃ এদিকে তো আমি শুনলাম, পঁচাগড়া মুক্তিবাহিনীর দখলে আর সেটা দখল করার জন্য পাক ফৌজ খুবই চেষ্টা চালাচ্ছে।

বসির ভাই ঃ চেষ্টা তো করবেই, কিন্তু পারলে হয়। মুক্তিবাহিনী যেখানে মুক্ত করছে, তাদের ঘাঁটি শক্ত করছে।

ময়না বু ঃ ঢাকা শহরে তো হরদম বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। কয়েকটি পেট্রোল বোমার আগুনে রেলসেতুগুলোর চরম ক্ষতি হয়েছে।

মাস্টার ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী এখন প্রতিটি সেক্টরে তৎপর। রাস্তা-রেল-নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম-অধিকৃত অঞ্চলে পঞ্চাশ থেকে একশ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে গেছে।

সমস্ত শহরের চারিদিকে পরিখা খোঁড়া হয়েছে। দোকানপাট সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় তো জোর গুজব দু'হাজার মুক্তিসেনা প্রস্তুত, যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বসির ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী এদিকে ঝিনাইদহ পাঁচমাথার মোড় দখল করে নিয়ে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছে।

বনি ঃ এদিকে তো আর দু'চারদিনের মধ্যেই রাজশাহী-নবাবগঞ্জ দখল হওয়ার উপক্রম। মুক্তিবাহিনী ১৭ জন রাজাকার, তিনজন পাকসেনা বন্দী করে এনেছে। আর বহু রাইফেল আর গুলি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

ময়না বু ঃ এর জন্যই তো শয়তানগুলো এখন পালাবার পথ খুঁজছে।

মাস্টার ভাই ঃ পালাবে আর কোথায়? এখন ওরা সবাই আশ্রয় নিতে চাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টগুলোয়। আর মুক্তিবাহিনী তাদের সে পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এখন শয়তানগুলো ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বাংলাদেশের পথে-ঘাটে মুক্তিবাহিনীর হাতে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরছে। পাকিস্তানী ৬০টা ট্যাংকের মধ্যে ১৭টাই তো মারা পড়েছে। বিমান বহরের ১৮টা বিমানের মধ্যে পাঁচটা নেই। নদী-আকাশপথ আর সড়কে কোথাও নিস্তার নেই শয়তানদের।

ময়না বু ঃ সংঘবদ্ধ মুক্তিকামী মানুষের শক্তি যে কি প্রচণ্ড তার প্রমাণ পাচ্ছে শয়তানরা এখন।

বনি ঃ আরো পাবে বুবু, কিন্তু সেদিন আর বেশী দূরে নয়।

বসির ভাই ঃ যাক ময়না বুবু, কথাবার্তা তো হলো, এবার কাপড়-চোপড়গুলো দাও, আমাদের আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলে যাবো।

ময়না বু ঃ এই যে দিচ্ছি ভাই।-নাও, কাল আরো কিছু পাবো, পরশু এসে নিয়ে যেয়ো।

বসির ভাই ঃ আচ্ছা।

মাস্টার ভাই ঃ চলো, আমরা তাহলে যাই। বুবু চলি।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

মাস্টার ভাই ঃ এখন আমাদের দুর্যোগময় রাতের অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে। এখন আমাদের মুক্তিবাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। শত্রুশিবির একের পর এক মুক্তিবাহিনীর পদদলিত হচ্ছে। মুক্তাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটছে দিনের পর দিন। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ এখন ফেলছে স্বস্তির নিঃশ্বাস। মুক্তাঞ্চল দিয়েছে তাদের নতুন জীবনের আশ্বাস। আজ আমরা জমায়েত হয়েছি দুটো কারণে। একটা হলো- আমরা মুক্তিবাহিনীকে কিভাবে আরো সাহায্য করতে পারি তারই পরিকল্পনা নিতে হবে এবং দ্বিতীয়টা হলো- সদ্য মুক্তাঞ্চলের বিপর্যস্ত জীবনধারা আমরা আবার স্বাভাবিক এবং সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারি। এ কাজ নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তার জন্য চিন্তা আমরা করি না, কেননা মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তি আপন আপন দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান, সচেষ্ট এবং উন্মুখ। আমরা গভীরভাবে আমাদের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাসী।...কি ব্যাপার বসির ভাই কিছু বলবে নাকি?

বসির ভাই ঃ পাকিস্তানী জল্লাদগুলো নিজের ঘাঁটি ছেড়ে পালাবার সময় আশেপাশের গ্রাম-বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। এর জন্য আমরা কি করব? আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি, আমাদের বলো।

বনি	ঃ	হ্যাঁ মাষ্টার ভাই, বসির ভাই ঠিকই বলেছে। প্রত্যেকটা জায়গায় একই রকম অন্যায় করছে ওরা। আমাদের বুদ্ধি দাও কিভাবে সাহায্য করব আমরা।
মাষ্টার ভাই	ঃ	নানাভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা। প্রথমতঃ যেসব অঞ্চলে ওরা এমন অত্যাচার করছে, বা করেছে সেখানের খুঁটিনাটি খবরাখবর আর ক্ষতির পরিমাণ জানতে হবে। তারপর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অত্যাচারিত মানুষকে আশু সাহায্য করতে হবে। অসুস্থ-আহত লোকদের চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র নিয়ে যেতে হবে।
ময়না বু	ঃ	আমি কিন্তু আরো কিছু ওষুধপত্র , কাপড়-চোপড় জোগাড় করে রেখেছি। আমাকে খবর দিলেই আমি লোকজন নিয়ে সংগে সংগে চলে যাবো।
মাষ্টার ভাই	ঃ	তাহলে সবাই প্রস্তুত। প্রতিটি মানুষকে খবর দিয়ে রাখো। যে ছোট ছোট দল ভাগ করে কাজের ভার দেয়া হয়েছে, তাদের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত থাকবে।
বসির ভাই	ঃ	সে কথা বলে দিয়েছি মাষ্টার ভাই। ইতি মধ্যেই কয়েকটা সাহায্যকারীদল চলে গেছে। ওষুধপত্র, কাপোড়-চোপড়ও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছু জোগার করে রেখেছি।
মাষ্টার ভাই	ঃ	খুব ভালো করেছ। লড়াই যে ভাবে তীব্রতর হচ্ছে, তাতে বিজয়ের দিন আমাদের সুদূর নয়। জল্লাদবাহিনীর বিষদাঁতগুলো একের পর এক ভেঙে আমরা মুক্ত করব বাংলাদেশ।
বনি	ঃ	এদিকে তো মুক্তিবাহিনী যশোর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর জেলার আরো কয়েকটি থানা দখল করে নিয়েছে।
বসির ভাই	ঃ	শুধু তাই নাকি? গেরিলা আক্রমণে হেরে গিয়ে পাকফৌজ যশোর শহর থেকে পাকবাহিনীর সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে মাগুড়া শহরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
ময়না বু	ঃ	মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকফৌজ এখন চেঁচাচ্ছে 'পালাও, পালাও'। এখন ওরা যাযাবরের মতো আজ এ শহরে কাল ও শহরে পালাবে, শেষে পালাবার যখন আর পথ থাকবে না তখন কি করবে?
বনি	ঃ	তখন বঙ্গোপসাগরে-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ধলেশ্বরী-মহানন্দা-আত্রাই আর পুনর্ভবায় ইঁদুরের মতো ডুবে মরবে। আর তা না হলে এখন যেমন মাঝে মাঝেই ধরা দিচ্ছে, তখন মুক্তিবাহিনীর কাছে দলে দলে ধরা দেবে।
ময়না বু	ঃ	সাহায্যের সব রাস্তাগুলোই তো বন্ধ হয়ে গেছে। নদীপথ, সড়ক আর রেলপথে যোগাযোগ তো বন্ধ, এদিকে আবার বিমানপথও বন্ধ হবার উপক্রম। গেরিলারা লালমনিরহাট বিমানবন্দর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।
মাষ্টার ভাই	ঃ	যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শয়তানগুলোর এখন আর অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না, তখন হবে হয় মৃত্যু, নয় আত্মসমর্পণ। এ ঘটতেই হবে, হতে বাধ্য। ইতিহাসের লিখন মর্মান্তিকভাবে ওদের যে পরাজয় লিখে রেখেছে, তাতে হানাদারদের নিঃশেষ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।
বনি	ঃ	এদিকে শুনেছ গেরিলা বাহিনী নাগেশ্বরী থানাটা দখল করে নিয়ে লালমনিরহাট বিমানবন্দরটা ঘিরে ফেলেছেন, এখান থেকে হানাদারদের জন্য বিমান চলাচল বা বিমানের সাহায্যে কোন সাহায্যদ্রব্য পাঠানো একেবারে বন্ধ-

বসির ভাই ঃ গত বুধবার মুক্তিবাহিনী সিলেটের শমসেরনগর বিমানঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছেন। রংপুরের ধরলা নদীর উপরে তারা শক্তি সঞ্চার করে হানাদারদের আঘাত হানার জন্য দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার ভাই ঃ মুক্তিবাহিনী খুলনার সাতক্ষীরা শহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে এবং ফেনীর কমলপুরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা যশোর জেলার সাদিপুর, ঝিনাইকুণ্ড এবং জামিরা এলাকা থেকে দখলদার সৈন্যদের বিতাড়িত করেছে।

ময়না বু ঃ মুক্তিবাহিনী দিনাজপুর জেলার বোদা থানা সদর দখল করে নিয়েছে। পচাগড় থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এই বোদা থানা। এখন মুক্তিবাহিনী তীব্রগতিতে ঠাকুরগাঁয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে দখল করে নিয়েছে। এদিকে আবার ময়দানদীঘি এলাকাটা হানাদার বাহিনীর হাতে থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছে।

বনি ঃ মুক্তিবাহিনী এখন যেখানে আঘাত হানছে সেখান থেকেই শয়তানরা পিছু হটছে। সময় হয়ে গেছে, বাছাধনরা খাওয়া-দাওয়া ভুলে এখন 'ইয়া নফসী, ইয়া নফসী' শুরু করেছে।

বসির ভাই ঃ বনি, একটা সুন্দর আলোচনা হচ্ছে। তার মধ্যে শুরু করেছ ফাজলামি, তোমাকে কতবার বলা হয়েছে, এখন ঐসব হালকা কথাবার্তা বলবে না।

মাস্টার ভাই ঃ যাক তোমরা দুজনেই থামো, মুক্তিবাহিনী কুমিল্লা জেলার তিনটে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে। শয়তানদের বাইরের সংগে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। এই এলাকাগুলো হলো গংগাসাগর এবং রাজারকোট।

বসির ভাই ঃ যশোর সেক্টরে মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে নাভারন-সাতক্ষীরা রোডটি থেকে পাক জল্লাদবাহিনীদের সরিয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরা শহর থেকে তিন মাইল দূরে ভোমরা-সাতক্ষীরা রোডে হানাদারদের সংগে মুক্তিবাহিনীর জোর লড়াই চলছে।

বনি ঃ কুষ্টিয়া জেলার কথাও শোন তাহলে। জীবননগর তো মুক্তিবাহিনীর দখলে; এদিকে আবার জীবননগর থানার উত্তর-পূর্বে আন্দুবাড়িয়া এখন মুক্তিবাহিনীর দখলে। চুয়াডাঙ্গা দখলের ব্যাপার নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সংগে-প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

মাস্টার ভাই ঃ মারো আর তাড়ো। কথাটা ঠিকই। বগুড়া জেলায় মুক্তিবাহিনী আরিয়াকান্দি থানায় ২২ জন পাক দস্যুকে খতম করেছে। আর বেঁচেছিল দুজন, তারা আবার পালাতে না পেরে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ময়না বু ঃ পাক জানোয়ারগুলো যেখানে না পারছে, সেখানেই বিমান আক্রমণ চালিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষদের মারছে, তাদের বাড়িঘর নষ্ট করে ফেলছে।

মাস্টার ভাই ঃ কিন্তু তাতেই কি বাংলাদেশের মানুষের মনোবল ভাঙতে পারবে? পারবে না। কোনদিন ওরা সক্ষম হবে না। বাংলার মানুষের মন আরো সবল, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। শত দুঃখ কষ্টেও বাংলার মানুষ ভেঙে পড়বে না।

বনি ঃ বাংলার মানুষ এবং মুক্তাঞ্চলে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করেছে; চাষবাস করছে, ফসল কাটছে, ফসল তুলছে ঘরে।

মাস্টার ভাই ঃ এদিকে আরেক খবর শুনেছ? ঢাকার বেতার কেন্দ্র, পাকিস্তানের প্রলাপের ভাণ্ডার একদম বন্ধ হয়ে গেছে। গেরিলাবাহিনীর আক্রমণে শেষ পর্যন্ত ওদের দালালী কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বসির ভাই ঃ ওদের হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে, গলার স্বরও বন্ধ হয়ে আসবে। হতেই হবে।

মাস্টার ভাই ঃ যাক, যুদ্ধের আলোচনা হলো, আমরা খবরাখবর তো শুনলাম, এবার আমরা আমাদের অন্য আলোচনায় আসি।

ময়না বু ঃ বলো মাস্টার ভাই। আমরাও কাজের কথা শুনি।

মাস্টার ভাই ঃ ময়না বু শোন, মেয়েদের কাজ প্রচুর আছে। তোমরা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানুষকে সান্ত্বনা দেবে। নতুন করে গেরস্থালী যারা গুছিয়ে নিচ্ছে, তাদের সাহায্য করবে। মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়া বা তার ভাঙা সংসার গড়ে তোলার কাজে তোমরা সাহায্য করতে পারবে সবচেয়ে বেশী। এ কাজের ভারটা তোমাদেরই নিতে হবে। তা ছাড়া শয়তানদের বোমায় আহত বা যুদ্ধে আহত মানুষের সেবা করার দায়িত্বও তোমাদের নিতে হবে। আশা করি এ কাজটা ভালই পারবে তোমরা, তাই না?

ময়না বু ঃ হ্যাঁ, মাস্টার ভাই। খুব ভালভাবে পারব। আমি আমার দলবল নিয়ে এই কাজই করছি, দরকার হলে আরো কয়েকজনকে নিয়ে নিবো।

মাস্টার ভাই ঃ বসির ভাই, বনি-তোমাদের কাজ হবে আহত অসুস্থ মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা, মানুষের ঘরবাড়ি তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং খাদ্য এবং আশ্রয়হীন মানুষের জন্য খাদ্য এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

বসির ভাই ঃ বনি, তাহলে আমি উত্তর পাড়ায় যাচ্ছি, ওখানেই কাজ করব, আর তুমি তোমার ছেলেদের নিয়ে পূর্বপাড়ায় চলে যাও।

বনি ঃ হ্যাঁ, আমি পূর্বপাড়ায় থাকবো, মাস্টার ভাই তুমি আসবে তো? আমাদের মাঝে মাঝে বুদ্ধি-সুদ্ধি দিবে, কিভাবে কাজ করলে সুবিধা হবে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিবে।

মাস্টার ভাই ঃ নিশ্চয় আমি সব জায়গায় যাবো, আমি সবসময় তোমাদের সংগে সংগে থাকবো, আর শোন, কাল আবার এ সময় এসো, কতগুলো নির্দেশ আছে, সেগুলো জানিয়ে দেবো। আর একটা কাজ করো, মানুষের মনোবল অটুট রাখার জন্য তাদের সংগে গল্পগুজব করবে, যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। আর হ্যাঁ, শয়তানদের ঘাঁটির খবরাখবর, ওদের চলাফেরার খবরগুলো কিন্তু অবশ্যই জোগাড় করবে।

বনি ঃ ঠিক আছে, তাহলে আমরা যাই। ময়না বু চলো যাই, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি যাবো।

ময়না বু ঃ চলো উঠি, মাস্টার ভাই তাহলে গেলাম।

মাস্টার ভাই ঃ আচ্ছা।

বসির ভাই ঃ তাহলে মাস্টার ভাই, চলো আমরাও যাই।

মাস্টার ভাই ঃ চলো।

(রচনা ও পরিচালনাঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
১৯। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান	---	...১৯৭১

(এক)

জয় বাংলা বাংলার জয়।।
হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এই তো সময়।।

বাংলার প্রতিঘর ভরে দিতে
চাই মোরা অন্নে।
আমাদের রক্ত টকবক দুলছে
মুক্তির রিক্ত তারুণ্যে।।

নেই--ভয়
হয় হউক রক্তের প্রখ্যাত ক্ষয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
অশোকের ছায় যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ।
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ।।
শাসনের নামে চলে শোষণের
সুকঠিন যন্ত্র।
বজ্রের হুংকারে শৃংখল ভাংতে
সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র।

আর--নয়
তিলে তিলে মানুষের এই পরাজয়
আমি করি না করি না করি না ভয়।
জয় বাংলা বাংলার জয়।।

(কথা-গাজী মজহারুল আনোয়ার)

(দুই)

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ।।

যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদী জলে ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে নদীর নীল অম্বরে মোর মেলছে পাখা
সারাটি জীবন সে মাটির গানে অস্ত্র ধরি।।

নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি-
মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি
মোরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি
মোরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি।।

যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে
যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভুলে
যে গৃহকপোত সুখ স্বর্গের দুয়ার খুলে
সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি।।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি সুখের হাসির জন্য আজি অস্ত্র ধরি।।

(কথা-গোবিন্দ হালদার)

(তিন)

আমি এক বাংলার মুক্তি সেনা
মৃত্যুর পথ চলিতে
কভু করি না ভয় করি না।
মৃত্যুরে পায়ে দলে চলি হাসিতে।
দুঃসহ জীবনের রাহু মুক্তি
প্রাণে মেখে সূর্যের নবশক্তি
বজ্রশপথে নেমেছি যুদ্ধে
বাঙ্গালীর জয় হবে নিশ্চয়
চলেছে এ দুর্জয় মুক্তির পথে।

বাংলার তরে আমি সঁপেছি এ মন
নেই জ্বালা হাহাকার নেই হুতাশন।
রক্তে রাঙা আজ বিপ্লবী মন
ক্ষমা নেই বাংলার গণদুশমন
বজ্রের তূর্যের মন্ত্রে
মারবো এবার মরবো না আর
চলেছি যে শত্রুকে পায়ে দলিতে।

(কথা-নেওয়াজিস হোসেন)

(চার)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শোধবে তারা
ও জনতা এই জনতা এই জনতা।।
তোমার সভায় আমীর যারা,
ফাঁসির কাঠে ঝুলবে তারা।
তোমার রাজা মহারাজা,
করজোড়ে মাগবে বিচার।
ঠিক যেন তা এই জনতা।।

তারা নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে।
তারা ক্ষুদিরামের রক্তে ভিজে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে।
তারা ফাঁসির কাঠে জীবন দিয়ে
প্রাণ পেয়েছে প্রাণ পেয়েছে।।
তারা গুলির ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে,
প্রাণ পেয়েছে এই জনতা।
নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে।
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে।।
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।

রক্ত দিয়ে শোধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা।
ঠিক যেন তা এই জনতা।।

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।।

(কথা- সলিল চৌধুরী)

(পাঁচ)

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি
বলো যতো খাঁটি
তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটিরে
আমার জন্মভূমির মাটি।।

ধন জন মন যত ধন দুনিয়াতে
হয় কি তুলনা বাংলার কারো সাথে।
কত মার ধন মানিক রতন
কত জ্ঞানীগুণী কত মহাজন।
এনেছে আলোয় সূর্য এখানে
আঁধারের পথ পাতি রে
আমার বাংলা ... ... ।।

এই মাটির তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক, শফিক, বরকত কত নাম
কত তিতুমীর, কত ঈশা খান
দিয়েছে জীবন, দেয়নি তো মান।

রক্ত শয্যা পাতিয়া এখানে
ঘুমায়েছে পরিপাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।

(কথা-আবদুল লতিফ)

(ছয়)

ছোটদের বড়দের সকলের
গরীবের নিঃস্বের ফকিরের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।।

নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান দেশ মাতা এক সকলের
লাঙ্গলেরা সাথে আজ চাকা ঘুরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা সে যে কোন প্রাণে
মসজিদ, মন্দির, গীর্জার আবাহনে
বাণী শুনি একই সুরের ।।

চাষাদের মুজরের ফকিরের
ফকিরের নিঃস্বের গরীবের
আমার এ দেশ, সব মানুষের, সব মানুষের।
বড়দের ছোটদের সকলের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার এদেশ সব মানুষের ... ।।
(কথা ও শিল্পী-রথীন্দ্রনাথ রায়)

(সাত)

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই।।

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাসের নির্মোক কাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।

প্রতারণা প্রলোভন প্রলোপ
হোক না আঁধার নিশিছদ্র
আমরা ত সময়ের সারথী
নিশিদিন কাটাবো বিনিদ্র।

দিয়েছি ত শান্তি আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত সম্ভ্রম আরো দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত

হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত
অবিরাম যাত্রা চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।।

হতে পারি পথভ্রম আরও বিধ্বস্ত
ধিকৃত নয় তবু চিত্ত
আশায় ত সুস্থির লক্ষ্যের যাত্রী
চলবার আবেগেই তৃপ্ত।

আমাদের পথরেখা দুস্তর দুর্গম
সাথে তবু অগণিত সঙ্গী
বেদনার কোটি কোটি অংশী
আমাদের চোখে চোখে লেলিহান অগ্নি
সকল বিরোধ বিধ্বংসী।

এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনদিন আমরা যে ভাঙবোই
মুক্ত প্রাণের সাড়া আনবোই।

আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন অগ্নিশিখা জলবেই
চলবেই চলবেই
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

(কথা-সিকান্দার আবু জাফর)

(আট)

মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
অনাচার অবিচার শোষণের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ-বিক্ষোভ-ঝংকার-হুংকার
আমরণ সংঘাত, প্রচণ্ড উদ্দাম
সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম!]

ক্ষমতা দম্ভ লোভ সালসায় যারা
জনতার অধিকার করে খর্ব
ঘরে ঘরে গড়েছি দুর্জয় প্রতিরোধ দুর্গ
তাদের আজ প্রতিহত করবোই করবো।

যারা মানুষের রক্ত চোষে,
মানুষের মাঝে আনে ব্যবধান
যারা পৃথিবীর কলঙ্ক কালিমা,
কেড়ে নেয় মা-বোনের সম্মান
এসো রক্তশপথে আজ আঘাতে আঘাতে
তাদের করি খান খান-

বঁচার জন্য ভয় সংশয় রেখে
প্রতিজ্ঞা করেছি আজ মোরা লড়াবো
কাটিয়ে জীবনের দুঃখ ঝরা রাত্রি
নতুন এক পৃথিবী গড়বোই গড়বো।

(কথা-শহীদুল ইসলাম)

(নয়)

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর
পারি দিবরে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে।।
জীবন কাটি যুদ্ধ করি
প্রাণের মায়া সঙ্গ করি
জীবনের সাধ নাহি পাই।

ঘর-বাড়ির ঠিকানা নাই
দিন-রাত্রি জানা নাই
চলার ঠিকানা সঠিক নাই।।

জানি শুধু চলতে হবে
এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে।।

জীবনের রঙে মনকে টানে না
ফুলের ঐ গন্ধ কেমন জানি না
জ্যোৎস্নার দৃশ্য চোখে পড়ে না
তারাও তো ভুলে কভু ডাকে না।।

বৈশাখেরই রৌদ্র ঝড়ে
আকাশ যখন ভেঙে পড়ে
ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে যায়।।

হাতছানি দেয় বিদ্যুৎ আমায়
হঠাৎ কে যে শান্ত সোনার
দেখি ঐ ভোরের পাখী গায়।।

তবু তরী বাইতে হবে
খেয়া পারে নিতে হবে
যতই ঝড় উঠুক সাগরে।
তীরহারা এই ঢেউয়ের
সাগর পারি দিব রে।।

(শিল্পীঃ আপেল মাহমুদ ও সঙ্গীরা)

(দশ)

অবাক পৃথিবী দেখো
রূপসী বাংলা রুদ্র মূর্তি আজ।।

তোমরা চিনতে মায়াভরা সেই বাংলাকে
তোমরা জানতে শস্য শ্যামলা বাংলাকে
সেই সে বাংলা আজ হয়েছে ক্ষুধার রাজ।।

যে দেশ ছিল সোনার ফসলে ভরা
যে দেশ ছিল নীল নভঃনীলে ঘেরা
আঘাতে আঘাতে সেই পলিমাটি চৌচির হলো আজ।।

যে মায়াকুঞ্জ একদিন ছিল পাখীর কুজনে ভরা
যে সহজ মন একদিন ছিল স্নেহ প্রীতি মায়া ঘেরা
সে হৃদয় যন্ত্রে আজ গরজে উঠেছে বাজ।।

(কথাঃ নূরে আলম সিদ্দিকী)

(এগার)

রক্তেই যদি ফোটে
জীবনের ফুল
ফুটুক না, ফুটুক না, ফুটুক না।।

আঘাতেই যদি বাজে
প্রভাতের সুর
বাজুক না, বাজুক না, বাজুক না।।

গান গান গান বেজেছে অগ্নি গান
দূর সব ব্যবধান
সাত কোটি প্রাণ বিসর্জনে
বাংলার গ্লানি ঘুচুক না, ঘুচুক না।।

এক এক এক
হয়েছি সবাই এক
আসুক দুর্বিপাক
ক্ষুব্ধ মিছিল চলবেই চলবে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠুক না, উঠুক না।।

(কথাঃ সৈয়দ শামসুল হক)

(বারো)

নোঙর তোল সময় যে হোল হোল
হাওয়ার বুক নৌকা এবার
জোয়ারে ভাসিয়ে দাও
শক্ত মুঠি বাঁধবে বজ্র বাঁধিয়া নাও
সমুখে এবার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা ভোল
দূর দিগন্তে সূর্য রথে
দৃষ্টি রেখেছ স্থির
সবুজ আশার স্বপ্নেরা আজ
নয়নে করেছে ভিড়
হৃদয়ে তোমার মুক্তি আলো
আলোর দুয়ার খোল।

(কথাঃ নঈম গওহর)

(তেরো)

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো, এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে জেগেছে কাঁপন
আয়রে বাঙালী ডাকিছে রণ।।

ঘরে ঘরে ঐ জ্বলছে অগ্নিশিখা
শহীদের খুনে লিখতে রক্ত লেখা
আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গেছে পাহাড়
ভেঙ্গেছে ওরে বন্ধুগণ।।

দিকে দিকে তোরা আয়রে সর্বহারা,
মুক্তি শপথ ভেঙ্গেছে বন্দী কারা।।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে পথের বাঁধন
ওরে ও বাঙ্গালী শোনরে শোন।।

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো এর জীবন পণ।

(কথাঃ টি, এইচ, শিকদার)

(চৌদ্দ)

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল
জোয়ার এসেছে পরশ মনে
রক্ত লাল, রক্ত লাল, রক্ত লাল।।
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল,
হয়েছে কাল, হয়েছে কাল।।

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুন প্রতরোধ গড়ে
নয়া বাংলার নয়া শ্মশান, নয়া শ্মশান।

আর দেরী নয় উড়াও নিশান
রক্তে বাজুক প্রলয় বিষাণ
বিদ্যুৎ গতি হউক অভিযান।
ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রুজাল, শত্রুজাল।।
(কথা-গোবিন্দ হালদার, সুর-সময় দাস)

(পনেরো)

এক সাগর রক্তে বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

দুঃসহ এ বেদনার কণ্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।

যুগের নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না।।

কিষাণ কিষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতান
বাউলের একতারাতে
আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত হবে।
নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে
আমরা তোমাদের ভুলব না।।
(কথা-গোবিন্দ হালদার, সুর ও শিল্পী-স্বপ্না রায়)

(ষোল)

সালাম সালাম হাজার সালাম
সকল শহীদ স্মরণে,
আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই
তাদের স্মৃতির চরণে।।

মায়ের ভাষায় কথা বলাতে
স্বাধীন আশায় পথচলাতে
হাসি মুখে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
সেই স্মৃতি নিয়ে গেয়ে যাই গান
তাদের বিজয় মরণে।।

ভাইয়ের বুকের রক্তে আজিকে
রক্ত মশাল জ্বলে দিকে দিকে
সংগ্রামী আজ মহা জনতা
কণ্ঠে তাদের নব বারতা
শহীদ ভাইয়ের স্মরণে।।

বাংলাদেশের লাখো বাঙালী
জয়ের নেশায় চলে রক্ত ঢালি
আলোর দেয়ালী ঘরে ঘরে জ্বালি
ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালি-
শহীদ স্মৃতি বরণে।।
(কথা-ফজল-এ খোদা)

(সতেরো)

সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের
শ্মশান করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত
জবাব দিতে হবে।।

শ্যামল বরণী সোনালী ফসলে
ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সদা ব'য়ে যেত
পূর্ত অমৃত ধারা
অগ্নিদাহনে সে সুখ স্বপ্ন
দগ্ধ করেছে কে?
আমরা চেয়েছি ক্ষুধার অন্ন
একটি স্নেহের নীড়
নগদ পাওনা হিসেব কষিতে
ছিল না লোভের ভীড়।।\

দেশের মাটিতে আমরা ফলাবো
ফসলের কাঁচা সোনা
চিরদিন তুমি নিয়ে যাবে কেড়ে
হায়রে উন্মাদনা
এই বাঙালীর বুকের রক্তে
বন্যা বহালো কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত
জবাব দিতে হবে।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-মকসুদ আলী খান সাঁই)

(আঠারো)

সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে,
বন্ধুগো এসো হয়েছে সময়,
পথ যে তোমায় ডাকছে।।

বন্ধুগো আজ চেয়ো না পিছে,
আজকে শঙ্কা করো না, মিছে,
বাংলার মাটি, বাংলার তৃণ,
তোমাদেরই কথা বলছে।।

বন্ধু অনেক বেদনা সয়েছি,
অনেক হয়েছি কাতর,
বন্ধু ভুলেছি বেদনা এবার
হৃদয় করেছি পাথর।।

রক্তের দাম চাইনাকো আর
আজকে দেখুক বিশ্ব আবার,
বাংলার প্রাণে, বাংলার গানে
আগুনের শিখা জ্বলছে।।

(কথা-সারওয়ার জাহান)

(উনিশ)

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল
মারীভয় সংশয় ত্রাসে
অতিকায় অজগর গ্রাসে
মানুষের কলিজা
ছেঁড়া খোড়ে খাবলায়
খাবলায় নরপাল।।

ঘুম নয় এই খাঁটি ক্রান্তি
ভাঙো ভাই খোয়ারির ক্লান্তি
হালখাতা বৈশাখে
শিষ দেয় সৈনিক হরিয়াল।।

দুর্বার বন্যার তোড়জোড়
মুখরিত করে এই রাঙা ভোর
নায়ে ঠেলা মারো হেই এইবার
তোলো পাল তোলো পাল ধরো হাল।।

কড়া হাতে ধরে আছি কবিতার
হাতিয়ার কলমের তলোয়ার
সংগ্রামী ব্যালাডে
ডাক দেয় কমরেড কবিয়াল।।

(আবু বকর সিদ্দিক)

(কুড়ি)

শোনন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠো পথে,
আবার এসে ফিরে যাবো আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো।
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ।।

বিশ্ব কবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।
‘জয় বাংলা’ বলতে মনরে আমার এখনো কেন ভাবো,
আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিন মণি।

(কথা-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর ও শিল্পী-অংশুমান রায়)

(একুশ)

অত্যাচারীর পাষাণ কারা জ্বালিয়ে দাও।
সভ্যতার ওই বধ্যভূমি জ্বালিয়ে দাও।
শত্রহনন চলছে দিকে দিকে
সকল যুগের নিপীড়িতের পক্ষ থেকে

আপোষহীন সংগ্রামের
শেষ কথাটি জানিয়ে দাও

অসূরের হাড়কাঠে
তোর পায়ের ধূলিঝড়
ওরে লাগুক,
লাগুক ভয়ঙ্কর-

খুনের বদলা খুন নেবো
খুন নেবো আজ
রক্ত লোভীর খুনী পাঁজর ভেঙ্গে
হানাদারের কলজে ছিঁড়ে
খুনের আগুন জ্বালিয়ে দাও।

(কথা-আল মুজাহিদী)

(বাইশ)

আমার নেতা শেখ মুজিব,
তোমার নেতা শেখ মুজিব,
দেশের নেতা শেখ মুজিব,
দশের নেতা শেখ মুজিব,
আহা বাংলা মা'র কোল কইরাছে উজল।
ওরে মনের আশা আল্লায় তাঁরে কইরা দিক সফল রে
আশার আরো করতাছে ঝলমল,
ও দ্যাখো আশার আলো করতাছে ঝলমল।।

আমার নেতা শেখ মুজিব,
দিশার নেতা শেখ মুজিব,
যুগের নেতা শেখ মুজিব,
সবার নেতা শেখ মুজিব,
আজি নেতার নেতা হইছে শেখের ব্যাটা
ওরে সাবাস ব্যাটার বুকের পাটা, যেমন বিজলী ঠাটা রে
চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা,
এবার চুকবে যত সমস্যার ল্যাটা।।

হাইলার বন্ধু শেখ মুজির,
জাইলার বন্ধু শেখ মুজিব,
কুলির বন্ধু শেখ মুজির,
ঢুলির বন্ধু শেখ মুজির,
আহা এমন বন্ধুর তুলনা আর নাই।
ওরে নিজের প্রাণ বিলাইয়া করে দ্যাশেরি ভালাই রে,
আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই
ও এবার আইসো ভাই তাঁর কাতারে দাঁড়াই।।

(কথা ও সুর-হাফিজুর রহমান)

(তেইশ)

ও বগিলারে,
কেন বা আলু বাংলাদেশের মাছের আশা নিয়া।।
ও বগিলারে, …………।

শিয়াল কান্দে, কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া হায়রে।।
দুপুর রাইতে ডুপরি কান্দে, ভুট্টো বড় মিয়া, কান্দে!।
ও বগিলারে,………।

আপন ফাঁন্দে আপনি বন্দী টিক্কার চৌখত পানি, ঐ দেখ।।\
আন্ধার দেখে মাইরের চোটে মিছাই বন্দুক তানি।।\
বগিলারে,………….।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বাংলার মাটি ঠুকরি ভাংলু কার।
আষাঢ় মাসোত কাদোয় পরি
হলু নাজেহাল, ও তুই হলু নাজেহাল।
শাওন মাসোত ফালগুন ছাড়ি
নেংটি করলো ছাড়ি
বৈঠার গুঁতায় বাপরে মরে
জান বাঁচে না আর
ও তোর জান বাঁচে না আর।

মরদ মরদ কাওয়ার শালি
কেমন তোর মরদানি ঐ।।
বন্দুক ছাড়ি ঘর উদাসী, ও তুই।।
বউয়ের আগে কেরদানি
গাইলের চোটে কোমড় ভাংগী ভাত বাড়িনু গিয়া
হাত বাড়াইয়া কান্দে এখন ভুট্টো-ইয়াহিয়া, টিক্কা-ইয়াহিয়া
ও বগিলারে,
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।

(কথা-হরলাল রায়, শিল্পী-রথীন্দ্রনাথ রায়)

(চব্বিশ)

ওরে আমার দেশের মানিক সোনা।।
তোরা হাসিয়া জীবন দিতেছিস
শেখ মুজিবের সব জানা।।

তোমাদের মত কে আর আছে,
তোদের মারতে বসেছেরে।।
তোরা দুরাচারী ধ্বংস কর
সহায় আছে রাব্বানা।।

কত দিন করবে শয়তানী
উড়িয়ে দেবে তার জীবন খান।।
তোরা শেষ কর তাদের দুশমনি
গুলিকে ভয় কইর না।।

যত শয়তান আছেরে দেশে,
বেশীদিন রবে না,
কয়দিন পরে খুঁজলে তাদের,
একটিও পাবি না।

তোদের কাছে সবাই নত,
শেষ করে দাও শত শত।।
এখন হইছে বাঘে হত হত
প্রাণ ভয়ে আর বাঁচে না।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ্ আলী সরকার)

(পঁচিশ)

মোদের ফসল কেড়ে নিলরে,
যারা মারলো জাতি-কুলরে,
তোরা ভাই শেষ কর তাদের।।
তাদের পাঠাইয়া দেরে তোরা,
ঐ না যমের ঘরে।।

তোদের খাইয়া মানুষ হইল,
তাই বাঘেরা বেঁচে রইলরে।।
এবার বুঝিয়ে দে ভাই সকল
কেমনে যায় সে পারে।।

হানাদারীর পাঞ্জেগানা
ভিতরে শয়তানী
এবার বুঝুক বাঙ্গালীদের
সিংহ বিক্রমণি।।

তোরা জয়ধ্বনি কর...বাঙ্গালী
জোরছে কষে গুলি মাররে।।
দেখবি তোরা জয় হয়েছিস
এই ভব সংসারে।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ আলী সরকার)

(ছাব্বিশ)

ওরে ও বাঙ্গালীরে,
দুশমনদেরে, দেশে রাইখ না।।
যারা তোদের খাইয়া তোদের মারে
তারে ক্ষমা কইর না।।
খানের ঘরে খান ইয়াহিয়া-
মানব পশু গেছেরে হইয়া।।
ভাইরে মারে ভাই হইয়া
কি আজব এ ঘটনা।।

কতদিন আর ঘুমাও ঘরে:
চাইয়া দেখ আজ বাহিরে,
ওরে অবোধ নয়ন মেললি না।।

ও বাঙ্গালী-
মরুভূমির বাঘে ঘুরে
এবার মার ধইরে ধইরে।।
চালাও গুলি বুদ্ধির জোরে
একটিরও প্রাণ রাইখ না।।

(কথা, সুর ও শিল্পী-শাহ আলী সরকার)

[১-৪ গান শামসুল হুদা চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িকী 'অনেক রক্ত একটি জাতি', ৫-১৬ গান 'বেতার বাংলা ডিসেম্বর ১৯৭৯', ১৭-২৩ গান শামসুল হুদা চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'একাত্তরের রণাঙ্গন' এবং ২৪-২৬ গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র থেকে সংকলিত।']

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২০। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ নিউজ কমেন্টারি	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিল পত্র	জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

NEWS COMMENTARY

১৯ জুন, ১৯৭১

With the postponement of the forthcoming meeting of the Aid-to-Pakistan Consortium of World Bank begins a new phase in the international response to the genocidal war in Bangladesh-formerly the majority wing of Pakistan. The postponement is particularly significant because this is for the first time in the 86-day old war between the people of Bangladesh and the Pakistani military junta that the big aid-giving powers including USA and Britain have spoken in silent but real terms about their dislike of what is happening in the East. After all, the Consortium is not a charitable organisation. It grants interest-carrying loans only when it feels that the recipient country can guarantee the safety of both principal and interest. It does not require an expert to see that the genocidal war has made Pakistan totally bankrupt. Although the Newsweek has quoted a very low price for Pakistani rupees at the international money market, the reality is that Pakistani rupees is not saleable at all. Eye-witness reports from such open money markets as Beirut, Hong Kong and Bangkok indicate that buyers would not even touch Pakistani rupee let alone naming a price however low. Pakistan is trying to find a temporary relief by borrowing from rich Arab sheikhdoms. But they, too, are business men and are not likely to prove too eager to throw large amounts of gold down the one-way drains of Pakistan's dwindling economy.

The World Bank team that visited Bangladesh last week quickly saw through the carefully fabricated veil of deception put up for them by Yahya's henchmen. According to its report, widespread famine is just round the corner in Bangladesh. Peter Cargil, Chairman of the World Bank Aid-Pakistan Consortium, has talked only about possible increased food, aid prior to his departure from Karachi. Through the diplomatic euphemisms of his comments it has become clear that the World Bank wants Pakistan to find a political solution of the problem in the East before further economic aid can be considered with seriousness, Almost simultaneously comes a similar statement from William Rogers, US Secretary of State, He, too, has stressed upon a political settlement of the war in Bangladesh for what he termed as lasting peace in the sub-continent. France, Canada and Japan- three other members of the Aid Pakistan club are presumably thinking on the same line,

---

ইংরেজী সংবাদ ভাষ্যগুলি 'আহমেদ চৌধুরী' ছদ্মনামে আলমগীর কবীর রচিত।

Thus two clear-cut world opinions are polarizing fast on Bangladesh issue. The public opinion around the world, greatly molded by extensive press reporting, is clearly in favor of recognizing Sheikh Mujibur Rahman and his party as the sole legal and moral spokesman for the people of Bangladesh. They are convinced that after the genocidal war of the Army junta over the people of Bangladesh the very basis of Pakistan has now vanished and that the people of Bangladesh must be granted independence forthwith. They are genuinely worried about a serious threat to international peace in the area.

The second opinion is that of Western governments. It has been rather slow in crystallizing, but is clearly bringing pressure now upon Yahya regime to seek political solution of the problem. If the lunatic generals are in a listening mood they are likely to be tempted by the proposal because it offers them sufficient room for political maneuvering without conceding anything. A Hurry of proposals and counter proposals would buy them sufficient time during which to make a yet another frantic effort to find money for footing the bill of the mad adventure-an adventure that aims at a total colonization of Bangladesh, at least for a few decades. It would be foolish to expect that a fascist army that undertakes and executes a mass extermination programme without any armed provocation whatsoever would agree willingly to a political settlement.

If, as a repercussion, thousands of Muslims die in the communally vulnerable area; of India, Pakistani junta could not care less. All they want is a political advantage over India. Those Muslims of India who have been showing their allegiance to the Pakistan Junta and are finding it difficult even to sympathise with great misery perpetrated by the junta on the people of Bangladesh should note this point. They should also note the treatment that is being meted out to the refugees from India in various West Pakistan provinces, particularly in West Punjab. However, the Indian Prime Minister has more than once expressed her determination to counter the vicious Pakistani plot and ha: already taken measures against communal violence in India.

The world must act now—not only in the interest of the captives and displaced o Bangladesh but also in its own interest. It must recognize the legitimate, popularly elected government of Bangladesh and arrange for the total withdrawal of the invading army of, Yahya. Only this can ensure a political stability in the region.

...জুন, ১৯৭১

Western governments, although still inadequately, are showing signs of awakening l the gigantic refugee problem that Pakistani Army junta has inflicted with deliberation upon India. According to reports, Relief goods are pouring in daily in Calcutta. These are being distributed speedily among the suffering millions in the camps. The quantum of aid is expected to rise over the coming weeks. But this should not encourage too much hop in the sufferers inside and outside Bangladesh. The sympathy for the refugees m N international community may continue indefinitely, but, the aid pipeline is most certain to

dry up gradually before the end of the year. Naturally, one could not possibly expect the donor countries to go on bearing such a heavy burden indefinitely. So what happens in the end? The load again passes on to the hard-pressed economy of India. But can India absorb such a shock? No.

Thus a permanent solution must be found immediately before the sub-continent develops into another bloody trouble spot of the world. The Pakistani junta seems to have been fairly successful in the propaganda field in its effort of diverting the world attention from the cause to the effect, from the criminal to the crime. The world seems to be more keen on arranging temporary relief for refugees who have crossed the border than on containing hordes of Yahya who were not only responsible for the crisis but are bent upon delaying the inevitable solution, namely, a free political climate, honorable and suitable for the refugees to go back eagerly to their homes. They cannot go back as long as the occupation army that murdered their dear ones and uprooted them with senseless brutality remain on the soil. The world must equally wake up to fate of the millions of captives who for various reasons failed to leave their country and are now desperately marking time in a state of terror. Deliberate destruction of food grains and food crops all over the occupied area has made an unprecedented famine a sure possibility. Because of the almost total disruption of the communication system, distribution of food-stocks that escaped destruction has become impossible. Already famine looms large over the districts like, Barisal, Patuakhali and Faridpur. Since Pak Army's carnage people have been subsisting on summer fruits before they could even ripen. By the end of May, all green mangoes, jack-fruits, bananas and whatever was humanly edible were exhausted. Price of rice shot up from Rupees forty a maund i.e. 80 pounds to Rs. 90 a maund. A match box costs 50 paisa. There is no salt, no sugar or tea. Nobody, rich and poor alike, has the money to buy anything. Pakistan Army soldiers and officers not only destroyed market places and food grain stocks but also robbed every household of cash money and gold. Overnight thousands of families were reduced to beggary. But there is none left rich enough to give them alms.

This is the state of affairs that these lunatic generals of Pakistan are bent upon of continuing unless there is a superior power either to eliminate them or to force them to call off the mad adventure. The heavy casualty among the young officers has given rise to some dissension within Pakistan army. A coup d'etat cannot be ruled out. But the world cannot go on waiting silently for that to happen, nobody knows when……

২০ জুলাই, ১৯৭১

A frightened Yahya has threatened war. The desperate man has now brought out his last card in the game of international deception and blackmail that he has been playing ever since he let loose his primitive hordes to massacre innocent human beings in Bangladesh. In an interview with a correspondent of the Financial Times of London he has threatened India with war if, as he liked to put it, India captured any part of East Pakistan. He even hinted that if he declares War on India he will not be alone-meaning

he will be backed by some other stale in his aggression. This is, indeed, yet another of the series of political blunders that he and his accomplices have been committing ever since March i, the day he dealt a lethal blow to the re-emergence of democracy in Pakistan and paved the way toward total disintegration 25 days later. Yahya's threat is an expression of extreme frustration that usually makes appearance prior to a nervous breakdown. This is, in reality, a public admission of the precarious War position in Bangladesh. He has now admitted that Pak Army, has lost positional control over vast areas of Bangladesh.

According to reports from various fronts, Pakistan Army has been retreating in all sectors following massive inspired attacks by the Liberation Forces. In the western sector, Pak Army suffered particularly heavy casualties and almost whole of Kushtia district has been recaptured by Mukti Bahini.

Observers believe that the significant setbacks suffered by the Pakistan Army in this sector has been mainly responsible for Yahya's threat of war on India. Naturally he is accusing India for territories that his occupation army lost to Mukti Bahini. How could he admit that his 'invincible' army has been putting up a pathetic show against the ill-equipped but superbly inspired youths of Bangladesh Liberation Forces? The pretending that his men were losing to mighty India is a desperate attempt at an artificial resuscitation of, at least, his own moral. But the world knows better. Scores of foreign journalists have toured the liberated areas of Bangladesh. They have also visited the camps of Mukli Bahini miles inside Bangladesh territory and talked with the commanders and commandos.

Foreign Television networks shot films of Mukti Bahini operations from war fronts. Their reports would easily testify that Indians have nothing to do with the liberation war. As a matter of principle the war is being fought only by the dedicated citizens of Bangladesh. The cause of their spectacular success has been, not a grand-scale fire power, but a supreme sense of dedication. They are fighting for the liberation of their motherland. Pakistan invaders, even though they bristle with armoury, will never match their spirit and moral armament. But Yahya and his accomplices are too drunk with their narcissistic madness to be able to recognize this. After all the war does not threaten the clique or their families. As thousands of dumb soldiers die thousands of miles away in the muddy, rain-soaked jungles of Bangladesh these officers enjoy the cool comforts of officers mess and company of international call-girls. Swiss banks are looking after the safety of their private fortunes-fortunes that they accumulated robbing Bangladesh and Pakistan for the coming rainy day. When the army rank and file discover their vicious motives and make things too hot-they will have chartered Boeings to fly them with their families to the safety of Swiss villas.

The darkly hint that Yahya will not be alone when he commits aggression against India shows that he has still remained the schoolboy bully he always was. Obviously he has forgotten that China never ventured outside her borders since Korea. Even the US-backed invasion of Laos could not stir her up. Whether she will come in direct military confrontation with India just to please Yahya's fascist junta is a question that is not too difficult to answer. On the other hand, India is no......to be frightened by the

desperate muscle-flexing of a militarily sterile-and deeply frightened gang leader such as Yahya. Moreover, Yahya's self-deceiving presumption that India is friendless once again points out his total back of political understanding.

৮ আগস্ট, ১৯৭১

With Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko's significant visit to New Delhi probably begins the decisive stage of the Bangladesh Liberation Struggle. The Soviet Government has reportedly given clear indications about its support for India if Islamabad military junta with American and Chinese approval chooses to declare war against India in its frantic and clearly suicidal effort to avert military defeat in ' Bangladesh in the hands of the Bangladesh Liberation Forces. This resolute stand of Soviet Government may well mean an end to Yahya's war cries as both Nixon and Lin Piao are not likely to risk a world war with unthinkable consequences just to save the ugly faces of Yahya and his accomplices. In other words, the possibility of Indo-Islamabad military conflict has now become a great deal remoter than it seemed even a few days ago. And that means the failure of Yahya junta to internationalize the Bangladesh issue with a view to crushing the liberation struggle.

Political observers believe that the Chinese, even the American stand on the issue might experience qualitative changes during the coining weeks-the weeks that are sure to 3ve crucial for the future of Bangladesh, West Pakistan and South East Asia. The Indian protest against American military and economic aid to Islamabad junta is certain have discernible effect on Nixon Administration. India has informed Washington that e considers such aid as hostile acts against India as Yahya's war threats were direct consequences of American support. The Indian denouncement is likely to have telling effects on American domestic politics. Nixon, by what now gradually appears to be a short-sighted policy, has alienated the largest democracy in the world but has gained-thing tangible yet from the Chinese front in return. While India is definitely moving .t of the sphere of American influence, China is still sounding no less belligerent so far U. S. Imperialism is concerned. Nixon is yet to not any concrete gain to prove to the voters that Peking has been floored and the threat of revolutionary communism has been eliminated to justify the sacrifice of U. S. influence over India that was cultivated with so much sweat after Indo-Chinese border clash in 1962, China in her own interest may not concede an ideological sell-out to USA just to gain an entry at the United Nations without which she has been doing not so badly so far. Finally, comes the cruel treatment of the people of Bangladesh by President Nixon. Despite comparatively poor publicity of the genocidal crimes of Yahya junta in the United States politically conscious people in general were shocked by the way Nixon lined up with the murderers. This proved an added burden over a conscience already badly bruised over Vietnam. In his desperate attempt at getting a hold over the Chinese plum Nixon did not have the time even to use- publicity media to create opinion in favor of the Pakistani fascists, Now if Sheikh Mujibur Rahman is murdered as has been threatened by Yahya regime when Nixon could easily secure his personal safety and release, that would mean really the point of no return " him. With such a poor record Nixon would surely prove a very bad runner at the 1972 presidential elections.

It is not that Nixon does not realize the mess he has got himself in during last few weeks. What then could be his strategy to avert his impending political disaster for the Republicans. His first move is likely to be to find a 'political solution' short of impendence for Bangladesh and get Sheikh Mujib to consent to it. As Yahya junta has made the scene too messy to make them presentable at a conference table one should not surprised to see the good old CIA back at its favorite game and pull off a coup d'etat by a group of so-called moderate generals.

Field reports by American officials still staying in Bangladesh must have convinced him that, let alone victory a military defeat is imminent for the Pakistani army caught in Bangladesh. If Nixon succeeds in saving the surviving army personnel here Pakistan would still remain tied to US apron strings out of sheer gratitude.

On the other hand, the Chinese stand on the issue no longer appears rigid. Peking radio has remained quiet over the issue for an unusually long time. The latest all-out American support for the Pakistani junta must have brought home to them the reality of Sino-Pak friendship based on nothing else but a common hatred against India. Despite all those arms and interest-free economic aid etc. Pakistan has always remained very much a baby of the White House. This is a reality that must taste rather unpalatable to the foreign Relation experts in Peking. Recently, discernible indications are there of a charged Chinese attitude toward India. Now with Indian disenchantment with American friendship may begin a newer phase in Indo-Chinese relationship because, until now, the major Chinese objection was against Indo-American understanding. On this side, Indian political leaders of almost all the major parties including the ruling Congress Party are increasingly expressing opinions in favor of a serious review of the Indo-Chinese cold confrontation. All these new developments certainly encourage prediction of an international atmosphere favorable to the future of Bangladesh. With the series of spectacular successes of the Mukti Bahini on the battle field and their increasing might and capability to go soon for a positional warfare to liberate and hold the occupied areas of Bangladesh comes the possibility of the recognition of the Government of Bangladesh by more than one country. The month of August is sure to prove the most significant for the liberation struggle of Bangladesh.

১২ আগস্ট, ১৯৭১

I can't help repeating my fear once again. The question of the moment-Is Sheikh still .alive? Has he not been done away with by the maniacs before Yahya's sudden declaration of the date of trial with shortest possible notice-a notice of precisely 48 hours? Why they hurry? Sheikh was not running away ! He was in their hands and far away from the; battlefield where defeat is engulfing the Pak army not too slowly and, quite steadily. There must be a greater reason behind the timing of the trial than a mere wish to show the .florid their kind of justice.

Sheikh had been kept incommunicado since his arrest. Nobody other than his vile captors has seen him. Of course, Begum Sulaiman, daughter of late Shahid Suhrawardy and presently a quisling of the military junta, claimed in Dacca late lust May that she has

met Sheikh Mujibur Rahman at the military jail in Attock in her bid to make the lead agree to a so-called compromise formula devised by the killer generals. Apparent Sheikh has told her to mind her own business. Even if this story is true, it is more th seven weeks now that no one has visited Sheikh to be able to tell the world about the stat" of his physical and mental health. Only Yahya himself conceded to a foreign journalist sometime ago that Sheikh was keeping bad health because the food supplied by the army was proving disagreeable.

There were also rumours that the leader was being subjected to inhuman torture r would not be surprised if it is true. It is a public fact that Yahya hated his guts. For a man almost totally devoid of civilized sensibilities fully trained by the British in colonial arrogance unarmed Sheikh's refusal to be browbeaten or to give in to army threat had consumed Yahya's brittle patience in no time.

Let me refer to his speeches since the day he declared the postponement of the national assembly session after consulting Bhutto and ignoring totally the majority party leader. He accused Sheikh of his failing to come to a so-called "consensus" with Bhutto but forgot his manners totally in the anger. While he referred to the villain as Mr. Bhutto, Sheikh was being referred to as Mujib. For a man raised in British-style army mess such lapse of courtesy could not have been an oversight. It easily betrayed his total dislike of the personality. In his next speech on 6th of March in which he grudgingly agreed to call the national assembly session on March 25 he again insulted Sheikh in the same manner, in fact added a crude venom every time he pronounced the name. In his speech of March 26 we noticed the repetition of the bad manner once again. It was clear that nothing would please Yahya more than to see Sheikh dead.

A deliberately leaked-out information alleging that Sheikh......had refused a defense counsel provided an added ground to the suspicion about a foul-play. Outside world did not have any contact with Sheikh. How could the refusal-to-defend story reach the world press unless with Yahya's collaboration? Doesn't this "refusal story'" come very handy if the so-called trial is meant to be cover-up for an already committed crime? Particularly when everybody knows that Sheikh would never have agreed to be tried by a foreign military court. The mystery has been further hardened by the reported transfer of Mrs. Mujibur Rahman to Karachi from Dacca where she was kept under house-arrest since last April along with her children. Is the family being liquidated as well? The fact is that no crime is impossible for these men from the pages of medieval tales of horror.

That the junta has proceeded with the illegal trial despite worldwide condemnation including repeated concerns expressed by its mentor, the U. S. State Department gives more credence to the fear. If it turns out to be a fact, it would be proved that Yahya was taking the foreign press for a ride while his hangmen were putting the noose round Sheikh Mu jib's neck. It would be interesting to note Nixon's response to the crime. The pretext he has been putting forward so far to justify continuance of arms and economic aid to the junta was that the U. S. government could gain a leverage this way for what….a political accommodation over Bangladesh. As long as Sheikh lives and remains in captivity the pretext comes very handy as a cover-up device. But without him

Nixon would be in a quandary. He has miserably lost in the international power game as ' has only a ping pong ball to show to his voters in exchange of world's largest democracy. Sheikh's death is certain to spell disaster for Nixon and, consequently, for his protégés in Islamabad.

As for the people of Bangladesh-they will not rest until the murder has been avenged to their satisfaction.

If by one chance in a thousand, Sheikh is still alive it would be for the world powers to stop this farce of a trial before it is too late.

১৭ আগষ্ট, ১৯৭১

Reports from Islamabad suggest that Yahya has lost control of Tikka Khan. The maniacal murderer in Dacca has stopped just short of publicly declaring himself the supreme ruler of what Islamabad likes to believe its Eastern colony. Now Yahya is afraid of visiting Dacca. On the other side Tikka is scared of touring Islamabad for fear of sadden arrest. Yahya has for the second time put off his much-publicized tour of Occupied areas of Bangladesh-a place he did not dare to visit since he betrayed Sheikh Mujibur Rahman and the people of Bangladesh and fled from Dacca like a thief in the darkness of night. Two weeks ago he pompously asked a number of foreign journalists to f hang around if they wanted to accompany him in his tour of Dacca. Some of them must F still be hanging around but with tongues in their cheeks. Meanwhile, Tikka Khan was conspicuously absent from the meeting of so-called National Economic Council held in Islamabad sometime ago.

It is also interesting to note that on August 14 Yahya, as a matter of routine, decorated Tikka with Hilal-e-Quaid-e-Azam. Yet, if the relations were good, he would: most certainly have been decorated with the highest award Hilal-e-Pakistan for [completing the historic task of destroying Pakistan. Of course, it is possible, that Yahya has kept the medal for himself.

The rift between the gangsters apparently resulted over Tikka's total lack of (understanding of the world reaction to his crimes. He led Yahya into believing that the; situation was really normal in the East and that he could send any number of foreign journalists to see it for themselves. Perhaps he thought that the journalists could be ' bought over just like those hacks from West Pakistan by drinks and dinners in the army mess. Perhaps like those silly West Pakistanis (with the notable exception of Anthony Mascarenhas) they, too, would parrot his hand-cuts. Like an honest fool Yahya believed in him and sent the journalists who in due time exploded the lies of Tikka. This apparently annoyed Yahya who would have preferred to keep the journalists' out Particularly when the naked aggression against the people of Bangladesh could not be hidden with mere repairs of some badly damaged buildings of Dacca.

He was hoping to get Tikka in Islamabad in order to punish him for the costly folly. But, then, Tikka got the smell of it through his personal friends in the junta and stayed

out. Now he could not euro less if Yahya's international position is made doubly ludicrous by his repeated failures to keep the schedule of Dacca tour.

One thing is certain that the twin can no longer co-exist. Either Tikka goes or Yahya goes. Apparently, President Nixon would like to see both go leaving the power in the hands of other pro-American generals who might not find it so difficult to swallow some kind of an agreement with Sheikh Mujib. The President is clearly against Bangladesh independence but would be very happy to see a political solution within the framework of Pakistan-something that is, of course, totally unacceptable to the people of Bangladesh now.

১৮ আগস্ট, ১৯৭১

According to latest reports Pakistani ambassadors to USA and UK have been called back. It is not known whether they have been sacked or are going to be put in the secretarial godown of Islamabad with some inconsequential assignments in corridors of the foreign office. Whatever happens to their fate-it is now clear that the gang must have been going nuts over the national and international mess they succeeded in creating out of almost nothing over last few months.

The faults of Aga Hilaly-Yahya's man in Washington and Salman All, his henchman in Britain to warrant this hit in the stomach have been their failure to get even a single story published in the US and the British press in support of Yahya's crimes in Bangladesh. But, by Jove, didn't they try? It was indeed a difficult task for Salman Ali, or any other diplomat for that matter except the Americans, to get anything published in the British press with which the editors didn't agree. Poor Salman knew this and gave up futile efforts after some initial failures. But Hilaly, by nature, is a different kettle offish, He is such .a pest that the simple mono-syllables like "no" are rather insufficient to dampen his spirit. Moreover, he happened to be an East Pakistani domicile. Although he could not speak a word of the Bengali he bagged his ambassadorship from the Bengali quota. Being originally a refugee from Madras he could never be one of the family with the Punjabi coterie in the foreign office. He would have been set aside long long ago had it not been for that Bengali quota business. At a time when Yahya was busy committing genocide for sheer self-survival he had indulged in frequenter and louder yap-yap in favor of the crimes even if it was only to prove that he wasn't a Bengali after all. He got himself TV spots and whined like a school-boy before the American viewers complaining that the American press never listens to him-never publishes his handouts. These were such pathetic shows that even the rustic tin-gods of Islamabad felt embarrassed. And the Punjabi coterie was just waiting for the chance to get rid of him.

But would it be possible for their successors to score better marks? How could mi anyone defend such a revolting case anyway? After all, a measure of civilization still exists outside the borders of Pakistan and Lin Piao's China. There it is impossible to present a linen soaked in the blood of at least a million innocent lives as something snow white....

২০ আগস্ট, ১৯৭১

The fate and real whereabouts of Sheikh Mujibur Rahman who voluntarily allowed himself to be arrested on March 25 still remains shrouded in mystery. Although some questionable characters like Begum Akhtar Suleiman claimed to have visited him in prison, there has been not a single conclusive proof to date to suggest that he is still alive surviving the wrath of the psychopathic murderer Tikka Khan on the night of his arrest.

Contradictory reports deliberately leaked out by the sources close to the trigger-happy junta kept the world guessing helplessly until this day. The lone and intrinsically negative response that came from the junta's secretariat was a crude attempt at criticizing United Nations' Secretary General for his publicly expressed concern for the safety of Sheikh Mujibur Rahman. U Thant and other world personalities considered the trial, whose verdict had been already pronounced by the prosecutor-cum-judge-cum-;executioner Yahya in so many of his interviews with foreign press, as yet another disgrace to civilized norms and sensibilities. Despite American and Chinese hacking of the junta U Thant failed to remain quiet this lime contrasting with his shocking silence [during the first week of Pakistani genocide in Bangladesh-a silence that encouraged the-bloodthirsty generals to go for Sheikh's life so blatantly. The reply from Pakistani foreign office had the audacity to point out to the Secretary General that he had remained silent over British massacres in Northern Ireland. By this the Pakistanis tried to convey that they too are entitled to all the United Nations inaction over their crimes in Bangladesh. Its sounds like a murderer defending himself citing another murderer who got away with his crimes. The attitude thus revealed shows the level of shamelessness to which these criminals in general's uniform capable of stooping.

Even greater an outrage is the fact that these children of Hitler and Marquis de Sade have so far been getting away with their criminal lunacies. Is the world so powerless to rid this planet of these ugly growths and make it a better place for human beings to live? Can the world powers, including China and USA, be so devoid of conscience, so blinded by petty national interests that they could go on playing either collaborators or silent onlookers of the crimes? Hasn't the Soviet Union a greater responsibility toward the people of Bangladesh and their undisputed leader than mere signing of treaties with third, fourth and fifth parties forgetting first party of the confrontation?

Let us assume that the murderers have still kept Sheikh Mujib just alive. I say just because according to another report Sheikh has been tortured-a fact that was responsible for his collapse in the courtroom of the so-called trial. Now, defying world condemnation, if Yahya proceeds to execute the leader what do the world powers propose J do? Will they do anything more meaningful than just words? This is the question that has been dominating the thoughts of the observers of the gruesome tragedy.

If the world thinks, just like the killers of Islamabad, that Sheikh's murder would cow the Bengali nation and solve the problem-it is indeed living in fool's paradise. Bangladesh is not Biafra or Congo-let us remind the great powers once again. The entire nation has been hit by an unjust and un-called for war by a vicious fanatical, feudalist and

fascistic military junta. We have paid a record price for our freedom. Now we are convinced that our only condition for survival is nothing short of total independence. And independence we shall win-by our own might. We do not ask the big powers to help Us or give us arms. AM we want is that these murderers do not get economic and arms aid. History has doomed them.

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

Keeping neatly quiet for 10 days the Pakistani Radio has come up with yet another blatant lie concerning the shame trial of Sheikh Mujibur Rahman. It has claimed in its news broadcast of yesterday that Sheikh who, according to the same source, had earlier refused to defend himself in a court with no right to try him, has named a pane! of three lawyers to defend his case. The radio has also claimed that A. K. Brohi, one of the three lawyers allegedly chosen by Sheikh, has refused to take the brief for what the radio claims as his prior commitments. Unconsciously, the radio has forgotten to mention the names of other two lawyers. Or was it consciously?

The news, which is the most despicable lie of the Pakistani junta since its handouts on its genocidal crimes in Bangladesh, has been tailored to suit the needs of the conspiracy to hoodwink world opinion that has been outraged by farce of the trial. This latest bit of fiction has been designed to counteract the earlier 'expose' that Sheikh has refused to defend himself. We are well aware of the attitude our leader is likely to take if confronted with the proposition of such a trial. Some in the junta know this as well and, hence, tried that way to convince the world that Sheikh was actually alive. That he has not been tortured or maimed by his sub-human captors to respond the way he would have responded in a normal state of affair.

But the junta played one card too many. The world immediately doubted the move. It was seriously suspected that Sheikh has probably been murdered and this story about his refusal has been cooked to make the lie an all-military affair. The suspicion most probably pushed the army professional liars on duty off the track. Quickly they have come up with this new story a-bout Sheikh Mujib's defense choice.

The story of Brohi's refusal to defend Sheikh also looks quite convincing. Brohi or, for that matter any other, would have to have it least three heads on shoulder to take up brief for Sheikh Mujib. Because he would most certainly be in dire trouble if he ventures to display professional honesty in his role of the counsel for defense. He might even be bumped off to mysterious death. Brohi would be the last man to come to Sheikh's rescue. Of course, he had also refused to be the counsel for the prosecution when the Ayub regime framed the so-called Agartala Conspiracy Case against Sheikh Mujibur Rahman. This shows that he is much too clever a jockey to ride Yahya's lame horse. Assuming that Sheikh is still alive and the trial would be pushed through whether the world-frorn White House to Kremlin, from Secretary General U Thant to Khan Abdul Gaffar Khan-like it or not, Yahya junta will have to appoint a defense counsel at least to keep the books right. According to legal procedures, any case carrying the penalty of death the defendant

must be provided with a counsel-if necessary at slate's cost. Thus defense counsels there ' will be whether the defendant likes it or not.

Political observers still find nothing tangible to suggest that Sheikh has not already been murdered. Even this latest lie about Sheikh's alleged choice of a defense panel does not prove that he is alive. The Pakistani Radio has mentioned other two lawyers who have presumably agreed to collaborate with the junta in this farce of a trial. The army W0uid use them to sign the papers suggesting a fair trial before the execution of Sheikh Muiibur Rahman. It is most likely that the army would not risk exposure by keeping them alive for long. That is the contradiction of politics by murder. You never can stop killing.

The world must force the Pakistani junta to reveal the truth. If Sheikh is alive the world must force the junta to set him free.

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২১। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত ইংরেজী অনুষ্ঠানঃ ওয়ার্ড প্রেস রিভিউ অন বাংলাদেশ	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৭১

২৫ জুলাই, ১৯৭১

The policy of murder and violence that the military rulers of Islamabad adopted to subdue the people of East Bengal has begun to boomerang. Abandoning the path of peaceful negotiation, the trigger-happy West Pakistani generals cracked down on the mild-mannered, cultured, and peace-loving East Bengalis. Why? Because the people had asserted their democratic right to run their province according to their wishes and end the decades-long colonial exploitation at the hands of West Pakistani military and bureaucratic rulers. The Military Governor of East Bengal, General Tikka Khan, had boasted that he would crush the people of Bangladesh in six days. Three months after the expiry of that date, the people are still far from being crushed. The war that the 'valiant1 generals of Islamabad launched was not merely against armed rebels but the entire people of East Bengal. The atrocities committed against unarmed civilians—men, women and children, are now known all over the world and the smoke screen raised by the military junta has been completely blown off. How millions of refugees have been driven away from their homes is also now a matter of common knowledge. However, repeated claims of normalcy in Bangladesh by Pakistani publicity media show that Islamabad still wants the world and especially the people of West Pakistan to be kept in the dark about the strong fight being put up by the Mukti Fauj. A West German State Minister Dr. Earnest Hcinsen and a British Labor M. P. Mr. John Storehouse, have been to some of the liberated areas. They say they were impressed by the activities of the freedom fighters there. For some time past, the freedom fighters have changed their tactics completely, The nature of engagements shows that they have become adept in the advanced techniques of guerilla warfare. They ambush the enemy and make raids at places of their choice. Bridges, culverts, railway lines and other strategic installations have been blown up on a large scale. The commanders are using artillery and mortars. The activities of the freedom fighters are by no means confined to the countryside. In recent days, there have been grenade attacks inside Dacca city. At least twenty raids on army camps and positions are being made daily in the city and its suburbs. Production in the Ghazipur Ordnance Factory near Dacca has again been suspended following damage caused by guerilla attacks. Water supply in Dacca has remained suspended for two days. The main power plant in Dacca was knocked out by insurgents a few days ago. There have been reports about the reimposition of curfew in the city.

In Chittagong city and other areas of the district, flags of Bangladesh are again fluttering on housetops. There have been attacks in many other towns also.

The expelled correspondent of the New York Times, Sydney Schonberg has reported that guerilla resistance appears to be widening and growing more effective. Mark Tally of

the B.B.C. recently reported that the Pakistan army was not in a position to post its personnel at all the would be strong-holds of freedom fighters and strategic bridges.

In short, the army is feeling the punch strongly. Recent history has shown that an army, however powerful, cannot crush a whole people. The flame of freedom has been lighted in Bangladesh. The atrocities committed by the West Pakistani army have embittered the hearts of the East Bengal people. The freedom fighters are gaining in experience and strength and time is on their side. Well, violence was Islamabad's own choice.

২৮ জুলাই, ১৯৭১

Much is now known about the genocide carried out in East Bengal by the West Pakistan military rulers. They have made such a thorough job of it that if Hitler were to come to life, he would not find anything lacking in the methods of his modern disciples. The most conservative estimates put the number of those killed at a quarter million. Seven million East Bengalis have had to flee to India to save their lives and honor. Before the world today, the name of the military junta of Islamabad is mud. Yet, to hoodwink public opinion, the Pakistani militarists are issuing appeals to the refugees to return to East Bengal, claiming complete normalcy in the region. They have even opened reception centers for returning refugees.

A correspondent of the British newspaper, The Sunday Times, recently visited one of 5: these camps and reported that its entire population was five stray dogs. During the past few weeks, Parliamentary delegations from Britain, Canada and Ireland have toured East Bengal. They all got the impression that an atmosphere of terror prevailed there. The Islamabad rulers seem to have learnt even more than mass murder "techniques from the book of the Nazis. Information trickling though, despite censorship, shows that East, Bengal has been turned into a police state. It is today a valley of fear, where a Gestapo type inquisition is going on. To such government employees as are still attending offices, a questionnaire has been issued by the martial law authorities. One of the questions to be answered specifically is: Did you vole for the Awami League? 'Another, are you a Bengali? What great crimes!

A graphic account of conditions in East Bengal has been given by a correspondent of the Los Angeles Time's Jack Foisie. Dacca, he says, is a city in which fear is the dominant emotion. There is ghostly emptiness in the streets at night. At dusk, the workers hurry to their homes or to the homes of kinsfolk if their walls are thicker and doors stronger. Says Foisie: "After a quickly eaten monotonous meal of rice and greens, and may be a bit of curried fish, the oil lamp is extinguished and the door is barred. There is the belief that a darkened house is less likely to receive a visit from the authorities." The cause of the fear, the correspondent says, is what several people, in furtive conversations, have described as the 'inquisition'. He adds, "In all nocturnal poundings of the door, the object appears to the same. Information about the whereabouts of rebels; the recruiting of informers, who do so to save their own skins; or the ravishing of their women; or just a visit for the pleasure of intimidating; or to collect payment to be left alone." He narrates

the story of an Bengali banker, who had to buy his safety and that of his family from military officers with a large sum. "Sometimes men are marched at gun point." Foisie writes, "leaving the women to wail. Some men don not return or are returned beaten."

The so-called Peace Committees set up by the army authorities and the local militia raised by them are but another tool for terrorizing the people. Mark Tally of the B.B.C London Times says the local militia are mostly thugs, and glad of the opportunity to settle old scores.

৩০ জুলাই, ১৯৭১

Army repression in East Bengal resulting in the postponement of a return to democracy in Pakistan has finally started to have reverberations in West Pakistan itself, : no less a person than Mr. Bhutto. who has been considered the collaborator par excellence with the army. It should not be forgotten that the army and Mr. Bhutto acted in concert earlier this year to thwart effectively Pakistan's return to a democratic set up following the elections of December 1970… At that stage it was clear that the interests of the army and those represented by Mr. Bhutto had converged. Their joint aim was to deny the transfer of effective political power to the duly elected majority in Pakistan's National Assembly, namely the Awami League. The basic reasons behind this move were many, including the fear that with the Awami League in power the equation between East and West Pakistan will be radically altered. the army will lose its financial autonomy and the hate-India campaign on which Pakistan's ruling elite has thrived so far will collapse like a house of cards. Moreover, Mr. Bhutto with his well-known love for power, was not able to tolerate a situation in which he would be personally deprived of any significant share in the power structure of Pakistan. Mr Bhutto had probably pinned his hopes on the fact that with the Awami League out of the way one of two things would happen. Either, power would be transferred to his People's Party, the second largest party in the National Assembly, at the Centre, or, in the event of East Bengal continuing under martial low at least the four provinces in West Pakistan would have representative government restored to them. In this case his party would come to power in the two most populous provinces of the western wing, Punjab and Sind, As it turned out, all these calculations went away. General Yahya Khan refused to transfer power to the elected representatives in the western wing as long as, what he called, "normalcy' had not returned to East Bengal. Since there was no indications of return to such normalcy Mr. Bhutto felt his designs frustrated. Moreover, there were indications of increasing restiveness within his party as a result of this delay in the transfer of power. As a result of all this. Mr. Bhutto in his frustration tended to become more and more vocal in his demand for transfer of power, this becoming a source of embarrassment to the military regime. The honeymoon period apparently had come to an end. It was probably with this in mind that the regime sent him on a jaunt abroad, ostensibly to present Pakistan's case on Bangladesh.

It is now reported that in an interview with an Iranian paper in Tahran. Mr. Bhutto has stated that there must be a political settlement in Pakistan and the Awami League, the

majority party, just play its party in this settlement. He has also demanded a speedy return to civilian rule. Mr. Bhutto. whose tour was organized by the military junta, was immediately called back to West Pakistan. His later meeting with Yahya indicate they are no longer seeing eye to eye.

৬ নভেম্বর, ১৯৭১

The Asian', an international news weekly published from Hongkong covered the increased activities of the Liberation armed forces in the occupied areas of Bangladesh.

The report captioned "Bangladesh fighters harass Pak army in renewal resistance" begins with a description of "Razakars:, the mercenaries raised by the invaders. It reads. "in the occupied areas of Bangladesh today, the chief operators in this murky field are the Razakars. Their name has lofty historic associations; it means, literally, "Servants of the king." In fact, the Razakar are paid agents of the Pakistani army. Their special operations are haphazard personal assaults.

These hired hands of the Pakistani security forces have also set a standard fee for "aiding" the enemy are paid to repress. The charge for guiding Bengalis on their war to safety is three rupees (about 40 US cents)

In such a field of twilight operations, where "protection" is an ambidextrous business, it is often unclear whose interest are really being served. It is, for example quite possible that Pakistan Army officers are content to ignore the devious aid that the Razakars give to fleeing refugees, reckoning that it can only add to the tide of confusion and panic.

But two things can be said with certainty about these hirelings. First, money talks eloquently to them. Secondly, they can be very hasty and brutal.

As the onslaught by our valiant armed forces mount into organized frontal offensive, these band of Razakars, when the occupation army has left to our mercy, willingly and/or unwilling come forward to our help. The Asian comments, the Razakars have been recruited from among the Biharis, these immigrants to Bangladesh whose arrival dates from the partition of India. As guerilla raids have increased, so have their activates. In addition to assisting refuges, some of them have been known to act as guides to the Mukti Bahini, the Liberation Army, during their forays against isolated outposts.

There are signs now that the Pakistani army may be losing faith in the efficacy of the Razakars, who are evidently not living up to their unofficial designation of a "Home Guard." Some Bengalis among them have defected with their weapons, to the Bangladesh guerillas. It is known that training courses which were conducted for Razakar recruits on the playing fields of Dacca University have now been abandoned.

The same mark the surrounds the movements of the Razakars envelopes large areas of the whole field of spasmodic conflict in Bangladesh. But some clear pointers are beginning to emerge now and they suggest that the Bangladesh forces are now more "battle-hardened" and rare ready to launch attacks on a far more impressive scale that hitherto.

"The Asian" commenting on the casualty rate of the Pakistan army, efficiency of the Mukti Bahini and fast organisation of our armed forces, says, "To judge from known casualty rates, the Mukti Bahini are already engaging in more than hit-and-run skirmishes. Between 20 and 30 wounded Pakistani soldiers are being brought in daily to Dacca Cantonment Hospital.

Guerilla casualties, on the other hand, appear to be relatively light, possible because of the advantage they have in surprise.

The Guerilla are meeting increased support in the villages they pass through. In some places, where the inhabitants previously asked the Mukti Bahini fighters to keep away, for fear of reprisals, the inhabitants now freely offer food and shelter.

This, and reliable reports of better supplies of arms and ammunition, must lend weight to the forecasts that the Bangladesh forces are about to launch attacks over wider fronts in a much expanded scale of operations.

৮ নভেম্বর, ১৯৭১

The Newspapers throughout the world are-still continuing to report about the atrocities of Yahya Khan's troops in Bangladesh. These atrocities are compelling more innocent civilians to cross the border and take shelter in India. The U. N. relief Commissioner accepts the figure of 9.5 million refugees but Yahya Khan for last 4 months maintaining the figure of 2 million only. However, again, the General at the same time claims that huge number of refugees are returning every day, If that is so how does the figure remain static for 4 months?

The Time Magazine of the United States writes on Oct. 25 "although Islamabad has ordered the military command to ease 'off on its repressive tactics, refugees are still trekking into India at the rate of about 30,000 a day, telling of villages burned, residents shot and prominent figures carried off and never heard from again". This means that approximately one million refugees are crossing the border every month and while Yahya Khan may maintain figure of 2 million for next 4 months also in reality there would be 4 more million refugees crossing the border before the end of February.

On the atrocities of the occupation army the Financial Times writes on October 26 "instead of the military regime's persistent denials, the Pakistan army and police continue to take reprisals against unarmed civilians living where the Bengali rebels operate, even within sight of residence of the new civilian Governor in the middle of Dacca, Martin Woollacott writes in the Guardian on Nov. 1, "the Pakistani regime in East Bengal, inspite of Islamabad's unholy and contemptible attempts to bring about a return to normalcy still rests on a foundation of violations and raw coercions.

The success of Mukti Bahini also continues to dominate the world newspapers and magazines, The Newsweek magazine of the United States writes on Nov. 1 "since Yahya Khan launched extermination campaign last March against the insurgent Bangladesh State and forcing more than 9 million refugees to flee into India-the Bengali guerillas

have built up a force of 50 thousand men." Naturally, the Newsweek correspondent has been extremely conservative about the number of guerillas. It goes on to say: the guerillas have been highly successful in harassing Government troops, and many western analysts feel that the rebels success is likely to continue. Yahya does not have enough troops there now to curb the guerillas."

The Guardian of London writes "recently the Mukti Bahini have struck several times in the very centre of Dacca-usually with bombs and on several occasions mounting conventional attacks". It further writes "in the Gopalganj area, south of Faridpur, where the Mukti Bahini are well established, they appeal to have a special political cadre which although armed, spends most of its time explaining to the peasantry what is happening in Dacca."

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

"Bengal guerillas step up number of assassinations and bombings" was the headline of the London Times of Nov. 9. It writes "the guerillas are trying to close down all higher educational institutions in East Bengal on the ground that they are controlled by Pakistan army". It further says, "the number of political assassinations have increased sharply in the last few days. Yesterday a rightwing politician appointed by the Pakistan Govt. to serve in the future provincial assembly was killed by sub-machinegun fire." That the Mukti Bahini are serving notices on the people who are collaborating with the occupation army and giving them enough time to rectify themselves are also evident in the report of the Times. It says, "the guerillas have threatened to kill all members of the peace committees, all officials appointed by the martial law authorities and anyone else actively cooperating with the occupation army." It further reports "the Bengali civil servants who have stayed at their jobs have generally been warned that they are under close observation by the guerillas and that more than token cooperation with the government will be punishable by assassination.11 About the heavy casualties that the occupation army is suffering, is also evident in the report of the Times. It says, "military morale is understood to have declined and the increasing number of army casualties have apparently made it impossible to continue a former policy of flying the bodies of officers back to West Pakistan for burial."

......Current week's the Newsweek Magazines of United States also suggests that Pakistanis are fighting a losing battle. Yahya Khan is engaged in a unwinnable war. It says "Pakistan army has only the deepest notion of guerilla warfare. While the soldiers are close door on the border the Mukti Bahini seem to have the run of East Pakistan. The Government has attempted to combat the insurgent with Razakars, but the Razakars harm the government more than they help it." That the' effect of employing Razakars has become counterproductive and leads to alienate the people more in favor of the Mukti Bahini. The Newsweek says "these repressive tactics of Razakars when applied against the people have turned most Bengalis into Mukti Bahini's supporters". The senior Editor of the Newsweek Magazine Arnaud de Borchgrave asked the people whether they wanted

to remain pan of Pakistan or create a new state of Bangladesh, the reply was, he wriies ilmost all of them answered Bangladesh". The Magazine further confirms that all the people in Bangladesh are now more committed to an independent state than ever before. The senior Editor of the Magazine writes "Several people whispered to me "Bangladesh should be independent, all of us feel that way".

The Magazine also mentions that the Pakistan army is losing grip over the situation. writes "what general Niazi, martial law administrator in East Pakistan does not seem to appreciate is the steady deterioration of internal security and the degree of organisation of Mukti Bahini. By last week the government had lost control of 25% of the police stations E. Pakistan."

That the civil administrators of Yahya Khan are also cooperating with Mukti Bahini evident from this issue of the Newsweek Magazine of Nov. 15. It says "a number" of strict commissioners are tacitly cooperating with the guerillas and much of the areas north of Dacca itself is still under the outright control of the Mukti Bahini." With regard the organisation and efficiency of the Mukti 'Bahini the senior editor writes. "I personally was contacted by Mukti Bahini representative within 30 minutes of checking to my hotel in Dacca despite tight police security," He further says, the rebels had established a disciplined network carefully organized into teams-some assigned to collect taxes and organise Bank robberies, others designated as saboteurs, still others coldly ear-marked to be assassins."

১৬ নভেম্বর, ১৯৭১

The Newsweek Magazine of U.S. on Nov. 15 reveals that Yahya Khan and his generals are completely unaware of the realities in Bangladesh. His civil Governor also does not know of the factors that are prevailing in the minds of the people. It says "the harsh truths about Bengali resistance are being concealed not only from the civil Werner A. M. Malik but from President Yahya Khan himself."

Lastly, the Magazine also confirms the atrocities that are being committed by Pakistan army even today. It reports, "a highly knowledgeable foreign observer accuses e soldiers of atrocities." The army recently surrounded the village of Demra where the Mukti Bahini had never been, raped all the women between 12 and 35 and shot all the en older than 12."

It further writes, "only days' later Pakistani gunboats swept up the river Chalna eking fishing boats and shooting the fishermen as they swam for safety." But the agazine's senior editor rightly points out that the more repressive Pakistan's army is and e more atrocities they commit, the bolder the resistance will be from the people. It will only strengthen the power of resistance rather than subjugating the people. The Magazine rites, "all this accomplishes is to make the resistance in East Pakistan more extreme and

more dedicated than ever. The majority of people are already anxious to break away from Pakistan and the Pakistan army commanders are beginning to realize that they are trapped in an unsinkable guerilla war."

"Yahya's shrinking alies" was the editorial headline of the Guardian of London on November 9. It mentions how Pakistan is gradually being isolated and Yahya Khan's closest friend China is now gradually withdrawing her support. The editorial says "events are running inexorable against Yahya Khan. The continuing American aid stopped dead yesterday and China most devoutly. .of allies has sent Yahya Khan's emissaries home from Peking with the softest of comradely cotton wool." With the American stoppage of arms supply to Pakistan, the editorial says "it leaves Yahya without western friends. The West Pakistan generals in short have come to an end of their path of bungling violence." Chinese cold behavior with Yahya Khan's representatives in Peking is also reflected when the editorial says "unease became manifest during the talks. There is no prospect of intervention by China against India if war breaks out. If war comes indeed Pakistan will be operatively alone, deserted and condemned."

"Pakistan army still killing and looting-says refugees" was the headline of the Daily Telegraph, London. The Newspaper reports "it was at first thought that the wholly Muslim Pakistan army was concentrating its attacks on Hindu villages but officials regard the latest evidence as proved that the army is waging a straightforward campaign against any one thought to offer support to the idea of an Independent Bangladesh nation."

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

As the days go on the Mukti Bahini's offensives intensify more. "Wave of sabotage in East Bengal as border tension rises" was the headline of the London Times this week. It writes, "the most spectacular act of sabotage carried out by the guerillas was the sinking in Chittagong of a large oil tanker that was about to sail for Dacca, 7 of the crews were missing". The Newspaper's Dacca correspondent Malcolm Brown further says the guerillas have recently blown up patrol fuel supplies to hamper to Pakistan army, and have so far sank or damaged at least a dozen ships." He further writes, in the past 24 hours they have also assassinated a leading Dacca Lawyer in his room and set off three large bombs in a power station leaving Dacca and two towns nearby without electricity for most of the day. Lack of power yesterday caused a water shortage in Dacca. He goes on to say electric power in Dacca and elsewhere in East Pakistan has been progressively disrupted by sabotage to the point where there are half a dozen power outs every day.

"Dacca Business Centre shaken by bomb blast" was the headline of Daily Telegraph of London on November 12. It says, a heavy explosion had shaken business centre of Dacca yesterday when a bomb exploded in a car a few yards from the entrance to the main post office. A reliable British eye-witness saw one man killed but later it was learnt 3 people were killed." About the morale of 6,000 West Pakistan Police who were brought m to East Pakistan in March is at a very low point, reports this Newspaper. It says "they

are beginning to show signs of severe strain. .several units have been confined to barracks for the past week." The correspondent of this paper further writes "I understand the police who came to Dacca to replace those members of the East Pakistani force who had defected to Bangladesh were told they would return home on September. As there is still no signs of relieve for the force, they are becoming increasingly truculent in their demands to be given a firm date when they will return to the West.

That the troops out of their desperate situation continue to harass ship-keepers by demanding goods the reporter writes "I have also seen some West Pakistani soldiers in groups harassing shopkeeper. The behavior of the troops is certainly worse than it was two months ago."

"Guerillas disrupting flow of Pakistan's raw jute" was the headline of Financial Times of Nov. 12. It says "guerrilla activities in East Pakistan appear to be having an impact in supplies of raw jute to the World's Spinning Industries. According to some shipping Companies there is a continual short of jute for lifting". From a report in London Goatfrey Brown, correspondent of the Financial Times writes "the uncertainties and delays in shipments are forcing jute spinners in Europe to mop up any unbought persons afloat. As a result prices for jute are tending to rise and have gone up by 7 to 10 pounds a ton in the last fortnight."

১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

"Guerillas took over large areas of East Pakistan" was another headline in the Daily Telegraph of London. It says "7 major regions of East Pakistan have been declared liberated zones by Bangladesh guerillas. Since an autumn offensive got under way two weeks ago the 'successes are more than even guerilla commanding officers had anticipated".

The correspondent of the Newspaper gives the details about the liberated areas controlled by the Mukti Bahini. The correspondent travels 70 miles from the Indian border into the liberated areas of Bangladesh. It mentions Modhupur forest and the Sundarban forest to be the main guerilla bases of Bangladesh Mukti Bahini, The Newspaper says "apart from the main towns and the land routes between them the whole of Bangladesh excluding the north-west becomes guerilla held territory". The Razakars who are supposed to guard the ferry crossing bridges, administrative buildings and army camps are not proving much of a success.

In another dispatch by Clare Hollingworth writes in the Daily Telegraph of London "Industry within 30 miles of Dacca was brought to a complete standstill after Bangladesh guerillas destroyed 3 out of 4 generators of the main power station on the outskirts of the city".

In the dispatch "guerillas cut off Dacca Power Station" Clare Hollingsworth further writes, 3 explosions occurred inside the compound of the well-guarded power station at

Siddhirganj. They caused an immediate cut in electricity supplies even to emergency, clients such as the workers house, police and army barracks. She further writes, the most : serious result is that at least one thousand workers in jute mills and light industry in the Dacca region will be put out of work, where around 60% of the working population were already unemployed.

The Times of London writes about the conditions that are now prevailing inside Bangladesh and the absolute failure of the Pakistan Government's attempt to administer the occupied areas. The law and order situation has gone completely out of hand. The West Pakistani soldiers and residents in Bangladesh are feeling insecure and the businessmen are taking away all their properties to West Pakistan. The Times of London writes "most West Pakistani residents of East Pakistan feels themselves dangerously threatened and many are finding some way to immigrate before it is too late." About the Mukti Bahini, it writes "the guerillas operate more or less at will, despite constant search by the army against suspected guerilla strongholds." It further writes, "military morale is understood to have declined. Police' morale has also suffered." The Newspaper further confirms that police and Razakars are joining the Mukti Bahini in a much larger way. It says "in June the Government sent over a force of West Pakistani police officers, and men to replace the defectors. The force was told that the assignment would be only for the duration of a brief emergency but they are still here and the emergency appears more serious than ever.

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

The occupation army of Yahya Khan has started to disintegrate. They are on the brink of collapse as they suffer heavier casualty's every day. The more they continue their atrocities and repression, the more support the Mukti Bahini enjoy from the common people. The fool, dull and the below-average soldier, Yahya Khan, has gone stark staring bankers. The Daily Express of London describes him on November 17 "he is a thick-set, somewhat cumbersome man. It is to his great discredit that he has not visited Bangladesh since the crackdown began on March 25." It further goes on to say "he has relied for his information on reports from his commanders and one can only assume, that is why, both refugees and guerilla fighters have been dismissed by him as miscreants and Indian infiltrators,"

Ian Brodie, the Foreign Correspondent of the Daily Express further accuses Yahya Khan by saying "he has precipitated the crisis when the result of the Pakistan election, a big win for Sk. Mujib, did not suit him." He further writes about Yahya Khan, "Yahya Khan, the bull headed man seemingly somewhat bemused by the peril he has wrought". He further goes on to say "when General Yahya says he is just a simple soldier he should be taken at his word. With his hectoring manner he is better suited to be a sergeant-major than a General.

The Financial Times of November 16 reports Mrs. Indira Gandhi to have said to the Congress Party executive "Bangladesh has come to stay, (here is no power on earth which can alter this real position."

"Mrs. Gandhi reported to have given ultimatum over Bangladesh" was the Headline of the Times of London on November 17. In this dispatch Peter Hazelhurst reports "Mrs Gandhi the Prime Minister had given the international community a time-limit of two weeks to resolve the crisis in Bangladesh."

"Mrs. Gandhi sees tide turning" was the headline of Daily Telegraph of London on November 16. David Loshak, the New Delhi correspondent of the Newspaper writes "Mrs. Gandhi the Indian Prime Minister told parliament yesterday that the international tide was turning against Pakistan."

That Pakistani troops in the occupied areas of Bangladesh are getting more desperate everyday is now confirmed by the report in the Daily Telegraph of London of November 17. "Pakistanis murdered Priests" was the headline. The correspondent writes "American Roman Catholic Priest Father William P. Evans was shot dead at the weekend, 17 miles south-west of Dacca. He had lived and worked in Pakistan for 23 years" Clare Hollingsworth further writes "I was on my way to his Mission Church of Bukshnagar when he was murdered in a disputed area of no roads or telephone. The boatman he engaged to take him from Gola to the Mission described what happened to the Archbishop of Dacca who was staying at the Mission". The boatman told Clare Hollingworth "we were boating down the river when military guards ordered them to report to the local commanding officer as the boat was searched. Father Evans was questioned and allowed to return to the boat. But for some unknown reason they took Father and me out of the boat and forced us to sit in a ditch".

Clare Hollingworth, the correspondent of the Daily Telegraph, further describes the most criminal and treacherous act of Pakistan army in killing Father Evans, the respected American Roman Catholic Priest in Bangladesh. She writes "although the commanding officer was satisfied about the identity of Father Evans the army began firing at close range." The boatman told the correspondent " I broke lose in fear of my life and they fired at me also a couple of time but missed. I later heard from another boatman in the neighbor that Father was shot dead and his body thrown into the river."

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

The report of massive attack of Mukti Bahini on the occupation army continue to bring tremendous success every day. They have now intensified their offensives from every corner and at every sector wherever the troops of Yahya Khan are existing. The world press in almost all the capitals report on the successes of the Mukti Bahini.

"In Bengali guerillas Hamlet hope is high" was the headline in the New York Times

of United States. Malcolm Browne in this dispatch from Bangladesh writes "under the precepts of warfare laid down by such Asian strategists as Mao Se-tung, Bangladesh is a guerillas haven, with the terrain mostly on the side of the fighters of the Mukti Bahini". He further writes quoting the Mukti Bahini leader of the area saying "If you foreigners would send us the arms and ammunitions we need we could throw out the Pakistan army in 7 days. The correspondent further writes "traveling on a motor launch and a Shampan I was escorted to the hamlet which is south of Dacca by a guerilla guide. This guerilla I hamlet, in common with many rural communities in the deltaic flood plain of Bangladesh, is a good 20 miles from the nearest road or footpath. It is accessible only through a maiz of shallow canals clogged with water plains with innumerable positions for ambushing intruders." "Guerillas in liberated zones like this one feel completely secure from army operations and houses displayed Bangladesh posters and portraits of the imprisoned Bengali leaders Sk. Mujibur Rahman". The correspondent further appreciates the organisation of the Mukti Bahini by saying "when traveling with guerilla agent in Dacca and elsewhere, an elaborate system of signals and clandestine arrangements smoothed the way past any potential military obstacle. He further writes an exact knowledge of where won liberated zones ends and the other begins is important to everyone in Bangladesh. As a rule of thumb, foreign diplomats and military observers consider that about a quarter of the region is in the control of the guerillas who claim a force of at least 100,000 men. But even in the heart of army occupied territory Pakistani control is tenuous".

Malcolm Browne further writes that the guerrilla commander told me "in common with all guerilla movements we captured our arms from the enemy". He further mentions "communications between guerilla districts are said to be rapid and reliable". During my visit a guerilla arrived from a distant zone carrying a plastic case sealed against the mud and rain and containing battle directives propaganda posters and copies of the mimeographed Mukti Bahini Newspaper.

"Bangladesh forces take down in drive to gain control on vital communications link" were the headline of the Times of London on Nov. 18. It says, Bangladesh guerillas have captured the town of Darshana. The Mukti Bahini's aim in this sector seem to be to push further east to gain control of the main road link between the port of Chalna and districts in the north and the east. The Road is also vital for control of the important towns of Kushtia, Jessore and Khulna.

John Stonehouse in a debate in the British Parliament on Nov. 18 again demanded of the British Government to recognize Bangladesh. In this debate in the House of Commons the former Cabinet Minister of the last Labor Government said the United Nations has through inactivity completely failed to do anything about the rape of Bangladesh and that some initiative must be taken to get Yahya Khan to call off the repression carried on by the army in East Bengal, to release Sk. Mujib and to allow the people of East Bengal to decide their own future.

He said "Awami League leaders who survived the carnage and escaped, declared the Independent State of Bangladesh and it is that state that we should recognize as having come into existence."

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১

The Mukti Bahini for the whole week have now been engaged in fierce fighting with occupation army in all sectors of Bangladesh. "Town is liberated by the Bangladesh -guerillas" was the headline in Morning Star of London on Nov. 23. It says "Bangladesh forces have liberated the town of Chougacha in the Jessore District of Bangladesh after a bitter battle with Yahya Khan's troops". It further quotes "after the capture of Chougacha, 14 miles north-west of Jessore town, Yahya Khan's army withdrew to the nearby town of Navaran from which they were launching counter attacks on the Bangladesh Mukti Bahini." It further says "the Mukti Bahini had also made advances over the weekend in Kushtia, Khulna and Jessore districts on the border with West Bengal and before capturing Chougacha it has taken Maheshpur 23 miles north-west of Jessore town." The Newspaper further writes, "the Pakistan army suffered immense losses in men and tanks planes in the engagement with the cracked commandos of the Mukti Bahini in Jessore and Kushtia sectors. The commandos are pressing forward liberating more areas 3se two sectors."

It goes further to confirm, "the Mukti Bahini had liberated Debhala a border town in khulna district after a grim and formidable battle:' The Bahini also captured Kaliganaj and were advancing in lands from there. The Newspaper further says "in kustia the Bahini is…..towards the towns of Jibannagar and Damurhuda under cover of own artillery established in liberated areas near the Indian border towns of Banpur and Gidi. Yahya's army was suffering heavy casualties and that the sound of shell fire Mukti Bahini's 25-pounder artillery could be heard in Krishnanagar more than 20 from the battle scene.

“Guerillas make major gains in Bangladesh" was the headline of the Daily Telegraph of Nov 23. David Loshak a correspondent of the Newspaper reporting from Delhi says “Bangladesh government guerillas make major advance against the Pakistani army in bangladesh. The guerillas were said to have met again in Khulna, Kushtia and Jessore districts and have taken the town of Chougacha".

The Financial Times of London reports on Nov. 23 "the Mukti Bahini in a consorted offensive have overrun 10 Pakistani positions in different districts of Bangladesh from a in the south to Rangpur and Sylhet in the north. The guerillas have, inflicted casualties on the Pakistani troops at all the places where the fighting have been in progress since last Friday". It further says freedom fighters have liberated 14 villages spread over a wide areas in Kushtia and Jessore districts following a fierce battle which

"Bengali guerillas put on the pressure" was the headline of the Financial Times. In a dispatch by its correspondent from Karachi the Newspaper writes "Mukti Bahini guerillas continued to increase pressure on the military administration. … … …There has been a constant intensification of sabotage activities making the situation fluid and difficult despite the strict measures taken by the military regime over past few weeks to deter guerillas from escalating their activities". It further says, "the chosen targets of the guerillas include industrial establishments, disrupting communications and shooting peace Committee members cooperating with the government with the object of creating panic and paralyzing civic life and administration to the extent they have abandoned hope of a return to normal".

"Razakars help of Bangladesh forces" -was the headline of the Scotsman of Britain on Nov. 22. It says, the Razakars in Bangladesh are no more then headed group they used to be. They have found a new rule that make them acceptable at least partly to the guerillas. The Razakars employed by Pakistan army have reportedly been helping the guerillas lately with vital information about the army. The Razakars inform the rebel commando to leave or take defensive positions before Pakistani army plans to attack them. It further reports many recent successes of Mukti Bahini had been due to the information that had come primarily from the Razakars. The Razakars also provide the Mukti Bahini with protective cover.

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

All over Britain and elsewhere Bangladesh residents are rejoicing at the news of India's recognition of Bangladesh Government as a sovereign Independent State. Ian Nrodie, special correspondent of Daily Express in a front page dispatch says "Sullen and silent villagers of Sudigh picked through rubble of their homes. ."

John Pilger, chief international correspondent of Daily Mirror, which has a circulation of 15 million a day, was the first outsider to view result of what obviously has been the most efficient blitzkrieg since Israel's six-day war in 1967. One Bangladesh old man told Pilger "my friend you are too late, they have taken all our women and all our;' girls they have taken many of our young men too. Still we are glad you have come Joi Bangla".

The ruffle feathers here and any other parts of the west caused by the Indian army's action in and around East Bengal appear to be giving way to an attempt to view the escalation of the fighting in some perspective. In a feature article, the Times of London said "it would be wrong to put the blame on India for following this realistic policy and putting power to the test. For 8 months the Pakistani government………….almost willfully turning aside from the political reality of the Eastern wing………..It further goes on to say "they cannot hope now to swing, international support to their side by representing themselves as innocent sufferers from unprovoked aggression. And if India have calculated that the cost in human suffering could be less from the limited action they

have undertaken no one can easily accuse them of gross misjudgment". The Times of London in the same article says, for the moment however the Pakistan government is being urged to acknowledge its impose and to make concession that will return real political power to the elected representatives of Bangladesh.

On the continent, comments in France and West German Newspapers by and large suggest the same line. The Daily Telegraph of London writes. President Yahya's possible aim was to install a civilian government which would include Bengalis in the next few days in an attempt to outmaneuver India but it failed.

The Times-of London on December 6 writes "as Pakistan has rejected all the warnings of such appeals as world leaders made, India believes she has no voice but to enforce a solution for Bangladesh". It further goes on to say given the brutality of Pakistan behavior in the East since March 25, given the suffering imposed on so many millions of refugees and given the strong backing in Bangladesh for provincial autonomy Pakistan enters the conflict at best with a weak and disreputable record. The Daily Telegraph of London suggested on Dec. 6, "the best thing that could happen on the circumstances would be an early Indian victory in Bangladesh so that India could neutralize Pakistani offensives in the West.

Sir Alec Doglas Hume, British Foreign Secretary in a statement to the House of Commons refrained from making any value judgment on the Indian subcontinent. The leader of the opposition Mr. Harold Wilson associated himself with Sir Alec's attitude in not arriving at a snap judgment on the issues raised by the fighting.

Mr. John Storehouse, the leader member of the Parliament and a former cabinet member congratulated Sir Alec for not supporting the U. N. resolution and declared that the world community was to be blamed for not recognizing the rights of the 75 million people of Bangladesh.

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

In a statement circulated through the East German News Agency ADN, the East German Government echoed the Soviet stand that the bloodshed in the Indian subcontinent should be halted immediately. The statement said "East Germany was and is not indifferent to the situation on the Indian subcontinent". It says "responsible governments interested in world peace had made several appeals to Pakistan to guarantee a peaceful settlement in Bangladesh. India also had made repeated proposals for a peaceful political settlement but Gen. Yahya Khan did not see any reason to it.

In Paris, French Communist Party in a statement said "Pakistan's declaration of a state of war with India had created an extremely grave situation in Asia". The statement further said "the conflict had been triggered by the Yahya Khan's government's refusal to recognize the massive success of the Awami League in the last year's elections".

A commentator of the Communist Party newspaper L `Humanite said "It is of great significance not to lose sight of its root causes. En the course of over 8 months it has been not an Indo-Pakistan conflict but a war unleashed in Bangladesh by the Pakistani military authorities '.

The Times of London writes on December 7 "India has now affirmed the political end of the war in Bangladesh in the hope that doing so the military end will be reached sooner. No room is left for compromise, no protest from any quarter, no ceasefire resolution at the United Nations or observers interjected between the combatants will alter India's resolves." The Daily Telegraph of London says "given India's policies and the stage which had been reached on the ground in Bangladesh the decision had indeed become logical."

The Guardian writes "Bangladesh born on blood and desperation will not go away now. Even if the international efforts for peace succeed Mrs. Gandhi's recognition of a Awami League government will still stand backed by substantial territorial control". The Reuter reports "Radio Moscow today accused China of lack of sincerity in current moves in the United Nations to find a peaceful solution to the Indo-Pakistan conflict". It further said "China was colluding with the imperialists in betraying the national liberation movements".

The New York Times of Dec. 7 accused President Nixon of supporting Pakistan under the guise of neutrality in the Indo-Pakistan conflict. In all editorial it says "everything failed to condemn the repression in Bangladesh or to press for a genuine political settlement. The United States has now flatly charged India with major responsible for the resulting international conflict having waited months to suspend arms aid to Pakistan. The administration has now promptly suspended military aid to India. This is hardly ‘absolute neutrality The editorial further says "the United States efforts at the United Nations first in the Security Council and now in the General Assembly have been aimed at bringing about a simple cease-fire and withdrawal of forces". Urgent and desirable as such action surely is, it cannot be practically effective unless the United Nations and its leading members specially the United States are prepared at the same time to recognize and attempt to deal with the root cause of the problem with Pakistan.

With regard to President Nixon's last desperate bid to save his face by saying that America would remain absolutely neutral in the South Asia conflict, the editorial further said "President Nixon's declaration of absolute neutrality in Indo-Pakistani conflict fails to conceal administration policies, which have in fact, been obviously biased in favor of the government of President Yahya Khan in Islamabad."

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ইংরেজী প্রতিবেদনমালা	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	জুন-নভেম্বর ১৯৭১

১৫ জুন, ১৯৭১

SHOCKING WESTERN APATHY:
BANGLADESH NO BIAFRA OR INDONESIA

Western popular response to the tragedy of Bangladesh has been very slow in warming up. The responsible press based at London, New York and Washington has pointed this out more than once with elements of bewilderment. However, the reaction to the cool reception, in the people of Bangladesh, has been quite sharp. Because we know (hat thousands of innocent's lives could have been saved only if western people and governments could use their influence on the economically bankrupt regime of Yahya to stop its totally uncalled-for genocidal war on the people of Bangladesh. It was a better realization. We can't believe that twentieth century civilization could remain a silent spectator to an outrage that negated and demolished every one of its cherished norms. They hoped and waited. They hoped against hope and waited. Lingering days grew into long weeks. Weeks into months. But little happened except lip service.

What could be the reason for such bewildering apathy? The World press is already calling the tragedy of Bangladesh as something than that of Vietnam. Yet where are those thousands of white radicals, students and peaceniks who can work themselves into frenzy over anything happening in South Africa or Vietnam? Why the militant Black Power movement and Women's Lib are silent?

Yahya's genocidal war against Bangladesh is both racist and communal in character. Yet where are those vociferous crusaders against racism? The whole apathy tempts one believe that, despite the advances in technical civilization, the world has remained spiritually where it was during the ages of colonialism and slave trade. It is not divided into nationalities as we want to believe but into two distinct zones of whites and colored's with the latter overwhelmingly outnumbering the former. White radicals suffer pangs of conscience only when whites set about the colored's. But when colored's commit genocide among themselves they close their rank and seem enjoy a common secret pleasure. White radical's conscience remains linen clean as long as the whites remain out of the bloody game. I do hope I am not wrong in my interpretation.

There may be a second reason behind this apathy. Yahya regime, aided by some malevolently tendentious reporting of the tragedy by some irresponsible western journalists, has succeeded in convincing a section of the whites that Bangladesh

* প্রতিবেদনগুলি আলমগীর কবির রচিত

liberation movement is actually a secessionist movement like that of Biafra and thus can meet no other end but defeat. One Western radio still insists on calling our liberation fighters separatist guerillas. Yahya's apologists also cite the example of Indonesia's Suharto who successfully removed the extremely popular nationalist leader Sukarno simply by decimating half a million alleged members of the PKI. Emphasizing that Yahya, too, would find pace and keep Pakistan together simply by decimating the Awami League and the Bengali intelligentsia. Just before the launching of the genocide Zulfiqar Ali Bhutto's Karachi weekly Combat hinted at these consequences with relish and with a view to warning the people of Bangladesh against demanding too much of autonomy through Six Points formula.

Needless to say that all these beady-eyed fascists have been gazing through the wrong end of the political telescope. They failed to sec that the Bangladesh liberation struggle is not a secessionist movement and that the issues at stake are essentially different from those of Biafra or Indonesia. In Indonesia Suharto succeeded because he did not go for genocide and aimed only at the liquidation of the Communist Party which did not enjoy even a quarter of the popular support enjoyed by Awami League in Bangladesh. In Biafra, the issue was essentially tribal in nature and it was the revolt of a small minority against an overwhelming majority. That was armed to the teeth, and, as such, was doomed from the start. In Bangladesh, we have a clear cut case of liberation movement. Here the majority of the populations have decided to rise after 23 years of brutal economic and political exploitation by the vested interests of West Pakistan aided by a fascist army. It was impossible for them to remain in a union where mutual trust and respect and not a common religion could be the only basis of unity. Added to this, remains the unique geographical and ethnical reality.

The war is indeed a mad venture of the Army junta that still appear to be too pig-headed to realize the extent or even the nature of their folly. It is a matter of great pity that the western world in general could also be a victim of the same myopia.

১৬ জুন, ১৯৭১

UN PROVED IMPOTENT

The failure of the United Nations to act against the genocidal war of Pakistan's military junta against the people of Bangladesh shocked world conscience more than anything else. The suffering millions waited in vain for Secretary General U Thant to Kit least to restrain the marauding hordes of the fascist junta from decimating innocent men, women and children who had little concern with politics except that they voted for Sheikh Mujibur Rahman in an election conducted by Yahya himself. The Indian delegation to United Nations tried his best to make U Thant take a positive step to make the Security Council wake up to the threat to peace not only in the sub-continent but also in e of Asia. Yet nothing came out of it except U Thant's offer of humanitarian aid for distressed only if Yahya asked for it. But Yahya had no intention of bringing succour

to those whom he himself, with deliberation, has thrown into great misery. The Secretary General, however, remained fully informed of the carnage and genocide through one or two UN officials who were not evacuated during March. The shocking tale, however, forced him to make public his private sorrow and disgust. He termed the tragedy as one of the most horrifying in human history.

Presently world pressure is mounting for UN intervention in Bangladesh, Leading British and American papers have called upon the Security Council to take up the matter with due urgency. Whether the Secretary General can stir up the council member sufficiently to call a meeting is something that we would not like to speculate upon at this moment. But with USA and Britain still sitting on the fence and Soviet Union too cautious to act hastily this may not be an easy matter for U Thant.

Whether the UN tries to Jive up to its great expectations for the first time in its history or not, the people of Bangladesh and the freedom fighters would do better to rely upon nobody else but themselves for liberation. The history of the United Nations hardly encourage high hopes. It intervened several times in Africa but this or that big power rendered its efforts sterile. We only have to look toward Congo, South Africa or Rhodesia. There is a chance that UN intervention in Bangladesh would only confuse the issue further and add to the misery of the suffering millions unless big powers take direct interest in the inevitable independence of Bangladesh.

As the sole and moral spokesman of the people of Bangladesh-Sheikh Mujibur Rahman raised the issue of Bangladesh in March when U Thant ordered his personnel to withdraw from Bangladesh apprehending the massacre that followed. That should have provided him with sufficient grounds to make UN come to the rescue of the people of Bangladesh.

But all that is old history now. A Sot of blood has since flown under the bridge. 74 million Bengalees have survived the shock and are now regrouped and morally reinforced and all poised to shatter the myth of Pak Army's prowess once and for all. The ultimate victory is very much in view. All that is needed now is' total unity, and unflinching patience and courage.

১৭ জুন, ১৯৭১

BRITISH PARLIAMENT DEBATES BANGLADESH

Bangladesh has become once again a hot subject of debate in the British Parliament, thanks to that section of Labor MPs who had also acted at the very beginning of the carnage by demanding an immediate ceasefire. 120 Labor members of the parliament have emphatically demanded the recognition of Bangladesh government because, insist, that "with the widespread murder of civilians and atrocities on a massive scale, the

Pakistani Army forfeited all rights to rule East Bengal." In a motion tabled at the House of Commons they called for a meeting of Security Council to consider the threat to peace and contravention of the Genocide Convention.

It was indeed a bold step particularly when one realizes that the Conservatives have the issue of Common Market at its disposal to get the mind of the British Public off any other world problem including the horror in East Bengal. Political observers believe that the British Government would stick to whatever policy toward the Pakistani genocide it has so far been following despite opposition pressure. Still the debate might help to make Sir Alec more cautious in accepting the promises of Yahya about a political settlement on their face value. If that happens then British economic aid to the Reactionary junta would be slow in coming and help the liberation movement however indirectly, however modestly.

What the influential world politicians with conscience and human feelings could do now is to expose the treacherous nature of Yahya and the group of lunatic general backing him. Right from the day he usurped power while his ailing mentor Ayub Khan kept the politicians busy with a fake Round Table Conference in 1969, he continually played a game of unpardonable deception with the people of Pakistan, particularly with the people of East Bengal. He proved himself a successful actor. The whole country including the wily journalists were taken in by his put up show of naive simplicity and plain talk. He did not miss a single occasion to stick out his favorite antic "I'm a soldier-I talk straight and I mean business". Yet all along he was planning with his mentally sick associates what he thought the "Final Solution" to the demands for democracy in Pakistan and to autonomy for East Bengal. To hoodwink the world he went through the expensive paraphernalia of an election. It did not cost him anything but cost the taxpayer's 8 crores of very hard-earned rupees. Foreigners thought that the whole thing could not possibly be a hoax because a poor country like Pakistan could not possibly afford to allow such an expensive election go waste. Well, they did not know much about Pakistani military madness. Nor did we. Thus the history's worst betrayal of the people, that remained also the decade's most well-guarded secret, was given effect on the night of 25th of March. That Yahya and his associates are some of the most deceitful liars of this century was further proved from the lame explanation he put forward in defense of his genocidal war on Bangladesh. On March 26 in his broadcast he said that he had no choice but to act the way he did because the Awami League has been trying to run a parallel government during March and because Pakistani flag and Mr. Jinnah's picture were torn and army personnel were insulted by the public. His henchmen could not think fast enough to put forward the Awami League plot of revolt in Dacca and Chittagong and consequent arrest of Yahya and his generals-an excuse that was extended about a month later for the world press. His recent speeches show that he likes the latter story and considers it suitable for convincing foreign governments.

The fact is that his lies are as clear as daylight now. He has proved himself a lowdown conspirator, and an unrepenting murderer. Despite his boasts about soldier ship

he and his henchmen generals are a disgrace to the uniforms they wear. It is only a matter of time before the Army proves itself a traitor even to the people of West Pakistan. Yahya has already used an over-clever, greedy and over-ambitious Bhutto in his conspiracy against the people of East Bengal. The playboy politician has now been pushed into oblivion. But the junta has a more vicious role for him in view as soon as they can finish with the problem in the East.

Thus, any promise coming from such a confirmed liar and a traitor as. Yahya should cut no ice with Western governments that sincerely wish to see a people's rule in East Bengal which has now evolved into an irreversible People's Republic of Bangladesh. A political settlement can be possible only if the conditions put forward by Syed Nazrul Islam, Acting President, People's Republic of Bangladesh, in his radio broadcast of 6th June are accepted unconditionally:

These are -

a) Release Sheikh Mujibur Rahman and all political prisoners.

b) Total withdrawal of all Pakistani soldiers from the soil of Bangladesh.

c) Recognition of the Government of Bangladesh.

d) Compensation for the economic exploitation of East Bengal since 1947 and indemnities for the war losses imposed on Bangladesh since March 25.

২৫ জুন, ১৯৭১

MORE US ARMS FOR KILLING BENGALEES:

AAPSO FAILS TO UNDERSTAND BANGLADESH

The U. S. Government's concern for the victims of Pakistani genocidal war on the people of Bangladesh that has already taken a toll of about one million innocent lives came under suspicions once again with some fresh shipment of military hardware for Pakistan. Despite the pledge given by the State Department to the Congress about the stoppage of all military aid to Pakistan after March 25, two Pakistani freighters sailed from New York with deadly equipment. The licenses were issued, as has been admitted by the State Department official, on March 31 and April 6. He said that the government decision of March 26 to stop arms shipment look several days to be put into effect.

Whether such an excuse of common lapse can be accepted as genuine has been questioned by a personality no less than that of Senator Stuart Symington. He said: the fact that these shipments have gone forward indicated that the State Department either did not know what was going on or misled the Congress." Senator Edward Kennedy n already challenged the U. S. government about the truthfulness of its promises. Meanwhile comes the news that a third ship has also sailed for Pakistan carrying & probably war goods. The incident that has shocked the world along with the entire U.S.

public is sure to rock Secretary of State, William Rogers, if not the White House itself. We in Bangladesh wonder if the existence of a pro-Pakistan cell within the State Department is possible-a cell that cleverly manipulated the movement of files to create technical delays necessary for the Pakistani freighters to load and sail before the government decision is officially effected. Is it also possible that the Pakistani military-junta bribed some key officials to obtain clearance for their deadly cargo that is sure to be used in the genocide of Bengalese? It would be for the Secretary of State to probe into the matter and eliminate the cell if it really exists.

The least the U. S. government could do now to prove its sincerity is to intercept the ships on the high seas and seize the cargo. There is no time to be lost. Pakistani killers are clever enough to transfer the cargo to ships flying different flags to evade any action.

Another sad episode appears-this time from the mid-eastern front. The Afro-Asian Peoples Solidarity Organisation that held its 10th session in Damascus this week, failed to find enough sympathy for the million dead and over 5 million refugees of Bangladesh caused by the Pakistani fascist junta. Being forced by the unrelenting pressure of the Indian delegate a brief resolution was passed that expresses least amount of sympathy possible for the victims of the tragedy. Kabir Ahmed, a representative from Bangladesh, was allowed to be present at the sessions, but was not allowed to speak. Why the Arab countries who dominated the scene failed to find sufficient grounds to condemn history's worst crimes against humanity perpetrated by the Pakistani military junta appears like a paradox. The debate on the issue proved shockingly controversial and it was clear that the representatives of Libya, Syria, UAR and Nigeria were too prejudiced by the official religion of Pakistan to pay much attention to the crimes committed in its name. Nigeria of course, could not support the cause of Bangladesh because it itself committed a similar crime in suppressing its minority population of Blafra. Libya is a mediaeval monarchy with little concern for democratic principles. Since the death of Nasser, UAR has fast moved towards rightist fanaticism. It is quite significant that, contrary to the altitudes displayed by the reactionary Arab Governments, Yassir Arafat, the leader of Palestinian Guerrilla Organisation Al Fattah has expressed his unreserved solidarity with the people of Bangladesh struggling for freedom against some of the most detestable criminals of history. It is a matter of great regret that the Afro-Asian People's Solidarity Organisation has found enough grounds to express its solidarity with these criminals instead of 75 million people struggling for independence and democratic rights. This very act of the Arab States delivers a terrible blow to the fundamental principles of Afro-Asian People's Solidarity Organisation.

৪ ও ৫ জুলাই, ১৯৭১

EMERGENCE OF SECULARISM

One of the most significant resultants of the liberation struggle now being waged in Bangladesh against an army that is sick with communalism has been the emergence of

secularism. For the first lime in known history-Moslems and Hindus faced a common enemy without a trace of internal dissension. Both suffered equally and both are now resolved to destroy the enemy once and for all so that they would be able to live in a free land where social relations particularly the relation between religious communities would be founded on a totally new economic base that would guarantee inter-community peace.

The emergence of secularism that has now been irreversibly consolidated actually found a popular base during the Language Movement of 1952. This is probably the only movement that has been almost exclusively interested by students and later nourished by the intelligentsia.

The communal riots that occurred in East Bengal were almost always provoked by the ruling clique with the aid of a section of non-Bengali refugees. These refugees, being bitter victims of the partition always proved willing collaborators in the hope of expropriating the property belonging to minority community if they could be forced to leave for India, In the communal frenzy of 1950 a section of Bengali Muslims were also tempted by the then Muslim League into believing in similar material gains.

The main grievance that the Muslim community put forward to build a case for Pakistan in Bengal was the economic dominance of the Hindu community. After partition the situation reversed abruptly in East Bengal but the vested interests continued to use the old bogey for their own ends. The Kashmir issue proved very handy for a time.

Then came the beginning of the great awakening, Soon Bengali Moslems began to recognize the real forces of economic exploitation that were tightening their grip on the rich soil of East Bengal. Soon after the creation of Pakistan the blue-print for transforming East Bengal into a virtual colony had been drawn up by the vicious military-capitalist-bureaucratic entente based in West Pakistan. The first onslaught came through the embargo over Bengali language. The aim was that if Urdu could be imposed on the people as the only State Language the cultural, political and economic dominance would automatically pass to the 3 per cent of the population whose mother tongue happened to be Urdu. Bengalees smothered the design successfully. But communalism still remained a lever in the hands of the ruling clique, After 1952, East Bengalees felt the need for a sane, normal relationship with neighboring India. This frightened the rulers because anti-Indian jingoism had helped them so much in their political deception and economic exploitation of the people. They made a desperate attempt at reviving communalism in East Bengal in 1964 in the wake of the communal disturbances that took place in India over that missing prophet's heir from a shrine in Kashmir. This time the division was clear. One side, aided by the military regime of Ayub Khan, those non-Bengalis were all set to create a bloodbath. Opposing them came out the entire Bengali Moslem community led by the intelligentsia. Newspapers came out with 8-column banners urging people to counter the vicious design, For the first time in history Moslems died trying to save Hindus from murderous knives. The outcome was spectacular. The riot was quelled

This popular inclination for secularism frightened the regime that desperately looked for yet another way to revive the old scourge. The Indo-Pak war over Kashmir that came only a year later was a direct outcome of this policy, A section of the intellectuals were bought over by the regime to rouse popular frenzy against India. But the people were not at all convinced about the necessity of a war over a piece of land that they have never seen. Shastri Government's decision to not to attack East Bengal reinforced the justification further.

The credit for this steady growth of secularism in a people that only 23 years ago thought in terms of nothing else but religion should particularly go to the popular political parties. The Awami League initiated the march of sanity when the party decided to introduce joint electorate system for Pakistan and dropped the word "Muslim" from its nomenclature. This also quickly won over a large section of the minority community for its membership. Other left parties also steadfastly held on to secular political concept. During the election campaign of 1970 rightist parties with clear backing of Yahya regime and foreign reactionary forces tried to revive communalism. They were thoroughly beaten,

One might ask-can there be a revival of communalism once Bangladesh becomes a free country with a Muslim majority? The answer is no because through the liberation struggle most of the built-in economic antagonisms of the society are being eliminated. A new beginning would be made where ability and need would be the only criteria of economic distribution. Neither religious denominations nor the social set up that existed prior to March 25 would have any relevance to the processes of the new state.

৫ জুলাই, ১৯৭১

BRITISH DELEGATION SLATES YAHYA, TIKKA

The British Parliamentary delegation that visited the occupied areas of Bangladesh last week has not only overcome the traditional British passion for understatements but has come out with a clear indictment against the law of jungle that has been introduced by Pakistan's military regime over the land of Bangladesh. Arthur Bottomly, a former Labor Minister, and the leader of the delegation tried his best to remain dispassionate despite the signs of horror that he and his fellow members witnessed during their army-conducted tour of certain areas of the occupied zone. While in India, although his teammate conservative M, P. Toby Jessel emphatically denounced Yahya regime for the genocide he and his army committed against the unarmed people of Bangladesh. Mr. Bottomly remained satisfied with somewhat non-committal euphemisms. But as soon as he reached London he woke up at least partially to the great responsibility that he and his team had laid on them. He did not mince words. He said: "President Yahya's administration had totally failed in Bangladesh." He further said, "this is clear, we are convinced of it," Mr. Isonomy in a statement on behalf of the team put Tikka Khan, the

executioner of lakhs of Bengali men, women and children, on the dock. He said that "Tikka Khun has no understanding of the economic and social aspects of the situation. His army not only committed atrocities hut it is continuing to do so." The team also found Yahya an arrogant power drunk man when he turned down (he team's request to let them meet Sheikh Mujibur Rahman. Yahya apparently denounced Sheikh as a criminal. Thus the architect of the murder of a million unarmed men, women and children, denounces the unchallenged leader of 75 million people and a men who till the moment he was arrested believed in democratic principles and civilized codes of behavior. This indeed is a irony of history.

Toby Jessel, the conservative M.P. has now become, after what he saw in Bangladesh with his own eyes, a forthright champion of the cause of the people of Bangladesh. He is likely to strengthen the hands of that tireless sympathizer of Bangladesh tragedy Labor M. P. John Stonehouse. As soon as the team reached London Airport Mr. Jessel told newsmen that refugees would not go back home until they are asked to do so by Sheikh Mujibur Rahman himself.

Labor M. P. Reginald Prentice, another member of the team said in reply to a question (hat in 99 cases out of a hundred he would be against using economic aid as a lever. But in the present case of Pakistan it was justified. Now it would be for the delegation to force a hearing of their report in the Parliament. They must do everything in their power to force the British Government to wake up lo its responsibility as the former splitter of the sub-continent. The split is no longer working. A new balance of power must be found. If Bengali Muslims had the right to vote into Pakistan, they also have the right to vote out of it. It is for Britain to see that this right is not denied by a junta of mad generals. Britain must not only stop all economic and military aid to Pakistan but should also see that the state of Bangladeshis guaranteed of its independence.

৪ ও ১০ জুলাই, ১৯৭১

AWAM1 LEAGUE OPTS FOR MILITARY SOLUTION

Over 300 elected representatives of the Awami League met somewhere in Bangladesh early this week to discuss the future course of the Liberation Struggle that has entered a crucial and most probably, the decisive stage this week. The members met and the discussions were not open to journalists. All the members apparently resolved to fight for a military solution of the problem. It was decided to carry on the liberation war with new revolutionary zeal and annihilate on me soil of Bangladesh all invading soldiers from Pakistan. The entire machinery of the Government of the People's Republic of Bangladesh would now be fully geared toward this end.

With this decision comes to an end all speculations about a so-called political solution of the problem. A political solution always meant nothing else but a political understanding or rapprochement with Yahya regime-a regime that has already taken a

million Bengalee lives and has rendered millions and millions rootless, homeless and jobless. The very suggestion of any such so-called understanding within the framework, of Pakistan should have appeared totally repugnant not only to the freedom loving Bengalees but also to the radical sympathizers around the world. But many a genuine well wisher of the people of Bangladesh kept asking for a handshake with the killers with the hope that this might bring to an end further massacres of innocent people. Luckily Yahya and this arrogant brutes cared little about world opinion. Yahya has certainly helped the liberation movement with his arrogant broadcast of June 28. That made the situation crystal clear. The only solution to the problem is a military rout of the invading army and the rout must be carried out by no foreign power but by the Bengalees themselves. What the sympathetic foreign governments can do now is to stop all aid to Pakistan and extend all moral and material support to Bangladesh.

The world, particularly the people of Bangladesh were shocked to hear about the continued arms aid from USA to the killer junta. Many Bengalese thought this might help to defeat the Liberation Forces. One must not lose a second to point out that the arms are not going to make much of a difference to the victorious assaults of the Liberation army. As it is, Pakistan has enough arms in stock to run this war for another year. What do you think they were doing with the lion's share of national budget keeping the country underfed for last two decades? They were piling up arms. In addition, Chinese arms pipeline is always loaded. The American arms on top of this only shows Pak junta's nervousness. But they haven't enough of one thing that would not be, supplied either by China or by America and that is manpower willing to die seeking victory not for themselves but for the callous murderers. Pakistan's total number of men in arms would not exceed 250 thousand. Of this lot, the junta can deploy no more than 100,000 in to die in Bangladesh because the rest would be needed for the protection of West Pakistan borders. Of the 70,000 odd already sent to Bangladesh over 30,000 are either dead or badly wounded. The families of the casualties are not receiving even the insurance money that they are entitled to in the event of a war. The killer regime was clever enough not to declare its bloody adventure in the East as a war. This has caused so much unrest among the affected that processions demanding compensation from the bankrupt regime have started to come out in West Pakistan towns. This unrest has a built-in mechanism to grow and grow as casualties mount and mount in Bangladesh. On the other hand, Mukti Bahini has an unlimited source of manpower. Today the volunteers who have dedicated themselves to the Liberation struggle would number over 300,000. And the Mukti Bahini has only to give a call-there would be a million young fighters ready to die for their motherland. Thus, not only Pakistan cannot run this war long enough without destroying itself economically but militarily, too, it is doomed to defeat.

There is only one way to hasten this inevitable conclusion and that is by providing the Mukti Bahini with heavier arms and aircraft. The People's Republic of Bangladesh must find these. These are not impossible to get.

১২ ও ২২ জুলাই, ১৯৭১

NOT 'SEPARATISM': A WAR OF LIBERATION

A section of the world seems to be in the habit of referring to the struggle for emancipation of the people of Bangladesh as a 'secessionist or a separatist movement'. This indeed builds an impression similar to that of the separatist movements of the French-speaking people of Canada or the Flemish-speaking people of Belgium. This also builds an image about the future-a future similar to that of Katanga of Congo or, lately, of Biafra. General readers have little time to go through the pros and cons of the upheaval to discover that the movement in Bangladesh is significantly distinct from any of the upsurges mentioned earlier. Although the sympathy for the plight of the people of Bangladesh following the genocidal war launched by Pakistan against them is universal, few of the newspapers, especially those of USA, take the trouble to explain the significant difference and to emphasize that in the case of Bangladesh the end is bound to be nothing else but victory unlike Katanga or Biafra. Part of this vital discrepancy is due to the comparative ignorance of the correspondents themselves about the real nature of the movement. But to a great extent it is a deliberate attempt at downgrading the liberation movement-an attempt that is being constantly made by these forces who want to preserve the political status quo in the subcontinent for their own ends.

Perhaps time is here to explain to the world once again, in clearest possible terms, the radical distinction that exists between the national liberation struggle now being waged by the people of Bangladesh against a foreign army and a secessionist or separatist movement. Pakistan came into being because various nationalities of the sub-continent belonging to the religion of Islam chose to avoid the overwhelming economic and political domination of the Hindu majority. At the Lahore meet of the Muslim League in 1940 they agreed to work for the achievement of Pakistan on the condition that each region coining within the new state would be granted sovereignty and total economic and political autonomy. The historic Lahore Resolutions promised to ensure such a loose federation. This shows that the then Muslim League, recognized the ethnical, cultural and linguistic differences that existed among the nationalities that lived in various parts of this vast sub-continent inspite of the fact that they followed the same religion. What the Muslim League strived for was to create a new state where a lasting unity would be achieved among the various nationalities of the union through an equitable and rational distribution of economic resources and political power. In fact, the very future of the new state depended entirely on the realisation of this fundamental premise-a premise that was to be founded on mutual trust and respect-a premise that did not exist in 1947 when the state of Pakistan came into being.

In the ecstasy of the freedom from colonial rule after two hundred grueling years few of the Moslems in partitioned Bengal had the time to examine the real nature of the power transfer. Quietly the British colonial government left the reins of power to those who would serve their interest best in the sub-continent. We found a group of capitalists,

bureaucrats and army officers who, in general, had played anti-independence, anti-people role during the entire freedom movement firmly placed in the seats of power, Almost overnight these anti-people products of British Raj, who served the Raj so well, transformed themselves into defenders of the new state, defenders of its integrity and religion-integrity and religion as they interpreted them. Needless to say, their interpretations were tailored to help the preservation of their stranglehold on the new state's economy, and polity. They had no intention of striving for that cherished foundation of the artificial union. I call the union artificial because a mere common religion can never be the basis of international unity. Because, then there would have been no need for so many Arab states or the need of such a high boundary wall between Pakistan and Afghanistan both of whom have Islam as their state religion. An equitable distribution of economic resources and political power in Pakistan would have meant the emergence of a truly democratic state something that this capitalist-bureaucratic-military entente dreaded most.

Thus began the sordid story of one of the most brutal colonial exploitations in history. The large geographical distance between the two regions came to the advantage of the clique. On top the general apathy of the people of West Pakistan toward politics proved an added advantage. Fascist repression helped to perpetuate the shameless exploitation of East Bengal until a time came when the Bengalees cried out-enough. The clique, under the leadership of a fascist military junta, knew from the beginning that their exploitation of the people of East Bengal could not go on unchallenged forever and ever. Keeping this in view they kept strict surveillance on the armed forces so that the percentage of Bengalees in the forces never exceeded 10 per cent or so. And this way they thought they had ruled out any possibility of an armed rebellion. But history has surprised them.

The rest of the story is too familiar to repeat here. It has gone into the blackest phase of human history. Pakistan was born divided and the clique that captured power and still holding on to it never made an attempt to find a basis of unity with the Bengali nation in the east. It is only the natural patience of this nation that helped to linger the doomed union for 23 long years.

That the people of Bangladesh are racially, culturally and linguistically different from other nationalities of West Pakistan has been amply proved by the genocidal war that has been unleashed by the Pakistani junta. They have massacred innocent men, women and children. Indiscriminate rape of Bengali women and other indignities inflicted on them are so barbaric and inhuman in nature that only Hitler's racists madness could be compared with this. Such atrocities could never be inflicted on a nation by the members of the same nation or race whatever the degree of madness or megalomania.

Secession or separatism is essentially intra-national in nature. A section of one nation rises to secede from the rest seeking to safeguard its regional interests. But when a nation seeks to break out of an artificial union-a union that in essence is comparable to a

colonial empire, it clearly becomes a case of national liberation struggle. A case of struggle for freedom from colonialism. Human history is replete with many, many such instances. The United States of America, China or the Soviet Union-all have go through this unavoidable and irreversible stage of national liberation from foreign domination. Today if the same slates oppose or even play the part of a silent onlooker they become guilty of betrayal of the same cause that they once cherished-a cause for which they laid down lives by millions.

১৩ জুলাই, ১৯৭১

CAUSES OF ARAB APATHY TOWARD BANGLADESH

When misfortunes come they come in battalions-so goes the proverb a la Shakespeare. But never could one think that nature would pick the people of Bangladesh to make the proverb come true even if it is only for once in a century. No human being with a heart in the right place would ever want such grisly extermination campaign to take place in a Country that was still groggy' from century's worst cyclonic calamity that claimed not less than two million lives only a few months ago. But it did happen and to rub it in further came that inexplicable international apathy-particularly from governments of super powers who could do so much to stop this mad, heinous crime of the Pakistani junta against the civilization as a whole. As if that was not enough. Soon the Bengalees heard that some Arab government are finding it difficult even to express some sympathy for the disgraced humanity in Bangladesh let alone condemning the beastly crimes of the killer junta. Such a shocking antipathy caused in them more heartache than Nixon administration's open collusion with the murderers because, dating from Suez Crisis. Bengalees never missed an opportunity to stand behind the Arabs in their hour of need despite the fact that all the Pakistani regimes followed a dubious policy that actually supported the imperialist plot against Arab freedom. This was never forgotten by President Nasser as long as he was alive. Every time he had a visitor from Pakistan he would point out the sofa on which the then Pakistani foreign minister sat just before he went to London to intimate the support of his regime for British aggression in the wake of Egyptian nationalization of the Suez Canal. But things have changed radically since the disappearance of Nasser. We'll come back to that later.

I must put the facts vis-a-vis Arab response to Bangladesh freedom movement in their correct perspectives. Things are not really all black for us there. We must clearly recognize who are really giving tacit approval to Pakistani crimes and who are not. Saudi Arab government has been the first to come to Pakistan's aid. She was followed by other medieval monarchies of the desert land. We must not hasten to condemn these governments outright because we must try to understand why, for what interest would (hey approve of such a horrible massacre of a people-an overwhelming majority of whom are devout Moslems. Their reaction to Pakistani appeal for support was somewhat natural. Being thoroughly feudal in outlook these monarchies have little concern or love

for the democratic aspirations of the common masses. Common masses in these countries live in a state of serfdom and suffer perhaps one of world's wretched existences. What appealed to these governments is the clever religious overture of the Pakistani junta. As there were few Bengalees around to point out the facts, the Pakistani regime had a free field and made these monarchies believe that Islam was in danger in Bengal and that its Moslem population were fast becoming non-Moslems and were trying to join a Hindu dominated India. So Pakistan had, as it made them believe, no choice but to launch a 'Jehad" and safeguard Islam in East Bengal. It was a pill that came easy and the monarchs being totally ignorant about East Bengal swallowed it no less easily. Obviously there was none to point out that these self-styled defenders of Islam were not only the usurpers of political power in Pakistan, but themselves led a life that was in total contradiction with the tenets of Quran and Sunnah. There was none also to tell them that Pakistani army was actually butchering devout Moslems by their thousands and were destroying places of worship for no other reason hut in its attempt to crush Bengali nation's will to bring to an end the brutal economic and political exploitation of the West Pakistani military-bureaucratic-capitalist entente. Saudi newspapers that published pro-Pakistan articles by correspondents who had never been within even a thousand miles of Bangladesh and were totally fed with Yahya's press releases. That explains the monarchist attitude. But why the standard bearers of Arab socialism have gone against the people of Bangladesh who stood by them through thick and thin? They too have nothing to gain by approving the Pakistani butchery. What then has gone wrong with their proclaimed solidarity with the peoples of the world striving for national liberation? As I was saying earlier, something has gone radically wrong with Arab socialism since the demise of Nasser. UAR is clearly shifting to the night-toward reaction. This contention can be supported by citing the systematic suppression by Sadat government of moderate socialists and simultaneous concessions for the fascist Moslem Brotherhood, an Egyptian counterpart of Pakistan's Jamat-i-Islami, a vicious sect that was ruthlessly suppressed by Nasser himself. The trend is very much same in countries like Syria and Lebanon where Egypt has great influence. Thus, the attitude of the non-monarchist Arab governments is, in essence, similar to that of the monarchists because they, too, have been blinded by the Pakistani hoax in the name of Islam.

But, even in this darkly atmosphere of ignorance and bigotry, comes a shaft of light from the direction of those freedom fighter of the Arab world who are now simultaneously confronting two enemies-Israel from without and the monarchist governments from within. The Palestinian commando organizations like AI Fattah and EPLP who are now locked in a grim battle in Jordan against Hussain's troops that also include Pakistani soldiers have expressed their solidarity with the freedom fighters of Bangladesh. The similarity of the plight of the people of Bangladesh and Palestine, if could be explained to the Arab people, I'm positive that entire Arab world would come to know about the Pakistani crime and would unequivocally express their solidarity with the people of Bangladesh.

১৭ জুলাই, ১৯৭১

NIXON GOES TO PEKING AS BANGLADESH BLEEDS

So the cat is out of the bag at last. China is not really 'East1 and the U.S.A is not really "West'-The twain can meet. President Nixon's decision to visit Peking at latter's invitation is probably a happening that is much more significant that many of us are able to visualise at the moment. Until the genocidal war on the people of Bangladesh who could have thought that such a meeting was possible before the end of this century?

Those virulent Peking radio broadcasts against Yankee imperialism still ring in the ear making eyes blink in disbelief. Thus, Peking has come forward to disprove its own so loudly drummed thesis that the contradiction between the highest stage of capitalism that was termed by Lenin as imperialism and revolutionary socialism is irreconcilable. Now the fact that President Nixon, probably the most rightist US President ever, has actually been invited by Peking hierarchy perhaps indicates that Peking's Neo-socialism and brutal US imperialism cannot only coexist but a lot greater intimacy is very much possible. There is little doubt now that Chou en Lai's China will be admitted in the United Nations at the first available opportunity. The immediate casualty of the union would be Chiang's Formosa. But in the long run the real victim is likely to be Soviet Union.

After Formosa only country that is likely to be extremely concerned about this Sino-American wedlock is the People's Republic of Bangladesh. As more facts emerge into light it is becoming increasingly clear that Pakistani junta played an important role in bringing about this hitherto unthinkable marriage. Both the parties were apparently ready to be bedfellows for quite a few months but there had to be a third party enjoying the confidence of both to crack the 23-year old ice Pakistani regime looked quite suitable. A common sickening obsession about India led China and Pakistan to believe that they were good friend and that they had a lot in common. On the other had, since its inception,. Pakistan played second fiddle to American foreign policy and actively collaborated with imperialist plots around the world. One should never forget Pakistan's betrayal of Arab cause during Suez Crisis. Pakistan agreed to do the match-making but demanded in return Chinese and American support for its grisly murder plan against the people of Bangladesh. As it has been proved later, Pakistan was promised a so-called "noninterference" in her crimes. Thus, probably knowing fully well that these would be used to massacre innocent people of Bangladesh, China went on supplying huge quantities of small and medium weight arms and ammunition. She even devised a 3-man mini-tank suitable for use in small towns of sub-tropical Bangladesh. These were the tanks that were used in the demolition-cum-massacre operation in Dacca, Chittagong, Narayanganj, Khulna, Jessore and Comilla. On the other hand, there are reasons to believe that the Nixon Administration, particularly the Central Intelligence Agency, knew well in advance of the massacre plan of the Pakistani military junta. What delayed the public admission of White House that U.S.A. was continuing arms aid to Pakistan despite State

Department's pledge to the contrary to the Congress was nothing else but a mounting public opinion against the Pakistani genocide. Pakistan could not find a single newspaper in the whole of the United States, nor a TV or Radio network to invent some excuse for I its gruesome crimes in Bangladesh. One must note that Nixon's adviser Dr. Kissinger was allowed to come to Pakistan to make his secret trip to meet the Chinese leaders only after I White House announced that Nixon Administration intends to continue arms and economic aid to Pakistan. It was a kind of blackmail to which Nixon perhaps submitted unwillingly. He would have preferred the traditional U. S. method of doing things i. e. do everything say nothing. But such a silence was proving crucial for Yahya and his gang of murderers in the power tussle within the army. But admitting the offence publicly Nixon has been forced to give the political advantage to the Democrats in the coming elections. But he has also calculated the gains. If he manages to bring about a lasting friendship with China that would help withdrawal of U. S. troops from Indo-China without really losing political control over it he stands a good chance of neutralizing the Democrats.

Thus China and America have got a date for themselves at the expense of a million lives in Bangladesh and 6 million Bengali refugees in India. Such a callous manoueuvre in political opportunism would surely help to write some of the darkest pages of human history. China a self-proclaimed defender of the rights of suffering humanity condoned the crime clearly for a political advantage in its global strategy against the Soviet Union. USA, the standard bearer of history's most vicious imperialism, in this joint effort at undercutting the Soviet Union, seeks even greater political domination of the world. China is yet to become a super power but the Soviet Union is already one. This is a very clever way of undermining its influence. As things stand now, there is no likelihood of a Chinese display of similar political accommodation for the Russians.

But what is going to happen to us? Are we the people or Bangladesh to be doomed in the cause of Sino-American friendship? However, political observers are more inclined to believe that Sino-American honeymoon may in the long run mean better days for Bangladesh. The new understanding may result in the softening of Chinese attitude toward India. Moreover, now that the main purpose has been realized it is unlikely that the marriage partners would continue to go out of their way to please the marriage broker. The solution of the Bangladesh problem i. e. total independence could be hastened only if the Soviet Union begin to take greater active interest.

Now a question to ponder. Has Washington become more socialist or Peking more capitalist?

২৩ জুলাই, ১৯৭১

YAHYA PREPARES TO MURDER SHEIKH

We the people of Bangladesh are now shock-proof. Naturally, thus, we were not startled to hear about Yahya's determination to murder Sheikh Mujibur Rahman after

going through the minimal paraphernalia of a trial by military Court. Nobody expected a more civilized behavior from these morbid fascists. They have more than established by now that they are not only totally devoid of those human values that constitute the line of demarcation between animals and human beings but are too drunk with arrogance to recognize even their own impending doom. Now that they have totally failed to deceive the world about the crimes they have committed against humanity in Bangladesh they have given up pretending altogether. Their naked designs-so obnoxious to civilized sensibilities-are now being publicized through its publicity media. That they are making the civilized world shudder in disgust matters little to them.

Fairplay and magnanimity are words unknown to the dictionary of cowards. It would be only foolish to expect any civilized treatment of Sheikh Mujibur Rahman from such confirmed cowards as Yahya and his conspiring Generals. The Sheikh, if he wanted, could have escaped in time. But being a brave democrat and a man with supreme faith in civilized codes of behavior considered the idea distasteful. But he was clever enough not to put all the eggs in the same basket and had ordered his party men to seek shelter outside the domain of the Pakistani Army in case they go berserk. The Army came, surrounded his house and opened fire around the midnight of March 25. Sheikh a man of great moral power, came out on the balcony and asked the Army Officer to arrest him and stop that shooting nonsense. This gesture was regarded by that towering coward Tikka Khan as a great victory. Tikka Khan who is totally devoid of almost all the human characteristics would have loved to put his prize captive to death had it not been for Yahya-who wanted to play around with the gallant leader of 75 million Bengalees a little longer. He did not trust trigger-happy Tikka. Sheikh was soon transferred to a military prison in West Pakistan. As the massacre continued in Bangladesh Sheikh was being coerced to sign a so-called "agreement" that meant a virtual political sell-out of the people of Bangladesh. Naturally, alcohol and power drunk Yahya did not know the stuff Sheikh was made of. Despite menacing threats coupled with physical torture Sheikh successfully resisted the nefarious move and held on to the trust reposed in him by 75 million freedom-hungry people of Bangladesh. Consequently came the threat of his trial by military court. The way some of world's biggest powers are appeasing the Pakistani fascists, it is not unlikely that Sheikh Mujibur Rahman will be murdered and the world will have the memory of yet another great patriot like Patrice Lumumba on its conscience. And the murderers will not end there. Sheikh's family now living under house arrest in Dacca's Dhanmondi Residential area may not be spared either.

One might wonder about the role that the U. N. might play in this regard. Lumumba died under its very nose in the hands of Katanga fascists led by Moise Tshombe. But the U. N. did play a role there. It's the then Secretary General Dag Hammarskjold gave his life trying to find a solution. U Thant before he retires could at least impress upon the members of the Security Council about the grave threat to international peace that is hiding in any possible murder of Sheikh Mujibur Rahman. Indications are there that the U. N. is stirring up about Bangladesh-particularly after Yahya's lunatic threat of war against India. But there are influential coteries within U. N. who might like to avoid the real

responsibility by simply devising some form of cushioning pad between India and Pakistan should they decide to clash suddenly. Avoiding the real issue-the issue of Bangladesh freedom-has been the U. N. role so far. But it is also clear that it wants to avoid an Indo-Pak showdown over Bangladesh. It is time it realizes that-not India-but Pakistan would force a flare-up as soon as it realizes that it can no longer hold out in Bangladesh. It has been paying a heavy price in men and money to retain a semblance of control over Urban Bangladesh. But the Liberation Forces are making even that existence rather miserable by stepped-up offensive. Desperately Yahya sought Chinese help and persuaded China to commit interference in Bangladesh's affair by supplying 200 odd Chinese experts who are to prop up the tottering strategy and logistics of the Pakistan Army. Presence of Chinese troops on Bangladesh soil has pushed the area a step further toward the bloodbath dreaded by political observers. Time is certainly here for the U. N. to do something about it and not by sending so-called 'observers' to inspect India-Bangladesh border. Only way to halt this slide toward a bigger disaster is by forcing the illegal and immoral Pakistani government to leave the soil of Bangladesh.

As for ourselves: we shall retaliate on the battlefield. Let us remind Yahya about the fate that the murderer of Lumumba had in store for himself. Tshombe not only lost his Katanga-but himself died rather ingloriously when lots of hot bullets flew through his guts. Yahya's end will be no more glorious.

২৪ ও ২৮ জুলাই, ১৯৭১

INDIAN MOSLEMS MISLED

There are unmistakable indications that a section of Indian Moslems are finding it difficult to sympathies with the suffering millions of Bangladesh. They seem to be more inclined to have faith in the lies that are being spread by saboteurs, spies and agents-provocateur planted in their midst by the Pakistani military junta. Our Calcutta correspondent reports that, clandestinely published leaflets in Urdu carrying vicious lies against the people of Bangladesh are being distributed by Pakistani agents. Most unnerving of all is the report that these leaflets are not only being quoted in a section of Indian Urdu press but some irresponsible editors feel roused enough to publish lurid accounts of imaginary massacres of Urdu-speaking refugees by Bengali nationalists during the month of March-just before the genocidal war of Yahya. These dispatches' claim that lakhs of 'Beharis' were massacred in Dacca, Chiuagong, Khulna and other areas in the wake of the non-violent movement launched by Sheikh Mujibur Rahman on 1st of March. They also claim that if Yahya did not start the counter massacre of Bengali population the entire Urdu-speaking population would have been wiped out.

What a convenient apology for Yahya's mass murder in Bangladesh and it coincides so well with a claim of word-to-word similarity put out by the military regime when .its earlier claims of equally fantastic nature failed to dupe the world. The travesty of truth in these malicious reports is so perfect that it is too embarrassing to make even an attempt at a reply. But a reply must be given.

During the 25 days that followed Bangabandhu Sheikh Mujib's call for peaceful, non-violent non-cooperation movement not single case of non-Bengali death was reported from any place in Bangladesh. Only some West Pakistanis who were escaping from Dacca with substantial wealth in cash and gold were intercepted by student volunteers Although the army provoked them by opening fire, killing and wounding them, there has not been a single case of West Pakistani death either. Finding the atmosphere rather tense Bangabandhu himself had ordered the students to withdraw.

Unfortunately, a section of short sighted refugee non-Bengalees in Bangladesh always joined hands with the West Pakistani clique against the political and economic interests of the Bangladesh. It was indeed this section that collaborated fully with Yahya's murderers since they were let loose on March 25. The Army first trained and armed them. Then they backed them with full military protection to start anti-Bengali riots in Dacca, Narayanganj, Chittagong, Khulna, Rangpur, Syedpur, Ishurdi and many other places. Hundreds of unarmed innocent Bengalis were massacred and their houses and properties looted. Even women and children were not spared. The ghastly massacre was reminiscent of the communal madness that we had the misfortune to witness 20/25 years ago. Yet the Bengalees displayed supreme tolerance. Despite great emotion-Mukti Bahini commander protected the Urdu-speaking population in the liberated areas. Unfortunately, a section of the same people later collaborated with the Pakistani army when the Mukti Bahini made tactical withdrawals and contributed to Bengali massacre.

So far I have been referring to a section of non-Bengalees. This I did only to emphasize that there exists another section of Urdu-speaking population in Bangladesh who had faith in Sheikh Mujib's promise that they, too, would be treated equally with Bengalees. This helped them to identify themselves with the people of a land where they intend to settle permanently. Despite temptations held out by the colonial Pak army whose prime aim is to use one section of the population against another-a trick that they learnt from their past masters-they have refrained from anti-national acts.

A section of Indian Muslims still seem to nurse a nostalgic affection for Pakistan-a state for which we all had sacrificed so much in the forties with the hope that it would find a better economic and political lot for the Moslem India. But, almost in no time, the great expectation had turned sour. A vicious coterie captured power and systematically and ruthlessly exploited people for their own ends. Suddenly the people of Bangladesh realized that the mere fact of having the same religion with these exploiters was not helping at all-in fact it was proving a great handicap. Because any opposition to the exploitation was being attacked by the coterie in the name of Islam and so-called integrity-When people refused to be duped, hoodwinked, or suppressed under such pretexts, they came out in strength to massacre them in cold blood.

How could anyone in his senses side with such a viciously anti-people force. Even those who are collaborating with them do not realize that they are only being used. Pakistani junta, in its effort to hide its real nature, is trying its best to present the issue as

a conflict between Hindus and Moslems, between India and Pakistan. But the reality is that of the million unarmed men, women and children massacred by them an overwhelming majority were devout Moslems. How then could these Indian moslems call this massacre of fellow-religionists a "Jehad" or even a move to safeguard Islam-or Pakistan-the supposedly Islamic state.

Indian Moslems must not get carried away with those sugar-coated blood clots being dished out by the Pakistani sub-humans. They must realize that Pakistan has ceased to be the state that they once dreamt.

They must feel lucky to live in a democratic state where they can freely display their support for an enemy state. They could be justifiably branded the fifth column for Pakistan and dealt with accordingly. They must not misuse or abuse this privilege that had been denied to every Pakistani since 1947.

২৬ জুলাই, ১৯৭১

A MULTI-PRONGED ATTACK ON BANGLADESH

The nature and extent of the economic exploitation of Bangladesh since it was included in the state of Pakistan is no less tragic than the gruesome horror of the current genocidal war. In fact the tragedy has reached unbelievable proportions since April this year.

It is now known universally that Bangladesh, former East Pakistan earned the lion's share of the foreign exchange of Pakistan all these 23 years but received, in return, shares of national wealth that may symbolically be compared with peanuts. This part of the doomed federation was deliberately reduced to a colonial market for West Pakistan-based industry that was built up by huge foreign exchange earned by our cash crops-jute and tea. A fraction of the industrial boom did come to East Pakistan but were mostly owned and controlled by West Pakistani capital. There has been little incentive for local entrepreneurs. As a result, the industrial units in Bangladesh that were not owned by West Pakistanis were put up by the public sector. But as the glaring example of Karnaphuli Paper and Synthetic Fibre Complex would show, these too were being disinvested to West Pakistani capitalists. Despite popular resentment culminating in violent mass demonstrations against this outrageous economic exploitation, nothing really changed. In fact the economic colonization was boosted up further by the capitalists who, obviously, were assured of military protection by a junta of West Pakistani Generals who have been ruling Pakistan first indirectly-then, for last 12 years, directly.

During last few years the nature of exploitation became very crude. West Pakistani business concerns operating in East Bengal not only refused to invest even a penny locally but its eastern offices had strict orders to transfer to West Pakistan all the takings daily before sunset. The jute industry happened to be the only industry that could not be

set up in West Pakistan for geographical reasons. Right from the start it was being dominated by Adamjee an undeterred bankrupt of pre-partition Bombay who became billionaire in Pakistan almost literally in a twinkle. This greedy manipulator monopolized the market and reduced jute growers to virtual beggary while he minted money by selling the products of their labor at ludicrously high prices. Later he was joined by other non-Bengali capitalists to add a few more twists to the grind. The result of this ceaseless multi-faceted, ruthless exploitation soon revealed itself even in the government statistics where the figures are always questionable. Today the per capita income of East Bengal is about half of that of West Pakistan although they began from the same mark. In fact Bengalees had a slightly better average in 1947.

Politically, as the military-capitalists-bureaucratic entente considered. East Bengalis had no right to protest against this slow strangulation to death. "Islam in danger", "Indian agents", "anti-state conspiracy", "national integrity in jeopardy", etcetera and etcetera were the bugles to suppress them. Political persecution of Bengalees took a vicious form, Thousands languished in prisons without trial. Ayub Khan, after capturing power by a unique combination of political man oeuvre, intimidation and blackmail in 1958, sought to tackle the' mounting discontent in the East by a subtler method. He officially recognized that East Bengal had been deprived all these years and promised to put things right. Of course he did not mean it. The exploitation continued. But to keep it out of public view he went all out to buy out the disgruntled intelligentsia-with jobs, scholarships and other legal and illegal material bribes. It worked but pushed the political leadership from middle classes to the masses who were hit in the stomach. Ayub had no plan to buy them over as well. The rest of the story-until 25th March 1971-is now too familiar to warrant repetition here.

The junta led by Yahya lacks .the 'finesse' of Ayub. As a consequence, we are witnessing history's most disgusting two-pronged attack on the people of Bangladesh. Military butchery has already taken a million innocent lives. Yahya and his gang are now slowly gearing up to create history's worst famine before the end of the year. Marching in step has come industrial robbery. All important machineries and machine parts from mills and factories owned by West Pakistani capitalists .are being shipped to Karachi. Now, according to latest reports, the military administration of murderer Tikka has taken over from them the economic robbery. Industrial concerns belonging to public sector i. e. to the people of Bangladesh are being robbed of their machineries. As for instance the Film Development Corporation Studio of Dacca-the nucleus of what was until March 25 a growing film industry, is being robbed of its expensive equipment. Movie cameras, shooting floor equipment, sound recording units and the black and white and color film laboratory equipment are reportedly being shifted to Lahore. The studio that has (he highest production rate in the world came into being in 1956 through an act of the provincial assembly moved by Sheikh Mujibur Rahman, the then provincial Industries Minister. This kind of robbery is also being extended to other industries owned by the public. We had heard that Britain callously destroyed our traditional handloom industry

to secure market for Manchester's textile industry. We had also heard about the brutality of the British indigo planters. It seems that history has remained stand still ever since. I Only nobody knew about it until these Pakistani sub-humans got to work in Bangladesh.

২৭ জুলাই, ১৯৭১

UN TO PAKISTAN'S RESCUE

A highly sinister move has been reported from the glass house of the United Nations. Needless to say that the move has been masterminded by someone no less than the UN Commissioner for Refugees, Prince Sadniddin Aga Khan. Prince Sadruddin, it might be realized, to hide his sympathy for the Pakistani fascists even after touring the battered Bangladesh occupied areas and the refugee camps in India where six million refugees from Pakistani brutality were staying. A callous indifference toward the terrible plight of the people of Bangladesh seeped through his guarded and diplomatic cliché-ridden statements to the press. Needless to say that his latest design against our people-a design that aims to send 50-member team of U.N. observers to Bangladesh for only he and his mentors know what-has the wholehearted support of Nixon Administration that has now taken a clearer stand on the issue and seems to be bent upon scheming and doing anything possible to fix up a puppet regime of hated Pakistani colonists in Bangladesh-a design that is even more obnoxious than the one with which USA tried to prop up Ngo Din Diem regime of South Vietnam. This is, indeed, the first diplomatic offensive of Nixon Government against the people of Bangladesh after its decision to supply more and more arms to the killer junta.

Against such a formidable backgrounder there should be no reason for us to have any illusions about this proposed U.N. team of observers. Its intentional are clearly antagonistic to the struggle for freedom now being waged by the people of Bangladesh. The animalistic butchery of a million innocent lives by the Pakistani military fascists who have also been subjecting the entire population of Bangladesh to an infernal and senseless brutality for last four months made little impression on the United Nations. Its Secretary General, although had publicly expressed his personal shock at the tragedy, failed utterly as the chief executive of a body that once used to be looked upon as the protector of world's suffering humanity. Week after week the ravaged humanity in Bangladesh waited in vain for the United Nations to do something to reduce the agony of a genocidal war treacherously imposed on them by a group of sub-human conspirators. But nothing happened. The U.N. proved a shockingly heartless, silent spectator. When such an organisation suddenly becomes too active it certainly gives rise serious concern. The proposal of sending the so-called observers is not only sinister in motive but is ominous of an even worse predicament for the people of Bangladesh. The team's presence is surely meant to help the Pakistani junta to consolidate its position in the occupied areas of Bangladesh. Its army, cripplingly harassed by freedom fighters, badly needed a breather. The U.N. observers, in a way known to themselves, intend to provide just that. The overall design is to try and shift the emphasis from the liberation struggle and to divert

the international attention to that imaginary Pakistani contention that it is merely a of confrontation between India and Pakistan. That the Pakistanis began with a genocidal war against the entire population of Bangladesh-a. war that gave birth to uncompromising war of liberation-is the real issue and that India is being referred Pakistan in its mischievous aim to divert world attention from its inhuman crimes the people of Bangladesh is now being opposed officially by the United Nations hat obnoxious role this once-noble organisation is being made to play just to satisfy the interest of Nixon's foreign policy! It looks as though the civilized world is coming to end and all the cherished human values are going all topsy-turvy.

The Pakistani fascist radio could not control the glee at its dubious victory with the United Nations. Its latest news bulletin gave away the secret motive of Prince Sadruddin It has claimed that the observers are meant to spy on the Indo-Bangladesh border to establish the Pakistani claim that India has been helping the freedom fighters and that there is no such thing as liberated zone of Bangladesh. Ignoring the on the spot reporting from famous western journalists who visited the liberated areas the United Nations has decided to surrender to the Pakistani lie. As for India, she has always declared her sympathy for the freedom movement of Bangladesh. Whether India would accept the presence of such U.N. spies near her borders is not difficult to answer.

The United Nations could have played a helpful role in Bangladesh only if it could be roused by considerations other than the dubious political motives of bigger powers. It is a matter of great pity that the shortsighted advisors of U-Thant are failing to see the futility of their sinister move aimed at helping the Pakistani fascist junta to colonies Bangladesh and to keep in the saddle a puppet government against the clear wishes of its people to be free.

The people of Bangladesh and their government regard this latest U.N. move not only illegal but consider it a gross violation of their sovereign and an unpardonable act of interference in the affairs of Bangladesh. The team is, thus, warned of grave consequences. These so-called observers would be considered enemies of our freedom struggle. Bangladesh liberation forces would, thus, consider them as collaborators and would treat them exactly the way collaborators and traitors are treated. But the U.N. need not necessarily play the role it is being made to play. There is still time for something constructive.

১৩ জুলাই, ১৯৭১

FAMINE AS A WEAPON RELIEF FOOD FOR SOLDIERS!

BANGLA IS NO BIAFRA

Two important aims of Yahya's killer junta in Bangladesh are an outright military victory and a great famine. The former he had futilely hoped to achieve in a few days-

certainly not longer than a week or so, It is now dragging toward the sixth month with the hope of victory fast receding beyond the horizon with every sunrise. Like a drowning man Yahya now wants to survive by holding on to any piece of weed coming his way.

His latest strategy has been one of creating a famine, as wide-spreadly as possible, in the occupied areas of Bangladesh. He, hopes that with this famine, when he will have millions more die in Bangladesh, the resistance will crumble assuring a lasting victory for his colonial army. That he is bent upon this trebly more infernal, sadistic madness has been proved by several recent happenings. He received from U.S.A. and China boats and coasters, allegedly to facilitate the distribution of food following total disruption of the communication system by the Mukti Bahini. These have been duly transformed into gunboats and army supply crafts. This week Mukti Bahini captured a Pak army supply convoy. It was carrying ration that included dozens of cartons of relief food meant for cyclone and flood victims of Bangladesh donated by World Red Cross and CARE, the American relief organisation. Not only that blankets, tents and other relief materials donated by various world organizations for the victims of great November cyclone have been supplied to the killer-army. Thus, deliberately hungry millions are being forced to die of hunger not only by not doing anything for supply of required food grains in the occupied areas, but also by depriving them of the food supplied by outside agencies. This monstrous vengeance against the people of Bangladesh is being practiced within full knowledge of Nixon administration that claims to have a lever with the killer junta by virtue of its policy of appeasement. The critical month of October is approaching. Unprecedented famine is perhaps imminent. We shall soon know that the United Nations has proceeded to justify this premeditated mass murder like the way it condoned the Pakistani genocide. But can this apocalyptic design of the killer junta be successful in destroying the liberation war? Obviously, Yahya and his collaborators are working keeping Biafra in view. In Biafra the severe famine was responsible for the defeat. Can the same thing happen here too?

The fallacy of the murderous logic of victory through famine lies in the very nature of the war and in the geographical conditions of Bangladesh. In Biafra, the rebels were trapped by the federal army in a land that was contiguous to Nigeria. They could not even seek sanctuary in another friendly country. Thus, with famine, their war economy crumbled. The conditions in Bangladesh are just the opposite. Here the colonial army is trapped and totally surrounded by the liberation forces who do not depend on the economy of the occupied areas. In fact, in the 85-90 per cent of the areas controlled by the People's Republic of Bangladesh, there will be no question of famine whatsoever. Already measures are being taken to meet any food shortage during October. Hence, a famine in the occupied area will have no effect whatsoever on our march to victory.

The murderous famine strategy shows once again that Yahya may be a monstrous killer but a lousy military strategist. And the way he fled from Dacca on March 25 had proved already that he is also a disgraceful coward. The man seems to be going round the bend-as the net is steadily closed in. The writing is getting larger on the wall.

১৫ জুলাই, ১৯৭১

WORLD PRESS WORRIED ABOUT SHEIKH :

HONOUR FOR TIKKA!

Now the daily Telegraph of London has joined Radio Bangladesh in expressing doubts about the whereabouts and fate of Sheikh Mujibur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh. In an editorial published in its issue of August 14, the paper asked-"Is Sheikh Mujibur Rahman Dead?" Like we did on several occasions during last few days the leader-writer of the daily also points out the fact that since Sheikh's voluntary arrest on the night of March 25 nothing has been heard of him except for some statements by Yahya Khan that Sheikh would be punished and that he would be tried secretly on charges that carry death penalty. The Pakistani army had said last Monday that his trial would start next day. "Has he," asks the editorial, "in fact already been executed?" It also asks-"Is General Yahya able to do anything to show that such inevitable suspicions are unfounded?" The paper has further suggested that to put world suspicions at rest Yahya should arrange for Sheikh's non-Pakistani lawyers to have access to him. But such an effort has already been made without success. What roused international suspicion is the fact that Sheikh was suddenly put on this dubious trial only at a day's notice. The announcement was followed by another report, again through army source, that Sheikh has refused to accept the validity of the court and has. thus, refused to have a defense counsel. This could be the only piece of clever propaganda in the entire handling of the Bangladesh tragedy. Anybody who knows Sheikh would be convinced of Sheikh's alleged stand. But the point is it suits the purpose of the military junta so well. If Sheikh has already been murdered-this fiction would come very handy for deceiving the world. In that event-the next move of the killer junta would be to declare that Sheikh has been found guilty and that he was sentenced to death. It might be tempted to play around with the execution pan of the sadistic farce a little longer. Nevertheless, after some time, the news of Yahya's refusal to grant the reprieve and consequent execution of the leader would be made public with suitable timing and language.

Earlier Yahya had taken the British press for a ride when he remarked to a correspondent during an interview that Sheikh may not be executed by firing squad-he may die, what he called, 'a natural death in prison'. Of course, he did not say what really is meant by "natural death" in hangman's vocabulary. Anyway, the news helped to control speculations about Sheikh's whereabouts until the Daily Telegraph came out with its serious doubts yesterday.

There are, of course, reports of people finding an under construction prison as a possible venue for the trial. One foreign correspondent reports that he has seen the prison well guarded by army personnel. There is nothing more concrete than what could be made out by putting these presumptions, assumptions, rumors, and stray incidents together to suggest that Sheikh might still be alive and the ludicrous farce of his trial is

still being enacted. A similar rumor now suggests that the trial might have been adjourned.

But all this kite-flying amounts to very little when one remembers that in this game the prosecutor, the judge and the executioner are embodied in the same man who has, on more than one occasion, made public his passionate desire to see the death of his prize captive. Now that he has failed in the conspiracy to convince the world of this essentially Bangladesh-Pak confrontation as one of Indo-Pak conflict, he would be doubly tempted to murder Sheikh with a view to killing two birds at a time or so to speak. This would most certainly rule out all possibility of a negotiated independence of Bangladesh which is the only political settlement of the issue that would be acceptable to the people of Bangladesh and, to the Soviet Union and India. On the other side, Yahya expects a serious power tussle within the Awami League for leadership in the event of Sheikh's death. Political observers noted the carefully selected list of Awami Leaguers exempted from cancellation of their seats issued by the military junta. The list excludes important cabinet members of the People's Republic of Bangladesh with the calculated hope that such exclusions would germinate devastating mistrust within the Party which, in turn, would shatter the unflinching unity of the people of Bangladesh in their determination to liberate themselves from West Pakistani colonialism.

However childish, the man oeuvre certainly shows that nowadays even ostriches are trying to be cleverer than what we are used to believe. Nevertheless they still are essentially ostriches and ridiculously powerless to change the direction of the rising storm.

It is too late for Yahya's mediaeval antics. The wilting is very much on the wall. If Sheikh's death means blocking of the way to a negotiated independence for Bangladesh-something that is wished by our peace loving friends like the Soviet Union and India, then military solution it will be. A military victory is not only a grand possibility but our valiant fighters of the Liberation Forces can wrench it much sooner than many of our reserved well-wishers think. All we need is active sympathy and cooperation. We never wanted nor do we want now that anybody other than the people of Bangladesh would fight in this war of liberation. We are quite able and willing to beat back the invaders to win our freedom ourselves.

Now I971's Crudest Joke

According to a report from Islamabad Tikka Khan, the unrepentant murderer of not less than two million unarmed men, women and children, has been decorated by Yahya with the high civil award of Hilal-e-Quaid-i-Azam. This shows that, in some peculiar way history does repeat itself sometime. General Dyer who massacred within minutes a peaceful crowd at Jalianwalabag was honored by London's Daily Express with the Silver Sword of Velour on his arrival from India. Of course, the crimes of Tikka Khan against humanity dating from the massacre of Baluch people in the midst of their Eid-day prayer until today are of a much grislier order than that of Dyer. This unconscious

disciple of Marquis de Sade is really in the class of Eichman and Dr. Meogele and the commandants of Hitler's extermination camps Auswitz, Belsen and Dachan. Hitler decorated them with some of the highest order of the Nazi Reich-needless to say, in the name "of their services to German people and state.

৪ জুলাই, ১৯৭১

YAHYA FINDS HIS QUISLING

The appointment of the mercenary Motaleb Malik as the civilian governor of the occupied areas of Bangladesh in reality marks the beginning of the Pakistani junta's final capitulation. This so-called doctor who never made a living by practicing his alleged training in dentistry is indeed a seasoned mercenary politician who moves into total oblivion during popular movements but returns right back to the dias when anti-people forces usurp political power. According to a political observer, he is neither a male nor a female-politically speaking that is. This political eunuch has been a favorite name in all the illegal, undemocratic, immoral cabinets that hoisted themselves over the people of erstwhile Pakistan for last twenty years with unnerving regularity. This so-called doctor has also a unique record to his credit that explains the attraction that he has for Yahya and his gang. Just like his medical practice, he never could get himself elected by popular vote since-well, nobody knows when. Who else could Yahya trust for the job except for such a political non-entity having the soul of a slave?

There is very little doubt, inside and outside the occupied areas of Bangladesh that Dr. Malik's authority as the so-called governor would not and could not extend much beyond the door of his personal toilet. Even the word 'puppet' fails to fathom the irrelevance of his political and administrative authority. Yet Yahya plans to tell the world-particularly the hard pressed White House and the angry World Bank-that through this character he has started 'civilianizing' the administration of the occupied areas of Bangladesh. Yet the truth is, and will be until the final capitulation, that with Malik on display for the outside world the campaign of genocide, rape, loot and arson will continue unabated under the direct planning of the military apparatus of the Martial Law Administrator of the zone whoever he might be. Malik, let alone having any authority over anything, will in fact, be a permanent headache for the army and its intelligence service. Because it would not be a pleasant worry for them to keep their stooge alive from Mukti Bahini bullets-particularly because he will have to be brought out of the cupboard in the Governor's House from time to time for specially staged public shows. Not that Yahya worries much about the death of yet another Bengali, whether a collaborator or not. But his demise would rob him of-one of the very few perfect quislings available to aid him in his crimes. Nevertheless, this is the last act of treachery that this Dr. Malik will play against the people of Bangladesh.

Meanwhile news comes from Paris that Yahya has viciously attacked the democratically elected leader of 75 million people of Bangladesh. In an interview to the

rightwing Paris daily 'Le Figaro' he has called Sheikh Mujib a 'criminal' and a "minor fascist". But the half-wit went on to brag about his Nazi-style massacre of the people of Bangladesh only a sentence later. He shamelessly boasted that his army is a professional one and that when they kill they do it cleanly. He apparently led himself into believing that his army fought a full-fledged war on the night of March 25 against an equally equipped army. Using typically Army Mess lingo he boasted that "it was no football match." Unfortunately" Le Figaro" correspondent failed to remind him that his barbarous army was let loose on an unarmed and unsuspecting civilian population and that only a cowardly army would declare war on women and children. The correspondent should also have reminded this major fascist that his animals in army uniforms not only did the killing with professional efficiency but also displayed great talent in rape, loot and arson. Cruelty with a great purpose may be called efficiency 'but otherwise, it is plain sadism. He should also have reminded the major fascist that if Sheikh Mujib did not believe in democratic processes he could have made mincemeat out of these Pakistani fascists if he wanted. It's his civilized behavior that has given the major fascist the opportunity to breathe air in Islamabad instead of pushing up the daisies.

It is indeed an irony of history that world's one of the most cowardly killers and despicable liars now sits in judgment of a defender of democracy. Until now crime has not only paid but it seems to have allowed enough latitude for such intolerable effrontery. But history also shows that things do change for better at long last. Otherwise today we would have had Hitlers, Mussolinis and Tojos settling the destiny of mankind.

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

AMNESTY1 FAIL TO DECEIVE : BBC THAWS :

MERCENARY MALIK

It is perhaps not accidental that Yahya's fresh offer of so-called amnesty to Bengali army personnel who are now fighting as dedicated members of the Mukti Bahini comes just after the installation of his Bengali-speaking quisling-a non-practising doctor called Motaieb Malik.

Naturally, the so-called offer has been made-incidentally for the third time in last four months-with a view to deceiving those who have been successful in evading the murderous assaults of the horders of Yahya and Tikka. The announcement seems to tell-"now boys, come back now. You have nothing to fear now that you have a Bengali-speaking governor to look after you". Yahya must be in a desperate plight to resort to such silly trickery. The trick looks a great deal more stupid than that refugee-reception-centre gimmick where foreign correspondents found only dogs responding to Pakistani hospitality-a sort of canine solidarity-a grand display of dogly one heartedness. But this time Yahya is not likely to find even dogs. For some simple hearted men did believe his words when he had announced this fake amnesty for the first time. Some of those members of the armed forces who had taken shelter in the villages and were still in two minds about joining the Mukti Bahini responded to the call and tasted the lethal honey of

Yahya's amnesty. These unforunate fools were found by the captive population of Dacca floating in the river Buriganga tied up in bundles of 15 to 20. They were still wearing" the army shorts and vests. Some had bayonet wounds on their bodies. But most died when the murderers from hell drained out the last drop of blood from their bodies inside Dacca cantonment.

Luckily only a small number were hoodwinked by Yahya's siren of death. After the news of mass slaughter spread out-not even one army personnel responded to the second call. In fact, just after the first slaughter the minds of the confused were made up and hundreds of them were seen marching in the darkness of the night toward the zone controlled by the Mukti Bahini. They now belong to the hardcore of the massive Liberation Army that has now got the Pakistani cowards on the run. For the first time the BBC, an extremely conservative and perennially suspicious body, has accepted the reality of the situation. After near-total silence over the liberation war for months, the BBC has at last publicly recognized that Free Bangladesh is very much a reality and not just a figment of imagination of a couple of million people living outside the range of Pakistani guns. Its special correspondent Martin Bell in a filmed reportage has sought to establish that the Mukti Bahini has grouped itself into a well-organized force and that free Bangladesh is very much a reality although its formal control over the entire territory remains to be announced. He has given enough space to a member of the liberation army to justify the cause of liberation. He revealed: Pakistani soldiers are cowards. They run for their lives when Mukti Bahini boys go into action. They run so fast that they leave behind arms and ammunition for use by the Mukti Bahini.

Now either Yahya must be-a fool or totally mad to except such a victorious army to fall for an 'amnesty' trap by a colonial force that not only massacred their loved ones by the thousand but has looted their property and brutally raped their mothers, wives and sisters. His trick of using the name of this Bengali speaking political eunach called Motaleb Malik can never work outside his Islamabad palace.

All these years-since before the partition of the sub-continent-Motaleb Malik managed to stay away from the limelight. But there are too many witnesses who grew up with him. He began his career by dressing himself up as a so-called labor leader of Calcutta. Exploiting the name of religion he had managed to establish himself as a leader of Moslem laborers. Soon he became one of the inventors of the technique of personal profit by workers strike. Making the workers strike to force the employer pay a handsome bribe to him but little or nothing to workers-became his flourishing profession. Meanwhile, thanks to his love for Anglo-Saxon masters, he had changed his family name from 'Mallik' to 'Malik' so that his white bosses could pronounce his name with less effort. When the whites departed, he was quickly picked up by Mohammad Ali Jinnah in his frantic effort to demolish the Bengal Opposition that was consolidating under the leadership of Shaheed Suhrawardy. Jinnah only had to wag his finger like a banana—and Malik fell at his feet like a dog. He got a minister ship in Jinnah's handpicked cabinet from the Bengali quota while the great sons of Bengal-like A.K. Falul Haq and Shaheed Suhrawardv were left in the lurch.

There began Mollik alias Maiik's chain of minister ships. He proved such an obliging peasant to the West Pakistani bureaucrats, I mean, he proved himself such a servile puppet thai the secretaries enjoyed complete freedom in depriving the then East Pakistan. This is the reason why he was always favored by the military-cupitalist-bureaucratic entente that ruled Pakistan until the State exploded on the 25th day of March in the year of one thousand nine hundred and seventy one. For the same quality Motlik: alias Malik is Yahya's favorite today despite Yahya's pathologically racist hatred against the Bengali people.

As I was saying, Yahya may fool himself with this quisling but not the people of Bangladesh. Even that prize fool of a war horse Zulfi Bhutlo seems to have got the wind. Mollik alies Malik is a bad man for him too. He has reportedly denounced Mollik alias Maiik's appointment.

As a footnote: let me inform the listeners in the occupied areas of Bangladesh the latest news from the bookmakers. It is reported that already betting has started over the next president of Islamabad. Will it be Bhutto or Yahya? Latest odds favor Bhutto as a 10 to 2 winner.

Yahya has destroyed Pakistan. Bhutto will have the privilege of destroying the remnant.

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

AN HISTORIC FIVE-PARTY AGREEMENT :

PROF. GALBRA1TH MISTAKES BENGALI SPIRIT

A historic five-party agreement has been reached yesterday in Mujibnagar. After long discussions for 2 days the leaders of the Awami League, National Awami Party (Bhashani group), National Awami Party (Muzaffar group), Bangladesh Communist party and Bangladesh National Congress agreed to Form an 8-member National Consultative Committee. The Committee will be available for consultations in matters relating to the national liberation struggle. For the first time since March 25 Moulana Bhashani attended such a top level political discussion.

The Consultative Committee consists of the following members: Moulana Ahdul Hamid Khan Bhashani, Bangladesh Premier Tajuddin Ahmed, Bangladesh Foreign Minister Khondoker Moshtaque Ahmed, Professor Mujaffar Ahmed of National Awami Party. Moni Sing of Bangladesh Communist Party and Monoranjan Dhar of Bangladesh National Congress. Two more members are to be included from other parties with definite commitment in the liberation struggle.

The Committee reaffirmed the determination to continue the liberation war until victory. In clearest possible language it has declared that any political settlement short of lull independence for Bangladesh would not be acceptable to people of Bangladesh.

The Committee appealed to the civilized countries of the world to declare their solidarity with the struggling people of Bangladesh and called upon them to recognize the People's Republic of Bangladesh. The committee also appealed to all countries for full support including arms and ammunition for the liberation struggle.

The formation of National Consultative Committee at such a critical juncture of Asian history was hailed in various quarters soon after its announcement from Mujibnagar.

The most significant declaration of the Committee vis-a-vis the national liberation war has been its appeal for recognition and arms and ammunition. This is for the first time that such a public appeal has been made for recognition by any political party including the Awami League and the Government of People's Republic of Bangladesh. It is believed that the appeal is likely to make great impact on many states having unquestionable sympathy for the cause of the people of Bangladesh. In fact, reliable sources indicate that recognition of the Republic by a number of states are probably in the offing. Now that a number of socialist parties' have formally joined with the Awami League with the right of having a say in matters concerning the running of the war a number of East European countries might feel encouraged to come forward with recognition and material help. The reliable source informs that the German Democratic Republic i.e. East Germany which, incidentally, is also the fourth largest industrial power in Europe, might be the first country to recognize Bangladesh. GDR's example would most certainly be taken up by other socialist counties. One must not forget the consistently favorable attitude of the Yugoslav Government since the outbreak of the Pakistani genocide. In fact, one would not be surprised if Yugoslavia beats GDR to become the first country to recognize the inevitable sovereignty of the Peoples Republic of Bangladesh. Hungary is another good possibility. Czechoslovakia and Poland might, however, be slow in coming as they have considerable business stakes in Pakistan. Some Asian states are also expected to recognize the Republic soon enough. A number of Latin American states including Cuba might prove no less cooperative. Next few days are likely to prove extremely eventful so far as the death of Pakistan is concerned.

Against such significant development and an unmistakable reiteration of the Bengalee people's will to continue the war till victory, the call for total autonomy for East Bengal by Professor John Galbraith a former US Ambassador to India, really comes as an anti-thesis. Professor Galbraith, reports Radio Bangladesh's Calcutta correspondent, has apparently suggested on his arrival there yesterday that a just solution to the Bangladesh problem would be the granting to total self-rule to East Bengal so that the Bengalees could feel that they are the masters of their own fate like the people of Panjab. He further, said that such a solution would be acceptable to the civilized peoples of the world.

It is a matter of great regret that such a learned economist and seasoned diplomat as Professor Galbraith should be suggesting such an unrealistic and improbable solution so late in the game. It is a pity that he has failed to understand the verdict of history. He has

failed to see that Pakistan was such in unnatural union that could survive only through mutual trust and respect. Yet over last twenty three years some reactionary forces who usurped power imparted the East-West relation a colonial character whose worst manifestation was this brutal, genocidal onslaught on last March. How does the professor think that there could be resurgence of the primary conditions for a meaningful partnership when the colonists have decimated million innocent men. women and children of the deprived region? Not only that the vicious genocide is still continuing, the colonists are systematically proceeding to destroy the cultural and economic backbone of the Bengalees. The colonists are now proceeding even to destroy their mother tongue-a language to which the Bengalees have already laid down countless invaluable lives-by imposing an underdeveloped and alien script on it. How could any civilized man, let alone such a distinguished scholar as professor John Galbraith, suggest now any basis for continuing union? It is quite possible that the former US Ambassador is privately airing White House's formula for a so-called political settlement. If total autonomy for Bangladesh was such feasible formula why couldn't the American masters of Islamabad impose it upon the killer Generals before March 25?-before making the people of Bangladesh the victims of world's one of the most heinous crimes against humanity? In fact. Sheikh Mujib's Six-Points aimed at nothing more. Still the US Administrations allowed the massacre to happen. Professor Galbraith-please try to understand that history was set along an irreversible course on March 25. Please see that the only civilized, sensible and peaceful solution is total independence for Bangladesh.

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

US SENATORS VOTE STOPPAGE OF AID : PAKS ON THE RUN

Bangladesh war of National liberation has now entered its final stage. From our side, the Mukti Bahini is all set to go for the kill as soon as the dry season returns to press home the spectacular advantages of the monsoon-time guerrilla warfare. From the enemy's side, the last card is down-that of so called civilianization of the administration in the occupied areas of Bangladesh. At the end of the fifth month of Yahya junta's brutal war against the people of Bangladesh it is all but lost for them. The Pakistani army, the remnants that is, are now confined to the cantonments. Over 35 thousand men and officers are dead. The hastily raised par militia Razakars are not only dropping dead at every available opportunity but are proving a positive burden on the beaten army gasping for breath.

Despite all kinds of clandestine cash and material aid from Nixon Administration, China and Arab monarchies, Pakistani economy has at last reached the brink and is poised to slip over. Advised by the US State Department Yahya had to embark upon this stupid civilianization programme with the help of puppets enjoying the trust, not of the people, but of the junta. US Foreign Aid Bill has now gone to the Senate where Senator

Kennedy is a dominant factor. The Rill's proposals fur economic aid to Pakistan and Greece have already been rejected by the House of Representatives. It was suggested there that until there is a civilian rule in Bangladesh and the refugees have returned aid to Pakistan could not be resumed. The Senate members are also likely to vote the same way Thus the sham civilianization with Or. Motaleb Mollik alias Malik as the figurehead governor is clearly a pitiful effort at pacifying the American senators before the decisive voting on the Hill which starts early next week. Malik has now started working on the second condition-that of refugee-return yesterday. He has offered to have talks with Indian authorities for their return and has promised the sky and the heaven to the refugees who had fled for their very lives. The junta and its running dogs like Motaleb Mollik, however could not care less about the kind of reaction of the refugees toward this overture from an agent of the same murderers who had forced them to flee. The overture is merely a sinister move to put on record something about the refugees so that some ill-informed senators could be hoodwinked. Needless to say, so far as the refugees are concerned, his master's dog's assurances could not appear any more or less deceitful than those that had already come from the master killer himself. If US senators choose to follow the line of the House of Representatives on the subject of further economic aid to Pakistan, how the Islamabad junta is going to react? This is the most crucial question of the moment. Stoppage of US aid will mean sudden collapse of the economy whose backbone has been irreparably crushed by the mad ventures against the people of Bangladesh. This is certain to lead to' severe unrest throughout Pakistan. Even the old faithful of the junta-Zulfi Bhutto is growing restive and has already threatened to go Mujib's way if Yahya does not hand over power to him.

The junta members including the hawks would be thinking twice before embarking upon a Bangladesh-type populace versus army confrontation in Pakistan. Not for anything else but for the hard fact that the army hasn't got the breath for yet another war. Needless to say, that its war cries against India are only outbursts of desperation that offer the killers a faint hope of relief through UN intervention.

How then would it react? The most likely reaction of the Junta would be retreat from Bangladesh after executing a scorched-earth policy. This is sure to happen unless there is a coup d'etat by saner forces that might prove practical enough to accept the fact of history that Pakistan as it was on March 25 has ceased to exist. But such a coup has only an even chance of coming off.

People of the occupied areas however should prepare themselves for the worst. They must be ready to hit the defeated army when they choose to go berserk again and embark upon yet another genocidal mass murder. They must remember that despite all its show of strength Pakistani army in Bangladesh is helplessly trapped. A retreat to Pakistan is a logistical impossibility. It is quite likely that the officers would want to flee by aircraft when things get really hot, leaving their war-weary men behind to face the jazz. This time the army must not be allowed to repeat the surprise attack of March 25. You must hit any

weapon-modern or indigenous-would prove useful against an army on the run and short of ammunition. In fact, indigenous arms might play a decisive role in the final act. If the Pakistanis surrender-take them prisoners and treat them well.

A note of caution. All the guerrilla groups that have developed within the occupied areas independently of the central command of the Mukti Bahim must fight unitedly irrespective of their political beliefs. This is a war of national liberation. The country and its freedom come first. Any parochialism or partisan attitude resulting in a mutually annihilating conflict would, tantamount to a betrayal of the cause of the1 people of Bangladesh. After much suffering our people deserve a better patriotism from those who have taken upon themselves the noble task of liberating their fellowmen from the yoke of Pakistani colonialism.

Let the slogan he-Unite for victory. Victory to Bangladesh.

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

COLLUSION WITH IRAN

Yahya's hurried trip to Tehran did not really come as a great surprise. With the military defeat approaching fast in Bangladesh he must find some way out. Not that he is giving up the hope of victory altogether. However ridiculous the military position might be-he is still moving aroused with mischievous ideas.

The joint communiqué issued from Shah's Palace, however, indicate that for the first time since his genocidal attack on the people of Bangladesh Yahya has been able to make the Iranian monarch talk in favor of Pakistan's interest. It is significant that after the failure of his agents including Zulfi Bhutto in getting the Iranian regime to side with Pakistan in its crimes Yahya himself had to have a go at the House of the Pahalvis. But even such high level overture could not produce what he really wanted. Shah eventually stuck to his original title over Bangladesh-that of no commitment. The joint communiqué does not say that Iran considers Bangladesh issue an internal affair of Pakistan.

But Yahya's gains are fairly considerable from another point of view. For the first time since United Nations High Commissioner for Refugees Prince Sadruddin Aga Khan, Yahya has not been able to sell his idea about the basic nature of the conflict. He has been insisting, without any rhyme or reason, that the war between the People ofBangladesh and his junta was actually an Indo-Pakistan confrontation. We are amazed that the Shah swallowed the pill and apparently offered his government's good offices for a meeting between India and Pakistan for a settlement of the imaginary conflict.

New Delhi is certain to prove rather cold to this dubious move. India, however, is not surprised to see the Iranians play the Pakistani game. During Ayub's war against India in

1965 Iran broke all the norms of international behavior for a non-involved country. She provided the harassed Pakistani air force with planes, aviation fuel and large quantities of arms. Pakistani Boeings were given shelter against Indian attack. In his neurotic hurry Yahya forgot that Iran with such a record of collusion against India would prove hardly acceptable as a mediator.

Yahya's Tehran trip and his alleged attempt at the 'normalization' of Indo-Pak relations is a mere publicity stunt, What then was his real move? Is Yahya trying to prove to the world that he is striving for peace with India while, behind the door, he is engaged in devising a surprise attack with a view to averting his imminent defeat in Bangladesh? That, indeed, would be more in the line of Yahya's thinking. Only in a war with India that he can expect to get the United Nations involved in the Bangladesh conflict. UN intervention would surely come to his advantage and might avert the crushing defeat that is approaching fast. If this is the real motive then Shah of Iran is playing the dangerous role of a Pakistani collaborator that might eventually lead to an international flare-up in South and West Asia. World powers, particularly the Soviet Union are sure to note this with concern Pak-Iranian sinister move. Soviet President Podgorny's call for an immediate solution of the Bangladesh problem in Moscow yesterday has probably come also as a warning against this Pak-Iranian design.

President Podgorny's speech is sure to put Yahya and his accomplices in great difficulty. The major behind-the-scene villain who, with great deliberation since the fifties, helped to bring about the destruction of Pakistan is M. M. Ahmad. He has also been a great friend and guide of Yahya and his killer associates, His removal from the scene, at least temporarily, by a stabbing incident is certain to put Yahya in a real guidance crisis. Yahya seems to have been able to pacify a restive Bhutto for the time being after latter's threat to do Sheikh Mujib to him unless he hands over power. Bhutto might try to take advantage of the crisis in which Yahya now finds himself. Next few days are likely to prove rather eventual in the ivory tower of that haunted city of Islamabad.

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

INDIA-U.S.S.R. TREATY

The part of the text of Indira-Kosygin joint statement that specifically mentions the issue concerning Bangladesh contains certain safeguards for the future of the freedom struggle in Bangladesh. It is quite significant that the word 'Bangladesh' has been avoided in the text. Although the critics of the Indo-Soviet pact have capitalized on this calculated omission, the fact remains that the statement is destined to prove a document of tar-reaching consequences. President Podgorny's subsequent statements in Delhi strengthens the hope even more. Let met begin the analysis by quoting from the statement:

> "Taking note of the developments in East Bengal since March 25, 1971 both sides consider that the interest of the preservation of peace demands that urgent measures should be taken to reach a political solution of the problems which have arisen there, paying regard to the wishes, the inalienable rights and lawful interests of the people of East Bengal as well as the speediest and safe return of the refugees to their homeland in conditions safeguarding their honor and dignity."

In other words, the guideline for any political solution of the problem has been made clear in these lines. The wishes and lawful rights of the people' mean nothing else but upholding of the results of the December 70 elections. In other words, the two countries demand a political solution acceptable to the elected representatives of the people of Bangladesh. The Bangladesh Government, through a statement, has made it clear that nothing short of independence should be acceptable. Another most significant aspect of the statement is the unique fact that the statement was signed, on behalf of the Soviet Union, by the Chairman, the Prime Minister and the General Secretary of the Soviet Communist Party.

In my opinion, the most significant remark of the Soviet Premier concerns that internal matter "phrase". This, if taken singularly, could give rise to misapprehensions. But as the statement should be taken in its totality one must note that the Soviet Union also considers the problem thus created-an international matter. Against such a background, what does the Soviet leader mean by "internal matter"? We must not forget that the only way to disrupt our liberation struggle would be by internationalizing it in a wrong sense. In the sense of, say, Vietnam. This is, considered an internal matter so far as the war between Bangladesh freedom fighters and Islamabad generals is concerned. This is our fight. It is the Bengalee nation alone-and no other nation-that must be involved in the war that is now raging. We would rely upon such friendly countries as India and the Soviet Union to guarantee us that-to guarantee us international non-interference. Let me remind other friends and well-wishers that this "non-interference line" is precisely the stand of the Vietnamese people and, of course, that of Soviet Union vis-a-vis Vietnam. In fact, the failure of the world community to restrain foreign forces from getting involved in Vietnam has been directly responsible for the prolongation of the conflict.

In this context, we must also note a few significant omission. Particularly missing were words of sympathy that both the countries feel for the freedom fighters. Any such mention would have given sufficient grounds to the imperialist backers of the fascist Islamabad regime to get involved directly in Bangladesh. There is no reason why we one should assume that neither Indira nor Kosygin wants to see a victorious liberation army. One must remember here that the Soviet Union supplied billions of dollars worth of arms and ammunition to the Vietnamese while demanding, all along, a peaceful political solution.

Nobody is averse to any political solution suggested by the joint statement provided the solution is endorsed by the legally elected representatives of the people of

Bangladesh. But these representatives have already announced the minimum terms for an agreement with Islamabad-and these are-acceptance of (he independence and sovereignty of Bangladesh and an unconditional release of Sheikh Mujibur Rahman and other political prisoners being subjected to torture and terror in the occupied areas. These minimum conditions are indeed our conditions, for no ideology as such, but for sheer survival. And, until these are achieved, we have no choice but to fight on-as has been so aptly suggested by the French freedom fighter, writer and former minister of Culture-Andre Malraux. And fight we shall. We have great confidence in the leadership of all friendly countries including India and the Soviet Union and we believe that they will never be party to any conspiracy to impose upon us a so-called political solution just because it would suit the national interests of certain inflated powers. We the majority of the people of pre-March 25 Pakistan proclaimed that the artificial union of Pakistan ceased to exist as from that fateful day when some mad, sadistic and power hungry generals and their capitalist and bureaucratic collaborators chose to unleash on the majority population an unprecedented wave of terror and butchery. Nothing could be more moral and legalistic than this solemn-irreversible proclamation. Yet, if some powers think that they can still make the framework of Pakistan survive just because it suits their interest they are indeed grossly mistaken. Our only appeal to them is-leave us alone to settle our own scores. Do not interfere by supplying arms and money to either party. If you can do that we promise you a solution within weeks and, thereby, ensure a peaceful zone in South Asia-if that is what you really want.

By this extremely tactful-essentially brilliant stand the Soviet Union has succeeded in keeping a leverage with Islamabad without harming at all the progress of the war of our national liberation. By using her influence she might be able to persuade Islamabad to agree to settle the issue by agreeing to quit Bangladesh. This is not an impossibility. There is no reason to think that after six-months of this suicidal war Islamabad is not already crippled economically. According to latest reports the World Bank is sure to refuse further loans. Militarily, too, the picture is far from rosy.

Finally, a note of warning to our people inside occupied areas and abroad. Forces financed and encouraged by powers that are unfriendly to Bangladesh are out to create confusion with a view to demoralizing the fighters and their sympathizers. Some are going so far as to suggest that we are too ill-equipped to fight Pakistan's modern army and, thus, we should agree to a so-called political solution. Yet the stock-taking of last six months war would show that the enemy, despite better training and armory, has lost 40 times more men than we have. Is this a miracle? Of course not what are the causes then of such a staggering victory? People's support, first class terrain for our kind of warfare and inextinguishable patriotism of our young lions. Victory is ours-not only because we want it but because it’s a verdict of history.

৫ অক্টোবর, ১৯৭১

BRITISH LABOUR PARTY WAKES UP : UN INTERVENTION . NOT WELCOME NOW

At long last the British Labor Party has come very near to clear commitment on Bangladesh issue. A statement prepared by Party's national executive calls for immediate end to military repression in Bangladesh and for the release of Bengali political leaders-particularly Sheikh Mujibur Rahman. The statement also calls upon the Aid-Pakistan consortium and all other countries to suspend all aid to the discredited military regime until a solution acceptable to the people of Bangladesh is found. It also demands that the United Nations should be more active in finding such a solution.

The statement is to be presented at the annual convention of the Labor Party being held in Breighton this week. It is to be debated next Thursday and, political observers believe, the views expressed by the leadership may get endorsed in to by the general body,

This is indeed a significant development. Because despite persistent lobbying and maneuvering by such leading members of the party and the parliament as John Stonehouse, Peter Shore and others, party leader Harold Wilson had remained tight-lipped over the Pakistani crime in Bangladesh.

There may be several reasons behind this seemingly sudden commitment. One thing is certain that Bangladesh has at last begun making her presence felt-around the world. Bangladesh is not just a case of 'internal revolt' of some country like Greece, Spain or Nigeria. This realization has been (he highlight of latest reactions from world capitals that had remained neutral so far. Labor Party's awakening to the unshakable reality, even though it took six long months to take shape, signifies unmistakably the rising of me great wind of change. A number of Labor MPs were of the opinion that among all international powers Britain has a unique responsibility toward the sub-continent. It was argued that as Britain presided over the division of its Indian empire in 1947-she is directly responsible for any anomaly generating from the artificial division and consequent artificial unions. Islamabad junta's colonial, racist and fascistic onslaught on the people of Bangladesh clearly showed that British-aided division ot the sub-continent is not working at all. It is now clear that to ensure a lasting and peaceful political equilibrium in the sub-continent, the lines of demarcation have to be redrawn, rearranged. The new Republic of Bangladesh has to be found a respectable place in the map of the sub-continent.

London could have played an important and significant role in the conflict. By acting in time, the Conservative ministry of Edward Heath could have saved the lives of thousands of innocent victims of Pakistani bullets and could have minimized greatly the strain on India because of the exodus from Bangladesh. But Sir Alec Douglas Home,

the Foreign Secretary, failed to act positively enough. This failure has, quite probably, spurred the Labor Party to seize the initiative. As Bangladesh is increasingly proving an issue of great international significance, it is quite likely to play significant part in British and American elections. Anyhow, whatever the causes of Labor leadership's swing toward us, the people of Bangladesh will thank heart fully John Stone house and those Labor members of the parliament who have proved themselves such great friends of our people. Most certainly their maneuvers were mainly responsible for ending Labor Party's indecision vis-a-vis Bangladesh.

About the involvement of the United Nations in Bangladesh-we are frankly sceptical. Even after six months of gruesome killing the United Nations has failed even to examine the accusations of genocide raised from four corners of the earth. It remained a silent spectator when Yahya boastfully tried to our record, outscore his pagan ancestor Nadir Shah through mass massacres in Bangladesh. In fact, with a view to aiding Yahya in his brutal yet hopeless effort to suppress the spontaneous war of Independence in Bangladesh it devised several ways to intervene. These were resisted resolutely and successfully by the people of Bangladesh and their international friends. Even today, the United Nations is viewing the conflict between Bangladesh and Islamabad as a kind of confrontation between India and Pakistan. This stand is considered positively mischievous and anti-people by the people of Bangladesh because this has been the spirit of the Pakistani propaganda from the moment Yahya opened his mouth on March the 26^{th} .

In the interest of world peace and peace in South Asia and in the interest of the people of Bangladesh who want to live in peace as a free people in their homeland, there can be only one solution of the conflict. And that is outright and universally recognized independence of Bangladesh. Let us point out, once again, that only mutual trust and benefit could have been the basis for any union between the people of Bangladesh and various regions of Pakistan, as they have nothing else in common, linguistically, ethnically, culturally and historically. The common religion argument is too stupid, too anachronistic to deserve a second mention.

Britain, U.S.A and certain other countries who have given large amounts of aid to Pakistan are worried as creditors. Will Pakistan be able to repay the debts once the rich jute and tea-producing land of Bangladesh becomes independent? This has been their main worry and was the cause of their bewildering silence over Yahya's crimes. West Pakistan is faced with acute economic crisis since the foreign exchange-earner Bangladesh declared independence. Yahya and his stupid advisers have seen to it. through nothing else but sheer arrogance, that there could never be any basis for a rapprochement. Now the onus is on the creditors-some of whom also happen to be Islamabad's political guides. Free Bangladesh has come to stay. The sooner they realize this the better. Because by that acceptance of reality they might stop losing further-in credits, debt-servicing and all that.

Only thing that remains to be done now is to force Yahya and his gang to see the light and accept the verdict of history. Perhaps, countries like Britain are more qualified

for the job than the UN where some nations have already shown great inclination to play football with the life-and-death issue of 75 million people. The game at UN suits Yahya very well. Moreover, by its callous silence over the real issue the United Nations has virtually lost its legitimate right to mediate.

১৪ অক্টোবর, ১৯৭১

YAHYA AND HIS BY-ELECTIONS

One of the blessings of living in an ivory tower is that it allows inhabitants limitless liberties-shame or morality or legality never has a role to play in their schemes. Yahya's latest drum-headings about holding so-called by-elections in occupied areas of Bangladesh where he did hold successful elections only 10 months ago confirms this once again. Always being far away from the people and during last 6 and half months being only among his closest collaborators in crime-he seems to have lost even that film-thin veneer of consciousness about what other people or even the world may have to say about his series of misdeeds and crimes.

Otherwise how could any self-respecting man talk about electing representatives of the people when he has, by the simple scratch of a pen (of course accompanied by genocidal onslaughts on the people themselves), made the party that won the elections illegal, invalidated the election of the 79 legally elected members and created conditions to make sure that no more than 15 or 16 treacherous Awami Leaguers of the rest 88 attend the farcical 'national assembly' that he say he intends to call next December to frame a constitution-his constitution. A man who considers the rest of the world foolish enough not to be able to see through these childish pranks of his certainly qualifies for the title- "Ass of the century". It doesn't take a political expert to understand that what he wants from East-not people's representatives but a set of criminals who would not deter from committing any crime against the Bengali nation to suit their master's taste for blood and intrigue.

But, in reality, this so-called holding of by-elections when Yahya has only his razakars to vote for his selected criminals in the last desperate attempt at creating some world consensus in his favor. Poor thing! Being always surrounded by professional liars who constantly tell him fairy-tales about the exploits of his killers in uniform in Bangladesh and secret sympathies of world government, he doesn't realize the real extent of his predicament. The war in Bangladesh is all but lost. His war-cries against India have been, so far, falling on deaf ears. Even his imperialist friends realize that the man is going round the bend with every sunrise.

But he will not break until the very last moment. This is the only positive quality that his thoroughly bad breeding has infused in him. Even after six months of thrashing by the Mukti Bahini-even after he has lost the services of over 40,000 of his best men and officers-he wants to pretend that he is not perturbed. In the next few weeks he will be struck an unforgettable blow by the freedom fighters. But, if he is still there, this sick

arrogance of his is expected to continue. The suicidal war on Bangladesh has ruined Pakistan economically nullifying its ill-gotten economic gains of last twenty four years. But the tin-soldier would not budge. He still continues blowing through the hopelessly punctured balloon of his non-existent prestige. He wants to show that he doesn't give a damn to world's view of his effrontery. Despite Worldwide condemnation of the illegal immoral trial of Sheikh Mujibur Rahman the man had the audacity to go through with it and condemning the People's leader to death. What cowardly reaction to Sheikh's super bravery! If he wanted Sheikh could have escaped to safety. But a democrat by heart and soul, he refused to do that and voluntarily, accepted arrest. Now this criminal has also the audacity to 'leak out' his intentions-that he might not murder Sheikh but instead let him rot in Pakistani prisons for the rest of his life. He thinks that by this he would be able to demoralize the freedom fighters. But, like all his erstwhile thoughts, he is gravely mistaken in this one too. Sheikh did not put all the eggs in the same basket. He stayed on but ordered all his lieutenants to continue the fight until victory. The greatest ambition of his life has been the establishment of a free, independent Bangladesh. Well-this has been achieved. What remains to be done now is its consolidation through a mopping-up operation against the foreign enemy, That is being carried out with increasing speed and efficiency. Our great leader Sheikh Mujibur Rahman's physical presence may not be necessary as every freedom fighter, whether with arms or without arms is inspired by his ideals.

Bangabandhu Shaikh Mujibur has left behind a million Mujiburs. Yahya is welcome to taste what such a leadership can mean.

১৫ অক্টোবর, ১৯৭১

MONEM ELIMINATED : OTHER COLLABORATORS

SHAKING IN PANTS

So traitor Monem gets his due at last. For the first time in Bangladesh it has been established that crime, after all, doesn't always pay. As expected, Ayub Khan has publicly shed a few drops of tears for the man who served him with the devotion and ferocity of an Alsatian. Monem had one good quality-he never could be discreet with his inner feelings. For this, often he used to talk quite shamelessly, about his master's benevolence that made a Governor out of a brief less district lawyer. He not only worked like a slave for his master-but successfully created within himself the soul of an ideal slave. When Ayub and his grotesque dictatorship were hated by the people-this man had the hateful guts to pronounce publicly-"Ayub is my father, my leader." With his active help Ayub turned the then East Pakistan into a colonial market for West Pakistan's industry. The more the people of Bangladesh hated him, the more reasons Ayub had for retaining him. He inflicted him on the Bengali people for 7 long years.

Monem was Ayub's most trusted collaborator in latter's grand designs against Bengali people's autonomy movement in general-and Sheikh Mujibur Rahman and the Awami

League in particular. Prisons of Bangladesh swelled with thousands of patriots. Monem unleashed all the evil powers that Ayub reposed in him in his attempt to crush Sheikh Mujib and his party. In May 1966 he had Sheikh arrested. On the 6th of June the same year when the 6-point autonomy movement was formally launched, he set his police against the demonstrators and soon there was no space left in the prisons to lake more prisoners.

Alongside the reign of terror, developed unprecedented volumes of corruption and nepotism. In the offices nothing would move without bribe. Every leaf of Monem's family-tree prospered like magic. During his last years, public traffic had to be stopped to make room for his escorted, siren blaring American car. In every sense, Monem symbolised Ayub's worst insult to Bengali nation. No wonder Ayub calls him a great patriot in his funeral message.

The man is dead now. The Mukti Bahini in its purification campaign has removed him despite fullest protection given to him by the Pakistani army. Justice has triumphed-however delayed. No more will this man be mentioned in matters concerning Bangladesh. Let no man right his epitaph.

Elimination of Monem has reportedly struck terror in the hearts of the quislings and collaborators of the foreign army in Bangladesh. The so-called ministers in Motaleb Malik's puppet cabinet have been shaking in their pants. They do not usually come out of doors even with army escort. Fazlul Qader Choudhury-the so-called politician has reportedly fled to West Pakistan. Parid Ahmed, too, has gone into hiding. And, that rat Mahmud Ali does not know for sure whether he should return to Bangladesh whose people he betrayed as Yahya's stooge at the United Nations. The days of the traitors at Dacca University, Radio Pakistan and Dacca Television are numbered too. But there is still time to repent. Stop betraying your own kith and kin only to help a vicious foreign enemy. Come to the liberated area and surrender. You may be forgiven.

২ নভেম্বর, ১৯৭১

YAHYA'S APPROACHING DOOM

The man who has lost only one ear tends to walk along one side of the road. But when he has lost both his ears he walks through the middle of the road. So goes a Bengali saying about shamelessness. And it fits so well with the way Yahya has been moving as revealed in his latest interview with London's Empire Loyalist paper the Daily Mail. When the whole world knows that he and his gang were hectically preparing to put into effect a two-year old genocide plan against the people of Bangladesh holding fake talks with Sheikh Mujib, this creature still insists that Sheikh Mujib went back on his promise of asking only internal autonomy and organized and led an armed rebellion. Ignorance is indeed a bliss for such incorrigible nincompoops. The fellow does not seem to recognize the glaring fallacy of his own claims.

After the heinous betrayal of the people of Bangladesh he suddenly postponed on February 28 the scheduled opening session of the National Assembly. Sheikh Mujib had every right to opt for armed struggle against the vicious junta, the usurpers of people's, power, and its feudal and capitalist collaborators like Bhuttos, Saigols and Adamjees. But icing it heart-and-soul democrat he still hoped against hope. He chose a nonviolent means to give Yahya and his gang the last chance. But the criminals seized the, opportunity to prepare for one of history's grisliest crimes. If Sheikh really had organized armed rebellion he would not be in Yahya's prison now to swallow indignities and suffer tortures from such scrums of (he earth. The fact is, if Yahya had anticipated the kind of armed struggle that the people of Bangladesh have succeeded in mobilising despite the sudden, unsuspecting onslaught by not, less than 5 divisions of Pakistani animals in human garb, things would have been quite different now. He and his collaborators would have come to the table like good boys for talks. Sheikh Mujib through his Six Points Charter had given them the last opportunity to save Pakistan through a partnership of equals. But then Pakistani army generals are not supposed to be visionaries nor are they supposed to be politician by any measure. Quite naturally, thus, they were intoxicated with the armed might that they had acquired hut paid for by the poverty-stricken people, they led themselves into believing that by indiscriminate murder, rape, loot and arson hey would be able to cow down the 75 million people of Bangladesh within 72 hours to urn Bangladesh into colonial paradise for the Pakistani coterie for centuries and the Bengalees would be forced to serve their Pakistani masters. However ridiculous the idea night have been it fitted perfectly with the mentality of the man who, even in this stage of civilization, quite shamelessly boasts of his decadency from that mass-killing pagan Nadir Shah in presence of foreign journalists. As the days of tyrants molding human destiny are over, Yahya despite the infernal massacre campaign in Bangladesh, is now faced with an unavoidable defeat. Bengalees are poised to prove that it is the people and not a handful of tyrants who would choose the course of future history.

The Daily Mail interview also reveals that Yahya has at last started talking about independent Bangladesh however reluctantly. He has accused India of trying to install in Bangladesh a 'puppet' government. This is indeed an observation of great humor. The elected representatives of Bangladesh would form a 'puppet1 government and Yahya's quislings in Dacca have formed a 'representative' government! Even a look through the wrong end of the telescope" would produce a better observation. Perhaps the same cupidity is also responsible for the so-called bye-elections for choosing obedient quislings. I leave the conclusion to the listeners. Let us assure Yahya and the world that Bangladesh Liberation Forces are new quite capable of driving out the Pakistani invaders from the soil of Bangladesh. All India should do now is to remain war-ready to counter Pakistani onslaught against her sovereignty. Yahya has apparently told both Newsweek and the Daily Mail that he would definitely go to war with India. He has even talked of Chinese arms aid in case of a War. This is probably a bluff-meant to bolster up Pakistani morale. Cleverly he did not mention U. S. arms aid. Pakistani war adventure in 1965 has proved quite clearly that no country can fight a modern war without a war industry-with

borrowed arms. Islamabad is welcome to taste a bigger defeat this lime. He should remember what the Indian Defense Minister has just said. He said: This time war would be fought only on West Pakistani soil. Whether Yahya actually starts a war against India or not, he can cleanly write off Bangladesh. Bangladesh is destined to be free perhaps before the end of the year.

Another laughable aspect has been an unwanted advice of Yahya to Mrs. Indira Gandhi. After hurling abuses, that are characteristic of his bad breeding at the Indian Premier he went on to warn that an independent Bangladesh would mean the beginning of the end of the Indian Union. It seems that even after so much trouble the fellow is totally incapable of understanding the laws of politics or history. He fails to see that the people of Bangladesh opted for independence only after it was made clear that their union with Pakistan only means an endless subjugation that has all the characteristics of classical colonialism. If there has been any genuine effort on the part of the usurpers of political power in Pakistan to treat Bangladesh as a partner with full democratic rights history-would have moved along a completely different course. In India, Yahya fails to realize, the very practice of democracy does not allow outright colonization of one region by another. It is in this democracy lies the root of Indian unity. Because the reactionary clique led by the army will never allow democracy to flourish in Pakistan, disintegration of what was once Pakistan would not halt with the parting of Bangladesh alone. Even the feeble union of West Pakistani regions would eventually snap and perhaps no less bloodily. Because there exists a no less crude form of exploitation of at least three other regions by one. The domination of feudal Punjab in the armed forces, in administration and industry and commerce was responsible for the Baluch rebellion of 1959-a rebellion that was ruthlessly suppressed with the world knowing little about ii. In fact, it was this success that encouraged the killer junta to undertake the murder mission against the people of Bangladesh. As things are moving now-within a matter of years the very name of Pakistan will vanish from the surface of the earth. Only the people of Pakistan by rising in arms against the vicious clique and its class allies like Bhutto can stave off this logical inevitability.

৯ নভেম্বর, ১৯৭১

US PEOPLE FORCE NIXON STOP ARMS FLOW

The United States has suspended all future arms aid to Pakistan. According to State Department spokesman Charles Bray the decision to revoke the license granted to Pakistan for 3.6 million dollars worth of military hardware was reached several weeks ago. The time taken to announce the decision has been attributed to the technicality of informing the Congress first.

On the face of it, the announcement signifies, at least, partial victory for a large section of the American people and their elected representatives to the Congress.

Nevertheless the decision has been taken with a view to creating an impact on the !972 presidential elections. President Nixon's foreign policy has suffered .severe setback with the signing of the Indo-Soviet pact and the entry of the Peoples Republic of China into the United Nation and consequent expulsion of the US baby-the Taiwan regime of Chiang Kai Shek. According to political observers, this deliberately timed announcement of the stoppage of arms aid to Pakistan is being interpreted as an attempt by President Nixon to recoup at least a part of the territory he had lost to the Democrats.

The announcement, however, should receive careful consideration of the people of Bangladesh and their friends around the world. One must not fail to notice that the decision to stop future arms aid was reached with the consent of Yahya junta. Moreover, there is absolutely nothing to suggest that there has been any change at all in U. S. Administration's basic approach to Bangladesh tragedy. Despite Indian Prime Minister's personal approach, President Nixon has chosen to remain sympathetic to Islamabad regime and has declined to put pressure upon Yahya and his killer gang even to halt their butchery in Bangladesh. This fact, again, emphasizes that the stoppage decision has, perhaps, nothing to do with the plight of the Bangladesh people-that the move is aimed at U. S. politics at home.

The fact that Yahya voluntarily agreed to the stoppage-particularly at a time when he is faced with certain defeat in Bangladesh-invites a lot of suspicion. Could it be that he agreed to the stoppage of direct aid in lieu of promises of the same aid through indirect channels? Pakistan's close lies with Saudi Arabia. Jordan, Iran and Turkey may help to open up an alternative route for U. S. arms flow without disturbing Nixon Administration's domestic image. All these countries have been close collaborators of Yahya in latter's genocidal war against Bangladesh people. There are confirmed reports that during last six months substantial quantities of military hardware and fuel came to Yahya by way of Tehran and Ankara. Is there any way to stop passage of U. S. arms crates via these countries? U. S. Congressmen have displayed great alertness over their administration's heartless policy vis-a-vis Bangladesh. Perhaps, they would now be on the lookout for any such deception.

A great part of the credit for the stoppage of direct arms supply to Islamabad must go lo "New York Times". Had it not been for its superb exposition of the State Department lies vis-a-vis continued arms aid to Pakistan despite a public announcement to the contrary-the real behind-the-scene story would never have come to light. By this the paper has served a great human cause-because the entire civilization is now on trial .in Bangladesh. We are pretty certain that with such daring watchdogs of human values remaining active, it would not be easy for the black cargo to reach the killers unnoticed. Despite the doubts and fears, the State Department announcement certainly marks a significant step forward in mankind's march toward a better world. We congratulate all these Congressmen who have been responsible for exerting the pressure needed.

১৩ ও১৫ নভেম্বর, ১৯৭১

PAKISTAN IN TIGHT CORNER: D-DAY NEARING :

WARNING FOR UN

A senior editor of Newsweek has just been in Mujibnagar by way of Bangkok, after spending a number of days in occupied and liberated areas of Dacca district. Despite worldwide speculation about the imminence of an Indo-Islamabad war, privately he is of the opinion that Pakistan is hardly in a position to fight a full-scale war with India. The colonial army in Bangladesh is in a desperate position. After visiting several Mukti Bahini strongholds in and around Dacca he has concluded that the Bahini is not only a viable force but has already succeeded in cornering the invaders. Pakistanis are so short of ammunition supply that often they fail to reply to Mukti Bahini shelling. In more than 50 per cent of their operations the freedom fighters succeed in capturing enemy arms and ammunition stocks. He also reports that the Mukti Bahini has gained such confidence by these successes that they no longer retreat after the sudden attacks. They capture an area and stay there. This latest tactic has paid off handsomely in many ways. Not only this is destroying Pakistani morale but is wining at the same time, greater and greater confidence of the population. Pakistanis are in the habit of surprise attacks against unarmed civilians anytime they suffer a defeat at the hands of the Mukti Bahini. Now this hit-and-crush policy has reduced civilian casualty considerably. The Newsweek man, a veteran of many wars including Vietnam, Algeria, South Africa and Biafra, is of the opinion that Islamabad is militarily nearly-finished. He thinks that even without an Indo-Pak conflagration the Mukti Bahini is capable of winning the war much sooner than Western observers would like to admit. He told a friend in confidence that Pakistan is certain to taste defeat in one or, at most, two months.

Such an assessment by someone who is one of the few confidante's of Yahya certainly draws attention. Apparently, he has been personally requested by Yahya to make a secret realistic report to him about the predicament of his army in Bangladesh. This fact, of course, should prove rather disturbing for the Mukti Bahini boys who took the correspondent in confidence and showed him their camps and strategic installations. There is little to suggest that he was not spying for Yahya. Perhaps time is here for the Mukti Bahini to impose a security cordon against all foreign correspondents. During last one week or so, hundreds of these correspondents were frantically searching for Mukti Bahini stones. After pooh-poohing Bahini war efforts and their successful hits against Pak army for 6 long months suddenly they have realized the extent of the blunder they had committed. They are also keen on the story in a sort of Cuban way. As the Mukti Bahini is certain to be victorious they must discover the political character of the struggle. Are they all nationalists or Reds in disguise? And, as past experience shows, the conclusions generally have little to do with reality. So it is always better to stay away from them in every possible manner. The freedom fighters, even if they happen to meet these people, they must not talk on politics or war tactics. They must mistrust them all

unless there are definite proofs to the contrary. Now, a caution far the inhabitants f Dacca. The desperate enemy might seek to attack and destroy the city itself when h begins to reel the hopelessness of this position. The people must prepare themselves f the fateful day right now. He assured that this time it will not be an one-sided affair The citizens must not only help the Mukti Bahini boys hut also rise with whatever they can lay their hands on to kill enemy soldiers who will he driven out of the cantonment and would be forced into hand to hand street fighting. You have nothing to fear. We are much too numerous, and now much too strong, for them.

Meanwhile a lot of publicity is being given to the blowing up of an American ship donning United Nations markings at China port. The ship, claimed US and UN sources carried nothing else but food grains for relief. The publicity clearly aims to establish that freedom fighters want the famine-stricken people of Bangladesh to die without food. Whether the suffering millions of Bangladesh would believe the story or not is nut difficult to guess. They know who their friends a re-freedom fighters or the United Nations that continues to give tacit approval to Yahya's genocide in Bangladesh. So there is nothing on UN's record to prove that it cares a hoot about whether we die or live. In fact, we are not quite sure whether the ship actually had a cargo of food grains and didn't have hidden ammunition- Even if it carried food grains there is nothing to assure us that the stuff was not meant to feed the bcseiged Pakistani Army. We have definite proof of World Red Cross milk meant for emaciated babies being used to feed the Pakistani invaders.

Let this be a warning. Any ship calling at enemy occupied ports of Chittagong and Chalna would be categorized as saboteurs and collaborators. It is our sacred duty to destroy them. Any country genuinely concerned about the plight of our people should send their food gifts through the Government of Bangladesh-the only legal authority of the land. Any attempt to by-pass it would be interpreted as a hostile act.

In reply to a question by the Newsweek man, Yahya's chief killer in Bangladesh General Niazi has threatened to deploy his tanks once again against the people ol Dacca if the Mukti Bahini boys take the fighting inside the city. He blow his tops and said that the Bengalees should know what the colonial army can do to the unarmed civilians of Dacca. This is, indeed, the first public admission by the killers that they deployed tanks against defenseless, unarmed citizens of Dacca on and after March 25. The silly General didn't quite realize that this boasting to the foreigner actually gave away the degree or Pakistani soldiers' cowardice. Anyway Mukti Bahini is well prepared this time to face all the consequences.

২২-২৩ নভেম্বর, ১৯৭১

BANGLADESH GET READY!

Most of the journalists who had entered the occupied as well as the liberated areas of Bangladesh usually come to Mujibnagar to report then" experience to anyone willing to

listen. This specialist traffic has been coming this way over last two or three weeks. Many of them, including the correspondents of some of the well-known papers with international circulation, have filed stones to tell the world, in one way or another, that Pakistan has been buried on March 25 and that Bangladesh is not only a reality but, in a matter of weeks, it might score a total military victory over the decaying occupation forces. Needless to say that these correspondents and photographers are, invariably, dispassionate in their views. They take all kinds of risks just to be able to file exclusive stories, not for any cause, but for their own professional fame. As a result, their views, although often devoid of compassion for the suffering, in a way provides a fairly reliable guide.

Over two weeks or so I have personally met a large number of these journalists, Ail of them appeared to present the same picture about the Pakistani occupation, army's hopelessness. They used to hesitate to concede even this much only a month ago. The mounting atrocities and indiscriminate killing going on in the enemy occupied zones of Bangladesh further confirm the nervousness of the killer army. In fact, the atrocities are likely to be stepped up even further with every victory the Mukti Bahini scores against them.

The people living in the occupied zones particularly in the cities of Dacca, Chittagong and Comilla should prepare themselves right now for any eventuality. The net is closing in steadily. The Mukti Bahini boys have been marching toward Dacca from al! directions. The occupation army's supply lines are dwindling fast. Their officers are expected to fly out of Bangladesh when things get really hot leaving behind the dumb, halfwit soldiers to kill and destroy until the ammunition stocks are exhausted and then to get killed themselves. This horrible phase is not far off. The citizens must take note and prepare themselves in any way they think best. Their only duty would be to stay alive by whatever means and help the liberation fighters when they lay a siege round the cantonment. The killers are most likely to attempt a total destruction of the cities by launching shells and rockets from inside the cantonments. They may even be tempted to let loose the mini China-built tanks against the cities. But these tanks are vulnerable to anti-tank weapons that the Mukti Bahini have in abundance. They will be blown to pieces in no time. The fact few days fight in the Western Sector-already as many as 13 medium sized tanks have been destroyed by the Mukti Bahini. The Pakistanis are not likely to come out of the cantonments being afraid of street fighting with the Mukti Bahini to be outnumbered and outgunned. The extent of prolongation of the war will depend on how long the enemy can hold out in the cantonment. Mukti Bahini's strategy is to flush them out. Keeping these in mind-the people must prepare themselves right now. There is no time to be lost. Stay clear of the cantonment areas.

Meanwhile the world continues to be in total darkness about suspected massacre that took place in Dacca late last week when the army went about the unarmed civilians after suddenly clamping curfew on the city early in the morning for nearly 15 hours at a stretch. The world press and radio networks did not appear to receive any report from their correspondents on the grisly happening. This shows that the killer authorities have

stopped the correspondents from filing stories on the massacre. Of course, the killers could not possibly hide the whole story for ever. Soon some foreign correspondents would come out of Dacca to tell the world what has actually happened. Our own reports indicate that fighting did take place between the Mukti Bahini and the killers well before his curfew was clamped. Losing the fight the invaders went about the innocent civilian's n revenge-the natural reaction of the cowards. This war has proved that the Pakistani lords are primitive barbarians right from the pages of medieval history and that modern civilization and its values failed to make any impression on them. As soldiers they are; One of the most cowardly even known. They seem to fight with lot of velour only against unarmed men and women and children.

২৪ নভেম্বর, ১৯৭১

FINAL BATTLE BEGINS:

MUKTI BAHINI RIDING HIGH

Just before the end of the rainy season there were a surprisingly large number of pundits all over the place to suggest that with the advent of the dry season the Pakistani barbarians in Bangladesh would turn into an army of Hercules's and would beat the tiny Bengali freedom fighters to a pulp. Quite naturally this was the hope that was nursed by these dubious pundits, in other words, the admirers of the fictional Pakistani prowess. Well, half the prediction was right i.e. the prediction about some people getting chopped into mince meat. It has become too evident even for the reluctant foreign correspondents to ignore. Since the Mukti Bahini quickly changed their lactic of hit-and-run for one of hit-stay-and-crush about four weeks ago, the brave young lions of Bangladesh struck terror in the hearts of the invaders by driving to hell an unbelievable number of their lives in frontal, unrelenting battles all over Bangladesh. Finding himself totally powerless Yahya sought to take it out on neighboring India by shelling her undefended towns and villages and by killing innocent civilians-the only job in which this descendent of the pagan marauder Nadir Shah has already displayed great expertise.

In reply to extreme restraint displayed by India Yahya-clique have been flexing their fatty muscles. Right from the day the freedom fighters of Bangladesh took to arms, the frightened skunks of Islamabad have been trying their best to internationalize the Bangladesh-Islamabad conflict. Although the animals have quite a few foreign associates !n (heir crimes against the people of Bangladesh, they all failed to involve the United Nations in the conflict for one reason or another.

Now, failing in its international maneuvers, the skunks are bent upon going over the rink-if necessary, along with the unsuspecting, ignorant 45 million people of Pakistan. Early last week when the Mukti Bahini initiated the final phase of this war of national liberation-Pakistani invaders in Bangladesh have suffered heavy casualties and they have been made to run in all the sectors. With every defeat they suffer Islamabad-controlled

radios cry hoarse over imaginary involvement of Indian troops. Of course, this has been the stupid official line right from the start. They always found great pleasure in terming the freedom fighters as Indian infiltrators. The silly stand made them world's laughing stock. But, then, shame or international humiliation means little to the arrogant buffaloes with brains about the size of peanuts.

Even though the impartial journalists would not corroborate Islamabad's fiction about Indian tanks rolling towards Jessore, it matters little to the frightened generals. They have already declared emergency and are going frantically through the motions of precipitating a war with India hoping against hope that someone will come to their rescue in Bangladesh. Yet even a child knows that Islamabad is hardly likely to declare war against India because that would simply mean shedding of Pakistani blood on Pakistani soil. Until now the killer junta has been, by and large, successful in deceiving the entire Pakistani population with shocking lies about the Bangladesh massacre and the crisis that was precipitated by nobody else but the junta members almost out of the blue. The tons of thousands of dead bodies of Pakistani soldiers are either buried or burnt out with petrol in Bangladesh. And nothing about the inglorious end is disclosed to dead soldiers' relations. But when Indian tanks and planes actually start hitting the cities of Lahore, Karachi and Rawalpindi-blood will flow-Pakistani blood for a change-and the whole game will be over for the junta. It is already worse than worst in Bangladesh. Troubles in Pakistan would virtually mean the capitulation of the killer junta. Thus, this war-dance and jingoism are perhaps put up shows, more exercises in political and military impotency. Whatever the killer junta does-it will never shift the theatre of conflict from Bangladesh to Pakistan. So far as they are concerned-if more blood is to flow let it be Bengali blood.

But, the fun is that, they are doomed to defeat in Bangladesh as well-and in the hands of the Mukti Bahini. And a lot sooner than many observers would concede or would want to believe. India has nothing to gain by going to war. In fact, she has everything to gain by not going to war. Why should she fight a war when the Mukti Bahini is capable of guaranteeing the return of all Bangladesh refugees to their homes-refugees who have been India's primary concern? If Pakistani planes are shot down it is only to show to Islamabad killers that India was no longer prepared to tolerate any more violation of her territorial integrity whether on land, sea or air.

Whatever may the transmitters of Islamabad liars have to say about to war, one thing is certain the Mukti Bahini is poised for final victory. Our countrymen particularly those who are captives in the occupied areas of Bangladesh-you can now wait for the new dawn. The darkness of the ghastly night of horror is clearing fast. Until your liberators reach yon-fight and stay alive. The citizens of Dacca, Chittagong and Comilla and other towns in particular must remain extra alert. While the entire western sector is being liberated fast, special divisions and battalions are moving steadily toward the capital and port cities. Civilians must try and stay away from the confrontation zones.

২৫ নভেম্বর, ১৯৭১

THE DECISIVE STAGE

The war of Bangladesh National Liberation has now gone well into the decisive stage. Reports from Western Sector indicate that liberation of Jessore town is imminent. Capture of Jessore would in real terms, mean at least half the final victory-as this will actually mean defeat of Pakistani troops in all the Sectors that rely on Jessore for their supplies, In other words, except parts of Dacca and Chittagong Pakistanis could be totally got rid off. The frantic withdrawal of Pakistani troops and collaborators from Jessore over last few days indicates that the killer invaders are already on the run. PIA planes were engaged to run as many as 40 sorties daily. Meanwhile, during the battle all along Jessore Road, Mukti Bahini boys have been scoring decisive victories. They have knocked out over 15 tanks and a large number of enemy soldiers. Being caught in a desperate position the invaders called in their air force for bombing and strafing the Mukti Bahini positions. One of the four Sabre jets was shot down by ground fire1. The rest 3, trying to show off, crossed Indian borders and were neatly destroyed by Indian Air Force. Meanwhile, in Chittagong, reports the Australian Broadcasting Corporation, the Bangladesh Air Force went into operation for the first time and bombed the hell out of surprised Pakistanis. But, despite all these defeats, the shameless mouthpiece of Islamabad beasts, Radio Pakistan, goes on barking about fictional Pakistani victories. It mentions all the Sectors where the killers are getting ail the licking but claims, in the same breath, that the fleeing Pakistanis have killed hundreds of Indian soldiers. Obviously, by Indian soldiers-the faithful dog means the Mukti Bahini boys. By listening to the Radio it would seem that the Bahini boys were sucking their thumbs when the Pakistanis allegedly killed them and ran.

That the Pakistanis are in a mess is amply proved by the way Niazi has' been behaving of late. He has been going on daily murder sprees in Dacca by imposing curfew every six or ten hours or so. Reports say, that the Pakistani murderers have been on continuous rampage. The unarmed and innocent civilians were being subjected to murder, loot, rape and arson. This outrage coming after so many claims of 'normalcy' certainly proves that Niazi has gone berserk out of fear and frustration. One Pakistani spokesman has admitted publicly that they are hopelessly outnumbered, outgunned. He is right-for a change. But killer Niazi wouldn't believe it. The fool has announced cash rewards for Mukti Bahini heads. He is much too idiotic to realize that it is too late in the game for such stupid antics. He has also proved himself, rather lousy on figures. He does not realize that entire treasury of Islamabad would get exhausted if rewards are to be paid for even a third of the Mukti Bahini heads. Perhaps, he knows that he won't have to pay a penny in real terms. Not one head will be sold out to foreign invaders.

It's a futile exercise Niazi. Take our advice: Get out of Bangladesh before. it is too late.

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১

NIAZI'S PITIFUL BOASTS

.London's The Daily Express has called Yahya a sadistic general with the intelligence of a Sergeant-Major, If that is the I. Q. of his boss, what, then, could be the level of intelligence of Lt. General Niazi-Yahya's killer associate in the occupied areas of Bangladesh? A clue to this is certainly available in Newsweek's Senior Editor Arnand Borchgrave's on the spot reporting from the occupied .one a few days earlier. It suggests that this nincompoop of a general has the intelligence of an overfed buffalo. Consequently, he is totally unresponsive to most of the human sensibilities and realities. Perhaps this is the only explanation that could be attributed to his silly boasts about how he has been killing the guerrillas. He reportedly barked: Oh, I'm not afraid of the guerrillas: I'm picking them off like flies." Obviously, the smug nit has neither the experience nor the intelligence to know how difficult it is to kill a fly. Moreover, the analogy falls flat when one realizes that flies don't bite-like the way Mukti Bahini tarantulas have been sucking the life blood out of the invaders. What's more, these tarantulas are immune from all kinds of insecticides that Niazi may have in his store. It's only a fool's smugness that has been allowing him to bark so noisily even at this stage of the game. Soon you will be laughing from the other side of your mouth Niazi-it's a solemn promise from us to you. Try and stay alive if you can to listen to the final jazz-to be more precise, to the inglorious regime.

Yahya and his stupid generals may not have realized what is really happening-but the good old lago seems to have got the smell of death already. Zulfi Bhutto, the self-styled Duke of Larkana, has reportedly said in Karachi that "Old Pakistan is dead. And that a new Pakistan must be created to avert a catastrophe". In other words, the clever cheat and the liar of a Dick has already written off Bangladesh and is already pleading for arresting further disintegration of the artificial union of Pakistani nationalities. Yet, it was only seven months ago-on March 26 to be more precise-that this man had boasted "I have saved Pakistan"-after giving his fullest support to Yahya's campaign of genocide against the people of Bangladesh. It requires a truly shameless creature to make such an about-turn and that, too, so publicly. However, by this he has displayed at least a higher degree of political understanding than those beasts in generals uniform, He knows how bad things are and how fast the whole of Pakistan is sliding toward disaster. Pakistan is finished-he knows that. Now to save his skin he is moving cleverly. He no longer demands transfer of power. The artificially created war-hysteria against India has helped him very much. The declaration of a state of emergency rules out any possibility of that never-never power transfer. Yet, cunning Bhutto is quiet. As trouble fumes all over Pakistan he continues to play the dubious role. Without taking any lesson from his fiasco in Bangladesh, Yahya has chosen to apply the same stick against the Sindhis, Baluchis and Pathans. The National Awami Party of both Wall Khan and Moulana Bhashani have been banned using the same pretext that was used against the Awami League. And, as expected, the reaction, too, is going to be the same. As NAP and Awami League leaders

are being hauled up, armed resistance is breaking out. The outcome-that is inevitable is the disappearance of the State of Pakistan from the surface of the earth. Bhutto is cleverly moving out of the scene—so that the blame doesn't fall on him. Yet the fact is he has played no less an active role in this shocking tragedy than that of Yahya and his criminal collaborators.

The end is near. Probably nearer than a few weeks. On Bangladesh theatre the last act is more than halfway through. There the net is closing in steadily and fast. The next play has already commenced-not along Indo-Pak border but in Pakistan itself. Despite all his muscle flexing-Yahya cannot afford a war against India. That means he would eventually fail in rousing the fascist jingoism in the people. He is certain to fail in his attempt to divert their attention from the inner strife that is waiting there like a time bomb. It is certain to explode and with it will explode the fascist generals, fascist feudal-lord politicians and fascist bureaucrats-the entente that was all along responsible for this sad end.

সংযোজন

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৩। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা অনুষ্ঠানমালার আরও কয়েকটি কথিকা।	'বেতার বাংলা' মার্চ ও এপ্রিল,	.... ১৯৭১ ১৯৭২

তথাকথিত পাকিস্তান বেতার ঢাকা

ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। না, গ্যাস চেম্বার কিম্বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে বেতার কর্মচারীদের হত্যা করা হচ্ছে না। মিথ্যে প্রচারকে জিইয়ে রাখবার জন্য তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং এই প্রয়োজনটুকু না থাকলে বেতারের সঙ্গে জড়িত সবাইকে মানবতার বর্বরতম শত্রু ইয়াহিয়া সরকার এতদিনে নিশ্চয়ই হত্যা করতো। তবু বলছি ঢাকর বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন আর কি হতে পারে?

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ-এর পর যদি কারো কারো বেতার কেন্দ্রে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হ'ত তা হলে দেখতে পেতেন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সামী কোরায়শীর সেক্রেটারীয়েট টেবিলের উপর দ্বিতীয় আর একটি টেলিফোন শোভা পাচ্ছে। সাধারণ টেলিফোনের থেকে এর গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এই টেলিফোন থেকে একটি মাত্র জায়গায় যোগাযোগ করা যায় এবং সে জায়গাটা হচ্ছে কসাইদের সুরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কেন এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেলিফোন লিঙ্ক-এর এই আলাদা ব্যবস্থা? ঢাকার বেতারে আরও ৬ জন সিনিয়র সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আছেন। কিন্তু কেনই বা বেছে সামী কোরায়শীর কক্ষে এই টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হল? যদিও তিনি অনেক জুনিয়র- এর একমাত্র উত্তর সামী কোরায়শী পশ্চিম পাকিস্তানী। অতএব, তিনি কসাই সরকারের একনিষ্ঠ পদলেহী। অবশ্য সামী কোরায়শী ছাড়াও ঢাকা বেতারে আরও এমন কয়েকজন দালাল রয়েছে যারা সামরিক স্বার্থের লালসায় বর্বরতার গ্যাংরিনে আক্রান্ত শত্রুদের পদলেহন করছে। বাংলার মানুষের ন্যায়দণ্ড তাদেরকে কোনদিনই ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করতে পারে না।

এ থেকে আর একটি সত্য আগুনের মতো জ্বল জ্বল করে ওঠে। আর সেটা হচ্ছে কসাই সরকার বাঙালীদের কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছে না, বাংলার মুক্তিকামী মানুষদের নিয়ে তারা সর্বদাই সন্ত্রস্ত। অবশ্য এটা অত্যন্ত পুরোনো সত্য। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে- এত অবিশ্বাস, এত সন্ত্রস্ততা, এত আতঙ্ক সত্ত্বেও বর্বর সরকার মিথ্যে প্রচারের প্রলেপ বুলিয়ে তাদের কুৎসিৎ মানসিকতাকে চাপা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাই রেডিও পাকিস্তানের খবরে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, অমুক জায়গায় জনসাধারণ কসাইদের ভাষায় দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিয়েছে। একদিকে তারা প্রচার করছে শান্তি কমিটির কথা, অন্যদিকে প্রচার করছে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই যদি হবে তাহলে শান্তি কমিটির প্রয়োজন পড়ল কেন? কেন নানা ধরনের মিথ্যে প্রচারণার বেসাতি? কেনই বা বার বার প্রচার করা হচ্ছে আপনারা সবাই কাজে যোগ দিন? এর উত্তর বাংলার মানুষ জানে। নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

[১৯৭১-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বেতারের কয়েকজন কর্মীসহ আশরাফুল আলম শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র ছেড়ে মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দেন। এই কথিকাটি ১৯৭১-এর ৯ই জুন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল- বেতার বাংলা, ১৯৭২]

বলছিলাম ঢাকা বেতারের কথা। কিভাবে সেখানে ন্যায়কে, সত্যকে হত্যা করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে আসছি। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মতামত- শত্রু কবলিত ঢাকা বেতারের একটি নিত্যকার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কি সত্যি কথা প্রচার করা হয়? এর উত্তর জানতে হলে পত্রিকা অফিসের কথা জানা প্রয়োজন। বর্বর জঙ্গীশাহী বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিষয় টেলিফোনে জানিয়ে দেন। এবং সেইসব বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় লেখা হয়ে থাকে। এরপর লিখিত বক্তব্য ছাপাবার আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেটা অনুমোদন করেন।

পত্রিকার সমস্ত সংবাদ ঠিক একই নিয়মে ছাপা হয়-শুধুমাত্র তারিখ, পত্রিকার নাম এবং সম্পাদকের নাম ছাড়া। বিবেকহীন নির্মম বেয়নেট সত্যকে লংঘন করে যে পত্রিকার জন্ম দেয় তাদের আর যা-ই থাক বিন্দুমাত্র সত্যের প্রয়াস থাকে না। তাই দৈনিক পত্রিকার মতামত একটি জাল অনুষ্ঠান। ঢাকা বেতারে এ ধরনের অনেক জালিয়াতি চলছে। ২৫'শে মার্চের পরও আমি ঢাকা বেতারে কিছুদিন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে ছিলাম পরে ও-বি সেকশনে লোক না থাকায় সেই সেকশনে আমাকে দেয়া হ'ল। ও-বি অর্থাৎ আউটসাইড ব্রডকাস্ট সম্পর্কে বলার আগে 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠানটির কথা না বলে পারছি না। ২৫শে মার্চের পর প্রথম যেদিন পত্রবিতান প্রচার করা হ'ল তার দুদিন আগে এই অনুষ্ঠানটির স্ক্রীপ্ট লেখা এবং পড়বার জন্য একটা নির্দেশ পেলাম। সেই সঙ্গে আমাকে কয়েকটা চিঠি দেয়া হ'ল। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব দেয়া হয়। সেই চিঠিগুলোর তারিখ দেখে অবাক হয়ে গেলাম, চিঠিগুলো ১৯৭০ সালের। আরও অবাক হলাম চিঠিগুলোর উপরে লেখা 'রিপ্লাই' অর্থাৎ ৭০-এর কোন এক সন্ধ্যায় এই চিঠিগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে। এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক। দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার পত্রবিতান অনুষ্ঠান-এর পালা এলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষও একটু চিন্তায় পড়লেন, শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাকে পুরোনো কিছু চিঠি খোঁজ করতে বললেন। দোতলার একটা অফিসরুমে গিয়ে দেখলাম আলমারির পাশে মেঝেতে অসংখ্য চিঠি পড়ে আছে। এত চিঠি? একটু অবাক হবারই কথা। চিঠিগুলো ১৯৭১ সালেরই, কিন্তু ২৫শে মার্চের আগের কথা। একটার পর একটা চিঠি পড়তে লাগলাম। প্রত্যেকটা চিঠির বক্তব্য প্রায় একই ধরনের। এক সময় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণভাবে সমর্থন করে যেসব অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল তারই প্রশংসায় ভরপুর। একটা চিঠির এক জায়গায় পড়লাম 'বাংলার মানুষের বক্তব্যকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য ধন্যবাদ- অনুষ্ঠানগুলি শুনিলে এত আনন্দ লাগে যে, আমার মায়ের মৃত্যুশোকও আমি ভুলিয়া যাইতে পারিব।''

প্রতিটি চিঠিই অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য ছাড়াও কুটিল ভুট্টো ও প্রধান কসাই ইয়াহিয়ার কঠোর সমালোচনায় ভরা ছিল।

দোতলার সেই কক্ষে যখন চিঠিগুলো পড়ছিলাম পাশের কোন রুম-এর স্পীকার থেকে পাকিস্তানী খবর-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারী, দেশের প্রধান শত্রু শেখ মুজিব এইসব শব্দ ভেসে আসছিল, আমি তখন যে চিঠিখানা পড়ছিলাম তাতে অল্প বয়সের একটি ছেলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লিখছে-

''এয়ারপোর্ট-এ ইয়াহিয়া খান আসলে তাকে তো বাচ্চা ছেলের দ্বারা মালা দিয়ে স্বাগত জানান হয়, তাই না? জানেন আমাকে যদি তাকে মালা দেয়ার জন্য নেয়া হত তাহলে লুকিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে যেতাম আর মালার বদলে তাকে গুলি করে মারতাম।''

এইসব চিঠি নিয়ে কর্তৃপক্ষকে দেখালাম। কিন্তু এ দিয়ে তো আর 'পত্রবিতান' অনুষ্ঠান চলে না। জনৈক কর্তাব্যক্তি নির্দেশ দিলেন কিছু মিথ্যে ঠিকানা দিয়ে সমস্ত স্ক্রীপ্ট লিখতে। ক্ষমা করবেন, আমি লজ্জিত। সেই নির্দেশ মত স্ক্রীপ্ট লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং তা যথারীতি সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্রচার করেছিলাম। তারিখটা আমার স্মরণ নাই। ২৫শে মার্চের পর মে মাসে দ্বিতীয় যেদিন পত্রবিতান অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় সেই দিনের কথা বলছি। ঐ দিনের চিঠির সত্যতা সম্পর্কে যে কোন শ্রোতা শত্রুকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সেই দিনের পত্রবিতান অনুষ্ঠানে যেসব শ্রোতার চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছে তাদের সেই ঠিকানায়

বেতার কর্তৃপক্ষ কোনদিনই তাদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কারণ, নাম-ঠিকানা সবই কাল্পনিক ছিল। সেই দিনের পত্রবিতানে এমন অনেক কাল্পনিক শ্রোতার চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছিল যারা নাকি কষ্টিপাথর, প্লেইন ট্রুথ, ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। কি ভয়ঙ্কর জালিয়াতি।

ঢাকার আউট ব্রডকাষ্ট সেকশনকে 'ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে' এই শীর্ষক অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করতে হ'ত। ঢাকা এবং তার আশেপাশে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তারই উপর শত্রুদের ভাষায় প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। যেমন ট্রেন কেমন চলছে কিংবা ফ্যাক্টরী কেমন চলছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার। আর ওই সাক্ষাৎকারগুলো নিতে আমাকেই যেতে হত। গেল মাসের প্রথম দিকের কথা। পোরটেবল রেকর্ডিং মেশিন নিয়ে কমলাপুর স্টেশনে গেলাম। সমস্ত স্টেশন খাঁ খাঁ করছে। ডিকেড অব রিফর্মস-এর ভাষায় এশিয়ার বৃহত্তম স্টেশনের এ কি পরিণতি! জনহীন নিস্তব্ধতায় চারদিক থম থম করছিল। মনে হচ্ছিল নির্জনতার দ্বারা সমস্ত স্টেশনটা লাঞ্ছিত। টিকেট কাউন্টারের পাশের বিরাট চত্বরটার উপর দিয়ে একমাত্র আমিই প্ল্যাটফর্মের ভেতর প্রবেশ করলাম। দু'একজন উর্দুভাষী টিকেট কালেক্টর ও দু'একজন অন্যান্য কর্মচারী প্ল্যাটফর্মে অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরে দেখতে পেলাম লাইনে দাঁড়ানো নিস্তব্ধ কতগুলো কম্পার্টমেন্ট। জানালাগুলো বন্ধ। দেখলেই বোঝা যায়, বহুদিন চাক্কা ঘোরেনি। প্রথমে স্টেশনের জনৈক পদস্থ কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নিলাম। বুঝতে পারলাম তিনি নিরূপায় হয়েই ইন্টারভিউ দিলেন। প্যাসেঞ্জারদেরও সাক্ষাৎকার নিতে হবে। কিন্তু প্যাসেঞ্জার পাব কোথায়? স্টেশনের কয়েকজন কর্মচারীকে প্যাসেঞ্জারের ভূমিকায় অভিনয় করালাম। তারা সবাই উর্দুভাষী। বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন। স্টেশনের সেই পদস্থ কর্মচারীই ব্যবস্থা করে দিলেন। সাইডিং-এ একটা ইঞ্জিন দাঁড় করানো ছিল। সেখান থেকে সাউণ্ড এফেক্ট সংগ্রহ করলাম। যথারীতি ট্রেন চলাচলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হল। অথচ যবনিকার দুয়ারে যে অভিনয়টুকু করান হ'ল, যে সাজান মিথ্যে কথাগুলো বলান হ'ল তার হিসেব কে রাখে? এরি নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান! বেয়নেটের আগায় অনেকেই বাধ্য হয়ে সাজানো সাজানো কথা তোতাপাখির মত আউড়ে গেছে। এবং সেই সব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ফলাও করে "ঢাকা শহর ও তার আশেপাশে" শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। বর্বর ইয়াহিয়া সরকার এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইছেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলে রাখি, ঢাকা শহরে একটা মাত্র কারখানা পুরোদমে চলেছে। আর তা হচ্ছে ঢাকা বেতার। যেখান থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 'মিথ্যে'' ম্যানুফ্যাকচার করা হয়।

মে মাসের ৮ তারিখে স্কুলগুলো খোলার জন্য বর্বর সরকার নির্দেশ দিয়েছিল। তিন-চারটে স্কুলে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন স্কুলে ছাত্র দেখতে পাইনি। ঢাকার কোন এক নামকরা স্কুলের গেটে দেখলাম জনা ৫/৬ ছেলে জটলা করছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম তারা ক্লাশ করতে আসেনি। এবং তারা ক্লাশ করবেও না। এমন কি স্কুলবাড়ির ভিতরে ঢুকতেও তারা ভয় পাচ্ছিল। কারণ যে কোন মুহূর্তে দু'পেয়ে পশুরা এসে তাদেরকে হত্যা করতে পারে। তবুও স্কুলের উপর প্রামাণ্য অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। দু'একজন শিক্ষক যাদেরকে বেয়নেটের ডগায় স্কুল খুলতে বাধ্য করান হয়েছিল তারাই সেই বেয়নেটের ভয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ক্লাশে কোন ছাত্রী নেই অথচ একজন শিক্ষয়িত্রী ক্লাশে পড়াচ্ছেন। এমনি একজন শিক্ষয়িত্রীর কণ্ঠস্বরও সেদিনের সেই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল অথচ ছাত্রীবিহীন একটি ক্লাশকক্ষে সেই শিক্ষয়িত্রী শুধু পড়ানোর অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ ধরনের অভিনয় করতে বাধ্য করেছিল।

এরই নাম স্বাভাবিকতা, এরই নাম প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। এবং এরই নামই জালিয়াতি। 'ডকুমেন্টারী' নামে তারা জাল অনুষ্ঠান প্রচার করছেন। পত্রবিতান অনুষ্ঠানে তারা কাল্পনিক শ্রোতাদের কাল্পনিক চিঠির উত্তর দিচ্ছেন, সংবাদ সেখানে 'ম্যানুফ্যাকচার' করা হয়, যে কোন স্ক্রীপ্ট প্রচারের পূর্বে ইংরেজীতে অনুবাদ করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়; কোরানের কোন কোন আয়াত এমন কি ছুরা, হাদিসের কোন কোন অংশ বা পুরো হাদিস তারা প্রচার করতে দিচ্ছেন না। বেতারের 'প্রোগ্রাম ফাইল' ঘাঁটলে এমন

অসংখ্য 'স্ক্রীপ্ট' পাওয়া যাবে না থেকে কোরানের উদ্ধৃতি কেটে দেয়া হয়েছে। বেতার কেন্দ্রের ডিউটি রুমের আলমারিতে রাখা হাদিসের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, এমন কি কোন কোন হাদিস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে-'আল্লাহতালা সে জাতির অবস্থা কখনই পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন না করে।'' আল-কোরানের এই বিখ্যাত বাণীটি শত্রুর দ্বারা পরিচালিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে আর শোনা যায় না। মোটের উপর মিথ্যার বারুদ পুড়িয়ে ঢাকা বেতার আতসবাজির খেলায় মেতে উঠেছে। সেখান থেকে এক ধরনের বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে- যাকে সহজ কথায় ছ্যাবলামো ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ঢাকা বেতার একটা অনুষ্ঠানের নাম সোহাগ করে রেখেছে 'প্লেইন ট্রুথ'। অনুষ্ঠানের বক্তব্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে তারা কতগুলো জটিল মিথ্যের জাল বুনছেন অনুষ্ঠানটির নাম 'কমপ্লেক্স লাই' দিলেই ভাল হত। তাই বলছিলাম- ঢাকা বেতার কেন্দ্র এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেখানে বিবেককে, সত্যকে, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের বক্তব্যকে বেয়নেটের পাশবিক আক্রমণে প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে। এর চেয়ে জঘন্যতম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প আর কি হতে পারে।

(আশরাফুল আলম রচিত)

মৃত্যুহীণ প্রাণ

মাকে গল্প বলতে বললে মা গড়িমসি করতেন। পরে আমাদের আগ্রহ দেখে শুরু করতেন।

এক দেশে ছিল এক রাজা। আর রাণী। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। সেপাই লস্করে জনে মানুষে ম ম করে রাজপুরী, আমলায় পইলায়, উজিরে নাজিরে রাজদরবারের কী রবরবা! কিন্তু আজ গল্পের ধরন পাল্টে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিখিয়ে দিয়েছেন রাজা একটি নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যেকেই এক একটি রাজা। আমরা সবাই রাজা। শুধু স্বাধীনতা বন্দী নয়, জালেমের কারাগারে ন্যায়বিচার মানবাধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ২৪ বছর ধরে মাথা কুটে মরছে। বন্দী আমার বাংলা। আমার রূপসী বাংলা আমরা ধর্ষিতা বাংলা। আমার জননী বাংলা।

রাজপুত্র একটি নয়। হাজার হাজার, লাখ লাখ রাজপুত্র-মাতৃ অপমানের তীব্র প্রতিশোধ কামনায় ছায়াহীন, বৃক্ষহীন ধু ধু তেপান্তরে ধূসর পথ অতিক্রম করে চলছে বন্দিনী মাকে উদ্ধার করতে।

আমার মা রাজপুত্রের যে বর্ণনা দিতেন তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! সেই রাজপুত্রের পোশাকে জরীর কারুকাজ, সূর্য এসে চুমু দিলেই সাত রং খেলা করে তার দেহে। রূপোর খাপে কারুকাজ করা তলোয়ার। মাথায় মণিমুক্তা খচিত উষ্ণীষ। গলায় গজমতি হার। কানে কানপাশা। চন্দন চর্চিত কপালে জয়-তিলক। চরণে চটকদার বাহারী জুতো। ঘোড়াটাই বা কম কী! দুধের মতো সাদা ধবধবে চোখ জুড়ানো ঘোড়া। তার উপর মখমলের জীন। আর আমার রাজপুত্র! পায়ে তার জুতো নেই। না বর্ষায়, না শীতে। পরনে একটি মাত্র লুঙ্গি। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা গেঞ্জি, নইলে গামছাই সার। চন্দন চর্চিত অঙ্গ নয়, ক্রলিং করে করে সারা গায়ে মেখেছে বাংলার মাটি। তলোয়ার তো নেই। হাতে লাঠি, নয় বর্শা। রাজাকার বা হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা থ্রি-নট-থ্রি। আমার রাজপুত্র বলে, না না ছিনিয়ে আনা নয়, ওটা তো রোজগার। রোজগারটা যদি এল-এম-জি হয়। ব্যাস আহার-নিদ্রা মাথায় উঠল, তেল দাও, সাফ কর, শোবার সময় বুকে জড়িয়ে ধরে শোও- স্বপ্নও ঐ এল-এম-জি নিয়ে। না, রাজকন্যা-টন্যা নয়, এমন কি পরীটরী কাছে ঘেঁষতে পারে না তার, সে স্বপ্ন দেখে বিশাল এক প্রান্তরে সে দাঁড়িয়ে আছে, এল-এম-জি একটানা গর্জন করে চলেছে, আর শত্রুসেনারা, তাগড়া ছোট চাচা প্রবল ঝাঁকুনী দিলে কুলগাছের কুলগুলো যেমন ঝুপ ঝুপ করে শিশিরের উপর ঝরে পড়ত, তেমনি

রাক্ষসগুলো ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে তো পড়ছেই। এক সময় একটা বুলেট এসে তাকে থামিয়ে দেয়। সে দ্যাখে, তার প্রিয় পতাকা দিয়ে গোটা শরীর জড়িয়ে রাখা হয়েছে। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে-আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

গান শুনতে শুনতেই তার ঘুম ভাঙে। আহা স্বপ্নটা যদি সত্য হয়! ধীরে ধীরে নতুন রাখা দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলায় সে।

আচ্ছা, আমার এই রাজপুত্রের কাছে আমার মায়ের রাজপুত্তুরটাকে একটু পানসে পানসে মনে হয় না! ঐ রাজপুত্রটা যেন যাত্রা-থিয়েটারের। কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা। না? নিজের কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, কোন কাজ নিজের করার মুরোদ নেই, হয় ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী নয় পরীটরী এসে করে দেয়। না হলেই চিত্তির।

আমার মায়ের কিসসা শেষ হতো এভাবে-তারপর? তারপর আর কি, রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। আর আমার রাজপুত্র?

না। না, না এমন রাজপুত্র পৃথিবী কোনদিন দেখেনি, কোন কবি কল্পনা করতে পারে না এর রূপের। পৃথিবীতে এর কথা কেউ কোনদিন বলে নি। বীর প্রসবিনী বাংলাদেশের গর্ভেই এমন রত্ন জন্মগ্রহণ করে। খালি হাতে যারা বীরের মতো লড়াই করতে পারে। যারা হাসতে হাসতে মারতে পারে, হাসতে হাসতে বীরের মতো মরতে জানে। আমার রাজপুত্র জানে মৃত্যু কত তুচ্ছ। জানে, মানুষ মরে। মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। কেউ রোগে মরে, কেউ হাসপাতালে মরে, কিন্তু প্রাণ দিতে জানে না। আমার রাজপুত্র শুধু মারতেই নয়, প্রাণ দিতেও জানে। যে প্রাণ মানুষের কল্যাণের জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে মর্যাদা দেয়ার জন্য, দেশের জন্য নিবেদিত, তার জন্য মৃত্যুবরণ করার মতো সৌভাগ্য আর কিছুতেই নয়। সকল জীবনের গৌরবোজ্জ্বল দেশের জন্য প্রাণ দিতে জানা। এ প্রাণ মরে না, চিরকাল বেঁচে থাকে। মেয়েরা ঘাটে চাল ধুতে ধুতে তারই গল্প করে, পাল তুলে দিয়ে বৈঠায় ক্লান্ত হাত রেখে মাঝি তারই গান গায়, কবিরা তাকে নিয়ে অমর কাব্য রচনা করেন, ক্ষেতে হুকোয় তামাক ভরতে ভরতে তারই গল্প চলে বুড়োদের আসরে।

সাধ্য আছে কোন নুরুল আমীনের কোন নতুন অস্ত্র দিয়ে, বুলেট দিয়ে, স্যাবরজেট দিয়ে বা শ্যাকে ট্যাঙ্ক দিয়ে বাংলার বুক থেকে রফিক, জব্বার, বরকত, সালামকে হত্যা করতে পারে? না । কেন? আমার রাজপুত্র মৃত্যুহীন প্রাণ দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিসসার রাজপুত্র রাজা হয়, তারপর এক সময় মারাও যায়। এই রাজপুত্রের মৃত্যু নেই। এরা মৃত্যুহীন প্রাণ।

(আসাদ চৌধুরী রচিত)

ইবলিশের মুখোশ

যখন ছোট ছিলাম, বয়স যখন পাঁচ কিংবা ছয়ের কোঠায় ছিল তখন দাদীমা গল্প শোনাতেন। ঝোলা বোঝাই গল্প ছিল দাদীমার। আজগুবি সব ভূতের গল্প। গল্প শুনতে শুনতে কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, কখনো আবার প্রত্যক্ষ ভূত দেখার মতোই আঁৎকে উঠতাম। বুকের ভেতরটা দূর দূর কেঁপে উঠতো। কোন কোন দিন এত ভয় পেতাম যে ভয়ের প্রচণ্ডতায় দাদীমাকেই নিজের অজান্তে জড়িয়ে ধরতাম। এতো ভয় পেতাম তবু কিন্তু গল্প শোনার নেশা কাটত না। ভয় খেয়ে গেছি বলে দাদীমা একটু থেমে গেলেই ওকে তাড়া দিয়েছি আবার শুরু করবার জন্য।

দাদীমার ভূতের গল্পে কেমন একটা যাদু ছিল। গল্পের সব নায়ক-নায়িকারা ছিল জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখি। মজার ব্যাপার হল জন্তু-জানোয়ারগুলো কথা বলতে পারত। দাদীমা সেই জন্তু-জানোয়ারের হাঁকডাকের স্বর ও গোঙানী অবিকল নকল করে শোনাতে পারত। জন্তুরা কেমন আচমকা তাদের রূপ পাল্টাতে পারত এবং দেহের রূপ পাল্টাবার সাথে সাথে বাঁচনভঙ্গীও কেমন পাল্টে যেত, দাদীমা সবকিছু পরিবর্তন করে শোনাতে পারতো। দাদীমার গল্পের সব জন্তু-জানোয়াররাই ছিল ভূত-প্রেত। সন্ধ্যার অন্ধকারে গুটি শুটি মেরে গল্প শুনতাম। অন্ধকারে ভূতেরা কেমন করে হাঁটে, কেমন করে চাঁপা গোঙাতে গোঙাতে পাহাড় পর্বত নদী খাল বিল অতিক্রম করে তা দিব্যি দেখতে পেতাম। দু'মিনিট আগেই যে ভূতটির আকৃতি একটি হিংস্র বাঘের ন্যায় ছিল হঠাৎ কেমন করে তা একটি পোষা ময়না পাখি বনে গিয়ে মিহি সুরে গান শুরু করত তা তখন ভেবেই পেতাম না। তখন ওই সব বিশ্বাস করতাম। কেন না, বয়েসটা ছিল পাঁচের কোটায়। দু'দশক পর আজ হলে দাদীমার সেই আজগুবি ভূতের গল্প হয়ত আমল দিতাম না। দাদীমার ভূতের গল্পে তখন শুধু এক জন্তু অন্য জন্তু বা পশু-পাখিতে রূপান্তরিত হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একাত্তরের প্রান্তসীমানায় মানুষও যে ভূত হতে পারে এবং রাতের অন্ধকারে তারা নরঘাতক পশু হতে পারে তা হয়ত দাদীমা জানতো না। জানা থাকলে এ মনুষ্যবশী ভূতদের গল্পও পারতো। বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে এই মনুষ্যবেশী ভূত তথা হিংস্র জানোয়ারদের আজকাল বিচরণ করতে দেখা যায়। সত্যি সত্যি যা ভূত, তার অস্তিত্ব বুঝে পাওয়া কঠিন-কিন্তু এরা যে মনুষ্যবেশী ভূত এদের মূর্তিমান অস্তিত্ব আবিষ্কার করাটা তেমন দুরূহ কাজ নয়।

বাংলার মুক্তিসেনারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে তাদের শৌর্যবীর্য ও পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হানাদার জন্তুদের আবিষ্কার করে চলেছেন। মনুষ্যবেশী এই জন্তুদের মুণ্ড আবিষ্কারই এখন এই বীর সেনাদের জীবনের পরম কামনা।

গত কয়েক দিনে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে মুক্তিবাহিনীর বীর গেরীলাদের হাতে হানাদার পাকিস্তনী সৈন্যরা প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর বাংলাদেশে জন্তুরাজ জেনারেল নিয়াজী এই সমস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। নিয়াজী বলেছে, আমার জওয়ানরা ভারতীয় অনুচরদের আক্রমন প্রতিহত করেছে এবং পাল্টা আক্রমণের মুখে ভরতীয় অনুচররা পিছু হাটতে বাধ্য হয়েছে। ওদিকে ইয়াহিয়া খানই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিকৃত রূপ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য মনুষ্যবেশী ভূতের মতো গোঙাতে শুরু করেছে। ভারত নাকি পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি আক্রমণ করছে। বেমালুম চেপে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মাদ খাঁ তার আব্বা হুজুর ইয়াহিয়ার চেয়েও কয়েকহাত বেড়ে গলাবাজি করছে। ভরত-পাকিস্তানের সীমান্তে নাকি একটি যুদ্ধাবস্থার মতো পরিবেশ বিরাজ করছে।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ' এ কথা যথার্থতই প্রমাণ করেছে ইয়াহিয়ার তাবেদার সুলতান খাঁ। মনুষ্যবেশী পশুসম্রাট ইয়াহিয়া আরেক কাণ্ড করে বসেছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। ভূতের মুখে রাম নাম আর কি। ভারত কিন্তু এর যথোচিৎ জবাব দিয়েছে। গত তেইশ বছর ধরেই ভারত সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রস্তাব দিয়ে এসেছে। আজ হঠাৎ জঙ্গী শাসকদের প্রবক্তা ইয়াহিয়া খান ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য এত উদ্বেল হয়ে উঠলো কেন? মতলবটা কি? আসল মতলব আমরা টের পেয়েছি। উদ্দেশ্য সৌহার্দ্য স্থাপন নয়, বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাকে বিভ্রান্তির অতলে ডুবিয়ে দেয়া। কিন্তু ইয়াহিয়া জানেন, বিভ্রান্তির অতলে বাংলাদেশের মানুষকে আর ডুবানো যাবে না। বাংলাদেশই নয় বিশ্ববিবেকও আজ জাগ্রাত।

ভূতের মুখে রাম নামই হোক আর সৌহার্দ্যর প্রস্তাবই হোক, সে আমাদের ব্যাপার নয়। তার জবাব ভারতই দিয়েছে এবং দেবে। কিন্তু আমাদের জবাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বুলেট বেয়নেটে মনুষ্যবেশী জন্তরা আমাদের সর্বহারা করেছে সেই বুলেট বেয়েনেটের আমরা জবাব দেব। কেননা, আমরা তাদের স্বরূপ উদঘাটন

করেছি। এরা দাদীমার সেই আজগুবি জন্তুবেশী ভূত নয়। এরা মানুষ্যবেশী হিংস্র জন্তু নরঘাতক, ইবলিশ। বাংলার পবিত্র মাটি থেকে উৎখাত করে বিশ্বের দরবারে এই ইবলিশের মুখোশ আমরা ফাঁস করে দেবোই দিবো।

(মেসবাহ আহমেদ রচিত)

রণাঙ্গনের চিঠি

যশোহরের রণাঙ্গনে ক্ষণিক বিরতির সময়ে জানতে পেলাম, গণতন্ত্রের পীঠস্থান মহান ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উল্লাসে ফেটে পড়েছে আমাদের সমস্ত শিবির। আনন্দে কোলাকুলি করছে সবাই, কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, আমার দেশের মাটি আমার মায়াঘেরা দেশের সোনার মাটি, কত ঝড় বয়ে গেলো তোর উপর দিয়ে, শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তোর সোনার অঙ্গ। ভাবিস আমরা তোর শৃঙ্খল ঘোচাবো, তোকে মুক্ত করবো, আবার তোকে সাজাবো আমাদের প্রীতি মমতা দিয়ে, সবটুকু শক্তি দিয়ে।

জানো বন্ধু, কী তৃষ্ণা কী আকুলতা নিয়ে কেটেছে গত আট মাস বারো দিন এই একটি সংবাদের জন্য! কেটে গেছে কতো বিনিদ্র রজনী। যখন রণক্ষেত্র থেকে আহত স্বামীকে কোলে করে নিয়ে ফিরেছি, তখন ভেবেছি আর কতদিন? স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে ভেবেছি আর কতো দিন বাকী আমাদের স্বীকৃতির। মনে পড়ে কয়েক দিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে আশরাফ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করেছিলো "স্বীকৃতি মিলেছে? উত্তর দেবার আগেই আশরাফ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। আমার বুকে আমার হাতে তখনও আশরাফের ছোপ ছোপ রক্ত। রক্ত কথা বলে উঠলো, "আমি আশরাফের রক্ত স্বীকৃতির দাবী নিয়ে বাংলার মাটিতে জমাট বেঁধে থাকবো, তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও। তোমরা আমাকে স্বীকৃতি দাও।"

আজ স্বীকৃতি মিলেছে। আমার বুকপকেটে রয়েছে আশরাফের রক্তমাখা আমার রুমালটি। বার বার রুমালটি দু'চোখে চেপে ধরছি। আমাদের বন্ধু আশরাফের রক্ত-শোন, তুমি শোন, স্বীকৃতি মিলেছে তোমার। স্বীকৃতি মিলেছে আশরাফের, স্বীকৃতি মিলেছে কুদ্দুস, টিটু, আজাদ, তারিক, মাসুদ আরো শত শত শহীদের রক্তের। স্বীকৃতি মিলেছে দশ লক্ষ লোকের রক্তের, যারা বর্বর খুনী ইয়াহিয়ার বাহিনীর গুলির আঘাতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, স্বীকৃতি মিলেছে বাংলার সাতে সাত কোটি মানুষের।

বন্ধু, আনন্দে আমার চোখের জল ঝরছে। আশরাফের পবিত্র রক্তের সংগে আমার চোখের জল মিলে একাকার হয়ে গেছে। তুমিও কী কাঁদছো বন্ধু? কেঁদো না। দোহাই তোমার, কেঁদোনা, চোখের জল মুছে ফেলো।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী সরকারের বিমান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ৪৭টি পাকিস্তানী জংগী বিমান ভূপাতিত। তাদের দুটি যুদ্ধজাহাজ, একটি ডেস্ট্রয়ার, ১টি সাবমেরিন নিমজ্জিত। তাদের একটির পর একটি ঘাঁটিতে পতন ঘটেছে। আখাউড়া, লাকসাম, কুলাউড়া, লাতু, বিয়ানীবাজার, মিয়ার বাজার, ফেনী থেকে শত্রুসেনা সম্পূর্ণ বিতাড়িত। সমগ্র টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উড্ডীয়মান বাংলাদেশের জয় পতাকা।

সুতরাং, বন্ধু কেঁদো না। চোখের কোণে তোমার আনন্দের, বেদনার যে জলটুকু জমে উঠেছে তা মুছে ফেলো। আমরা এগিয়ে চলেছি, তোমরাও এগিয়ে চলো দুর্বার গতিতে। শত্রুর দুর্গে আঘাতের পর আঘাত।

হানবো আমরা। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো ওদের সামরিক শক্তি। ধুলোয় মিলিয়ে দেবো ওদের শক্তির দম্ভকে। তারপর আর মাত্র কয়েকদিন পর যখন বাংলাদেশের মাটি থেকে শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যখন আমাদের সোনার বাংলার মাটি শত্রুস্পর্শের কলঙ্কমুক্ত হবে তখন আমরা কাঁদবো গলা জড়িয়ে আমাদের হারানো সাথীদের জন্যে। আমরা সেদিন চোখের জলে আমাদের বন্ধুদের শুভ্র, পবিত্র অম্লান স্মৃতিকে স্মরণ করবো। আর সবাই মিলে গড়ে তুলবো আমাদের সোনার বাংলাকে।

(গাজীউল হক রচিত)

বিচার চাই

সারা বাংলাদেশ যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার নবীন আভায় অবগাহন করছে ঠিক সেই সময় এক দুঃসংবাদ আমাদের সবাইকে বিস্মিত, মর্মাহত ও বেদনার্ত করে তুলেছে। পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে পশুর চেয়েও নির্মম খান-সেনারা ও তাদের দালালরা ঢাকার বুক থেকে শত শত বুদ্ধিজীবীকে গোপনে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই নরঘাতকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রতিভাকে ধ্বংস করে দেওয়া। এরা বেছে বেছে হত্যা করেছে প্রখ্যাত অধ্যাপকদের, ডাক্তারদের, ইঞ্জিনিয়ারদের, সাংবাদিকদের। ঢাকা সেক্রেটারিয়েটের অফিসারদেরকেও এরা হত্যা করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু পশুদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

প্রথম থেকে এই নরপশুরা যে একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের মানুষকে, তার ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এরা বর্ণগত ভিত্তিতে, ভাষাগত ভিত্তিতে, ধর্মগত ভিত্তিতে, সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে ও রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়। আমরা প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আমরা বলেছি উপযুক্ত অনুসন্ধান করে আমাদের এই অভিযোগ যাচাই করা হোক। আমরা বার বার জাতিসংঘের সদস্যদের বলেছি যে, যে আইন আপনারা পাশ করেছিলেন নেই আইন অনুসারে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা গণহত্যা। বর্ণগত ভিত্তিতে গণগত্যা চলেছে। গণহত্যা চলেছে ধর্মের নামে ভাষার নামে, সংস্কৃতির নামে। আমরা চিৎকার করে বলেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে মেরে ফেলা হচ্ছে। নারীর উপর নির্যাতন চলছে, বৃদ্ধ ও শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। আপনারা গণহত্যা হচ্ছে কিনা অন্তত একবার তদন্ত করুন, একবার দেখুন আমাদের ক্রন্দন যথার্থ কিনা। আমরা আরও বলেছি, একই বিষয়ের জন্য দু'ধনের মানদণ্ড হতে পারে না- একথা আপনারাই একদিন বলেছিলেন। ন্যুরেমবার্গে হিটলারের সাঙ্গপাঙ্গদের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আপনারা বিচার করেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যুদ্ধাপরাধের. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের। তাদের বিরুদ্ধে আপনারা গণহত্যার অভিযোগ এনেছিলেন এবং সেই অপরাধে তাদের শাস্তিও দিয়েছিলেন। আর তখনই সেই আন্তর্জাতিক আদালতের মার্কিনী বিচারপতি কি মন্তব্য করেননি যে, একই অপরাধের জন্য বিচারের মানদণ্ড দু'রকম হতে পারে না? তিনি কি আরও বলেন নি যে, উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশেই অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার কোন দোষ নেই, সব দোষ অফিসারের, এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়? তিনি কি বলেন নি যে, যে যার কাজের জন্য দায়ী হবে? সেই মহান বিচারপতি কি আরও ঘোষণা করেন নি যে আমরা এমন কোন আইন তৈরী করবো না যা আমাদের বেলায় ব্যবহার করা যাবে না? গণহত্যা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন পাশ করার সময় এ কথা কি ঘোষণা করা হয়নি যে গণহত্যার বিচার করার জন্য জাতিসংঘ যে-কোন ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তার অর্থ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বোঝাবে না? সেখানে কি বলা হয়নি যে বর্ণগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত কারণে কাউকে হত্যা বা অত্যাচারিত করা যাবে না? জাতিসংঘের সনদের ৯৯ সংখ্যক ধারায় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে কি ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে

এসব হস্তক্ষেপের অধিকার দেয়া হয়নি? দুঃখের বিষয়,বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পুরাপুরি গণহত্যা অনুষ্ঠিত হোল, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হোল, লক্ষ লক্ষ নারীর আর্তনাদে বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো, লক্ষ শিশুর আর্তনাদে কেঁদে উঠলো বাংলার গাছপালা, কিন্তু তাতে জাতিসংঘের গলাবাজ সদস্যদের হৃদয় সামান্যতমও কাঁপলো না। মানুষের মরণ আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছালো না। তারা নির্বিকার চিত্তে সম্মতি জানালো পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর কার্যাবলীর প্রতি। তারা গণহত্যা হতে দিলো, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে দিলো, তারা লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে মরতে দিলো, তারা অত্যাচারিতকে পায়ে দলে দিলো, অত্যাচারীকে সাদরে কোলে টেনে নিলো। তারা আইন ভঙ্গ হতে দিলো, তারা অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করলো।

বিশ্বশান্তির এই সব ধ্বজাধারীদের ধারণা যে, চোখ বুঁজে থাকলেই কঠিন কঠোর সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এদের ধারণা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র বলেই ন্যায়বিচার করার দরকার নেই। এরা মনে করে, দু'একবার আইন ভঙ্গ হতে দিলে এমন দোষ ঘটে না। এরা ভাবে, যত আইন ভঙ্গ হোক না কেন গোলমালে না জড়িয়ে পড়লেই বাঁচা যাবে। এরা ঠিক করেছে যে, কেবল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখবো না।

দুঃখের বিষয় মহাকালের শিক্ষা এরা ভুলে গেছে। এরা ভুলে গেছে যে, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া কোন উদারতার ব্যাপার নয়, আইন ভঙ্গ হতে দেওয়া দুপক্ষেরই বিপজ্জনক। হিটলার যখন বারবার অন্যায় করছিল তখন বৃহৎ শক্তিগুলো সব মেনে নিচ্ছিল, হিটলার ছোট ছোট দেশগুলো যখন দখল করছিল তখন চেম্বারলিন ছাতা দিয়ে তাকে বাতাস করছিলেন। কিন্তু সেই আইন ভঙ্গকারী হিটলারই কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ডেকে আনলো, বৃটেন ফ্রান্সসহ বহু দেশে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালালো। যদি প্রথম থেকেই বাধা দেয়া হোত তাহলে এই ধ্বংসের সম্মুখীন হতো না পৃথিবী।

পৃথিবীর সর্বত্র অন্যায় হচ্ছে। অথচ স্বার্থপরতার জন্য তার প্রতিকার করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের মানুষ প্রাণ দিলো, কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হলো না। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো চেয়ে চেয়ে তাই দেখলো। আমরা ক্ষুদ্র বলেই এই অবহেলা। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা যদি মিথ্যা না হয় তাহলে একদিন অন্যায়ের প্রশ্রয়দানকারীরা উপযুক্ত শিক্ষাই পাবে। অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য রক্ত দিয়েই শাস্তি পেতে হবে। এবং অত্যাচারীর হাতেই সেই শাস্তি পেতে হবে তাদের।

আমার সোনার বাংলার শত শত প্রতিভাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। কি আর কোন ভাষায় যে আমরা হাহাকার করবো বুঝতে পারছি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়েছি। শত স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরাও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। কোন কিছুই দিয়েই তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ হবে না। যেসব সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেন তাঁদের অভাবে সারা দেশ আজ কাঁদছে। আমরা সবাই আজ হাহাকার করছি। সেইসব বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সময় চীৎকার করে আমরা বলতে চাই- হত্যাকারী যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারী যেন শিক্ষা পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শাস্তি পায়, হত্যাকারীর সাগরেদ যেন শিক্ষা পায়।

তবে এ কথা ঠিক, অপরাধীর বিচারের ভার আমরা নিজের হাতে তুলে নেবো না। বিচার করবেন আমাদের সরকার। বিচারের ভার বহন করবেন সরকারের আইন বিভাগ।

(মোহাম্মদ আবু জাফর রচিত)

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৪। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত সূচী (অংশ)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দলিলপত্র	......১৯৭১

২৫ আগস্ট, ১৯৭১

১। সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা (কোরাস)
২। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো একটি কাহিনী (আপেল মাহমুদ)
৩। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ
৪। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম

২য় অধিবেশনঃ

১। মুজিব বাইয়া যাওরে (আঃ জব্বার)
২। জাগো অনশন বন্দী উঠোরে যত (কোরাস)
৩। আমার দেশের মাটির গন্ধে (ফেরদৌসী রহমান)
৪। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
৫। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী

৩য় অধিবেশনঃ

১। চল বীর সৈনিক (আপেল মাহমুদ)
২। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)
৩। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৪। আমার প্রতিবাদের ভাষা
৫। আমি শুনেছি শুনেছি বাংলার মায়ের কান্না (মান্না হক)

২৮ আগস্ট, ১৯৭১

২য় অধিবেশনঃ

১। শেখ মুজিব সত্যযুগের (তোরাব আলী শাহ)
২। মুজিব বাইয়া যাওরে (আঃ জব্বার)
৩। ওরা কোথায় গো (শাহ আলী সরকার)
৪। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৫। আজি বাংলাদেশের (অজিত রায়)

৩য় অধিবেশনঃ

১। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
২। সোনার বাংলা বলো (কোরাস)
৩। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
৪। অনেক রক্ত দিয়েছি (আঃ জব্বার)
৫। দুর্জয় বাংলা- (কোরাস)

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১ম অধিবেশনঃ

১। সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের (কোরাস)
২। সেলাম সেলাম হাজার সেলাম (ঐ)
৩। আমার বাংলা দেশের মাটি (ঐ)
৪। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (ঐ)

২য় অধিবেশনঃ

১। ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা (কোরাস)
২। ভায়ের মায়ের (ঐ)
৩। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নাই (ঐ)
৪। হাজার বছর পরে (আঃ জব্বার)
৫। জয়ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মোঃ শাহবাঙালী)
৬। হায়রে পাষাণ তোদের শীর্ণ দেহ (স্বপ্না রায়)
৭। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ (কোরাস)
৮। কারার ঐ লৌহ কপাট (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ

১। রক্তে যদি ফোটে (কোরাস)
২। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৩। আমি ভয় করবো না (জরিন আহমদ)
৪। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক (তপন ভট্টাচার্য)
৫। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৬। অনেক রক্ত দিয়েছি (আঃ জব্বার)
৭। সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশনঃ

১। পথে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ ও স্বপ্না রায়)
২।আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৩। তোমার নেতা আমার নেতা (ঐ)
৪। সোনার বাংলা বলে (ঐ)
৫। জয়ধ্বনি করে শেখ মুজিবর (মোঃ শাহ বাঙালী)
৬। কার বা বিচার কে বা করেরে (হরলাল রায়)
৭। শিকল পরা ছল (নজরুল গীতি)
৮। জাগো অনশন বন্দী (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ

১। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (কোরাস)
২। বাধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৩। বাংলার মাটি বাংলার জল (ঐ)
৪। যুদ্ধ কর অসি ধর (অনিল চন্দ্র দে)
৫।আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৬। জাগো জাগো ও বাঙালী (ঐ)

২১ অক্টোবর, ১৯৭১

১ম অধিবেশনঃ

১। ও আমার দেশের মাটি (অজিত রায়)
২। জয় জয় বাংলার জয় (কোরাস)
৩। পথে যেতে যেতে জন্ম হলো (আপেল মাহমুদ)
৪।সোনা সোনা সোনা লোকে (কোরাস)

২য় অধিবেশনঃ

১। জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে (নাসরিন ও অরূপ)
২। আয়রে চাষী মজুর কুলি (কোরাস)
৩। জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (ঐ)
৪। বিচারপতি তোমার বিচার (ঐ)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহমদ)
৬। জাগো অনশন বন্দি (নজরুল গীতি)
৭। কারার ঐ লৌহ কপাট- (ঐ)

৩য় অধিবেশনঃ

১। ওরে জাগো জাগো ও বাঙ্গালী (কোরাস)
২। নওজোয়ান সব এগিয়ে চল (ঐ)
৩। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)
৪। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৫। সোনার স্বদেশ ভূমি (মনজুর আহমদ)
৬। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (অজিত রায়)
৭। আমি মরিব তাতে ক্ষতি নেই (কোরাস)

১ নভেম্বর, ১৯৭১

২য় অধিবেশনঃ

১। জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো (কোরাস)
২। জয় জয় বাংলার জয় (ঐ)
৩। পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৪। বাংলার মাটি বাংলার জল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৫। ও খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি (রবীন্দ্রনাথ)
৬। আরে ও মাঝি ভাই (মনিরা জামান)
৭। দুর্গম গিরি কান্তার মরু (নজরুল গীতি)
৮। চল ছুটে চল (পল্লীগিতি) (আঙ্গুর)

৩য় অধিবেশনঃ

১। আমার প্রতিবাদের ভাষা (কোরাস)
২। যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক (ঐ)
৩। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
৪। আমি একজন মুক্তিসেনা (মান্না হক)
৫। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল)
৬। দুনিয়ার যত গরীবকে আজ (ঐ)

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
১ম অধিবেশনঃ
১। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (কোরাস)
২। দিনের শোভা সূর্য রাতের শোভা চাঁদ (আঃ গনি বোখারী)
৩। 'এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ'- একটি গীতিনকশা
সংযোজনা-শাজাহান ফারুক
বর্ণনায়- আশরাফুল আলম
সঙ্গীত পরিচালনা-
১। সুজেয় শ্যাম
২। আপেল মাহমুদ
৩। রফিকুল আলম।

৩য় অধিবেশলনঃ

১। কারার ঐ লৌহ কপাট (কোরাস)
২। মোরা ঝঞ্জার মত (ঐ)
৩। জনতার সংগ্রাম চলবে (ঐ)
৪। সোনার বাংলা (জারী গান) (হযরত আলী)
৫। চল ছুটে চল (মফিজ আঙ্গুর)
৬। একি অপরূপ (কোরাস)
৭। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (ঐ)
৮। সংগ্রাম সংগ্রাম (অনুপ)

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
১। গীতিনকশা (রক্ত চাই)
সঙ্গীত পরিচালনাঃ সুজেয় শ্যাম (কোরাস)
২। জয় বাংলার জয় (কোরাস)
৩। জনতার সংগ্রাম চলবেই (ঐ)
৪।ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৫। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (কোরাস)

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১। এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ
২। জয় ধ্বনি কর বীর মুজিবর (মোঃ শাহ বাঙালী)
৩। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)
৪। সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি
৫। বাংলাদেশ বাংলাদেশ (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
৬। এই কথাটি ধরেই (লায়লা জামান) (ঐ)
৭। এবার তোর মরা গাঙ্গে (তপন ভট্টাচার্য) (ঐ)

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশনঃ
১। ধন্য আমার জন্মভূমি (কোরাস)
২। রক্ত চাই রক্ত চাই (ঐ)
৩। আগুন আগুন আমরা আগুন (ঐ)
৪। জনপদ প্রান্তরে সাগরে বন্দরে (ঐ)

৫। ঝড় ঝঞ্জার মুখোমুখি (ঐ)
৬। আহা ইয়াহিয়া কান্দেরে (হরলাল রায়)
৭। কার বা বিচার কে বা করে রে (ঐ)
৮। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্র সঙ্গীত)

১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম অধিবেশনঃ
১। পথের আঁধার আর নাই (কোরাস)
২। এবার উঠেছে মহাঝড় (ঐ)
৩। মোরা জঞ্জার মতো উদ্দাম (ঐ)
৪। কারার ঐ লৌহ কপাট (ঐ)
৫। ও বাঙালী ভাই কে কে যাবি (ইন্দ্রমোহন বোখারী)
৬। ঐ ঐ ঐ চল চল নওজোয়ান (আঃ গনি রাজবংশী)
৭। জয় বাংলা জয় (কোরাস)
৮। রক্ত রঙ্গীন উজ্বল দিন (ঐ)

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ
১। ও বগিলারে কেন বা আইলো (নথীন্দ্রনাথ রায়)

২।সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ (কোরাস)
৩। ওরা কলিজা ছিঁড়ে
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। সম্মুখপানে চলবো মোরা
৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা তোদের (আঃ গনি বোখারী)
৭। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)
৮। ঐ ঝঞ্জার ঝংকারে ঝংকারে

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১। দেয়ালে দেয়ালে লিখা (কোরাস)
২। ওরা যতই বলুক (ঐ)
৩। সোনার বাংলা করবো সোনা (মোঃ নৌশেদ আলী)
৪। বারুদে বারুদে সারা বাংলা
৫। পথের আধাঁর আর নেই (লাকি আখন্দ)

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। সংগ্রাম সংগ্রাম (কোরাস)
২। আমার প্রতিবাদের ভাষা (ঐ)
৩।মুক্তির একই পথ সংগ্রাম (ঐ)
৪। দুর্জয় মোরা সাত কোটি (ঐ)
৫। এবার উঠেছে মহাঝড় আলোড়ন (ঐ)
৬।এঘর দুর্গ ওঘর দুর্গ (ঐ)
৭।সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি (ঐ)
৮।ঐ ঝঞ্জার ঝংকারে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
৯। বাংলা থেকে দুশমনদের (সর্দার আলাউদ্দিন)
১০। ও আমার দেশবাসী ভাই (মোঃ মুন্নাফ)
১১।জনতার সংগ্রাম চলবেই (কোরাস)
১২। আয়রে চাষী মজুর কুলি (ঐ)
১৩।এবার তোর মরা গাঙে (রবীন্দ্রসঙ্গীত
১৪। এই কথাটি বলেই (ঐ)

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। জয় জয় জয় হবে বাংলার (কোরাস)
২। ওরা কলিজা ছিঁড়ে (ঐ)
৩। ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি (ঐ)
৪। ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল (ঐ)
৫। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৬। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
৭। রুখে দাঁড়াও রুখে দাঁড়াও (সরদার লাউদ্দিন)
৮। বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধর (মনোরঞ্জন সরকার)
৯। একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে (আপেল মাহমুদ)
১০। অনেকে রক্ত দিয়েছি (আঃজব্বার)
১১। ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ঝংকারে (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
১২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা (ঐ)

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ

১। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (কোরাস)
২। মোরা ঝঞ্জার মত উদ্দাম (নজরুলগীতি)
৩। শিকল পরা ছল (ঐ)
৪। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (কোরাস)
৫। সংগ্রাম আজ সংগ্রাম (ঐ)
৬। রক্ত রঙীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১। আমরা গেরিলা আমরা (কোরাস)
২। আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা (ঐ)
৩। দুর্জয় বাংলা (ঐ)
৪। দুর্গম দূর পথ বন্ধুর (ঐ)
৫। নোঙ্গর তোল নোঙ্গর তোল (ঐ)
৬। তোরা জোরছে চল (শাহ আলী সরকার)
৭। দস্যু মারিতে চল ধাইয়া (ঐ)
৮। পরানের বন্ধুরে বলবো কি তোরে (দ্বৈত সঙ্গীত)

৯। হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার (আপেল মাহমুদ)
১০। বাঁধ ভেঙ্গে দাও (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১১। চল যাই চল যাই (ঐ)

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রথম অধিবেশনঃ
১। আজ রণ সাজে বাজিয়ে বিষাণ (সমবেত কণ্ঠ)
২। ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য (ঐ)
৩। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে (ঐ)
৪। রক্ত রঙ্গীন উজ্জ্বল দিন (ঐ)
৫। আমি মস্ত সাগর
৬। মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম (নজরুল গীতি)
৭। রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ
১। আমি শুনেছি শুনেছি (মান্না হক)
২।থের আঁধার আর নাই (কোরাস)
৩। চল বাঙ্গালী চল (পল্লীগীতি) (কোরাস)
৪। মুক্তি ভাই ঝম ঝম করে (তোরাব আলী শাহ)

তৃতীয় অধিবেশনঃ
১। সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গীকার (কোরাস)
২। সম্মুখপানে চলবো মোরা (ঐ)
৩। চলরে সবাই বাঁধ ভাঙ্গাবার (ঐ)
৪। মুজিবর মুজিবর (ঐ)
৫। ওরে শোনরে তোরা শোন (ঐ)
৬। আমি মরবো তাতে ক্ষতি নাই (ঐ)
৭। আমার মুক্তিবাহিনী ভাইরা (তোরাব আলী শাহ)
৮। আকাশের তারার মত (ঐ)
৯। ও আলোর পথ যাত্রী (কোরাস)
১০। চল চল চল (নজরুলগীতি)
১১। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
১২। নাই নাই ভয় (ঐ)
১৩। এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে (ঐ)

পরিশিষ্ট-১

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৫। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতিবেদন	....	........১৯৭১

১. মুক্তিকামী বাঙালীর প্রেরণার উৎস
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

আতিকুর রহমান

ইথারে ভেসে আসা শব্দ যে বুলেটের চেয়েও প্রচণ্ডতম শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'। ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীর বীর পশুরা সেদিন বুলেট-বেয়োনেট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী আঘাত হেনেছে নরপশুদের বিরুদ্ধে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী বাহিনী মরণ ছোবল হেনেছিল। শহর-বন্দর-গ্রামকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল। সেই আঘাতে হকচকিত বাংলার মানুষ পরদিন ২৬শে মার্চ বেতারে শ্রুত একটি বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন আশার বাণী। সে বাণী ছিল স্বাধীনতার, হানাদারদের কবল থেকে মুক্তির। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এই বেতার বাঙ্গালীদের যুগিয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, দেশকে মুক্ত করার প্রেরণা।

বিপ্লবী বীর সূর্যসেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল চট্টলার বুক থেকেই সেদিন বেতারে হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা। আর কালুরঘাটস্থ পাকিস্তানী বেতারের ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানো হয়েছিল স্বাধীনতার সে বাণী। ২৬শে মার্চ জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

২৫শে মার্চ রাতে হানাদার হায়েনার দল হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর ২৬শে মার্চ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বেতারের সকল কর্মচারী কাজ বন্ধ করে নিয়েছিলেন। ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখেছিলেন যাতে হানাদার বাহিনী প্রয়োজনবশত অবিলম্বে বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করতে না পারে। ঢাকা বেতারও সেদিন নীরব ছিল।

চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' চালু করেছিলেন তাঁরা সকল প্রকার ঝুঁকি নিয়ে।

২৬শে মার্চ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য একবার চট্টগ্রাম বেতার থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান প্রচারিত হয়েছিল।

সংগঠিতভাবে না হলেও সেদিনই সন্ধ্যায় আরেকদল কর্মী 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বলে পরিচয় দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। ২৭শে মার্চ এই কেন্দ্র থেকে মেজর (বর্তমান লেঃ কর্নেল) জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

এই কেন্দ্র থেকেই ২৮শে মার্চ মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঢাকায় টিক্কা খানকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয়। সত্য না হলেও জনগণের হৃদয়ে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য বেতার কর্মীরা সুপরিকল্পিতভাবে এ কাজ সেদিন করেছিলেন।

দুই ভাগে বিচ্ছিন্নভাবে এজন্য প্রচেষ্টা চলেছিল। প্রথম দিনে দুপুরে সামান্যক্ষণ অনুষ্ঠান প্রচারকালে গণ-পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ, হান্নান হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আর এই অনুষ্ঠান প্রচারে সহযোগিতা করেছে চট্টগ্রাম বেতারের ইঞ্জিনিয়ার মীর্জা নাসির, জনাব আবদুস সোবহান, চট্টগ্রাম কাস্টম বিভাগের জনাব আবদুল হালিম, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা জনাব এম, এ, মাসেম প্রমুখ।

সেদিন সন্ধ্যায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সাথে জড়িত বেতার কর্মিগণ ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে এই প্রচার চালু রেখেছিলেন। সেসব বেতার কর্মীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত মুজিবনগর থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন।

আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার ডাঃ সৈয়দ আনোয়ার আলীর বাসভবনে জমায়েত হয়েছিলেন দেশপ্রেমিক কয়েকজন ব্যক্তি। নেপথ্যে শুরু হয়েছিল অপর প্রচেষ্টা। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার জনাব আসিকুল ইসলামের গাড়ীতে (চট্টগ্রাম ট-৯৬১৫) সেদিন ডাঃ আনোয়ার আলী, জনাব ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ চন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা সবাই ছুটে গিয়েছিলেন আগ্রাবাদস্থ ব্রডকাস্টিং হাউসে। আরেকদিক থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কর্মী জনাব বেলাল মোহাম্মদ, জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, জনাব মাহবুব হাসান একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রডকাস্টিং হাউসে পৌঁছেন। সমবেত প্রচেষ্টার ফল ফলে সেদিন সন্ধ্যায়।

সেই কর্মীদের দল আবার একত্রে কালুরঘাট পৌঁছেন। খবর পেয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন টেকনিশিয়ান ও প্রোগ্রাম প্রডিউসার কয়েকজন।

রাত সাড়ে সাতটার দিকে ট্রান্সমিশন কেন্দ্রের একটি কক্ষকে স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করে জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মুক্তির নবতম হাতিয়ারের ব্যবহার।

প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা করে টেলিগ্রামের বাংলা ও ইংরেজী তর্জমা প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজী থেকে তর্জমা করেছিলেন ডঃ মঞ্জুলা আনোয়ার। ইংরেজীতে ঘোষণাটি পড়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব আশিকুল ইসলাম। এই ঘোষণায় বাঙালী জাতি উদ্বুদ্ধ হয়নি শুধু- বাঙ্গালী জাতি যে স্বাধীন হবেই সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

আধ ঘণ্টার মত প্রচারকালে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান ও বয়োবৃদ্ধ কবি আবদুস সালাম কথিকা পাঠ করেছেন। সেদিনের ঘোষণায় কণ্ঠ দিয়েছেন কাজী হোসনে আরা।

৩০শে মার্চ পর্যন্ত বেতার কর্মীরা অনিয়মিত হলেও অনুষ্ঠান প্রচার করেছেন। ৩০শে মার্চ হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা চালায়। আর তা ছিল কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে। স্যাবর বিমান থেকে রকেট নিক্ষেপ করে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল ইথারের ভাষা।

পরে বেতার কর্মীরা স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ধীরে ধীরে তখন মুজিবনগরে গড়ে উঠছিল ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের পথ ধরেই। সেদিনের অনেক কর্মী পরে সেখানে যোগ দেন।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা বেতার কেন্দ্র রক্ষার দায়িত্বে থেকে সেই কয়দিন অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন অনুষ্ঠান চালু রাখার।

‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ থেকে তখনকার অনুষ্ঠান প্রচারে জড়িত ছিলেন এ ছাড়াও প্রোগ্রাম প্রডিউসার জনাব আবদুল্লাহ-আল-ফারক ও জনাব মোস্তফা আনোয়ার, বেতার ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আহমদ শাকের, টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট জনাব রশিদুল হাসান ও জনাব আমিনুর রহমান, টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, জনাব শরফুজ্জামান ও কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ।

সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন জনাব এ, কে খানের দুই ভাইপো সেকান্দর ও হারুন।

অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছেন। মেকানিক শফুর। প্রথমে ড্রাইভার হিসেবে চাকুরী নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার জন্য মেকানিক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শত অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তার অদম্য প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় একদিন অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

[-দৈনিক ‘পূর্বদেশ,’ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

২, বেতার-মুক্তি সংগ্রামে*

বেলাল মোহাম্মদ

এই তথ্য-নিবন্ধ নির্মাণোদ্যত হয়ে প্রথমেই যে বিবেচনা বোধ করছি, তা হচ্ছে, ইতিহাস দুই কারণে বিকৃত হতে পারে। এক, প্রণেতার স্মৃতি বিপত্তি, যার কারণ কালবিলম্ব না করে লিপিবদ্ধকরণের পরিবেশের অপ্রতুলতা। দুই, অবস্থা গতিকে না ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থে কোনো কোনো তথ্য গোপন বা অব্যক্ত আবশ্যকতা। এই শেষোক্ত কারণে অনেক সময় কোন বক্তব্য বিষয়কে বিকৃত না করলেও সীমাবদ্ধতা দিয়ে ক্ষুন্ন করতে পারে বেশ খানিকটা, অনেক কথাই স্মৃতিতে অম্লান হওয়া সত্ত্বেও সর্বমুহূর্তে প্রকাশ করা যায় না।

গোড়াতেই সবিনয়ে একটি কতা বলে রাখতে চাই, যে বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ কর্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, আমার সহকর্মীরা অনেকেই বর্তমান আছেন যারা এটি পাঠ করবেন এবং আমার ভ্রমের জন্য বা দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও উপলব্ধির বিভ্রমের জন্য তাদের কারো কাছে এখানে বর্ণিত কোনো তথ্যকে অস্বস্তিকর আপত্তিকর বিবেচিত হলে তা যেন ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির বা অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে একজন সাংবাদিক যখন কোন সংবাদ সরঞ্জাম প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সংগ্রহ করেন, তখন তিনি ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে স্বয়ং জড়িত না হয়ে তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকা লিখতে গিয়ে আমরা স্বকীয় নগণ্য প্রয়াসকে ও সামগ্রিক সংগ্রামসূচী ও সংগ্রামী কার্যক্রমের সংগে সংযুক্ত করতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হই। এটি একটি সংগ্রামী জাতির অস্তিত্বের সংগে একটি ব্যক্তিজীবনের কর্মময়।

---

*একই শিরোনামে ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে ‘বেতার বাংলা’র বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত বেলাল মোহাম্মদ-এর প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

অস্তিত্ব রক্ষার আত্মপরিচয়মূলক সহজাত এবং নির্দোষ ঔৎসুক্য। অনুরূপ মানসিকতার প্রাবল্যে আমাদের ন'মাসকালের দেশ রণাঙ্গনের যাবতীয় কথা প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় আত্মকথা।

বর্তমান সময়ে সঙ্গত কারণেই আমরা সবাই অসম্ভব রকম জাতীয় সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত বলেই নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকা আকারে এতো কথা বলতে হলো।

এবার আরম্ভেরও প্রারম্ভিক হিসেবে বলতে হচ্ছে, একটা বিষয় রহস্যাবৃত থাকা পর্যন্ত তাই নিয়ে বিচিত্র বিক্ষিপ্ত জল্পনা-কল্পনারও যেমন অবকাশ আছে, তেমন অবকাশ আছে নানা রকম রটনার এবং নানা জনের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ-সুবিধার।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ইতিমধ্যেই একটি বহুবিতর্কিত জটিল প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে একজন নগণ্য বেতার কর্মী হিসেবে আমার সর্বসময়ের বক্তব্য হচ্ছে, স্বধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব কারুরই নেই। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বেতার বিভাগীয় কর্মীরাই আলোচ্য কেন্দ্রটি চালু করেছেন- সেটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক কিংবা হোক রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে বা সহযোগিতায়। কেননা, বেতার মাইকের সামনে শব্দনিক্ষেপণ এবং শব্দকে ইথারে উৎক্ষেপন এই দুই কর্মই বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় কর্মীগণ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া ২৫শে মার্চ, ৭১- এর পূর্বহ্নে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের বেতার কেন্দ্রগুলো দখলদার সরকারের সঙ্গে সত্যিকার অসহযোগিতা প্রদর্শনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল- তারই নির্দশন হচ্ছে 'রেডিও পাকিস্তান'- নাম ঘোষণাটি সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজ নিজ আঞ্চলিক নাম ঘোষণা শুরু করেছিল, যেমন, ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল বাঙালী কর্মীদের সমন্বয় সংগ্রাম কমিটি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের ভাষণটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রথম ৭ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রচার করা হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৫ই মার্চ, ৭১ স্থানীয় লালদীঘির ময়দানে অভিনীত গণনাটক মমতাজউদ্দীনের রচিত 'এবারের সংগ্রাম'- এর রেকর্ড ১৭ই মার্চ চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাজানো হয়েছিল। বেতার তথা সরকারী কর্মচারীদের কানে নিত্যই বাজাতো একটি বজ্রকণ্ঠের বাণীঃ বাঙালীর স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ তোমাদের করতে বলা হলে তোমরা অফিস বন্ধ করে দেবে।

ঠিক তা-ই করেছিলাম ২৬শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা চট্টগ্রাম বেতারের কর্মীরা। প্রথম অধিবেশনের শেষাংশে যে মুহূর্তে বেতারের তখনকার প্রাদেশিক অনুষ্ঠানের সামরিক প্রশাসক প্রবর্তিত বিধানের প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে উপস্থিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। আমাদের কর্মীরা বেতার ভবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

তার পরের ঘটনাগুলো অসম্ভব রকম স্বতঃস্ফূর্ত, অসম্ভব রকম বিচিত্র-বিক্ষিপ্ত। বিচিত্র কি, তখন আমাদের অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও এরকম কিছু একটা ভাবতে পারেন, এখন যদি বেতারের বাঙালিদের সংগ্রামের সপক্ষে কিছু প্রচার করা যেতো।

বস্তুতঃ অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা থেকেই চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটারে বিভিন্ন পর্যায়ে একই দিনে ২৬শে মার্চ, ৭১ তিনবার স্বল্পকাল স্থায়ী তিনটি অধিবেশন প্রচারিত হয়। একবার বেলা ২ টা বেজে ৭ মিনিট আর একবার সন্ধ্যা ৭ টা বেজে ৩৫ মিনিটে এবং আর একবার রাত ১০ টায়। বস্তুতঃ এই তিনটি ঘটনাই অসম্ভব রকম বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর উদ্যোগ-আয়োজনও ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত- দেশে দখলদার সামরিক বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে যেমন সেদিন সর্বত্র গড়ে উঠেছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ, এগুলোও ঠিক তেমনি।

দ্বিপ্রহরের অধিবেশনটির আমি প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতা নই। কিন্তু পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, সেটির উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান। তিনি ও তার দলের সহকর্মীরা আমাদের কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ট্রান্সমিটার চালু করিয়েছিলেন। অধিবেশনটিতে ঘোষণা হিসেবে জনাব হান্নানের নাম ও বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং জনাব হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা প্রসঙ্গে পাঁচ মিনিট ভাষণ প্রচার করেছিলেন। অধিবেশনের স্থিতিকালও ছিল ছয় থেকে সাত মিনিট।

জনাব হান্নানের প্রভাবে যেসব বেতারকর্মী/প্রকৌশলী ট্রান্সমিটার চালু করেছিলেন, তাঁর পরে আর এমুখো হননি-অধিকন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলাম।

সন্ধ্যা৭টা বেজে ৩৫ মিনিটে যে অধিবেশন প্রচার করা হয় সেটার উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলাম আমি। ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ নামটি আমিই অন্যতম সহকারী আবুল কাসেম সন্দ্বীপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির এবং অনুমোদন করেছিলাম।

২৬ শে মার্চ, ৭১ সকালবেলা সহসা যখন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে দন্তচিকিৎসক মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে। তখনই আমার মনে এসেছিল, এখন যদি কিছু একটা করা যেতো! যেটা একজন অসহযোগকারী বাঙালীর জন্যে অত্যান্ত স্বাভাবিক, আগেই বলেছি। মনের কথাটা সে মুহূর্তে আমি শুধু বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম- তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন।

প্রথমেই আমি গিয়েছিলাম স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগ অফিসে- নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়ে যদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা যায়। পরিচিত কারো সঙ্গেই সেখানে আমার দেখা হয়নি। আমি শুধু নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে সেখানে অন্যভাবে অসম্ভব রকম কর্মব্যস্ত দু’একজন কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করেছিলাম। তখন সেখানে অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানেই দেখা হয়েছিল অধ্যাপক মমতাজউদ্দীনের সঙ্গে। মমতাজ আমার প্রস্তাব/ পরিকল্পনা শুনেই নির্দ্বিধায় সহযোগী হয়েছিলেন এবং নিজেন প্রভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী এডভোকেট রফিকের কাছ থেকে একখানা জীপ চেয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রসঙ্গটি ছিল আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এ দুটি এলাকাকে পর্যপ্ত সংখ্যক সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বা বাঙালী সৈন্য সমাবেশে সংরক্ষিত করা। আমরা দুজন জীপে করে রেলওয়ে বিল্ডিং- এর পাহাড়ে ইপিআর হেড কোয়ার্টার্সে কমাণ্ডার রফিকের কাছে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ২ টা। কমাণ্ডার আধ ঘণ্টার মধ্যে বেতার ভবনে ২০ জন এবং ট্রান্সমিটারে ১৫ জন ইপিআর পাঠিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বাস্ত হয়ে আমার রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মাহবুব হাসান বেতার নাটকের শিল্পী- প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট, আমাদের প্রকৌশলীদের অনেকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব। তার সহায়তায় প্রকৌশলিক প্রস্তুতি সম্পাদন আমার উদ্দেশ্য ছিল।

এবার আমরা তিনজন জীপে করে চকবাজার এলাকার বাসিন্দা আমাদের বেতারের দুজন প্রকৌশলীর কাছে গিয়েছিলাম। তারা শর্ত আরোপ করেছিলেনঃ তারা কাজ করবেন, তবে এক, আঞ্চলিক প্রকৌশলীর লিখিত অনুমতি নিতে হবে অথবা দুই, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা বাধ্য হয়ে প্রস্তাবিত কাজটি করেছিলেন- অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেন তাদের বিপদ না হয়। বেশ তো! দ্বিতীয় শর্তে আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কেননা তখন যে কোন মুহূর্তে কমাণ্ডার রফিকের বাহিনী এসে পড়বে বলে আমরা আশা করেছিলাম।

প্রকৌশলী দুজনকে ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দিয়ে আমারা তিনজন বেতার ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। পথে কলেজ রোডে পৌঁছে মমতাজউদ্দীন বললেনঃ আচ্ছা, ভালো কথা, আমরা কিন্তু কি প্রচার

করবো সেটা একটুও চিন্তাভাবনা করছি না। এক কাজ করা যাক আমি এখানেই নেমে পড়ি এক্সটেম্পোর (তাৎক্ষণিক) কিছু বলতে পারবেন এরকম দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে শিগগিরিই আগ্রাবাদ গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সেদিন মমতাজউদ্দীন আর আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি। এখন আমি আর মাহবুব হাসান- আমরা আগ্রাবাদ রোডে জেকস এর সামনে এসে জীপ ছেড়ে দিয়েছিলাম- গাড়ী আর যাবে না, এখানে ছিল ব্যারিকেড। হেঁটে জনশূন্য বেতার ভবনে পৌঁছেই মাহবুব হাসান কন্ট্রোল রুমের সূইচ অন করেছিলেন। এমন সময় টেলিফোন। ট্রান্সমিটার থেকে প্রকৌশলী বন্ধুরা মাহবুব হাসানকে জানিয়েছিলেন তারা অনুষ্ঠান 'এয়ার'-এ দিতে পারবেন না। কেননা ইতিমধ্যেই তারা আঞ্চলিক প্রকৌশলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি সম্মতি দেননি- কাজেই তারা ট্রান্সমিটার ভবন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি টেলিফোন ধরলাম। বলেছিলাম আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দুই শর্তের একটি কর্যকারী হবে।

মাহাবুব হাসান আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসার নম্বরে ডায়াল করে রিসিভার আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আঞ্চলিক প্রকৌশলী ঠিক এ কথাটি বলেছিলেন। বেলাল সাহেব আমাকে কেন জড়াচ্ছেন। বেতার কেন্দ্রে আমি তো দু'নম্বর। আপনি বরং নাজমুল আলম সাহেবের পারমিশন নিন। দুপুর বেলা হান্নান সাহেব জোর করে নিয়ে গিয়ে আমাদের হাতে কাজ করালেন, তার জন্য কি যে বিপদ আসে, আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।

আমি বলছিলাম- আর ডি সাহেবের বাসায় তো টেলিফোন নেই, ওর সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করবো। তিনি বললেনঃ আলম সাহেব এখন আর ডি কাহহার সাহেবের বাসায়। ওখানে টেলিফোন করুন।

ঠিক সে সময় আমার খোঁজে এনায়েতবাজার থেকে আবুল কাসেম সন্দীপ ও আবব্দুল্লাহ আল ফারুক বেতার ভবনে এসে পৌঁছেছিলেন। জনাব কাহহারের বাসায় টেলিফোন করে আমি কাসেমকে কথা বলতে দিয়েছিলাম। নাজমুল আলম সাহেব ওখানে আছেন কিনা এটাই জেনে নিতে বলেছিলাম। ওদিক থেকে এই অনুসন্ধানের কারণ জানতে চাওয়া হলে কাসেম আমার কথা বলেছিলেন। স্বাভিকভাবেই রিসিভার আমার হাতে এসে গিয়েছিল।

নাজমুল আলমের সঙ্গে আলোচনা করে আবদুল কাহহার আমাকে যা বলেছিলেন, তা সক্ষেপে, বেতার ভবন বন্দরে নোঙ্গ করা পাকিস্তনী যুদ্ধজাহাজ 'বাবর' সোয়াত-এর শেলিং এর আওতায় যে কোন মুহূর্তে শত্রুকবলিত হতেপারে। উত্তম হবে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ক্ষুদে স্টুডিওটি ব্যবহার করা- সেটি শহর থেকে বেশ দূরে- সে এলাকার পতন শীঘ্র হবার কারণ নেই। এ ছাড়া একযোগে দুটি ঘর রক্ষা করার জন্যে বাড়তি প্রস্তুতি অবশ্যক। ট্রন্সমিটার ভবনটি ব্রডকাস্টিং পারপাস-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এবারে মাহবুব হাসান, আবুল কাসেম স্বন্দীপ, আবব্দুল্লাহ আল ফারুক আর আমি কন্ট্রোল রুম থেকে বেড়িয়ে এসেছিলাম। গাড়ি বারান্দায় আমাদের একজন মহিলা ঘোষিকা- তিনি একজন ভদ্রলোককে দেখিযে বলেছিলেনঃ বেলাল ভাই, ইনি আমার চাচা ডাক্তার আনোয়ার- আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেনঃ আচ্ছা আপনারা বেতার চালু কার কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন?

আমি বলেছিলামঃ আগে চালু করার ব্যবস্থা করি, তারপর যা মুখে আসে বলবো। কথা তো সেই একটা, আমরা স্বধীন।

তিনি সাইক্লোস্টাইল করা একটি ক্ষুদ্রকার ঘোষণাপত্র আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেনঃ এটা দেখুন তো দুই বা তিন বাক্যবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পড়েই আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলেছিলামঃ ভালোই হলো এটা দিয়েই অধিবেশন শুরু করা হবে, আর এরই ভিত্তিতে প্রচার করা হবে সকল বক্তব্য।

আমি টুকরো কাগজখানা পকেটে নিয়েছিলাম। তারপরই বেরিয়ে এসেছিলাম ডাক্তার আনোয়ারকে বিন্দুমাত্র সৌজন্য প্রদর্শন না করে।

জেকস্-এর সামনে এসেই খেয়াল হয়েছিল আমাদের গাড়ী নেই। এখন উপায়! উদ্ধার করেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার- তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ঘোষিকা হোসনে আরা। ডাক্তার আনোয়ার বলেছিলেনঃ কালুরঘাট যাবেন তো আসুন আমার গাড়ীতে।
মাহবুব হাসানের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

ট্রান্সমিটার ভবনে অবস্থানরত প্রকৌশলী বন্ধুরা তো তাদের শর্ত পূরণ ছাড়া সহযোগিতা দেবেন না। দেখা যাক আঞ্চলিক প্রকৌশলীকে বাধ্য করে এখান থেকে একটা টেলিফোন করিয়ে দেয়া যায় কিনা। আমরা আগ্রাবাদ কলোনীতে আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায় গিয়েছিলাম- তিনি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে পরে চাপে পড়ে বলেছিলেনঃ আচ্ছা, আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আপনারা যান।

রাস্তায় ইতিমধ্যে কবি আবদুস সালাম আমাদের গাড়ীতে এসে উঠেছিলেন। বললেনঃ নাতী বেলাল, আমাকে তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। আমি-এই-দেখ্-একটা কথিকা লিখছি-দু'পাতা লেখা হয়ে গেছে, এটা প্রচার করবো। তুই দেখে দিস।

মাহবুব হাসান বলেছিলেনঃ দেখুন, আর-ই সাহেব আসলে, ট্রান্সমিটারে আদৌ ফোন করবেন না। এদিকে বিনা পারমিশনে ওঁরা দুজন কাজ করবেন না। আমি বরং এক কাজ করি- আমি স্টেশন রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়েই এসে পড়বো। আপনারা এ গাড়ীতে যান।

মাহবুব হাসান আর আমাদের সংগে যোগদান করতে পারেননি- শুধু দু'দিন পরে একবার টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন।

কালুরঘাটগামী মোটর গাড়ীতে আমরা তখন ছ'জন- হোসনে আরা, ডাক্তার আনোয়ার, কবি আবদুস সালাম, কাসেম, ফারুক ও আমি। ট্রান্সমিটার ভবনের গেটের কাছেই আমি একরকম লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পরেছিলাম। কেননা, দেখতে পেয়েছিলাম, প্রকৌশলী বন্ধু দু'জন ততোক্ষণে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠেছেন। রিকশা আগলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম-বলেছিলামঃ আর-ই সাহেব পারমিশন দিয়েছেন (?) এবং স্বেচ্ছাসেবকরাও এসে পড়বেন মাহবুব হাসানের সংগে। আপনারা দয়া করে চলে যাবেন না।

ওরা বলেছিলেনঃ আর-ই সাহেবের সংগে আমাদের টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, তিনি বলেছেন কিছু করলে নিজের দায়িত্বে করবেন। দেখুন, আমাদের চাকরি থাকবে না।

ডাক্তার আনোয়ার সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ও শেষবাবের মতো পরম আনুকূল্য দিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছি কোনো গ্রামীণ অস্থায়ী ছাউনী থেকে কয়েকজন সশস্ত্র জোয়ানকে নিয়ে এসে সাময়িকভাবে ট্রান্সমিটারে মোতায়েন করার উপস্থিত ব্যবস্থা করেছিলেন- বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৌশলী বন্ধুদের দেয়া একটি শর্ত পূরণ করা গিয়েছিল।

কেন্দ্রের নাম ও প্রথম ঘোষণাপত্রটি আমি লিখেছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনের অফিসকক্ষে বসে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আমি 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিলঃ বেলাল সাহেব, দেরী করছেন কেন? এখন তো প্রায় সাড়ে সাতটা-যা পারেন প্রচার শুরু করুন। লোক এখন

রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছে- আটটা বাজলেই কিন্তু আকাশবাণীর খবর শুনবে সবাই। আপনাদেরটা আর কেউ শুনবে না।

আমাদের বার্তা সম্পাদক সুলতানা আলী। করেছিলাম তিনি হয়তো ইতিমধ্যে আবদুল কাহ্হারের কাছ থেকে আমরা কথা জেনেছিলেন। সুলতানা আলী আমাকে প্রচারযোগ্য দুএ'কটি খবরও বলে দিয়েছিলেন।

হোসেন আরাকে আমি কণ্ঠ দিতে দিইনি- কেননা একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্রে আমাদের শ্রোতা সাধারণের জন্যে একটি মহিলাকণ্ঠের ঘোষণা বেমানান ঠেকাতে পারে বলে আমাদের ধারণা হয়েছিল। সেদিন অন্য একজন ঘোষক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন- সুলতানুল আলম। তবে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম ঘোষণটি সর্বপ্রথম আমার নির্বাচনক্রমে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। আবদুল্লাহ-আল-ফারুক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন। কবি আবদুস সালাম কথিকা প্রচার করেছিলেন।

অধিবেশন চলাকালেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জনাব এম, এ হান্নান। তিনি তাঁর ভাষণের পূর্বাহ্নে নাম ঘোষণা করতে বলেছিলাম। আমি বলেছিলামঃ নাম ঘোষণা না করলেই ভালো হতো, কেননা আমরা শত্রুশ্রোতাদের কাছে যতোটা সম্ভব নিজেদের অবস্থানকে দুর্জ্ঞেয় রাখাত চাই-সহজে যেন ওদের বোমাবর্ষণের টার্গেট নির্ণয় করতে না পারে। রাডারের সাহায্যে ওরা ঠিকই ধরে নেবে- তবে এক-দু'দিন অন্ততঃ তা বিলম্বিত হবে।

জনাব হান্নান দ্বিপ্রহরে স্বনামে ব্রডকাস্ট করার কথা বললে আমি বলেছিলামঃ তখন কেন্দ্রের নামকরণ হয়নি এবং অনুষ্ঠান প্রচারের ধারবাহিকতা পরিকল্পনা ছিল না।

আমার উদ্দেশ্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই তার মূল্যবান ও সময়োপযোগী ভাষণ প্রচার করেছিলেন।

বেতার ভবন থেকে আমার একটি টেপ হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। তাতে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রেকর্ডকৃত ও প্রচলিত গণসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গীটার বাদ্য ছিল- সেই টেপটিও এই অধিবেশনে বাজানো হয়েছিল।

আনুমানিক আধঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশন শেষে বাইরে এসে আমরা ডাক্তার আনোয়ার ও তাঁর সৌজন্যে মোতায়েনকৃত জোয়ানদের কাউকে আর দেখতে পাইনি। জনাব হান্নানও তার ভাষণ প্রচারের পর চলে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ডাক্তার আনোয়ারকে এরপর আর কোন দিনই বেতারকেন্দ্রে দেখতে পাইনি এবং হোসনে আরা পরবর্তীকালে পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছিলেন।

আমি, কাসেম ও ফারুক পায়ে হেঁটে রাত সাড়ে দশটায় এনায়েতবাজারে ফিরে এসেছিলাম্ পথটি ছিল ৭/৮ মাইল। (অংশ)

-দৈনিক 'আজাদী,' ২৬ মার্চ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭

৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্মকথা

মেসবাহ আহমেদ

.....বাংলাদেশে ২৬শে মার্চের সূর্যোদয় হল রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। ইথারে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল ‘‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’’! ঐ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনে মনে হয়েছিল এ একটি অল্প বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র। তখনো জানা যায়নি কে বা কারা এই অসমসাহসী যোদ্ধা যাদের উদ্যোগে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও সুখ -দুঃখ-কান্নার কথা প্রথম বাতাসে ধ্বনিত হল। অবশ্য পরে আমরা এদের সন্ধান পেয়েছি।

শত্রুসৈন্য চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল করাবার পর এই বেতার কেন্দ্রের অন্যতম বেলাল মোহাম্মদের পরিচালনায় দশজনের একটি দল চট্টগ্রাম থেকে সরে গিয়ে কালুরঘাট এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার প্রথম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করে। এই দলে ছিলেন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, শরফুজ্জামান, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লা-আল-ফারুক, সুব্রত বড়ুয়া ও কাজী হাবিবউদ্দীন। কালুরঘাট পাকিস্তানী সৈন্যদের কবলে এলে পরে তাঁরা বাংলাদেশকে অন্য এক মুক্তাঞ্চল থেকে কিছুদিন অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

২৫শে মার্চ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রেও কয়েকজন বাঙালী কর্মী আটকা পড়েছিলেন। ২৮শে মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনে পুলিশ বাহিনী ও ই-পি-আর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পাক ফৌজ রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে পিছু হটতে বাধ্য হয়। একদিন একরাত পর্যন্ত কয়েকজন বেতারকর্মীকে একটি স্টুডিও মধ্যে আটকে রাখা হয়।

মুক্তাঞ্চল থেকে স্বাধীনতার অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন নির্ভীক কর্মী জীবন বিপন্ন করে বেরিয়ে পড়েন বেতার ভবন থেকে। এই দলে ছিলেন অনুষ্ঠান সংগঠক মেসবাহ আহমেদ, অনুষ্ঠান সংগঠক আতাউর রহমান, অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম, অনুষ্ঠান প্রযোজক শাহজালাল ফারুক এবং বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন।

রাজশাহী বেতারের এই কর্মীদল ২রা মে মুজিবনগরে পৌঁছান। দু’চারদিন পরের কথা। তখন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক শামছুল হুদা চৌধুরী এসে গেছেন। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আরো উৎসাহ পেলাম।

ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার এবং জামিল চৌধুরী, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান, বিশিষ্ট সাংবাদিক এম, আর, আখতার এবং চিত্রাভিনেতা হাসান ইমাম ও তখন মুজিবনগনে। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা এবং শেখ সাহেবের প্রেস সেক্রেটারী আমিনুল হক বাদশার সংগেও দেখা হল।

আমরা সকলে মান্নান সাহবের সংগে দেখা করলাম

পর পর কয়েকদিন আলোচনা হল। মান্নান সাহেবের পরিচালনায় উচ্চ বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারযোগে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের কয়েকটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

ইতিমধ্যে ট্রান্সমিটার সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গেছে। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেনার জন্য ১৪ই মে মান্নান সাহেব আমাদের শ’ দুই টাকা দিয়েছিলেন।

আমি, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক এম, এ মোহাইমেন এম-পি-এ ঐদিনই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করি।

দু-তিনদিন ধরে আমরা প্রপোজল রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট রেজিস্টার, কণ্ট্রাক্ট ফরম, আর্টিস্ট রেজিস্টার ইত্যাদি তৈরি করি। এবস কাজে অনু ইসলাম আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেণ, যদিও তিনি তখন 'জয়বাংলা' পত্রিকায় কাজ করতেন।

এগিয়ে এল চরম মুহূর্ত। মান্নান সাহেবের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ কিলোয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঢাকা বেতারের সেই নির্ভীক 'তিন কর্মী' আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান এবং টি, এইচ শিকদার মুজিবনগরে এসে পৌঁছেন। তারা এসেই এম-এন-এ তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং আমিনুল হক বাদশার সংগে দেখা করেন। তাদের সংগে ঢাকা থেকে আনীত কিছু মূল্যবান গানের টেপও ছিল।

২৫শে মে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশের বেতারকর্মীদের জবিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিনই বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও দুঃখ-কান্নার শব্দ ধ্বনিত হয় বাতাসে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে বাংলাদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বেতার প্রচারে শুরু হল।

কয়েকদিন আবাসিক বাড়ীর সীমাবদ্ধ পরিবেশে ছোট একটি ঘরকে স্টুডিও করে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। প্রথম কিছুদিন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার নিদারুণ অসুবিধার মধ্যেও অনুষ্ঠান প্রচার করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা সে সমস্ত অসুবিধা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলাম। স্টুডিও অভাব, পর্যাপ্ত রেকর্ডিং সুবিধার অভাব এবং শিল্পী-সাহিত্যেকের ও কথকের অভাবের মধ্যে প্রথম দু'তিন মাস যে কি কষ্টে আমরা অনুষ্ঠান চালিয়েছি তা আজ লিখে শেষ করা যাবে না। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের সেই দশজনের দলটিও এসে কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রথম দিকের ঝক্কি খানিকটা কাটিয়ে ওঠার পর অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমগ্র দায়িত্ব ছিল তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এম-এন-এ আবদুল মান্নানের উপর ন্যস্ত।

কিছুদিনের জন্য সেক্রেটারী পর্যায়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব আবদুস সামাদও অনষ্ঠান সম্পর্কে আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভেতর অনুষ্ঠান সংগঠন এবং কেন্দ্রের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন আমাদের সিনিয়র পোগ্রাম অর্গানাইজার শামসুল হুদা চৌধুরী।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন আশফাকুর রহমান।

পরবর্তীকালে তথ্য ও বেতার সচিব হিসেবে আনোয়ারুল হক খান আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগে নিয়মিত কর্মী হিসাবে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হলেনঃ শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান, মেসবাহ আহমেদ, বেলাল মোহাম্মদ, তাহের সুলতানা, টি এইচ সিকদার, মোস্তফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল্লা-আল-ফারুক, শহীদুল ইসলাম, শামসুদ্দিন আহমেদ, মঞ্জুর কাদের (বাবুল আখতার), আবু ইউনুস প্রমুখ কর্মী।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেছেন আবদুস সাকের, রাশেদুল হাসান, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম, মইনুল হক, প্রণব রায়, মোহাম্মদ মহসিন ও শরফুজ্জামান।

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সংবাদ বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে তারা হচ্ছেন কামাল লোহানী, মোহাম্মদ মামুন, সুব্রত বড়ুয়া, মৃণালকৃষ্ণ রায়, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, নূরুল ইসলাম সরকার, আলী রেজা চৌধুরী, পারভীন হোসেন, জাহেদ সিদ্দিকী, শহীদুল হক ও জারিন আহমেদ।

ড্রামা প্রডিউসার ছিলেন রণেন কুশারী ও হাসান ইমাম। ইংরেজী অনুষ্ঠান প্রচারে ছিলেন আলমগীর কবীর ও আলী যাকের।

যেসব শিল্পী, সাহিত্যক ও বুদ্ধিজীবী অনুষ্ঠান সমৃদ্ধির জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, তাদের মধ্যে ডক্টর এ, আর, মল্লিক, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মাযহারুল ইসলাম, ডক্টর আনিসুজ্জামান, শওকত ওসমান, গাজীউল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সিকান্দার আবু জাফর, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, কল্যাণ মিত্র, নারায়ণ ঘোষ, সুভাষ দত্ত, জহির রায়হান, সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বুলবন ওসমান, আসাদ চৌধুরী, আনু ইসলাম, প্রণব চৌধুরী, রাজু আহমেদ, নূরন্নাহার মযহার, আইভি রহমান, উম্মে কুলসুম, জিল্লুর রহমান, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্প আবদুল জব্বার, অজিত রায়, রথীন রায়, কল্যাণী ঘোষ, আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, রফিকুল আলম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মী বলে নয়, একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে বলতে পারি, এই কেন্দ্র থেকে গত নয় মাসে প্রচারিত প্রায় সব অনুষ্ঠানই উন্নতমানের হয়েছে। বিশেষ করে 'চরমপত্র', 'অগ্নিশিখা,' 'জল্লাদের দরবার', 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে', 'পুতুলনাচের খেল' অনুষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশিষ্ট সাংবাদিক এম আর আখাতার 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের লেখক ও প্রচারক। 'জল্লাদের দরবার' লিখতেন প্রখ্যাত নাট্যকার কল্যাণ মিত্র। জল্লাদ, দুর্মুখ, নবাবজাদা, টিটিয়া খান, পিয়জী খান, গর্ভণর এবং বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করতেন যথাক্রমে চিত্রাভিনেতা রাজু আহমেদ, চিত্র পরিচালক নারায়ণ ঘোষ, প্রসেনজিৎ আজমল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতিখার, জহিরুল হক ও বুলবুল মহলানবীশ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন আশরাফুল আলম। 'ইসলামের দৃষ্টিতে' অনুষ্ঠান প্রচার করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যক সৈয়দ আলী আহসান আমাদের অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন।

'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' এবং 'পুতুলনাচের খেল' লিখতেন যথাক্রমে ফয়েজ আহমদ ও আবদুল গাফফার চৌধুরী।

গণসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গানের সুর সংযোজনা এবং কণ্ঠদানে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করেত হয়। তাঁরা হচ্ছেন- তাহের সুলতান, সমর দাশ, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, মান্না হক, কল্যাণী ঘোষ, সুজেয় শ্যাম, অজিত রায়, রফিকুল আলম, অনুপ ভূট্টাচার্য, হরলাল রায়, রথীন রায়, প্রমুখ শিল্পী।
(অংশ)

-'জয়বাংলা/বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যাবে শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থে।

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
২৬। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কিত একটি সাভার কার্যবিবরণী	‘বেতার বাংলা’ ডিসেম্বর, ১৯৭৮	১০ অক্টোবর, ১৯৭১

MINUTES OF MEETING ON CO-ORDINATION ON PROPAGANDA AND PUBLICITY EFFORTS IN SUPPORTS OF WAR ACTIVITY HELD ON 10-10-1971

Members Present :

1. A. Samad, Secretary, Ministry of Defense.
2. Dr. B. Hossain, Adviser.
3. Mr. Alamgir Kabir.
4. Mr. Shamsul Huda Chowdhury.
5. Mr. Kamal Lohani.
6. Mr. A. Rahman.
7. Mr. B. Mahmood.

Progress of action on decisions taken in last meeting was discussed. Members from Radio Bangladesh assured that they are working on lines already decided upon and significant improvement will be noticeable from 15-10-71 onwards.

There was further discussion on measures which will contribute to improve the Radio Programme.

DECISIONS :

1. An office will be immediately set-up in the Radio Building and all Staff work done there.

2. The method of news composition will be changed and text will be the same for English. Bengali and Urdu Bulletins. In view of pressure of work Mr. A. Kabu will compose the night bulletin and Mr. K. Lohani will compose the morning and afternoon bulletins.

3. The Radio will be immediately provided with a type-writing machine, two portable tape recorders and one Cassette tape recorder.

4. The Staff of the outside broadcast section will go out frequently to the field I h will be given T.A. as no conveyance can be arranged at present.

5. Dependence on patriotic songs should be reduced and in its place martial songs and music should be introduced.

6. Arrangement for bringing the microphone from Agartala should be immediately made.

7. Security checking will be made rigid from 15.10.71. In the meantime I.D. Cards should be issued where necessary.

8. Payments for script-writers and talkers should be regular.

9. The panel of Talents should be finalized immediately in consultation with Mr. A. Mannan, MNA-in-charge.

10. Programme shall be drawn up for 7 days at a time sufficiently in advance (at least 4 days). The responsibility of filling in the Programme shall lie with the respective Programme organizer/Section heads.

11. Arrangement shall be made by Secretary, Information for getting Pak Newspapers for the counter-propaganda section.

Sd/-A. Samad
Secretary
Ministry of Defense.

Memo No. D-003/76(8)

Dated 18-1071

1) Copy forwarded to Mr. M.A. Mannan, MNA-in-charge, Information & Broadcasting for information.

2) Mr. Shamsul Huda Chowdhury, Swadhin Bangla Betar Kendra for information.

Secretary.

নির্ঘণ্ট

অ
অগ্নিশিখা (মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান) ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৪০-৩৪৭, ৫২৭
অগ্রগামী মুক্তিবাহিনী (কথিত) ২২২-২২৫
অন্বিষ্ট রাজ্যঃ আমার বাংলা (কবিতা) ৩৩৮
অনুপ ৫১৪
অবৈধ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল (কবিতা) ৩৩৫-৩৩৬
অভিজ্ঞতার আলোকে ১৩৯-১৪৩
অভিযোগ (কথিকা) ১৮৫-১৮৭
অমর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্মরণে (কথিকা) ২৩০-২৩২
অরূপ-৫১৩
অর্থনৈতিক পুর্নগঠন (প্রস্তাব) ২১৮-২২৩, ২৪৯-২৫০
অর্পণ (নেপালের পত্রিকা) ১৩৪-১৩৫
অশুভ শক্তির চ্যালেঞ্জ আমি (কবিতা) ৩১৬
অসহযোগ আন্দোলন (১৯৭০), ১৩৮-১৩৯, ১৫৪
অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কমিশন ২২৯

আ
আইখম্যান ৩৩৫
আইরিশ টাইমস(ডাবলিন থেকে প্রকাশিত)
আওয়ামী লীগ ৬, ৫৬, ৫৭-৫৮, ৬৩, ১০০, ১১১, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১৩০-১৩২, ১৩৮-৩৯, ১৪৪-১৪৫, ১৪৭-১৪৮, ১৪৯-১৫০, ১৬৬, ১৭৫-১৭৭, ১৯৩-৯৪, ২০৫, ২০৭, ২৫৩-৫৫, ৫১৯, ৫২১, ৫২৫
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৩৬-১৩৭
আকবর-আল-কুয়েত (কুয়েতের পত্রিকা) ১৩৪-১৩৫, ১৯৩--১৯৪
আকন্দ, লাকী ৫১৫
আখতার, এম, আর ১৯, ২১, ৩১, ৩৯, ১৮৭-৮৯, ৫২৫, ৫২৭
আকসাস (তুরস্কের পত্রিকা) ১৩৪-৩৫, ১৯৩-৯৪,
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১০৪, ১৪৫, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭
আঙ্গুর, মফিজ (সঙ্গীত শিল্পী) ৫১৪
আজকের বাংলায় (কথিকা) ৩০০, ৩০৩
আজাদ (লাহোরের উর্দু দৈনিক) ১১৬-১৭
আজাদ, রফিক ১৫২
আজাদ হিন্দু ফৌজ ১৩৮
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ৫৪, ১৮১-৮৪, ১৯২-৯৩, ২৫০-৫৪, ২৭৯
আনসার ২৪, ৯১, ১৫৪-৫৫, ১৮৭, ২৫৫-৫৬
আনিসুজ্জামন (ডঃ) ২৩০-৩২,৫২৭
আনোয়ার ২৪৮
আনোয়ার, মঞ্জুলা (ডাঃ) ৫১৯
আনোয়ার, মোস্তফা ১৩-১৪, ১৮, ২১, ২২, ২৩, ৫১৯,৫২৩, ৫২৭
আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি ৭১, ১২২
আদমজী ১৩৮-৩৯
আবদুল্লা-আল-ফারুক ৫১৯, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫,৫২৭
আবার দেখবো (কবিতা) ৩১২
আবেদীন, আনোয়ারুল ৩০০-৩০৩
আবেদীন, জয়নাল (শিল্পাচার্য) ১৫২
আবু জাফর, মোহাম্মদ ১০০, ১৬৬-৭২, ২০৭-১০
আবু জাফর, সিকান্দার ১৮৫-৮৭, ৪০৬-০৭, ৫২৭
আব্বাস উদ্দিন (সঙ্গীত শিল্পী) ১৬৮-৬৯
আফগান মিল্লাত (আফগানিস্তানের দৈনিক পত্রিকা) ১৯৩-৯৪
আমরা গেরিলা ২৩, ২৪, ২৮,

আমরা তাদের ভাতে মরাবো (কথিকা) ২০৬-০৮
আমার প্রতিদিনের শব্দ (কবিতা) ৩১৩-৩১৪
আমার স্বর্গের নামে (কবিতা) ৩৩০-৩১
আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা (কথিকা) ১৯৯-২০১
আমিন (শহীদ) ১৭২-১৭৩
আমীন, নূরুল ১১৬-১৭, ১৩৭, ২২৪, ২৮৯-৯০
আমীর আলী ১৩৮-৩৯
আমীরুদ্দীন (এ্যাডভোকেট) ২৪৮
আমেরিকান ভূমিকা ১৭২-৭৪
আরউইন, জন ৭১
আরথার, ম্যাক (মার্কিন জেনারেল) ১৭২-৭৩
আলগেমাইনে জাইটিং (জার্মান পত্রিকা) ১৯০-৯১
আল-তাউরা (সিরিয়ার পত্রিকা) ১৩৫-৩৬, ১৯২
আলবেয়র, কামু ১৫১
আল মুজাহিদী ৪১৫-১৭
আল সাব (লেবাননের দৈনিক পত্রিকা) ৬৫
আল-সাহাফা (সুদানের দৈনিক) ১৯৩
আলম, আশরাফুল ২১, ২২, ৪০, ১৭৮-১৮১, ৫০৩-০৬, ৫১৪, ৫২৬, ৫২৭,
আলম, ইফতেখারুল ৩৪৮-৩৭০
আলম, জাহাঙ্গীর ২১০-১২
আলম, নূরে ১৭
আলম, রফিকুল ৫১৪, ৫২৭
আলম, সুলতানুল ৫২৪
আলমারকিউরিও (চিলির পত্রিকা) ১৩৪-৩৫
আলী, ইশাক ৬৪
আলী, জাকের ১৯,৫২৭
আলী, মনসুর ২০
আলী, মাহমুদ ১১৬,১৩৭, ২২৪, ২৮৯-৯০
আলী, মোহাম্মদ (বগুরা) ২৫০-৫১
আলী, রাও ফরমান (লেঃ জেঃ) ১২১-২২, ১৮৮, ৫১৭
আলী, সুলতান ৫২৪
আলী, সৈয়দ আনোয়ার (ডাঃ) ৫১৮,
আলী, হযরত ২১৪
আলী, হাফেজ ২২৪-২৬
আলী, অ্যার্লা (কর্ণেল) ৭১
আসসালাফি যুব আন্দোলন (ইয়েমেন) ৫৭-৫৮
আসাদ ২৪৮
আসাহি শিমবুন (জাপানের পত্রিকা) ৫৭
আহমদ, এম, এম ৫৪, ৫৫, ৮৯, ১৯০-৯১
আহমদ, জরিন ৫১২,৫১৩, ৫২৭
আহমদ, তাজউদ্দিন ৪১, ৬৫, ১৬৬, ১৬৯-৭০, ১৭৩, ৩৭৮
আহমদ, নাদিম ১৭৫-৭৭
আহমদ, ফরিদ ২৮৯-৯০
আহমদ, ফয়েজ ১৪৬-১৫১, ১৭০-৭১, ৫২৭
আহমদ, সালেহ ১৯,২০
আহমদ, হাবিবউদ্দিন ৫১৯
আহমেদ, ইলিয়াস ২৮, ২০৬-২০৮, ২৩৩-৩৫
আহমেদ, বদরুন্নেসা (এম, এন, এ) ১৩২-৩৪
আহমেদ, মেসবাহ ২৮৮-৯১, ৩০৩-৩০৬, ৫০৮-০৯, ৫২৫-২৭
আহমেদ, রাজু ৩৪৮-৩৭০, ৫২৭
আহমেদ, শামসুদ্দিন ৫২৭
আহম্মদ, মনজুর ৫১৩
আহসান (এডমিরাল) ১৩৮-৩৯
আহসান, সৈয়দ আলী ১৮, ১৯, ২৮১-৮২, ৩১৩-১৪, ৫২৭,
আয়ুব-বিরোধী গণবিপ্লবী(১৯৬৯), ১৭৬-৭৭, ২৪৮

ই

ই,পি,আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) ১, ৪, ৬-৭,৯, ২৪, ৯১, ১২৩, ১৩৬-৩৭, ১৩৯-৪৩, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ২০২, ২১৬-১৭, ২৫৫-৫৬
ইউথ ইউনিয়ন (সুদান) ৫৭-৫৮
ইউনুস, আবু ৫২৭

ইউনাইটেড প্রেস ইন্টান্যাশনাল ৪০
ইকবাল, ফারুক ২৪৮
ইজভেস্তিয়া (সোভিয়েত পত্রিকা) ২৬৫-৬৬
ইবলিশের মুখোশ (কথিকা) ৫০৮-০৯
ইফতিখার, ফিরোজ ৫২৭
ইভান্স, ফ্রেড ৮১-৮২
ইমাম, হাসান ৫২৫, ৫২৭
ইমাম হোসেন ২৮৮-৮৯
ইরাকী বিপ্লব (১৯৫৮), ১৬৪-৬৫
ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস ১, ৯১
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ১৩২, ১৩৬-৩৭, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ১৮৭, ২৫৫-৫৬
ইসমত আরা ৬৪
ইসলাম, অনু ৩২৫, ৫২৫, ৫২৭
ইসলাম, আশিকুল ৫১৯
ইসলাম, কাজী নজরুল (বিদ্রোহী কবি) ১৫, ৪০, ৪২-৪৩
ইসলাম, মযহারুল (ডা.) ১৭, ৩৯, ৮৬-৯০, ১০১-১০৩, ২৪৩-৪৪, ৩৩০-৩১, ৫২৭
ইসলাম, শহিদুল ১৭, ২৬, ৩১, ২২৯-৩০, ৪০৮, ৫২৬, ৫২৭
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ২৮, ৪০-৪১, ১৬৬
ইসলাম ও পাকিস্তানের রাজনীতি (কথিকা) ১৭
ইসলামের দৃষ্টিতে (কথিকা) ১৯, ২৮১-৮২, ৫২৭
ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ (কথিকা) ২৮১-৮৫
ইয়র্কশায়ার পোস্ট ৭২
ইয়াজিদ ৫৪, ২৮০, ২৮৮-৮৯
ইয়াহিয়া জবাব দাও (কথিকা) ২৪, ২৩১-৩৩
ইয়াহিয়া--ভুট্টো বৈঠক ১৭৯-৮০
ঈ
ঈশা খান ৪০৪-০৫
উ
উইলিয়াম, ডব্লিউ, টি ৭২-৭৩
উকিল, আবদুল মালেক (এম-এন-এ) ১৩৬-৪০
উড, রিচার্ড (বৃটিশ মন্ত্রী) ১৬১-৬২
উডনিক, জেবি (হল্যান্ডের মন্ত্রী) ৬২
উতশান মালয়েশিয়া (মালয়েশিয়া দৈনিক) ১৯২
উ থান্ট ৪১, ৪২-৪৩, ৬০, ৭২, ৭৩, ৭৮-৭৯, ১১৩-১৪, ১১৫, ১৮৮-৮৯
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ১৭৪-৭৫, ২০২,২৫৩
উপনির্বাচন (পুনঃনির্বাচন) ১১১-১২, ১১৬-১৭, ১৪৬-৪৮, ১৪৯-৫১
উম্মে কুলসুম ৩৪০-৪৭, ৫২৭
উলানুকী (সোভিয়েত লেখক) ১৬০-৬১
ঋ
ঋণ সালিসী বোর্ড- ১৬৩-৬৪
এ
এ সত্য রুধিবে কে? (জীবন্তিকা) ৩৭৫-৩৮০
এক ইউনিট প্রথা ২৫২
একটি উর্দু কথিকা (উর্দু অনুষ্ঠান) ২৭৯-৮০
একতা (পত্রিকা) ২০৫-০৬
এক্সপ্রেস ২০৫-০৬
একুশ দফা ৮৮
এখন অনেক কাজ (কথিকা) ২২৪-২৬
এগারো (১১) দফা কর্মসূচী ১৩১-১৭৬, ২৪৮
এডিনি, মার্টিন (মিঃ) ২২৯
ও
ওসমান, বুলবন ৩০৭-০৯
ওসমান, শওকত ২৪, ২০০-০৩, ২৩১-৩৩, ৫২৭
ওসমানী (কর্নেল) ১৮৫
ওয়াজিউল্লা (২৪৮
ওয়ার অন ওয়ান্ট ৪৫
ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস ৭৩
ওয়াশিংটন পোস্ট ৬১-৬২, ৬৮, ৭৩
ওয়াশিংটন স্টার ৭৩
ক
কনার (মিঃ ২২৯
কবির, আলমীর ২০, ২১, ৪৪২, ৪৫০, ৫২৭
কম্পরাম ২৪৮
কমাণ্ডার (কবিতা) ৩১৭-১৯

করিম, রেজাউল ৫২৫, ৫২৭
কয়েকটি ছবি - একটি ইতিহাস (কথিকা) ২১০-১২
কাঠগড়ার আসামী ১৫৩-৫৪
কাদের, মঞ্জুর ২২,৫২৭
কাদের, যহুর ৫২৬
কাদরী, শহীদ ১৫২
কামাল মাহবুব (মাহবুব তালুকদারের ছদ্মনাম) ১২৩-৩০, ১৯৩-৯৭
কাসেম ২৮৮, ২৮৯-৯১
কাহহার, আবদুল ৫২৪
কায়কোবাদ ১০৬
ক্লিফটন, টনি ৬৪-৬৫
ক্রীশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর ৭৩, ১৪৪
কুদুরিয়াভেৎসেভ, ভি ৮৪
কুশারী, রণেন ৫২৭
কে আমাদের রুখবে? (জীবন্তিকা) ৩৭৯-৮২
কেনেডি, এডওয়ার্ড ৫৪, ৬০, ৭২, ৭৩ , ৭৪, ১০৮-০৯, ১৬০-৬১, ১৭৪
কেনেডি, জন এফ ৭৩
কোন এক নিবেদিতাকে (কবিতা) ৩২৩-২৪
কোরায়শী, সামী ৫০৩
কেসিগিন, আলেক্সী ৭৭,৮২, ১৩৫-৩৬
কোহিস্তান (লাহোরের উর্দু দৈনিক) ১১৬-১৭
ক্রাশ বেঙ্গলী প্রোগ্রাম ১১৮-১৯

খ

খসরু ২২৫
খাঁ, সুলতান মোহাম্মদ ৫০৯
খান, আবদুল কাইয়ুম ২২৪, ২৫৪, ২৫৬, ২৯৩
খান, আবদুল গফফার খান ৭৫, ২৭৯
খান, আবদুল মোমেন ১০৫, ১০৬, ২৫০-৫১, ২৫৬
খান আসগর (এয়ার মার্শাল) ৭৪
খান এ, কে ৫১৯
খান, ওয়ালী ৭৫-৭৬, ১৯৩-৯৪
খান, টিক্কা ২, ৫, ৯, ১০, ৫৬, ৬৪, ৮৯, ১৩০, ১৩৮-৩৯, ১৪৪-৪৫, ১৫৩-৫৫, ২০৩, ২২৯, ২৫৫-৫৬, ২৭৯, ২৯৩, ৪১৭-১৮, ৫১৭, ৫১৮-১৯,
খান, তোয়াব ১৬১-৬৬, ৫২৭
খান, মুহাম্মদ আইউব ১০৪, ১১১, ১২২, ১৪৪, ৪৫, ১৪৯-৫০, ১৬৩, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭, ১৮৩, ২২৭-২৮, ২৩০-৩১, ২৪৮, ২৫০-৫১, ২৫৩, ২৫৪
খান, মুহাম্মদ ইয়াহিয়া ৪, ২৪, ২৮, ৪২, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৭-৫৮, ৫৮-৫৯, ৬০, ৬১, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১২-১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৬-১৭, ১১৭-১৯, ১১৯-২০, ১২১, ১২৫-২৬, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫-৩৬, ১৩৭, ১৩৮-৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪২-৪৩, ১৪৩-৪৭, ১৪৭-৪৮, ১৪৮-৫১, ১৫১, ১৫৪, ১৫৭-৫৮, ১৫৮, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৩-১৬৪, ১৬৮-৬৯, ১৬৯-৭০, ১৭২-৭৩, ১৭৩, ১৭৫-৭৬, ১৭৬ -৭৭, ১৭৯-৮০, ১৮৫-৮৬, ১৮৮, ১৮৮-৮৯, ১৯০-৯১, ১৯২, ১৯৩-৯৪, ১৯৬-৯৭, ২০৩, ২০৭-০৮, ২২৭-২৮, ২২৯, ২২৯, ২৩০-৩১, ২৩১-৩৩, ২৩৩-৩৪, ২৪২, ২৪২-৪৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৫-৫৬, ২৫৬, ৩৬৫-৬৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৩-৮৪, ২৮৮-৮৯, ২৮৯-৯০, ৩৩৬, ৩৪০-৪৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪১৭-১৮, ৪১৮-১৯, ৪২০, ৫০৫, ৫০৯, ৫১০, ৫১৭
খান, লিয়াকত আলী, ২০১-০২, ২৫০, ২৫৬,
খান, সদরুদ্দীন আগা, ৬০
খান, সর্দার আমানুল্লাহ ২৩৩
খান, সবুর ২৫০-৫১
খান, সিরাজউদ্দিন হেসেন ২৪৭-৪৮
খাপরা জেলা ওয়ার্ড ঘটনা ২৪৮
খায়েরুদ্দিন, খাজা ২৮৯-৯০
খোকন, (শহীদ) ৯৯
খোন্দকার মোশতাক ৭১

খোন্দকার মেহের ২২, ১৯৯-২০১
গ
গওহর, নঈম ৪১১
গণশক্তি (পত্রিকা) ২০৫-০৬
গণহত্যা ৬৪, ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৯-৯০, ১১০-১১১, ১২৫-২৭, ১৩০-৩১, ১৩৩-৩৫, ১৫৫-৫৬
গ্রামবাংলা (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান) ৩৯২-৪০১
গান্ধারা ১৩৮-৩৯
গান্ধী, ইন্দিরা ৫, ১১৯-২০, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬১
গার্ডিয়ান (লণ্ডনের পত্রিকা) ১২১, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ২২৯
গুণ নির্মলেন্দু ২৪৯-৫০, ৫২৭
গুণ, বাসনা ২৪৪-৪৬
গুণবর্ধন (সিংহলের পার্লমেন্ট সদস্য) ২৬৬
গুহ ঠাকুরতা, জ্যোতির্ময় (অধ্যাপক) ১৮৫
গোখলে ৮৬-৮৭
গোলাম, মহম্মদ ৮৮, ১৪৩, ১৪৪-৪৫, ১৭৬, ২২৭-২৮, ২৫০-৫১, ২৫৬
গোয়েবলস ১৬২, ১৬৩, ২২৯
গ্যালাঘার, কর্নেলিয়াস ৫৭-৫৮, ৬৪,৭৮
ঘ
ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল (কথিকা) ২৭২-৭৪
ঘোষ, কল্যাণী ৫২৭
ঘোষ, যোগেশ ১৮৫
ঘোষ, নারায়ণ (মিতা) ৩৪৮-৭০, ৫২৭

চ
চট্টোপাধ্যায়, মাধুরী ৫২৭
চট্টোপাধ্যায়, শক্তি ১৫৩
চরমপত্র ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ১২৭-২৮, ১৮৭-৮৯, ৫২৭
চাঁদ সুলতানা ১৯৯-২০০
চার দাবী ৫৬,
চিকাগো ট্রিবিউন ১৩৪-৩৫
চি পেং (চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ১৫৮-৫৯
চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ৮৭, ১৪৩
চুন্দ্রিগর, আই, আই ২৫০-৫১
চেঙ্গিস খান ২৮০
চেনা কণ্ঠ ৮৭, ৮৯, ৯০
চেম্বারলিন ৫১১
চেসওয়ার্থ, ডোনাল্ড ৪১
চৌধুরী, আবু সাঈদ ১১৫-১৬
চৌধুরী, আবদুল গাফফার ১৪২-৪৭, ১৫৫-৫৮, ২২৭-২৯, ২৬৪-৬৬, ২৮৮-৯১, ৫২৭, ৫২৭
চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক ২৭, ২৪০-৪৩
চৌধুরী, আলী রেজা ১৯, ২২, ৫২৬, ৫২৭
চৌধুরী, আলীম (ডাঃ) ২৪৭-৪৮, ২৪৮
চৌধুরী, আসাদ ৩২০-২২, ৫০৬-০৮, ৫২৭
চৌধুরী, এম এম (পুলিশ প্রধান) ১২২
চৌধুরী, জামিল ২২৫
চৌধুরী, নাসিম ২১৮-২১, ৩১৭-১৯, ৫২৭
চৌধুরী, প্রণব ৩৩৮, ৫২৭
চৌধুরী, মতিন আহমদ ২৫৭-৬৪
চৌধুরী, মিজানুর রহমান ৩৩২-৩৪
চৌধুরী, মুনির (শহীদ) ২৪৭-৪৮, ২৪৮
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ২৫০-৫১, ২৫৬
চৌধুরী, রেজাউল করিম ৫১৯
চৌধুরী, শামসুল হুদা ৪২০-২১, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৭
চৌধুরী,, শামীম ২৬, ২৮, ১৯৮-৯৯
চৌধুরী, সলিল ৪০৩-০৫
চৌধুরী, হামিদুল হক ২৮৯-৯০
ছ
ছয় দফা দাবী ১০৪, ১৪৪-৪৫, ১৭৪-৭৫, ১৭৬-৭৭, ১৯৮, ২১৩, ২০৯, ২৪৮, ২৫৪
জ
জনতা (পত্রিকা) ২০৫
জনতার আদালত (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান) ৩৮৯-৯২
জনতার সংগ্রাম (কথিক) ১৫৪-৫৫, ১৮৩-৮৫
জনস্টোন, রাসেল ১৩৪

জব্বার (শহীদ) ১০৫, ২৪৮
জব্বার, আবদুল ৫১২, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭
জমহুরিয়াত (তুরস্কের দৈনিক) ১৯২
জমিদার ১৩-১৪
জলি, জাহানূর ৩৮
জলিল, আবদুল ১৬৭-৬৮
জল্লাদের দরবার (রূপক নাটক) ২১, ২৭, ২৭, ৩৪৮-৭০, ৫২৭
জয় বাংলা (পত্রিকা- ৩০, ১৬৭, ১৬৮-৬৯, ৫২৬, ৫২৭
জসীমুদ্দীন (কবি) ১০৫, ১৯৪-৯৫
জাইচেক (ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্টের স্পীকার) ৫৫
জাকার্তা (ইন্দোনেশীয়ার পত্রিকা) ১৩৪-৩৫,
জাকার্তা টাইমস ৭৩
জাগরণী (দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান) ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৬, ২৭
জাগৃতি (দেশাত্মবোধক গান) ১৭
জাফর, মোহাম্মদ আবু ৩৭৫-৮০, ৫১০-১১
জাফর সাদেক (মোহাম্মদ আবু জাফরের ছদ্মনাম) ১০০, ১৬৬-৭২, ২০৭-১০
জামাতে ইসলাম ২০২, ২৫৪, ২৫৫
জামিল শারাফি (রণেশ দাশগুপ্তের ছদ্মনাম) ৯১-৯৩
জামিলা বোখারিদ ১৯৯-২০০
জিন্নাহ, মুহাম্মদ আলী ১০৬, ২২৫
জীবনানন্দ (কবি) ১৫২, ১৯৬-৯৭, ৩৩৩, ৪১৫-১৬
জেনকিনস, লোরেন ৭১
জেবুন্নাহার আইভি ১৯৭-৯৯, ২১২-১৪
জেসেল টোবি ৬৩
জেহাদী, মোঃ মুজি বুর রহমান ২৭
ঝ
ঝিলামের চার ভাই (কথিকা) ২৩৩-৩৫
ট
টলস্টয় (সোভিয়েট উপন্যাসিক) ১৫১
টাইগারম্যান (বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি) ৮০-৮১
টাইম ম্যাগাজিন ১০৯
টিক্কা খানের বীভৎস রক্তস্নান (সংবাদ শিরোনাম) ৬৪
টিটো (যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট) ৮২
টুডো (কানাডার প্রধান মন্ত্রী) ৭২
দ্য টেরিবল ব্লাড বাথ অব টিক্কা খান (সংবাদ শিরোনাম) ৬৪
ঠ
ঠাকুর, তাহের উদ্দীন ৫২৬
ড
ডন (করাচীর পত্রিকা) ৫৫, ১১৬-১১৭
ডর্ফম্যান, রবার্ট ১৩৪-৩৫
ডগেনস নিহিতের (সুইডিশ দৈনিক) ৬৯
ডেমোক্রাটিস ইউথ ইউনিয়ন (ইরাক) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক ইউথ ইউনিয়ন (লেবানন) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব ইউথ (সিরিয়া) ৫৭-৫৮
ডেমোক্রাটিক পার্টি (যুক্তরাষ্ট্র) ১৭৪
ডেলী জাপান টাইমস ৫৭
দি ডেলী জুনাইদিন (তুরস্কের পত্রিকা) ৫৭
ডেলী টেলিগ্রাফ (লণ্ডনের পত্রিকা) ১০৯, ১১১, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ১৬৩-৬৪
ডেলী মিরর (লণ্ডনের পত্রিকা) ৬৫
ডেলী মেইল (লণ্ডনের পত্রিকা ১৩৪-৩৫
ড্যান্টন (ফরাসী বিপ্লবের নেতা) ১৫৫
ঢ
ঢাকা বেতার ১০৭
ত
তথাকথিত পাকিস্তান বেতার, ঢাকা (আলোচনা) ৫০৩-০৬,
তালুকদার, মাহবুব ১২৩-৩০, ১৯৩-৯৭
তীতুমীর ১৪৩, ১০৪-০৫
তেহরান জার্নাল (তেহরানের ইংরেজী দৈনিক) ১১২-১৪

তুগলক ১০৭
থ
থিওডোরাকিস, মিকিস (সঙ্গীতজ্ঞ) ১৫১
দ
দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম (কথিকা) ২৫৭-৬৪
দত্ত, ধীরেন্দ্র ১৮৫
দত্ত, সুভাষ ৫২৭
দর্পণ (বাংলা কথিকা) ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ১৫০-৫৮, ১৭৮-৮৯
দাউদ ১৩৮-৩৯
দাবানল (পত্রিকা) ১৬৭-৬৮
দাশ, সময় ৪১২, ৫২৭
দাশগুপ্ত, রণেশ ১৯, ৯১-৯৩, ১৫৪-৫৫, ৫২৭
দাস, ডেভিড ২৮৫-৮৭
দাস, দিলীপ চন্দ্র ৫১৮
দিন এলো (কবিতা) ৩৩৯
দ্বিজাতিতত্ব ১৩৮-৩৯, ১৮৭
দুর্জয় বাংলা (কথিকা) ২৬৯-৭১
দুর্জয় বাংলা (সঙ্গীতানুষ্ঠান) ২২, ২৩
দৃষ্টিকোণ (কথিকা) ১৭২-৭৬
দৃষ্টিপাত ২০, ২১, ৮৬-১০৩
দে, অনিল চন্দ্র ৫১৩
দেব, গোবিন্দ (ডঃ) ১৮৫, ২০৩, ২৪৮
দেবী, সুমিতা ৫২৭
দেয়ালের লিখন (কথিকা) ২৪০-৪৩
দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা (কথিকা) ২৪৪-৪৬
দেশবাসী সমীপে নিবেদন (কথিকা) ২৭৮-৮০
দৈনিক আজাদী ৫১৯-২৪
দৈনিক ইত্তেফাক ২০৫
দৈনিক পূর্বদেশ ৫১৯
দ্য গল (ফ্যান্সের প্রেসিডেন্ট) ১৪৮-৪৯, ১৫০-৫১
ধ
ধর, দিলীপ কুমার ১৯৬-৯৮
ধর, সাধন কুমার ৩৮
ন
নওশাদ, রফিক ৩৩৭
নজরুল (সাংবাদিক) ২৪৭-৪৮
নজরুল ইসলাম (বিদ্রোহী কবি) ৮৭, ১০৬, ১৫২, ১৬৮-৬৯, ২২৪-২৫, ২৮০, ৩৩২, ৪১৫-১৬
নতুন বাংলা (পত্রিকা) ১৬৭
নমরুদ ২৮০
নসরুল্লা, নওয়াবজাদা ১৪৪-৪৫
নাজিমুদ্দিন, খাজা ১৭৬
নাথ, ডলি, (মিস) ২০৩-০৪
নাদির শাহ ১৬২, ১৭৫-৭৬
নামফলক (কবিতা) ৩২৫
নারায়ণ, জয়প্রকাশ (ভারতের সর্বোদয় নেতা) ১১৩-১৪
নাসরিন ৫১৩
নাসির, মীর্জা ৫১৮
নাসের (ক্যাপ্টেন) ৩
নিউইয়র্ক টাইমস ৮২-৮৪, ৮৬, ১১৭-১৯, ১৩৪-৩৫, ১৬০-৬১, ২০৯
নিউ ওয়েভ (পত্রিকা- ৭৫
দি নিউ হেরাল্ড (নেপালের পত্রিকা) ৫৭
নিউজইউক ৬৩-৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ১১৬-১১৭, ১২১-২২, ১৫৮-৫৯, ১৬০-৬৪
নিক্সন, রিচার্ড ৬০, ৭১, ১২১, ১৭২-৭৪, ১৮৮-৮৯, ৩৩৬, ৩৪৫
নিয়াজী, এ, এ, কে, (ইস্টার্ন সেক্টরের কমাণ্ডার) ১১৬-১৭, ১২১-২২, ১৬৩-৬৪, ২৭৯
নুন, ফিরোজ খান ২৫০-৫১
নূরজাহান মযহার ২১৪-২১৬
নুরন্নাহার মযহার ৫২৭
নেজামে ইসলাম ২০২, ২৫৪, ২৫৫
নেলসন, হিথ ৬৬
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ২৫৩-৫৪
প
পত্র বিতান (বেতার অনুষ্ঠান) ৫০৪-০৬
পদগর্নি, নিকোলাই ১৭৪, ১৮৮-৮৯

পঁপিদু, জর্জেস (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট) ৮৪
পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ১৪৬-৫১, ৫২৭
পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৭৫
পাকিস্তান কাউন্সিল ২৪৬-৪৭
পাকিস্তান টাইমস (দৈনিক পত্রিকা) ৫৬, ৭৪, ২৫৫
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (কথিকা) ২৫০-৫৬
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১১৬-১৭
পাকিস্তান প্রস্তাব ৮৭
পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ৪২-৪৩
পাল চৌধুরী, রণজিৎ ২৬, ১৫০-৫৩
পার্সি, চার্লস ৭৮
পিণ্ডির প্রলাপ ১৬১-৬৬
দি পিপল (পত্রিকা) ৩৯, ২০৫-০৬
পিলাত ২৮৫-৮৭
পুতুল নাচের খেল ১৫৫-৫৮, ৫২৭
পুলিশ বাহিনী ১, ৯, ৯১, ১৩৬-৩৭, ১৩৯-৪০, ১৫৪-৫৫, ১৮৪-৮৫, ১৮৭, ২০২, ২৫৫-৫৬
পোপ পল ৬২
প্রতিধ্বনি (কথিকা) ২৬, ২৭, ২২৯-৩০
প্রতিনিধির কণ্ঠ (জাতীয় সংসদ সদস্যদের বক্তৃতামালা) ১৩০-৪০
প্রসেনজিৎ ৫২৭
প্রাভদা ৮৪, ১৩৫-৩৬, ২৬৫-৬৬
প্রিন্টির আর্নেস্ট ৬৩
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৯-২০০

ফ

ফজল-এ-খোদা ৪১২
ফজলে রাব্বি ২৪৭-৪৮, ১৪৮
ফরাসী বিপ্লব ১৫৪-৫৫
ফার ইর্ষ্টান ইকনমিক রিভিউ ৫৬
ফারুক, মাহমুদ ২৬
ফারুক, মোহাম্মদ ৫২৭
ফারুক, শাহজাহান ৫১৪, ৫২৫
ফুলব্রাইট (সিনেটর) ৫৪
ফুয়েরা ৩৩৫
ফেন্সী ১৩৮-৩৯
ফেরাউন ২৮০

ব

বজ্রকণ্ঠ (শেখ মুজিবের বাণী) ১৭-২৮, ২৭৩-৭৪
বটমলি, আর্থার ৬২-৬৩
বরকত ১০৫, ১৭৬, ২২৫, ২৪৮, ৩২৫, ৪০৪-০৬
বসু, মনোজ (সাহিত্যিক), ২৪৬-৬৩
বড়ুয়া, বিপ্রদাস ১৮৩-৮৫
বড়ুয়া বিপ্লব ২৭৬-৭৮
বড়ুয়া সুব্রত ৫২৭, ৫২৭
বাইবেল পাঠ ও আলোচনা (কথিকা) ২৮৫-৮৭
বাইশ পরিবার ১৩৮-৩৯
বাংলা ভাষা ১০৪-০৬, ১৯৩-১৯৮, ২৩৮-৩৯, ২৪৬-৪৭,
বাংলাদেশ গেরিলা (কথিকা) ১৯৮-৯৯
বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু (কথিকা) ২৪৩-৪৪
বাংলাদেশে (কবিতা) ৩৩২-৩৪
বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় (কথিকা) ২২১-২৩
বাংলাদেশের অর্থনৈথিক পুনর্গঠন (কথিকা) ২১৮-২১
বাংলাদেশের পুনর্গঠন (কথিকা) ২৪৯-৫০
বাঘা যতীন ১৪৩
বাঙ্গালী জবাব দাও (কথিকা) ১৬
বাঙালী জাতীয়তাবাদ ১৮৭
বাঙালী রেজিমেন্ট ১, ৯, ২৪, ১২৩, ১৩৬-৩৭
বাঙালী, মোহাম্মদ শাহ ২২, ৫১২, ৫১৩
বাংলার বাণী ১৬৭, ২০৫-০৬
বাংলার মুখ (জীবন্তিকা) ২৩, ২১৬-১৯
বাংলার মুখ (পত্রিকা) ২০৫-০৬
বাংলার সংগ্রামী জনতা প্রস্তুত (কথিকা), ২৪৭-৪৯
বার্নস, মাইকেল ৪১, ৫৬
বায়রন লর্ড (ইংরেজ কবি) ১৫১
বায়াফ্রার ঘটনা ৭১
বি, এন, আর ২৪৬-৪৭

বিউইন, এ ৬৬
বিচার চাই (কথিকা) ৫১০-১১
বিপন্ন যখন (কথিকা) ২৫৭-৩০১
বিপ্লবী ফরাসী গণ সেনাবাহিনী ১৫৫
বিপ্লবী বাংলা (পত্রিকা) ১৬৭-৬৮
বিপ্লবী বাংলাদেশ (পত্রিকা) ১৭১-৭২
বিশ্ব জনমত ১৭-২১
বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ (কথিকা) ১৫৮-১৬২
বিশ্ব ব্যাঙ্ক রিপোর্ট ৬৭
বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপ ৪২-৪৩
বিশ্ব শান্তি সংসদ (হেলসিঙ্কি) ৬০
বীরাঙ্গনা খাওলা ১৯৯-২০০
বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলন ৪০-৪১, ৫৫, ৫৮-৫৯
বেগম উম্মে কুলসুম মুসতারী শফি ২৩, ২৩৮-৪১
বেগম মুজিব ১১৪
বেতার বাংলা ১১
বেনিটো মুসোলিনী ৩৩৫
বেল মার্টিন (বি, বি, সি'র রিপোর্টার) ২৩০
বেলগ্রেড বোরবা (যুগোশ্লাভ দৈনিক পত্রিকা) ৭৩
বেলাল মোহাম্মদ ১২, ১৭, ৫১৯-২৪, ৫২৭
বোখারী, আবদুল গনি ৫১৪, ৫১৫
বোখারী, ফারেগ (কবি) ২৭৯
বোলস, চেষ্টার ৭৩
বোস, অমিতাভ ৩৪৮-৭০
বোস, প্রসেনজিৎ ৩৪৮-৭০
ব্রচগ্রেভ, আরনড-দ্য ৮৬, ১১৬-১১৭, ১৬৩
ব্রাউন, ডব্লু ম্যালকম ১১৭-১৯
ব্রান্ট, উইলি (পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর) ১৫৮-৫৯

ভ

ভগৎ সিং ১৩৭
ভট্টাচার্য, অনুপ ৫২৭
ভট্টাচার্য, তপন ২৭২-৭৪, ৫১৩, ৫১৪
ভট্টাচার্য, সন্তোষ (অধ্যাপক) ২৪৮
ভট্টাচার্য, সুকান্ত (কবি) ২৭৭-৭৮, ৩৩৩-৩৪
ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ১১০
ভালিকা ১৩৮-৩৯
ভাসানী, মৌলানা আবদুল হামিদ খান ৮৯, ১৪৩, ১৭৬, ২২৭-২৮
ভিকম্যান, ক্রিস্টার (সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ৮০
ভুইয়া (ক্যাপ্টেন) ৩, ৪
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৫৬, ১০২, ১১১, ১১৬-১৭, ১২০-২২, ১৩০, ১৩১, ১৩৫-১৩৭, ১৩৮-৩৯, ১৫৮-৫৯, ১৭২, ১৮৮-৮৯, ২২৪, ২৫৪-২৫৬, ৪১৭-১৯, ৫০৫
ভূমি রাজস্ব নীতি ১৬৬
ভের্ন (ক্যাপ্টেন) ৯৫, ৯৬

ম

মঈন (মেজর) ৭২
মওদুদী, ১৩০, ২২৪
মজুমদার, গৌরীপ্রসন্ন ৪১৫-১৬
মতিয়ার ২৪৮
মনিরা জামান ৫১৪
মনিরুজ্জামান (ডঃ) ১৮৫, ২০৩, ২৪৮
মল্লিক, এ, আর (ডঃ) ৫২৭
মহসিন, মোহাম্মদ ৫২৭
মহাথেরো, জ্যোতিপাল ৪২-৪৩
মহালনবীশ, বুলবুল ৩৪৮-৭০, ৫২৭
মহাশ্মশান, (কায়কোবাদ রচিত) ৯৯
মাইলাই হত্যাকাণ্ড ৬৪
মাও সে তুঙ ৮৫
মানবতার নামে (কথিকা) ২০
মানুষের মুখ (ধারাবাহিক কথিকা) ১২৩-৩০
মান্নান, আবদুল ৫২৫-৫২৭
মানেকশ', শ্যাম (জেনারেল) ১২১-২৩
মামুন, মোহাম্মদ ৫২৭, ৫২৭
মান্সফিল্ড, মাইক (সিনেটর) ১৭৪
মার্গলিন, স্টীফেন এ, ১৩৪-৩৫
মালরো, মঁসিয়ে আঁদ্রে ১১৩-১৪, ১৫০-৫১
মালিক (ডাঃ) ১১২-১৩, ১১৪, ১১৭, ১২২, ১৩৭, ১৫৭-৫৮, ১৫৮-৫৯, ১৬৫, ১৭৪, ১৮৮, ২০৪, ২২৯

মালিক মন্ত্রীসভা ১৫৮-৫৯
মাসেম, এম, এম ৫১৮
মাস্কি (সিনেটর) ১৭৪
মাসুদ, আবু ২০
মাহবুব, কামাল ১৭
মাহমুদ, আপেল ৪০৮-৪০৯, ৫১২, ৫১৩,৫১৪,৫১৬,৫২৭
ম্যাসকারেনহাস, এন্থনী ৮৯-৯০
ম্যাসকারেনহাস, রির্পোট ৮৯-৯০
ম্যাকগর্ভাস (সিনেটর) ১৭৪
ম্যাকব্রাইড, সিয়ান ৭৮
মির্জা, ইস্কান্দার ৮৮, ২২৭-২৮, ২৫০-৫১, ২৫৬
মিত্র, ইলা ৯৪
মিত্র, কল্যাণ ৩৪৮-৭০, ৩৭১-৭৪, ৫২৭
মিত্র বাহিনী ১২১-২৩, ২১৯, ২২৪, ২৭৭
মীরজাফর ৮৮, ১৩৬-৩৭, ১৮৭, ২২৭-২৮, ২৪৬-৪৭
মীরজাফরের রোজনামচা (জীবন্তিকা) ৩৭১-৭৪
মুকুল নায়ক ১৬৭
মুক্তাঞ্চল ঘুরে এলাম (কথিকা) ২৭০-৭২
মুক্তাঞ্চলে (কথিকা) ২৭৬-৭৮
মুক্তিবাহিনী (মুক্তিসেনা) ১, ৩-৯, ১২, ২৪, ২৮, ৪০, ৪২, ৬৯-৭১, ৭৪, ৭৬, ৮৩, ৮৫, ৮৬-৮৭, ৯০-৯১, ৯৩-৯৪, ৯৬-১০০, ১০১-০৩, ১১৮-২০,১২১-২৬, ১৩০, ১৩৯-৪০, ১৪৪-৪৫, ১৫৯-৬২, ১৬৩, ১৬৪-৬৫, ১৬৭-৭১, ১৭১-৭২, ১৭৮-৮১, ১৮৩-৮৫, ১৮৭,১৯৮-২০৩, ২১২-১৯, ২২২-২৫, ২২৭, ২৩৩-৩৪, ২৪২-৪৩, ২৫৭-৮৩, ২৯২, ২৯৮-৯৯, ৩০৫-০৮, ৩৪৮, ৩৭৫-৮৯, ৩৯২-৪০১
মুক্তিফৌজের ক্যাম্প (কথিকা) ২৬৬-৬৯
মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের কবিতা (কথিকা) ১৯৩-৯৭
মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে (কথিকা) ২৬৪-৬৬
মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী ১৬৭-৬৮
মুক্তিসংগ্রাম ও বঙ্গবীরঙ্গনা (কথিকা) ২১৪-১৬
মুক্তিসংগ্রামে মায়ের প্রেরণা (কথিকা) ২১২-১৪
মুখার্জি, মৃণাল কান্তি ২৭২
মুজাহিদ বাহিনী ৯১, ১৩৬-৩৭
মুন্নাফ, মোহাম্মদ ৫১৫
মুসলিম লীগ, ৮৭, ৮৮, ১৭৬, ১৮১-৮২, ১৮৫-৮৬, ২৫৪, ২৫৫
মুসা (আঃ) ৬১
মৃত্যুহীন প্রাণ ৫০৬-০৮
মেইল (ফ্রিটাউন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা) ৭০
মেসন, এডওয়ার্ড ১৩৪-৩৫
মোস্তফা (সাংবাদিক) ২৪৭-২৪৮
মোস্তফা, আনোয়ার ৫২৫
মোহাইমেন, এমএ (এমপিএ) ৫২৬
মৌলিক গণতন্ত্র ১৭৪-৭৭

য
যীশু খৃষ্ট ৬৬, ২৮৫-২৮৭
যুক্তফ্রণ্ট ৮৮, ১৭৬
যুদ্ধই একমাত্র পথ কথিকা ২০৭-১০
যুদ্ধকালীন পরিস্তিতি ও বাংলার নারী (কথিকা) ২০৩-০৪

র
রক্ত দিয়ে রেখে গেলাম (কথিকা) ২৩৫-৩৭
রক্তরাঙা ঈদুল ফিতর (ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠান) ২৯৩-৯৫
রক্তশপথ (নাট্যানুষ্ঠান) ২৫
রক্ত স্বাক্ষর (স্বরচিত কবিতা পাঠ) ১৭-১৯, ২২, ২৬, ২৮
রক্তে রাঙা ঈদ (ঈদ উপলক্ষে অনুষ্ঠান) ২৯১-৯৩
রক্তের অক্ষরে লিখি ১৬৬-৭২
রজার্স (মিঃ) ৬০
রদিনভ, এ এ (পাকিস্তানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত) ৭৭
রণজিৎ ২২
রণদামামা (কথিকা) ১৯৬-৯৮
রণভেরী (যুদ্ধের খবর) ১৭, ১৮

রণশিবিরের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র (কথিকা) ৩৯৯-৪০১
রণাঙ্গন ঘুরে এলা (কথিকা), ২৭৩-৭৭
রণাঙ্গণ বাংলার নারী (কথিকা) ২৩৮-৪১
রণাঙ্গণের চিঠি (কথিকা) ৫০৯-১০
রফিক ১০৫, ২৪৮, ৩২৫, ৪০৪-০৫
রফিক, মোহাম্মদ ৩৯, ৪০, ৩২৬-২৯
রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বকবি) ৮৭, ৮৯, ১৪৪-৪৫, ১৫২, ১৬৬, ১৭৬-৭৭, ১৮৭, ২২৪-২৫, ২৪৪, ২৮০, ৩১৪, ৩৩২, ৪১৫-১৬
রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসংগ ১০৫, ১৭৬-৭৭, ২৪৬-৪৭
রমজানের ওই রোজার শেষে (ঈদ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান) ২৮৮-৯১
রশিদ (ই-পি-আর জোয়ান) ৯১
রহমান, আইভি ৫২৭
রহমান, আতাউর ৫২৫
রহমান, আতিকুর ৫১৭-১৯
রহমান, আবু রাহাত মোঃ হাবিবুর ২৮, ২৮১-৮৫
রহমান, আমিনুর ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
রহমান, আশফাকুর ৩৪০-৪৭, ৫২৬, ৫২৭
রহমান, এস,এ (বিচারপতি) ১৭৪-৭৫
রহমান, জিল্লুর (এম-এন-এ) ১৩৪-১৩৭, ৫২৭
রহমান, জিয়াউর ২, ৬, ২৩৫-৩৬,৫১৮
রহমান ফেরদৌসী ৫১২
রহমান, মসিউর ২৪৮
রহমান, মিজানুর (এম-এন-এ) ১৩০-৩৩
রহমান, মুস্তাফিজুর ১০০-০১, ১২১-২৩, ১৫৩-৫৪, ২২২-২৫,২৯৩-৯৫, ৩৭৯-৩৮২, ৩৮৩-৮৯, ৩৯২-৪০১, ৫২৭
রহমান, শহীদুর ২০
রহমান, শেখ মুজিবুর ১, ২, ৪, ৬-১০, ১৭, ২১, ৫৬, ৬৩, ৬৬, ৭২-৭৫, ৭৬-৭৮, ৮৯, ১০০, ১০৪, ১০৮-২১, ১৩০-৩৩, ১৩৭-৪০, ১৪৩-৪৮, ১৫৪-৫৫, ১৬১-৬২, ১৬৫, ১৬৯-৭০, ১৭৪-৭৭, ১৭৯-৮০, ১৯৩-৯৫, ১৯৮, ২০৪, ২০৭-১০, ২২৯, ২৩২-৩৩, ২৪৩-৪৪, ২৫৪-৫৬, ২৬৪-৬৬, ২৮০, ৩১২, ৩২৫, ৩৩৬, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৮, ৪১৫-১৯,
রহমান, হাফিজুর ৪১৬-১৮
রহমান, হাসান হাফিজুর ১৯৫-৯৬
রাজনৈতিক বঞ্চনার নেপথ্যে ২২৭-২৯
রাজনৈতিক মঞ্চ (কথিকা) ১৭৫-৭৭, ১৮১-৮৪
রাজবংশী, ইন্দ্রমোহন ৫১৫
রাজাকার, ৯৬-৯৭, ১০১, ১১৬-১১৭, ১৪২, ১৬৩-৬৪, ২০৬, ৩৯৪
রামমোহন ৮৭
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১০৫-১০৬, ১৭৬-৭৭, ১৯৮, ২২৫, ২৪৮
রায়, অজিত ৫১৬, ৫২৭
রায়, অংশুমান ৪১৫-১৬
রায়, করুণা ৩৪৮-৭০
রায়, প্রণব ৫২৭
রায়, মৃণাল কৃষ্ণ ৫২৭
রায়, রথীন্দ্রনাথ, ৪০৬-৭, ৪১৭-১৯, ৫১৪, ৫১৫, ৫২৭
রায়, স্বপ্না ৪১২-৪১৩, ৫১৩, ৫২৫
রায়, হরলাল ৪১৭-১৯, ৫১৩, ৫১৫
রায় চৌধুরী, অসিত (অধ্যাপক) ১৯, ২৪৬-৪৮, ২৯৬-৩০১
রায়হান, জহির ২৫০-৫৬, ৫২৭
রাহমান, শামসুর ১৫২
র‍্যামসডেন, জেমস ৬৩
রিপন সোসাইটি ১৩৪-৩৫
রিপোর্ট- ১৯৭১ (কবিতা) ৩২০-২২
দ্য রিলিজিয়ন (ভেনেজুয়েলার পত্রিকা) ৬৬
রেনেসাঁর সূচনা : বাংলাদেশ (কথিকা) ২৩৭-৩৯
রোবসন, রোনাল্ড ৮৫
রোস্তাম ২৪৮
রোসে আল-ইউসুফ (আরবের আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকা) ১৯২-৯৩

ল

লতিফ, ৪০৪-০৫

লণ্ডন টাইমস ৭১, ৭২
লা ফিগারো (পত্রিকা) ১১৪, ১৯০
লা লিব্রা (ব্রুসেলসের পত্রিকা) ১৩৪-৩৫
লাচাঁস, জর্জেস ৬৬
লামদ (ফ্রান্সের সংবাদপত্র) ১৬২
লাল গৌরবে আসে স্বাধীনতা (কবিতা) ৩৩৭
লালদিঘীর ময়দান
লায়লা খালেদ ১৯৯-২০০
লায়লা জামান ৫১৪
লিবারেল দল (ইংল্যাণ্ড) ১৩৪
লিবারেল পার্টি (কানাডা) ৬৬
লোরকাও, গর্সিয়া (স্পেনের কবি) ১৫১
লোহানী, কামাল ১৭, ১৮, ২১-২৩, ৫২৭
লোহানী,দীপ্তি ৩৯
শ
শব্দ সৈনিক ১১, ১৭৮-৮৯. ২২৭-২৫৬, ২৭৯-৮০, ৩১০-১১, ৩১৬, ৩২০-২২, ৩২৫, ৩৩৫-৩৬, ৩৩৯
শব্দের তারতম্য (কবিতা) ৩১০-১১
শরণার্থী সমস্যা ৪০-৪১, ৬৩, ৬৫-৬৬, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৮১, ৮২, ২৫০
শরফুজ্জামান ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
শহীদ, আবু ২১
শহীদ মিনার (আলেখ্য) ১৮
শহীদ সাবের ৯৪-৯৬
শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ (ডঃ) ১০৫
শ্রমিক দল (ইংলণ্ড) ৪১, ৫৫, ৬২
শাকের, সৈয়দ আহমদ ৫১৯, ৫২৫
শাহজাহান (ক্যাপ্টেন) ২৭২
শারাফী, জামিল ২০
শামসুজ্জোহা (ডাঃ) ২৪৮
শাহ, জহির (আফগানের বাদশাহ) ১১৩-১৪
শাহ, তোরাব আলী ৫১২, ৫১৬
শাহনাওয়াজ ১৩৮, ১৮৮-১৮৯
শাহাবুদ্দিন, এ,বি,এম ২৬
শাহবুদ্দিন, খাজা ২৫৬
শ্যাম, সুজেয় ৫১৪, ৫২৭
শিকদার, ইবনে নুর ১৭, ৩১০-১১
শিকদার, টি,এইচ ৩৯, ৩২৩-২৪, ৪১১, ৫২৬, ৫২৭
শিকাগো নান টাইমস ১৬০-৬১
শিক্ষা দিবস ২৩০-৩২
শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন ২৩০-৩২, ২৪৮
শেখ আয়াজ (সিন্ধুর কবি) ২৭৯
শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার : বিশ্বজনমত ৭২-৭৫, ৭৭-৭৮, ১০৪, ১০৮-১০৯, ১৩২-৩৪, ১৪২-৪৭
শ্যোন (মিঃ) ২২৯
স
সংবাদ (দৈনিক পত্রিকা) ৯৪, ২০৫-০৬
সর্দার, আলাউদ্দিন, ৫১৪, ৫১৫
সন্দ্বীপ, আবুল কাশেম ৪০, ১৯০-৯৪, ৩৩৯, ৫১৮, ৫২১, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৭
সপ্তম নৌবহর ১৭২-৭৪
সলিমুল্লা ২১
সরদার ফজলুল করিম ৯৪
সরকার, বীরেন ২৪৮
সরকার, মনোরঞ্জন ৫১২, ৫১৩, ৫১৫
সরকার, শাহ আলী ১৭, ৪১৮-২১, ৫১৫, ৫১৬
সলিমুল্লা (ইলিয়াস আহমেদের ছদ্মনাম) ২০৬-০৮, ২৩৩-৩৫
স্বদেশ (পত্রিকা) ১৬৭
স্বদেশ স্বকাল (কথিকা) ২৪৬-৪৮
স্বরাজ (পত্রিকা) ২০৫-০৬
সাঁই, মকসুদ আলী খান ৪১৪
সাঁওতাল কৃষক আন্দোলন ৯৪
সাংবাদিক স্বাধীনতা ও হানাদার অধিকৃত বাংলাদেশ (কথিকা) ২০৪-০৬
সাদেক, মুসা ২৭০-৭২, ২৭৩-৭৭, ৩৩৫-৩৬
সাদেকীন ৪০, ১৮১-৮৪, ২১৬-২১৯
সার্ত্রে, জাঁ পল ১৫১
সানডে টাইমস ৮৯-৯০,

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (কথিকা) ১৬
স্বাধিকার (পত্রিকা) ২১৩
স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদ ৯, ১৩৬-৩৭
স্বাধীণ বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত গান ৪০২-৪২১
স্বাধীনতার ঘোষণা ২
সামন্তবাদ ১৩-১৫
সাময়িকী (বাংলা কথিকা) ১৯০-৯১
সামাদ, এবনে গোলাম (ডঃ) ২২০-২৩
সামাদ, এমএ ৪১, ৫৮-৫৯, ৫২৭
সারওয়ার জাহান ৪১৪-৪১৫
সালাম, আবদুস ১১, ১০৫, ১৭৬, ২২৫, ২৪৮, ৩২৫, ৫১৯, ৫২৩, ৫২৪
সাহা, মাহদেব ৩৯, ১৫৮, ১৬২, ১৩৫-৩৭, ৫২৭
স্যাক্সবি, উইলিয়াম (মার্কিন সিনেটর) ১৬১-৫২
সিং, মরণ ৫
সিদ্দিক, আবু বকর ৪১৪-৪১৬
সিদ্দিকী, এম, আর ১১৫
সিদ্দিকী, জাহেদ ৫২৭
সিদ্দিকী, নূরে আলম ৪০৮-৪১০
সিপাহী বিদ্রোহী ১৩৭
সিরাজী, ইসমাইল হোসেন ৮৭
সিয়াটো-সেন্টো জোট ৪১
স্বীকারোক্তি (কথিকা) ৩০৭-০৯
সীমার ২০৯-৯১
সুফিয়ান এম,এ (অধ্যাপক) ১৪১-১৪২
সুভাস বসু (নেতাজী) ৮৭, ১৩৭-৩৮
সুলতান, তাহের ৫২৬-৫২৭
সুলেরী, জেড ২০৫
স্যুম্যান, মরিস (ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ৮০
সূর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে (কথিকা) ৩০৩-৩০৬
সূর্যসেন ১৪৩, ৫১৭
সূর্যসেনের স্মৃতি (কথিকা) ১৯
সেকান্দার ৫১৯
সোনার বাংলা (গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্য প্রচারিত) অনুষ্ঠান ২২, ২৩, ২৪, ২৬-২৯, ৩৮৩-৮৯
সোবহান, আবদুস, ৫১৮
সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি ৮৪
সোভিয়েতের ভূমিকা ১৭৩-৭৪
সোলায়মান ২৮৯-৯০
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ১৪৩-৭৪, ২২৭-২৮
স্টোনহাউস জন ৫৭-৫৮
হ
হংকং স্ট্যাণ্ডার্ড (হংকং-এর দৈনিক) ৭৭
হক, আমিনুল (বাদশা) ১৯, ২০, ৫২৬
হক, গাজীউল ৩৭, ২৪৭-৪৯, ৩৪০-৪৭, ৫০৯-১০
হক, জহিরুল ৩৪৮-৬৯
হক, নূরুল (এম-এন-এ) ১৩০
হক, ফজলুল ৮৭-৮৯, ১৪৩, ১৭৬, ২২৭-২৮
হক, মান্না ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬
হক, শহীদুল ২১, ২২, ৫২৭
হর্নসবী, মাইকেল ৭১
হলিডে (পত্রিকা) ২১৩
হাই, মোহাম্মদ আবদুল (অধ্যক্ষ) ১০৫
হানিফ ২৪৮
হান্নান, এম,এ ৫১৮, ৫২১, ৫২৪
হাবলু ১০০
হাবিবউদ্দীন, কাজী ৫২৫
হামিদ ১৩০, ১৩৭, ১৪৩, ১৫৪-৫৫,
হাফিজ, আবদুল (অধ্যাপক) ১৮-২১, ৯০-৯১, ৯৩-৯৯
হারুন ২৪২, ৫১৯
হালদার, গবিন্দ ৪০৩, ৪১২-১২
হালাকু খান, ২৪৮, ২৮০
হালিম, আবদুল ৫১৮
হাশিম, আবুল ১০৫
হাসান, আবুল ১৫২
হাসান, কামরুল ৫২৫
হাসান, গাজীউল ২০৪-০৬

হাসান, বদরুল ৪০, ২৬৯-৭১, ২৯১-৯৩
হাসান, মাহবুব ৫১৮-৫২৩
হাসান, মোজাফফর (ভাইস এডিমরাল) ১৪২
হাসান, রশিদুল ৫১৯, ৫২৫, ৫২৭
হিটলার, ১৭১-৭২, ২০৯, ৫১০, ৫১১
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১৩-১৪
হিলালী, আগা (জাতিসংঘে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত) ১০৮-০৯
হুদা, নাজমুল (মিঠু) ৩৪৮-৭০, ৫২৭
হুদা, সৈয়দ শামসুল ৪১০
হে স্বদেশ হে আমার বাংলাদেশ (কবিতা) ৩২৬-২৯
হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট (মার্কিন ঔপন্যাসিক) ১৫১
হোচিমিন ৩৩৬
হোড়, সুকুমার ২৩৭-৩৯
হোসেন, আমীর ২০, ২১, ২৭, ১০৪-২৩
হোসেন, নেওয়াজিশ ৩১৬, ৩৮৯-৯২, ৪০৩-০৪
হোসেন, পারভীন ১৯, ২০, ৫২৭
হোসনে আরা, কাজী ৫১৮, ৫২৪
ক্ষ
ক্ষুদিরাম ১৩৭, ১৪৩, ৪০৩-০৪

INDEX A

Abdullah-al-Islam 31, 32
Activities of the Liberation Army 45, 50, 52-53
Afro-Asian Peoples Solidarity Organization 454-56
Agartala Conspiracy Case 433
Agnishikha (A Composite Programme for the Freedom Fighters) 15, 16 ,29
Ahmad, M.M. 483
Ahmed, Farid 491
Ahmed, Fayez 30, 33, 38, 39,40
Ahmed, Khondoker Moshtaque 479
Ahmed, Mesbah 34
Ahmed, Muzaffar (Professor) 479
Ahmed. Raju 32
Ahmed. Tajuddin 44. 479
Ahmed, Zareed 32
Ahsan, Syed Ali 33, 34, 35, 36
Akhtar, Babul 30, 32, 37
Akhtar, Jamil 33
Akhtar, M.R 30, 31, 34, 39
Akhtar, Parveen 39
Alam, Ashraful 32, 34, 35, 36, 40
All. Hafez 36, 38
Ali. Hossian 47
Ali. Mansur 50
Ah. Salman 431
Alor Diganta (A talk in Bengali) 16
Amar Sonar Bangla 30
Amnesty, fall to deceive : BBC Thaws : Mercenary Malik (article) 477-79
Anjuman-e-Mahajarian 50
Anwar, Mustafa 29, 30, 31, 32, 36, 39
Arafat, Yassir 476
Awami League 45, 47, 50, 435, 436, 443, 448, 451, 452-53, 458. 458-60. 475. 479. 490. 502
Awami League Opts for Military Solution (article) 458-60 The Asian 437
B
Bajrakantha (Voice of Sheikh Mujibur Rahman) 29
Bangladesh Communist Party 479
Bangladesh Get Ready (article) 497-98
Bangladesh Liberation Forces 42-43, 426-27,427-29,434-35. 437-38, 438-39,440, 441,442-46, 468, ,493,498-500
Bangladesh National Congress 479
Bangali, Mohammad Shah 34, 35, 38, 39 Begum Akhtar Sulaiman 431 Begum Umme Kulsum 29 Belal, Mohammad 32
Bell, Martin 478
Bengal Liberation Army 2, 3, 6,10
Bhashani, Moulana Hamid Khan 48. 5 1. 479, 502
Bhuiya (Captain) 3
Bhutto, Z A 430, 436, 437.451. 479. 482. 483,501-02

Biswa Janamat 16,29 Borchgrave, Arnaud de 438 Boltomly, Aurther 458-59 bowles. Chester 68 Bray. Charles 493
British Delegation Slates Yahya Tikka (article) 458-59
British Labour Parly Wakes Up: An Intervention Not Welcome Now (article) 486-89
British Parliament Debates Bangladesh (article) 452-54
Brodie. Ian 441
Brohi A.K. 432
Brown, Malcolm 86, 440, 443
Brown, goatfrey 440
Budapest Peace Conference 42-43
Bultimore Sun 134-35
Burns, Michael 44
The Bangalis Strike Back (article) 70 C
Caravan (Kabul Daily) 49
Cargill, I.P.M.67, 422 .('arm 11 report 67
Causes of Arab Apathy Towards Bangladesh (article) 462-63
CENTO 45
Centre for the World Fellowship of Buddhists 46
Chakravarty, Sabuj 38
Charampatra (Counter Programme) 16, 17,29
Chessworth, Donald 44
Chaing Kai Shek 493
Chinese Attitude 426- 29, 464-65
Chow-En-Lai 464
Chodhury, Abdul Gaffar 33, 35, 36
Chodhury, Abdul Razzak 34, 36
Chodhury, Abu Sayeed (Justice) 42-43, 46
Chodhury, Ahmad 30, 31, 32
Chodhury, Ali Reza 32
Chodhury. Asad 39
Chodhury, Babul 32
Chodhury, Fazlul Qader491 Chodhury, Pranab 39
Chodhury, Rezwanul Huq 39 Chodhury, Shamim 39 Chodhury, Shamsul Huda 528. 529 Chodhury, Subhra 37 Christian Monitor 134-35 Collusion with Iran(article) 483 Conflict in East Pakistan : Background and Prospect 134-35 Conservative Party (U.K.) 487

D

The Daily Express (London) 441, 445-46. 475,501
The Daily Mail 493
The Daily Mirror 445-46
The Daily Telegraph 51-52, 52, 440. 441.
442, 444, 445-47, 448, 474-75
Darpan (A Talk in Bengali) 16, 29
A Death of a Nation (Report) 65
The Decisive Stage (article) 499-500
Declaration of Independence 10
Dhar, Monoranjan 479
Dillon, G.S. (Major) 138
Dogens Nyheter (Swedish Daily) 69
Dorfman, Rober (Dr.) 46,-47

E

East Bengal Regiment 10
East german News Agency 447-57
East Pakistan Rifles 10
Eastern News Agency (ENA) 205-06
Eichman 475
Emergence of Secularism (article) 456-57
Evans, William P. 442

F

Famine 424-26
Famine as a Weapon Relief Food for Soldiers! Bangla is no Biafra (article) 472-74
Faruq, Md. 36 Faruqui, A. A. 31
Final Battle Begins : Mukti Bahini Riding
High (article) 498-99
The Financial times 438, 441-42, 444
Foisie, Jack 435
French Communist Party 448

G
Galbraith, John (Prof.) 4, 71-73 Gandhi. Indira 46-47, 48, 441-42,448, 484-86, 493 Gestapo 4, 5 Ghose, Narayan 32 Giri V. V. 48
Gromyko, Andrei (Soviet Foreign Minister) 427-28
The Guardian 438, 440, 448
Gun, Nirmalendu 31. 39
H
Hammarksoeld Dag 466 Hasan. Badrul 30, 33, 35 Hazelhurst, Peter 46 Heath, Edward 487 Heinsen, Earnest (Dr.) 434
Hilaly, Aga 431
An historic five-party agreement : Prof Galbraith mistakes Bengali spirit (article) 479-81
History of Economics and Political Domination of East Pakistan. 134-35
Hitler 435,462,475
Hollingworth, Clare 441, 442
Home Guard 437
Hoq, A. K. Fazlul 88, 479
I [ornsby, Michael 435
Hossain, B (Dr.) 528
Hossain, Parveen 31, 32, 33, 37,47,51
Hossain, Shah Moazzem 48, 49
Hume, Sir Alec Doglas 447, 452
Huq.Gaziul 38
Huq, Nurul (M.N.A) 33
Hussain, (Jordan) 463
Hussain, Amir 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39
I
Imam, Hasan 36
India-USSR Treaty (article) 484-86
Indian Moslems Misled (article) 467-469
Indian National Army (INA) 138 Indo-China Border Clash (1962) 428-29 Islam, Kazi Nazrul (Poet) 15, 16, 36, 42-43 ,46,47
Islam, Syed Nazrul 42-43, 39, 454
Islam, Mazharul (Dr.) 35, 36, 38
Jalianwalabag Massacre 475 Jallader Darber (Drama) 29 Jamat-e-Islami 463
Islam, Shahidul 35, 36, 38 Jessel, Toby 458-59 Jinnah, Muhammad Ali 452. 479
K
Kabikantha (Self Composed Poems) 16
Kabir, Alamgir 30, 31, 32 35, 36, 450
Kashmir Problem 457 Kennedy, Edward (senator) 454-55, 481 Khan, Abu Toab 32 ,34, 36, 37, 39 ,40 Khan, Abdul Gaffar Khan. 47. 49-50, 433 Khan, Abdul Monem 490-91
Khan, Ayub 452-53, 457, 470, 483, 490-91
Khan. Muhammad Yahya 46-47. 49. 51, 422-433,436-38, 439-40, 441,442, 443, 448, 449, 450-54, 458-59, 463,465-67, 468, 470,472-79, 481-483, 488-93, 494-97,501.-02
Khan, Sjadruddin Aga (Prince) 471-72, 483 "*
Khan, Tikka 65, 430, 431. 434, 458-59, 466,474-75
Khan, Wali 502
Kissinger, (Dr.) 465
Kosygin 484-86
L
L' Humanite (Communist Party Newspaper of France) 448
Labour Party (England) 44, 487, 488
Lahore Resolution (1940) 460-61
Laldighi Maidan 3
The Le Figaro (Paris Daily) 477
Lin Piao431
Lohani, Kamal 30, 33, 37, 38, 40 The London Times 44, 46-47, 134-35, 437, 438, 440, 441 -42,445-47, 448 Los Angeles Time 435 Loshak, Devid 444

M
Mahalanabish, Bulbul 30
Mahmood, B 528
Majumder, Phani 48, 49
Malik, A. M. 439, 475-77. 477-79, 481, 491
Malreaux, Andre 485
Mannan, M. A 16,529
Mao-Se-Tung 443
Maruqis De Sade 475
Mascarenhas, Anthony 431
Mitra, Kalyan 30, 32, 33, 39
Mohathero, Jyotipal 46
Molla. Jalaluddin 45
Monem Eliminated : Other Collaborators Shaking in Pants (article) 490-91
More Us Arms for Killing Bengalees : AAPSO Fails to understand Bangladesh (article) 454-56
The Morning Star 443-44
Morshed, Noorjahan 48, 49
A Multi-pronged Attack on Bangladesh (article) 469-71
Muslim League,456. 460-61

N
Nadir Shah 493, 488, 498
Naser (Captain) 3
Nasser (President) 463
National Awami Party (Bhashani Group) 51, 479, 502
National Awami Partv (Muzaffar Group) 479. 502
National Awami Party (Wali) 502
National Consultative Committee 479-81
National Economic Council 430
New Statesman 134-35
News Comentary 422-33
Newsweek 65, 86, 134-35,422, 438,493, 495
Newsweek Magazine 438-39
New York Times 435. 443,448-49, 494
Ngo Dm Diem regime 471
Niazi (Captain) 439, 500, 501-02
Niazi's Pitiful Boasts (article) 501-02
Nixon 427-28, 506-07, 431, 449, 451-52, 463,464-65,471, 473,493-96 Nixon Goes to Peking as Bangladesh Bleeds 464-65
Not 'Separatism' : A War of Liberation (article) 460-62

O
Observatore Ramano (The Vatican Daily) 52
Ockland Tribune (Newspaper) 134-35
O'Dyer 475
Oikatan (Patriotic Song) 16 Osman, Bulban 35 Osman. Shawkat 34 Otowa Ciuzen 134-35

P
Pakistan Bouddha Krishti Prachar Sangha 42-43, 46
Pakistan in Tight Corner: D-Day Nearing
: Warning for U.N. (article) 495-97
Palestinian Guerrilla Organisation 456
Peace Committee (Local) 444
People's Party of Pakistan 436
Pilger, John 445-46
Pmdii Prolap (Radio Talk) 29
Podgorny 44, 46, 47, 483, 484 .
Political Solution 422-24, 428-29, 454
Pratiddhani 29
Pravda (Soviet Communist Party Paper) 46-47
Prentice, Reginald 458-59

R
Rafique, Mohd 32 Rahman, A. 33, 529
Rahman, Ashfaqur 33, 31, 35, 36, 38
Rahman, Mustafizur 29, 35, 40 ,
Rahman. M. 3 1, 33. 36 Rahman. Shamsur 39 Rahman, Sheikh Mujibur 2, 3, 6, 10 , 49, 423,428-29, 430, 431, 432-33, 441 ,443, 451 -52,454, 458-59, 465-67, 468-69, 471,474-75, 477, 482, 483, 485, 490, 492 Rahman, Ziaur(Major Zia) 2, 3, 6 Rahman. Zillur(MNA) 38
Raj Bongshi, Indramohan 32

Raktaswakkhar (Self Composed Poems and Patriotic Song) 16
Ranangane Banglar Nari (Radio Talk) 29
Ranaveri (News of the Sectors) 16
Rashid, Mamunoor 36
Razakars 437, 438. 441, 444-46
Reicn (Nazi) 475
Rogers, William (U.S. Secretary) 422-23, 454-55
Round Table Conference (1969) 452-53
Roy, Ajit 35-36
Roy, Ajoy 37
Roy Chowdhury, Asit .38
S
Sadat, Anwar 46, 47
Sadek, Musa 34, 38, 39
Sadekin 29, 36, 39,
Sadeque, Zafar 31, 33, 36
Shaha, Manadev 30, 34, 36, 40
Shaha, Purnendu 30
Sakhyatker (Radio Talk) 29
Samad, A (Local Agent) 50, 528-29
Samad, M.A. 45,51
Samayeeki (News commentary in Bengali) 16
SEATO 45
Shah (Iran) 483
Shahi, Aga 46-47
Shamsher, (Lieutenant) 3
Shastri, Lai Bahadur 457
Shocking Western Apathy : Bangladesh No Biafra or Indonesia 450-51
Siddiqui, Zahed 30. 31, 32, 33, 35, 39
Sirkar, Shah Ali 16
Six Point Formula 451, 492
Som Short (Reporter of the Mai) 70
State Language Movement (1952) 456
Stonehouse. John 434, 443, 447, 449, 458-59
Suharto (Indonesia) 451 Suhrawardy, Hussain Shahid 429, 479 Sunday Telegraph 134-35 Sunday Times 134-35
The Terrible Blood Bath of Tikka Khan 65
The Time Magazine 438 U
Swadhin Bangla Liberation Government 6
Symington, Stwart 454-55 T
Tally, Mark 435,

U Thant 42-43, 44,46-47,431, 432,433, 451-52,466,472
Ukil, Abdul Malek (MNA) 34
(Jmme Kulsum 38
UN Proved Impotent (article) 451-52
United Press International 44 US People force Nixon stop arms flow (article) 493-95
US Senators Vote stoppage on aid : Paks on the UN (article) 481-83
An Unwinable Guerilla War (Report) 86

V
The Venezuelan Chamber of Deputies 51-
52

W
War on Want 41-44
Washington Post 134-35
Woollacott. Marwt438
The World Federation of the United Nations Associations 51 -52
World Opinion 44-48, 51-52
World Peace Conference 45
World Press Review on Bangladesh 447-
49
World Press worried about Sheikh : Honour for Tikka! (article) 474

Y
Yahya and his by-elections (article) 489-90
Yahya finds his quisling (article) 475-77
Yahya's Prepares to murder Sheikh (article) 465-67
Yahya's approaching Doom (article) 491-93

Z
Zaker, Ali, 31, 33
Zehadi, Moulana M. R. 30, 31